দুর্বার ও আশ্চর্য অভিযান গ্রন্থমালা

# জুল ভের্ন অমনিবাস

## পঞ্চম খন্ড

অনুবাদ

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

mmhs013

# জুল ভের্ন অমনিবাস

দুর্বার ও আশ্চর্য অভিযান গ্রন্থমালা

mmhs013

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুল ভের্ন ( ১৮২৮-১৯০৫ )

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# জুল ভের্ন অমনিবাস

## ৫

দুর্বার ও আশ্চর্য অভিযান গ্রন্থমালা

অনুবাদ :

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ :
জ্যৈষ্ঠ ১৪০১

স্বত্ব :
কৌশল্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ :
পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

শব্দগ্রন্থন :
অরিজিৎ কুমার
লেজার ইম্প্রেশনস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক :
স্বপনকুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ISBN-81-7079-589-3

একশো কুড়ি টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসঙ্গটা, সম্ভবত, এই পঞ্চম খণ্ডে এসেই পাড়া যায়, এখন।

কী-কী বই পড়তেন জুল ভের্ন? বিজ্ঞানের বই, ইতিহাসের বই, ভূগোলের বই, নৃতত্ত্বের বই — *পড়তেন* অ্যাটলাস, ব্র্যাডশ, জাহাজ কম্পানির রুট, কোথায় কোন নতুন রেললাইন হ'লো, ট্রেনে-ট্রেনে যোগাযোগব্যবস্থা কেমন, ইত্যাদি-ইত্যাদি। এগুলো তো না-বললেই চলে এগুলো না-পড়লে তিনি তাঁর *দুর্বার ও আশ্চর্য অভিযান গ্রন্থমালা*-র কাহিনীগুলো হয়তো ফাঁদতেই পারতেন না। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন যাত্রাপথের খুঁটিনাটি ঠিকঠাক দিতে না-পারলে বিশ্বাসযোগ্যই হ'তো না তাঁর অ্যাডভেনচার। এ-সব কল্পনায় ছাড়া ঘটেনি কখনও, কিন্তু ঘটতো যদি, তবু বিশ্বাসযোগ্যই হ'তো — সব চমক এবং বিস্ময় সত্ত্বেও।

কিন্তু আর কী-কী বই পড়তেন?

তাঁর নিজের রচনা থেকেই চমৎকার সাক্ষ্য পাওয়া যায় তাঁর পড়াশুনোর — কিংবা ঘুরিয়ে এও বলা যায় এমন কোনো-কোনো লেখক ছিলেন, যাঁরা তাঁর খুবই পছন্দ ছিলো। যেমন আলেকজান্দর দুমা, যেমন ওয়ালটার স্কট, যেমন এডগার অ্যালান পো। তালিকা বাড়িয়েই যাওয়া যায়। কীভাবে তিনি লিখতেন জারের দূত মিখায়েল স্ট্রগফের কাহিনী, যদি রুশী গল্প-উপন্যাস তাঁর আদৌ পড়া না-থাকতো?

জুল ভের্ন — মনে রাখতে হবে — তাঁর এই *দুর্বার ও আশ্চর্য অভিযান গ্রন্থমালা* প্রণয়ন করার আগে লিখেছিলেন নাটক, অপেরা, গান। কোনো-কোনো রচনা পড়লে তো বোঝাই যায় হাতপাকাবার সময় এই-যে লেখাগুলি লিখেছিলেন, সেগুলো তাঁর কোনো-কোনো রচনায় ছাপ ফেলে গিয়েছে। *ইন সার্চ অভ দ্য কাস্টঅ্যাওয়েজ* তিন মহাদেশ জুড়ে দুর্বার গতিতে বিভিন্ন সব বিপদআপদের মধ্য দিয়ে এগোয়, আর জাক পাঞয়ল — ইজিচেয়ারের অন্যমনস্ক ভূগোলবিদ — সারাসময়েই ধারাভাষ্য চালিয়ে যান — কিন্তু মেরি আর রবার্ট গ্রান্টকে নিয়ে জাক পাঞয়ল আস্ত একটি *চলচ্চিত্রে* গানের পর গান গেয়ে প্রায় একটা অপেরার কথাই মনে করিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের— আর জাক পাঞয়লের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মরিস শেভালিয়ে। *এরাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ* একবার দিনের পর দিন অপেরা হিশেবেই ফরাশি মঞ্চে প্রয়োজিত হয়েছিলো, আর যতদিন সে-অপেরা চলেছিলো, দর্শকসংখ্যা নাকি কখনও হ্রাস পায়নি। আজ তো এটা জানি যে কত ভাষায় কত চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছিলো তাঁর এইসব কাহিনী নিয়ে — আর কোনো-কোনো কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছিলো একাধিকবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনিতে অনেক বিষয়েই খুঁটিনাটি দেন জুল ভের্ন, কিন্তু সাহিত্য সম্বন্ধে কিছুই বলেন না — যদি-না তিনি সরাসরি উপসংহার লিখতে বসেন এডগার অ্যালান পো-র *ন্যারেটিভ অভ আর্থার গর্ডন পিম* -এর অথবা ইয়োহান দে হ্বিস-এর *সুইস ফ্যামিলি রবিনসনের*। সে-সব বইতে সর্বজ্ঞ কথক আমাদের পূর্ববর্তী বইগুলোর কথা বারে-বারেই মনে করিয়ে দিতো। কিন্তু সরাসরি হয়তো সম্ভবই ছিলো না অন্য-কোনো কবি-সাহিত্যিককে নিয়ে আলোচনা করার — বা এমনকী তির্যকভাবে হ'লেও তাঁদের কথা উল্লেখ করার। কেননা এমন-কোনো চরিত্রের মুখ দিয়ে তাঁদের সম্বন্ধে বলাতে হবে, যার জবানে এই কবিদের উল্লেখ অস্বাভাবিক হ'তো না। কিন্তু যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই তাকে কাজে খাটিয়েছেন বৈ-কি।

যেমন, *দ্য বারজাক মিশন* উপন্যাস। সেখানে কথক একজন সাংবাদিক — আমেদে ফ্লরেঁস। আজ আমরা জানি, অনেক দিন ধ'রে এই উপন্যাস লিখছিলেন জুল ভের্ন, তার আগে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে হেরেও গিয়েছেন, অসম্ভব জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও। রাজনীতি একটি অন্যজাতের খেলা। আর জীবদ্দশায় এই বই প্রকাশিত হোক, এই অভিপ্রায়ও তাঁর ছিলো না, ফলে এই বই বেরোয় ১৯০৬ সালে, তাঁর মৃত্যুর পর। এখানে জুল ভের্ন আমেদে ফ্লরেঁসের জবানিতে রোমান্টিকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা বলেছেন, যখন আমেদে ফ্লরেঁস একবার স্মরণ করেছেন *মাজেপ্পার* কথা। হাঙ্গেরীয় ফেরেন্ৎস লিশ্ট (১৮১১-৮৬) *মাজেপ্পা* রচনা করেছিলেন, পিয়ানোর জন্যে, ১৮৪৭-এ, আর পরে অর্কেস্ট্রার জন্যে ১৮৫১তে। আর লিশ্ট-এর নির্ভর ছিলো বায়রন আর ভিক্তর উগোর কবিতা। মাজেপ্পাকে বুনোঘোড়ার সঙ্গে নগ্ন বেঁধে ঘোড়াটি ছুটিয়ে দেয়া হয়েছিলো, আর সে এই ভীষণ শাস্তি সত্ত্বেও মারা যায়নি, পরে বরং কশাকদের সর্দার হ'য়ে উঠেছিলো। পরে চাইকোভস্কি অপেরা লিখেছিলেন মাজেপ্পাকে নিয়ে, মস্কোতে সেটা প্রথম প্রয়োজিত হয়েছিলো ১৮৮৪তে, আর চাইকোভস্কির অপেরার গান লিখেছিলেন ভি. পি. বুরেনিন — এবং তাঁদের অবলম্বন ছিলো পুশকিন। মাজেপ্পা (১৬৪৪-১৭০৯) ইতিহাসের চরিত্র, সে পিটার দ্য গ্রেট-এর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করেছিলো। জুল ভের্ন তাঁর প্রথমপ্রেম সংগীত ও অপেরা যে কখনও ভুলে যাননি, এখানে মাজেপ্পার কথা উল্লেখ করাতেও তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু এই অর্কেস্ট্রা বা অপেরার অবলম্বন যে-কবিরা, তাঁরা আরো চিত্তাকর্ষক — বায়রন, উগো, পুশকিন — রোমান্টিক আন্দোলন সম্বন্ধে যা-ই আমরা ভাবি না কেন — তিন দেশের এই তিন কবিকে বারে-বারেই আমাদের স্মরণ ক'রে নিতে হবে। কবিরা বা সাহিত্যিকরা যে কোত্থেকে জোগাড় করেন উপকরণ, মালমশলা। আমরা জানি, সমুদ্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হবার আগেই জাঁ-আর্তুর র‍্যাঁবো তার "মাতাল তরণী"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখেছিলেন জুল ভের্ন-এরই *টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লিগস আণ্ডার দ্য সী* প'ড়ে, সমুদ্রের বর্ণনা প্রতিচরণেই স্মরণ করেছে জুল ভের্নকে। জুল ভের্ন নিজেকে শেষঅব্দি, *আবারও*, রোমাণ্টিকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছেন তাঁর এই শেষ উপন্যাসে একাধিক স্থলে মাজেপ্পা-র উল্লেখ ক'রে।

আমরা আগেই বলেছি, জুল ভের্ন-এর রচনাবলি প্রথম থেকে অণুসরণ ক'রে এলে আমরা দেখতে পাবো বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর ধারণা কীভাবে বারে-বারে পালটেছে : *ব্লুমসডে বুক* থেকে *ডুমসডে বুক* । সত্যি-বলতে, ঔপনিবেশিকতা নিয়ে যা-ই বলুন না কেন —অন্তত বিজ্ঞান বিষয়ে জুল ভের্ন তাঁর ধারণা কী, সেটা রেখে-ঢেকে প্রকাশ করেননি। *দ্য বারজাক মিশনেই* একজায়গায় স্পষ্ট বলা আছে, প্রথম যে-লোক রিভলভার বানিয়েছিলো, সে যদি কখনও ন্যাকা সেজে বলে সে জানতো না কীসের জন্যে ব্যবহার করা হবে এই আগ্নেয়াস্ত্র, তবে তার মতো মিথ্যেবাদী আর দুটি নেই। যতই আমরা শান্তির জন্যে পরমাণু ফাটাই না কেন, আমরা যাতে হাঁদা সেজে এ-কথা কখনও না-বলি যে আমরা জানতুম না কত ধানে কত চাল—কী থেকে কী হয়। জানতুম না এই হবে — এ-কথা ব'লে দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। আইনের চোখে অজ্ঞতা কখনও যথার্থ ওজর বা কৈফিয়ৎ ব'লে গণ্য হ'তে পারে না। কিন্তু আইনের চোখ নয় — মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিও কী বলে, সেটাই আসল। পাশ্চাত্যে বিচারের দেবীর চোখ বাঁধা। কিন্তু চোখ-কান খুলে রেখেই এখন যে সবকিছু দেখতে হবে, জুল ভের্ন-এর আধুনিক প্রমেথিউসদের কাহিনী তা-ই বলে।

১২ বৈশাখ ১৪০১
কলকাতা

**মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরাউণ্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ
ইন সার্চ অভ দ্য কাস্টঅ্যাওয়েজ
দ্য বারজাক মিশন
১. নাইজার নদীর বাঁকে
২. শাহারায় শহর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# এরাউণ্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

## এক

# বাজি

বাগ্মী হিশেবে পৃথিবী-জোড়া নাম হয়েছিলো শেরিডানের। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে যে-বাড়িতে তাঁর জীবনান্ত ঘটেছিলো, আঠারো শতকের শেষের দিকে সেই বাড়িতেই থাকতেন রিফর্ম ক্লাবের সভ্য ফিলিয়াস ফগ। কিন্তু পরিহাস এটাই যে শেরিডান কথা বলতে যত ভালোবাসাতেন ফিলিয়াস ফগ কিন্তু ঠিক ততটাই ভালোবাসতেন মুখে কুলুপ এঁটে ব'সে থাকতে—পারতপক্ষে কোনো কথা না-বলতে পারলেই বুঝি তিনি সবচেয়ে-খুশি থাকতেন।

ফগের টাকাকড়ি ছিলো অঢেল, কিন্তু কীভাবে তিনি টাকা রোজগার করতেন, সে-এক মহা-রহস্য। রিফর্ম ক্লাবের মেম্বার হিশেবেই তাঁকে সকলে জানতো, কাজ-কারবার কোনোকিছু করতে কেউ তাঁকে দ্যাখেনি—অথচ টাকা ছিলো অঢেল। ফগ কথা বলতেন কম, খরচ করতেন কম, আর তাঁর সংযম ছিলো সে-এলাকার সকলের আদর্শ। অথচ, কিপ্টেও ওঁকে বলা চলে না, কেননা তাঁর দানের পরিমাণ ছিলো প্রচুর। বিলাসিতা জিনিশটা অসহ্য ছিলো ফগের কাছে। কিন্তু, তাঁর সম্পর্কে যে-কথাটি সব-চাইতে আগে বলবার, তা হ'লো : তাঁর সাংসারিক কাজকর্ম চলতো ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায়—একসেকেণ্ড এদিক-ওদিক হ'লেই কুরুক্ষেত্র বেধে যেতো।

ভূগোল ছিলো ফগের নখদর্পণে। আর সেজন্যেই অনেকেই মনে করতো তিনি বুঝি অনেক দেশ-বিদেশ ঘুরে এসেছেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার—লণ্ডনের একচুল বাইরে কখনও তিনি পদার্পণও করেননি। নিজের বাড়ি, আর রিফর্ম ক্লাব—এই দু-জায়গা ছাড়া ফগ আর-কোথাওই যাননি কখনও।

বাজি রেখে তাশ খেলা ছাড়া আর-কোনো নেশা ছিলো না ফগের। ক্লাব-ঘরে ব'সে খবর-কাগজ পড়া আর বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে তাশ খেলা ছাড়া আর-কিছুই তিনি জানতেন না। তাশ খেলায় তাঁকে কেউ হারতে দেখেছে ব'লে মনে হয় না। বাজির টাকা নিজে না-নিয়ে ফগ দান করতেন, কাজেই এ-কথা বলা-বাহুল্য যে টাকার লোভে তিনি তাশ খেলতেন না। হুইস্ট খেলায় মাথা লাগে ব'লেই বোধহয় হুইস্ট খেলায় ফগের এত টান ছিলো আর সে-খেলায় সম্ভবত তাঁর কোনো জুড়ি ছিলো না।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপন বলতে দুনিয়ায় ফগের কেউ ছিলো না; সেভিল-রোর সেই নির্জন বাড়িতে তিনি একাই থাকতেন। বাড়িতে ফগের সঙ্গে দেখা করতে কেউ কখনও গেছে ব'লে কোনো নজির পাওয়া যায় না। রিফর্ম ক্লাবেই, প্রত্যহ, একলাই, তিনি আহার করতেন —তাঁর সঙ্গে এক টেবিলে ব'সে খেতে কাউকে কখনও দেখা যায়নি। ক্লাবের ওয়েটাররা খুব-সতর্ক হ'য়ে তাঁকে খাবার পরিবেষণ করতো। সবচেয়ে ভালো জিনিশ ছাড়া কিছুই যে তিনি ঠোঁটে ছোঁয়ান না, সে-কথা ওয়েটারদের ভালো ক'রেই জানা ছিলো।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র দশ ঘণ্টা বাড়িতে থাকতেন ফগ, আর সেই দশ ঘণ্টা কাটতো ঘুমুতে ও পোশাক-আশাক পরতে। আড়ম্বর না-থাকলেও তাঁর বাড়িতে স্বাচ্ছন্দ্য ছিলো, আরাম ছিলো। জেমস্ ছিলো তাঁর পরিচারক। প্রভুর মেজাজ বুঝে তাকেও ঠিক ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় নির্দিষ্ট সময়ে কাজ করতে হ'তো। আমাদের কাহিনীর যবনিকা যেদিন উঠলো, সেদিন জেমস্ ফগকে দাড়ি কাটবার জন্যে যে-গরম জল দিয়েছিলে তা ছিয়াশি ডিগ্রি না-হ'য়ে চুরাশি ডিগ্রি হয়েছিল ব'লে সঙ্গে-সঙ্গে বরখাস্ত হ'য়ে গেলো সে, প্রায় বিনাবাক্যব্যয়েই।

ইজি-চেয়ারে ব'সে ফগ তাকিয়ে ছিলেন তাঁর ঘড়ির দিকে। ঘড়িটা, ভালো-বাহুল্য, সবচেয়ে ভালো জাতের। ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড তো বটেই, বারের নাম, মাস, বছর পর্যন্ত পাওয়া যেতো ঐ ঘড়িতে। সোয়া-এগারোটা বাজে তখন। অন্যদিন ফগ এই সময়েই ক্লাবে যেতেন। কিন্তু আজ সবকিছুই যেন কেমন গোল পাকিয়ে গেছে।

ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় সোয়া-এগারোটার সময় জেমস ঘরে ঢুকে জানালে, 'কর্তা, নতুন লোক এসেছে।'

সঙ্গে-সঙ্গে বছর-ত্রিশের একজন ফরাশি ঘরে ঢুকলো। ফগ লোকটার দিকে তাকালেন। 'ফরাশি দেখছি! তোমার নামই জন?'

'জন না, জাঁ—জাঁ পাসপার্তু।' লোকটি বললো, বোধহয় একটু বেশিই কথা বলে সে, 'আমার ধারণা, লোক আমি খারাপ নই। এ-পর্যন্ত অনেকরকম কাজই করেছি আমি। কিছুদিন রাস্তায়-রাস্তায় গান গেয়েও বেড়িয়েছি। এক সার্কাসের দলেও ছিলাম কিছুকাল —ট্রাপিজের খেলায় তো রীতিমতো ওস্তাদ। এক কুস্তির আখড়ায়ও সর্দারি করেছি কিছুদিন। পারীর রেলে ফায়ারম্যানও ছিলাম কয়েকদিন। পাঁচ বছর হ'লো ফ্রান্স ছেড়েছি। ইংল্যাণ্ডে এক ভদ্রলোকের কাছে কাজ করেছিলাম কিছুকাল—কিন্তু শেষ অব্দি তাঁর কাছে কাজ করা আর পোষালো না। এখন তাই বেকার ব'সে আছি। শুনলাম, আপনার একজন পরিচারক চাই। আরো শুনলাম, আপনি সংযমী আর সময়ানুবর্তী। আপনার কাছে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবো —এই ভরসাতেই এসেছি।'

ফগ জবাব দিলেন, 'ঠিক আছে। তোমার সততার কথা আমি আগেই শুনেছি, সার্টিফিকেটগুলোও দেখেছি। এই চাকরির শর্তগুলো সব জানো তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বেশ। এখন ক-টা বেজেছে ?'

পাসপার্তু তার জেব থেকে একটা প্রকাণ্ড ঘড়ি বের ক'রে বললে: 'এগারোটা বাইশ।'

'উঁহু। তোমার ঘড়ি ঠিক নয়—স্লো চলছে।'

'অসম্ভব।' পাসপার্তু প্রতিবাদ করলে, বেশ সজোরেই।

'তোমার ঘড়ি চারমিনিট স্লো চলছে। সে-যাক, ভুলটা শুধরে নিলেই হ'লো। মনে রেখো, আঠারোশো বাহাত্তর সালের দোসরা অক্টোবর বেলা এগারোটা ছাব্বিশে তুমি আমার কাজে ভর্তি হ'লে।' বলতে-বলতে ইজি-চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ফগ, যন্ত্রেচলা মানুষের মতো টুপিটা মাথায় দিলেন, তারপর আর-কিছু না-ব'লে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

নতুন মনিবের সামনে দাঁড়িয়ে পাসপার্তু এতক্ষণ তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছিলো। তার নতুন প্রভুর চেহারাছিরি দিব্বি, সুন্দর কান্তি ফগের, লম্বা-চওড়া শরীর। দেখলেই মনে হয়, ফগ এককথার মানুষ। যারা ভালো ক'রে লক্ষ করেছিলো, তারা জানতো, ফিলিয়াস ফগ কখনও খামকা, কারণবিনা কোনো কাজ করতেন না। যেখানে এক-পা ফেললেই চলে, সেখানে কেউ তাঁকে দু-পা এগুতে দ্যাখেনি। যে-পথে গেলে সবচেয়ে-কম সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছুনো যায়, ফিলিয়াস ফগ সবসময় সেই পথেই পা বাড়াতেন। বাধা তাঁর কাছে বাধাই ছিলো না। যা ধরতেন, তা শেষ না-ক'রে তিনি ছাড়তেন না । খামকা কোনো-কিছু করা তাঁর অভ্যেস ছিলো না । দুঃখে-আনন্দে অবিচলিত, বিপদে অচঞ্চল, সদা শান্ত, ধীরস্থির ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফগ এক আশ্চর্য-স্বভাব লোক ছিলেন। তাড়াহুড়ো ক'রে কিছু করতে কেউ তাঁকে কখনও দ্যাখেনি। নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, সাতে-পাঁচে কোনো রা করতেন না বা কাড়তেন না।

জাঁ পাসপার্তুও মানুষ হিশেবে ভালোই। দৃঢ়গড়ন শরীর তার, এত বিচিত্র অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও মুখে একটা আশ্চর্য-সরল লাবণ্যের ছাপ। অনেকদিন অনেকরকম কাজ করতে-করতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো—তাই কিছুদিন শান্তিতে কাটানোর জন্যেই ফগের কাছে এসে চাকরি নিয়েছিলো সে।

পাসপার্তু তার ঘরকন্না দেখে নিতে লাগলো। দেখলো, যেখানে যা থাকা উচিত, এ-বাড়িতে তা ঠিক-সেখানেই আছে। কোথাও বিলাসিতার চিহ্নও নেই, অথচ কোনো অভাবও নেই। পাসপার্তু মনে-মনে খুশিই হ'লো। সবকিছু দেখে-শুনে সে নিজের ঘরে এসে হাজির হ'লো। ঘরটা ভালো। একদিকে একটা টেলিফোন আর একটা ইলেকট্রিক বেলও আছে সেই ঘরে। ফায়ার-প্লেসের উপরে দেয়ালে একটা ইলেকট্রিক ঘড়ি টিক-টিক ক'রে চলছে। ফগের ঘরের ঘড়ি আর এই ঘড়ি ঠিক একইসময় রাখছিলো। ঘড়িটার পাশেই, দেয়ালে, একটা কাগজে পরিচারকের প্রাত্যহিক কাজের একটা রুটিন ঝুলছিলো।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাসপার্তু পড়তে লাগলো : *আটটা তেইশ মিনিটে প্রাতরাশ, ন-টা সাঁইত্রিশ মিনিটে দাড়ি কামাবার জন্য গরম জল, পৌনে দশটার সময় স্নানের আয়োজন* ইত্যাদি-ইত্যাদি। পাসপার্তু তার কাজের রুটিনে মনঃসংযোগ করলো বেশ খুশি মনেই, যাকে বলে হৃষ্ট চিত্তে।

ক্লাবে পৌঁছেই ফগ কারু সঙ্গে কোনো কথা না-ব'লে নিজের খাবার-টেবিলে গিয়ে বসলেন। বারোটা সাতচল্লিশ মিনিটের সময় খাওয়া শেষ ক'রে ড্রয়িংরুমে এসে পৌঁছুবা-মাত্র বেয়ারা তাঁর হাতে একটি *টাইমস* কাগজ দিয়ে গেলো। *টাইমস* আর তারপর *স্ট্যাণ্ডার্ড* কাগজ পড়তে-পড়তেই বিশ্রামের সময় হ'য়ে গেলো। বিশ্রাম সেরে ফগ একটি *মর্নিং ক্রনিকল* হাতে ক্লাবের সেলুনে এসে ঢুকলেন।

আধঘণ্টার মধ্যেই তাঁর বন্ধু-বান্ধবে ঘরটা ভ'রে গেলো। এঁরা সবাই হুইস্টে এক-একজন নামজাদা খেলোয়াড়। আন্দ্রে স্টুয়ার্ট, জন সলিভান, স্যামুয়েল ফলেন্টিন, টমাস ফ্লানাগেন, বিলেতের বড়ো-একটা ব্যাংকের অন্যতম ডিরেক্টার গথিয়ার র‍্যাল্‌ফ —এঁদের কারুই টাকার অভাব ছিলো না। বেশ কিছুকাল ধ'রেই ফিলিয়াস ফগের হুইস্ট-যুদ্ধ চলছে এঁদের সঙ্গেই।

ফায়ার-প্লেসের চারদিকে ব'সে এঁরা গল্প-গুজব করতে লাগলেন। ফ্লানাগেন বললেন : 'র‍্যাল্‌ফ, এই-যে সাংঘাতিক ডাকাতিটা হ'য়ে গেলো, এর কিনারা কিছু হ'লো কি?'

স্টুয়ার্ট বললেন : 'কী আর হবে? ব্যাংকের টাকাগুলো সবই মাঠে মারা গেলো আর-কি!'

স্টুয়ার্টের কথায় কান না-দিয়েই র‍্যাল্‌ফ বললেন, 'আমার অবশ্য ভরসা হচ্ছে যে চোর ধরা পড়বেই। আমেরিকা, ইওরোপ, এশিয়া—সবখানেই আমাদের ডিটেকটিভ আছে। প্রত্যেক বড়ো-বড়ো বন্দরেই তারা খবর নিচ্ছে। এদের চোখে ধুলো দিয়ে, এদের ফাঁকি দিয়ে পালানো খুব-সহজ নয়।'

স্টুয়ার্ট বললেন : 'তাহ'লে চোরের চেহারা কেমন তা আপনারা জানেন?'

কথা শুনে র‍্যাল্‌ফ দৃঢ়স্বরে বললেন : 'চোর কেন বলছেন? টাকাটা যে নিয়েছে, সে চোর নয়।'

'সে-কী!' স্টুয়ার্ট অবাক হলেন। 'সাড়ে-আট লক্ষ টাকার নোট নিয়ে যে স'রে পড়তে পারে, সে যদি চোর না-হয় তো কী?'

'না, চোর সে নয়!'

বিদ্রূপে ফেটে পড়লেন সলিভান : 'না, না, সে কেন চোর হ'তে যাবে? সে হ'লো সস্ত পলের অতীব আদরের চেলাটি।'

এতক্ষণে খবরের কাগজ থেকে মাথা তুললেন ফগ। '*মর্নিং ক্রনিকলে* পড়ছিলুম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যিনি নোটগুলো নিয়েছেন, তিনি নাকি আপাদমস্তক একজন ভদ্রলোক।'

আলোচনা চলতে লাগলো।

তিনদিন আগে ইংল্যাণ্ডের ব্যাংক থেকে সাড়ে-আট লাখ টাকার নোট চুরি হয়েছিলো। ব্যাংকের অন্যতম ডিরেক্টার র‍্যাল্‌ফ সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন : 'এই চুরির জন্যে ক্যাশিয়ার বেচারির কিন্তু কোনো দোষ নেই। ও কী করবে ? ও তখন মন দিয়ে ব্যাংকের একটা পাওনা খাতায় জমা করছিলো। একটা লোক তো আর চারদিকে নজর রাখতে পারে না। দুটো বৈ তো তার আর চোখ নেই।'

ব্যাংক অভ ইংল্যাণ্ডে যাঁরা টাকাকড়ি দিতে বা নিতে আসতেন কর্তৃপক্ষ তাঁদের সততা সম্পর্কে কখনোই কোনো সন্দেহ করেননি। কেউ নোট দেখছেন, কেউ সোনা পরীক্ষা করছেন, কেউ-বা হিরে-জহরৎ মণি-মুক্তো দেখছেন। পরীক্ষার পর সবাই আবার যথাস্থানে টাকাকড়ি মণিমুক্তো রেখে দিতেন —এইভাবেই কাজ চলতো। কিন্তু সেদিন যিনি নোট নিয়েছিলেন তিনি আর তা ফেরৎ দেননি। বেলা পাঁচটার সময় যখন ব্যাংক বন্ধ করা হবে, তখনই প্রথম জানা গেলো যে, ব্যাংকের সাড়ে-আট লাখ টাকা চুরি হয়েছে।

অমনি হৈ-চৈ শুরু হ'য়ে গেলো। চারদিকে ডিটেকটিভ পাঠানো হ'লো। মুহূর্তে দেশে-বিদেশে ঐ চুরির খবর ছড়িয়ে পড়লো। ব্যাংক অভ ইংল্যাণ্ড ঘোষণা করলো, চোর ধরতে পারলে ত্রিশ হাজার টাকা পুরস্কার তো মিলবেই, তা ছাড়া অপহৃত টাকার যতটুকু পাওয়া যাবে, তার উপর শতকরা ত্রিশ টাকা হিশেবে কমিশন দেয়া হবে।

*মর্নিং ক্রনিকল* জানালে যে, ঘটনার দিন আচার-ব্যবহারে-সুমার্জিত ভদ্রবেশধারী একটি লোককে ব্যাংকের নোট পরীক্ষা করতে দেখা গিয়েছিলো। তার পোশাক ও চেহারার বর্ণনা ডিটেকটিভদের দেয়া হয়েছিলো ব'লেই কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস, চোর ধরা পড়বেই। খবরের কাগজগুলো তো হুজুগ পেলেই হৈ-চৈ করে, এবারও শোরগোল তুলতে তারা ভোলেনি।

র‍্যাল্‌ফের বিশ্বাস পুরস্কারের লোভে ডিটেকটিভরা নিশ্চয়ই প্রাণপণ চেষ্টা করবে —তাহ'লে চোর বা দস্যু যা-ই সে হোক না কেন ধরা পড়বেই। স্টুয়ার্টের মত ছিলো অন্যরকম। হুইস্ট খেলতে-খেলতে তাই তাঁরা এই জবর-গরম খবরেরই আলোচনা করতে লাগলেন। স্টুয়ার্ট বললেন : 'চোর যে মহাধুরন্ধর, তা বেশ বোঝাই যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস ও পালিয়ে যাবে।'

র‍্যাল্‌ফ বললেন : 'পালাবে তো বটেই—কিন্তু যাবে কোথায়, বলুন।'

'কেন ? দুনিয়ায় কি জায়গার অভাব আছে নাকি ! পৃথিবীটা তো আর এতটুকু এক এঁদোগলি নয়, পালাবার জায়গার আবার ভাবনা !'

ফিলিয়াস ফগ তাশ শাফল করতে-করতে বললেন : 'এককালে পৃথিবীটা বড়োই ছিলো বটে, তবে এখন আর সে-দিন নেই।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টুয়ার্ট বললেন : 'তার মানে? পৃথিবীটা কি এখন ছোটো হ'য়ে গেছে নাকি?'

র‍্যাল্‌ফ বললেন : 'ঠিক তা-ই। একবার পৃথিবীটা ঘুরে আসতে এখন যে-সময় লাগে, আগে লাগতো তার দশগুণ বেশি। তবেই তো পৃথিবী ছোটো হ'য়ে গেলো। এইজন্যে চোরের সন্ধান খুব তাড়াতাড়ি হবে—সে আর পালাবে কোন চুলোয়?'

ফগ বললেন : 'মিস্টার স্টুয়ার্ট, এবার আপনার পালা, খেলুন।'

আর খেলা! স্টুয়ার্টের তখন খেলার দিকে মন ছিলো না। 'এখন তিন মাসে পৃথিবী ঘুরে আসা যায় ব'লে পৃথিবীটা এতই ছোটো হ'য়ে গেছে যে আপনি দিব্বি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছেন?'

ফগ বাধা দিলেন : 'তিন মাস তো ঢের-বেশি—আশিদিনেই এখন সারা দুনিয়া ঘুরে আসা যায়।'

সলিভান সায় দিলেন ফগের কথায়। 'এ-কথা ঠিক। রোটাস থেকে এলাহাবাদ অব্দি গ্রেট-ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলপথ খুলেছে। এখন আশিদিনেই সারা পৃথিবী ঘোরা হ'য়ে যায়। এই দেখুন-না, *মর্নিং ক্রনিকলে* লিখেছে, মার্সেঈও ব্রিন্দিসি হ'য়ে রেল ও স্টীমারে লণ্ডন থেকে সুয়েজ সাতদিন : স্টীমারে সুয়েজ থেকে বম্বাই তেরোদিন, রেলে বম্বাই থেকে কলকাতা তিনদিন, স্টীমারে কলকাতা থেকে হংকং তেরোদিন; স্টীমারে হংকং থেকে ইয়োকোহামা ছয়দিন; স্টীমারে ইয়োকোহামা থেকে সানফ্রান্সিসকো বাইশদিন; রেলে সানফ্রান্সিসকো থেকে নিউ-ইয়র্ক সাতদিন, রেল আর স্টীমারে নিউ-ইয়র্ক থেকে লণ্ডন নয়দিন—একুনে আশিদিন।'

দিনের হিশেব কষতে-কষতে খেলার কথা ভুলে গিয়ে স্টুয়ার্ট একটা ভুল তাশ খেলে ফেললেন। 'হ্যাঁ, আশিদিনই বটে। কিন্তু ঝড়-তুফান, জাহাজ-ডুবি, রেল-কলিশন —এ-সব তো আর ও-হিশেবে ধরা হয়নি।'

ফগ বললেন : 'সে-সব ধ'রেই বৈকি।'

'বলেন কী?' স্টুয়ার্ট যেন অবাকই হলেন একটু। 'সে-সব ধ'রেই? যদি মার্কিন মুলুকের ষণ্ডাগুণ্ডারা পথ থেকে রেল উঠিয়ে রাখে, কিংবা যদি ট্রেন থামিয়ে লুঠতরাজ শুরু ক'রে দেয়, তাহ'লে—'

শান্তগলায় ফগ জবাব দিলেন 'হ্যাঁ, তাহ'লেও।—এই দেখুন, আমার হাতে দুটো রঙ। এ-বাজি আমার।'

স্টুয়ার্ট বললেন : 'ও-সব গাঁজাখুরি ব্যাপার খবরকাগজেই মানায়, বাস্তবে—'

'বাস্তবেও ঐ হিশেব ঠিক।'

স্টুয়ার্ট হাসলেন। 'আপনিই একবার ক'রে দেখান না যে আশিদিনেও পৃথিবী ঘুরে আসা যায়।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চলুন-না, আপনিও ঘুরে আসবেন আমার সঙ্গে।'

'উঃ-রে ব্বাস্-রে! আমি বাপু এই অসম্ভব ব্যাপারে নাক গলিয়ে নাকাল হ'তে চাইনে। আপনি যদি আশিদিনেই পৃথিবী ঘুরে আসতে পারেন, আমি তবে ষাট হাজার টাকা দেবো।'

'আশিদিনে পৃথিবী ঘুরে-আসা—এই তো? বেশ, আমিই না-হয় যাবো।'

'কবে?'

'কেন? এক্ষুনিই রওনা হ'য়ে পড়বো। তবে আগেই ব'লে রাখছি সমস্ত খরচ কিন্তু আপনার।'

ফগের একগুঁয়েমি দেখে স্টুয়ার্ট একটু বিরক্তই হ'য়ে পড়লেন। 'এইসব বাজে কথা রেখে, আসুন তো, এক-হাত খেলা যাক ভালো ক'রে।'

'আগের বাজি আপনি হেরেছিলেন—এবার আপনিই শুরু করুন।'

কী মনে ক'রে স্টুয়ার্ট আবার বললেন : 'দেখুন মিস্টার ফগ, আপনি যদি রাজি থাকেন তো আমি ষাট হাজার টাকাই বাজি রাখবো। যখন একবার বলেছি বাজি ধরবো, তখন কোনোমতেই সে-কথা নড়চড় হবে না বা মিথ্যে হবে না।'

'বেশ-তো, ভালো কথা।' ফগ বললেন। 'আমিও পিছু হঠবার পাত্র নাই। ব্যারিং-এর গদিতে আমার তিন লাখ টাকা জমা রয়েছে—আমি সেই তিন লাখ টাকাই বাজি রাখছি।'

সলিভান অবাক হ'য়ে গেলেন। 'তিন লাখ টাকা বাজি! এ আপনি বলছেন কী, মিস্টার ফগ? পাগল হলেন নাকি? একটা সামান্য-কিছু গোলযোগ হ'লেই তো আপনার সব টাকা জলে যাবে! রাস্তায়-ঘাটে কত রকম বাধা-বিপত্তি আছে। এখন হয়তো বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু পরে—'

ফগ বাধা দিয়ে বললেন : 'অদৃষ্টপূর্ব এমন-কিছু ঘটতেই পারে না।'

'এই-যে আশিদিনের হিশেব, এর চেয়ে কম সময়ে সারা দুনিয়া ঘুরে আসা কিন্তু অসম্ভব।'

'সবদিকে চোখ রেখে ঠিকমতো চলতে পারলে কম সময়েই সব কাজ করা যায়।'

'আপনাকে অনেকবার ট্রেন থেকে স্টীমারে, স্টীমার থেকে ট্রেনে ওঠা-নামা করতে হবে। একটু যদি দেরি হয়, যদি ট্রেন বা স্টীমারে ঠিক সময়ে উঠতে না পারেন—'

'কে বললে আমার দেরি হবে?'

'এ আপনি ঠাট্টা করছেন নিশ্চয়ই।'

'ঠাট্টা? সত্যিকার ইংরেজ বাজি রেখে কখনও ঠাট্টা করে না! আপনাদের যাঁর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইচ্ছে তাঁর সঙ্গেই বাজি ধরতে আমি রাজি আছি। হ্যাঁ, তিন লাখ টাকার বাজি—আমি আশিদিনের মধ্যে সারা দুনিয়া ঘুরে আসবো। আপনারা রাজি আছেন?'

নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ক'রে সবাই জানালেন : 'হ্যাঁ, রাজি।'

'বেশ। পৌনে ন-টায় ডোভার মেল ছাড়ে—আমি ওতেই রওনা হচ্ছি।'

'সে-কী!' স্টুয়ার্ট রীতিমতো তাজ্জবই হলেন। 'আজ সন্ধ্যায়ই?'

'হ্যাঁ, *আজই সন্ধ্যায়*। আজ দোসরা অক্টোবর, বুধবার। একুশে ডিসেম্বর শনিবার পৌনে ন-টার মধ্যে আমি এই ক্লাব-ঘরে এসে হাজির হবো। যদি না-পারি, তবে ব্যারিং-এর গদিতে আমার যে তিন লাখ টাকা আছে, সে-সবই আপনাদের হবে। এই নিন, ঐ টাকার চেক রাখুন।'

তক্ষুনি বাজির শর্তগুলো লেখা হ'লো। দু-তরফই সেই দলিলে সই করলেন।

ফিলিয়াস ফগ কিন্তু তখনও আগের মতোই অবিচলিত। ফগ জানতেন যে তাঁর যথাসর্বস্ব হ'লো ছ-লাখ টাকা। এই অভূতপূর্ব ভ্রমণেই তার অর্ধেক খরচ হ'য়ে যাবে। তাই তিনি তিন লাখ টাকা বাজি ধরেছিলেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধব সবাই খুব উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন—টাকার জন্যে নয়, তারা সবাই একেকজন টাকার তিমিঙ্গিল, কিন্তু তবু এমন অবস্থায় এ-রকম বাজি ধরলে আপনা-আপনিই যেন বুক কেঁপে ওঠে।

ফগ কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে তাশ খেলছিলেন। দেখতে-দেখতে সাতটা বেজে গেলো। সবাই বললেন : 'আর-না, এবার খেলা বন্ধ হোক। মিস্টার ফগকে যাত্রার জন্যে তৈরি হ'তে হবে তো।'

খেলতে-খেলতেই ফগ বললেন : 'আমি তো তৈরিই আছি!'

সোয়া-সাতটার সময় তাশ খেলা ছেড়ে ফগ উঠে দাঁড়ালেন। হুইস্টের বাজি জিতে যে-তিনশো টাকা পেয়েছিলেন, তা কোটের পকেটে রেখে বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। পৌনে-আটটার সময় ফগকে বাড়ি পৌঁছুতে দেখে পাসপার্তু আশ্চর্য হ'লো—রুটিন অনুযায়ী তাঁর তো রাতদুপুরের আগে বাড়ি ফেরার কথা নয়!

ফগ নিজের ঘরে ঢুকে টেলিফোনে পাসপার্তুকে ডাকলেন। পাসপার্তু ঘরে ঢুকে পকেট থেকে ঘড়ি বার করলে, বললে, 'এখনও তো রাতদুপুর হয়নি!'

'সে আমি জানি। দশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের ক্যালের দিকে যেতে হবে।'

পাসপার্তুকে হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ফগ আবার বললেন, 'আশিদিনের মধ্যে আমাকে সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে হবে, তাই এক্ষুনি ক্যালে রওনা হ'তে হবে আমাদের। চলো, ট্রেনের আর বেশি দেরি নেই।'

পাসপার্তু তো একেবারে থ! আশিদিনে সারা দুনিয়া ঘুরে আসা? সে-যে একেবারে অসম্ভব! মাথা খারাপ হয়নি তো ফগের? সদ্য-পাওয়া সাধের চাকরিটা বুঝি প্রথম দিনেই তাকে খোয়াতে হ'লো!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফগ কিন্তু সেদিকে খেয়াল না-ক'রে ব'লে চললেন : 'জিনিশপত্র বিশেষ-কিছু নিতে হবে না। একটা কার্পেটের ব্যাগে গোটা-দুই শার্ট আর জোড়া-তিনেক মোজা নিলেই চলবে। তোমার জন্যেও তা-ই নিয়ো। আর যা-কিছু দরকার হবে, পথে যেতে-যেতে কিনে নিলেই হবে। আমার ম্যাকিন্টশ আর বড়ো কোটটা নিয়ো। আমাদের অবিশ্যি বেশি হাঁটতে হবে না, তবু যেন দু-জোড়া বুটজুতো সঙ্গে থাকে। এ-কী ? চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে ? শিগগির করো, শিগগির।'

অবাক পাসপার্তু তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে হতাশভাবে একটা চেয়ারে ব'সে পড়লো, আপনমনেই বললো, 'কপালের লেখা কে খণ্ডাতে পারে ! আমার বরাতে বেশ হ'লো দেখছি ! দু-দিন একটু শান্তিতে থাকবো ভেবেছিলুম ! এখন খুব হ'লো !'

কিন্তু ভাববার অবসর কই ? সময় নেই, এক্ষুনি রওনা হ'তে হবে। পাসপার্তু দ্রুতহাতে জিনিশপত্র গোছাতে লাগলো, আর ভাবতে লাগলো, *আশিদিনে সারা দুনিয়া ঘুরে-আসা* ! তবে কি আমি পাগলের চাকরি নিলুম ? না-না, এ-যে একদম অসম্ভব ! এ নিশ্চয়ই একটা তামাশা। পাঁচ বছর হ'লো দেশ ছেড়েছি, পাঁচ বছর পর আবার দেশের মুখ দেখতে পাবো—সে হিশেবে ক্যালে যাওয়াটা একরকম ভালোই। পারী দেখতে তিনি অন্তত একবার নিশ্চয়ই সেখানে যাবেন—আর গেলে কি আর দু-দিন না-থেকে পারবেন ? কিন্তু তা-ই বা বলা যায় কী ক'রে ? যিনি কখনও ঘরের বাইরে পা দেননি, তিনি যখন পৃথিবীভ্রমণে বেরুচ্ছেন, তখন ব্যাপারটা যে আসলে কী, সেইটেই হ'লো সত্যিকার ভাববার কথা।

আটটার মধ্যেই পাসপার্তু জিনিশপত্র ব্যাগে ভ'রে তৈরি হ'য়ে নিলে, আর অস্থির মনে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে ফগের কাছে এসে দাঁড়ালে। ফগ এর মধ্যেই তৈরি হ'য়ে নিয়েছিলেন। হাতে ছিলো ব্র্যাডশ-র *কন্টিনেন্টাল গাইড*। পাসপার্তুর কাছ থেকে ব্যাগটা নিয়ে তার ভিতর একতাড়া ব্যাংক-নোট রেখে বললেন, 'কি ? সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো ? ব্যাগটা নাও। সাবধানে রেখো—এর মধ্যেই কিন্তু তিন লাখ টাকার নোট রইলো।'

*তিন লাখ টাকা* ! ব্যাগটা পাসপার্তুর কাছে হঠাৎ যেন বিষম ভারি হ'য়ে উঠলো, মনে হ'লো, হাত বুঝি অবশ হ'য়ে এলিয়ে যাচ্ছে, বুঝি আর হাতে ধ'রে রাখতে পারা যাচ্ছে না।

দু-জনে নিচে নামলেন। দরজায় তালা পড়লো। একটা গাড়ি ডেকে চ্যারিংক্রস স্টেশনের দিকে রওনা হলেন তাঁরা। প্রায় সাড়ে-আটটায় ফগ আর পাসপার্তু স্টেশনের ভিতর প্রবেশ করলেন। একটি ভিখিরি এসে হাত পেতে দাঁড়াতেই ফগ পকেট থেকে হুইস্টের বাজি-জিতে-পাওয়া টাকা ক-টা দিয়ে দিলেন—আর পাসপার্তু তাঁর এই দান দেখে ফগকে অত্যন্ত ভালোবেসে ফেললো।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাসপার্তু পারীর জন্যে দুটো ফার্স্টক্লাসের টিকিট কিনে আনতে গেলো। এমন সময় রিফর্ম ক্লাবের সভ্যরা ফগকে *সী-অফ* করতে স্টেশনে এসে হাজির হলেন। তাঁদের দেখে ফগ বললেন, 'এই দেখুন, আমি তো এক্ষুনি যাত্রা করছি। আমার পাসপোর্টে কন্সালের সই দেখলেই তো আপনাদের আর সন্দেহের কারণ থাকবে না?'

র‍্যাল্‌ফ নম্রকণ্ঠে বললেন : 'না, না—পাগল হলেন নাকি? আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট—পাসপোর্টের ছাপটাপের আর দরকার কী?'

স্টুয়ার্ট বন্ধুকে সতর্ক ক'রে দিলেন। 'কবে ফেরবার কথা তা যেন ভুলে যাবেন না।'

'আঠারোশো বাহাত্তর সালের একুশে ডিসেম্বর পৌনে-ন-টা। আশা করি মনে থাকবে। আচ্ছা, চলি।'

পৌনে ন-টার সময় ডোভার মেল ছাড়লো। অন্ধকার রাত্রি, তার উপর টিপ-টিপ ক'রে বৃষ্টিও পড়ছিলো তখন। হঠাৎ পাসপার্তু চেঁচিয়ে উঠলো : 'হায়-হায়! তাড়াতাড়িতে আমার ঘরের বাতিটা নিবিয়ে দিতে ভুলে এসেছি!'

ফগ শান্ত নির্বিকার গলায় বললেন, 'বেশ। আমরা যদ্দিন না-ফিরছি বাতিটা একটানা জ্বলতেই থাকবে। বিজলির বিলের দামটা অবিশ্যি তোমাকেই দিতে হবে।' ডোভার মেলটা তখন যদি হঠাৎ থামতো, পাসপার্তু নিশ্চয়ই বিজলির চাইতেও দ্রুতবেগে দৌড়ে ঘরে ফিরে যেতো। গিয়ে বাতিটা নিবিয়ে, দিতো। কিন্তু, একঘেয়ে শব্দ ক'রে ডোভার মেল দ্রুতবেগে ছুটেই চললো, অন্ধকার ফুঁড়ে সোজা সামনের দিকেই।

## দুই

## মিস্টার ফিক্স, ডিটেকটিভ

ফগ জানতেন তাঁর এই বাজি নিয়ে বিলেতে রীতিমতো একটা হৈ-চৈ প'ড়ে যাবে। হ'লোও তাই। এই অদ্ভুত বাজির কথা যখন খবরের কাগজে বেরুলো, তখন সারা ইংল্যাণ্ড আর আয়ারল্যাণ্ডে একটা তুমুল শোরগোল প'ড়ে গেলো। যে শুনলো, সে-ই নানান রকম যুক্তি-তর্ক দিয়ে এই দুঃসাহসিক পর্যটনের পরিণাম আলোচনা করতে লাগলো। কেউ-কেউ বললে, ফগ নিশ্চয়ই সফল হবেন। কিন্তু বেশির ভাগ লোকেই বললে, এমন অসম্ভব ব্যাপার ককখনো সম্ভব হবে না—ফগের পরাজয় সুনিশ্চিত। অনেকে আবার বললে, এ ফগের পাগলামি ছাড়া আর-কিছু না। *টাইমস, স্ট্যাণ্ডার্ড, মর্নিংক্রনিকল* ইত্যাদি খান-কুড়ি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্র-পত্রিকা জানালে যে, 'এ-রকমটা ককখনো হবে না, ফিলিয়াস ফগের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।' শুধু *ডেইলি টেলিগ্রাফ* ফিলিয়াস ফগের পক্ষ নিলে। অনেকে বললে : ফিলিয়াস ফগ একটা বদ্ধপাগল। আর রিফর্ম ক্লাবের সভ্যরাও ডাহাউন্মাদ। মাথাখারাপ না-হ'লে কি কেউ কখনও এমনতর অসম্ভব ব্যাপারে বাজি ধরে ? কেউ-কেউ তো বললে, ফিলিয়াস ফগ ব'লেই কেউ নেই, ও-সব কাগজওলাদের কাটতি বাড়াবার চাল।

*ইলাসট্রেটেড লণ্ডন নিউজে* যখন ফিলিয়াস ফগের ছবি বেরুলো, তখন কেউ-কেউ এবং অনেক মহিলা ফগকে সমর্থন করলেন। কেউ-কেউ এ-কথাও বললেন, দুনিয়ায় কত আশ্চর্য ব্যাপারই তো ঘটছে, তাহ'লে আর এমনটা হ'তে বাধা কোথায় ?

সাতুই অক্টোবর রয়্যাল *জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটির* পত্রিকায় একটা বিরাট প্রবন্ধ বেরুলো। প্রবন্ধলেখক বিরাট এক ফিরিস্তি দিয়ে উপসংহারে জানালেন যে, আশিদিনে পৃথিবী-পরিক্রমার ব্যাপারটা এক উন্মাদ ছাড়া আর-কারু পক্ষে ভাবাও সম্ভব নয়। প্রবন্ধটি বিলেতের সকল কাগজেই পুনর্মুদ্রিত হ'লো। আগে এই ব্যাপারে লোকে যে-সব বাজি ধরেছিলো, এই প্রবন্ধে ফিলিয়াসের নিশ্চিত পরাজয় জেনে প্রায় সকলেই সেই বাজি প্রত্যাহার করলো। সপ্তাহখানেক যেতে-না-যেতেই ফগের দল একান্ত দুর্বল হ'য়ে পড়লো।

এমন সময় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বড়োকর্তা নিচের টেলিগ্রামটা পেলেন :

*'ব্যাংকের নোট-চোর ফিলিয়াস ফগের খোঁজ পেয়েছি। ওকে বম্বাইয়ে গ্রেপ্তার করার জন্যে পরোয়ানা চাই।—ডিটেকটিভ ফিক্স।'*

এই টেলিগ্রামের খবরও ছড়িয়ে পড়তে বিন্দুমাত্র দেরি হ'লো না। মুহূর্তমধ্যে ফিলিয়াস ফগ ঘৃণ্য ব্যাংক-দস্যু ব'লে পরিচিত হ'য়ে পড়লেন। রিফর্ম ক্লাবের সভ্যদের ছবির মধ্যে ফিলিয়াস ফগের যে-ছবি ছিলো, লোকে উৎসুক হ'য়ে সেই ছবির সঙ্গে দস্যুর চেহারা মিলিয়ে সমস্বরে ব'লে উঠলো : এ-কী! ফিলিয়াস ফগ তবে দস্যু! সর্বনাশ! লোকটা কী চালাক! কেউ-কেউ বললে : ফিলিয়াস ফগ যে একটা দস্যু এ-তো আগেই জানতুম। দস্যু না-হ'লে কি কেউ এমন একলা থাকে—ত্রিসংসারে কারু সঙ্গে মেলামেশা করে না। অনেকে বললে : অবাক কাণ্ড! ফিলিয়াস ফগ যে এত ভয়ানক লোক তা তো জানতুম না! যেই ব্যাংকের টাকাটা হাতে পড়েছে, অমনি পৃথিবী পরিভ্রমণের একটা ছুতো ক'রে সটকে পড়েছে, যাতে পুলিশ তার আর-কোনো খোঁজ না-পায়! ওঃ! কী সাংঘাতিক!

বরাত ব'লে যে একটা-কিছু রহস্যময় ব্যাপার আছে তা লোকের সঙ্গে-সঙ্গেই থাকে। ফিলিয়াস ফগের অদৃষ্টও নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে-সঙ্গেই ছিলো, মিস্টার ফিক্স ডিটেকটিভের বরাতও তাঁর কাছ-ছাড়া হয়নি। তবু দুজনের বরাত যে এমনিভাবে জড়িয়ে-মড়িয়ে জট পাকিয়ে পড়বে, তা আগে কে জানতো ?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পি. অ্যাণ্ড ও. কম্পানির যতগুলো জাহাজ ছিলো, তার মধ্যে *মংগোলিয়াই* সবচেয়ে দ্রুত চলতে পারতো। নয়ই অক্টোবর বুধবার সুয়েজ-বন্দরে *মংগোলিয়া* জাহাজের পৌঁছুবার কথা ব'লে জাহাজের প্রতীক্ষায় জাহাজ-ঘাট লোকে লোকারণ্য হয়েছে। সকলের মুখেই এককথা : 'ঐ এলো। ঐ এলো!'

জাহাজের জন্যে অপেক্ষা করতে-করতে শ্রান্ত হ'য়ে দুই ভদ্রলোক সেই ভিড় ঠেলে জেটির ধারে পায়চারি করছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন সুয়েজের ইংরেজ কন্সাল। অন্যজন একটু বেঁটেখাটো ও শীর্ণ দেখতে—তবে মুখে-চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। কীসের যেন একটা চিন্তা ভদ্রলোককে এতই অধীর করেছিলো যে কিছুতেই একটুও সুস্থির হ'তে পারছিলেন না। এঁরই নাম মিস্টার ফিক্স, ডিটেকটিভ, ব্যাংক-দস্যুকে ধরবার জন্যে পোর্ট-সুয়েজে এঁকেই প্যাঠানো হয়েছিলো।

ব্যাকুল আগ্রহে *মংগোলিয়া* জাহাজের জন্যে অপেক্ষা করতে-করতে ফিক্স কন্সালকে বললেন : 'আপনি তাহ'লে বলতে চান, *মংগোলিয়ার* কখনও দেরি হয় না?'

'না, কখনও দেরি হয় না। *মংগোলিয়া* কাল পোর্ট-সয়ীদ ছেড়েছে। অত-বড়ো একটা জাহাজের কাছে সুয়েজ ক্যানাল আর কতটুকু পথ? ঠিক সময়ের আগে পৌঁছুলে গবর্মেণ্ট প্রত্যেকবার চারশো টাকা পুরস্কার দিয়ে থাকেন। আমি তো জানি *মংগোলিয়াই* বরাবর সে-টাকা পেয়ে এসেছে।'

'*মংগোলিয়া* কি বরাবর ব্রিন্দিসি থেকে আসে?'

'হ্যাঁ। ভারতবর্ষের ডাক ব্রিন্দিসিতেই জাহাজে ওঠে। শনিবার বিকেল পাঁচটায় জাহাজ ছেড়েছে—এই এলো ব'লে। অত ব্যাকুল হবার কী আছে? আপনি অত ব্যস্ত হবেন না। আচ্ছা, ব্যাংক-দস্যু যদি সত্যি-সত্যিই জাহাজে থাকে, আপনি দস্যুর চেহারার যে-বর্ণনা পেয়েছেন, তা থেকেই তাকে চিনে নিতে পারবেন? ও-রকম কোনো ধূর্ত দস্যুকে কি অত সহজে শনাক্ত করা যাবে? আমার তো তা মনে হয় না।'

'চেহারা কি—আমার মনই তাকে চিনিয়ে দেবে। চোখে না-দেখেও যেমন কখনো-কখনো গায়ের গন্ধে মানুষ চেনা যায়, এ-ও ঠিক তেমনি। হাজার-হাজার চোর দেখেছি আমি। যদি এই জাহাজে সে এসে থাকে তবে আমায় সে কিছুতেই ফাঁকি দিতে পারবে না।'

'উঃ! কী সাংঘাতিক চুরি! ঈশ্বর করুন, আপনি যেন চোরকে ধরতে পারেন।'

'সাংঘাতিক ব'লে সাংঘাতিক! এমন চুরি ক-টা হয়? ভাবুন দেখি, নগদ সাড়ে-আট লাখ টাকা! এ কি যেমন-তেমন কথা! যদি ধরতে পারি, পুরস্কারও পাবো অঢেল। এমন সুযোগ জীবনে আসে ক-বার? আজকাল যে কেমন হয়েছে, এমন জাঁহাবাজ চোর বড়ো-একটা দেখতে পাওয়া যায় না। আজকাল শুধু গোটাকতক ছিঁচকে চোর আর পুঁচকে চুরিই জ্বালিয়ে খাচ্ছে আমাদের!'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বড্ড উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছেন আপনি! আপনি যদি ধরতে পারেন, তবে তো ভালোই হয়। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে কাজটা অত সহজ হবে না। আপনি যাঁর চেহারার বর্ণনা পেয়েছেন তিনি হয়তো নেহাৎই নিরীহ একজন নির্বিরোধী নির্দোষ ভদ্রলোক।'

'বড়ো-বড়ো চোরদের বাইরে থেকে দেখতে নিরীহ ভদ্রলোকই লাগে। ডাকাতের মতো চেহারা যার, সে কি আর সাহস ক'রে চুরি করতে পারে? চেহারা দেখেই যে লোকে আগেভাগেই তাকে সন্দেহ করবে। ভণ্ড সাধুতার মুখোশ খুলে ফেলাই আমাদের কাজ—আর গোয়েন্দার কাজের সত্যিকার বাহাদুরি তো তাতেই!'

জেটির উপর ভিড় তখন বেড়েই চলছিলো।

দিনটাও ছিলো সুন্দর আর পরিচ্ছন্ন। পূবদিক থেকে সমুদ্রের সোঁদা-গন্ধ-মাখা হাওয়া বইছিলো ধীরে-ধীরে।

জেটির ঘড়িতে সাড়ে-দশটা বেজে গেলো।

ব্যগ্র হ'য়ে উঠলেন ফিক্স। 'না, এ-জাহাজ আজ আর আসবে না দেখছি!'

কন্সাল বললেন : 'উঁহু, ভাববেন না। আর বেশি দেরি নেই।'

'সুয়েজে কতক্ষণের জন্য নোঙর করবে?'

'ঘণ্টা-চারেকের জন্যে। এখানেই কয়লা তোলে জাহাজে। সুয়েজ থেকে এডেন তেরোশো দশ মাইল দূরে। বুঝতেই তো পারছেন, কত কয়লা লাগে।'

'সুয়েজ থেকেই বুঝি সরাসরি বম্বাই যায়?'

'হ্যাঁ, একদম বম্বাই। পথে আর-কোথাও দাঁড়ায় না।'

'তা-ই তো! ডাকাতটা যদি এই পথেই *মংগোলিয়া* জাহাজে এসে থাকে, তবে ইংরেজ-পুলিশকে ফাঁকি দেয়ার মৎলবে সুয়েজেই নামবে। তারপর এখান থেকে দিনেমার কি ফরাশিদের কোনো-একটা কাছাকাছি উপনিবেশে যাওয়ার চেষ্টা করবে। ভারতবর্ষ তো ইংরেজের অধীন—সেখানে গেলে যে তার কোনো সুবিধে হবে না, তা সে বেশ ভালো ক'রেই জানে।'

'লোকটা যে অত চালাক, আমার তা মনে হয় না। চালাক হ'লে আসবে কেন অ্যাদ্দুর? লণ্ডনেই তো লুকিয়ে থাকা সবচেয়ে সহজ। অত বিরাট শহরে কে তাকে খুঁজে বার করবে? খড়ের গাদায় কি আর ছুঁচ খুঁজে পাওয়া যায়?' এই কথা ব'লে কন্সাল গোয়েন্দাবাহাদুর ফিক্সের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের কাজে চ'লে গেলেন। তাঁর কথায় ফিক্সের চিন্তা আরো বেড়ে উঠলো।

একটু বাদেই ঘন-ঘন সিটি শোনা গেলো। যে যেখানে ছিলো সবাই দ্রুতপায়ে ছুটলো জেটির দিকে। তীরের নৌকাগুলো সঙ্গে-সঙ্গে নোঙর তুলে বাঁধন খুলে *মংগোলিয়ার* দিকে এগুলো। ঠিক এগারোটার সময় *মংগোলিয়া* নির্দিষ্ট জায়গায় নোঙর ফেলে চোঙ দিয়ে হুশ-হুশ ক'রে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক যাত্রী ছিলো জাহাজে। কেউ-কেউ জাহাজের ডেক থেকেই চারদিকের দৃশ্য দেখতে লাগলো, কেউ-বা নৌকোয় চ'ড়ে এলো তীরে। ফিক্স খুব সাবধানে প্রত্যেক আরোহীকে দেখতে লাগলেন। ব্যাংকদস্যুর সন্ধানে তিনি যখন খুবই শশব্যস্ত, তখন একজন যাত্রী ভিড় ঠেলে তাঁর কাছে এসে তাঁকেই শুধোলেন, 'মশায়, বলতে পারেন ইংরেজ সরকারের কন্সাল আপিশটা কোথায়?' কথা বলতে-বলতে আগন্তুক একটা পাসপোর্ট বার ক'রে বললেন, 'আমি এই পাসপোর্টে কন্সালের সই নিতে চাই।'

ফিক্স পাসপোর্টটা হাতে নিয়ে পড়লেন। অমনি কেঁপে উঠলো তাঁর হাত। কী তাজ্জব ব্যাপার! এ-যে সেই দস্যুরই পাসপোর্ট! এতে যার ছবি রয়েছে, দস্যুরও ছবি যে ঠিক তেমনি। ফিক্স আগন্তুকের দিকে তাকালেন। বললেন : 'এ তো তোমার পাসপোর্টে নয়!'

'না, এটা আমার মনিবের।'

'তিনি কোথায়?'

'জাহাজে আছেন।'

'তাঁকেই কন্সাল আপিশে যেতে হবে, তুমি গেলে চলবে না।'

'আপিশটা কোথায়?'

সামনের একটা বাড়ি দেখিয়ে ফিক্স বললেন : 'ঐ সামনের মোড়টায়—ঐ-যে বাড়িটা দেখতে পাচ্ছো, ঐটেই।'

'তাহ'লে আমি যাই, তাঁকেই আনি-গে।' এই ব'লে আগন্তুক ফের জাহাজে প্রত্যাবর্তন করলো।

ফিক্স আর বিন্দুমাত্র দেরি না-ক'রে কন্সালের কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনাকে বিরক্ত করতে হ'লো ব'লে মাপ করবেন। নোট-চোর যে *মংগোলিয়াতেই* আছে, আমি তার বিশেষ প্রমাণ পেয়েছি।' এই ব'লে যা-যা ঘটেছে, সব বিস্তারিতভাবে খুলে বললেন।

সব শুনে কন্সাল বললেন : 'তাহ'লে সে এখানেই আসছে? কিন্তু সত্যিই যদি সে চোর হয় তাহ'লে সে কখনও এখানে আসবে না।'

'যদি তার ঘটে একটুও বুদ্ধি থাকে, তাহ'লে সে নিশ্চয়ই আসবে এখানে।'

'তার ঐ পাসপোর্টটা পাঁচজনকে দেখাতে নাকি?'

'হ্যাঁ। চোর-ডাকাতের পালানোর পথ নিষ্কণ্টক করা, আর ভালো মানুষকে খামকা ঝঞ্ঝাটে ফেলা—এ ছাড়া পাসপোর্টের আর-কোনো দরকার আছে নাকি? এর পাসপোর্টটা যে ঠিকই আছে, কোনো জাল পাসপোর্ট নয় তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তবু আশা করি, আপনি ওতে সই করবেন না।'

'কেন? পাসপোর্টে গোলমাল না-থাকলে তো আমাকে সই করতেই হবে।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তা হোক, কিন্তু যতক্ষণ-না লণ্ডন থেকে ওয়ারেণ্ট পাচ্ছি ততক্ষণ তো দস্যুকে এখানে আটকে রাখতে হবে।'

'সে হ'লো আপনার কাজ, আপনি তার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু আমার—' কন্সালের কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজায় করাঘাত হ'লো। ভৃত্য এসে দুজন অপরিচিত লোককে সেখানে পৌঁছে দিয়ে প্রস্থান করলে। এঁদের একজন একটা পাসপোর্ট নিয়ে সই করাবার জন্যে কন্সালের হাতে তুলে দিলেন। কন্সাল পাসপোর্টটা ভালো ক'রে পরীক্ষা করতে লাগলেন আর ফিক্স নীরবে ব'সে আগন্তুকের আপাদ-মস্তক খুব ভালো ক'রে দেখতে লাগলেন। পাসপোর্ট দেখে কন্সাল শুধোলেন : 'আপনার নামই ফিলিয়াস ফগ?'

'হ্যাঁ।'

'এই লোকটা কি আপনারই সঙ্গে চলেছে? আপনার ভৃত্য?'

'হ্যাঁ। ওর বাড়ি ফ্রানসে। নাম জাঁ পাসপার্তু।'

'আপনি লণ্ডন থেকে আসছেন? যাবেন কোথায়?'

'হ্যাঁ, লণ্ডন থেকেই আসছি। যাবো বম্বাই। আমি যে এখানে এসেছি, আপনার সই নিয়ে তার প্রমাণ রাখতে চাই।'

এরপর কন্সাল আর-কোনো দ্বিরুক্তি না-ক'রে পাসপোর্টে স্বাক্ষর করলেন। ফগ তাঁর ফি চুকিয়ে দিয়ে অভিবাদন ক'রে পাসপার্তুকে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

ব্যগ্রকণ্ঠে ফিক্স শুধোলেন : 'এখন আপনার কী মনে হয়?'

'চেহারাছিরি দেখে ভদ্রলোককে তো নেহাৎ ভালোমানুষ ব'লেই মনে হ'লো।'

'হ'তে পারে। কিন্তু সে-কথা হচ্ছে না। ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে দস্যুর চেহারা কি হুবহু মিলে যাচ্ছে না?'

'তা অবশ্য মিলছে, তবে সবসময় চেহারার বর্ণনা—'

বাধা দিয়ে ফিক্স বললেন : 'সে আমি দেখে নিচ্ছি। ভৃত্যের কাছে ঘেঁসতে অসুবিধে বিশেষ হবে না। লোকটা যখন ফরাশি, তখন কিছুতেই নিশ্চয়ই মুখ বুজে থাকতে পারবে না। আচ্ছা, চলি তবে। এক্ষুনি অবশ্য আবার ফিরে আসবো।' ফিক্স তক্ষুনি পাসপার্তুর খোঁজে বেরুলেন।

কন্সালের আপিশ থেকে বেরিয়ে ফগ সরাসরি জেটিতেই ফিরলেন। পাসপার্তুকে কতগুলো কাজের ভার দিয়ে সোজা ফিরে গেলেন জাহাজে।

ফিলিয়াস ফগের ডায়রিতে দোসরা অক্টোবর থেকে একুশে ডিসেম্বর অব্দি প্রত্যেক দিনের জন্য নির্দিষ্ট স্থান ছিলো। কোন মাসে, কোন তারিখে, কোন বারে, ক-টার সময় তাঁকে পারী, ব্রিন্দিসি, সুয়েজ, বম্বাই প্রভৃতি বড়ো-বড়ো জায়গাগুলোয় পৌঁছুতে হবে, তা লেখা ছিলো। কোনো জায়গায় পৌঁছুতে নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে কত বেশি বা কত কম সময় লাগলো, তাও তিনি লিখছিলেন। জাহাজে এসে ডায়রি বার করলেন তিনি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে লেখা ছিলো : দোসরা অক্টোবর বুধবার রাত্রি পৌনে ন-টার সময় লণ্ডন ত্যাগ, বৃহস্পতিবার ভোর আটটা চল্লিশ মিনিটের সময় পারী। শুক্রবার চৌঠা অক্টোবর ভোর ছ-টা পঁয়ত্রিশে মার্সেঈ-এর পথে তুরীন শহরে আগমন—এবং সাতটা কুড়িতে তুরীন পরিত্যাগ। শনিবার পাঁচুই অক্টোবর বিকেল চারটেয় ব্রিন্দিসি, বিকেল পাঁচটায় *মংগোলিয়া* জাহাজে যাত্রা। এবার ফগ লিখলেন : বুধবার নয়ই অক্টোবর বেলা এগারোটায় পোর্ট সুয়েজে আগমন। এ পর্যন্ত আসতে লেগেছে সবমিলিয়ে সাড়ে ছ-দিন।

## তিন

## মিস্টার ফিক্সের অনুসন্ধান

একটু পরেই জেটিতে ফিক্সের সঙ্গে পাসপার্তুর দেখা হ'য়ে গেলো। ফিক্স শুধোলেন : 'কী-হে? তোমাদের পাসপোর্টে ঠিকঠাক স্বাক্ষর করা হয়েছে তো?'

'আরে! আপনি যে! ধন্যবাদ! হ্যাঁ, সবই ঠিক হয়েছে।'

'বম্বাই চলেছো বুঝি?'

'হ্যাঁ। এত তাড়াতাড়ি আমরা চলেছি যে এখনও আমার কাছে সবই স্বপ্ন ব'লে মনে হচ্ছে। এইটে তো সুয়েজ, কেমন না?'

'হ্যাঁ, সুয়েজ।'

'তাহ'লে আমরা মিশরে, মানে আফ্রিকাতে, এসেছি! সত্যি-সত্যিই কি আমরা এখন আফ্রিকায়? একবার ভাবুন দেখি ব্যাপারখানা! আমার তো ধারণাই ছিলো না যে আমরা কখনও পারীর বাইরে যাবো। সেখানে কতক্ষণই-বা ছিলাম—একটি ঘণ্টা মাত্র। এখন আমার বড্ড আপশোশ হচ্ছে। পারীর সুন্দর-সুন্দর জায়গাগুলো আবার দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে আর কেবলই মন-কেমন করছে।'

'তাহ'লে সত্যিই দেখছি তোমাদের বড্ড তাড়াতাড়ি চলতে হচ্ছে?'

'আমার আর তাড়াতাড়ি কী, আমার মনিবেরই যত তাড়াতাড়ি। ভালো কথা, আমাকে খান-কয় কামিজ আর একজোড়া জুতো কিনতে হবে। লণ্ডন থেকে রওনা হবার সময় আমাদের সঙ্গে ছোটো-একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ ছাড়া আর-কিছুই ছিলো না।'

'চলো, এক্ষুনি তোমাকে বাজারে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে যা-যা দরকার, সব পাবে।'

'আপনি অতি সজ্জন।' সবিনয়ে বললে পাসপার্তু। 'আচ্ছা, চলুন তাহ'লে। একটু



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাড়াই আছে আমার। জাহাজ-ছাড়ার আগেই আবার আমাকে ফিরে আসতে হবে কিনা।'

ফিক্স বললেন : 'এখনও জাহাজ ছাড়ার ঢের দেরি আছে। এই তো সবে বারোটা বেজেছে।'

পাসপার্তু পকেট থেকে তার প্রকাণ্ড ঘড়িটা বার করলো। ঘড়িটা সম্ভবত তার ঠাকুরদার আমলের। 'বারোটা বেজেছে ! আমার ঘড়িতে তো ন-টা বাহান্ন বাজে।'

বাইরের দিকে পা চালাতে-চালাতে ফিক্স বললেন : 'তাহ'লে তোমার ঘড়ি ভুল !'

'ভুল !' পাসপার্তুর গলা কেমন তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠলো। 'ঠাকুর্দার আমল থেকে ঘড়িটা ঠিক সময় দিয়ে আসছে, একটুও এদিক-ওদিক ট্যাঁ-ফোঁ করেনি, আর আজ কিনা ভুল হ'য়ে গেলো ! ইল্লি। বছরে পাঁচমিনিটও এদিক-ওদিক হয় না—আর আজ দু-তিন ঘণ্টার ফারাক হ'য়ে গেলো ! কী বলছেন, মশাই, আপনি ? এ কি আমার যে-সে ঘড়ি ! ঠিক যেন একটা ক্রনোমিটার !'

'কেন-যে সময়ের অত তফাৎ হয়েছে, আমি তা বুঝতে পেরেছি,' ফিক্স বললেন : 'তোমার ঘড়িতে লণ্ডনের সময় আছে। সুয়েজের সময় আর লণ্ডনের সময় এক নয়–সুয়েজে যখন বারোটা, তখন লণ্ডনে প্রায়-দশটা। যেখানেই যাও, বেলা ঠিক বারোটার সময় সেই দেশের ঘড়ির সঙ্গে নিজের ঘড়ি মিলিয়ে নিয়ো—তাহ'লেই ঠিক সময় থাকবে।'

'বললেই হ'লো আর-কি। চাইনে আমি অন্য দেশের সময়। আমার ঘড়ি যেমন আছে, তেমনি থাক। আমার ঘড়ি কি ভুল হ'তে পারে, মশায় ?' সগর্বে পাসপার্তু তার ঘড়িটা পকেটের মধ্যে রেখে দিলে।

ফিক্স শুধোলেন : 'তোমরা বোধহয় বেজায় তাড়াহুড়ো ক'রেই লণ্ডন থেকে বেরিয়েছো ? যাচ্ছো কোথায় ?'

'হ্যাঁ, খুব তাড়াহুড়ো ক'রেই বেরুতে হয়েছে আমাদের। বুধবার রাত ঠিক আটটার সময় আমার মনিব তাঁর ক্লাব থেকে ফিরে এলেন, তারপর ঠিক পৌনে-এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হ'লো। উনি সারা দুনিয়া ঘুরে আসতে বেরিয়েছেন কি-না, তাই বরাবর সামনের দিকেই চলেছি আমরা।—সোজা নাকবরাবর।'

'সারা দুনিয়া ঘুরে আসতে বেরিয়েছেন ? বিশ্বপরিভ্রমণে ?'

'হ্যাঁ, তাও আবার মাত্র আশিদিনে। আমাকে বললেন যে, বাজি রেখে এই কাজে হাত দিয়েছেন—কিন্তু, আপনাকে বলতে আপত্তি নেই, আমি এ-কথার বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস করিনে। মাথার ঠিক থাকলে কি কেউ এমন আজব বাজি ধরে, এমনিতর কাজে হাত দেয় ? আমার তো মনে হয় এর পেছনে অন্য-কোনো কারণ রয়েছে।'

'ভারি আশ্চর্য মানুষ তো তোমার মনিব ! ওঁর জুড়ি মেলা ভার ! উনি কি খুব ধনী



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাকি!'

'ধনী ব'লে ধনী, বিরাট ধনী। টাকার একেবারে কুমির। তাঁর সঙ্গে টাকা কত! সবই টাটকা ব্যাংক-নোট। খরচ করতে তো কুণ্ঠিত দেখিনে কখনও। নির্দিষ্ট সময়ের আগে বম্বাই পৌঁছুতে পারলে *মংগোলিয়ার* এঞ্জিনম্যানকে ইনাম দেবেন বলেছেন।'

'তুমি বুঝি অনেকদিন থেকেই এঁর চাকরি করছো?'

'অনেকদিন? যেদিন আমরা লণ্ডন ছেড়েছি, ঠিক সেদিন থেকেই আমার চাকরির শুরু!'

পাসপার্তুর কথা শুনে ফিক্সের মন যে কীভাবে আলোড়িত হ'লো, তা সহজেই অনুমেয়। ব্যাংকে চুরি হওয়ার পরেই অত তাড়াহুড়ো ক'রে লণ্ডন থেকে বেরিয়ে-পড়া, সঙ্গে কাঁড়ি-কাঁড়ি ব্যাংক-নোট, একটা বাজির ভান ক'রে ভারতবর্ষে পৌঁছুনোর জন্যে এমন অধীর ব্যগ্রতা—এ-সমস্তই ফিক্সের সন্দেহকে আরো-সুদৃঢ় ক'রে তুললো। আরো বিশদভাবে, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে, খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে ফিক্স পাসপার্তুর সঙ্গে নানান কথা বলতে লাগলেন।

পাসপার্তু শুধোলে : 'বম্বাই তো ভারতবর্ষে, মানে এশিয়ায়? এখান থেকে বুঝি অনেক দূর?'

'নেহাৎ কাছে নয়, জাহাজে দিন-দশেক লাগে।'

'উঃ! বাতিটার কথাই আমার দিনরাত মনে হচ্ছে!'

'বাতি? কীসের বাতি?'

'বিজলি বাতি। এমন তাড়াহুড়ো ক'রে বেরুতে হয়েছিলো যে বেরুবার সময় বাতিটা যে নেভাতে হবে, সে-কথাই খেয়াল ছিলো না। যখন খেয়াল হ'লো, তখন বেজায় দেরি হ'য়ে গিয়েছে। মুখ ফসকে কথাটা যেই বলেছি, অমনি কর্তা জানালেন, বাতিটা তো জ্বলছে আমারই দোষে, ফলে আমার ভুলের মাশুল আমাকেই গুনতে হবে—যা বিল উঠবে, সবই দিতে হবে আমাকে! তা, ভেবে দেখুন, দিনে দু শিলিং ক'রে গচ্চা দিতে হচ্ছে। ধরুন, যদি আশিদিন পরে ফিরেও আসি, কত টাকা আমায় মিছেমিছি খেসারৎ দিতে হবে! শুধু মুহূর্তের একটা ভুলে এতগুলো টাকা গুনাগার—'

পাসপার্তুর ঘ্যানঘ্যান বাহাদুর গোয়েন্দা ফিক্সের কানের পোকাগুলোকেও যেন নড়িয়ে দিচ্ছিলো তখন। পাসপার্তুতে কত টাকা গচ্চা দিতে হবে, তাতে ফিক্সের কী! ফিক্স এখন আকাশে মস্ত একটা কেল্লা বানাচ্ছেন—ব্যাংকদস্যুকে পাকড়াতে পারলে কত টাকা পাবেন, তিনি তখন তার ভাবনাতেই মশগুল। ইনামের সঙ্গে-সঙ্গে নামও হবে তাঁর, কাগজে-কাগজে ছবি বেরুবে। সবাই তাঁকে একডাকে চিনতে পারবে। আহা, কবে যে চোরটার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিতে পারবেন!

পাসপার্তু তখন তার নিজের নামের মানে সাতকাহন ক'রে ব্যাখ্যানা করতে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেগেছে। তার নামের মানে *সবখোল চাবি* হ'লে কী হয়, নিজের কপালটাতেই সে কুলুপ এঁটে রেখেছে! নামের অবশ্য আরেকটি অর্থও হয়—ছবি বাঁধিয়ে রাখার ফ্রেম —তা সে নিশ্চয়ই নিজের ভাগ্যটাকেই এখন ফ্রেমে পুরে টাঙিয়ে রেখেছে। কোথায় সবখানে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াবে এই *সবখোল চাবি*, সব কুলুপে ঢুকে পড়বে অনায়াসে—না, বাঁধানো একখানা ছবি হ'য়েই শোভা বাড়াচ্ছে তার দুর্ভাগ্যের।

পাসপার্তুর নাকিকান্নাকে মোটেই প্রশ্রয় না-দিয়ে বাহাদুর গোয়েন্দা ফিক্সসাহেব পাসপার্তুকে নিয়ে গিয়ে তার যা-যা কেনাকাটা করার ছিলো, সেগুলো দরদাম ক'রে, শস্তায় দাঁও বাগাবার ভঙ্গি ক'রে, পাসপার্তুর কৃতজ্ঞতা অর্জন ক'রে, অতঃপর তার কাছ থেকে বেশ অন্তরঙ্গভাবেই বিদায় নিলেন। এবং সটান পুর্নবার এসে হাজির হলেন কন্সালের কাছে।

অতঃপর কন্সালের সঙ্গে ফিক্সের যা কথাবার্তা হ'লো, তা এইরকম:

'না, না, কন্সাল। আমার আর-কোনো সন্দেহই নেই। যার জন্যে অ্যাদ্দিন হা-পিত্যেশ ক'রে বসেছিলুম, সে-ই এখন সশরীরে এখানে এসে হাজির হয়েছে। লোকটি কি-রকম ফেরেব্বাজ দেখুন—গুল দিয়ে বেড়াচ্ছে, সে না কি আশিদিনে আস্ত পৃথিবী ঘুরে আসবে। আরে, এ-যে তার একটা ধাপ্পা ছাড়া আর-কিছু নয়, সে কি আর আমার বুঝতে দেরি আছে? ও-রকম বুজরুকি আমি ঢের-ঢের দেখেছি।'

'আপনার কথা ঠিক হ'লে বলতেই হয় লোকটা আসলে ধূর্তের শিরোমণি, সে এত দেশ-বিদেশ ঘুরে শেষকালে খোদ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চোখেই ধুলো দিয়ে লণ্ডন ফিরতে চায়!' বইটি আমারবই.কম এর জন্য নির্মিত।

'কী ক'রে ফেরে, দেখবো।'

'কিন্তু আপনার কোনো ভুল হয়নি তো?'

'আমার ভুল!' ফিক্স যেন বিষম অপমানিত বোধ করলেন। 'আর যারই ভুল হোক, ডিটেকটিভ ফিক্সের কখনও ভুল হয় না। ফিক্স উইল ফিক্স হিম—ইভেনচুয়্যালি।'

'কিন্তু সে-যে সুয়েজ পেরিয়ে যাচ্ছে, তা সে প্রমাণ করবার জন্যে এমন উঠে-প'ড়ে লেগেছে কেন?'

'আসল কারণ জানিনে। তবে ধাপ্পাটা বজায় রাখবার জন্যেই হয়তো। হয়তো এই ভাণটা বাহাল রাখতে চায় যে সে পৃথিবীভ্রমণেই বেরিয়েছে! যাক, আমি এক্ষুনি লণ্ডনে তাড়া দিয়ে তার করছি— যাতে বম্বাইতে ওয়ারেণ্টটা পেয়ে যাই। ভারতবর্ষের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে-সঙ্গে বাছাধনকে পাকড়াতে হবে। আমিও *মংগোলিয়ায়* এই ব্যাংকদস্যুর সহযাত্রী হবো। দেখবো, কী ক'রে আমার কব্জা থেকে সে পালায়।'

ব'লে কন্সালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিক্স প্রথমে গেলেন ডাক ও তারের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপিশে—লণ্ডনে টেলিগ্রাফ পাঠালেন তিনি, যাতে বম্বাইতে নামবামাত্র ওয়ারেণ্ট হাতে পান। তারপর ছোট্ট একটা ব্যাগে নিজের জামাকাপড় পুরে সোজা গিয়ে হাজির হলেন *মংগোলিয়ায়*। একেবারে ঠিক সময়েই পৌঁছেছিলেন। একটু বাদেই চোঙ দিয়ে কালোধোঁয়া ওগরাতে-ওগরাতে *মংগোলিয়া* নীল সমুদ্রে পাড়ি জমালে।

সুয়েজ থেকে এডেন তেরোশো দশ মাইল দূরে, কম্পানির সব জাহাজই অতটা পথ সবমিলিয়ে একশো আটত্রিশ ঘণ্টায় পেরিয়ে আসে।

জাহাজে উঠেই ফিলিয়াস ফগ বন্ধু জুটিয়ে নিয়েছেন—বন্ধু মানে তাশুড়ে, যাঁদের সঙ্গে ব'সে-ব'সে তিনি হুইস্ট খেলবেন। জাহাজেরই সঙ্গী সবাই—জীবনে এই-প্রথমবার তাঁদের তিনি চর্মচক্ষে দেখলেন। ডেকে গিয়ে পায়চারি করার বদলে, অন্তহীন নীল জলের একঘেয়ে উচ্ছ্বাস দেখার বদলে, হরতন রুহিতন চিড়েতন ইশ্‌কাবনেই ফিলিয়াস ফগের আগ্রহ বেশি। টেক্কা-সাহেব-বিবি-গোলাম—এ-সব হাতে থাকলে তাঁর ককখনও একঘেয়ে বা অসহ্য লাগে না।

পাসপার্তুও আচমকা-এই-সমুদ্রযাত্রাকে শেষটায়, খুশিমনেই, মেনে নিয়েছে। দিব্বি কোনো কাজকর্ম নেই, ফাইফরমাশ খাটা নেই, জাহাজের সেলুনে আর ডাইনিংরুমে ভালোমন্দ গেলো, আর হজমের যাতে গোলমাল না-হয়, বাকি সময়টা ডেকে পায়চারি ক'রে বেড়াও।

আর সুয়েজ থেকে বেরুবার পরের দিনই পায়চারি করতে গিয়ে পাসপার্তুর সঙ্গে আচমকা দেখা হ'য়ে গেলো ফিক্সের। দেখেই, পাসপার্তু গায়ে প'ড়েই এগিয়ে গেলো ফিক্সের দিকে। 'আপনার সঙ্গেই তো সুয়েজের জাহাজঘাটায় দেখা হয়েছিলো, তাই না?'

'আরে, তা-ই তো বটে। তুমিই না সেই ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছো—'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন মিস্টার—'

'আমার নাম ফিক্স।'

'মিস্টার ফিক্স, আপনাকে জাহাজে দেখে খুব খুশি হলাম। যাচ্ছেন কোথায়?'

'বম্বাই।'

'বাঃ, ভালোই হ'লো। আপনি কি আগে আর-কখনও বম্বাই গিয়েছিলেন?'

'অনেকবার। পি. অ্যাণ্ড ও. কম্পানির আমি একজন এজেণ্ট কি-না। আমাকে তো আখছার নানা জায়গায় যেতে হয়।'

'ভারতবর্ষের সঙ্গে আপনি তাহ'লে পরিচিত দেখছি। ভারতবর্ষ ভারি-একটা আজব দেশ, কেমন না?'

'তা একরকম আজব দেশ বলতে পারো।' ফিক্স তাঁর পুঁথি-পড়া বিদ্যেকে স্মরণ করবার চেষ্টা করলেন। 'সেখানে কত মন্দির মশজিদ মিনার আছে। কত সাপ-বাঘ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, তা মিস্টার ফগ ভালো আছেন তো?'

'বেশ সুস্থ আছেন। আমিও ভালোই আছি। ঠিক রাক্ষসের মতো খাচ্ছি আজকাল। সমুদ্রের হাওয়া বোধহয় খিদে বাড়ায়।'

'কই, তোমার মনিব তো কখনও ডেকে আসেন না?'

'না। এ-সব বিষয়ে তাঁর মোটেই কোনো কৌতূহল নেই।'

'আমার মনে হয়, এই আশিদিনে সারা দুনিয়া ঘুরে আসার ব্যাপারটা একটা ভান মাত্র। এর ভেতরে নিশ্চয়ই বিশেষ-কোনো-একটা গুরুতর বিষয় লুকোনো আছে। তুমি কী বলো?'

'শপথ ক'রে বলতে পারি, আমি এ-সবের কিছুই জানি না। আর সে-বিষয়ে কিছু জানবার আগ্রহও নেই আমার।'

তখনকার মতো কথাবার্তা এখানেই শেষ হ'লো। কিন্তু পরে সুযোগ পেলেই ফিক্স পাসপার্তুর কাছ থেকে খবর বার করবার চেষ্টা করতেন। সেজন্য মাঝে-মাঝে দু-এক গেলাশ মদ্যপান করতে আমন্ত্রণ জানাতেন তিনি। মদিরা সেবনে পাসপার্তুর কখনোই কোনো অনীহা নেই। সে ভাবতো, বাঃ, লোকটা কী ভদ্র, অমায়িক, এমন ভদ্রলোক তো সচরাচর দেখা যায় না!

দ্রুতগামী *মংগোলিয়া* মোম্বাসা ছাড়লো, বেবেলমণ্ডেব ছাড়লো, ক্রমে-ক্রমে এডেন বন্দরের উত্তরে অবস্থিত স্টীমার-পয়েন্ট ছাড়িয়ে এলো। বম্বাই তখনও ষোলোশো-পঞ্চাশ মাইল দূরে। পনেরো তারিখে এডেন পৌঁছুবার কথা হ'লেও চোদ্দই অক্টোবর সন্ধেবেলাতেই *মংগোলিয়া* এডেন পৌঁছেছিলো। ফিলিয়াস ফগ তাই পনেরো ঘণ্টার মতো সময় হাতে পেলেন। স্টীমার-পয়েন্টে নেমে ফিলিয়াস ফগ পাসপোর্টে সই করিয়ে এনেছিলেন। বলা বাহুল্য, হুঁশিয়ার ও ধুরন্ধর ফিক্স অলক্ষ্যে তখন তাঁকে অনুসরণ করতে ছাড়েননি।

সন্ধে ছটার জাহাজের নোঙর উঠলো। বিপুল ভারত মহাসাগরের উচ্ছ্বসিত নীল জল কেটে তরতর ক'রে বম্বাইয়ের দিকে চললো *মংগোলিয়া*। তখনও বম্বাই প্রায় একশো সত্তর ঘণ্টার পথ ছিলো।

আকাশ ছিলো পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ। আবহাওয়া ছিলো চমৎকার। আস্তে-আস্তে বাতাস বইছিলো। ক্যাপ্টেন সুযোগ বুঝে পাল তুলে দিলেন। ফলে আর পালে দ্রুত থেকে দ্রুততর হ'য়ে উঠলো জাহাজের গতি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

## চার

# ঘূর্ণিপাকে

যেদিন পৌঁছুবার কথা, তার দু-দিন আগেই *মংগোলিয়া* বম্বাইয়ের জাহাজ-ঘাটায় এসে ভিড়লো। সন্ধে আটটার সময় কলকাতার ট্রেন ছাড়বে। ফগ হুইস্ট খেলা শেষ ক'রে তীরে নামলেন। পাসপার্তুকে কতগুলো দরকারি জিনিশপত্র কিনতে দিয়ে সময়মতো রেলস্টেশনে হাজির হ'তে বললেন, তারপর সোজা গেলেন কন্সাল আপিশে। বম্বাইয়ের দ্রষ্টব্য স্থানগুলোর প্রতি ফগের কিছুমাত্র আকর্ষণ ছিলো না। তাই কন্সাল আপিশ থেকে বেরিয়ে সোজা স্টেশনেই চ'লে এলেন তিনি, আর সেখানেই রেলের হোটেলে আহার সমাধা করলেন।

ফিক্স একটু বাদেই জাহাজ থেকে নেমে পুলিশ-আপিশে গেলেন। সেখানে নিজের পরিচয় দিয়ে দস্যুর পশ্চাদ্ধাবনের কাহিনী বর্ণনা ক'রে শুধোলেন : 'লণ্ডন থেকে কোনো ওয়ারেন্ট এসেছে কি?' উত্তরে শুনলেন, 'না, আসেনি।' ওয়ারেন্টটির লণ্ডন থেকে বম্বাইয়ে পৌঁছুবার উপযুক্ত সময় তখনও হয়নি। ফিক্স বড্ড হতাশ হ'য়ে পড়লেন। তবু পুলিশ কমিশনারের কাছে একটা ওয়ারেন্ট প্রার্থনা করলেন। পুলিশ কমিশনার জানালেন: 'আমার দেয়ার কোনো এক্তিয়ার নেই।'

নিরুপায় হ'য়ে বিলেতের ওয়ারেন্টের অপেক্ষাতেই রইলেন ফিক্স। দস্যু যাতে পালিয়ে যেতে না-পারে, সেজন্যে রাখলেন কড়া নজর। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিলো, ফগ অন্তত দু-চারদিন বম্বাই থাকবেনই। তদ্দিনে নিশ্চয়ই ওয়ারেন্ট এসে উপস্থিত হবে।

পাসপার্তুরও ধারণা ছিলো যে তারা কিছুকাল বম্বাই থাকবে। কিন্তু তার দিবাস্বপ্ন ভেঙে যেতে দেরি হয়নি। সে দেখলো, অন্তত কলকাতা পর্যন্ত যেতেই হচ্ছে—কে বলতে পারে আরো দূর পথ যেতে হবে কি-না। তার ধীরে-ধীরে বিশ্বাস হ'তে লাগলো, তবে বুঝি বাজির কথা মিথ্যে নয়। সে তার কপাল চাপড়ে পোড়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগলো।

ফগের কথামতো জিনিশপত্র কিনে পাসপার্তু রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। যত ঘোরাঘুরি করতে লাগলো, ততই তার কৌতূহল বেড়ে চললো। বম্বাইয়ের জাঁকজমক তার চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

রেল-স্টেশনের পথে আসতে-আসতে সে দেখতে পেলে অনতিদূরে মালাবার গিরি-শৃঙ্গে একটা মন্দির দেখা যাচ্ছে। এমন চকমেলানো সুন্দর মন্দিরটা একবার দেখে যাওয়া দরকার ভেবে সে মন্দিরের দিকে এগুলো।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরাশি পাসপার্তু জানতো না যে হিন্দুর মন্দিরে, এমনকী মন্দির-প্রাঙ্গণে পর্যন্ত খ্রিষ্টানরা ঢুকতে পারে না। যারা প্রবেশ করতে পারে, তাদেরও মন্দিরের বাইরে জুতো রেখে প্রবেশ করতে হয়। এই নিয়ম অবহেলা করলে ইংরেজ-আদালতে নিয়মভঙ্গকারীর কঠোর শাস্তি অনিবার্য।

অনভিজ্ঞ পাসপার্তু যখন নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে জুতো প'রে মন্দিরপ্রাঙ্গণে ঢুকে সোল্লাসে মনে-মনে মন্দিরের কারুকার্যের প্রশংসা করছিলো, তখন কে যেন এসে চক্ষের পলকে একধাক্কায় তাকে মাটিতে পেড়ে ফেললে। সে তাকিয়ে দেখলে, তিনজন ক্রুদ্ধ হিন্দু তার কাছে দাঁড়িয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় তীব্রকণ্ঠে তিরস্কার করছে। না, তিরস্কার বা ভর্ৎসনা নয় —বিশুদ্ধ গালাগালিই সে-সব। আর গালাগাল বুঝতে বোধহয় ভাষাও জানতেও হয় না। একজন জোর ক'রে তার জুতো খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো ; আর অন্য-দুজন তাকে আক্রমণ ক'রে সাংঘাতিকভাবে প্রহার করতে লাগলো।

পাসপার্তু নিজেকে সামলে নিয়ে চক্ষের পলকে উঠে দাঁড়ালে। তারপর দু-চারটে ঘুসি মেরে বিপক্ষদলকে একটু হতচকিত ক'রে দিয়ে তীরবেগে পলায়ন করলে। অমনি চারদিকে ধর-ধর রব উঠলো ! কিন্তু পাসপার্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজপথের জনারণ্যে মিশে গেলো, আর কেউ তার সন্ধান পেলো না।

ট্রেন ছাড়বার পাঁচ মিনিট আগে পাসপার্তু হাঁপাতে-হাঁপাতে স্টেশনে এসে হাজির হ'লো। জামা-কাপড় ছিড়ে ফালা-ফালা, মাথায় নেই টুপি, পায়ে নেই জুতো, খালি-পা ক্ষতবিক্ষত। ফগের জন্য যে-সব জিনিশ কেনাকাটা করেছিলো গোলমালের সময় সেগুলো যে কোথায় পড়েছে কে জানে। ফিক্স তখন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ফিলিয়াস ফগের কাছেই অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পাসপার্তুর দুরবস্থা দেখে তাঁর তো চোখ কপালে উঠলো। পাসপার্তু তার দুর্দশার কাহিনী সংক্ষেপে ফগকে খুলে বললে। ফগ শান্তভাবে গাড়িতে উঠতে-উঠতে বললেন : 'আশা করি এমন কাজ আর-কখনও করবে না।' খালি-মাথা খালি-পা হতবুদ্ধি পাসপার্তু কী বলবে বুঝতে না-পেরে ফ্যালফ্যাল ক'রে প্রভুর দিকে তাকিয়ে কোনো দ্বিরুক্তি না-ক'রে গাড়িতে উঠে বসলো।

ফিক্স ও দস্যুর পশ্চাদ্ধাবন করবার জন্যে সেই ট্রেনেই যাবেন ব'লে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু পাসপার্তুর কাহিনী শুনে মনে-মনে ভাবলেন, দেখা যাক, কী হয়। ঠিক সেইমুহূর্তে হুইসল দিয়ে বম্বাই মেল কলকাতা যাত্রা করলো।

যে-গাড়িতে ফিলিয়াস ফগ পাসপার্তুকে নিয়ে উঠেছিলেন, সেই গাড়িতেই জেনারেল সার ফ্রান্সিস কোমার্ট ছিলেন। *মংগোলিয়া* জাহাজে এঁরই সঙ্গে হুইস্ট খেলতেন ফগ। সার ফ্রান্সিসের জীবনের বেশির ভাগই কেটেছিলো ভারতবর্ষে। ইতিপূর্বেই ফগের বাতিকগুলো লক্ষ করেছিলেন ভদ্রলোক। তাঁর রকম-সকম দেখে অনেক সময় সার ফ্রান্সিসের সন্দেহ হ'তো, বুঝি এই রক্তমাংসের শরীরের মধ্যে কোনো প্রাণ নেই—যে-



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন প্রকৃতির অফুরন্ত লীলা-সুন্দর রূপ দেখবার জন্যে ব্যাকুল থাকে, সেইরকম কোনো মন বোধহয় নেই ফিলিয়াসের শরীরে। জীবনে অনেক লোক দেখেছেন সার ফ্রান্সিস, কিন্তু ফগের মতো লোক আর-কখনও দ্যাখেননি।

ট্রেন যেমন চলছিলো, তেমনি চললো। দেখতে-দেখতে পেরিয়ে গেলো পশ্চিমঘাট গিরিমালার সুড়ঙ্গ-পথ।

কথা-প্রসঙ্গে সার ফ্রান্সিস বললেন : 'আর-কিছুদিন আগে হ'লে আপনাকে কিন্তু বিফল-মনোরথ হ'তে হ'তো মিস্টার ফগ, আশিদিনে সারা দুনিয়া ঘুরে আসা সম্ভব হ'তো না। কারণ, তখন পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্তই চলতো রেল—তারপর আর লাইন ছিলো না। তখন সেখান থেকে পাল্কিতে কিংবা ঘোড়ায় ক'রে যেতে হ'তো।'

'ও-সব সামান্য বাধায় আমার অসুবিধে হ'তো না। পথ চলতে গেলে মাঝে-মধ্যে বাধাবিঘ্ন এসে হাজির হবে, সেটা তো জেনেশুনেই বেরিয়েছি।'

'আজকেই তো আপনার সব মাটি হ'তে বসেছিলো।' কম্বল মুড়ি দিয়ে পাসপার্তু কুঁকড়েমুকড়ে ঘুম যাচ্ছিলো, তাকে দেখিয়ে সার ফ্রান্সিস বললেন, 'আপনার ঐ ভৃত্য পাসপার্তু আজ যে-কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছিলো, ব্রিটিশ ভারতে সেই অপরাধ কিন্তু খুবই গুরুতর ব'লে গণ্য হয়। এ-দেশের লোকের ধর্মবিশ্বাসে যাতে কোনো আঘাত না-লাগে, ইংরেজ সরকার সে-বিষয়ে খুব হুঁশিয়ার ও তৎপর। আজ যদি ও ধরা পড়তো—'

'তাহ'লে কী আর হ'তো? এ-দেশের আইন অনুসারে তার শাস্তি হ'তো। দু-দিন পরেই সে আবার ইওরোপে ফিরে যেতো। ওর জন্য কি আর আমি এখানে ব'সে থাকতুম? ককখনো না। ওকে ফেলে রেখে একাই চ'লে যেতুম আমি।'

রাত বেড়ে চললো ক্রমশ। সকলে ঘুমিয়ে পড়লেন। ট্রেন যেমন তীরবেগে ছুটছিলো, তেমনি চললো।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙলো পাসপার্তুর। ট্রেন আগের মতোই দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। পাসপার্তু গভীর মনোযোগ দিয়ে চারদিকে দেখতে লাগলো। মল্লিনাথ, ইলোরা, ঔরঙ্গবাদ ছাড়িয়ে বেলা প্রায় সাড়ে-বারোটার সময় বেহরামপুর স্টেশনে এসে ট্রেন থামলো। ঝুটো-মোতি-বসানো একজোড়া চপ্পল কিনে পাসপার্তু সগর্বে তার খালি-পা আবৃত করলো।

মালাবারের দুর্ঘটনার পর থেকেই পাসপার্তুর মতি ফিরেছিলো। বম্বাইয়ে আসবার আগে পর্যন্ত তার বিশ্বাস ছিলো, এই আজব ভ্রমণ বুঝি ভারতবর্ষে এসেই শেষ হবে। কিন্তু ভারতবর্ষের সুন্দর দৃশ্যাবলি তার মনের ঘুমিয়ে-থাকা ছটফটে চঞ্চল ধাতটাকে জাগিয়ে তুললো, যৌবনের উদ্দাম উন্মাদনা আবার তার মনে ফিরে এলো। এবার তার বিশ্বাস হ'লো যে ফিলিয়াস ফগের বাজি রাখার কাহিনী পুরোপুরি সত্যি। যে-ক'রেই হোক, আশিদিনের মধ্যে পৃথিবী ঘুরে আসতেই হবে। এবার ফিলিয়াস ফগের চেয়ে তার অস্থিরতা আর চিন্তাই যেন বেশি হ'য়ে উঠলো। ঠিক সময়মতো যাওয়া যাবে তো? পথে কোনো



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপদ-আপদ ঘটবে না তো? কোনো কারণে দেরি হ'য়ে যাবে না তো? বাজি জিততে পারলে কত গৌরব! বম্বাইয়ে তার বোকামির জন্যেই যে সব নষ্ট হ'তে বসেছিলো, সে-কথা মনে ক'রে এখন তার বিষম লজ্জা হ'লো, বুক দুরু-দুরু করতে লাগলো। কোনো স্টেশনে একটু বেশিক্ষণ ট্রেন দাঁড়ালেই বিরক্ত হ'য়ে উঠতে লাগলো সে। অবশেষে ট্রেনের ড্রাইভারের উদ্দেশে গালি পাড়তে শুরু করলো, আর মনে-মনে বলতে লাগলো: 'আমার মনিবও যেমন—ড্রাইভারকে কিছু বখশিশ দিলেই তো সে আরো-জোরে গাড়ি ছোটাতো। পুরস্কার পেয়েই তো *মংগোলিয়ার* ক্যাপ্টেন প্রবলবেগে জাহাজ চালিয়েছিলো!'

বাইশে অক্টোবর সকাল আটটার সময় রোহটাস থেকে পনেরো মাইল দূরে গাড়ি থেমে গেলো। গার্ডসাহেব চেঁচিয়ে বললে: 'নামো, নামো—গাড়ি থেকে নামো! এখানে গাড়ি বদল হবে।'

ফিলিয়াস ফগ এ-কথার মানে বুঝতে না-পেরে সবিস্ময়ে সার ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকালেন। পাসপার্তু মুহূর্তমধ্যে নেমে গিয়ে পড়িমরি ক'রে খবর নিয়ে ফিরে এলো, 'ট্রেন আর চলবে না, পথ নেই।'

সার ফ্রান্সিস বললেন: 'বলছো কী তুমি? ট্রেন আর চলবে না? এর মানে?'

'আমি বলছি যে, ট্রেন আর একইঞ্চিও এগুবে না।'

তার কথা শুনে ফিলিয়াস ফগ আর সার ফ্রান্সিস হন্তদন্ত হয়ে ট্রেন থেকে নামলেন। সামনে গার্ডকে দেখে সার ফ্রান্সিস শুধোলেন: 'আমরা কোথায় এসেছি?'

'খোলবি গাঁয়ে।'

'এখানে এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে-থাকার কারণ কী?'

'ওদিকে এখনও রেল-লাইন পাতা হয়নি।'

'পাতা হয়নি? তার মানে?'

'এখান থেকে এলাহাবাদ পঞ্চাশ মাইল। এ-পঞ্চাশ মাইল পথে এখনও লাইন বসানো হয়নি। এলাহাবাদ থেকে আবার ট্রেন পাওয়া যাবে।'

সার ফ্রান্সিস রেগে উঠেছিলেন। ব্রিটিশ রাজত্বে সাহেবসুবো কর্তাব্যক্তিদের রাগ একটু বেশিই হয়। 'লাইন হয়নি তো বরাবর কলকাতার টিকিট দেয়া হ'লো কেন? খবরের কাগজে যে লিখেছে লাইন বসানো হ'য়ে গেছে?'

'সে আমি কী করবো বলুন? সে হ'লো খবরের কাগজের দোষ। টিকিট তো সরাসরি কলকাতারই দেয়া হচ্ছে। এ তো সব্বাই জানে যে, যাত্রীরা নিজেদের ব্যবস্থামতো খোলবি থেকে এলাহাবাদ যায়।'

গার্ডের কথা শুনে সার ফ্রান্সিসের রক্তচাপ মাথায় উঠলো, রাগ সব সীমা ছাড়ালো। যদি পারতো, তাহ'লে পাসপার্তু তক্ষুনি গার্ডকেই উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দিয়ে বসতো।

ফিলিয়াস ফগ বললেন: 'চলুন, সার ফ্রান্সিস। যে-ক'রেই হোক এলাহাবাদ তো



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতেই হবে। দেখা যাক, কোনো উপায় হয় কি না।'

'এখন আর কী ব্যবস্থাই-বা করা যাবে? যা দেখছি, তাতে মনে হয় এখানেই আপনার বাজির দফা রফা।'

'ও কিছু না। ও-জন্যে ভাববেন না। পথেঘাটে দেরি যে কিছু হবে, সে আমি আগেই ভেবে দেখেছি।'

'সে-কী?' সবিস্ময়ে সার ফ্রান্সিস বললেন : 'লাইন যে তৈরি হয়নি, সেটা কি তবে আগেই জানা ছিলো আপনার?'

'না, তা ছিলো না। তবে আমার যাত্রাপথে যে অনেক অভাবিত বাধাবিপত্তি এসে দাঁড়াতে পারে, সে-সম্বন্ধে আমার মনে কখনও কোনো সন্দেহ ছিলো না।'

'কলকাতার ট্রেন ধরতে না-পারলে যে আপনার সর্বস্ব যাবে!'

'ট্রেন ধরতে পারবোই। ছাব্বিশে দুপুরের আগে কলকাতা থেকে হংকং-এর জাহাজ ছাড়বে না। আজ তো কেবল বাইশে। এখনও ঢের সময় আছে।'

এমন চাঞ্চল্যবিহীন নিশ্চিন্ত উত্তরের আর-কোনো জবাব দেয়া যায় না। অন্যান্য যাত্রীদের অনেকেই এ-কথা জানতো যে, খোলবিতেই গাড়ি-বদল করতে হয়। প্রত্যেকেই নিজের-নিজের বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছিলো। কারু জন্যে ঘোড়া, কারু জন্যে বা গোরুর গাড়ি অপেক্ষা করছিলো। যাত্রীরা নিজের-নিজের যানবাহন নিয়ে প্রস্থান করলো। ফিলিয়াস ফগ আর সার ফ্রান্সিস কোনোরকম যানবাহনই পেলেন না।

ফগ তখন বললেন : 'যখন কোনো যানের সুবিধে নেই, তখন আর উপায় কী? আমি হেঁটেই যাবো! পায়দলে।'

এই কথা শুনে পাসপার্তু তার মোতিবসানো চপ্পলজোড়ার দিকে তাকালে একবার।

অল্পক্ষণ পরে পাসপার্তু এসে খবর দিলে : 'আমাদের যাবার একটা হিললে হয়েছে। একটা হাতি আছে এখানে।'

'চলো, দেখে আসা যাক।'

স্টেশনের কাছেই সেই হাতির মালিক থাকতো। পাসপার্তু ফিলিয়াস ফগ আর সার ফ্রান্সিসকে নিয়ে সেখানে গেলো। নধরকান্তি মাতঙ্গপ্রবরের দিকে তাকিয়ে ফগ বুঝলেন, হাতিটি তাঁদের এলাহাবাদ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে। মালিককে জিগেস করলেন : 'তোমার হাতির নাম কী?'

'*কিউনি*।'

'তোমার ঐ কিউনি চলে কেমন?'

'বেশ দ্রুতই চলে।'

'ভাড়া যাবে?'

'আমার হাতি *গরম* হয়েছে। এ-হাতি এখন আমি কাউকেই ভাড়া দেবো না।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিলিয়াস ফগ নাছোড়বান্দা। বললেন : 'আমি ঘণ্টায় দেড়শো টাকা ভাড়া দেবো।'

'না, আমি ভাড়া চাই না।'

মুহূর্তমধ্যে ঘণ্টায় চারশো টাকা ভাড়া উঠলো, কিন্তু মালিক নির্বিকার, বললে : 'না, সাহেব। আপনারা অন্যত্র চেষ্টা করুন।'

পাসপার্তুর মুখ থেকে সব রক্ত যেন মুহূর্তে মিলিয়ে গেলো। সার ফ্রান্সিস বুঝলেন, ফিলিয়াস ফগের বিশ্বভ্রমণ এইখানেই খতম হ'লো!

ফিলিয়াস ফগ কিন্তু তখনও অবিচলিত। বললেন : 'ভাড়া না-দাও, বিক্রি করো। আমি পনেরো হাজার টাকা দেবো।'

মালিক মাথা নাড়তে-নাড়তে ভাবলে, এ সাহেবটা পাগল নাকি?

ব্যাপার দেখে সার ফ্রান্সিস ফগকে আড়াল ডেকে নিয়ে দাম বাড়াতে নিষেধ করলেন। 'অনেক দাম হয়েছে। এর চেয়ে ঢের-কম দামে এ-দেশে হাতি পাওয়া যায়।'

ধীরকণ্ঠে ফগ জবাব দিলেন : 'উত্তেজিত হ'য়ে ঝোঁকের মাথায় আমি কখনও কিছু করি না। ঠিক সময়ে এলাহাবাদ তো যেতেই হবে, তার উপরেই তিন লাখ টাকার বাজি নির্ভর করছে। যে-ক'রেই হোক, হাতিটা চাই-ই চাই।' পরক্ষণেই মালিকের কাছে এসে বললেন : 'পনেরো হাজারে হবে না? আচ্ছা, আঠারো হাজার? বিশ হাজার? পঁচিশ হাজার? তাও না! আচ্ছা, তিরিশ হাজারই সই। তিরিশ হাজার দেবো।'

*তিরিশ হাজার*! পাসপার্তুর পাংশু মুখ আরো-পাণ্ডুর হ'য়ে গেলো। সার ফ্রান্সিস হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলেন। হাতির মালিক দেখলো, আর বেশি আশা করা ভালো নয়— কী জানি, যদি এই পাগলা সাহেবের মন ঘুরে যায়! সে হাতিটা ঐ তিরিশ হাজারে বিক্রি করতেই রাজি হ'লো।

তক্ষুনি একজন মাহুত জোগাড় ক'রে ফিলিয়াস ফগ পাসপার্তু আর সার ফ্রান্সিসকে সঙ্গে নিয়ে এলাহাবাদের দিকে যাত্রা করলেন।

পার্শি মাহুতটির অবশ্য পথ-ঘাট ভালোই জানা ছিলো। বিশ মাইল পথ সংক্ষেপ করবার জন্যে সে বনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'লো।

ফিলিয়াস ফগ আর সার ফ্রান্সিস দুজনে দুটি ছোটো হাওদায় বসলেন। পাসপার্তু দুই হাওদার মাঝখানে আশ্রয় নিলে। ঘণ্টা-দুই চলবার পর যখন সকলে জিরিয়ে নেবার জন্যে হাতির পিঠ থেকে নামলেন, তখন সকলেই খুব শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছেন—হাওদায় ব'সে গজেন্দ্রগমনের দুলকিচালে দুলতে-দুলতে সকলেরই সারা শরীর ব্যথায় জর্জর হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু ফগের সেদিকে খেয়ালও ছিলো না। সার ফ্রান্সিস অবাক হ'য়ে বললেন : 'মিস্টার ফগ যেন লোহায় গড়া!' সেইসঙ্গে পাসপার্তু অমনি এ-কথাও যোগ ক'রে দিলে :



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কাঁচা লোহায় নয়, পাকা লোহায়।'

সামান্য-কিছু আহার ক'রে মাহুতের নির্দেশমতো সকলেই আবার হাতির পিঠে উঠলেন। মাহুতের ইঙ্গিতে বিশালদেহী কিউনি হেলে-দুলে বনভূমি পেরিয়ে তাল-খেজুরের বনের পাশ দিয়ে চলতে লাগলো। জায়গাটার নাম বুন্দেলখণ্ড। দেশীয় রাজাই ছিলেন বুন্দেলখণ্ডের সর্বময় কর্তা। একদল গোঁড়া ধর্মান্ধ উন্মত্ত হিন্দু বাস করতো সেখানে। আরোহীসমেত দ্রুতগামী হাতি দেখে কোথাও-কোথাও কতগুলো লোক কুটিল ক্রোধে এমন হাবভাব দেখালে যে বোঝা গেলো সুযোগ পেলেই তারা কোনো বিপদ ঘটাতে দ্বিধা করবে না। বলা বাহুল্য, এরাই বুন্দেলখণ্ডের সুবিখ্যাত দস্যুদল।

পাসপার্তু তখন ভাবছিলো : 'এলাহাবাদে পৌঁছে মিস্টার ফগ হাতিটার কী ব্যবস্থা করবেন? কিউনি কি তাঁর সঙ্গেই যাবে? উঁহু, সে-তো সম্ভব নয়। ঢের খরচ পড়বে তবে। বোধহয় বিক্রি ক'রে দেবেন হাতিটা। কিন্তু কিনবে কে হঠাৎ? কিউনির যে-রকম পরিশ্রম হচ্ছে, তাতে মনে হয় ছেড়েই দেবেন একে। আর যদি আমাকেই বখশিশ ক'রে বসেন তাহ'লেই হবে সবচেয়ে মুশকিলের ব্যাপার!'

তখন প্রায় সন্ধে হ'য়ে এসেছে। বিন্ধ্যপর্বতের কতগুলো দুরারোহ উৎরাই পেরিয়ে হাতি একটা ভাঙাচোরা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। ফিলিয়াস ফগ হিশেব ক'রে দেখলেন, এতক্ষণে মাত্র অর্ধেক পথ এসেছেন। রাত তখন অন্ধকার-ছাওয়া। একটু ঠাণ্ডাও পড়েছিলো। পার্শি মাহুত যে-আগুনের কুণ্ড জ্বাললো, তারই চারদিকে ব'সে সবাই খাওয়া-দাওয়া শেষ করলেন।

পাসপার্তু ছাড়া সকলেরই বেশ ভালো ঘুম হয়েছিলো। সারাদিন হাতির পিঠে দুলে-দুলে পথ চলতে হয়েছিলো ব'লে সে রাত্রেও ঘুমের ঘোরে তা-ই করতে লাগলো—ভালো ক'রে ঘুমই এলো না তার। সার ফ্রান্সিসের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা ছিলো। তাই স্থানে-অস্থানে ঘুমুনোর অভ্যেসও ছিলো। আর নির্বিকার-চিত্ত ফিলিয়াস ফগ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুলেন—যেন তাঁর সেভিল রো-র বাসার দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় শুয়েছেন।

সকাল ছ-টার সময় তাঁরা আবার হাতির পিঠে উঠে বসলেন। মাহুত জানালে যে, সন্ধের আগেই এলাহাবাদ পৌঁছুনো যাবে। সে লোকালয় ছেড়ে ছায়া-ঘেরা বনপথেরই আশ্রয় নিয়েছিলো। অনেকক্ষণ চলবার পর হঠাৎ হাতিটি থমকে দাঁড়ালো।

এ-কী! এখন মাত্র বিকেল চারটে—এখনই কিউনি থামলো কেন? সার ফ্রান্সিস মাহুতকে শুধোলেন : 'থামলে যে? কী হ'লো হঠাৎ?'

পার্শি মাহুতটি বললে : 'কী জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না। কী যেন একটা এদিকপানেই আসছে।'

সবাই কান পেতে শুনলেন, দূর থেকে একটা বাজনার শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ধীরে-ধীরে সে-শব্দ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হ'য়ে উঠলো। মাহুত কিউনিকে একটা গাছে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেঁধে রেখে কী ব্যাপার দেখবার জন্যে একটু এগিয়ে গেলো।

একটু বাদেই ফিরে এলো সে। দ্রুতকণ্ঠে বললে : 'বুন্দেলখণ্ডের ব্রাহ্মণদের একটা শোভাযাত্রা আসছে। চলুন, আমরা পালিয়ে যাই।'

হাতি নিয়ে বনের গভীরে ঢুকলো মাহুত।

ঢাক-ঢোলের আওয়াজ আর চ্যাঁচামেচি-ভরা একটা তুমুল কোলাহল ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগলো। দেখতে-দেখতে শোভাযাত্রা দৃষ্টিপথে এসে হাজির হ'লো। উষ্ণীষ আর আলখাল্লা-পরা পুরোহিতরা চলেছে শোভাযাত্রার আগে-আগে। নানা-বয়সি লোকজন সমবেতস্বরে এক করুণ শ্মশান-সংগীত গাইতে-গাইতে পুরোহিতদের ঘিরে চলেছে। ঢাক-ঢোলের আওয়াজের নিচে মাঝে-মাঝে সেই গানের শব্দ চাপা প'ড়ে যাচ্ছিলো।

এদের পিছনেই একটা রথ টেনে নিয়ে চলেছে কয়েকটা ঘোড়া। রথের উপর এক দেবীমূর্তি। ভয়ংকর তাঁর রূপ। মূর্তিটি দেখেই সার ফ্রান্সিস চিনতে পারলেন। বললেন, 'এই-ই হিন্দুদের করালবদনা ভয়ালভীষণা কালী-মূর্তি। তাদের প্রেম আর মুক্তির প্রতিভূ।'

পাসপার্তু ব'লে উঠলো : 'উঃ, কী ভীষণ রূপ এঁর ! এ-যে দেখছি মৃত্যুর প্রলয়ংকরী মূর্তি, প্রেমের স্নিগ্ধ আভার প্রতিমা মোটেই নয় !' আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিলো সে, কিন্তু মাহুতের ইঙ্গিতে তাকে চুপ ক'রে যেতে হ'লো।

কালী-মূর্তিটিকে ঘিরে জন-কতক পুরোহিত উন্মাদের মতো দাপাদাপি ক'রে নাচছিলো। এদের পরই দেখা গেলো দামি-পোশাক-পরা একদল ব্রাহ্মণকে। এরা এক ভদ্রমহিলাকে সবলে টেনে আনছিলো। ভদ্রমহিলা প্রতি-পদক্ষেপের সঙ্গে-সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিলেন।

ভদ্রমহিলা অপূর্ব সুন্দরী। গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌর। সারা গায়ে বহুমূল্য অলংকার। পরনে স্বর্ণ-খচিত মখমলের পোশাক, তার উপর মশলিনের একটা ওড়না। তার ভিতর দিয়ে তাঁর সুকুমার দেহ-লাবণ্য ও অতুলনীয় দেহগঠন ফুটে বেরুচ্ছিলো।

মহিলাটির চারধারে খোলা তলোয়ার হাতে বন্দুক কাঁধে একদল প্রহরী। এদের পিছনে একদল লোক একটি শবাধার ব'য়ে আনছিলো। শবটি একজন বৃদ্ধের। বহুমূল্য রাজপোশাকে ঢাকা। মুক্তো-খচিত উষ্ণীষ, সোনা আর রেশমের তৈরি দেহাবরণ, কটিবন্ধে কিংখাবের উপর হীরক বসানো। মৃতদেহের পাশে বহুমূল্য অস্ত্র-শস্ত্র প'ড়ে। সব পেছনে কতগুলো লোক উন্মাদের মতো বিকট চীৎকার করতে-করতে এগুচ্ছিলো। তাদের চীৎকারের নিচে গান-বাজনার আওয়াজ চাপা প'ড়ে গিয়েছিলো।

সার ফ্রান্সিস মাহুতের দিকে তাকিয়ে শুধোলেন : 'এই বুঝি সতী?'

মাহুত ঠোঁটে আঙুল দিয়ে সকলকে নীরব থাকতে ইঙ্গিত করলো।

শোভাযাত্রা কিছুক্ষণ বাদে অরণ্যের গভীরে অদৃশ্য হ'য়ে গেলে পর ফিলিয়াস ফগ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধোলেন : '*সতী* কী ?'

সার ফ্রান্সিস জবার দিলেন : 'এ একধরনের নরবলি ! তবে তফাৎ এই যে, যে নিহত হয়, সে স্বেচ্ছায় প্রাণ দেয়। এখুনি যে ভদ্রমহিলাকে দেখলেন, কাল ভোরে তাঁর দেহ আগুনে পুড়বে।'

পাসপার্তু উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো। 'কী সর্বনাশ ! এরা কি রাক্ষস নাকি ?'

ফিলিয়াস ফগ প্রশ্ন করলেন : 'ঐ মৃতদেহটি কার ?'

মাহুত বললে : 'ঐ ভদ্রমহিলার বৃদ্ধ স্বামীর। তিনি এ-অঞ্চলের একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন।'

'এখনও এই সর্বনেশে প্রথা চালু আছে ?'

'ভারতের বেশির ভাগ জায়গাতেই এ-প্রথা এখন আর চলতি নেই।' সার ফ্রান্সিস বললেন : 'তবে বুন্দেলখণ্ডে এখনও এই প্রথা প্রচলিত—স্বাধীন রাজ্য কি-না, তাই ইংরেজের আইন চালু হয়নি। এভাবে জীবন্ত পুড়ে মরতে রাজি না-হ'লে তার কপালে আজীবন যে কত দুঃখ আছে, তার ইয়ত্তা নেই। সমাজ তার মাথা মুড়িয়ে দেবে, একঘরে করবে, তার ছায়া পর্যন্ত মাড়াবে না। কিছুদিন আগে আমি যখন বম্বাই ছিলুম, তখন একবার একটি বিধবা তার স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাওয়ার জন্যে গবর্নরের অনুমতি চেয়েছিলো। গবর্নর সে-অনুমতি না-দেয়ায় বিধবাটি খুব ক্ষুব্ধ হ'য়ে বম্বাই ছেড়ে চ'লে গেলো অন্যখানে। সেখানে একজন রাজার সাহায্যে শেষে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরলো।'

মাহুত ঘাড় নেড়ে এ-কথা স্বীকার ক'রে বললে : 'কাল যে সতীদাহ হবে, তা কিন্তু স্বেচ্ছায় হবে না !'

'তুমি কী ক'রে জানলে ?' ফিলিয়াস ফগ শুধোলেন।

'বুন্দেলখণ্ডে এ-কথা কে না জানে ?'

'কিন্তু কই, ভদ্রমহিলাকে তো কোনো বাধা দিতে দেখলুম না ?'

'কী ক'রে বাধা দেবেন ? আফিং আর ধোঁয়ায় তাঁর কি আর এখন জ্ঞান আছে !'

'তাঁকে ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ?'

'পিল্লাজির মন্দিরে। এখান থেকে সে-মন্দির দু-মাইল দূরে। আজ রাত্রে সবাই সেখানে থাকবে। কাল খুব ভোরে *সতী* হবে।' এই ব'লে মাহুত যেই হাতিটা চালাতে যাবে, অমনি ফিলিয়াস ফগ বাধা দিলেন। 'রাখো, রাখো। সার ফ্রান্সিস, আমরা যদি ভদ্রমহিলাকে রক্ষা করি ?'

'রক্ষা করবেন ?' সার ফ্রান্সিস অবাক হলেন।

'এখনও আমার হাতে বারো ঘণ্টা সময় আছে।' ফিলিয়াস ফগ বললেন। 'ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবেগে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন সার ফ্রান্সিস। 'এতক্ষণে বুঝলুম, আপনার হৃদয় আছে! আর সে-হৃদয় সাড়া দেয় ঠিক মোক্ষম জায়গায়, একেবারে আসল ব্যাপারে!'

ফগ বললেন: 'হ্যাঁ, তা কখনো-কখনো সাড়া দেয় বৈকি।'

## পাঁচ

# দুঃসাহসের ডাকে

ব্যাপারটি যেমন গুরুতর, তেমনি দুঃসাহসিক। অসম্ভব বললেও চলে। অগ্রপশ্চাৎ না-ভেবে দুঃসাহসের ডাকে এভাবে সাড়া না-দিলেই ভালো করতেন ফগ। এ-কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লে কে জানে বিপক্ষের হাতে তাঁকে মরতে হবে কি-না! অন্তত চিরকালের জন্যে বন্দী হবেন কি না, তা-ই বা কে জানে? তাহ'লেই তো সব খতম হ'য়ে গেলো। যে-জন্যে এত পরিশ্রম ক'রে তিনি এতদূর এসেছেন, তা ব্যর্থ হবে। আশিদিনে সারা পৃথিবী ঘুরে আসবার জন্যে যে-বাজি ধরেছেন, তাহ'লে সেই বাজিতে হারতে হবে তাঁকে। কিন্তু তাঁর হৃদয় কোনো বাধাই মানলো না। তিনি দেখলেন, এ-কাজে সার ফ্রান্সিস একজন শক্তিশালী সহযোগী। পাসপার্তুও যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। ভাবনা একটাই, সেটি এই পার্শি মাহুতের জন্যে।

সে যদি সাহায্য না-করে, না-করলো—কিন্তু দেখতে হবে সে যাতে বিপক্ষের দলে না-যায়।

সার ফ্রান্সিস তাই সোজাসুজি মাহুতকে সে-কথা জিগেস করলেন। মাহুত জবাব দিলে, 'আমি পার্শি। আপনারা যাঁকে উদ্ধার করতে চাচ্ছেন, তিনিও পার্শি। আপনারা যা বলবেন, আমি তা-ই করবো।' সে আরো বললে: 'আপনারা মনে রাখবেন, আমাদের সামনে মস্ত-একটা বিপদ পাহাড়ের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। এ-কাজে শুধু-যে আমাদের জীবনের আশঙ্কা আছে, তা-ই নয়—যদি আমরা ধরা পড়ি, তবে মৃত্যুর আগে যন্ত্রণারও কমতি হবে না।'

ফিলিয়াস ফগ জবাব দিলেন: 'সে-সব বিপদ ঘাড়ে নিতে আমরা তৈরি আছি। সন্ধে অব্দি অপেক্ষা করা যাক, রাতের অন্ধকারে কাজ শুরু করা যাবে। ভদ্রমহিলাটি কে, তুমি জানো?'

মাহুত বললে, 'ভদ্রমহিলার নাম আউদা। বম্বাইয়ের একজন ধনী বণিকের মেয়ে। তিনি উচ্চশিক্ষিতা। দীর্ঘকাল বিদেশে কাটিয়েছেন। মা-বাবা কেউ নেই। নিজের ইচ্ছার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরুদ্ধেই বুড়ো রাজার সঙ্গে আজ তিন মাস হ'লো তাঁর বিয়ে হয়েছে। ভয়ানক দুরদৃষ্টের কথা ভেবে তিনি পালিয়ে যাবারও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি। রাজার কয়েকজন নিকটআত্মীয় আছেন। তাঁরা রাজসম্পত্তির ভোগদখল চান। আউদা বেঁচে থাকলে তাঁদের সুবিধে হবে না ব'লে তাঁরা জোর ক'রে তাঁকে পুড়িয়ে মারছেন।'

মাহুতের কথা শুনে ফিলিয়াস ফগের সংকল্প আরো-দৃঢ় হ'লো। মাহুতকে বললেন : 'কোনো সাড়াশব্দ না-ক'রে পিল্লাজির মন্দিরের যত কাছে পারো, তত কাছে নিয়ে চলো।'

কিউনি আধঘণ্টার মধ্যেই তাঁদের নিয়ে মন্দিরের প্রায় আধমাইল দূরে এসে দাঁড়ালে। গাছপালার আড়াল থেকে তখন সেই তুমুল শোরগোল শোনা যেতে লাগলো।

মাহুত বললে : 'রানী আউদা নিশ্চয়ই এখন মন্দিরের মধ্যে বন্দিনী।'

সকলেই ভাবতে লাগলেন, কী ক'রে তাঁকে উদ্ধার করা যায়। রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে, তখন কি মন্দিরে প্রবেশ করা ঠিক হবে, না দেয়াল ভেঙে সেই ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকলে সুবিধে হবে? মন্দিরের কাছে গিয়ে সরেজমিন তদন্ত ক'রে না-দেখলে এ-প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে না।

তাঁরা উদগ্রীব হ'য়ে রাত্রির প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সন্ধে ছ-টার সময় বন অন্ধকারে ঢাকা প'ড়ে গেলো। প্রহরীদের অতিক্রম ক'রে মন্দিরের কাছে যাওয়ার সেটাই একমাত্র সুসময় দেখে মাহুত তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। তাঁরা ধীরে-ধীরে খুব সাবধানে বনপথে হামাগুড়ি দিয়ে এগুলেন। একটু যাওয়ার পরই ছোট্ট-একটা ঝর্নার কাছে এসে পৌঁছুলেন তাঁরা। মশালের আলোয় দেখলেন, রাশি-রাশি চন্দনকাঠ দিয়ে একটা মস্ত চিতা তৈরি হয়েছে। সেই চিতায় শোয়ানো হয়েছে বুড়ো রাজার মৃতদেহ। রানী আউদার সঙ্গে পরদিন ভোরবেলাতেই তা ভস্মসাৎ হবে। চিতা থেকে মন্দিরটি একশো হাতেরও বেশি-দূর হবে না। মন্দিরের গম্বুজটা সন্ধের অন্ধকারে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছিলো।

মাহুতের ইঙ্গিত-মতো বড়ো-বড়ো ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে-লুকিয়ে তাঁরা আরো-সাবধানে রুদ্ধনিশ্বাসে নিঃশব্দে এগুতে লাগলেন।

খোলা মাঠের কাছে এসে মাহুত থামলো। সিদ্ধি খেয়ে বিভোর হ'য়ে প্রহরীরা সেখানে শুয়ে ছিলো। দু-একজন তখনও টলতে-টলতে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। কাছেই গোটা-কয়েক মশাল জ্বলছিলো কম্পিত শিখায়। মশালের ছায়া-আলোয় তাঁরা অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখলেন, সবলদেহ রাজপুত প্রহরীরা খোলা তলোয়ার হাতে মন্দিরের সামনে পায়চারি ক'রে পাহারা দিচ্ছে।

মাহুত আর এগুলো না। বুঝলো, বিনা বাধায় এ-পথে এগুনো অসম্ভব! সার ফ্রান্সিস আর ফগেরও সেই একই ধারণা হ'লো। তাঁরা মৃদুস্বরে পরামর্শ করতে লাগলেন। সার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্রান্সিস বললেন : 'আরো-খানিকক্ষণ অপেক্ষা করা যাক। এই-তো সবে আটটা বাজলো। বেশি রাতে প্রহরীরা নেশাভাঙ ক'রে ঘুমিয়ে পড়তে পারে।'

তাঁরা তখন একটা গাছের নিচে শুয়ে উত্তেজিতভাবে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন। সময় যেন আর কাটতেই চায় না। মাহুত মধ্যে-মধ্যে এদিক-ওদিক গিয়ে খবর নিতে লাগলো। দেখলো, প্রহরীরা আগের মতোই পাহারা দিচ্ছে। মশালও আগের মতোই জ্বলছে। মন্দিরের ভিতর থেকেও তখন জানলা দিয়ে কম্পিত আলোকরেখা দেখা যাচ্ছিলো।

রাত গভীর হ'লো, কিন্তু অবস্থার আদপেই কোনো বদল হ'লো না। তখনও অতন্দ্রচোখে পাহারা দিচ্ছিলো প্রহরীরা। মনে হ'লো, তারা যেন সারারাতই এ-ভাবে জেগে কাটিয়ে দেবে। এ-পথ ছেড়ে মন্দিরের দেয়াল ভেঙে ভিতরে ঢোকবার চেষ্টাই তখন যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে হ'লো। তাই মাহুত ফের সন্তর্পণে সব দেখে আসতে অগ্রসর হ'লো। ফগ, পাসপার্তু আর সার ফ্রান্সিস মাহুতকে অনুসরণ করলেন।

অন্ধকার এমনই গাঢ় গভীর-ঘন যে কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না। দূরের মশালগুলো যেন চারপাশের অন্ধকারকে আরো-গাঢ় ক'রে তুলেছিলো। তাঁরা ভাবলেন, আর-কিছু চাই না, কোনোরকমে একবার মন্দিরের দেয়ালের সন্ধান পেলেই হ'লো। প্রবেশের পথ থাকলো তো ভালোই—না-থাকলে পথ বের ক'রে নিতে হবে।

একটু বাদেই মন্দিরের ইটের দেয়াল গায়ে ঠেকলো। সেদিকে কোনো দরজা বা জানলা ছিলো না। ফগ আর সার ফ্রান্সিস অন্য-কোনো সরঞ্জাম না-থাকায় পকেট-ছুরির সাহায্যে ইট খুলতে লাগলেন। মাহুত আর পাসপার্তু সেই আলগা ইটগুলো ধীরে-ধীরে খুলে নিতে লাগলো।

খান-কয়েক ইট খোলবার সঙ্গে-সঙ্গেই মন্দিরের ভিতর হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো ! সঙ্গে-সঙ্গে বাইরে কোলাহল উঠলো। পাসপার্তু আর মাহুত থামলো। সেখানে আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না মনে ক'রে সার ফ্রান্সিস সকলকে নিয়ে চট ক'রে দূরে স'রে গেলেন। ভাবলেন, পরে সুযোগ পেলে আবার আসবেন। কিন্তু সে-সুযোগ আর হ'লো না। খোলা তলোয়ার হাতে প্রহরীরা তক্ষুনি মন্দিরটি ঘিরে দাঁড়ালে।

রাগে সার ফ্রান্সিস ফুলতে লাগলেন। পাসপার্তু খুব উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো। অনেক চেষ্টায় আত্মসংবরণ করলো মাহুত। শুধু ফিলিয়াস ফগ তখনও অবিচলিত ও অকম্পিত রইলেন।

সার ফ্রান্সিস বললেন : 'আর কেন ? চলুন, এবার ফিরে যাওয়া যাক।'

ধীরকণ্ঠে ফগ জবাব দিলেন : 'অত তাড়া কীসের ? আমি যদি কাল দুপুরবেলা এলাহাবাদ পৌঁছুতে পারি, তাহ'লেই হবে। দেখাই যাক না শেষপর্যন্ত। শেষমুহূর্তেও তো আমাদের কোনো-একটা সুযোগ ঘটতে পারে।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সার ফ্রান্সিস ফিলিয়াস ফগের এই অবিচলিত ধৈর্য দেখে বিস্মিত হলেন। ভাবলেন, শেষমুহূর্তে তাঁর আর কী-সুযোগ ঘটবে? ইনি কি তবে জ্বলন্ত চিতায় লাফিয়ে প'ড়ে রানী আউদাকে উদ্ধার করবেন? এ-বকম উন্মাদ প্রয়াস যে বিফল ও বিপজ্জনক হবে, সে তো সকলেই জানে। ফিলিয়াস ফগের মতো ধীর-স্থির-স্থিতধী ইংরেজ যে অবোধের মতো এমন-একটা কাজ করবেন, এ-কথা সার ফ্রান্সিসের মোটেই বিশ্বাস হ'লো না। তবু এই ভয়ানক দৃশ্যের যবনিকাপাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি হলেন তিনি। মাহুত আবার পথ দেখিয়ে তাঁদের বনের বাইরে মাঠের কিনারে নিয়ে গেলো। তাঁরা সেখানেই লুকিয়ে থেকে, দূর থেকে, সেই নৃশংস হত্যার আয়োজন দেখতে লাগলেন। *সতী* মানেই জীবন্ত নারীদেহে অগ্নি-সংযোগ।

পাসপার্তু মনে-মনে একটা মৎলব ক'রে নিয়েছিলো। সকলের অলক্ষ্যে সে কোথায় চ'লে গেছে, কেউ তা জানতেও পারলেন না। অন্ধকারে পাসপার্তু গাছের তলা দিয়ে খুবই সাবধানে সেই চিতা-শয্যার দিকে এগুতে লাগলো। সে-যে কোথায় যাচ্ছে, তা শুধু সেই জানে!

আস্তে-আস্তে ভোর হ'য়ে এলো। প্রসন্ন প্রভাতের সোনালি আলো আকাশের কোলে মৃদু হাসির মতো ফুটে উঠলো; কিন্তু মন্দিরের চারদিকে তখনও ঘন অন্ধকার ছেয়ে আছে। এই আলো-অন্ধকারের সন্ধিক্ষণই *সতীদাহের* সময় ব'লে ঠিক করা হয়েছিলো। আস্তে-আস্তে সবাই ঘুম থেকে উঠলো। তাদের চ্যাঁচামেচিতে আর ঢাক-ঢোলের প্রচণ্ড আওয়াজে বন-প্রান্তর কেঁপে উঠলো। ক্রমশ *সতীদাহের* সময় এসে উপস্থিত হ'লো।

হঠাৎ দড়াম ক'রে খুলে গেলো মন্দিরের দরজা। খোলা দরজা দিয়ে মন্দিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো সুতীব্র আলোর ঝলক। দেখা গেলো, দুজন পুরোহিত দু-দিক থেকে ধ'রে সেই মৃত্যুপথযাত্রিণীকে মন্দিরের বাইরে টেনে আনলে। বার-কয় পলায়নের চেষ্টা ক'রে আফিঙের ধোঁয়ায় আবার নেতিয়ে পড়েছিলেন ভদ্রমহিলা। পুরোহিতেরা রানী আউদাকে নিয়ে চিতার দিকে এগুলো। প্রভাতের অর্ধস্ফুট আলোয় সেই ভয়ানক গায়ে-কাঁটা-দেয়া দৃশ্য অপলক চোখে দেখতে লাগলেন ফিলিয়াস ফগ।

চিতার উপর বুড়ো রাজার মৃতদেহ প'ড়ে। রনী আউদাকে তাঁর মৃত স্বামীর পাশে শুইয়ে রাখা হ'লো। স্তূপীকৃত চন্দন কাঠে আগুন লাগিয়ে দেয়া হ'লো—অমনি ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় ভ'রে উঠলো চারদিক। তুমুল শব্দে বেজে উঠলো বাজনা—ঢাকঢোল জগঝম্প।

ছুরি হাতে ফগ সেই অগ্নিকুণ্ডের দিকে এগুবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সার ফ্রান্সিস আর মাহুত অনেক কষ্টে তাঁকে ধ'রে আটকালেন। ফিলিয়াস ফগ তাঁদের ধাক্কা দিয়ে ফের তাঁর পা বাড়াবেন, এমন সময় এক অভাব্য অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে হতচকিত হ'য়ে পড়লেন; স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, পাথরের মতো।

*সতীদাহ* করতে যারা এসেছিলো তারা ভীতস্বরে উঠলো চেঁচিয়ে। আশঙ্কায় উদ্বেগে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্ময়ে-বিস্ফারিত চোখে তারা তাকিয়ে দেখলো, বৃদ্ধ রাজা নবজীবন লাভ করেছেন! রানী আউদাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন রাজা। তারা ভয়ে তাদের পুনরুজ্জীবিত রাজার দিকে আর তাকাতে পারলে না, প্রণত হ'য়ে মাটিতে মাথা ছোঁয়ালে।

চক্ষের পলকে জ্বলন্ত চিতা ছেড়ে রাজার প্রেতাত্মা ফিলিয়াস ফগের কাছে এসে বললো : 'আর দেরি নয়; চলুন, চলুন শিগগির! জলদি!'

সবিস্ময়ে সবাই তাকিয়ে দেখলেন, অচৈতন্য আউদাকে কাঁধে নিয়ে পাসপার্তু দাঁড়িয়ে! ধোঁয়ায় যখন চারদিক ভ'রে গিয়েছিলো তখন সেই ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে স্তূপাকার কাঠের উপর উঠে সে রক্ষা করেছে মৃত্যুপথযাত্রিণীকে!

আর একমুহূর্তও সময় নষ্ট করলেন না তাঁরা। তক্ষুনি ছুটতে-ছুটতে প্রবেশ করলেন বনের গহনে। দ্রুতগামী কিউনি তাঁদের নিয়ে এলাহাবাদের দিকে ছুটলো।

নিস্তব্ধ অরণ্য খানিকক্ষণের মধ্যেই কোলাহলে কলরবে চঞ্চল ও চকিত হ'য়ে উঠলো। বন্দুকের আওয়াজে চারদিক কেঁপে উঠলো। হাতির পাশ দিয়ে শোঁ-শোঁ ক'রে গুলি ছুটে যেতে লাগলো। *সতীদাহ* করতে যারা এসেছিলো, তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে পাগলের মতো পিছু-পিছু ছুটে এলো বটে, কিন্তু বনের সেই গভীর-গহনে হাতি কিংবা তার সোয়ারদের আর নাগাল পেলে না।

এই দুঃসাহসিক প্রয়াস সফল হ'য়ে যাওয়ায় হাতির পিঠে ব'সে হাসছিলো পাসপার্তু। সার ফ্রান্সিস তো খুশি হ'য়ে তার সঙ্গে বার-কয় হ্যাণ্ডশেক ক'রে ফেললেন, আর ফিলিয়াস ফগ শুধু বললেন : 'বেশ করেছো।' তাঁর মতো গম্ভীর-মেজাজ লোকের কাছ থেকে এই ছোট্ট প্রশংসাটুকুই যথেষ্ট। পাসপার্তু তাঁর প্রশংসার জবাবে বললো : 'এ-কাজের যা-কিছু গৌরব, যা-কিছু প্রশংসা—সবই তো আপনার প্রাপ্য—আমি শুধু উপলক্ষ মাত্র।'

মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পেলেও আউদার জ্ঞান তখনও ফেরেনি। তাঁর দিকে তাকিয়ে সার ফ্রান্সিস বললেন : 'এঁর বিপদের এখানেই শেষ নয়। যদ্দিন ইনি ভারতবর্ষে থাকবেন, তদ্দিন এঁর জীবন নিরাপদ নয়। ভারতবর্ষের যেখানেই থাকুন না কেন, এঁর ক্রুদ্ধ শত্রুরা এঁর সন্ধান করবেই, আর সুযোগ পেলেই পুড়িয়ে মারতে ছাড়বে না। ইংরেজের আইন ইংরেজের পুলিশ কিছুতেই এঁকে রক্ষা করতে পারবে না। দিন-কয়েক আগেই এমনি-একটা ঘটনা ঘ'টে গেছে। ইনি যদি একবার ভারতবর্ষের বাইরে অন্যকোনো দেশে যেতে পারেন, তবেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারবেন।'

ফিলিয়াস ফগ বললেন : 'এ-কথার জবাব এত চটপট দেয়া যাবে না, ভেবে দেখতে হবে।'

বেলা দশটার সময় তাঁরা এলাহাবাদে এসে পৌঁছুলেন। আউদার তখন ক্রমশ জ্ঞান



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে আসছিলো—ধীরে-ধীরে তিনি চোখ খুললেন। তাঁকে ওয়েটিং-রুমে রেখে ফগ তাঁর জন্যে কতগুলো দরকারি জিনিশপত্র কিনতে পাসপার্তুকে বাজারে পাঠালেন।

এলাহাবাদ থেকে ট্রেন ছাড়বার সময় হ'লো। ফিলিয়াস ফগ সেই পার্শি মাহুতকে তার পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে বললেন : 'তুমি আমাদের জন্য যথেষ্ট করেছো। সেজন্যে হাতিটা দিতে চাই তোমায়। নেবে তো?'

মাহুতের চোখদুটো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

ট্রেনে উঠতে-উঠতে ফগ বললেন : 'হাতিটা নিয়ে যাও। কিন্তু এতেও আমি তোমার ঋণ শোধ করতে পারলুম না।'

ট্রেন ছেড়ে দিলে। আউদার তখন পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে এসেছে। সব শুনে তিনি কেঁদে ফেললেন। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালেন সবাইকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভবিষ্যতের চিন্তা তাঁকে ব্যাকুল ক'রে তুললো।

তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে ফগ বললেন : 'আপনার ভয় নেই। আমি হংকং যাচ্ছি। বাধা না-থাকলে আপনাকেও সেখানে নিয়ে যেতে পারি।'

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অভিভূত আউদা বললেন : 'হংকং-এ আমার এক ধনী আত্মীয় ব্যাবসা করতেন। বোধহয় এখনও তিনি সেখানেই আছেন।'

'তাহ'লে তো খুব ভালো হ'লো।' ফগ বললেন। 'আমরা তাহ'লে তাঁকে খুঁজে বার করবো।'

## ছয়

## বিপদ যখন ঘনিয়ে আসে অতর্কিতে

পঁচিশে অক্টোবর ভোরবেলা ফিলিয়াস ফগ কলকাতা পৌঁছুলেন। বেলা একটার সময় হংকং-এর জাহাজ ছাড়বে, সুতরাং তখনও ঘণ্টা-কয়েক সময় হাতে ছিলো। ডায়রি খুলে ফগ দেখলেন ছাব্বিশে অক্টোবর তাঁর কলকাতা পৌঁছুবার কথা। আজ তেইশ দিন হ'লো তিনি লণ্ডন ছেড়েছেন। জাহাজ তাড়াতাড়ি আসায় হাতে যে-দু-দিন সময় প্রায় ফাউ পাওয়া গিয়েছিলো, আউদাকে উদ্ধার করতে গিয়েই তা কেটে গেছে। সময়ের হিশেব ক'রে ফগ বুঝলেন যে, যে-ক'রেই হোক বেলা একটার জাহাজেই তাঁকে হংকং যাত্রা করতে হবে।

হাওড়া স্টেশনে ট্রেন থামতে-না-থামতেই পাসপার্তু গাড়ি থেকে নেমে পড়লো।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার ইচ্ছে ছিলো আগেভাগেই হংকং-এর জাহাজে গিয়ে সব বন্দোবস্ত ক'রে রাখবে।

এমন সময় ধরাচুড়ো পরা একজন ইংরেজ দারোগা এসে শুধোলে : 'আপনার নামই কি ফিলিয়াস ফগ ?'

ঘাড় নেড়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দারোগার দিকে তাকাতেই দারোগা ফগকে জিগেস করলেন : 'এই বুঝি আপনার ফরাশি ভৃত্য ?

'হ্যাঁ।'

'আপনারা কি অনুগ্রহ ক'রে আমার সঙ্গে একটু আসবেন ?'

ফিলিয়াস ফগ একটুও বিচলিত হলেন না। ইংরেজের চোখে আইন *অতি পবিত্র জিনিশ,* আর পুলিশ দেশের আইন-রক্ষক। কিন্তু পাসপার্তু তর্ক করতে উদ্যত হ'লো। ফিলিয়াস ফগ তাকে থামিয়ে দিয়ে শুধোলেন : 'এই ভদ্রমহিলা কি আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন ?'

'অনায়াসে।' জবাব দিলেন দারোগা।

তাঁরা তখন একটা ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসলেন। সাহেব-পাড়ার একটা বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামলো। দারোগা তাঁর বন্দীদের নিয়ে একটা ঘরে ঢুকলেন। সেখানে তাঁদের বসতে ব'লে জানালেন যে : 'ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াদিয়ার কাছে সাড়ে-এগারোটার সময় আপনাদের বিচার হবে।' এই ব'লে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দারোগা প্রস্থান করলেন।

আউদার চোখে জল এসে গেলো। 'আমার জন্যেই আপনাদের এই বিপদ। আমাকে রক্ষ করতে গিয়েই আপনারা বন্দী হলেন।'

ফিলিয়াস ফগ শান্তগলায় তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। 'ইংরেজ রাজত্বে *সতীদাহ* নিবারণ করলে কোনো অপরাধ হয় না। বোধহয় পুলিশ ভুল ক'রে কোনো-একজনকে ধরতে গিয়ে আমাদেরই ধরেছে। সে যা-ই হোক, নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি। যে-ক'রেই হোক আপনাকে হংকং-এ নিয়ে যাবোই।'

ফগের কথা শুনে পাসপার্তু বললে : 'জাহাজ যে বেলা একটার সময় ছাড়বে !'

'তার আগেই আমরা জাহাজে পৌঁছে যাবো।'

ফগের দৃঢ় কণ্ঠস্বর কিন্তু পাসপার্তুর আশঙ্কা দূর করতে পারলো না।

সাড়ে-এগারোটার সময় দারোগা এসে তাঁদের আদালতে বিচারস্থানে নিয়ে গেলেন। ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াদিয়া এসে চেয়ারে বসতেই আরদালি হাঁকলো : 'আসামী ফিলিয়াস ফগ হাজির ?'

'হাজির।'

'পাসপার্তু ?'

'হ্যাঁ, হাজির।'

ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট তখন বললেন : 'বাদীদের ডাকো।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে-সঙ্গে একজন আরদালি তিনজন পুরোহিতকে সামনে এনে হাজির করলে। এরা তিনজনেই বম্বাইয়ের লোক। পাসপার্তু বিড়বিড় ক'রে আপন মনে বললে : 'এ-যে দেখছি শেষে তা-ই! এরাই তো আউদাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলো!'

অপরাধের বিবরণ প'ড়ে শোনানো হ'লো আসামীদের। হিন্দুদের কাছে অতীব পবিত্র একটি মন্দিরকে অপবিত্র করবার জন্যে ফিলিয়াস ফগ ও তাঁর ভৃত্যের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়েছে।

ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট ফিলিয়াস ফগের দিকে তাকালেন। 'অভিযোগ সম্পর্কে আসামীর কী বলবার আছে?'

নিজের পকেট-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ফগ বললেন : 'হ্যাঁ, আমি অপরাধ স্বীকার করছি।'

'আপনি অপরাধ স্বীকার করছেন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু পিল্লাজির মন্দিরে পুরোহিতেরা যে-পৈশাচিক কাণ্ড করেছেন, সে-সম্পর্কে তাঁরা কী বলতে চান, কী কৈফিয়ৎ দিতে চান, সে-কথা জানবার জন্যেই ব্যগ্র হ'য়ে আছি।'

পুরোহিতেরা মুখ-চাওয়া-চাউয়ি করলে। ফিলিয়াস ফগ ঠিক কোন কথার উল্লেখ করছেন, তা তারা বুঝতে পারেনি।

পাসপার্তু বললে : 'হ্যাঁ, ঠিক তা-ই। পিল্লাজির মন্দিরের কথাই জানতে চাই। সেখানে এঁরা একজন নিরীহ নির্বিরোধী নির্দোষী মহিলাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা করছিলেন।'

কথা শুনে তো পুরোহিতেরা একেবারে থ! তারা এত হতভম্ব হ'য়ে পড়েছিলো যে গোড়ায় কোনো কথাই বলতে পারেনি। ওয়াদিয়া অবাক হ'য়ে শুধোলেন : 'তার মানে? কাকে পুড়িয়ে মারবার আয়োজন হয়েছিলো? সে কোথায়? বম্বাই-এ নাকি?'

পাসপার্তু বললে : 'হ্যাঁ, বম্বাই-এ।'

'আমরা পিল্লাজির মন্দিরের কথা বলছিনে, মালাবারের মন্দিরের কথা বলছি।' পেশকার জানালে। 'অপরাধের প্রমাণ হিশেবে, সেই মন্দির-অপবিত্রকারীর জুতো এখানে আনা হয়েছে।'

জুতো দেখেই পাসেপার্তু ব'লে উঠলো : 'এ-কী! ও-যে আমার জুতো।'

এখানে আগেকার কথা কিছু ব'লে নেয়া দরকার। বম্বাইয়ের রেলস্টেশনে ধুরন্ধর গোয়েন্দা ফিক্স যখন দেখেছিলেন ব্যাংক-দস্যু পালিয়ে যাচ্ছে, তখন মালাবারের পুরোহিতদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, তাদের প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে, মন্দির অপবিত্র করবার জন্যে মোকদ্দমা দায়ের করতে রাজি করিয়েছিলেন। পুরোহিতদের মধ্যে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ-কেউ পরের ট্রেনেই ফগকে অনুসরণ করেছিলো।

কলকাতায় এসে ফিক্স দেখলেন, ফগ তখনও কলকাতায় পৌঁছোননি। তখনই তিনি আন্দাজ করলেন, ব্যাংক-দস্যু পলিশকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে পথে কোথাও নেমেছে, দু-এক দিনের মধ্যেই নিশ্চয়ই চুপি-চুপি এসে পড়বে। ফিক্স হাওড়া স্টেশনেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। পঁচিশে অক্টোবর ভোরবেলা পাসপার্তু যখন ট্রেন থেকে নামলে, অমনি তাঁর ইঙ্গিতে কলকাতার দারোগা তাঁদের গ্রেপ্তার করলেন। পাসপার্তু যদি মুহূর্তের জন্যেও আদালতের চারদিকে তাকিয়ে দেখতো, তবে দেখতে পেতো, সেই ঘরের এককোণে ব'সে ফিক্স বিপুল আগ্রহে এই মামলার শুনানি লক্ষ করছেন। তখনও ব্যাংক-দস্যুকে গ্রেপ্তার করবার আশা ফিক্স ছাড়েননি। বিলেতের ওয়ারেন্ট কলকাতায় পাবার আশা তখনও তাঁর ছিলো।

ওয়াদিয়ার প্রশ্নের জবাবে অপরাধ স্বীকার করলে ম্যাজিস্ট্রেট রায় দিলেন : 'ইংরেজ গবর্মেন্ট ভারতবর্ষের সকল ধর্মই রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কেউ কোনো ধর্মের কোনো অবমাননা করলে তাকে কঠোর সাজা দিতে কসুর করেন না। পাসপার্তু গত বিশে অক্টোবর বম্বাইয়ের অন্তর্গত মালাবারের মন্দিরে প্রবেশ ক'রে মন্দির অপবিত্র করেছে। সে এই অপরাধ স্বীকারও করেছে। বিচার পনেরো দিনের জন্যে মুলতুবি রইলো। ততদিন হাজত।'

পাসপার্তু বিহ্বল হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠলো : 'পনেরোদিন হাজতবাস!'

আরদালি চীৎকার ক'রে বললে : 'চুপ, চুপ!'

ম্যাজিস্ট্রেট রায় পাঠ করতে লাগলেন : 'যদিও দেখা যাচ্ছে ফিলিয়াস ফগ মন্দির অপবিত্র করার কাজে জড়িয়ে ছিলেন না, তবু পাসপার্তুর পলায়নে সাহায্য করবার জন্যে তাঁর প্রতিও ঐ আদেশ জারি করা হ'লো।'

শুনে ফিক্স আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলেন। ফিলিয়াস ফগ তো দু-হপ্তার জন্যে কলকাতায় আটকা পড়লো, এর মধ্যেই নিশ্চয়ই বিলেত থেকে ওয়ারেন্ট এসে পৌঁছুবে। আর পাসপার্তুর তখন নিজের উপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিলো। তারই নির্বুদ্ধিতায় ফগের সর্বনাশ হ'তে চললো দেখে নিজের গালে ঠাশ-ঠাশ ক'রে চড় কষাবার ইচ্ছে হচ্ছিলো তার।

কিন্তু ফিলিয়াস ফগ তখনও অবিচলিত রইলেন, যেন কিছুই হয়নি। দৃঢ়স্বরে ম্যাজিস্ট্রেটকে জানালেন : 'আমি জামিন চাই।'

'এখানে আপনাদের কেউ চেনে না। এক-এক জন পনেরো হাজার টাকা দিতে রাজি থাকলে জামিন দেয়া যেতে পারে।'

ফিক্সের বুক দুরুদুরু ক'রে উঠলো। তিনি ভাবলেন, ফগ কি এতই নির্বোধ যে একমুহূর্তে এত টাকা নষ্ট করবে!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিলিয়াস ফগ কিন্তু দ্বিরুক্তি না-ক'রে ব্যাগ থেকে একতাড়া নোট বের ক'রে পেশকারের টেবলের উপর রেখে বললেন : 'টাকাটা আমি এক্ষুনি দাখিল করতে চাই।'

ম্যাজিস্ট্রট জানালেন : 'বিচারের দিন হাজির হ'লেই টাকাটা আপনারা ফেরৎ পাবেন, এখনকার মতো আপনারা জামিনে খালাশ হলেন।'

ব্যাপার দেখে ফিক্স বিমূঢ় হ'য়ে গেলেন।

মুহ্যমান পাসপার্তুর দিকে তাকিয়ে ফগ বললেন : 'চ'লে এসো, পাসপার্তু।'

একটা বাজতে তখন মাত্র আধঘণ্টা বাকি। ফিলিয়াস ফগ একটা গাড়িতে উঠে সোজা জাহাজ-ঘাটের দিকে ছুটলেন।

বিমূঢ়ভাব অপসৃত হ'তেই ফিক্স ফগের অনুসরণ করলেন। তখনও তিনি আশা করছিলেন ফগ নিশ্চয়ই আদালতে মামলার দিন সময়-মতো এসে হাজির হবেন, অত টাকা কিছুতেই জলে ফেলবেন না। কিন্তু যখন দেখলেন, ফিলিয়াস ফগ তাঁর সঙ্গিনী ও পাসপার্তুকে নিয়ে *রেঙ্গুন* জাহাজে উঠলেন, তখন রাগে-ক্ষোভে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে-ছিঁড়তে বললেন : 'উঃ ! কী ভয়ানক লোক ! একমুহূর্তে অত টাকা নষ্ট করলে ! নিশ্চয়ই ও দস্যু ! যদি দরকার হয় তবে ওর সঙ্গে-সঙ্গে পৃথিবীর শেষসীমায় পর্যন্ত যেতে দ্বিধা করবো না। হেস্তনেস্ত একটা করতেই হবে !'

*এস. এস. রেঙ্গুন* ছিলো *মংগোলিয়ার* মতোই দ্রুতগামী। কিন্তু আরোহীদের থাকবার বন্দোবস্ত ছিলো *মংগোলিয়াতেই* ভালো। যাতে রানী আউদার কোনো অসুবিধে না-হয়, সেজন্যে ফগ বিশেষ বন্দোবস্ত করলেন।

রানী আউদা ক্রমশ ফগের ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠছিলেন। তাঁর প্রাণ-রক্ষার জন্যে সর্বদাই ফগকে কৃতজ্ঞতা জানাতেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন, বম্বাইয়ের বড়ো ব্যবসায়ী সার জামসেদজি জিজিভাইয়ের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা আছে। সার জামসেদজির ভাগ্নে থাকেন হংকং। আউদা তাঁরই আশ্রয়ে যেতে চান। কিন্তু তিনি আউদাকে গ্রহণ করবেন কি না, কে জানে ? যদি গ্রহণ না-করেন, তাহ'লে নিজের দশা কী হবে সেই ভাবনায় আউদাকে ব্যাকুল হ'য়ে পড়তে দেখে ফগ বললেন, 'সে-জন্যে ভাববেন না। সবই ঠিক হ'য়ে যাবে।'

*রেঙ্গুন* জাহাজে সমুদ্রযাত্রার প্রথম ভাগ ভালোভাবেই কেটে গেলো। দেখতে-দেখতে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পেছনে ফেলে তরতর ক'রে জল কেটে-কেটে রেঙ্গুন এগুতে লাগলো।

শিকার হাতছাড়া হ'য়ে যায় দেখে বিলেতের ওয়ারেণ্ট হংকং-এ পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে ফিক্সও *রেঙ্গুনে* এসে উঠেছিলেন। পাছে পাসপার্তুর সঙ্গে জাহাজে দেখা হ'য়ে যায়, এই ভয়ে খুব সাবধানে থাকতে লাগলেন তিনি। হংকংই হ'লো তাঁর শেষ আশার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গা। দস্যুকে হংকং-এ ধরতে না-পারলে আর ধরা যাবে না। হংকং-এর পরই তো চিন, জাপান, আমেরিকা। সাধারণ একটা ওয়ারেন্ট ব্রিটিশ এলাকার বাইরে চলবে না। এ-সব জায়গায় দস্যুকে গ্রেপ্তার করতে হ'লে বিশেষ ওয়ারেন্ট আনতে হবে, সেজন্যে প্রচুর সময় চাই। তদ্দিনে ফিলিয়াস ফগ যে কোথায় লুকিয়ে পড়বেন, কে জানে!

ফিক্স মহাসমস্যার মধ্যে পড়লেন। হাজার চেষ্টা ক'রেও এতক্ষণের মধ্যেও ফগের চুলের ডগাটি পর্যন্ত স্পর্শ করা গেলো না। হংকং-এ যদি দস্যুকে পাকড়াও করা না-যায়, তবে তো তাঁর নিজের সুনাম নিয়েই টানাটানি প'ড়ে যাবে। যে-ক'রেই হোক হংকং-এ কিস্তিমাৎ করতেই হবে। পাসপার্তুকে সব কথা খুলে বলা উচিত হবে কি না, ভাবতে লাগলেন ফিক্স। বললে সে হয়তো দস্যুর সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে ফিক্সকেই সাহায্য করবে! কিন্তু, যদি না-করে? যদি ফগকে সে ফিক্সের মৎলব ফাঁস ক'রে দেয়! তবে তো এত হয়রানি খামকা পণ্ড হ'য়ে যাবে। না— নেহাৎ দায়ে না-ঠেকলে কোনো কথা প্রকাশ করা চলবে না ব'লেই ফিক্স মনে-মনে ঠিক করলেন।

ফগের নতুন সঙ্গিনীটি কে, সে-প্রশ্নও ফিক্সের মনে আলোড়ন তুললো। তিনি বুঝতে পারলেন, বম্বাই থেকে কলকাতার পথেই এই ভদ্রমহিলা জুটেছেন। ভদ্রমহিলা অপূর্ব সুন্দরী—বোধহয় এঁর জন্যেই ফগ টাকা চুরি ক'রে পালিয়ে যাচ্ছেন। এবার সব সমস্যার উপর ফিক্স একটি আলোকসম্পাত করতে পারলেন। টাকা চুরি ক'রে এই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে ফগ অন্য-কোথাও চ'লে যাবার মৎলব এঁটেছেন।

ভদ্রমহিলা বিবাহিতা কি-না ফিক্স সে-প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামালেন না। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন ফিলিয়াস ফগ ভদ্রমহিলাকে অপহরণ ক'রেই নিয়ে যাচ্ছেন। অমনি এক মৎলব মাথায় খেলে গেলো ফিক্সের। নারীহরণের অপরাধে তো ফগকে গ্রেপ্তার করা যায়!

কী মুশকিল! *রেঙ্গুন* যে আবার হংকং চলেছে! ফগ যেমন জাহাজ থেকে জাহাজে, রেল থেকে রেলে লাফ দিতে-দিতে চলেছেন, তাতে হংকং-এ গিয়েও বেশি দেরি করবেন ব'লে বোধ হয় না। অবশ্যি একটা কাজ করা যায়। সিঙ্গাপুর থেকে হংকং-এর পুলিশকে তারে খবর পাঠিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলা যায়। তাহ'লে জাহাজ হংকং-এ ভেড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই ফগকে গ্রেপ্তার করা যাবে। কিন্তু আগে পাসপার্তুকে ধাপ্পা দিয়ে ভিতরের খবর বার করতে হবে।

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে ফিক্স জাহাজের ডেকে এসে দেখতে পেলেন, পাসপার্তু পায়চারি করছে। তাকে দেখেই সাগ্রহে ফিক্স এগিয়ে গেলেন। 'আরে! তুমি যে *রেঙ্গুন* জাহাজে?'

'কে? মিস্টার ফিক্স যে! সেই বম্বাইতে আপনার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছিলো, না? আপনিও সারা দুনিয়া ঘুরে আসতে বেরিয়েছেন নাকি?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'উঁহু, ও-সব বদখেয়াল আমার নেই। কিছুদিন হংকং-এই থাকবো ভাবছি।'

'তা-ই নাকি ! তা আপনাকে তো অ্যাদ্দিন ডেকের উপর দেখতে পাইনি। কলকাতা ছেড়েছি তো বেশ কিছুদিন হ'লো।'

'একটু অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলাম ব'লে এ-কদিন বেরুতে পারিনি। কী জানি কেন, বঙ্গোপসাগর আর ভারত মহাসাগর আমার ধাতে সয় না। সে-কথা যাক, তা তোমার কর্তা মিস্টার ফগ কেমন আছেন ?'

'ভালোই আছেন তিনি। ঠিক সময়েই সব কাজ হ'য়ে যাচ্ছে। মাঝে মহা-মুশকিলে পড়েছিলাম। আমি হ'লে তো হালই ছেড়ে দিতাম, কিন্তু তিনি আলাদা ধাতুতে গড়া ব'লেই এখনও পেছ-পা হননি।'

এই ব'লে পাসপার্তু ফিক্সের কাছে সব-কিছু খুলে বললে। মালাবারের মন্দিরে তার দুর্দশা, খোলবিতে হাতি কেনা, পিল্লাজির মন্দিরে *সতীদাহ*, কলকাতার আদালতে বিচার ও জামিনে খালাশ—সব-কিছুই একে-একে ফিক্সকে বললো সে। ফিক্স এর কিছু-কিছু ভালোই জানতেন। তবু না-জানার ভান ক'রে মনোযোগ দিয়ে শুনে বললেন : 'আউদা তাহ'লে তোমাদের সঙ্গেই চলেছেন ? মিস্টার ফগ কি তাঁকে ইওরোপে নিয়ে যাবেন নাকি ?'

'না, তা কেন ? সে কি আর হয় কখনও ? হংকং-এ আউদার কে-এক আত্মীয় আছেন। শুনেছি তিনি হংকং-এর একজন বড়ো ব্যাবসাদার। তাঁরই কাছে তাঁকে রাখতে যাচ্ছি আমরা।'

সব শুনে ফিক্স কিন্তু খুব মুষড়ে পড়লেন। হতাশ হ'য়ে ভাবলেন, 'এ-পথে তাহ'লে কিছুই হবে না !' মুহূর্তের মধ্যে হতাশার ভাব গোপন ক'রে তিনি পাসপার্তুকে বললেন : 'এসো, একগেলাশ জিন খাওয়া যাক। অনেকদিন বাদে দেখা হ'লো।'

পাসপার্তু শুনে তো খুব খুশি। বললে : 'চলুন। দু-এক গেলাশ জিন ছাড়া *রেঙ্গুন* জাহাজে আর কী ক'রেই বা সময় কাটানো যাবে !'

দুজনে জাহাজের খাবার-ঘরের দিকে এগুলো।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত

# ডিটেকটিভ ফিক্সের তৎপরতা

এর পরও জাহাজে পাসপার্তুর সঙ্গে ফিক্সের অনেকবার দেখা হয়েছিলো। কিন্তু তার রকম-শকম দেখে ফিক্স আর তার কাছ থেকে কোনো খবর বার করবার কোনো চেষ্টাই করেননি। কিন্তু তবুও ব্যাপারটা আর সোজাভাবে নিতে পারলো না পাসপার্তু। সে ভাবতে লাগলো : 'আমরাও যেখানে যাই, ফিক্সকেও সেখানে দেখা যায় ! ব্যাপারটা বড্ড ঘোরালো ঠেকছে তো ! নিশ্চয়ই ও-ব্যাটা একটা স্পাই। ফগ সত্যি-সত্যিই পৃথিবী ঘুরছেন কি না, নিশ্চয়ই তা-ই ও গোপনে দেখে যাচ্ছে।' সে বড্ড চ'টে উঠলো। ফিলিয়াস ফগের মতো একজন ভদ্রলোকের পিছনে টিকটিকি লাগানো ! সে মনে-মনে ঠিক করলে : 'আচ্ছা, আমিও দেখবো ফিক্স কত শক্তি ধরেন, আর রিফর্ম ক্লাবই বা কত বড়ো ক্লাব !'

এই আবিষ্কার সে মনে-মনে খুশিই হ'য়ে উঠলো। ঠিক করলে যে, যখুনি সুবিধে পাবে, তখুনি টিকটিকি-সাহেবের সঙ্গে মোলাকাত ক'রে নেয়া যাবে। দেখা যাবে, তিনি কতটা বাহাদুর।

তিরিশে অক্টোবর বুধবার বিকেলবেলা *রেঙ্গুন* মলাক্কা প্রণালীতে ঢুকলো। পরদিন ভোর চারটের নির্দিষ্ট সময়ের বারো ঘণ্টা আগেই পৌঁছুলো সিঙ্গাপুরে। জাহাজের লোকজন কয়লা তুলতে লাগলো জাহাজে। ফিলিয়াস ফগ হাতে কিছু সময় পেয়ে খুশি হ'য়ে শহরটা দেখবার জন্যে আউদাকে নিয়ে বন্দরে নামলেন। ফিক্স অবশ্যি তাঁদের পিছু নিতে ছাড়েননি। পাসপার্তু ফিক্সকে পিছু নিতে দেখে মনে-মনে বেশ-খানিকটা হেসে নিলে।

বেলা এগারোটার সময় *রেঙ্গুন* কয়লা তোলা শেষ ক'রে নোঙর তুললো। কয়েক-ঘণ্টা বাদেই জাহাজের আরোহীদের দৃষ্টি থেকে মলাক্কার উঁচু পাহাড়গুলো দিগন্তে বিলীন হ'য়ে গেলো। হংকং তখনও তেরোশো মাইল দূরে। ফিলিয়াস ফগ মনে-মনে হিশেব ক'রে নিলেন যে, দিন-ছয়েকের ভিতরেই হংকং পৌঁছুনো যাবে, আর ছয়ই নভেম্বরের ভিতরে অনায়াসেই ইয়োকোহামার উদ্দেশে রওনা হওয়া যাবে।

এতদিন অব্দি ভালোই ছিলো আবহাওয়া। হঠাৎ অল্প-অল্প ঝড় শুরু হ'লো। জাহাজের গতি দ্বিগুণ করা হ'লো। তরতর ক'রে জল কেটে এগিয়ে চললো *রেঙ্গুন*। কিন্তু তুফানও তার সঙ্গে তাল রেখে বেড়েই চললো। তুফান সামলে চলতে গিয়ে *রেঙ্গুনের* গতি কিছুটা ক'মে এলো। পেনিনস্যুলার অ্যাণ্ড ওরিয়েন্টাল কম্পানির জাহাজিরা কিন্তু খুব ওস্তাদ। ওস্তাদ নাবিকেরা তাদের যতটুকু সাধ্যে কুলোয় তার চেয়েও বেশি করতে লাগলো। পাসপার্তু কিন্তু তা সত্ত্বেও জাহাজের ক্যাপ্টেনকে মনে-মনে গাল পাড়তে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগলো। আউদাও খুব চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। কিন্তু ফিলিয়াস ফগের নির্বিকার ভাবলেশহীন মুখে চিন্তার কোনো ছাপই দেখা গেলো না।

ওদিকে ফিক্স কিন্তু তাঁর গোয়েন্দাগিরি কখনও ছাড়েননি। একদিন ফিক্স কথাপ্রসঙ্গে পাসপার্তুকে শুধোলেন : 'কী হে! হংকং-এ পৌঁছুবার জন্যে তোমরা দেখি বড্ড-বেশি ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছো! কী ব্যাপার বলো তো! অত তাড়া কেন?'

পাসপার্তু মনে-মনে চ'টে উঠে ছোট্ট ক'রে একটা জবাব দিলে: 'তা, তাড়া একটু আছে বৈ কি। গন্তব্য যদি কিছু থাকে তবে সেখানে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়াই ভালো।'

'মিস্টার ফগ কি সেখান থেকেই ইয়োকোহামার জাহাজ ধরবেন? সেজন্যেই বুঝি তিনি খুব উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছেন?'

পাসপার্তু এবারে ছোট্ট ক'রে জবাব দিলে : 'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা-হে, এই রহস্যময় পৃথিবী-ভ্রমণের কথা কি তোমার বিশ্বাস হয়?'

'নিশ্চয়ই বিশ্বাস হয়। কেন? আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'মোটেই না।'

পাসপার্তু রেগে উঠে বললে : 'হুঁ, সেয়ানা কুকুর!'

তার কথা শুনে ঘাবড়ে গেলেন ফিক্স। 'তাহ'লে কি আমি যে ডিটেকটিভ সে-খবর প্রকাশ হ'য়ে গেছে নাকি? কিন্তু কেউ তো জানে না যে আমি ডিটেকটিভ! তাহ'লে লোকটা জানলো কী ক'রে?' সেদিন আর-কোনো কথা জিগেস করতে তাঁর আর সাহসে কুলোলো না।

কিন্তু পাসপার্তু নাছোড়বান্দা। আরেকদিন সে নিজেই শুধোলে : 'তাহ'লে, মিস্টার ফিক্স, হংকং-এও কি আপনাকে আমাদের পেছনে দেখবার সৌভাগ্য হবে?'

তার কথা বলার ধরন দেখে ফিক্স একটু কিন্তু-কিন্তু করলেন। পাসপার্তু বললে: 'আপনি যদি বরাবর আমাদের সঙ্গে থাকেন–উঃ, তাহ'লে কী খুশিটাই না হবো! চলুন-না আমাদেরই সঙ্গে। পেনিনস্যুলার অ্যাণ্ড ওরিয়েন্টাল কম্পানির এজেন্টের পক্ষে মাঝপথে থেমে যাওয়াটা কি ভালো দেখায়? আপনার লক্ষ্য তো গোড়ায় ছিলো বম্বাই অব্দি, এখন তো দেখছি চিনেই এসে পড়েছেন প্রায়। আর ঐ-তো আমেরিকা! আর সেখান থেকে ইওরোপ? সে-তো ব্যাঙের লাফের একলাফ!'

ফিক্স তীব্র চোখে তার দিকে তাকালেন, কিন্তু তার চোখে সন্দেহজনক কিছু দেখতে না-পেয়ে বললেন : 'তা...হ্যাঁ-ও, না-ও। এ-চাকরিতে ভালো-খারাপ দুই-ই আছে।... তুমি নিশ্চয়ই আঁচ করতে পেরেছো যে আমি নিজের পয়সায় শখ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি না।'

পাসপার্তু হেসে বললে : 'সে আর আপনাকে বলতে হবে না।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওকে আর ঘাঁটানো সুবিধের মনে না-ক'রে ফিক্স নিজের ক্যাবিনে এসে ঢুকলেন। রাজ্যের ভাবনা-চিন্তা এসে তাঁকে বিব্রত ক'রে তুললো। 'তাহ'লে ও আমাকে চিনে ফেলেছে'—এ-কথা ভাবতে-ভাবতে তাঁর মাথায় এক বাহাদুর মৎলব খেলে গেলো। 'ও যখন আমাকে চিনেই ফেলেছে, তখন হংকং-এ নেমেই আমার সব কথা ওকে খুলে বলবো। হয়তো ও ঐ চোরটার কীর্তি-কাহিনী জানে না। তার কাণ্ড-কীর্তির কথা শুনলে তাকে পুলিশে দিতে ও আমাকে নিশ্চয়ই সাহায্যই করবে।'

ওদিকে ফিলিয়াস ফগ তখন স্থির চোখে ঝড়ে-মেতে-ওঠা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। যাত্রার মধ্যে এ-রকম বিঘ্ন দেখা দিলে বিচলিত হ'য়ে পড়ারই কথা —বিশেষ ক'রে এ-রকম কোনো বেপরোয়া বাজির ব্যাপারে। কিন্তু ফগের মুখে চিন্তার কোনো চিহ্নই দেখা গেলো না, বরং দেখা গেলো কঠিন আত্মবিশ্বাসের সুস্পস্ট লক্ষণ।

ওদিকে পাসপার্তু কিন্তু খুব অস্থির হ'য়ে পড়লো। সে *রেঙ্গুনের* নাবিকদের সাধ্যাতীত সাহায্য করতে লাগলো —পারলে সে একাই হয়তো দশজনের কাজ ক'রে দিতো। তার কর্মপটুতা দেখে সকলেরই তাক লেগে গেলো। আউদাও ফিলিয়াস ফগের এ-বিপদে খুব ঘাবড়ে গেলেন।

তুফান অবিশ্যি শেষ অব্দি একসময় থেমে গেলো, কিন্তু *রেঙ্গুন* গিয়ে হংকং পৌঁছুলো নির্দিষ্ট সময়ের পুরো একদিন পরে। ইয়োকোহামার জাহাজ বুঝি ছেড়ে গিয়েছে ! পাসপার্তু আর খবর-টবর নিতে সাহস করলে না। যদি শোনা যায় যে ছেড়ে দিয়েছে, তবে উপায় ? এর চেয়ে বরং জাহাজঘাটায় না-গিয়ে মনে-মনে আশা পুষে রাখাই ভালো। দুঃসংবাদ শুনতে-পাওয়ার চেয়ে কোনো সংবাদ না-জানাই তার কাছে ভালো ব'লে মনে হ'লো। ফিক্স অবিশ্যি ওদের এই দুরবস্থায় খুশি হ'য়ে মনে-মনে প্রার্থনা করতে লাগলেন যে ইয়োকাহামার জাহাজ যেন ওরা পৌঁছুবার আগেই ছেড়ে দেয়।

বন্দরের *পাইলট* জাহাজে উঠলে একটুও বিচলিত না-হ'য়ে অতীব-শান্ত সুরে ফিলিয়াস ফগ জিগেস করলেন : 'ইয়োকোহামার জাহাজ কি চ'লে গিয়েছে ?'

'না। জাহাজের বয়লার খারাপ হ'য়ে গিয়েছিলো ব'লে সময়মতো ছাড়তে পারেনি।'

'কখন ছাড়বে তাহ'লে ?'

'কাল সকালে জোয়ার এলে ছাড়বে।'

ফিলিয়াস ফগ শুধোলেন : 'জাহাজটার নাম কী ?'

পাইলট জবাব দিলে : *'কর্নাটিক'*।

ফগ তাকে ধন্যবাদ জানালেন। পাসপার্তু তো আহ্লাদে আটখানা, আনন্দে তার হাত সজোরে চেপে ধ'রে বললে : 'পাইলট, আপনি খুব ভালোমানুষ !'

পাইলট এভাবে আচমকা সম্মানিত হবার কোনো কারণ বুঝতে না-পেরে অবাক



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ'লো বটে, কিন্তু কারণ জানবার অপেক্ষা না-ক'রেই শিস দিতে-দিতে তার কাজে চ'লে গেলো। বেলা একটার সময় *রেঙ্গুন* জেটিতে এসে লাগলো। যাত্রীরা সব ওঠা-নামা করতে লাগলো।

অদৃষ্ট যে ফিলিয়াস ফগের উপর খুব খুশি, এ-কথা কোনোমতেই অস্বীকার করার উপায় নেই। জাহাজের বয়লারটা যদি খারাপ না-হ'তো, তবে জাহাজ দিতো ছেড়ে, আর তার পরের জাহাজের অপেক্ষায় সময় নষ্ট হ'তো আটদিন। এ-কথা অবিশ্যি সত্যি যে তাঁকে চব্বিশ ঘণ্টা দেরি ক'রে আসতে হয়েছে, কিন্তু সেজন্যে বিশেষ-কোনো লোকশান হবে না। যে-জাহাজ ইয়োকোহামা থেকে সান-ফ্রান্সিসকো যাওয়া-আসা করে, হংকং-এর জাহাজ না-পৌঁছুলে পর তার ছাড়বার নিয়ম ছিলো না। কেননা সে এই জাহাজের যাত্রীদের নিয়েই মার্কিন মুলুক যায়। যদিও এই পঁয়ত্রিশদিনে ফগ তাঁর হিশেবের চেয়ে একদিন বেশি সময় লাগিয়েছেন, তবু প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের উপর দিয়ে বাইশদিনের যাত্রায় সেটুকু পুষিয়ে নেবার ভরসা আছে।

পরদিন ভোর পাঁচটার আগে *কর্নাটিক* তো হংকং ছাড়বে না, কাজে-কাজেই শহরে যেটুকু কাজ ছিলো সেটুকু সেরে নেয়ার জন্যে সবশুদ্ধু ষোলো ঘণ্টা সময় পাওয়া গেলো। সোজাকথায়, আউদার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্যে ফগ ষোলো ঘণ্টা সময় হাতে পেলেন।

জাহাজ জেটিতে লাগার সঙ্গে-সঙ্গেই আউদাকে নিয়ে ফিলিয়াস ফগ নামলেন জাহাজ থেকে। তারপর একটা ভালো হোটেলের খোঁজ ক'রে গেলেন সেখানে। সেখানে পাসপার্তুকে তাঁর না-ফেরা পর্যন্ত হোটেলে থাকবার নির্দেশ দিয়ে তিনি চললেন স্টক-একচেঞ্জের সন্ধানে। তিনি ভেবেছিলেন যে জিজিভাইয়ের ভাগ্নে যখন খুব-বড়ো ব্যবসায়ী, তখন সেখানে নিশ্চয়ই তাঁর শুলুকসন্ধান পাওয়া যাবে।

খবর অবিশ্যি ফিলিয়াস ফগ পেলেন, কিন্তু দেখা পেলেন না। অঢেল টাকা-পয়সা কামিয়ে নিয়ে তিনি বছর-দুই আগে ইওরোপ চ'লে গেছেন। ওলন্দাজদের সঙ্গে তাঁর কারবার ছিলো, খুব-সম্ভব তিনি চিন থেকে নেদারল্যাণ্ডস-এই গিয়েছেন।

তক্ষুনি হোটেলে ফিরে ফিলিয়াস ফগ আউদাকে সব খুলে বললেন। সব শুনে তো আউদা খানিকক্ষণ মুহ্যমান হ'য়ে রইলেন। তারপর গালে হাত দিয়ে আরো-খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে কাঁপাগলায় তিনি শুধোলেন : 'তাহ'লে, মিস্টার ফগ? আমার উপায়?'

'এ-তো খুব সহজ ব্যাপার।' ফিলিয়াস ফগ জবাব দিলেন : 'চলুন-না ইওরোপেই।'

'কিন্তু...কিন্তু তাতে আপনার এতটা অসুবিধে...'

'না, না! ও-কী বলছেন! আপনি থাকলে আমার সময়সূচির কোনো ক্ষতিই হবে না।' এই ব'লে তিনি পাসপার্তুকে ডাকলেন। বললেন : '*কর্নাটিক* জাহাজের তিনটে ক্যাবিন রিজার্ভ ক'রে এসো, শিগগির। চটপট।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাসপার্তু তক্ষুনি হালকা মনে শিস দিতে-দিতে টিকিট কাটতে রওনা হ'লো। পকেটে হাত ঢুকিয়ে শহর দেখতে-দেখতে এগিয়ে চললো ভিক্টরিয়া বন্দরের দিকে। রাস্তায় চিনা, জাপানি, আর ইওরোপিয়দের ভিড়। হংকং অনেকটা বম্বাই, কলকাতা কিংবা সিঙ্গাপুরের মতন সে-হিশেবে। বিশ্বের প্রায় সবদেশেরই লোক সেখানে এসে আস্তানা গেড়েছে।

পাসপার্তু ক্যান্টন নদীর মুখে ভিক্টরিয়া বন্দরে এসে হাজির হ'লো। যে-জেটি থেকে *কর্নাটিক* ছাড়বে, পাসপার্তু সেখানে এসে দেখলো, ডিটেকটিভ ফিক্স কেমন যেন হালছাড়াভাবে ভাঙামনে পায়চারি করছেন। পাসপার্তু মনে-মনে বললে : 'হুঁ! রিফর্ম ক্লাবের ভদ্রলোকের গতিক-সতিক দেখে তো বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না।' সে হাসতে-হাসতে সরাসরি ফিক্সের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে।

ফিক্স কিন্তু বিনাকারণে ওভাবে কাঁচুমাচু মুখভঙ্গি ক'রে পায়চারি করছিলেন না। তখনও বিলেত থেকে ওয়ারেন্ট এসে পৌছোয়নি। কয়েকদিন হংকং-এ অপেক্ষা ক'রে না-থাকলে ওয়ারেন্ট পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। হংকং হচ্ছে ইংরেজের দখলে এদিককার শেষ জায়গা—কাজেই হংকং-এ দস্যুকে ধরতে না-পারলে তাকে এর পরে আর ধরবার সুযোগ নেই। অতএব ফিক্স তখন সেই মহাসংকটে প'ড়ে কী অস্থির চিন্তায় পাগলের মতো হ'য়ে উঠেছিলেন, তা কেবল তাঁর মতো ভুক্তভোগী ধুরন্ধর গোয়েন্দা ছাড়া আর-কেউ বুঝতে পারবে না।

পাসপার্তু সেদিকে খেয়াল না-ক'রে একগাল হেসে শুধোলে : 'কী খবর, মিস্টার ফিক্স? আপনি তাহ'লে আমাদের সঙ্গেই আমেরিকা যাচ্ছেন?'

দাঁত কিড়মিড় ক'রে কোনোমতে রাগটা চেপে ফিক্স বললেন : 'হ্যাঁ।'

অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লো পাসপার্তু : 'আসুন, আসুন! আমি কি আগেই বলিনি, আপনি কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়তে পারবেন না। আসুন, আসুন—আপনার প্যাসেজ বুক ক'রে নিন।'

দু-জনে তখন কম্পানির আপিশ-ঘরে গিয়ে চারখানা কামরা রিজার্ভ ক'রে এলো। কেরানিবাবু তাদের বললে যে, *কর্নাটিকের* মেরামত শেষ হ'য়ে গেছে, কাজে-কাজেই মিথ্যে আর জেটিতে সময় না-কাটিয়ে পরদিন ভোরে জাহাজ না-ছেড়ে সেদিনই সন্ধে আটটার সময় জাহাজ ছাড়বে।

পাসপার্তু বললে : 'তাহ'লে তো খুবই ভালো হ'লো! মিস্টার ফগের সময়সূচির সঙ্গে চমৎকার খাপ খাবে এ। যতটা সময় নষ্ট হবে ব'লে আশঙ্কা করছিলেন, বাস্তবে তার খানিকটা এতেই পুষিয়ে যাবে। যাই, গিয়ে সুখবরটা জানিয়ে আসি।'

আর নয়, সেই মুহূর্তেই মন ঠিক ক'রে ফেললেন ফিক্স। ভাবলেন, এইমুহূর্তে পাসপার্তুকে সবকিছু খুলে বলবেন, নইলে এ-জীবনে আর ব্যাংক-দস্যুকে পাকড়াবার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুযোগ হবে না। পথে বেরিয়ে জাহাজ-ঘাটার কাছে একটা রেস্তোরাঁ দেখে ফিক্স বললেন : 'এসো-হে, কিছু জলযোগ ক'রে নেয়া যাক।' পাসপার্তু কোনো দ্বিরুক্তি না-ক'রে তাঁর সঙ্গে গিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকলো।

রেস্তোরাঁটা বেশ বড়ো-সড়ো। তারা দুজনে একটা সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। ঘরটার একপাশে একটা ক্যাম্প-খাট। পাসপার্তু দেখলে কতগুলো লোক সেই বিছানায় লম্বা হ'য়ে চিৎপাত প'ড়ে আছে, সবাই ঘুমিয়ে কাদা। আরো-জনাকয়েক লোক ছোটো-ছোটো টেবিলের চারপাশে ব'সে কেউ বিয়ার বা পোর্ট, কেউ ব্র্যাণ্ডি, কেউ-বা অন্য-কোনো পানীয় গলাধঃকরণ করতে-করতে গল্প করছিলো। অনেকে মাটির তৈরি লাল-রঙা বড়ো-বড়ো নলচেতে গোলাপ-জলে ভিজোনো আফিং-এর গুলি ভ'রে ধূমপান করছিলো। যারা আফিং-এর নেশায় জ্ঞান হারিয়ে টেবিলের নিচে প'ড়ে যাচ্ছিলো, ওয়েটাররা তাদের ধরাধরি ক'রে ক্যাম্প-খাটে শুইয়ে দিচ্ছিলো। পাসপার্তু দেখলে, জনা-কুড়ি লোক সেই বিছানায় ওভাবে নেশায় বুঁদ হ'য়ে জ্ঞান হারিয়ে পাশাপাশি শুয়ে রয়েছে।

ফিক্স আর পাসপার্তু সব দেখে-শুনে বুঝতে পারলে এটি রেস্তোরাঁ নয়, চিনেদের একটা গুলির আড্ডা। চিনা গবর্মেণ্ট অনেক চেষ্টা ক'রেও এই নরককুণ্ডগুলোকে বন্ধ ক'রে দিতে পারেনি। তারা দু-জনে দুটো চেয়ার দখল ক'রে বসলো। পাসপার্তুর কাছে জাহাজের ক্যাবিন রিজার্ভ করার পর আর বাড়তি টাকাকড়ি ছিলো না। ও ফিক্সের বন্ধুত্বের খাতিরেই এখানে এসেছিলো।

দু-বোতল পোর্টের হুকুম দিয়ে ফিক্স পাসপার্তুকে নানান ধরনের লম্বাই-চওড়াই গল্প শোনাতে লাগলেন। পাসপার্তু বোতলকে-বোতল একাই সাবাড় ক'রে দিলে—ফিক্স চালাকি ক'রে ওকে বেশি মদ খাইয়ে নিজে নামমাত্র ছুঁলেন কি না-ছুঁলেন। হঠাৎ পাসপার্তুর খেয়াল হ'লো যে জাহাজ ছাড়বার সময় বদলে গিয়েছে আর সেটা তার কর্তা জানেন না। সে তক্ষুনি উঠে প'ড়ে বললে: 'জাহাজ তো সন্ধের সময় ছাড়বে। আমি উঠি। গিয়ে কর্তাকে খবর দিতে হবে।'

ফিক্স তাকে বাধা দিয়ে বললেন : 'সবুর, সবুর, একমিনিট অপেক্ষা করো।'

'কেন? কোনো দরকার আছে?'

'তোমার সঙ্গে একটা সাংঘাতিক জরুরি ব্যাপারে কথা বলতে চাই।'

'সাংঘাতিক জরুরি ব্যাপার? সে-কী? তা বেশ। আপনিও তো আমাদের সঙ্গে চলেছেন, কাল সকালেই এ নিয়ে আলাপ করা যাবে'খন। আজ আর আমার সময় নেই।'

'থামো।' ফিক্স এবারে কড়াসুরে বললেন : 'কাল শুনলে চলবে না। কথাটা জরুরি, আর তোমার কর্তার সম্বন্ধেই।'

ফিক্সের গলার স্বরে এমন কড়া ধাতানির ভাব লক্ষ ক'রে খানিকটা অবাক হ'য়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তীব্রদৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকালে পাসপার্তু। 'কর্তার সম্বন্ধে ? বেশ, বলুন।' আবার সে চেয়ারে বসলো।

ফিক্স পাসপার্তুর হাত ছুঁয়ে নিচুগলায় বললেন : 'আমি কে, তুমি কি তা বুঝতে পেরেছো ?'

মুচকি হাসলো পাসপার্তু। 'নিশ্চয়ই পেরেছি।' মনে-মনে বললে, 'তুমি যে একটা মিচকে শয়তান, তা কি আমার আর বুঝতে বাকি আছে।'

'সবকিছুই আমার জানা আছে। না, না, মিস্টার ফিক্স, একে বুদ্ধিমানের কাজ বলা চলে না মোটেই। আচ্ছা, বলুন, কী বলবেন। কিন্তু তাঁরা যে আপনাকে পাঠিয়ে খামকা হয়রান হচ্ছেন আর এত টাকা গচ্চা দিচ্ছেন—'

'খামকা !' ফিক্স উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন। 'তাহ'লে বেশ বোঝা যাচ্ছে কত টাকার মামলা, তা তুমি জানো না।'

পাসপার্তু জবাব দিলে : 'জানি কত টাকা। তিন লাখ টাকা মানে কুড়ি হাজার পাউণ্ড তো ?'

ওর হাতে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে ফিক্স বললেন : 'পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড !'

'কী ?' পাসপার্তু আর নিজেকে সামলাতে পারলে না, গলাছেড়ে চেঁচিয়ে উঠলো। 'কী বললেন ? পঞ্চান্ন হাজার ? তাহ'লে তো এখানে আর একমুহূর্ত সময় নষ্ট করাও অন্যায়।' সে উঠে দাঁড়াতেই ফিক্স আবার তাকে ধ'রে টেনে বসিয়ে বললেন : 'হ্যাঁ, পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড।' পাসপার্তুর দিকে মদের গ্লাসটা এগিয়ে দিলেন তিনি। 'পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড। আর আমি যদি সফল হই তাহ'লে পাবো দু-হাজার পাউণ্ড। তুমি যদি আমাকে সাহায্য করো, তাহ'লে তোমাকেও পাঁচশো দেবো।'

'আপনাকে সাহায্য করবো ?' অবাক হ'য়ে কেমন হতভম্বভাবে তাঁর দিকে তাকালে পাসপার্তু। 'তার মানে ?'

'হ্যাঁ, সাহায্য করবে। যাতে মিস্টার ফগ এখানে কয়েকটা দিন আটকে প'ড়ে থাকেন, তার ব্যবস্থা ক'রতে হবে।'

'কী !' চেঁচিয়ে উঠলো পাসপার্তু। 'এ আপনি বলছেন কী ? আমার মনিব ভালোমানুষ মিস্টার ফগের পিছনে স্পাই লাগিয়েও তাঁদের তৃপ্তি হয়নি, আবার যাতে ঠিক সময়ে লণ্ডনে পৌঁছুতে না-পারেন, তার ব্যবস্থাও করতে চান ? ছী-ছি-ছি !'

'তোমার কথা তো আমি বুঝতে পারছিনে !'

'উঃ ! কী ছোটোনজর !' পাসপার্তু ব'লে চললো। 'তাহ'লে তো তারা দেখছি মিস্টার ফগের পকেট মারতেও পেছ-পা হবে না !'

'আমরা তো ঠিক তা-ই করত চাচ্ছি।'

নির্জলা মদ পাসপার্তুকে ক্রমশ উত্তেজিত ক'রে তুলছিলো। 'এ তাহ'লে ভয়ংকর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা ষড়যন্ত্র ! আবার তারাই মিস্টার ফগকে বন্ধু ব'লে পরিচয় দেয়, ভদ্রলোক হিশেবে পরিচিত হয় !'

তার কথা শুনে ফিক্স বড্ড গোলে পড়লেন। তার কথা ফিক্স কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। সব কী-রকম একটা হেঁয়ালির মতো ঠেকছিলো তাঁর কাছে।

পাসপার্তু রেগে ব'লে চললো : 'এরাই কি-না বন্ধু ! এরাই আবার রিফর্ম ক্লাবের সভ্য ! মিস্টার ফিক্স, আপনি কি এখনও কর্তাকে চিনে উঠতে পারেননি ? তাঁর মতো মহৎ লোক ক-টা দেখছেন আপনি ? তিনি যে-বাজি ধরেছেন, তা তিনি সৎপথেই জিতে নেবেন, কোনো ফেরেব্বাজি করবেন না। তিনি তো আর ঠগ-জোচ্চোর-জালিয়াত নন।'

পাসপার্তুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ফিক্স বললেন : 'আমি যে কে, তা কি তুমি ঠিকঠাক বুঝতে পেরেছো ?'

'আপনি !' পাসপার্তু বললে : 'আপনি রিফর্ম ক্লাবের একটা স্পাই, খোচর । মিস্টার ফগকে পথে আটকে রাখবার জন্যেই আপনি আমাদের পিছু-পিছু কুকুরের মতো ছুটে এসেছেন। আমি তো অনেক আগেই আপনাকে চিনেছি, নেহাৎ মনে দুঃখ পাবেন ব'লেই মিস্টার ফগকে কিছু বলিনি ! এবার দেখছি বললেই ভালো করতুম !'

ফিক্স ভড়কে গিয়ে তাড়াতাড়ি শুধোলেন : 'তাহ'লে মিস্টার ফগ আমার কথা কিছুই জানেন না ?'

মদের গ্লাসটা এক-চুমুকে শেষ ক'রে পাসপার্তু বললে : 'না। তিনি এর কিছুই জানেন না।'

ধুরন্ধর ডিটেকটিভ ফিক্স দু-হাতে কপাল টিপে ধ'রে পলকের মধ্যেই নিজের কর্তব্য ভেবে নিলেন। তিনি দেখলেন পাসপার্তু খুব সরল শাদাসিধে মানুষ, নিশ্চয়ই ব্যাংক-লুঠে মিস্টার ফগের সাহায্য করেনি। ফিক্স ভাবলেন, 'যদি তা-ই হয়, তাহ'লে আমার সত্যিকার পরিচয় পেলে ও নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবে।' বেশি ভাববার সময়ও তখন ছিলো না। যে-ক'রেই হোক মিস্টার ফগকে হংকং-এ আটকে রাখতে হবেই। তক্ষুনি তাঁর কর্তব্য ঠিক ক'রে নিয়ে ফিক্স বললেন : 'শোনো, তুমি যা ভাবছো, আমি আসলে তা নই।'

অবাক হ'য়ে গেলো পাসপার্তু। বিস্ময়ে তার চোখ ছানাবড়া। 'সে কী ! তার মানে ?'

'আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ ! কী ? বিশ্বাস হচ্ছে না ? এই দ্যাখো আমার কার্ড !'

ফিক্স মুহূর্তের মধ্যে তাঁর কার্ড বের ক'রে সেই হতভম্ব ফরাশির সামনে তুলে ধ'রে বলতে লাগলেন, 'বাজি ধরার একটা মিথ্যে অছিলা তৈরি ক'রে মিস্টার ফগ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকেও ঠকিয়েছেন, আর রিফর্ম ক্লাবের সভ্যদেরও ফাঁকি দিয়েছেন। তুমি যাতে কিছু বুঝতে না-পেরে তাঁর সাহায্য করো, এই হচ্ছে তাঁর মৎলব।'

'তার মানে?' চেঁচিয়ে উঠলো পাসপার্তু। 'এভাবে ফাঁকি দিয়ে তাঁর কী লাভ?'

'লাভ হচ্ছে এই—গত আঠারোই সেপ্টেম্বর ব্যাংক অভ ইংল্যাণ্ড থেকে যে পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড চুরি যায় তা কার কাণ্ড জানো? মিস্টার ফগেরই। দস্যুর যে-ফোটো পাওয়া গেছে, মিস্টার ফগের চেহারার সঙ্গে তার হুবহু মিল আছে।'

সজোরে টেবিল চাপড়ে উঠলো পাসপার্তু। 'অসম্ভব! এ হ'তেই পারে না! মিস্টার ফগের মতো সজ্জন দুনিয়ায় দুর্লভ।'

'আরে, তুমি আর জানবে কী ক'রে? যেদিন মিস্টার ফগ তাঁর খ্যাপা বাজি ধ'রে ছুতো ক'রে বেরিয়ে পড়েন, তুমি তো সবে সেদিনই তাঁর কাছে চাকরি নিয়েছিলে। মনে করো দেখি, সেদিন তাঁর সঙ্গে কী ছিলো? কোনো জিনিশপত্র সঙ্গে ছিলো কী? কেবল একটা ব্যাগ, আর তার মধ্যে অজস্র ব্যাংক-নোট! তাছাড়া আশিদিনে কি সারা পৃথিবী ঘুরে আসা যায়? তুমিই বলো দিকিনি এ-একটা খ্যাপার কাণ্ড, না অন্য-কিছু? এখনও তুমি ওঁকে সাধু-পুরুষ বলতে চাও? আসিসির সন্ত ফ্রানসিস?'

পাসপার্তু কলের পুতুলের মতো বললে: 'অ্যাঁ-অ্যাঁ—তারপর?'

'দস্যুকে সাহায্য করেছো ব'লে তুমিও কি জেলে পচতে চাও?'

পাসপার্তু দু-হাতে তার কপালের রগ টিপে ধরলে। চোখের সামনে সারা পৃথিবী ঘুরতে লাগলো। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। হতবাক হ'য়ে সে ভাবতে লাগলো: 'কী অসম্ভব কথা! ফিলিয়াস ফগ একজন দস্যু! সেই নির্ভীক বীরপুরুষ একটা সামান্য চোর! *চোর*? না-না, এ অসম্ভব! কোনোমতেই এ হ'তে পারে না। কিন্তু ফিক্সের কথাও তো একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। ফিলিয়াসের ফগের হাবভাব আচার-আচরণ বেশ-একটু রহস্যময়ই—তাঁর সবকিছুই যেন কুহেলিঘেরা। কিন্তু—কিন্তু তবুও এ অসম্ভব!' রুদ্ধকণ্ঠে সে ফিক্সকে শুধোলে: 'তাহ'লে আপনি আমায় এখন কী করতে বলছেন?'

'আমি এতদূর অব্দি তাকে অনুসরণ ক'রে এসেছি।' ফিক্স বললেন। 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা চেয়ে পাঠিয়েছি, কিন্তু আজও সেই ওয়ারেণ্ট এসে পৌঁছোয়নি। তোমাকে শুধু এই ব্যবস্থাই করতে হবে মিস্টার ফগ যাতে কোনোমতেই হংকং ছেড়ে যেতে না-পারেন।'

'কিন্তু...'

বাধা দিয়ে ফিক্স বললেন: 'যদি পারো তবে তোমাকে একহাজার পাউণ্ড দেবো।'

'না, না—এ কাজ আমি করতে পারবো না।' পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলো



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাসপার্তু—চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না উঠতে—চেয়ারে যেন তার গোটা শরীরটাই আটকে গেছে। জড়ানো গলায় সে শুধু বললে, 'মিস্টার ফিক্স, আপনার কথা যদি *সত্যিই* হয়, মিস্টার ফগ যদি দস্যুই হন—তবু আমি তাঁর সঙ্গে বেইমানি করতে পারবো না। আমি এখনও বিশ্বাস করি, তিনি নির্দোষ, সাধু। আমি নেমকহারামি করতে পারবো না। অসম্ভব! সে আমি কোনোমতেই পারবো না। আমি আর যা-খুশি তা-ই হ'তে পারি, কিন্তু ইতর-কোনো বেইমান নই।'

'তাহ'লে তুমি রাজি নও?' ফিক্স তাকিয়ে দেখলেন পাসপার্তু প্রায়-মাতাল হ'য়ে পড়েছে। তিনি বললেন : 'বেশ, তাহ'লে আমাদের মধ্যে যে-সব কথাবার্তা হ'লো, সে-সব ভুলে যাও। এসো, আমাদের বন্ধুতার চিহ্ন হিশেবে আরেক গ্লাস ক'রে ব্র্যাণ্ডি খাওয়া যাক।'

এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে আর এত মদ খেয়ে পাসপার্তুর অবস্থা শুধু বেশামালই নয়, রীতিমত কাহিল হ'য়ে এসেছিলো। ফিক্স ঠিক করলেন, তাকে কোনোমতেই ফগের কাছে যেতে দেয়া চলবে না। টেবিলের উপরেই আফিংভরা সেই লালরঙা নলচেগুলো প'ড়ে ছিলো। ফিক্স তারই একটা তুলে দিলেন পাসপার্তুর হাতে। এমনিতেই কাহিল হ'য়ে পড়েছিলো পাসপার্তু, অনভ্যস্তভাবে নলে কয়েকবার জোর টান দেবার সঙ্গে-সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে গেলো মেঝের উপর।

'অবশেষে!' সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন ফিক্স। 'এবার ফিলিয়াস ফগকে বাগে পেয়েছি। *কর্নাটিক* জাহাজ ছাড়ার সময় যে বদলে গেছে, সে-কথা ফিলিয়াস ফগ আর জানতেও পারবে না! এবার তাকে দেখে নেবো!'

দাম চুকিয়ে দিয়ে ফিক্স চণ্ডুখানা ছেড়ে রাস্তায় বেরুলেন।

## আট

## ইচ্ছে থাকলে উপায়ও থাকে

এদিকে চণ্ডুখানায় যখন ফিলিয়াস ফগের ভবিষ্যৎ ও আশা সব ধ্বংস হ'য়ে যাচ্ছিলো, তখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে আউদাকে নিয়ে হংকঙের সাহেব-পাড়ায় বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। তাঁর অনুরোধে আউদা ইওরোপে যেতে রাজি হ'য়ে পড়ায় এত-দূর পথ পাড়ি দেয়ার জন্যে কতগুলো জিনিশ কেনাকাটা করা দরকার হ'য়ে পড়েছিলো। ফগের মতো কোনো ইংরেজ হয়তো একটা ব্যাগ সঙ্গে নিয়েই সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াতে পারেন,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কোনো ভদ্রমহিলার পক্ষে তো সেভাবে বেড়ানো সম্ভব নয়।

কেনাকাটা সারা হ'লে পর হোটেলে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফগ *দ্য টাইমস* আর *ইলাস্ট্রেটেড লণ্ডন নিউজ* পড়তে লাগলেন। পাসপার্তু এত রাতেও ফিরে না-আসায় ফগ মোটেই চিন্তিত হলেন না, কারণ তিনি জানতেন ইয়োকোহামার জাহাজ আগামীকাল ভোরের আগে ছাড়বে না। কাজেই পাসপার্তুকে দেখতে না-পেলেও সে নিয়ে তেমন-একটা মাথা ঘামালেন না। কিন্তু পরদিন ভোরে যখন পাসপার্তুকে তিনি ডাকলেন, তখনও তার কোনো পাত্তা পাওয়া গেলো না। ফগ অবিশ্যি তখনই প্রথম শুনলেন যে আগের দিন রাত্রেও সে আসেনি। তিনি এ-সম্বন্ধে কী ভাবলেন, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, কারণ তিনি এ নিয়ে কোনো কথাটি না-ক'য়ে, বিনাবাক্যব্যয়ে, জিনিশপত্র গুছিয়ে আউদাকে সঙ্গে নিয়ে *কর্নাটিক* জাহাজে যাবার জন্যে রাস্তায় এসে নামলেন। জেটিতে এসে শোনা গেলো আগের দিন রাত্রেই *কর্নাটিক* বন্দর ছেড়ে চ'লে গিয়েছে। ফগ এ-কথা শুনে শুধু তাঁর স্বাভাবিক গলায় আউদাকে বললেন : 'এ নিয়ে অযথা বিচলিত হবেন না আপনি। মোটেই হতাশ হবেন না। ইচ্ছে থাকলে একটা উপায় হবেই হবে।'

ফিক্স ওদের কাছে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে সব দেখছিলেন। এবার তিনি ফগের কাছে এসে দাঁড়ালেন। 'আপনিই তো কাল আমাদের সঙ্গে *রেঙ্গুনে* ক'রে এসেছেন, না?'

ফগ বললেন : 'হ্যাঁ—কিন্তু আপনাকে তো ঠিক...'

'মাপ করবেন, ভেবেছিলুম পাসপার্তুকেও আপনাদের সঙ্গে দেখতে পাবো।'

আউদা ব্যগ্রকণ্ঠে শুধোলেন : 'সে কোথায় আছে আপনি কি জানেন মিস্টার...'

'আমার নাম ফিক্স।' অবাক হবার ভান করলেন তিনি। 'সে-কী! ও কি আপনাদের সঙ্গে আসেনি?'

'না। কাল থেকেই তো তার পাত্তা পাচ্ছিনে।' আউদা বললেন : 'আমি ভাবছি সে কি *কর্নাটিক* জাহাজেই চ'লে গেলো?'

'ও কি আপনাদের ফেলে রেখেই চ'লে যাবে? মাপ করবেন—আপনারাও বুঝি ঐ জাহাজে যেতে চেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমিও যাবো ব'লে মনে করছিলুম। জাহাজখানা হঠাৎ চ'লে যাওয়াতে বড্ড অসুবিধেয় পড়লুম। খবর নিয়ে শুনলুম, মেরামতের কাজ শেষ হ'য়ে যাওয়াতে বারোঘণ্টা আগেই জাহাজটা হংকং ছেড়ে চ'লে গিয়েছে। এখন তো হপ্তা-খানেকের মধ্যে আর জাহাজও পাওয়া যাবে না। দেখুন দেখি, কী মুশকিলেই না পড়লুম!' ফিক্সের চোখে একটি ধূর্ত-কুটিল হাসির ঝিলিক খেলে গেলো। একেই কি শয়তানের হাসি বলে? তিনি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবছিলেন, আর একহপ্তা—তার মধ্যেই ওয়ারেন্ট এসে পড়বে। তারপর ব্যাংকদস্যুকে গ্রেপ্তার করার গৌরব ও ইনাম তাঁরই ওপর বর্তাবে। আর ভয় কীসের!

কিন্তু ফগ যখন তাঁর স্বাভাবিক শান্তগলায় বললেন, '*কর্নাটিক* ছাড়াও তো হংকং বন্দরে আরো-অনেক জাহাজ রয়েছে,' তখন সে-যে কী তিনি রকম আঘাত পেলেন, পাঠক তা নিশ্চয়ই সহজে অনুমান করতে পারছেন। ফগ আর কালবিলম্ব না-ক'রে আউদাকে নিয়ে জাহাজগুলোর পানে চললেন। ফিক্স চক্ষু ছানাবড়া ক'রে অবাক হ'য়ে তাঁদের অনুসরণ করলেন। কিন্তু ফিক্সের উপরই বোধহয় অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, নইলে ঘুরতে-ঘুরতে ঘণ্টা-তিনেক কেটে গেলো, কিন্তু এতগুলো জাহাজের মধ্যে কোনো জাহাজের ক্যাপ্টেনই ইয়োকোহামা যেতে রাজি হ'লো না। ফিক্সের মুখে ফের সেই ধূর্ত-কুটিল হাসিটা ফুটে উঠলো।

কিন্তু ফিলিয়াস ফগ নাছোড়বান্দা। তিনি তখনও জাহাজ-ঘাটায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। পথে এক জাহাজির সঙ্গে দেখা। জাহাজি শুধোলে : 'সাহেব কি বিশেষ-কোনো জাহাজের খোঁজ করছেন?'

'এক্ষুনি ছাড়তে পারে এমন কোনো স্টীম-বোটের কথা কি জানা আছে তোমার?'

'আছে, সাহেব। তেতাল্লিশ নম্বর পাইলট-বোটই আমার। এ-বছরে ওর চেয়ে ভালো নৌকো আর এ-তল্লাটে পাবেন না।'

'খুব স্পীডে যেতে পারবে তো?'

'ঘণ্টায় আট-ন মাইল ক'রে চলে, সাহেব। আসুন-না, একবার চাক্ষুষ দেখবেন। দেখলেই আপনার পছন্দ হবে, সাহেব। সমুদ্রের মাঝে একটু বেড়ানো-টেড়ানোর জন্যেই বুঝি নৌকোটা চাই?'

'ঠিক তা নয়। এই, ধরো, সমুদ্রে পাড়ি দেয়া আর-কী! আমি ইয়োকোহামা যেতে চাই, অবিশ্যি তুমি রাজি হ'লে।'

নাবিক হতভম্ব হ'য়ে ফগের পানে তাকালে। 'আপনি তামাশা করছেন না তো? একটা পাইলট-বোট নিয়ে ইয়োকোহামা?'

'তামাশা? না-না, তামাশা কেন? আমি *কর্নাটিক* জাহাজ ধরতে পারিনি। অথচ চোদ্দ তারিখের মধ্যে আমাকে ইয়োকোহামা পৌঁছুতেই হবে, দেরি হ'লে চলবে না। সেখানে গিয়ে আমাকে সান-ফ্রান্সিসকোর জাহাজ ধরতে হবে কি-না।'

'খুব দুঃখিত হলাম, সাহেব, কিন্তু, সে অসম্ভব!'

'আমি দিনে একশো পাউণ্ড ক'রে ভাড়া দেবো। ঠিক সময়ে পৌঁছুতে পারলে আরো দুশো পাউণ্ড বখশিশ পাবে।'

'আপনি কি সত্যিই যাবেন, সাহেব?' নাবিকটি জিগেস করলে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিলিয়াস ফগ উত্তর করলেন : 'নিশ্চয়ই যাবো।'

নাবিক একবার আকাশের দিকে তাকালে, তারপর আবার তাকালে সেই নিঃসীম সমুদ্রের দিকে। শেষে দোটানায় প'ড়ে ভাবতে-ভাবতে পায়চারি করতে লাগলো : একদিকে অতগুলো টাকা, অন্যদিকে জীবনের আশঙ্কা ! জীবন যদি নাও যায়, নৌকোটা বেঘোরে খোয়াবার ভয়।

ফিক্স তো ব্যাপার-স্যাপার দেখে একেবারে থ ! এই বুঝি গেলো সর্বনাশ হ'য়ে !

ফিলিয়াস ফগ আউদার দিকে তাকালেন। 'ছোট্ট নৌকো— আপনার ভয় করবে না তো ?'

'না। আপনার সঙ্গে যেতে আর ভয় কীসের ?'

অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে নাবিক বললে : 'আমার ছোটো নৌকো, অত-দূর পাড়ি দিতে তাই সাহস করিনে—বিশেষ ক'রে এই ঝড়-তুফানের সময়। সকলেরই প্রাণ যেতে পারে বেঘোরে। তাছাড়া ইয়োকোহামাও তো এখান থেকে কম-দূর নয়—ষোলোশো মাইল। সময়-মতো বোধহয় পৌঁছুনোও যাবে না। তবে এক কাজ করা যেতে পারে। নাগাসিকি এখান থেকে এগারোশো মাইল, শাংহাই আটশো। শাংহাই পৌঁছুলে আমরা তীরের কাছ দিয়েই যেতে পারবো, স্রোতের টানটাও পাবো।'

'কিন্তু, আমাকে যে ইয়োকোহামার আমেরিকার ডাক-জাহাজ ধরতে হবে !'

'বেশ-তো, তা-ই হবে। সান-ফ্রান্সিসকোর জাহাজ তো আর ইয়োকোহামা থেকে ছাড়ে না—শাংহাই থেকেই ছাড়ে। যেতে-যেতে ইয়োকোহামা আর নাগাসিকিতে দাঁড়ায়।'

'তুমি ঠিক জানো তো ?'

'ঠিক জানি। এগারোই নভেম্বর সন্ধ্যাবেলা শাংহাই থেকে জাহাজ ছাড়বে। তাহ'লে চারদিন সময় আছে হাতে—মানে, ছিয়ানব্বুই ঘণ্টা। যদি ঘণ্টায় আট মাইল ক'রে যেতে পারি আর অনুকূল হাওয়া থাকে, তবে ঠিক সময়েই শাংহাই পৌঁছুতে পারবো।'

ফিক্সের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'লো। ঘটনাস্রোত এবার যেভাবে যেদিকটায় মোড় নিচ্ছে, তাতে দস্যুকে পাকড়াও করবার তো আর-কোনো সুযোগই নেই !

ফগ নাবিকটিকে শুধোলেন : 'তোমরা কখন রওনা হ'তে পারবে ?'

'একঘণ্টার মধ্যেই। কিছু খাবার কিনে নৌকোর পালটা বাঁধবো—এই-যা দেরি।'

'তবে এই কথাই রইলো। তোমারই তো নৌকো ?'

'হ্যাঁ, আমারই নৌকো। আমার নাম জন বুন্‌স্‌বি, নৌকোর নাম *তংকাদিরি।*'

'এই নাও, তোমার সুবিধের জন্যে দু-শো পাউণ্ড আগাম দিচ্ছি।' ফগ নাবিকের হাতে একতাড়া নোট গুঁজে দিলেন। ফিক্স কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফগ বললেন : 'আপনি যদি ইচ্ছে করেন, তবে—'

'অজস্র ধন্যবাদ আপনাকে। আমিই আপনার কাছে কথাটা পাড়বো ব'লে মনে করেছিলুম।'

'তাহ'লে আধঘণ্টার মধ্যেই আমাদের তৈরি হ'য়ে নিতে হবে।'

আউদা বিমর্ষ কণ্ঠে বললেন : 'কিন্তু পাসপার্তুর যে কী হলো—'

তাঁকে আশ্বস্ত করলেন ফগ। 'আমার যা সাধ্য, তা আমি করবো।'

পুলিশ-আপিশে গিয়ে পাসপার্তুর চেহারা বর্ণনা ক'রে তার অনুসন্ধানের খরচ ও বিলেতে ফিরে আসবার জন্যে কিছু টাকা জমা রেখে এলেন ফগ।

বেলা তিনটের সময় সমুদ্রে পাড়ি দেয়ার জন্যে তৈরি হ'লো *তংকাদিরি*। ছোটো-খাটো নৌকো হ'লেও খুব-মজবুত আর দ্রুতগামী। বুনসবির অধীনে আরো-চারজন নাবিক ছিলো। বুনসবি বেশ দৃঢ়-গঠন, অত্যুৎসাহী ও সুদক্ষ নাবিক ! *তংকাদিরির* জন্যে তার একটা অহংকার ছিলো।

ফগ আর আউদা মালপত্র নিয়ে নৌকোয় উঠলেন। ফিক্স আগেই এসে হাজির হয়েছিলেন। তাকে দেখে ফগ বললেন : 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এ-নৌকোয় আপনার থাকার কোনো ভালো বন্দোবস্ত করতে পারছিনে। চোখ-কান বুজে কোনোরকমে এরই মধ্যে কাটিয়ে দিতে হবে।'

ফিক্স মনে-মনে একটু লজ্জা পেলেন। দস্যুর আতিথ্য গ্রহণ করেছেন ব'লে নিজের কাছেই নিজেকে বড়ো খাটো ব'লে মনে হ'লো তাঁর। মনে-মনে ভাবলেন : 'লোকটা দস্যুই হোক, আর যা-ই হোক, খুব বিনয়ী আর ভদ্র।' প্রতিমুহূর্তেই তাঁর আশঙ্কা হ'তে লাগলো, যদি হঠাৎ পাসপার্তু এসে হাজির হয়, তবেই সর্বনাশ হ'য়ে যাবে।

কিন্তু ফিক্সের বরাত ভালো। পাসপার্তুর কোনো পাত্তাই নেই। নোঙর তুলে দেখতে-দেখতে *তংকাদিরি* বন্দর ছেড়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চললো, নীল দরিয়ার জল কেটে-কেটে।

অমন-একটা ছোটো নৌকোয় ক'রে সেই ঝড়-তুফানের সময় আটশো মাইল সমুদ্র-পাড়ি দেয়া নিঃসন্দেহে খুব বিপজ্জনক ছিলো। জন বুনসবি টাকার লোভে আর ফিলিয়াস ফগ বাজি জেতবার জন্যে সে-বিপদ গ্রাহ্যই করলেন না। ফগের কথার জবাবে বুনসবি একবার শুধু বললে : 'আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। বুনসবির ওপর আপনি নির্ভর করতে পারেন। আমার যথাসাধ্য আমি করবো।'

*তংকাদিরি* বেশ দ্রুতবেগেই চলতে লাগলো। ফগ নৌকোয় ব'সে সেই অথৈ অকূল সাগরের এলোমেলো উথালপাথাল ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আউদা সেই সীমাহীন সমুদ্রের পানে তাকিয়ে একটু ভয় পেলেও মুখে বা হাবেভাবে তা প্রকাশ করলেন না।

একটু পরেই সন্ধ্যা হ'য়ে এলো। এদিকে আকাশেও তখন অল্প-অল্প কালো মেঘ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জমছিলো। প্রবল বেগে হাওয়া বইলো। তবু *তংকাদিরি* দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে দেখে ফগ একটু আশ্বস্ত হলেন। পুরস্কারের লোভে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো নাবিকেরা।

প্রথম দু-দিন ভালোভাবেই কেটে গেলো, কিন্তু তৃতীয় দিন ভোর থেকেই আকাশের অবস্থা সঙ্গিন হ'য়ে উঠলো। বিপুল উচ্ছ্বাসে ফুঁসে উঠলো দক্ষিণদিকের সমুদ্র। বুন্‌স্‌বি ভালো ক'রে চারদিক দেখে ফগকে বললে : 'আমার আশঙ্কা হচ্ছে এক্ষুনি সাংঘাতিক ঝড় শুরু হবে। মনে হচ্ছে দক্ষিণদিক থেকেই আসবে ঝড় —একটা ঘূর্ণি-বাতাস আসছে।'

'ভালোই হ'লো। দক্ষিণের ঝড়ে আরো-দ্রুত যাওয়া যাবে উত্তরদিকে।'

'আপনি যদি এ-কথা বলেন, তবে আমার আর কিছু বলবার নেই।'

শেষটায় বুন্‌স্‌বির আশঙ্কাই সত্যি হ'য়ে উঠলো। রাত আটটার সময় দক্ষিণদিক থেকে সাংঘাতিক ঝড় ছুটে এলো সমুদ্র উথালপাথাল ক'রে। যেমন ভীষণ ঝড়, তেমনি মুষলধারে বৃষ্টি। রাগে খেপে উঠলো সমুদ্র। প্রচণ্ড ঝড় *তংকাদিরির* ঝুঁটি ধ'রে নাড়াতে লাগলো। যেন দুরন্ত আক্রোশে একটা ক্রুদ্ধ বাঘ শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে ! রব উঠলো, 'শামাল, শামাল !' কিন্তু আশ্চর্য বলতে হবে বুন্‌স্‌বির নৌকা-চালানোর দক্ষতা। এই সাংঘাতিক ঝড়ে *তংকাদিরি* এ-কাৎ ও-কাৎ হ'লো বটে, কিন্তু ডুবলো না, ঝড়ের তাণ্ডবের মধ্যে তীরের মতো ছুটে চললো সামনের দিকে !

ফিক্স আকাশের অবস্থা দেখে মনে-মনে ভাবছিলেন, 'কেন যে মরতে এই খ্যাপা দস্যুটার সঙ্গে এলাম ! না-এলেই ভালো ছিলো !' আউদা খুব ভয় পেলেও ফিলিয়াস ফগের মুখের দিকে তাকিয়ে বুকে সাহস আনবার চেষ্টা করছিলেন। আর ফগ ভাবছিলেন, 'এমন না-হ'লে নৌকো এত দ্রুত যেতো কী ক'রে ! ঝড় তো আমার উপকারই করছে !'

এতক্ষণ ঝড়ের বেগ ছিলো উত্তরদিকে, এবার হ'লো উত্তর-পশ্চিমে। ঝড়ের তাণ্ডব এত বেড়ে গেলো যে বুন্‌স্‌বি অন্যান্য নাবিকের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ফগকে জানালে : 'আমার মনে হয় কাছাকাছি কোনো বন্দরের দিকে না-গেলে সাংঘতিক বিপদ ঘটবে।'

'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে।'

'কোন বন্দরের দিকে যাবো তবে ?'

'আমি তো শুধু একটাই চিনি।'

'সেটার নাম কী।'

'শাংহাই।'

জবাব শুনে বুন্‌স্‌বি স্তম্ভিত বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গেলো। তারপর বললে : 'বেশ। তা-ই হবে। আমরা শাংহাই বন্দরেই যাবো।'

*তংকাদিরি* যেমন চলছিলো, তেমনি এগুতে লাগলো। রাত ঘন হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তীব্র থেকে তীব্রতর হ'য়ে উঠতে লাগলো তুফান। এমন দুর্যোগ বোধহয় কেউ আর-কখনও দ্যাখেনি! সমুদ্রের সে-কী আক্রোশ, সে-কী পাখসাট! *তংকাদিরি* যে কেন ডুবলো না, সে-ই আশ্চর্য!

*তংকাদিরি* দু-বার ডুবতে-ডুবতে বেঁচে গেলো বটে, কিন্তু নৌকোর মাস্তুল, ছাদ ইত্যাদি সবই উড়ে গেলো। সকালের দিকে হাওয়ার বেগ কিছু কমলো বটে, কিন্তু এবার হাওয়া বইতে লাগলো দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। নৌকো প্রতিকূল হাওয়া কেটে চালানো বিষম কষ্টকর হ'য়ে দাঁড়ালো। দুপুরবেলার দিকে কিন্তু আচমকা থেমে গেলো তুফান, আকাশ হ'লো অনাবিল নীল। বুন্‌সবি শুধু হিশেব ক'রে দেখলো শাংহাই তখনও প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে। হাতে প্রায় ছ-ঘণ্টা সময় আছে। এই পঞ্চাশ মাইল ছ-ঘণ্টায় পেরুতে না-পারলে জাহাজ ধরা অসম্ভব। বুন্‌সবি চিন্তিত হ'য়ে পড়লো।

এদিকে সমুদ্র তখন নিস্তরঙ্গ। হাওয়ার কোনো চিহ্নই নেই। পালে আর হাওয়া লাগে না। শাংহাই তখনও পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে, আর হাতে মাত্র পাঁচঘণ্টা সময়!

হাওয়া, হাওয়া—একটু হাওয়া! কাল এত ঝড় বয়েছিলো, হাওয়া ছিলো তীব্রতম, আজ আর কি তার এককণাও থাকতে নেই। *তংকাদিরির* গতি হ'লো অত্যন্ত শ্লথ। ফিলিয়াস ফগের যথাসর্বস্ব নির্ভর করছে *তংকাদিরির* উপর। কিন্তু ফগ নির্বিকারভাবে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন।

দেখতে-দেখতে বাজলো সন্ধ্যা ছ-টা। সূর্য ডুবলো দিগন্তের সমুদ্রে। শাংহাই তখনও তিন মাইলের পথ। বুন্‌সবি আর্তনাদ ক'রে উঠলো, 'আর হ'লো না! পুরস্কার পেয়েও হারালুম!' কাতর চোখে সে তাকালে ফগের দিকে। ফগ নিরুদ্বেগ নির্বিকার চোখে বুন্‌সবির দিকে তাকালেন।

অনতিদূরে দেখা গেলো একটা জাহাজের চোঙ—ভলকে-ভলকে ধোঁয়া উঠছে সেই চোঙ দিয়ে। জাহাজ দেখেই চিনতে পারলো বুন্‌সবি। আমেরিকাগামী জাহাজ। সে রোষে-ক্ষোভে ব'লে উঠলো : 'জাহাজ অথৈ জলে ডুবে যাক!'

ফগ শান্তগলায় বললেন : 'সংকেত ক'রে সাহায্য চেয়ে জাহাজ ডাকো।'

কুয়াশার মধ্যে সংকেত করবার জন্যে *তংকাদিরিতে* পেতলের-যে কামানটা ছিলো, ক্ষিপ্রহাতে বারুদ ঢেলে তার নল ভ'রে তুললো বুন্‌সবি। মাস্তুলে বিপদজ্ঞাপক সাংকেতিক নিশান তুলে বারুদে আগুন দিলে সে।

*তংকাদিরির* ছোট্ট পেতলের কামান সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ শান্তিকে ভেঙেচুরে গর্জন ক'রে উঠলো।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়

# ইয়োকোহামার জাপানি সার্কাস

সাতুই নভেম্বর হংকং ছেড়েছিলো *কর্নাটিক*। ফিলিয়াস ফগ যে-তিনটে ক্যাবিন ভাড়া নিয়েছিলেন, তার দুটো খালিই গেলো। আট তারিখের ভোরবেলা *কর্নাটিকের* নাবিকেরা দেখেছিলো, অসংযত-বেশ একজন আরোহী ডেকের উপর হতবুদ্ধি হ'য়ে কেমন জবুথবু ব'সে আছে। লোকটি আর-কেউ নয়, আমাদের জাঁ পাসপার্তু!

*কর্নাটিক* যেদিন হংকং ছাড়লো, সেদিন তো পাসপার্তু হংকং-এর এক চণ্ডুখানায় অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে ছিলো, তবে জাহাজে এলো কী ক'রে? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হ'লে আবার আমাদের সেদিনকার রাত্তিরবেলার সেই চণ্ডুখানায় ফিরে যেতে হবে।

ফিক্স তো পাসপার্তুকে অচেতন ক'রে রেখে প্রস্থান করলেন। তারপরই চণ্ডুখানায় দুজন ওয়েটার এসে তাকে মেঝে থেকে তুলে ঐ ক্যাম্পখাটে শুইয়ে দিলে; তিন ঘণ্টা পরে সামান্য একটু জ্ঞান ফিরলো তার। তখন তার আর-কিছুই মনে পড়লো না, শুধু মনে পড়লো *কর্নাটিক*। তখন প্রায় সন্ধে হয়েছে। পাসপার্তু টলতে-টলতে দেয়াল ধ'রে রাস্তায় এসে দাঁড়ালে, তারপর যেন স্বপ্নের ঘোরে *'কর্নাটিক', 'কর্নাটিক'* ব'লে চীৎকার করতে-করতে চললো জেটির দিকে। জেটি বেশি দূরে ছিলো না। পাসপার্তু টলতে-টলতে *কর্নাটিকের* ডেকে গিয়ে উঠলো, আর *কর্নাটিক', 'কর্নাটিক'* বলে বার-বার চেঁচিয়ে উঠেই আবার অচেতন হ'য়ে প'ড়ে গেলো। হংকংএর যাত্রীদের মধ্যে এ-রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটতো ব'লে নাবিকেরা খুব অবাক হ'লো না, অচেতন পাসপার্তুকে ডেক থেকে তুলে একটা ক্যাবিনের মধ্যে রেখে এলো।

ভোরবেলা সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়ার ধীরে-ধীরে প্রকৃতিস্থ হ'লো পাসপার্তু। মনে পড়লো সব-কিছু। ভাবলে, আমি এমন মাতাল হয়েছিলুম শুনলে আমার প্রভু ফিলিয়াস ফগ কী বলবেন! যা-হোক, জাহাজে যে উঠতে পেরেছি এই ঢের! ডিটেকটিভ ফিক্স নিশ্চয়ই এখানে আসতে সাহস করেনি! কী আশ্চর্য! ফগের মতো লোককেও দস্যু ব'লে সন্দেহ ক'রে পেছনে টিকটিকি লেগেছে! এ-কথা কি এখুনি ফগকে খুলে বলবো? না, এখন থাক, ডিকেকটিভ ফিক্স আগে আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে সারা দুনিয়া চরকি ঘুরুক, তারপর লণ্ডনে গিয়ে তাকে নিয়ে বেশ-একটা মজা করা যাবে। এখন আর ফগকে বলা হবে না যে তাঁর পেছনে ফেউ লেগেছে।

মন ঠিক ক'রে পাসপার্তু ফগের কাছে মাপ চাইবার জন্যে তাঁর কামরার সন্ধানে চললো। সারা জাহাজ আঁতি-পাঁতি ক'রে খুঁজেও যখন ফগের দেখা পাওয়া গেলো না,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন সে ভাবলে নেশার ঝোঁকে সে নিশ্চয়ই অন্য-কোনো জাহাজে এসে উঠেছে, এ নিশ্চয়ই *কর্নাটিক* নয়। সে একটি নাবিককে শুধোলে : 'এটাই তো *কর্নাটিক*? ইয়োকোহামা যাচ্ছে?'

নাবিকটি বললে : 'হ্যাঁ।'

তখন হঠাৎ তার মনে প'ড়ে গেলো, জাহাজ ছাড়বার সময় যে আচমকা বদলে গিয়েছিলো, সে-খবর তো ফগকে জানানো হয়নি! অনুশোচনায় ভ'রে উঠলো তার মন। তার জন্যেই আজ সর্বনাশ হ'লো ফগের! তার জন্যেই ফগ আজ সর্বস্বান্ত, পুলিশের হাতে আটক হ'য়ে হয়তো-বা জেলেই প'চে মরবেন! পরক্ষণেই ফিক্সের উপর ভয়ানক চ'টে উঠলো সে। কাছে পেলে তখন হয়তো ফিক্সকে ছিঁড়েই ফেলতো পাসপার্তু।

মদের নেশার মতো রাগও ক্রমশ একসময় অন্তর্হিত হ'লো তার। এবার নিজের অবস্থার কথা ভাবতে লাগলো সে। আগেই টিকিট করা হ'য়ে গিয়েছিলো ব'লে ইয়োকোহামা পর্যন্ত তার আর জাহাজ-ভাড়া লাগবে না, খাওয়া-দাওয়ারও ত্রুটি ঘটবে না। কিন্তু তারপর? তার কাছে যে একটা পয়সাও নেই! পাসপার্তু আর বেশি ভাবতে পারলে না।

ঠিক সময়েই ইয়োকোহামা পৌঁছুলো *কর্নাটিক*। পাসপার্তুকে আজ জাহাজ থেকে তো নামতেই হবে, তারপর সারাদিন খাওয়া জুটবে কি না কে জানে? জাহাজেই তাই ঠেশে খেয়ে নিয়ে তীরে নামলে সে। নেমেই দেখতে পেলে, সামনে সুদূরবিস্তৃত রাজপথ, লোকের ভিড়ে গমগম করছে। লক্ষ্যহীন পাসপার্তু রাজপথ ধ'রে এগুলো সামনে।

সে ঠিক করলে, নেহাৎ যদি অন্য-কোনো উপায় না-হয়, তাহ'লে ইংরেজ কিংবা ফরাশি কন্সালের কাছে নিজের অবস্থা জানাবে। তাঁরা হয়তো কোনো-একটা উপায় ক'রে দেবেন। কিন্তু তার আগে একটিবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখা উচিত।

ইয়োকোহামার সাহেব-পাড়া, জাপানি-পাড়া পেরিয়ে বাজারে এসে হাজির হ'লো পাসপার্তু। হিরে-মুক্তোর দোকান, রোস্তোরাঁ, কাফে, দোকান-পশার কিছুরই অভাব নেই। চারদিক দেখতে-দেখতে সারাদিন ইতস্তত ঘুরে বেড়ালে সে। ক্রমশ সন্ধে হ'য়ে এলো। খিদেয় পেট জ্বলতে থাকলেও পয়সার অভাবে খাওয়া জুটলো না তার। পাসপার্তু এবার বুঝতে পারলে যে ঘর থেকে পা বাড়াতে হ'লে কিছু টাকা সঙ্গে না-রাখলে কিছুতেই চলে না।

অর্থহীন লক্ষ্যহীন পাসপার্তু জেটির দিকে এগুলো।

রাতটা তা কী ক'রে কাটলো, পাসপার্তু নিজেই যে ভালো ক'রে বুঝতে পারলে না। ভোরবেলা সে দেখতে পেলে খিদে তাকে এতই দুর্বল ও ক্লান্ত ক'রে ফেলেছে যে পেটে দানাপানি না-পড়লে আর চলে না। একটা পয়সাও নেই, এই অচেনা বিদেশ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভুঁয়ে খাওয়াবে কে ? তখনও ঘড়িটা ছিলো সঙ্গে, কিন্তু ঘড়িটা পাসেঁপার্তুর এত প্রিয় ছিলো যে সে ঠিক করলে, বরং না-খেয়ে মরবে, কিন্তু তবু ঘড়িটা সে বিক্রি করবে না। ভেবে দেখলে, এই অবস্থায় পোশাক বদলালে বিশেষ-কোনো ক্ষতি হবে না, বরং পকেটে কিছু আসতে পারে।

পাসপার্তু পুরোনো পোশাকের দোকান খুঁজে বের ক'রে নিজের পোশাকের বদলে একটি পুরোনো জাপানি পোশাক ও কিছু পয়সা পকেটে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। কাছের একটা হোটেলে কিছু খেয়ে নিয়ে পাসপার্তু জাহাজ-ঘাটার দিকে এগুলো। ইচ্ছে, যদি আমেরিকা-গামী কোনো জাহাজে কাজ নিয়ে জাপান ছাড়তে পারে।

কিন্তু সুপারিশ ছাড়া এমনতর কোনো চাকরির সৌভাগ্য হয় না কারুই। সুপারিশ নেই ব'লে পাসপার্তুও কোথাও চাকরি পেলো না। হাল ছেড়ে দিয়ে যখন শহরে ফিরছে, তখন একটা প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপন তার নজরে পড়লো।

**'সুবিখ্যাত উইলিয়ম বাটুলকারের জাপানি সার্কাসপার্টি !**
**আমেরিকা যাওয়ার আগে শেষ রজনী !**
**আশ্চর্য নাকের কসরৎ !**
**দেখবার শেষ সুযোগ কেউ ছাড়বেন না!'**

বিজ্ঞাপন দেখে পাসপার্তু ভাবলে, এরা যখন আমেরিকা যাচ্ছে, তখন কোনোরকমে এদের দলে ভিড়তে পারলে সুবিধেই হবে। একবার চেষ্টা ক'রে দেখা যাক। পাসপার্তু তক্ষুনি সার্কাসপার্টির ঠিকানা জোগাড় ক'রে উইলিয়াম বাটুলকারের কাছে গিয়ে হাজির হ'লো।

বাটুলকার যখন শুনলো যে পাসপার্তু তার সার্কাসের দলে চাকরি করতে চায়, তখন সোজাসুজি জানিয়ে দিলে যে তার যথেষ্ট লোক আছে, আর কোনো নতুন লোকের দরকার নেই। বেগতিক দেখে পাসপার্তু বললে : 'যদি আমি আপনাদের সঙ্গে আমেরিকা যেতে পারতুম, তবে বড্ড উপকার হ'তো।'

বটুলকার শুধোলে : 'তুমি তো জাপানি নও ব'লেই মনে হচ্ছে, তবে এমন পোশাক পরেছো যে ?'

'যার যেমন সাধ্যি, সে তেমনি পোশাক পরে।'

'বেড়ে বলেছো তো ! তোমাকে দেখে তো ফরাশি ব'লেই মনে হচ্ছে।'

'আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন।'

'কেমন ক'রে বিকট বিটকেল মুখভঙ্গি করতে হয় তা তাহ'লে তোমার ভালোই জানা আছে ?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাসপার্তু এ-কথা শুনে চ'টে উঠলো। কিন্তু নিরুপায় হ'য়ে বললে : 'ফরাশিরা যে মুখভঙ্গি করতে পারে এ-কথা কে না জানে? কিন্তু ইয়াংকিদের মতো অমন তাজ্জব মুখভঙ্গি করতে পারে না।'

'ঠিক বলেছো। তা দ্যাখো, তোমাকে আমার সার্কাসের দলে ক্লাউন ক'রে রাখতে পারি। রাজি? আহা-হা, রাগ কোরো না। ফ্রান্সের সার্কাসে তারা অন্য দেশের লোককে ভাঁড় সাজায়, ক্লাউন সাজায়। কিন্তু বিদেশে বেরুলে ফরাশিকেও ক্লাউন সাজতে হয়।'

'এখন তো তা-ই দেখতে পাচ্ছি।'

'গায়ে জোর আছে তো?'

'খেতে পেলেই আমার গায়ে জোর হয়।'

'গান গাইতে জানো?—জানো, বলছো? এ-গান কিন্তু যেমন-তেমন গান নয়—মাটিতে মাথা রেখে পা-দুটো উপরের দিকে তুলতে হবে; বাঁ-পায়ের তলায় ঘুরবে একটা লাটিম আর ডান পায়ে থাকবে একটা তলোয়ার—সেই অবস্থায় গান গাইতে হবে। পারবে?'

'ও-সব কায়দা-টায়দা কিছু-কিছু জানা আছে বৈকি!'

'ঠিক হ্যায়। এ-সব করতে রাজি থাকলে ঢুকে পড়ো আমার দলে।'

তখুনি সার্কাসের দলে চাকরি নিলে পাসপার্তু। আশ্চর্য নাকের কসরৎ দেখবার জন্যে হুড়হুড় ক'রে টিকিট বিক্রি হয়েছে, চারদিক লোকে-লোকারণ্য, মাঝে-মাঝে অর্কেস্ট্রা বাজছে—শিগগিরই সার্কাস শুরু হ'য়ে গেলো।

পৃথিবীর মধ্যে ভালো ম্যাজিশিয়ান ও সার্কাসওয়ালা ব'লে জাপানিদের বেশ সুনাম আছে। কিন্তু সেই জাপানিরাও রকম-বেরকম অদ্ভুত খেলা দেখে যখন বিস্ময়ে হতবাক, তখুনি আশ্চর্য নাকের কসরৎ শুরু হ'য়ে গেলো।

মধ্যযুগোচিত পোশাকে সেজে-গুজে ডানাওয়ালা জনা-কয়েক সার্কাসের লোক স্টেজে এসে দাঁড়ালে। তাদের বড়ো-বড়ো নাক স্টেজে এক অভিনব দৃশ্যের সৃষ্টি করলো : কারু আটহাত লম্বা নাক, কারু-বা চারহাত, কারু-বা পাঁচহাত। সেই নাকগুলোর মধ্যে আবার নানান রঙচঙ মাখানো। নাকগুলো বাঁশের তৈরি। কয়েকজন অদ্ভুত পেশাক-পরা লোক এসে নাকওলাদের নাকের উপর লাফ-ঝাঁপ দিয়ে নানান রকম খেলা দেখাতে লাগলো।

আরো পঞ্চাশজন দীর্ঘনাসা লোক এসে হাজির হ'লো নাকের পিরামিড তৈরি করবার জন্যে। পাসপার্তু ছিলো এই দলে। এভাবে বেদম-দীর্ঘ কোনো নাক লাগাতে ইচ্ছে ছিলো না তার, কিন্তু গত্যন্তর না-দেখে রাজি হ'তে হয়েছিলো। সেই বিরাট নাক নিয়ে ক-জন স্টেজের উপর শুয়ে পড়লো—তাদের নাকের উপর শুলো আবার আরো-কয়েকজন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—এদের নাকের উপরও আবার আর-একদল শুলো। এভাবে সেই নাকের পিরামিড উঠতে লাগলো উঁচুতে। এ-ভাবে উঠতে-উঠতে পিরামিডের চুড়ো স্টেজের শামিয়ানা ছুঁলো। দর্শকরা তো আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে ঘন-ঘন হাততালি দিতে লাগলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে তীব্র চনমনে শব্দে বেজে উঠলো অর্কেস্ট্রা।

হঠাৎ সবাই সচমকে তাকিয়ে দেখলে, সেই নাকের পিরামিড কেঁপে উঠছে। দেখা গেলো সব-নিচের দলের একজনের নাক গেলো খুলে। অমনি সেই পিরামিড ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেলো—সার্কাসের লোকরা কে কোথায় ছিটকে পড়লো কে জানে।

বিভ্রাটটা ঘটলো কিন্তু পাসপার্তুর দোষেই। হুড়মুড় ক'রে সেই গণ্ডগোলের মধ্যে থেকে কোনোরকমে বেরিয়ে এসে পাসপার্তু একলাফে ফুট-লাইট পেরিয়ে দৌড়ে গিয়ে দর্শকদের মধ্যে একজনের পায়ের কাছে ব'সে পড়লো। রুদ্ধস্বরে বললে : 'মাপ করুন, মাপ করুন আমায়!'

'এ কী, পাসপার্তু যে!'

'হ্যাঁ, আমি।'

'যাও, এখুনি জাহাজে গিয়ে ওঠো।'

পাসপর্তু তখনই ফিলিয়াস ফগ ও আউদার সঙ্গে থিয়েটার ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

ফটকের কাছেই দাঁড়িয়েছিলো সার্কাসের মালিক বাটুলকার। রাগে, আক্রোশে ফুঁশছিলো সে। এভাবে পিরামিড ভেঙে দেবার জন্যে পাসপার্তুকে আটকে তার কাছে ক্ষতিপূরণ চাইলে সে। ফিলিয়াস ফগ দ্বিরুক্তি না-ক'রে বাটুলকারের সামনে একতাড়া নোট ফেলে তখুনি সেখান থেকে বেরিয়ে আমেরিকাগামী ডাক-জাহাজ *এস. এস. জেনারেল গ্রাণ্ট* গিয়ে উঠলেন।

...শাংহাই বন্দরে কী ঘটেছিলো পাঠক নিঃসন্দেহে তা সহজেই অনুমান করতে পেরেছেন। *তংকাদিরির* কামানের শব্দ শুনে ডাকজাহাজ তার কাছে এসেছিলো, অমনি ফিলিয়াস ফগ আউদা ও ফিক্সকে নিয়ে ডাক-জাহাজে ওঠেন, আর চোদ্দই নভেম্বর পৌঁছোন ইয়োকোহামা।

ইয়োকোহামায় পৌঁছেই *কর্নাটিক* জাহাজে খবর নিয়ে শোনা গেলো, জাঁ পাসপার্তু ব'লে এক ফরাশি সেই জাহাজেই ইয়োকোহামা এসেছে। সেদিন রাত্রেই ফগের সান-ফ্রান্সিসকো রওনা হওয়ার কথা। ফগ ইয়োকোহামার কন্সাল আপিশে গিয়ে পাসপার্তুর খোঁজ নিলেন। হঠাৎ-যদি দেখা হ'য়ে যায়, সে-জন্যে অনেক ঘুরলেন শহরের রাস্তায়-রাস্তায়। অনেক খোঁজ ক'রেও যখন তার কোনো খোঁজ পাওয়া গেলো না, তখন জাহাজে ফেরবার পথে সার্কাসের তাঁবুর সামনে গিশগিশে ভিড় দেখে সার্কাস দেখতে ভিতরে ঢুকলেন। পাসপার্তু যে সার্কাসের দলে ভিড়ে বসতে পারে ফগ স্বপ্নেও তা ভাবেননি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর খেলা দেখতে-দেখতে অদূরে দর্শকদের মধ্যে ফগ ও আউদাকে দেখে পাসপার্তু চঞ্চল হ'য়ে উঠে কী-কাণ্ডই যে ক'রে বসলো, তা পাঠক আগেই জেনেছেন।...

...আউদার কাছ থেকে ফগের সমুদ্র-পাড়ির কাহিনী শুনলো পাসপার্তু। আরো শুনলো যে, ফিক্স নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোকও ফগের সঙ্গে *তংকাদিরিতে* চেপে ইয়োকোহামা এসেছেন। ফিক্সের নাম শুনে বিন্দুমাত্র চঞ্চল হ'লো না পাসপার্তু। ভাবলে, যথাসময়ে একবার বাগে পেলে ফিক্সকে সে উচিতশিক্ষা দেবে, আর তখনই তার ভিতরের কথা ফাঁস ক'রে দেবে। নিজের কথা বলবার সময় সে সব গোপন ক'রে গিয়ে বললে যে, চণ্ড খেয়ে অচৈতন্য হ'য়ে পড়েছিলো ব'লেই তার এত দুর্দশা ঘটেছে। ফগ সব দেখেশুনে তাকে জামা-কাপড় কেনবার জন্যে কিছু টাকা দিয়ে দিলেন।

বলা বাহুল্য, ফিক্সও *জেনারেল গ্রাণ্ট* জাহাজে ছিলেন। ইয়োকোহামা পৌঁছেই তিনি দেখতে পেলেন তাঁর সেই প্রত্যাশিত ওয়ারেন্ট বিলেত থেকে এসেছে। কিন্তু তার জোরে ফগকে ধরবার কোনো উপায়ই ছিলো না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক্তিয়ারের বাইরে আসামীকে ধরতে হ'লে স্পেশ্যাল ওয়ারেন্টের দরকার—কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থা করবার সময়ও তখন আর ছিলো না। ফিক্স ভাবলেন, 'যা-হোক, ওয়ারেন্ট তো পাওয়া গেলো—এখানে আর ওকে পাকড়ানো গেলো না বটে, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে যাওয়ামাত্রই ধরবো। তখন তাকে কে বাঁচাতে পারে দেখবো। এখন ফগ যাতে শিগগির বিলেত পৌঁছুতে পারে তারই ব্যবস্থা করতে হবে।' এমনি সময় পাসপার্তুকে দেখতে পেয়ে বিষম ভয় পেয়ে নিজের ক্যাবিনে প্রস্থান করলেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই রাত্রিতেই তাঁকে পাসপার্তুর কাছে এনে হাজির করলে।

তাঁকে দেখেই পাসপার্তুর মাথায় খুন চেপে গেলো। কোনো কথা না-ব'লে পাসপার্তু সটান তাঁকে অনেকগুলো ঘুসি কষিয়ে দিলে। ফিক্স জাহাজের ডেকের উপর ছিটকে পড়লেন। নাবিক ও যাত্রীদের মধ্যে অনেক চারদিকে দাঁড়িয়ে হো-হো ক'রে হাসতে লাগলো। ফিক্স তখন কাতর কণ্ঠে বললেন : 'আর কেন, পাসপার্তু, ঢের হয়েছে।'

তখন পাসপার্তু তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললে : 'হ্যাঁ, আপাতত যৎকিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যম হয়েছে বটে।'

'এসো তবে, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।' ফিক্স বললেন, 'আমি এখন যা বলবো তা ফিলিয়াস ফগের ভালোর জন্যেই।'

জাহাজের এককোণে পাসপার্তুকে ডেকে নিয়ে ফিক্স বলতে লাগলেন : 'তুমি আমার উপর একহাত নিয়ে নিয়েছো, বেশ করেছো। এমনধারা যে হবে, তা আমার জানাই ছিলো। গোয়েন্দাদের কাজই এমন যে সময়-অসময়ে বেধড়ক মার খেতে হয়। কিন্তু আমার কথাগুলো একবার মন দিয়ে শোনো। এতদিন পর্যন্ত আমি ওঁর বিপক্ষে ছিলুম



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এখন থেকে ওঁর প্রাণের বন্ধু—যদিও আমার এখনও দৃঢ়বিশ্বাস যে উনিই দস্যু। আরে, অত উত্তেজিত হ'য়ে উঠো না। যা বলি, শোনো। যতদিন ফগ ব্রিটিশ এলাকায় ছিলেন, ততদিন আমি ওঁকে অ্যারেস্ট করতে অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু এখানে ওঁকে কোনোরকমেই গ্রেপ্তার করতে পারবো না। মনে হচ্ছে, ফগ এখন বিলেতে ফিরবেন। আমিও ফেউয়ের মতো তাঁর অনুসরণ করবো। তিনি যাতে নির্বিঘ্নে বিলেতে যেতে পারেন, আমাকে এখন সে-চেষ্টাই করতে হবে। বিলেতেই জানা যাবে ফগ দোষী কি নির্দোষ। ততদিন তোমার মতো আমিও তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী।'

ফিক্স এমনভাবে কথাগুলো বললেন যে পাসপার্তুর কতকটা বিশ্বাস হ'লো।

ফিক্স শুধোলেন : 'কেমন ? তবে আমরা আজ থেকে বন্ধু।'

'বন্ধু ? ককখনো না।' চেঁচিয়ে উঠলো পাসপার্তু। 'তবে আমরা দুজনেই আজ থেকে ফগের শুভাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু এ-কথা মনে রাখবেন, যে-মুহূর্তে দেখবো আপনি তাঁর অনিষ্ট করবার চেষ্টা করছেন, সেই মুহূর্তেই আপনাকে আমি ছিঁড়ে ফেলবো ! এ-কথা যেন মনে থাকে।'

'তা-ই হবে'—ব'লে ফিক্স বিদায় নিয়ে নিজের ক্যাবিনে ফিরে গেলেন।

*এস. এস. জেনারেল গ্রাণ্ট* খুবই দ্রুতগামী জাহাজ ছিলো। ফগ হিশেব ক'রে দেখলেন যে, তিনি দোসরা ডিসেম্বর সান-ফ্রান্সিসকো, এগারোই নিউ-ইয়র্ক, আর বিশ তারিখে লণ্ডন পৌঁছুতে পারবেন।

অবহাওয়া চমৎকার ছিলো ব'লে *জেনারেল গ্রাণ্ট* দ্রুতবেগে সান-ফ্রান্সিসকোর দিকে এগিয়ে চললো। বলবার মতো বিশেষ কিছুই জাহাজে ঘটলো না। যা-কিছু ঘটছিলো, তা সবই ঘটছিলো আউদার মনে।

ক্রমশই ফগের দিকে আউদার হৃদয় আকৃষ্ট হচ্ছিলো। সে-আকর্ষণের কারণ শুধু কৃতজ্ঞতা ব'লে নির্দেশ করলে অবশ্য মস্ত ভুল করা হবে।

দশ

## ইয়াংকিদের হালচাল

যথাসময়ে *জেনারেল গ্রাণ্ট* সান-ফ্রান্সিসকোয় এসে নোঙর ফেললো। তখন সকাল। ফগ আমেরিকার মাটিতে পদার্পণ ক'রেই শুনলেন নিউ-ইয়র্কের ট্রেন সন্ধ্যার সময় ছাড়বে। তাঁরা একটা হোটেলে গিয়ে উঠলেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোটেলটায় কোনো জিনিশেরই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভাব ছিলো না। প্রাতরাশের পর ফিলিয়াস ফগ আউদাকে নিয়ে ইংরেজ কন্সালের আপিশে গেলেন পাসপোর্টে সই করিয়ে নিতে।

পাসপার্তু বললে : 'শুনেছি আমেরিকার রেলপথে ঠগ-জোচ্চোর দস্যু-ডাকাতের বড়ো ভয়। তারা চলতি ট্রেনে উঠেই লুঠ-তরাজ করে। গোটাকতক রিভলভার কিনে নিলে হয় না?'

ফগ বললেন : 'ইচ্ছে হয় তো কিনতে পারো। তবে পথে হয়তো সে-সবের কোনো দরকারই হবে না।'

রাস্তায় হঠাৎ ফগের সঙ্গে ফিক্সের মুখোমুখি দেখা হ'য়ে গেলো। তাঁকে দেখেই ফগ বললেন : 'আশ্চর্য! আমরা এক জাহাজেই এসেছি, অথচ আপনার সঙ্গে জাহাজে একবারও দেখা হয়নি!'

ফিক্স আগের কথা উল্লেখ ক'রে ফগকে যারপরনেই কৃতজ্ঞতা জানালেন। বললেন : 'আপনার সঙ্গে ভ্রমণ করা রীতিমতো সৌভাগ্যের কথা। আমিও কাজের খাতিরে ইওরোপেই যাচ্ছি। আপনার আপত্তি না-থাকলে আমরা বাকি রাস্তাটা একসঙ্গেই যেতে পারি।'

'সে-কী কথা! আপনার সঙ্গে ভ্রমণ করা তো আমারই সৌভাগ্যের বিষয়। বেশ-তো, আমরা না-হয় একসঙ্গেই ইওরোপ যাবো।'

ফিক্সের মৎলব সিদ্ধ হ'লো।

মানগোমারি স্ট্রিট দিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা। সামনেই দেখলেন লোকে লোকারণ্য। সেই জনারণ্য ভেদ ক'রে সামনে এগুনো অসম্ভব। সেখানে কেউ-বা চীৎকার করছে, কেউ-বা বড়ো-বড়ো পোস্টার নিয়ে ছুটোছুটি করছে, কোথাও উড়ছে ঝাণ্ডা, কোথাও-বা অনেকে চেঁচিয়ে উঠছে, 'ক্যামেরফিল্ড জিন্দাবাদ', কেউ-বা বলছে, 'মভিবয় জিন্দাবাদ।'

ফিক্সের মনে হ'লো এ নিশ্চয়ই কোনো রাজনৈতিক সভা। তাই তিনি বললেন : 'আসুন, আমরা চটপট এখান থেকে স'রে পড়ি। এখানে দাঁড়ালে বিপদ ঘটতে পারে। ইয়াংকিদের কোনো বিশ্বাস নেই।'

ফগও সায় দিলেন তাঁর কথায়। কিন্তু তখন অন্যদিকে যাওয়ার আর-কোনো উপায় ছিলো না। রাস্তার এককিনারে স'রে এসে তাঁরা সেখান থেকে কেটে পড়বার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। চারদিক দেখে-শুনে ফগ ভাবলেন, হয়তো আমেরিকার ন্যাশনাল কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচন, নয়তো কোনো প্রাদেশিক শাসনকর্তা মনোনয়নের জন্যেই এই সভা ডাকা হয়েছে।

ক্রমশই কোলাহল বেড়ে উঠছিলো বটে, কিন্তু হঠাৎ যে ধুমধাড়াক্কা দাঙ্গা শুরু হ'য়ে যেতে পারে কেউই সে-কথা ভাবতে পারেননি। দেখতে-দেখতে সেই জনারণ্যের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোলাহল গেলো বেড়ে, শুরু হ'লো ঘুসোঘুসি, লাঠালাঠি। রিভলভারের শব্দও কানে এলো। দাঙ্গা ক্রমশ গুরুতর আকার ধারণ করলো দেখে তাঁরা স'রে পড়বার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় এক সবলদেহ ইয়াংকি ফগের মাথা লক্ষ্য ক'রে লাঠি ওঠালে। ফিক্স যদি নিজের দেহে সে আঘাত না-নিতেন, তাহ'লে হয়তো ফিলিয়াস ফগ সাংঘাতিক আহত হতেন। লাঠির ঘায়ে ফিক্সের টুপি চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে গেলো।

অসহ্য ঘৃণায় ফেটে পড়লেন ফিলিয়াস ফগ : 'কী নীচ এই ইয়াংকিটা!'

লাল দাড়িতে হাত বুলিয়ে তাগড়াই সেই মার্কিন বললে : 'ওরে ইংরেজ, মনে থাকে যেন আবার আমাদের দেখা হবে!'

'ঠিক হ্যায়! যখন-ইচ্ছে তখনই তোমার সঙ্গে মোলাকাত করতে রাজি।'

'তোমার নাম কী?'

'ফিলিয়াস ফগ। তোমার?'

'কর্নেল স্ট্যাম্প প্রক্টর।'

উন্মাদ জনারণ্যের কোলাহলে ও ধাক্কাধাক্কিতে কর্নেল প্রক্টরের সঙ্গে ফগের ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেলো তখনকার মতো।

কী ক'রে যে আউদাকে নিয়ে ফগ আর ফিক্স হোটেলে জীবন্ত ফিরতে পারলেন, তা তাঁরা নিজেরাই জানেন না। পোশাক-আশাকের যে-দুর্দশা হয়েছিলো তাতে হোটেলে ফিরে সকলকেই নতুন জামাকপড় কিনতে হ'লো।

পাসপার্তু আগেই বারোটা অটোমেটিক রিভলভার ও প্রচুর কার্তুজ নিয়ে হোটেলে ফিরেছিলো। ফিক্সকে দেখেই তার ভুরু কুঁচকে গেলো। কিন্তু সে যখন শুনলো যে তাঁর জন্যেই ফগ আহত হ'তে-হ'তে বেঁচে গেছেন, তখন সে কথঞ্চিৎ শান্ত হ'লো। দেখলো যে ফিক্স তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করেছেন।

সান্ধ্যভোজন শেষ ক'রে সবাই স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠলেন। ট্রেনে উঠতে-উঠতে ফগ বললেন : 'সেই ইয়াংকিটার সঙ্গে আর দেখা হ'লো না। ইংরেজকে অপমান করার প্রতিশোধ নিতে আবার একদিন তার খোঁজে আমাকে এই নচ্ছার দেশে আসতে হবে।'

এ-কথা শুনে ফিক্স কিন্তু মনে-মনে হেসেই কুটিপাটি। ভাবলেন, 'একবার ইংল্যাণ্ডে গেলে হয়, তারপর আর তোমাকে ফিরতে হবে না বাছাধন! আমি নইলে সঙ্গে আছি কেন?'

স্টেশনের একটি লোককে দেখে ফগ শুধোলেন : 'আজ অত গোলমাল হ'লো কীসের?'

'একটা সভা হচ্ছিলো।'

'কোনো সেনাপতি মনোনীত হচ্ছিলেন বুঝি?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। 'না, না সেনাপতি নির্বাচন! ও কি আর যে-সে কথা! এ-সভায় একজন সাধারণ বিচারক মনোনীত হচ্ছিলেন।'

আর-কোনো কথাই জিগেস করা গেলো না। ট্রেন ছেড়ে দিলো।

নিউ-ইয়র্ক থেকে সান-ফ্রান্সিসকো পর্যন্ত রেল-লাইন তিন হাজার সাতশো ছিয়াশি মাইল লম্বা। এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে একদা কম ক'রেও ছ-মাস লাগতো—সেই ছ-মাসের পথ এখন একহপ্তায় দাঁড়িয়েছে।

যে-ট্রেনে ফগরা উঠলেন, সেই ট্রেনে ড্রয়িং-রুম, স্মোকিং-রুম, খাবার-ঘর সবকিছুই ছিলো। চলতি ট্রেনেই এক-কামরা থেকে অন্য-কামরায় যাওয়া যেতো। বই-পত্র, খাবার-দাবার কোনো-কিছুরই অভাব ছিলো না ট্রেনে। সঙ্গে-সঙ্গে একটা ছোট্ট প্রেসও ছিলো। সেই প্রেসে ছাপা হ'য়ে খবরের কাগজ পর্যন্ত বেরুতো। ট্রেনের সীটগুলো এমন কৌশলে তৈরি ছিলো যে, স্প্রিং টিপলেই তার পিছনের অংশ খুলে আসতো, বেরিয়ে পড়তো চমৎকার বিছানা—ধবধবে ও নরম। যে-গাড়িতে যতগুলো বিছানা, সেই গাড়িতে তার চেয়ে বেশি যাত্রী থাকবার নিয়ম ছিলো না।

কয়েক দিন ধ'রে নির্বিঘ্নেই ট্রেন চললো। সাতুই ডিসেম্বর ভোরবেলা গ্রীন-রিভার স্টেশনে এসে ট্রেন থামলো। গত রাত্রে প্রচুর বরফ পড়েছিলো, তার জের সকালবেলাতেও কাটেনি। পাসপার্তু ঠাণ্ডায় কাঁপতে-কাঁপতে ভাবছিলো, 'এ-সময়েও লোকে দেশ-ভ্রমণে বেরোয়! আর-একটু বরফ পড়লেই তো ট্রেন আর চলতে পারতো না!'

ট্রেন থামবার সঙ্গে-সঙ্গে অনেকেই নামলো। হঠাৎ আউদা এক ভদ্রলোককে দেখে ভয়ে আঁৎকে উঠলেন। ভদ্রলোক আর-কেউ নন—সেই কর্নেল প্রক্টর, যিনি 'আবার দেখা হবে' ব'লে ফিলিয়াস ফগকে শাসিয়েছিলেন। ফগ তখনও ঘুমোচ্ছিলেন। কর্নেলকে দেখে বিপদের আশঙ্কায় আউদার মন এতই বিচলিত হ'য়ে পড়লো যে তিনি ফিক্স আর পাসপার্তুকে কর্নেলের কথা খুলে বললেন।

ফিক্স বললেন : 'কোনো ভয় নেই আপনার, কিচ্ছু ভাববেন না। কর্নেলকে সব-আগে আমার সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে হবে। আমিই তো তাঁর হাতে বেশি অপমানিত হয়েছি।'

পাসপার্তুও দাঁত কিড়মিড় ক'রে বললে : 'ও-সব কর্নেল-টর্নেলকে থোড়াই কেয়ার করি আমি! আমার সঙ্গেও তার অল্প-বিস্তর হিশেব-নিকেশ আছে।'

এদের এইসব তড়পানি শুনেও শান্ত হ'তে পারলেন না আউদা। বললেন : 'মিস্টার ফিক্স, আপনি কি জানেন না যে মিস্টার ফগ কিছুতেই তাঁর নিজের দায় বা কলহ অন্য-কারু ঘাড়ে নিতে দেবেন না! তিনিই তো বলেছেন যে তাঁকে অপমান করেছে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্যে আবার আমেরিকায় আসবেন। তাঁর সঙ্গে কর্নেলের যদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনই দেখা হয়, না-জানি কী-একটা বিষম কাণ্ড ঘটবে। দু-জনের মধ্যে যাতে দেখা না-হয়, আপনারা বরং তারই ব্যবস্থা করুন। না-হ'লে অনর্থ হবে!'

ফিক্স বললেন : 'আপনার কথাই ঠিক। দেখা হ'লেই সব পণ্ড হ'য়ে যাবে। মিস্টার ফগ বাজি জিততে পারুন আর না-পারুন, তাঁর দেরি হ'লে—'

ইশারায় তাঁকে চুপ করতে ব'লে পাসপার্তু বললে : 'তাঁর দেরি হ'লে রিফর্ম ক্লাবের একটা মস্ত সুবিধে জুটে গেলো আর-কি! নিউ-ইয়র্ক যেতে এখনও আমাদের চারদিন বাকি। যদি মিস্টার ফগ এর মধ্যে গাড়ি থেকে না-নামেন, তাহ'লেই কর্নেলের সঙ্গে তাঁর আর দেখা হবে না। যে-ক'রেই হোক, তাঁদের যাতে দেখা না-হয়, সে ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে।'

এমন সময় ফগের ঘুম ভাঙলো দেখে সবাই চুপ ক'রে গেলেন। শুধু ফিক্স নিচুগলায় পাসপার্তুকে বললেন : 'মিস্টার ফগকে জিয়ন্ত বিলেতে নিয়ে যেতে যা-কিছু করা সম্ভব, আমি তা-ই করবো।'

ফগ যাতে গাড়ি থেকে না-নামেন তারই ব্যবস্থা করবার জন্যে ফিক্স তাঁকে বললেন : 'সময় যেন আর কাটতেই চায় না। একটু হুইস্ট খেললে মন্দ হ'তো না।'

ফগ বললেন : 'খেলার সঙ্গী আর তাশ পাওয়া গেলে সত্যিই বেশ হ'তো।'

'তাশ তো এখুনি আনতে পারা যায়। ট্রেনেই কিনতে পাওয়া যাবে। আর খেলার সঙ্গী? যদি মিসেস আউদা খেলেন—'

আউদা বললেন : 'আমি অল্পস্বল্প জানি।'

'আমিও একটু খেলতে পারি।'

ফগ খুশি হ'য়ে বললেন : 'বেশ-তো।'

পাসপার্তু তক্ষুনি গিয়ে কয়েক প্যাকেট তাশ কিনে আনলো।

ট্রেন নির্বিবাদে এগিয়ে চলো। ফগ নিশ্চিন্ত মনে হুইস্ট খেলতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফগ খেলায় এত জ'মে গেলেন যে, পথের মধ্যে হঠাৎ-যখন ট্রেন থেমে গেলো, সেদিকে খেয়ালও করলেন না।

হাতে কোনো কাজ ছিলো না ব'লে পথের মধ্যে হঠাৎ কেন ট্রেন থেমে গেলো, সে-খবর নেবার জন্যে পাসপার্তু গাড়ি থেকে নামলে। অনেকেই ট্রেনের গার্ডকে ঘিরে ধ'রে নানান প্রশ্ন করছিলো। কর্নেল প্রস্টরও ছিলেন এদের মধ্যে।

মেডিসিন-বো স্টেশনের স্টেশন-মাস্টার একটি লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছিলেন যে, সামনের একটা সেতু নিরাপদ নয়, কী-রকম যেন নড়বোড়ে হ'য়ে আছে; তার উপর দিয়ে ট্রেন চলতে পারবে না। গার্ড বললে যে, এই খবর পেয়েই সে গাড়ি থামিয়েছে। ট্রেনটা যেখানে থেমেছিলো, তার মাইল-খানেক দূরে ছিলো ব্রিজটা। ব্রিজটার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তলা দিয়ে একটা পাহাড়ি নদী তীব্রবেগে ছুটে চলেছিলো। জানা গেলো, ব্রিজটার কয়েকটা বীম ভেঙে গেছে ব'লেই অমন নড়বোড়ে হ'য়ে আছে।

খবর শুনে পাসপার্তুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। ফগকে এই দুঃসংবাদ দেয়ার সাহস আর তার হ'লো না। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে সে আরোহীদের আলোচনা শুনতে লাগলো।

কর্নেল প্রক্টর বললেন : 'বাঃ ! বেড়ে মজা দেখছি ! আমরা কি তবে এই বরফের মধ্যে অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকবো নাকি?'

গার্ড জবাব দিলে : 'না, আমি আরেকটা ট্রেনের জন্যে ওমাহা স্টেশনে তার পাঠিয়েছি। কিন্তু ছ-ঘণ্টার আছে সে-গাড়ি মেডিসিন-বো স্টেশনে আসতে পারবে না। এদিকে একমাইল পথ হ'লেও ছ-ঘণ্টার আগে হেঁটেও যাওয়া যাবে না। নদী পার হ'তে হবে তো। নৌকোয় পার হওয়া এখন অসম্ভব। পাহাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। নদী এত ফুঁসে উঠেছে যে নৌকোর সাধ্যি নেই সাঁকোর কাছে নদী পার হয়। পার হবার একটাই ঘাট আছে। সে আবার দশমাইল দূরে।'

যাত্রীদের মধ্যে তখন একটা বিষম শোরগোল উঠলো। ফগ যদি খেলায় মেতে না-থাকতেন, তবে তিনিও নিশ্চয়ই গাড়ি থেকে নেমে খবর নিতেন এত হৈ-চৈ কীসের।

ড্রাইভার তখন বললে : 'একটা উপায় অবিশ্যি আছে—একবার চেষ্টা ক'রে দেখলে হয়। হ্যাঁ, সাঁকো পেরুবার কথাই বলছি।'

'ট্রেনখানা সমেত নাকি ?'

'হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছি।'

গার্ড বললে : 'পাগল হয়েছো ? সাঁকো যে ভেঙে গেছে !'

'তা ভাঙলোই বা, প'ড়ে তো আর যায়নি। গোটা-দুই থাম ভেঙেছে মাত্র। আমি যদি খুব স্পীডে গাড়ি চালিয়ে দিই, তবে পলক ফেলতে-না-ফেলতে ট্রেন নিয়েই সাঁকো পেরিয়ে যেতে পারবো।'

ড্রাইভারের কথা শুনে তো পাসপার্তুর আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া। কিন্তু কথাটা অনেকেরই মনে ধরলো।

কর্নেল প্রক্টর বললেন : 'এ আর বেশি কথা কী। এ-তো হ'তেই পারে। এখানে তো তবু সাঁকোটা দাঁড়িয়ে আছে, ভেঙে পড়েনি। আমি এক ড্রাইভারকে জানি, যে বিনা সাঁকোতেই একবার একটা ছোটো নদী পার ক'রে ট্রেন নিয়ে গিয়েছিলো। সে তখন কী সাংঘাতিক স্পীডেই যে গাড়ি চালিয়েছিলো, তা আর বলা যায় না। গোটা ট্রেনখানা লাইন থেকে যেন লাফিয়ে উঠে নদী পেরিয়ে গেলো। আমাদের ট্রেন তো তবু সাঁকোর উপর দিয়েই যাবে।'

এ-কথা শুনে অনেকেই ড্রাইভারের পক্ষ সমর্থন করলো। একজন বললে : 'আমরা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে নির্বিঘ্নে যেতে পারবো, তার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা।'

আর-একজন অমনি ব'লে উঠলো : 'পঞ্চাশ ভাগ কী-হে—ষাট ভাগ!'

কর্নেল প্রক্টর বললেন : 'তোমাদের কোনো আন্দাজ নেই! যেখানে আশি-নব্বুই ভাগ সম্ভাবনা সেখানে ষাট ভাগ বলছো।'

ইয়াংকিদের হালচাল দেখে পাসপার্তুর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'লো। এমন সময় একটু-নিরাপদ একটা উপায় তার মনে এলো। সে বললো : 'আমি বলছিলুম কী এই বিপজ্জনক—'

তার কথা কেড়ে নিয়ে একটি লোক বললে : 'পার হবার আশি ভাগ সম্ভাবনা যেখানে দেখা গেলো, তা আবার বিপজ্জনক কী-হে ? ড্রাইভার নিজেই তো বলছে যে সে যেতে পারবে।'

'তা পারতে পারে। কিন্তু আমি যা বলছিলুম সেইটেই বোধহয় ঠিক হ'তো।'

*'ঠিক!'* কর্নেল প্রক্টর রেগে উঠলেন। 'ঠিক আবার কী! তুমি কি বুঝতে পারছো না যে আমরা ফুল-স্পীডে চালিয়ে যাবো ? শুনলে ? *ফুল-স্পীডে।*' তারপর বিদ্রূপে ফেটে পড়লেন—

'কী-হে ছোকরা, ভয় পেয়েছো নাকি ?'

'ভয় ? ভয় কাকে বলে পাসপার্তু জানে না!'

গার্ড বললে : 'উঠুন, উঠুন—সবাই গাড়িতে উঠুন। গাড়ি এখুনি ছাড়বে।'

পাসপার্তু নিচুগলায় বললে : 'তা না-হয় উঠছি। কিন্তু যাত্রীরা হেঁটে সাঁকো পেরুলে পর গাড়িটা সাঁকোর উপর তুললে ভালো হ'তো।' কিন্তু তার যুক্তি কেউ শুনতেই চাইলো না—শুনলেও মানতে চাইতো কি না সন্দেহ।

সবাই গাড়িতে গিয়ে উঠলো। ফগ তখনও একমনে হুইস্ট খেলছিলেন। ড্রাইভার সিটি দিয়ে ট্রেনখানি একমাইল পেছনে নিয়ে গেলো। সেখান থেকে এগুলো প্রচণ্ড বেগে, ঝড়ের বেগে। ঘণ্টায় একশো মাইলের কম হবে না সে-স্পীড। ট্রেন যেন রেললাইন না-ছুঁয়েই ছুটলো।

বিদ্যুৎ যেমন ক'রে চক্ষের পলকে আকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত স্পর্শ করে, ট্রেনটাও তেমনি নিমেষের মধ্যে সাঁকো পেরিয়ে গেলো। সবাই তাকিয়ে দেখলো, সাঁকোটা টুকরো-টুকরো হ'য়ে প'ড়ে যাচ্ছে নদীতে।

ট্রেন এগিয়ে চললো।...

ট্রেনে তিনদিন তিনরাত কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে তেরোশো বিরাশি মাইল পেরিয়ে এসেছে ট্রেন। ইভান্স-পাস স্টেশন ছাড়িয়ে সন্ধের পর ট্রেন ক্রমশ নিচের দিকে ছুটে চললো।...



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকালবেলা ফগ হুইস্ট খেলতে শুরু করলেন। ফিক্সও হুইস্টে রীতিমতো ওস্তাদ। অল্পক্ষণের মধ্যেই খেলা জ'মে উঠলো। সেবার ফগের পালা। যেই ফগ একটা চিড়েতন খেলতে যাবেন, অমনি কে যেন পিছন থেকে ব'লে উঠলো : 'আমি হ'লে হরতন খেলতুম।' সবাই চমকে পিছনে তাকিয়ে দেখলো, পিছনে কর্নেল প্রক্টর। ফগকে দেখেই কর্নেল বললেন : 'ও আপনিই আমার সেই পুরোনো ইংরেজ-বন্ধু। তা-ই তো বলি, ইংরেজ না-হ'লে গর্দভের মতো চিঁড়েতন খেলে কে?'

'ঠিক তা-ই। দেখুন-না, আমিও খেলছি তা-ই।' ফগ তাশ দিলেন।

তাশটা তুলে নেয়ার চেষ্টা করতে-করতে দুঃসহ স্পর্ধায় কর্নেল বললেন : আমি হরতন খেলতে চাই। আপনি হুইস্ট খেলার কিছুই জানেন না দেখছি।'

ফগ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। 'অন্যেও যেমন জানে, আমিও তেমনি জানি।'

বিদ্রূপে ফেটে পড়লেন কর্নেল। 'বেশ-তো। একহাত হ'য়ে যাক না!'

ব্যাপার দেখে আউদার মুখ পাঁশুটে হ'য়ে গেলো। ফগের হাত ধ'রে তাঁকে টেনে বসালেন আউদা। পাসপার্তু রাগে যেভাবে ফুঁসে উঠলো, তাতে মনে হ'লো সে বুঝি এক্ষুনি কর্নেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে!

ফগকে লক্ষ্য ক'রে ফিক্স কিন্তু তক্ষুনি বললেন : 'আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে এঁর সঙ্গে আমাকেই আগে হিশেব-নিকেশ করতে হবে—'

ফগ শান্তগলায় বললেন : 'মাপ করবেন, বোঝাপড়াটা আগে আমার সঙ্গেই হবে। কী ক'রে হুইস্ট খেলতে হয় তা আমি জানিনে, এ-কথা ব'লে কর্নেল আমাকে অত্যন্ত অপমানিত করেছেন। তিনি নিশ্চয়ই তার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দেবেন।'

তীব্র কণ্ঠ কর্নেল বললেন : 'কৈফিয়ৎ? যেখানে-খুশি, যখন-ইচ্ছে, যেমন-ক'রে চান—তা-ই পাবেন!'

ট্রেন তখন একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিলো। আউদা, ফিক্স ও পাসপার্তুর কোনো কথা না-শুনেই ফগ গাড়ি থেকে নামলেন। কর্নেলও তাঁর অনুসরণ করলেন।

প্ল্যাটফর্মে নেমে ফগ নম্রস্বরে বললেন : 'দেখুন কর্নেল, তাড়াতাড়ি ইওরোপে ফিরে-যাওয়া আমার বিশেষ দরকার। এখানে দেরি হ'লে আমার খুব লোকশান হবে।'

কর্নেল বললেন : 'তাতে আমার কী?'

ফগ আগের মতোই নরমগলায় বললেন : 'সান-ফ্রান্সিসকোতে আপনার সঙ্গে কলহ হবার পর আমি শপথ করেছিলুম আমার ইংল্যাণ্ডের কাজ শেষ হ'লেই আমি আপনার খোঁজে আবার আমেরিকায় ফিরে আসবো।'

তীব্র ব্যঙ্গে ফেটে পড়লেন কর্নেল। *'বটে!'*

'আজ থেকে ছ-মাস পরে আপনার সঙ্গে দেখা হবে কি?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ছ-মাস কেন, ছ-বছরই বলুন না!'

'আমি ছ-মাসের কথা বলছি। ছ-মাস পরে আমি ঠিক এখানে এসে হাজির হবো।'

কর্নেল চেঁচিয়ে উঠলেন : 'পাগল, না খ্যাপা? আমার কথাই হ'লো, *নাউ অর নেভার।*'

'বেশ, তা-ই হবে তাহ'লে। আপনি কি নিউ-ইয়র্কে যাচ্ছেন?'

'আমি যেখানেই যাই না কেন, আপনার তাতে কী। এর পরের স্টেশনের নাম হ'লো প্লামফ্রিক। গাড়ি সেখানে দশমিনিট দাঁড়াবে। গোটাকতক বন্দুকের গুলি চালাতে সেখানে আর কতটুকু সময়ই বা লাগবে?'

'সে-ই ভালো। তবে আমি প্লামফ্রিকেই নামবো।'

কর্নেল স্পর্ধা ক'রে বললেন, 'সেখান থেকে আর উঠতে হবে না!'

ধীরভাবে গাড়িতে উঠতে-উঠতে ফগ বললেন : 'কে জানে কী হবে?'

গাড়ি ছেড়ে দিলো। আউদাকে আশ্বস্ত ক'রে ফগ বললেন : 'যারা মুখে বেশি তড়পায়, তাদের কাছে আবার ভয় কী? মিস্টার ফিক্স, এই ডুয়েলে আপনি বোধহয় আমাকে সেকেণ্ড করবেন?'

ফিক্স রাজি হলেন। ফগ আবার নির্বিকারভাবে হুইস্ট খেলা শুরু করলেন। একটু বাদেই যে তাঁকে প্রাণঘাতী ডুয়েল লড়তে হবে, সেজন্যে উদ্বেগের কোনো চিহ্নই ফগের মুখে দেখা গেলো না।

এগারোটার সময় ট্রেনের বাঁশি শুনে বোঝা গেলো প্লামফ্রিক স্টেশন এসে গেছে। ফগ উঠে দাঁড়ালেন। পাসপার্তু আর ফিক্স রিভলভার নিয়ে তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। ফ্যাকাশে মুখে আউদা মড়ার মতো আসনেই ব'সে রইলেন।

পরমুহূর্তেই পাশেই কামরার পা-দানিতে দেখা গেলো কর্নেল প্রস্টরকে। অন্য কে-একজন আমেরিকান তাঁর দোসর হয়েছিলো। সবাই ট্রেন থেকে নামবার উদ্যোগ করতেই গার্ড বারণ করলো : 'নামবেন না আপনারা। গাড়ি কুড়ি মিনিট পেছিয়ে পড়েছে। আমি এখানে আর দাঁড়াবো না।'

ফগকে দেখিয়ে কর্নেল বললেন : 'আমি এঁর সঙ্গে একটু ডুয়েল লড়বো ব'লে ঠিক করেছি।'

গার্ড বললে : 'বড়ো দুঃখিত হলুম। কিন্তু কী আর করবো বলুন। ঐ শুনুন গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা পড়লো।' সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিলে। গার্ড সবিনয়ে বললে, 'আমায় মাপ করবেন আপনারা। অন্যদিন হ'লে আপনাদের জন্যে আমি একটু অপেক্ষা করতে পারতুম। তা আপনারা যদি একান্তই ডুয়েল লড়তে চান, চলতি ট্রেনেও তো তা হ'তে পারে।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফগকে বিদ্রূপ ক'রে কর্নেল বললেন : 'বোধহয় ওঁর তাতে সুবিধে হবে না।'

ফগ বললেন : 'আমার কোনো অসুবিধে হবে না—আপনার সুবিধে হ'লেই হ'লো।'

গার্ড তখন তাঁদের সঙ্গে নিয়ে ট্রেনের একেবারে শেষ কামরাটায় গেলেন। কামরাটায় দশ-বারোজন মাত্র যাত্রী ছিলো। গার্ড তাদের বললে, 'এই দু-জন ভদ্রলোকের নিজেদের মধ্যে একটু হিশেব-নিকেশ আছে। আপনারা যদি এঁদের একটু জায়গা দিতে পারেন, তবে খুব ভালো হয়।'

তাঁদের *অনুগৃহীত* ক'রে যাত্রীরা পাশের কামরায় চ'লে গেলো।

কামরাটা পঞ্চান্ন ফিট লম্বা, সুতরাং বন্দুকের ডুয়েলের পক্ষে কোনোই অসুবিধে ছিলো না। ফিলিয়াস ফগ আর কর্নেল প্রক্টর কামরার মধ্যে ঢুকলেন রিভলভার হাতে। কামরার দরজা বন্ধ ক'রে আর-সবাই অন্যখানে অপেক্ষা করতে লাগলো। ঠিক হ'লো, এঞ্জিনের সিটি শুনলেই লড়াই শুরু হবে এবং সে-লড়াই পুরো দু-মিনিট ধ'রে চলবে। এত-সহজে এত-তাড়াতাড়ি সব বন্দোবস্ত হ'য়ে গেলো যে ফিক্স আর পাসপার্তু কি-রকম যেন হতভম্ব হ'য়ে গেলেন।

ট্রেনের সিটির জন্যে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে সবাই যখন অপেক্ষা করছে, তখন হঠাৎ ভয়ানক গণ্ডগোল শুরু হ'লো। সেই হৈ-চৈ-এর মধ্যে ট্রেনের নানান জায়গা থেকে গ'র্জে উঠলো একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক। যাত্রীরা চেঁচিয়ে উঠলো। আর্তনাদে-আর্তনাদে তখন চারদিক মুখর হ'য়ে উঠেছে। কর্নেল প্রক্টর আর ফিলিয়াস ফগ রিভলভার হাতে যেখানে গোলযোগ সবচেয়ে বেশি, সেদিক পানে ছুটলেন।

একদল সিয়োক্স দস্যু চলতি ট্রেন আক্রমণ করেছিলো। আমেরিকার সেই নির্জন অঞ্চলে প্রায়ই তারা এ-ভাবে লুঠতরাজ চালাতো। তলোয়ার-বন্দুক নিয়ে ক্ষিপ্রবেগে ট্রেনের পা-দানির উপর উঠতো লাফিয়ে, লুঠ করতো যাত্রীদের যথাসর্বস্ব।

দস্যুদের মধ্যে একজন এঞ্জিনের উপর উঠে ড্রাইভার আর ফায়ারম্যানকে আহত করলে। তার ইচ্ছে ছিলো ট্রেন থামানোর, কিন্তু এঞ্জিনের ব্যবহার না-জানায় সে খুলে ফেললো বাষ্প-নলের মুখ। অমনি ট্রেন না-থেমে বরং উল্কার মতো ছুটতে লাগলো। অন্যান্য দস্যুদের সঙ্গে যাত্রীদের ভীষণ লড়াই শুরু হ'য়ে গেলো। রিভলভার আর বন্দুকের শব্দে কেঁপে উঠতে লাগলো চারদিক।

ট্রেন ছুটছিলো উল্কার মতো। গার্ড রিভলভার চালাতে-চালাতে ফগকে বললে : 'যদি ট্রেন থামাতে না-পারেন, তাহ'লে একজনও বাঁচবে না। ফোর্ট-কিয়ার্নি স্টেশন আর মাত্র পাঁচ-ছ মাইল দূরে। গাড়ি যদি স্টেশন পেরিয়ে চ'লে যায়, তাহ'লে দস্যুদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অন্য-কোনো উপায় থাকবে না। উঃ !' গার্ড আরো-কী বলতে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছিলো, এমন সময় দস্যুদের একটা গুলি এসে তার বুক ভেদ করলো। গার্ড ছিটকে পড়লো। ভলকে-ভলকে রক্ত উঠলো তার মুখ দিয়ে।

ফগ গার্ডের কথা শুনেই ট্রেন থামাবার জন্যে অগ্রসর হলেন। পাসপার্তু তাঁর পাশেই ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে ছিলো। সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আপনি যাবেন না—যাবেন না! এ একটা সামান্য কাজ—আমারই উপযুক্ত।'

ফগ তাকে বারণ করবার আগেই সে জানলা দিয়ে কামরার বাইরে চ'লে গেলো, আর খুব-সাবধানে ঝুলতে-ঝুলতে ট্রেনের সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। লাগেজ-গাড়ি ও এঞ্জিনের মাঝখানের লোহার রডটা একহাতে ধ'রে অন্যহাতে দু-গাড়ির সংযোজন-শৃঙ্খল খুলে দিলে। যে-লোহার রডটা দিয়ে এঞ্জিনের সঙ্গে লাগেজ-গাড়ি আটকানো ছিলো, তা তখন মুহূর্তের মধ্যে গেলো ভেঙে। খালি এঞ্জিন বিদ্যুৎবেগে ছুটে চললো সামনেব দিকে, আর প্রতি মুহূর্তেই কমতে লাগলো বাদবাকি ট্রেনের গতি। দেখতে-দেখতে ট্রেনটা ফোর্ট-কিয়ার্নি স্টেশনের কাছে এসে একেবারে থেমে গেলো। দস্যুদল তখন পালিয়ে যেতে বাধ্য হ'লো।

আরোহীদের মধ্যে যারা জখম হয়েছিলো, তাদের কারু আঘাতই তেমন সাংঘাতিক ছিলো না। মৃতের সংখ্যাও খুব বেশি ছিলো না। কর্নেল প্রস্টর একটু-বেশি আহত হয়েছিলেন, অন্যান্য আহত যাত্রীদের সঙ্গে কর্নেলকে ফার্স্ট-এডের জন্যে রেলস্টেশনে নিয়ে যাওয়া হ'লো।

আউদা আর ফগ কিন্তু একেবারেই আহত হননি। ফিক্সের কাঁধের খানিকটা মাংস ছ'ড়ে গিয়েছিলো মাত্র। কিন্তু পাসপার্তুকে পাওয়াই গেলো না—কেউই তার কোনো সন্ধান দিতে পারলে না। আউদা তার জন্যে কাঁদতে শুরু করলেন, আর ফগ অপলক চোখে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। আউদা সকাতর চোখে ফগের দিকে তাকালেন। সে-দৃষ্টির মানে বুঝতে বিন্দুমাত্র দেরি হ'লো না ফগের। কর্তব্য ঠিক ক'রে নিয়ে আউদার দিকে তাকিয়ে বললেন : 'জ্যান্ত কিংবা মরা—আমি পাসপার্তুকে খুঁজে বার করবোই।' আউদা সে-কথা শুনে আবেগভরে ফগের হাত চেপে ধরলেন।

ফিলিয়াস ফগ শপথ করলেন যে, যে-ক'রেই হোক পাসপার্তুর সন্ধান না-ক'রে আমেরিকা ছেড়ে যাবেন না—সেজন্যে যদি যথাসর্বস্ব যায়, তাতেও রাজি। তাঁর এ-কথা ভালো ক'রেই জানা ছিলো যে, পথে একদিন দেরি হ'লেই নিউ-ইয়র্ক গিয়ে ইংল্যাণ্ড যাবার জাহাজ আর পাবেন না—আর নিই-ইয়র্কে জাহাজ ধরতে না-পারলে বাজিতে নিশ্চিতভাবেই তাঁকে হারতে হবে। কিন্তু পাসপার্তুর অনুসন্ধান করাই কর্তব্যনিষ্ঠ ফগের কাছে বড়ো হ'য়ে দাঁড়ালো।

ফোর্ট-কিয়ার্নি একটা ছোটো দুর্গ। দুর্গের সৈন্যরা বন্দুকের আওয়াজ ও তুমুল হৈ-চৈ শুনে আগেই রেলস্টেশনে এসে হাজির হয়েছিলো। ফগ তাদের কম্যাণ্ডারকে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন : 'দেখুন, তিনজন যাত্রীর কোনো খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না।'

'তারা ম'রে গেছে নাকি ?'

'মরুক আর দস্যুর হাতে বন্দীই হোক, তাদের খোঁজ করতেই হবে। আপনি কি সৈন্য নিয়ে দস্যুদের অনুসরণ করতে চান ?'

কম্যাণ্ডার বললেন, 'এ তো বিষম সাংঘাতিক কথা ! তারা যে পালাতে-পালাতে কোথায় যাবে তার কি কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে ? আমি তো আর দুর্গ অরক্ষিত অবস্থায় রেখে যেতে পারিনে ! কে জানে সুবিধে পেলে দস্যুরা এসে দুর্গ আক্রমণ করবে কি না। তিনজনের জন্যে তো আর পঞ্চাশজনের জীবন বিপন্ন করতে পারিনে। দস্যুর আক্রমণে অনেকেরই তো প্রাণ গিয়েছে। কিন্তু তার আর কী করবেন বলুন। এ-রকম অপঘাত মরণ তো এখানে আখছারই হচ্ছে।'

'পঞ্চাশজনের জীবন বিপন্ন হবে কি না জানিনে—কিন্তু আমার মনে হয় তিনজনকে বাঁচাবার চেষ্টা আপনার করাই উচিত।'

কম্যাণ্ডার তীব্রকণ্ঠে বললেন : 'আমাকে আমার কর্তব্য বুঝিয়ে দিতে পারে এমন লোক তো এখানে দেখছিনে !'

শান্তগলায় ফগ বললেন : 'বেশ। আমি তাহ'লে একাই যাবো।'

ফিক্সের কাছে ফগের একা যাওয়ার কথা ভালো লাগলো না। এতদূর অনুসরণ ক'রে এসে কি শেষটায় ব্যাংক-দস্যুকে নাগাল থেকে হারাবেন ? তিনি বললেন : 'আপনি একাই দস্যুদের অনুসরণ করতে চান ? না, না—সে হবে না।'

'আপনি কি বলতে চান যার জন্যে আমরা প্রাণ পেয়েছি, সেই অকুতোভয় পাসপার্তুকে দস্যুর কবলে ফেলে আমি চ'লে যাবো ? ককখনো তা হবে না। আমি নিশ্চয়ই তার খোঁজ করতে যাবো !'

ফগের কথা শুনে কম্যাণ্ডার কী ভাবলেন, কে জানে। বললেন : 'আপনাকে আর একা যেতে হবে না—আপনি দেখছি সত্যিকার বীর।' তারপর সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন : 'আমি ত্রিশজন লোক চাই—কে-কে যাবে, এসো।'

ডাক শুনে সবাই যখন এগিয়ে এলো, তখন কম্যাণ্ডার ত্রিশজনকে বাছাই ক'রে নিয়ে যাত্রার জন্যে হুকুম দিলেন। এক ধীর-স্থির প্রবীণ অফিসার সেই দলের নেতৃত্ব নিলেন।

ফগ কম্যাণ্ডারকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে রওনা হচ্ছেন দেখে ফিক্স এগিয়ে এলেন। বললেন : 'আমাকে কি সঙ্গে নেয়া যায় না ?'

'আপনার যা-ইচ্ছে তা-ই করতে পারেন। তবে আপনি যদি মিসেস আউদার ভার নিতেন, তাহ'লেই আমার বেশি উপকার হ'তো। আমারও তো বিপদ ঘটতে পারে !'

ফিক্সের মুখ শুকিয়ে গেলো। এত পরিশ্রম ক'রে বিপদ-আপদ তুচ্ছ ক'রে এতদিন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধ'রে যার অনুসরণ ক'রে এলেন, আজ কি না তাকে একা ছেড়ে দিতে হচ্ছে, চোখের আড়াল করতে হচ্ছে ! তীব্র চোখে ফগের দিকে তাকালেন তিনি। দেখতে পেলেন, ফগের মুখে কুটিলতার কোনো চিহ্নই নেই। ফগের সরল দৃষ্টির কাছে হার মানলেন ফিক্স। গ্রহণ করলেন আউদার দেখাশোনার ভার।

ফিলিয়াস ফগ তাঁর ব্যাংক-নোটে বোঝাই ব্যাগটা আউদার হাতে দিয়ে সৈন্যদের সঙ্গে এগুলেন। যাত্রার সময় সৈন্যদের বললেন : 'যদি আমরা বন্দীদের উদ্ধার করতে পারি, তাহ'লে আপনাদের একহাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেবো ব'লে শপথ করছি।'

একটু বাদেই ফগ ফৌজ নিয়ে দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেলেন। আউদা তখন ওয়েটিং-রুমে ব'সে-ব'সে ভাবছিলেন মহৎহৃদয় ফগের কথা। আর ফিক্স বাইরে একটা চেয়ারে ব'সে ভাবছিলেন, 'আমি কী গর্দভ ! পকেটে ওয়ারেণ্ট থাকতেও আমি কিনা দস্যুটাকে ছেড়ে দিলুম ! আর কি সে ফিরে আসবে ? বোধহয় না। সে আমাকে নিশ্চয়ই ফাঁকি দিয়েছে।' অমনি তাঁর মনে হ'লো, বরফের উপর পায়ের ছাপ দেখে-দেখে ফগকে এখনও অনুসরণ করা চলে। কিন্তু সে-আশায় যে ছাই, তা বুঝতে তাঁর দেরি হ'লো না। যেতে-যেতেই আরো-বরফ পড়বে, আর তাহ'লেই কোনো পদচিহ্ন থাকবে না। ফিক্স হতাশ হ'য়ে পড়লেন। তাঁর চোখের সামনে যেন অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।

সময় কারু জন্যে ব'সে থাকে না। বরফের কুচি আর কুয়াশার মধ্য দিয়েই এগিয়ে চললো সময়। দেখতে-দেখতে বাজলো তিনটে। এমন সময় হঠাৎ ট্রেনের সিটি শোনা গেলো। সঙ্গে-সঙ্গেই দেখা গেলো, একটি ট্রেনের এঞ্জিন স্টেশনের কাছে এসে থেমেছে।

পাসপার্তু যে-এঞ্জিনটা ট্রেন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছিলো তা অনেক দূর অব্দি বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়েছিলো। কিন্তু ক্রমে কয়লা ফুরিয়ে যেতেই অনেক দূর গিয়ে ধীরে-ধীরে থেমে পড়েছিলো। আহত ড্রাইভারের ইতিমধ্যেই জ্ঞান ফিরে এসেছিলো। সে তক্ষুনি সকল অবস্থা বুঝতে পারলে। আবার আগুন জ্বেলে বিচ্ছিন্ন ট্রেনের খোঁজে সে ফের ফিরে আসতে লাগলো। কুয়াশায় কয়েক হাত দূরের জিনিশই দেখা যাচ্ছিলো না। ফোর্ট-কিয়ার্নি স্টেশন যাতে পেরিয়ে চ'লে না-যায়, সেজন্যে ড্রাইভার বার-বার সিটি দিচ্ছিলো।

এঞ্জিন আসতেই যাত্রীরা আনন্দিত হ'য়ে উঠলো। বিচ্ছিন্ন ট্রেন আবার এঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত করা হ'লে আউদা নতুন গার্ডকে শুধোলেন, 'গাড়ি কখন ছাড়বে ?'

'এক্ষুনি।'

'কিন্তু বন্দীরা ? আর যাঁরা তাদের খোঁজে গেছেন—'

'তা ব'লে তো আমি আর ব'সে থাকতে পারিনে। এমনিতেই গাড়ি তিন ঘণ্টা পেছিয়ে পড়েছে।'

'সান-ফ্রান্সিসকো থেকে আবার কখন গাড়ি আসবে ?'

'কাল সন্ধের সময়।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহ'লে তো খুব দেরি হ'য়ে যাবে। আপনি কি একটুও অপেক্ষা করতে পারবেন না।?'

'অসম্ভব। যদি যেতে হয় তবে আসুন, অযথা আর দেরি করবেন না।'

'তাঁদের ফেলে রেখে আমি কিছুতেই যাবো না।'

আহত যাত্রীরা সকলেই গাড়িতে উঠে বসলো। ট্রেন ছেড়ে দিলে।

ফিক্স খুব হতাশ হ'য়ে পড়েছিলেন। ট্রেন পেলেই চ'লে যাবেন ব'লে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু সত্যি-সত্যিই যখন ট্রেন পাওয়া গেলো, তখন তিনি আর গেলেন না। ভাবলেন, 'দেখা যাক, শেষ অব্দি কী হয়। আবার তো ট্রেন পাওয়া যাবে।'

বরফ যেমন পড়ছিলো তেমনি পড়তে লাগলো। আরো-ঘন হ'য়ে জল থেকে কুয়াশা উঠলো। আগের মতোই বইতে লাগলো ঠাণ্ডা হাওয়া। ক্রমে সন্ধ্যা হ'লো। রাত্রির অন্ধকারে স্টেশনটা ভূতের মতো নিঃঝুম হ'য়ে প'ড়ে রইলো। আশঙ্কায়, উৎকণ্ঠায় রাত্রে ঘুম হ'লো না আউদার। কিন্তু ফগদের কোনো খোঁজই পাওয়া গেলো না। ভোরবেলা আবহাওয়া অনেকটা ভালো হ'লো বটে, কিন্তু তখনও ফগের কোনো খবর পাওয়া গেলো না। আউদা আর ফিক্স উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়লেন। সৈন্যদের জন্যে চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন কম্যাণ্ডার।

ক্রমে বেলা বেড়ে চললো। চিন্তিত কম্যাণ্ডার তাদের খোঁজে দুর্গের বাকি সৈন্যদের পাঠাবেন ব'লে ঠিক করলেন। সৈন্যরা তৈরি হ'লো। এমন সময় হঠাৎ দূরে বন্দুকের আওয়াজ হ'লো। খানিকক্ষণের মধ্যে ফিলিয়াস ফগ, জাঁ পাসপার্তু ও আর-সবাই স্টেশনে এসে হাজির হ'লো।

ফোর্ট-কিয়ার্নি থেকে মাইল-দশেক দূরে দস্যুদের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়েছিলো। তাঁরা দূর থেকেই পাসপার্তু আর অন্য-দুজন যাত্রীকে দস্যুদের সঙ্গে লড়াই করতে দেখতে পেয়েছিলেন। এমন সময় ফগ ফৌজ নিয়ে সেখানে হাজির হ'য়ে সবাইকে উদ্ধার করলেন।

পাসপার্তু স্টেশনে এসেই ফিক্সকে দেখে শুধোলে : 'ট্রেন কই?' তার ভরসা ছিলো, তাদের এই বিপদের মধ্যে রেখে ট্রেন কখনোই চ'লে যাবে না।

ফিক্স ভারিগলায় বললেন : 'ট্রেন নেই, চ'লে গেছে।'

ফগ শান্তকণ্ঠে শুধোলেন : 'আবার কখন গাড়ি পাওয়া যাবে?'

'সন্ধ্যার আগে না।'

এ-কথা শুনে ফিলিয়াস ফগ অস্ফুট স্বরে শুধু বললেন : 'তাই তো!'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগারো

## কখনও হতাশ হ'তে নেই

ফিলিয়াস ফগের কুড়ি ঘণ্টা দেরি হ'য়ে গেলো। পাসপার্তু খুব দুঃখিত হ'য়ে পড়লো। ভাবতে লাগলো, 'আমার জন্যেই সর্বনাশ ঘটলো ফিলিয়াস ফগের।'

ফিক্স ফগকে বললেন : 'সত্যিই কি আপনার তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার ? বিলেতের ডাক-জাহাজ ধরতে চান বুঝি ? তাহ'লে এগারো তারিখের আগেই আপনার নিউ-ইয়র্ক পৌঁছুনো দরকার।'

'হ্যাঁ। ডাক-জাহাজের ওপরই আমার সর্বস্ব নির্ভর করছে।'

'যদি এ-সব বাধা-বিপত্তি না-ঘটতো তাহ'লে তো এগারো তারিখ ভোরেই নিউ-ইয়র্ক যেতে পারতেন।'

'হ্যাঁ, তাহ'লে আমার হাতেই বরং আরো বারোঘণ্টা সময় বেশি থাকতো।'

'আপনার তো সাকুল্যে কুড়ি ঘণ্টা মাত্র দেরি হয়েছে—তার থেকে বারো ঘণ্টা বাদ দিলে থাকে আট ঘণ্টা। এই আট ঘণ্টার বিলম্বে যাতে আপনার কোনো ক্ষতি না-হয়, তা কি আপনি করতে রাজি আছেন ?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু কী ক'রে সে আট ঘণ্টা পুষিয়ে নেবো ?'

'যখন বরফ পড়েছে, তখন স্লেজ গাড়ি বেশ চলবে। হাওয়াও আছে, পাল তুলে দিলে রেলের মতোই দ্রুতগতিতে যাবে। একটা লোক তার স্লেজ ভাড়া দিতে পারে বলছিলো।'

স্টেশনের কাছেই স্লেজ-ওলার বাড়ি। ফগ স্লেজ দেখে তো খুব খুশি হ'য়ে পড়লেন। গাড়িটা বেশ ভালোই, অনায়াসেই পাঁচ-ছজন লোক ধরবে তাতে। গাড়ির ঠিক মাঝখান থেকে একটা মাস্তুল উঠেছে উপরে, আর তাতে ঝুলছে বড়ো-একটা পাল। হালও ছিলো গাড়ির।

স্লেজ-ওলা বললে : 'পশ্চিম থেকে হাওয়া বেশ জোরে বইছে, বরফও জ'মে খুব শক্ত হ'য়ে গিয়েছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা ওমাহা স্টেশনে যেতে পারবো। ওমাহায় নিউ-ইয়র্ক আর শিকাগোর বহু ট্রেন পাওয়া যায়।'

তখন বেলা আটটা। ফগ তখুনি যাত্রার ব্যবস্থা করলেন। সবাই স্লেজে উঠে বসলেন। স্লেজ-ওলা পাল তুলে দিলে। প্রবল হাওয়ায় পাল ফুলে উঠলো। দুলতে লাগলো স্লেজ। তক্ষুনি সেই মসৃণ অথচ কঠিন বরফের উপর দিয়ে তীরবেগে ছুটলো স্লেজ। হিশেব ক'রে দেখা গেলো, স্লেজ যাচ্ছে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে। ফোর্ট-কিয়ার্নি থেকে ওমাহা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেশন দুশো মাইল। এভাবে স্লেজ চলতে থাকলে বেলা একটার মধ্যেই ওমাহা পৌঁছুনো যাবে ব'লে আন্দাজ হ'লো।

শীতে গায়ের রক্ত পর্যন্ত জ'মে যাবার জোগাড় হয়েছিলো। সবাই নির্বাক হ'য়ে ব'সে রইলেন। দিগন্তবিহীন বরফের উপর দিয়ে ছুটে চললো স্লেজ। সুদক্ষ স্লেজ-ওলা দৃঢ়হাতে হাল ধ'রে সোজা নাক-বরাবর স্লেজ চালিয়ে দিলে। স্লেজ যেন উড়ে চলতে লাগলো।

বেলা বারোটার সময় স্লেজ-ওলা পাল নামিয়ে দিয়ে বললে : 'ঐ-যে ওমাহা দেখা যায়।'

ফগ তাকিয়ে দেখলেন, দূরে কতগুলো বরফ-ছাওয়া ঘরদোর দেখা যাচ্ছে। স্লেজ সেখানে গিয়ে থামতেই তাঁরা দ্রুতপদে স্লেজ থেকে নেমে শিকাগোর একটা ট্রেনে উঠে বসলেন। আর পাঁচমিনিট দেরি হ'লেই ট্রেনটা ধরা যেতো না।

পরদিন দশই ডিসেম্বর-বিকেল চারটের সময় শিকাগোতে পৌঁছেই তাঁরা শুনলেন, এক্ষুনি নিউ-ইয়র্ক যাবার জন্যে একটা ট্রেন ছাড়ছে। ফগ তাঁর দলবল নিয়ে ট্রেনে উঠতেই ট্রেন ছেড়ে দিলে। পরদিন বেলা এগারোটার সময় ট্রেন এসে নিউ-ইয়র্কের জাহাজ-ঘাটে থামলো। ট্রেন থেকে নেমে তাঁরা শুনলেন, লিভারপুলে যাবার জাহাজ *চায়না* পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে বন্দর ছেড়েছে! পাসপার্তু কাতরকণ্ঠে ব'লে উঠলো : 'হায়, হায়! *চায়নার* সঙ্গে-সঙ্গে ফগের সকল আশাই অথৈ জলে ভেসে গেলো।' লিভারপুলে যাওয়ার তখন আর-কোনো জাহাজ ছিলো না।

পাসপার্তু পাগলের মতো হন্যে হ'য়ে উঠলো। আউদা তো একেবারে ভেঙে পড়লেন। মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জন্যেই শেষে সব গেলো! এত পরিশ্রম, এত টাকাখরচ—সব গেলো বৃথা! পাসপার্তু নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলো। সে জানতো যে, তার জন্যেই এ-বিভ্রাট ঘটলো। ফগ কিন্তু তাকে একফোঁটাও তিরস্কার করলেন না। সর্বনাশ হ'য়ে গেলো দেখেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'লেন না। সোজা নিকোলাস হোটেলে এসে আশ্রয় নিলেন। আউদাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে একবার শুধু বললেন : 'ককখনো হতাশ হ'তে নেই।'

সে-রাত্রে উৎকণ্ঠায় অন্য-কারু ঘুম না-এলেও ফগের ঘুমের কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি।

পরদিন বারোই ডিসেম্বর। ফগের হাতে তখন মোট সময় ছিলো ন-দিন তেরোঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। যদি *চায়না* জাহাজ ধরা যেতো, তাহ'লে ঠিক সময়ের মধ্যেই লণ্ডন পৌঁছে বাজি জিততে পারতেন ফগ। পাসপার্তু এইসব কথা ভেবে-ভেবে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলো।

ফগ সঙ্গীদের বললেন : 'যতক্ষণ-না ফিরে আসি, আপনারা এখানেই থাকবেন। ডাকবামাত্রই যাতে রওনা হ'তে পারেন তার বন্দোবস্ত ক'রে রাখবেন। যতক্ষণ শ্বাস,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ততক্ষণ আশ। যাবার কোনো উপায় হয় কি না আমি একবার দেখে আসি।'

ফগ হাডসন নদীর তীরে এসে হাজির হলেন। দেখলেন, অনেক জাহাজই বন্দর ছাড়বার উদ্যোগ করছে, কিন্তু সেগুলো সবই পালের জাহাজ, কলের নয়। সুতরাং এত জাহাজ থাকলেও কোনো সুবিধে হ'লো না। ইতস্তত ঘুরতে-ঘুরতে *এস. এস. আঁরিয়েতা* নামে একটা ছোটো জাহাজ তাঁর নজরে পড়লো। ফগ একটা নৌকো ক'রে জাহাজে গিয়ে উঠলেন। ক্যাপ্টেন জাহাজেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে ফগ বললেন : 'আমার নাম ফিলিয়াস ফগ, বাড়ি লণ্ডনে। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আমিই ক্যাপ্টেন। নাম আন্দ্রু সিপার্ডি, বাড়ি কার্দিফে।'

'আপনি বুঝি এখুনি জাহাজ ছাড়ছেন?'

'একঘণ্টার মধ্যেই ছাড়বো। বোর্দো যাচ্ছি।'

'কী বোঝাই নিয়েছেন?'

'কিছু-না। জাহাজ খালি। না, কোনো যাত্রী নেই জাহাজে। আমি যাত্রী নিইনে, বড্ড বিরক্ত করে তারা।'

'আপনার জাহাজ কি তাড়াতাড়ি চলতে পারে?'

'ঘণ্টায় তেরো-চোদ্দ মাইল যায়। *আঁরিয়েতা* জাহাজের নাম এ-এলাকায় সব্বাই একডাকে জানে।'

'আপনি কি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে আর আমার তিন বন্ধুকে লিভারপুল নিয়ে যেতে পারেন?'

বিদ্রূপের সুরে ক্যাপ্টেন বললেন : '*লিভারপুল*! বলুন না কেন একদম চিনদেশেই নিয়ে যাই! ও-সব আমার দ্বারা হবে-টবে না। আমি বোর্দো যাবো ঠিক করেছি, সেখানেই যাবো।'

'যদি অনেক টাকা দিই?'

'টাকায় কী হবে? এ-জাহাজ আমার। আমাকে টাকার লোভ দেখাবেন না।'

'আমি যদি জাহাজ ভাড়া চাই?'

'ভাড়া? আমি ভাড়া দিইনে।'

'ভাড়া না-দিলে বিক্রি করুন।'

'তাও না।'

অবিচলিত-চিত্ত ক্যাপ্টেনের কথা শুনেও ফগ হতাশ হলেন না। যে-ক'রেই হোক, অ্যাটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে লিভারপুল যেতেই হবে। মনে-মনে একটা মৎলব স্থির করে ক্যাপ্টেনকে আবার বললেন : 'ক্যাপ্টেন সিপার্ডি, আপনি কি আমাকে বোর্দো নিয়ে যাবেন?'

'হাজার টাকা দিলেও যাত্রী নেবো না আমি।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি যদি একেকজনের জন্যে পাঁচশো পাউণ্ড ক'রে দিই?'

'প্রত্যেক যাত্রীর জন্যে?'

'হ্যাঁ, প্রত্যেকের জন্যে!'

'আপনারা তো চারজন আছেন, না?' ক্যাপ্টেন সিপার্ডি মাথা চুলকোতে লাগলেন। একসঙ্গে দু-হাজার পাউণ্ড লাভ, অথচ তার জন্যে একপয়সাও খরচ নেই। শেষটায় লোভই জয়ী হ'লো। ক্যাপ্টেন বললেন : 'আমি কিন্তু কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক ন-টায় জাহাজ ছাড়বো। সময়-মতো হাজির হ'তে পারলে জাহাজে জায়গা হবে।'

ন-টার আগেই সবাই জাহাজে এসে উঠলেন। ন-টার সময় জাহাজ বোর্দো যাত্রা করলো। আর ফিক্স অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগলেন, 'এ-কী! যাবো ইংল্যাণ্ডে, আর কোথায় চলেছি। কোথায় বোর্দো আর কোথায় লিভারপুল! এর মানে তো কিছুই বুঝতে পারছিনে।'

*আঁরিয়েতা* জাহাজের নাবিকদের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের যে বিশেষ সদ্ভাব ছিলো না, জাহাজে উঠেই ফগ তা বুঝতে পারলেন। প্রচুর টাকা দিয়ে একদিনের মধ্যেই নাবিকদের হাতে আনতে তাই ফগকে কোনো বেগ পেতে হ'লো না। যে-ক'রেই হোক, *আঁরিয়েতা* যাতে লিভারপুল যায়, সে-ব্যবস্থা করতেই হবে। নাবিকদের সাহায্যে ফগ ক্যাপ্টেন সিপার্ডিকে তাঁর ক্যাবিনে বন্দী ক'রে রাখলেন, আর নিজেই ক্যাপ্টেন হ'য়ে লিভারপুলের দিকে জাহাজ চালাতে লাগলেন।

এ-যে *মিউটিনি*! সমুদ্রে কোনো জাহাজে ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধে অন্য মাঝিমল্লারা বিদ্রোহ করলে সে-যে ভয়ংকর কাণ্ড হয়। ধরা পড়লে প্রত্যেকের কঠোর সাজা হয় —প্রায়ই প্রাণদণ্ড জোটে বিদ্রোহীদের।

ব্যাপার দেখে ফিক্সের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। মনে-মনে আপশোশ করতে লাগলেন, 'কেন মরতে এলুম এই দস্যুর সঙ্গে! ফিলিয়াস ফগ ককখনো লিভারপুল যাচ্ছে না! নিশ্চয়ই ও একজন বোম্বেটে, জলদস্যু, চলেছে নিজের গুপ্ত আড্ডায়। সেখানে না-জানি কী দুঃসহ দুরবস্থাই আমার বরাতে আছে!'

ফগ যেভাবে জাহাজ চালাতে লাগলেন, তাতে ম'নে হ'লো এ-কাজে তিনি খুবই দক্ষ। পাসপার্তু তো রীতিমতো অবাক হ'য়ে গেলো। নাবিকেরা নতুন ক্যাপ্টেনের সদ্ব্যবহারে আর বদান্যতায় এত খুশি হয়েছিলো যে প্রাণপণে কাজ করতে লাগলো। *আঁরিয়েতা* পূর্ণগতিতে লিভারপুল অভিমুখে এগিয়ে চললো।

আজ ষোলোই ডিসেম্বর। পঁচাত্তর দিন কেটে গেছে। এখনও অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের পথে অনেকদূর যেতে হবে। দুর্ভাগ্য ছিলো ফগের সঙ্গে-সঙ্গেই। *আঁরিয়েতার* এঞ্জিন ম্যান দুঃসংবাদ জানালে : 'জাহাজের কয়লা ফুরিয়ে এসেছে। যেদিন থেকে জাহাজ ছেড়েছি, সেদিন থেকেই সমানে আগুন রেখেছি। লিভারপুলে যাওয়ার মতো কয়লা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহাজে ছিলো না। বোর্দো যাওয়ার মতোই কয়লা নিয়েছিলুম আমরা।'

ফগ নিশ্চিন্তভাবে হুকুম দিলেন : 'আচ্ছা, যাও। যতক্ষণ কয়লা আছে, পুরোদমে চলিয়ে যাও তো। আমি এইফাঁকে ভেবে দেখি, কী করা যায়।'

আঠারো তারিখে যখন এঞ্জিনম্যান এসে চরম খবর দিয়ে গেলো—আর একটুও কয়লা নেই, অবিচলিত ফগ তখন পাসপার্তুকে বললেন : 'ক্যাপ্টেন সিপার্ডিকে এখানে নিয়ে এসো।'

ক্যাপ্টেন সিপার্ডিকে দেখে মনে হ'লো যেন একটা ভীষণ বোমা ফেটে পড়বার জন্য অপেক্ষা করছে। কাছে এসেই ক্যাপ্টেন গম্ভীরস্বরে ফগকে শুধোলেন : 'আমরা এখন কোথায় আছি?'

'লিভারপুল থেকে সাতশো সত্তর মাইল দূরে।'

জবাব শুনেই ক্যাপ্টেনের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত জ্ব'লে উঠলো। গর্জন ক'রে বললেন, 'তবে রে বোম্বেটে!'

সে-কথায় কান না-দিয়ে শান্তগলায় ফগ বললেন : 'আপনার জাহাজ আমার কাছে বিক্রি করুন।'

'ককখনো না!'

'যদি বিক্রি না-করেন, তবে বাধ্য হ'য়েই জাহাজটা পুড়িয়ে ফেলতে হবে আমায়।'

'কী! আপনার দুঃসাহস তো কম নয়! আমার জাহাজ পোড়াবেন!'

'নিশ্চয়ই। অন্তত উপরকার যা-কিছু কাঠের জিনিশ আছে, সবই পোড়াতে হবে। জাহাজের কয়লা ফুরিয়েছে। কিন্তু আমাকে তো যেতেই হবে!'

চেঁচিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন সিপার্ডি : 'আপনার যাওয়া চাই ব'লে আমার জাহাজ পোড়াবেন? জাহাজের দাম কত জানেন? নগদ পাঁচ হাজার পাউণ্ড!'

'এই নিন, আমি ছ-হাজার দিচ্ছি।' ফগ তক্ষুনি একতাড়া ব্যাংক-নোট ক্রুদ্ধ ক্যাপ্টেনের পকেটের মধ্যে ফেলে দিলেন।

নগদ ছ-হাজার পাউণ্ড! মুহূর্তে সব রাগ জল হ'য়ে গেলো ক্যাপ্টেনের। পুরোনো একটা জাহাজের বদলে এতগুলো টাকা পেয়ে তৎক্ষণাৎ রাজি হ'য়ে গেলেন আন্দ্রু সিপার্ডি। বললেন : 'জাহাজের খোল আর এঞ্জিন তো আমার?'

'বেশ। খোল আর এঞ্জিন আপনার। রাজি তো?'

'নিশ্চয়ই।' টাকা গুনতে-গুনতে ক্যাপ্টেন বললেন : 'জাহাজের যত কাঠ আছে সবই আপনার।'

খামকা-খামকা এতগুলো টাকা উড়ে গেলো দেখে পাসপার্তু আর ফিক্স তো হতভম্ব! তাও জাহাজের খোল আর এঞ্জিন কিনা ক্যাপ্টেনেরই রইলো!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তখন ভাববার কোনো সময় নেই, হতভম্ব হবারও নয়। পাসপার্তু একাই বিপুল উৎসাহে কাঠ কাটতে লাগলো। কয়লার বদলে জাহাজের শুকনো কাঠগুলো ব্যবহৃত হ'তে লাগলো। সেইদিনই জাহাজের ক্যাবিনগুলো, ডেকের একাংশ প্রভৃতি ছাই হ'য়ে গেলো।

পরদিন উনিশে ডিসেম্বর জাহাজের মাস্তুল আর বড়ো কাঠগুলো পোড়ানো হ'লো। প্রাণপণে জাহাজ চালাতে লাগলো নাবিকেরা।

পরদিন *আঁরিয়েতার* সব কাঠই গেলো ফুরিয়ে, শুধু খোলটা রইলো বাকি। আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লিভারপুলে যাওয়া চাই। নাবিকেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলো।

দূরে কুইন্স-টাউনের আলো দেখে ক্যাপ্টেন সিপার্ডি বললেন : 'আর-কোনো আশা নেই, মিস্টার ফগ। এই সবেমাত্র আমরা কুইন্স-টাউন ছাড়ছি। এখনও অনেকদূর যেতে হবে। আপনার বরাৎ খারাপ—আমি কী করবো বলুন?'

ফগ বললেন : 'ঐ-যে আলো দেখা যাচ্ছে, সে কি কুইন্স-টাউনের? আমরা কতক্ষণে বন্দরে পৌঁছুতে পারবো?'

'তিনটের আগে না। জোয়ার চাই তো।'

অবিচলিত স্বরে ফগ বললেন : 'তবে এখন জোয়ারের জন্যেই অপেক্ষা করা যাক। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। হতাশা মানেই তো মৃত্যু।'

## বারো

## ভাগ্য যখন বিরূপ

আমেরিকার ডাক কুইন্স-টাউনে নামতো। একটি দ্রুতগামী ট্রেনে সেই ডাক পাঠানো হ'তো ডাবলিনে। ডাবলিনে ডাক নেবার জন্যে লিভারপুলগামী স্টীমার প্রস্তুতই থাকতো। ফগ হিশেব ক'রে দেখলেন, সেই পথে গেলে নির্দিষ্ট সময়ের বারো ঘণ্টা আগেই লিভারপুল পৌঁছুনো যাবে—আর অনায়াসেই আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পৌঁছুনো যাবে লণ্ডন।

রাত একটার সময় আঁরিয়েতা কুইন্স-টাউনে নোঙর করলো। তিলমাত্র দেরি না-ক'রে ফগ ট্রেনে উঠলেন, আর পরদিন বেলা এগারোটা চল্লিশ মিনিটের সময় পৌঁছুলেন লিভারপুল।

লণ্ডন সেখান থেকে ছ-ঘণ্টার পথ। ট্রেনেরও অভাব ছিলো না। ফগ বুঝলেন, বিজয় সুনিশ্চিত। পাসপার্তু তো আনন্দে নেচেই উঠলো। ঠিক সেই সময় ফিক্স ফগের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁধে হাত দিয়ে বললেন : 'মিস্টার ফিলিয়াস ফগ, চুরির অপরাধে রাজার নামে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলুম।'

ফিলিয়াস ফগ বন্দী হলেন। এতক্ষণে তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। ফিক্স তাঁকে কাস্টমস-হাউসেরই একটা ঘরে বন্দী ক'রে রাখলেন।

পুলিশ বাধা না-দিলে পাসপার্তু নিশ্চয়ই ফিক্সকে তখন ছিঁড়ে ফেলতো। মন তার ক্ষোভে-দুঃখে ভেঙে পড়লো। ঈশ! আগেই যদি সে ফগকে ফিক্সের পরিচয় দিতো, তাহ'লে তো এমনটা ঘটতো না! আর আউদাকে দেখে মনে হ'লো, তিনি যেন এইমাত্র আবার একবার জ্বলন্ত চিতা থেকে উঠে এসেছেন।

ঠিক যখন বাজি জিতে গৌরবের স্বর্ণমুকুট পরবেন মাথায়, ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটলো সর্বনাশ। পথের ভিখিরি হ'য়ে পড়লেন ফগ। তখনও পৌনে ন-ঘণ্টা সময় ছিলো। লণ্ডন পৌঁছুতে ছ-ঘণ্টার বেশি লাগতো না। ভাগ্য বিরূপ ব'লেই বিনা-মেঘে এমনভাবে বজ্রাঘাত হ'লো।

ফগ নির্বাক হ'য়ে বন্ধ ঘরে ব'সে রইলেন। তাঁর মনে তখন যে-ঝড় চলছিলো, তার কোনো চিহ্নই তার ভাবলেশহীন মুখে দেখা গেলো না। সকলেই দেখলো, ফগ তাঁর ঘড়িটা সামনের টেবিলের উপর রেখে অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন, যেন একমনে সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা প্রভৃতি গুনছেন। উজ্জ্বল চোখের তারায় একটা অস্বাভাবিক আলো ছাড়া এই ভীষণ দুর্ঘটনাতেও তাঁর কোনো পরিবর্তন হয়েছে ব'লে মনে হ'লো না।

অস্থির পদক্ষেপে সারা ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন ফগ। ঘুরতে-ঘুরতে ক্লান্ত হ'য়ে আবার বসলেন চেয়ারে। পকেট থেকে ডায়রিটা বের ক'রে পড়লেন : 'একুশে ডিসেম্বর, শনিবার—লিভারপুল।' তার নিচে ফগ লিখলেন : 'আশিদিনের দিন, বেলা এগারোটা চল্লিশ মিনিট।'

নির্বাক হ'য়ে ফিলিয়াস ফগ ব'সে রইলেন। কাস্টমস-হাউসের ঘড়িতে ঢং ক'রে বেলা একটা বাজলো। ফগ দেখলেন তাঁর নিজের ঘড়ি দু-মিনিট ফাস্ট।

ক্রমে বাজলো দুটো। তখনও মুক্তি পেলে একটি অত্যন্ত দ্রুতগামী এক্সপ্রেস ট্রেন ধরতে পারতেন ফগ—তাহ'লে তাঁর জয় হ'তো।

পনেরো মিনিট গেলো, কুড়ি মিনিট গেলো, কাটলো আধঘণ্টা। আর-কোনো আশা নেই!

হঠাৎ সশব্দে বন্ধ ঘরের দরজা খুলে গেলো। ফিক্স আর পাসপার্তুকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন আউদা। ব্যগ্রকণ্ঠে ফিক্স বললেন : 'মিস্টার ফগ, *ক্ষমা করুন*, ক্ষমা করুন! ভুল ক'রে ধরা হয়েছিলো আপনাকে। আসল চোর ধরা পড়েছে। আপনার চেহারার সঙ্গে তার চেহারার অদ্ভুত মিল ছিলো ব'লেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। আপনি মুক্ত।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিলিয়াস ফগ মুক্ত হলেন। ধীরপায়ে ফিক্সের দিকে এগিয়ে গেলেন। একমুহূর্তের জন্যে তাকালেন তাঁর মুখের দিকে। পরমুহূর্তেই তাঁর একটা প্রচণ্ড ঘুসিতে ফিক্স প'ড়ে গেলেন ঘরের মেঝেয়। একটাও কথা না-ব'লে ফগ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলেন।

ফগের দুর্ভাগ্য—রেল-স্টেশনে পৌঁছেই শুনলেন লণ্ডনের ট্রেন দুটো পাঁচ মিনিটের সময় চ'লে গেছে।

শিগগির কোনো ট্রেন নেই দেখে ফগ তখুনি একটা স্পেশ্যাল ট্রেনের বন্দোবস্ত করলেন। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ালো। ড্রাইভারকে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে গাড়িতে উঠলেন ফগ। চেষ্টার ত্রুটি করলে না ড্রাইভার। কিন্তু ট্রেন যখন লণ্ডনে এসে পৌঁছুলো তখন স্টেশনের ঘড়িতে আটটা পঞ্চাশ বেজে গেছে।

সারা পৃথিবী ঘুরে ফিরতে ফিলিয়াস ফগের শেষপর্যন্ত মাত্র পাঁচ মিনিট দেরি হ'য়ে গেলো।

আর এই পাঁচ মিনিট দেরি হবার জন্যেই হার হ'লো ফিলিয়াস ফগের।

## তেরো

## আউদার কথা

লণ্ডনে পৌঁছেই ফিলিয়াস ফগ সোজা বাড়ি চ'লে এলেন, ক্লাবে আর গেলেন না। এমনিতর সর্বস্ব-বাজি-ধরা এক ভ্রমণে অপরের দোষে শেষমুহূর্তে হেরে-যাওয়া যে কী মর্মান্তিক তা অন্যে বুঝতে পারবে না। কিন্তু মিস্টার ফগ তখনও অবিচলিত। তাঁর যথাসর্বস্ব তখন বারিং-এর গদিতে ছিলো—সে-টাকা এখন রিফর্ম ক্লাবের সভ্যদের। খরচপত্র বাদে তাঁর হাতে যা-কিছু সামান্য টাকাকড়ি ছিলো, তা নিয়েই কোনোরকমে এবার দিন কাটাতে হবে।

ফগ তাঁর বাড়ির একটা কোঠা আউদার জন্যে ছেড়ে দিলেন।

পাসপার্তু শুনেছিলো, অনেক সময় এ-রকম দুর্দশায় পড়লে হতাশ-হৃদয় মানুষ আত্মহত্যা ক'রে সকল যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করে। ফগ যাতে তেমন-কিছু ক'রে না-বসেন সেজন্যে সে সতর্ক হ'য়ে রইলো। বলা-বাহুল্য, বাড়ি পৌঁছেই পাসপার্তু তার কোঠার গ্যাসের বাতি নিভিয়ে দিয়েছিলো।

ক্রমে রাত এলো। রাত ঘনও হ'লো। সকলেই শুলেন। ফগ ঘুমিয়েছিলেন কি না



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে জানে। তবে আউদা সারারাত দুশ্চিন্তায় কেঁদে-কেঁদে কাটিয়েছিলেন। আর পাসপার্তু সারারাত অতন্দ্র চোখে ব'সে ছিলো ফগের ঘরের দরজায়।

পরদিন ভোরবেলা পাসপার্তুকে ডাকলেন ফগ। বললেন : 'মিসেস আউদার প্রাতরাশের বন্দোবস্ত করো। আর ব'লে এসো আজ সন্ধ্যায় আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

ফগ সেদিন আর রিফর্ম ক্লাবে গেলেন না। কী-ই বা দরকার যাওয়ার? সারাদিন ঘর বন্ধ ক'রে ব'সে নিজের ভবিষ্যৎ ঠিক করছিলেন ফগ। পাসপার্তু মুহূর্তের জন্যেও সেই বন্ধ দরজা ত্যাগ করলে না। ঘরের মধ্যে সামান্য-একটু শব্দ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই উৎকর্ণ হচ্ছিলো সে—এই বুঝি ঘটলো কোনো দুর্ঘটনা। দরজার চাবির ফাঁক দিয়ে সে মধ্যে-মধ্যে ঘরের ভিতর দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে ফগকে দেখে নিচ্ছিলো।

ক্রমে সন্ধ্যা হ'লো। সাড়ে-সাতটার সময় ফগ আউদার ঘরে এসে চুল্লির পাশে একটা চেয়ারে বসলেন। তাঁর ভাবলেশহীন মুখ দেখে কে বলবে যে তিনি এমনিতর একটি বাজিতে হেরেছেন। একটু চুপ ক'রে থেকে আউদাকে বললেন : 'আপনাকে ইংল্যাণ্ডে এনে বড়ো অপরাধ করেছি। সেজন্যে ক্ষমা চাচ্ছি।'

চঞ্চল হ'য়ে উঠলো আউদার হৃদয়। তাঁকে যিনি মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনে বাঁচালেন, তিনি চাইছেন ক্ষমা? তাঁর চোখ জলে ভ'রে এলো।

ফগ ব'লে চললেন : 'আমি যখন আপনাকে এখানে আসতে বলি, তখন আমার টাকার অভাব ছিলো না। ভেবেছিলুম সেই টাকার অর্ধেক আপনার জন্যে খরচ করবো। আপনি তাহ'লে স্বাধীনভাবে থাকতে পারতেন। আপনি তো জানেনই, এখন আমি পথের ভিখিরি।'

ভাঙাগলায় আউদা বললেন : 'মিস্টার ফগ, আমি সবই জানি। আপনার সঙ্গে-সঙ্গে একটা ভারি বোঝার মতো আসাটাই আমার অন্যায় হয়েছে। আমিই সেজন্যে ক্ষমা চাচ্ছি আপনার কাছে। আমিই তো ছিলুম আপনার ক্ষিপ্রগতির প্রধান বাধা। পথে আপনার কত দেরিই না হ'লো আমার জন্যে। সে না-হ'লে কি আজ এমন দুর্দশা হয় আপনার! আমি যে আগুনে পুড়ে মরছিলুম সে-ই ছিলো ভালো।'

'আপনার জন্যে আমার একফোঁটাও দেরি হয়নি। সেজন্যে আপনি দুঃখিত হবেন না। কিছুতেই আপনি ভারতবর্ষে নির্বিঘ্নে থাকতে পারতেন না। একদিন যারা আপনাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলো, তারাই আবার আপনাকে খুঁজে বার করতো।'

'আপনি মহৎ-হৃদয়, তাই সেই বিপদ থেকে আমাকে তো উদ্ধার করেইছিলেন, এখানে এসে যাতে আমি স্বাধীনভাবে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারি তার একটা ব্যবস্থাও করতে চেয়েছিলেন।'

'চেয়েছিলুম, কিন্তু হ'লো কই? আমার দুর্ভাগ্য সব ওলোটপালোট ক'রে দিলে!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যা-ই হোক, আমার এখনও যা-কিছু আছে তা-ই আমি আপনার হাতে তুলে দিতে চাই।'

'তাহ'লে আপনার কী ক'রে চলবে ? আপনি বোধহয় আপনার নিজের ভবিষ্যতের দিকে তাকাচ্ছেন না। আপনার যাতে কোনো অসুবিধে বা অভাব না-হয়, আপনার বন্ধুরা নিশ্চয়ই সেদিকে নজর রাখবেন।'

'আমার কোনো অভাব নেই ব'লেই সকল অবস্থাই আমার কাছে সমান, ভবিষ্যৎও। আমার কোনো বন্ধু-বান্ধবও নেই যে আমার জন্যে তাঁদের এত মাথাব্যথা হবে।'

'কিন্তু আত্মীয়-স্বজন ?'

'এখন আর আমার কোনো আত্মীয়-স্বজনও নেই।'

'মিস্টার ফগ, আপনার জন্যে আমার বড়ো কষ্ট হচ্ছে। জীবনে আপনি এত একা —দুঃখের অশ্রু মুছিয়ে দিতে পারে এমন-কেউ নেই, সে-যে বড়ো ভয়ানক জীবন ! লোকে কথায় বলে, দুঃখের বোঝা নেবার যদি অংশিদার থাকে, তবে সে-বোঝা যতই ভারি হোক না কেন, অনায়াসে ঘাড়ে নিতে পারা যায়।' আউদা চেয়ার থেকে উঠে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন ফগের দিকে। 'আমি যদি আপনার দুঃখের বোঝার অংশিদার হ'তে চাই তবে কি আপনার আপত্তি আছে ? আপনি কি আমায় আপনার স্ত্রীর সম্মান দেবেন ?'

ফগও তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর ঠোঁট কাঁপতে লাগলো। চোখের তারা হ'য়ে উঠলো উজ্জ্বল। ফগ ডাকলেন 'পাসপার্তু !'

পাসপার্তু ঘরে ঢুকে যখন দেখলো ফগ আউদার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর নরম হাত দুটি ধ'রে আছেন, তখন সব-কিছু-বুঝে ফেলতে তার একটুও দেরি হ'লো না। ফগ বললেন : 'গির্জের বিশপকে এক্ষুনি বিয়ের খবর দিতে হবে, পাসপার্তু। এখনও রাত বেশি হয়নি।'

পাসপার্তু খুশিগলায় বললে : 'এ-খবরের আবার সময়-অসময় কী ? কাল সোমবার। কালই কি বিয়ে হবে ?'

ফগ আউদার দিকে তাকালেন। সলজ্জ কণ্ঠে আউদা বললেন : 'তা-ই হোক।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোদ্দ

# সব ভালো তার শেষ ভালো যার

এডিনবরায় যেদিন আসল চোর ধরা পড়লো, সেদিন ছিলো সতেরোই ডিসেম্বর। তখন আবার একটা হৈ-চৈ প'ড়ে গেলো। এতদিন ফগ একটা সাধারণ হীন দস্যু হিশেবে পরিচিত হয়েছিলেন, একমুহূর্তেই সেই কলঙ্ক অপসৃত হ'লো। তখন আবার লোকের মুখে-মুখে ফিরতে লাগলো ফিলিয়াস ফগের নাম। আবার আশিদিনে পৃথিবী ঘোরা নিয়ে ধরা হ'তে লাগলো বাজি। হুজুগে-মাতা সব খবরের কাগজগুলো ফের ফগের সম্পর্কে প্রত্যেক দিন নয়া-নয়া তত্ত্বকথা আউড়ে যেতে লাগলো।

শনিবার, একুশে ডিসেম্বর সন্ধ্যা হ'তেই রিফর্ম ক্লাবের আশপাশ লোকে-লোকারণ্য হ'য়ে গেলো। সকলের মুখে এক কথা : 'আজ ফিলিয়াস ফগের আসবার দিন।' রাস্তায়-ঘাটে এত ভিড় হ'লো যে যানবাহন সমস্তই গেলো বন্ধ হ'য়ে। পুলিশ এসে চারদিকে কড়া পাহারা বসালে, যাতে কোনো গোলযোগ না-হয়।

রিফর্ম ক্লাবের সভ্যরা বিকেলবেলাতেই ক্লাব-ঘরে এসে হাজির হয়েছিলেন। আটটা বেজে কুড়ি মিনিটের সময় আন্দ্রে স্টুয়ার্ট বললেন : 'আর পঁচিশ মিনিট বাদেই নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হবে। কই, মিস্টার ফগ তো এলেন না এখনও!'

ফ্লানাগেন শুধোলেন : 'লিভারপুলের শেষ ট্রেন ক-টায় লণ্ডনে আসে?'

র‍্যালফ বললেন : 'সাতটা তেইশ মিনিটে। তার পরের ট্রেন রাত্রি বারোটার আগে আসে না।'

স্টুয়ার্ট তখন বলতে লাগলেন : 'তাহ'লেই দেখুন, ফগ যদি সেই সাতটা তেইশের ট্রেনেই আসতেন, তাহ'লে এতক্ষণে আমরা তাঁকে নিশ্চয়ই এখানে দেখতে পেতুম। কাজেই বাজিটায় আমারই জিত।'

ফলেস্টিন বললেন : 'অত ব্যস্ত হবেন না। মিস্টার ফগের রীতি-নীতি তো জানাই আছে আপনাদের। তাঁর মাথাটা সবসময় তেমন ঠিক থাকে না বটে, কিন্তু তিনি যে সব কাজ ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় করেন, সেটা তো আপনারা জানেন। তিনি যদি ঠিক শেষমুহূর্তেও এসে হাজির হন, আমি কিন্তু তাতে একটুও অবাক হবো না।'

ফ্লানাগেন বললেন : 'ওঁর প্রস্তাবটাই তো একটা পাগলামো। যতই তিনি ঘড়ির কাঁটা ধ'রে কাজ করুন না কেন, পথে বেরুলেই তো হাজার ফ্যাচাং। কোনো-না-কোনো অভাবিত কারণে দু-একদিন দেরি হবেই। তাহ'লেই তো মিস্টার ফগের সব বন্দোবস্ত উলটে যাবে।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

র‍্যাল্‌ফ বললেন : 'তবে আর কী! কালই ব্যারিং-এর গদি থেকে মিস্টার ফগের টাকাগুলো তুলে-আনা যাক।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে স্টুয়ার্ট বললেন : 'আর পাঁচ মিনিট!'

ফলেস্টিন বললেন : 'আর কেন? জয় তো আমাদেরই হ'লো, আসুন এখন খেলা যাক। ঐ দেখুন, পাঁচ মিনিটের দু-মিনিট গেলো।'

তাঁরা খেলবার জন্যে হাতে তাশ তুলে নিলেন। কিন্তু দেয়ালের ঘড়ি থেকে চোখ কিছুতেই ফিরতে চাইলো না। তাঁরা জানতেন যে বাজিতে তাঁরাই জিতবেন, তবুও সময় যেন আর কাটতে চাচ্ছে না। তাশ শাফল করতে-করতে র‍্যাল্‌ফ বললেন : 'আর মোটে দু-মিনিট!'

হঠাৎ বাইরের বিপুল লোকারণ্য থেকে সাংঘাতিক হট্টগোল শুরু হ'লো। চমকে উঠলেন সবাই, শুধু কাঁপাগলায় সলিভান বললেন : 'আর একমিনিট!'

এক... দুই... তিন... চার... পাঁচ... ত্রিশ সেকেণ্ড গেলো। ফিলিয়াস ফগ এলেন না। চল্লিশ গেলো, পঞ্চাশ সেকেণ্ড গেলো... তখনও এলেন না ফগ। আর মাত্র দশ সেকেণ্ড! ফ্লানাগেন গুনতে লাগলেন : 'এক. দুই. তিন. চার....'

বাইরে হৈ-চৈ তুলকালাম হ'য়ে উঠলো। অত হৈ-চৈ কেন?

'পাঁচ. ছয়. সাত...'

ফ্লানাগেন আট বলবার আগেই হঠাৎ খুলে গেলো ক্লাব-ঘরের দরজা। উত্তেজিত জনতার আগে-আগে বিজয়গর্বে ঘরে ঢুকলেন ফিলিয়াস ফগ। সবাইকে হাসিমুখে নমস্কার জানিয়ে উদাত্তগলায় বললেন : 'আমি এসেছি!

তবে কি সত্যিই এলেন ফিলিয়াস ফগ? সকলে সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলেন, সত্যিই ফিলিয়াস ফগ—সেই ভাবলেশহীন সৌম্য প্রশান্ত মূর্তি।

পাঠকের বোধহয় মনে আছে, সেদিন রাত্রি আটটা পাঁচ মিনিটের সময় পাসপার্তু বিয়ের বন্দোবস্ত করবার জন্যে বিশপের কাছে গিয়েছিলো। বিশপের ওখানে গিয়ে মিনিট পনেরো তাকে ব'সে থাকতে হ'লো শুধু-শুধু, কারণ বিশপ তখন বাইরে গিয়েছিলেন।

আটটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় উন্মাদের মতো বিশপের বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে পাসপার্তু। দৌড়—দৌড়—দৌড়! প্রাণপণে সে দৌড়ুচ্ছিলো। তিন মিনিটের মধ্যেই সে বাড়ি এসে পৌঁছেছিলো।

রুদ্ধকণ্ঠে ফগকে সে বললে : 'কাল বিয়ে হ'তে পারে না!'

'কেন?'

'কাল রোববার!'

'না—সোমবার।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আজ শনিবার ! আপনার ভুল হয়েছে ! আমরা ঠিক সময়ের চব্বিশ ঘণ্টা আগেই এসে পৌঁছেছি। আর দশ মিনিট মাত্র সময় আছে। আপনি চলুন !' আর-কোনো কথা না-ব'লে ফগকে টানতে-টানতে রাস্তায় নিয়ে গেলো সে, একটা ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে বললে : 'রিফর্ম ক্লাব। জলদি ! জলদি ! হাজার টাকা বখশিশ !'

ফগের এ-রকম ভুল কেন হয়েছিলো ? দিন গুনতেই কী ভুল করেছিলেন ?

এর জবাব কিন্তু খুবই সোজা। নিজের অজান্তেই ফগ অল্প-অল্প ক'রে চব্বিশ ঘণ্টা সময় অগ্রবর্তী হয়েছিলেন। লণ্ডন থেকে যাত্রা করা অব্দি বরাবর তিনি পুবদিকে আসছিলেন কাজেই মোটের উপর একদিন বেড়েছিলো। যদি পশ্চিম থেকে চলতেন তবে তাঁকে একদিন পিছিয়ে পড়তে হ'তো। বরাবর পুবদিকে যেতে-যেতে ফগ ক্রমে দক্ষিণ মেরুর কাছে এসে পড়েছিলেন। কাজেই প্রত্যেক ডিগ্রিতে দিন চার মিনিট ক'রে ছোটো হচ্ছিলো। সুতরাং তিনশো ষাট ডিগ্রিতে মোটের উপর চব্বিশ ঘণ্টা অগ্রবর্তী হয়েছিলেন।

আরো খোলশা ক'রে বলতে গেলে বলতে হয়, ফগ পুবদিকে এগুতে-এগুতে আশিবার সূর্যকে দেখেছিলেন মাথার উপর, আর ঠিক সেইটুকু সময়ের মধ্যেই তাঁর বন্ধুরা লণ্ডনে ব'সে সূর্যকে দেখেছিলেন ঊনআশিবার। এতেই একদিনের গণ্ডগোল হয়েছিলো।...

সেই আশ্চর্য বাজির কাহিনী তাই এবারে শেষ করতে হয়। কারণ ফিলিয়াস ফগের গলায় এখন দুলছে জয়মাল্য—ফগই বাজি জিতেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে বাজির গল্পও তো শেষ হ'য়ে যেতে বাধ্য। নয়-কি ?

---

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# ইন সার্চ অভ দ্য কাস্টঅ্যাওয়েজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্র থ ম

# মুশকিল আসানের তিন তলব

## এক

## হাঙরের পেটে এ-কোন লেখা

হাওয়া আসছিলো দক্ষিণপশ্চিম থেকে। সেই হাওয়া ঠেলে ভেসে চলেছিলো মস্ত-একটা প্রমোদতরী, উত্তর প্রণালী দিয়ে। মাস্তুলের ডগায় পৎপৎ ক'রে উড়ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঝাণ্ডা, তার নিচে নীল বলয়ের ওপর সোনালি জরিতে লেখা E.G., আর তাকে ঘিরে আছে বংশপ্রতীক, ছোটো-একটি মুকুট, কোনো আর্ল-এর পারিবারিক আভিজাত্যের চিহ্ন নিশ্চয়ই। বাষ্পেচলা এই প্রমোদতরীটির নাম *'ডানকান'*। *'ডানকান'*-এর মালিক লর্ড এডওয়ার্ড গ্লেনারভন হাউস অভ লর্ডস-এ যান বটে, দেশের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নিয়ে সেখানে কথাও বলেন, তবে তাঁর রক্তের মধ্যে আছে নীল সমুদ্রের নেশা: লালরক্ত যতটা-না নীল, তার চাইতেও বেশি-নীল বোধহয় এই সমুদ্রের টানই। রয়্যাল টেমস ইয়ট ক্লাবের তিনি নামজাদা সদস্য—কতবার যে তাঁর বিলাসবহুল ইয়ট নিয়ে পাড়ি দিয়েছেন, বাজি লড়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এবার কিন্তু নিছক দৌড়ের বাজি বা অ্যাডভেনচারের নেশায় তিনি তাঁর এই মস্ত প্রমোদতরীটি নিয়ে এই প্রণালীর জলে বেরিয়ে পড়েননি, এবার তিনি বেরিয়েছেন তাঁর নবপরিণীতা পত্নী তরুণী লেডি হেলেনাকে নিয়ে, নিছকই শখের বেড়ানো। সঙ্গে আছেন তাঁর তুতোভাই মেজর ম্যাকন্যাব্‌স। গোড়ায় যাবেন গ্লাসগো, তারপর বারদরিয়ায় প্রমোদভ্রমণে।

জুলাই মাস শেষ হ'তে চলেছে, আজ ২৬ তারিখ, বছরটা ১৮৬৪, ভরা গ্রীষ্ম। কিন্তু গ্রেটব্রিটেনে গ্রীষ্মকাল সবসময়ে তো ঠিক গ্রীষ্মকাল নয়, আবহাওয়ার মর্জি কারু বোঝাই দায়; হয়তো দিনের পর দিন সূর্যের দেখাই পাওয়া গেলো না, আকাশ ভরা রইলো নিচু, ভারি মেঘে, কালো বা ধূসর; বৃষ্টি পড়লো টিপটিপ বা ঝমঝম; হাওয়া গর্জালো তারই সাথে পাল্লা দিয়ে, উত্তুরে হাওয়া, কনকনে-ঠাণ্ডা। অতএব গ্রীষ্মকালেও ঠাণ্ডা এড়াবার জন্যে প'রে থাকো জবড়জং ভারি পশমি পোশাক; শুধু-যে কনকনে ঠাণ্ডা তা-ই নয়, তারই সঙ্গে অসহ্য হ'য়ে ওঠে দিনরাত্তির এই ভেজা-ভেজা ভাবটা। মনে হয় হাড়গোড়ও এই বর্ষার হাওয়ায় শ্যাওলা গজিয়ে জ'মে যাচ্ছে। এবার কিন্তু গ্রীষ্মের চালটা একটু অন্যরকম। বেশ ঝকঝকে রোদ্দুর ছিলো গত কয়েক সপ্তাহ, আকাশ ছিলো



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীল, আর অবহাওয়া ছিলো মোলায়েম। সেইজন্যেই হঠাৎ মাথায় এসেছিলো নতুন-বিয়ে-করা স্ত্রীকে নিয়ে সমুদ্রে কোথাও বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়। এরপর আবহাওয়া যদি দুম ক'রে ঝোড়ো হ'য়ে ওঠে, তাহ'লেও অবশ্যি ভাবনা নেই—*ডানকান* চলে বাষ্পের জোরে, মাস্তুলের পাল হাওয়ার কৃপা পাবে ব'লে হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে থাকে না; বিলাসের সমস্ত আধুনিক উপকরণ আছে জাহাজে, বাড়ির আরামের চাইতে কোনোদিক থেকেই কম নয়। আর বাড়িতে থেকেই বা করতেন কী? ক্লাব, পার্টি, নাচের মজলিশ, সাম্রাজ্যের কোথায় কী অঘটন ঘটছে সে নিয়ে আলোচনা আর তর্কাতর্কি, আর নয়তো কখনও-কখনও কোথাও পিকনিকে বেরিয়ে-পড়া: একঘেয়ে কাটছিলো জীবন, উত্তেজনাহীন, অলস, নিস্তরঙ্গ। বরং সমুদ্র সবসময়েই চঞ্চল—সবসময়েই বিষম তাড়া ক'রে কোথাও চলেছে, আর ঢেউয়েরা রহস্যময় কোন-এক ভাষায় অস্ফুট স্বরে সারাক্ষণই কী কথা শুনিয়ে চলেছে। জাহাজ মানে হ'লো 'চলন্তের মধ্যে আরেক চলন্ত'—কোথায় যেন এ-রকম একটা কথা একবার শুনেছিলেন লর্ড এডওয়ার্ড। 'চলো কোথাও'—সমুদ্রেরও তো এটাই সুর। কাজেই চলো, বেরিয়ে-পড়া যাক।

তাছাড়াও আরো-একটা উদ্দেশ্য ছিলো বৈকি লর্ড এডওয়ার্ডের। তাঁরই নির্দেশ-মাফিক, তাঁরই নকশা অনুযায়ী, সদ্য কারখানা থেকে বেরিয়ে এসেছে *ডানকান*, তাঁর নবপরিণীতা স্ত্রীকে এটাই তাঁর বিশেষ উপহার। কিন্তু এই ঝকঝকে জাহাজটি নিয়ে যদি বারদরিয়ায় পাড়ি জমিয়ে পরখ ক'রেই দেখা না-গেলো তবে বুঝবেন কী ক'রে *ডানকান* কেমন জাহাজ—কেমন মজবুত আর কাজের। অন্তত মহড়া দেবার জন্যও একবার বেরুতে হয় বৈ কি। আর এইজন্যেই তবতর ক'রে *ডানকান* এখন চলেছে প্রণালীর জলে—আগে হ'লে বলা যেতো মস্ত-এক রাজহাঁস যেন অনায়াসে সাবলীলভাবে চলেছে; এখন অবশ্য এই কলের জাহাজ, যার চোঙ থেকে গলগল ক'রে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, তাকে ঠিক পুরোনো কবিতার মতো রাজহাঁসের সঙ্গে তুলনা দেয়া ঠিক হবে না, সেজন্যে আরো-একটা নতুন-কোনো প্রাণীর কথা ভেবে নিতে হয়, কিন্তু মোদ্দা কথাটা মানতেই হয়: *ডানকানের* চলবার ভঙ্গি ছন্দোময়, সাবলীল, অনায়াস—এমন সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে পুরোনো পালের জাহাজ সচরাচর যেতে পারতো না। লর্ড এডওয়ার্ড ভারি খুশি *ডানকান* জাহাজের চলবার ভঙ্গি দেখে। কাপ্তেন জন ম্যাঙ্গল্‌সও এই জাহাজের ভার পেয়ে খুব খুশি। সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত তিনি চ'ষে বেরিয়েছেন জাহাজে-জাহাজে, অনেক ভালো জাহাজেও কাজ করেছেন আগে, তবে এই *ডানকান* জাহাজের সঙ্গে সেগুলোর কোনো তুলনাই হয় না।

লর্ড এডওয়ার্ড রক্তের মধ্যে চাঞ্চল্য বোধ করছিলেন ব'লে নিজেই স্ত্রীকে নিয়ে জাহাজে এসে উঠেছেন। তখনও তিনি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেননি তাঁর এই ছটফটে অস্বস্তিটায় আসলে আরো-কোনো বড়ো অভিযানেরই পূর্ববোধ ছিলো—সত্যি-বলতে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো অভিযানের কথাই তিনি ভাবেননি, শুধু একটু বেড়ানো সমুদ্রে, আর নতুন জাহাজটার কেরামতি হাতে-কলমে বা জলে ভাসিয়ে পরখ ক'রে দেখা—এই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য।

বেশ-খানিকটা পথ অনায়াসেই চ'লে এসেছে *ডানকান*—কোনো অস্বস্তি বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোঝা যায়নি, একটুক্ষণের মধ্যেই গতি দ্রুত ক'রে ফেলতে পারে এই কলের জাহাজ, আবার ইচ্ছে করলে তাকে মন্থরও ক'রে আনতে পারে;—তাকে বাতাসের গতি বা জলের উচ্ছ্বাস—কোনোকিছুর ওপরই নির্ভর করতে হয় না। মাঝি-মাল্লারাও এই নতুন জাহাজটা হাতে পেয়ে উৎসাহভরে কাজে লেগেছে। সত্যি-বলতে, কেউ যদি একবার নাবিক হয়, রক্তে যদি একবার সমুদ্রের নেশা ঢুকে যায়, তাহ'লে ডাঙায় আর কিছুতেই তার মন ওঠে না—এই মাঝিমাল্লারাও ডাঙায় ব'সে কবে *ডানকান* জলে ভাসবে তারই প্রতীক্ষায় ছটফট করছিলো। এখন তারা এই আনকোরা মজবুত জাহাজটা হাতে পেয়ে ভারি খুশি।

আজকের দিনটা ভারি চমৎকার। ঝকঝকে মুচমুচে রোদ্দুর, আকাশ ঘন-নীল, শুধু অনেক ওপরে ধূসর ও শাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, সমুদ্রের সবুজ জলেও বাড়তি কোনো ঢেউ বা ছটফটানি নেই : *ডানকান* জাহাজ তার এই *ট্রায়াল রানে* চমৎকার চলেছে।

সেইজন্যই একটু বাদে যখন দূরে জলের ওপর একটা ক্ষুব্ধ আলোড়ন দেখা গেলো তখন লর্ড এডওয়ার্ড বেশ অবাকই হ'য়ে গেলেন—মনে হ'লো সমুদ্রের জল তোলপাড় ক'রে কী-একটা যেন ওদিকটায় এক ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে। কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস নিশ্চয়ই বলতে পারবেন ব্যাপারটা কী—ঐ আজব, অতিকায় জলস্তম্ভেরই বা কী কারণ। দুরবিনে চোখ লাগিয়ে মনে হচ্ছে কোনো মাছ—কিন্তু হঠাৎ এই সময়ে স্কটল্যাণ্ডের সমুদ্রে এ কোথাকার অতিকায় মাছ?

লর্ড এডওয়ার্ডের প্রশ্নের উত্তরে কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস দুরবিনে চোখ এঁটেই ব'লে উঠলেন : 'এ তো হাঙরেরই এক জাতভাই!'

'হাঙর!' লর্ড এডওয়ার্ড বিস্মিত। 'এখানকার সমুদ্রে হাঙর আছে নাকি?'

'প্রায়ই আসে। এ অবশ্য কোনো সাধারণ জাতের খুদে হাঙর নয়—বরং সাধারণ হাঙরের চাইতে একে আলাদাই দেখায়। যদি অনুমতি করেন তো লেডি হেলেনাকে আমরা হাঙর কী ক'রে ধরে তারই একটা নমুনা দেখিয়ে দিই। মাছটা সত্যি বড়ো, তাছাড়া স্বভাবটাও বেয়াড়া। জেলেদের ছোটো নৌকোগুলোর ওপর উৎপাত করতে পারে—ফলে একে নির্মূল করাই ভালো।'

'তাহ'লে তা-ই করো। এ-বিষয়ে তুমি যা বলবে তা-ই হবে।'

লর্ড এডওয়ার্ড গিয়ে লেডি হেলেনাকে ডেকের ওপর ডেকে নিয়ে এলেন।

ঝকঝকে রোদ্দুর আর সমুদ্রও প্রধানত শান্তই—তাই এই অতিকায় হাঙরটার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাপাদাপি স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসের হুকুমে মাল্লারা সাজো-সাজো ভঙ্গিতে লড়াইয়ের প্রাথমিক প্রস্তুতিটা সেরে ফেললে। মস্ত-একটা আঁংটায়—তাকে বঁড়শি বলাই ভালো, যেমন অতিকায় মাছ তেমনি অতিকায় বঁড়শি—মাংসের টুকরো গেঁথে মাল্লারা জলে ফেলে দিলে। আংটাটা শক্ত কাছিতে বাঁধা, অনেকটাই বড়ো, দরকার হ'লে দড়ি ছেড়ে দিয়ে জলের মধ্যে হাঙরটাকে খেলানো যাবে। কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস অবিশ্যি নিছক মাছধরা দেখাবেন ব'লেই এটাকে ধরবার উদ্যোগ নেননি। এত-বড়ো মাছটা ধরতে পারলে অনেকটা তেল পাওয়া যাবে। হাঙরের তেল তো সবসময়েই কাজে লাগে। ওষুধ হিশেবে তো বটেই, তবে দরকার হ'লে এই চর্বিতে অন্য কাজও করা যাবে।

অনেকটা দূর থেকেই মাংসের গন্ধটা পেয়েছিলো মাছটা, কিংবা তার দৃষ্টিও ঘ্রাণশক্তির মতোই প্রখর ছিলো। তীরের মতো ছুটে এলো সে, যেন ছোঁ মেরে পড়বে। জলের ওপর দেখা যাচ্ছে প্রচণ্ড গতিতে তার কালো পাখনাটা ছুটে আসছে, ডগাটা ছাইয়ের মতো ধূসর। কাছে এলে চোখে পড়লো তার মস্ত দুটি ভাঁটার মতো চোখ, রাক্ষুসে খিদেয় মুখটা হা-করা, সারি-সারি দাঁত দেখা যাচ্ছে। প্রকাণ্ড মাথাটাকে দেখাচ্ছে অতিকায় কোনো হাতুড়ির মতো। এর পাখনার ঝাপট, জোয়ালের জাঁতিকল কিংবা মুগুরের মতো মাথাটার ঘা—কোনোটাই সাধারণ ছোটো জেলেডিঙির পক্ষে মনোরম হ'তো না। কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসই ঠিক বলেছেন । এ-জীবকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই।

কাছে এসেই মাছটা একটা গোঁত্তা খেয়ে ছোঁ মেরে পড়লো মাংসের টোপটার ওপর, আর সে মাংসের টুকরোটা গিলতেই মাল্লারা হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টান দিলে আর অমনি আংটাটা তার গলায় আটকে গেলো। তারপর শুরু হ'লো দড়ি টানাটানির খেলা। অতজন মাল্লা মিলে কাছিটাকে ধ'রে টান দিচ্ছে, হাঙরটা গলায় বঁড়শি বিঁধে যাওয়াতে ছটফটও করছে, কিন্তু তাই ব'লে মোটেই জল ছেড়ে ওঠবার লক্ষণ দেখাচ্ছে না। ও-রকম অস্থিরভাবে দাপাচ্ছে দেখে তার ঝটপটি কমাবার জন্যে পাখনার ওপর দিয়ে একটা দড়ির ফাঁসও পরিয়ে দেয়া হ'লো তাকে। তারপর আধঘণ্টা ধুন্ধুমার কাণ্ডর পর তাকে তোলা হ'লো ডেকে, মাল্লাদের একজন তক্ষুনি একটা কুঠারের কোপে তার পুচ্ছটাকে আলগা ক'রে দিলে। কিন্তু তার আগেই দেখা হ'য়ে গেছে দুই পাখনা, লম্বা পুচ্ছ, ফোলা পেট, লম্বা শরীর, মুগুরের মতো মাথা—সব মিলিয়ে প্রকৃতিঠাকরুন কী-একটা অদ্ভুত কারখানা সৃষ্টি করেছেন। সে যখন ছোটে জলের মধ্যে তখন তার ঐ পাখনা আর পুচ্ছই তাকে গতি- বা লক্ষ্য- ভ্রষ্ট হ'তে দেয় না। হাঙরটার ল্যাজে যে-কোপ দেয়া হয়েছিলো তার কারণ অতর্কিতে সে যাতে ল্যাজটা দিয়ে একটা মরণঝাপট দিতে না-পারে। লেডি হেলেনা কিন্তু এই ভয়ানক রক্তক্ষয়ী দৃশ্যটা দেখে কেমন আঁৎকে উঠেছিলেন, তিনি চটপট তাঁর ক্যাবিনে ফিরে গেলেন। এই রক্তারক্তি কাণ্ডটার জন্যে তিনি তাঁর মনোরম প্রমোদভ্রমণের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিজ্ঞতাটাকে মাটি ক'রে দিতে চান না।

অনেক প্রাণী আছে, মাংসাশী বটে, তবে খিদে না-থাকলে অন্য প্রাণীকে আক্রমণ করে না। হাঙররা মোটেই তা নয়, তারা ঝাঁক বেঁধে থাকে, সবাই মিলে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের ওপর, মুহূর্তে সব সাবাড় ক'রে দেয়। কুকুরমাছের জাতের এই মাছটা দলছাড়া হ'য়ে পড়েছিলো—সে কি একাই তার রাক্ষুসে খিদেটাকে নিবৃত্ত করবার জন্যে? সে অবশ্য একাই একশো।

মাল্লারা সাধারণত হাঙর ধরলেই পেট চিরে দেখে নেয় কী-কী সে গলাধঃকরণ করেছে ম'রে যাবার আগে। পুচ্ছহীন হ'লেও তার দাপাদাপি তখনও আদৌ তুচ্ছ নয়। সে তখনও ফোঁস-ফোঁস ক'রে নিশ্বেস নিচ্ছে আর ছটফট করছে। লম্বায় সে দশফুটের ওপর, ওজনটাও কোন-না ছশো-সাড়ে ছশো পাউণ্ড। মাল্লারা কয়েকজন মিলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, কিন্তু প্রথমেই পেট চিরে দেখা গেলো পেট খালি, পেটের মধ্যে কিচ্ছু নেই। মাংসের টুকরোটার গন্ধ পেয়েই সে-যে অমনভাবে ধেয়ে এসেছিলো তা সম্ভবত খিদেয় এমন হন্যে হ'য়ে ছিলো ব'লেই। কেটে সেটাকে টুকরো-টুকরো ক'রে ফেললে মাল্লারা, চর্বিটা সরিয়ে রেখে এই জলরাক্ষসের দেহাবশেষ জলে ফেলতে গিয়েও মাল্লারা থমকে গেলো, কেননা তাদের মধ্যে একজন তখন চেঁচিয়ে উঠেছে, 'আরে! ওটা কি আটকে আছে পাকস্থলিতে?'

'হবে কোনো নুড়িপাথর! যা রাক্ষুসে খাই-খাই, খিদের জ্বালায় হয়তো তা-ই খেয়ে ফেলেছে।' বললে আরেকজন।

টম অস্টিন—সে এই *ডানকান* জাহাজের ফার্স্টমেট—বললে, 'ধুর আহাম্মক! দেখছিস না এ ছিলো পাঁড়মাতাল। ওটা নুড়িপাথর নয় মোটেই। আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি একটা বোতল।'

এই শোরগোল শুনে লর্ড এডওয়ার্ড এগিয়ে এসেছিলেন কাছে। অবাক হ'য়ে বললেন : 'বোতল! হাঙরের পেটে বোতল! এমন কথা তো কস্মিনকালেও শুনিনি যে হাঙর বোতলশুদ্ধু মদ খেয়ে ফ্যালে! বোতলটা বার করো পেট থেকে! অনেক সময় লোকে দরকারি কাগজপত্র পুরে ছিপি এঁটে সমুদ্রে বোতল ভাসিয়ে দেয়। এটা হয়তো সে-রকমই কিছু। কই, নিয়ে এসো ওটা।'

হাঙরের পেট থেকে বোতলটা বার ক'রে নিয়ে আসা হ'লো। তাকে ধুয়েটুয়ে সাফসুতরো ক'রে বোতলটা রাখা হ'লো টেবিলে। লর্ড এডওয়ার্ড, মেজর ম্যাকন্যাব্স, কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস—এঁদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে লেডি হেলেনাও কৌতূহলী হ'য়ে পাশে এসে দাঁড়ালেন।

লর্ড এডওয়ার্ড বোতলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আগাপাশতলা সেটা নিরীক্ষণ করলেন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখে মেজর ম্যাকন্যাবস বললেন, 'হুম! শ্যাম্পেনের বোতল!' তিনি সেটা জানতেই পারেন, সামরিক ব্যাবাকে অস্ত্রশস্ত্র, কুচকাওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে নানাবিধ পানীয়রও চর্চা হ'য়ে থাকে।

'কীসের বোতল জেনে আর কী হবে,' লেডি হেলেনা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে বললেন, 'হঠাৎ হাঙরের পেটে কোত্থেকে এলো, সেটাই জানতে চাই।'

'অনেকদিন নিশ্চয়ই জলে ভেসেছিলো। কী-রকম শ্যাওলা পড়েছে ওপরটায় দেখেছো?' লর্ড এডওয়ার্ড বললেন, 'হাঙরটার পেটে হয়তো খুব বেশিদিন যায়নি।'

ছিপিটা খুলতে গিয়ে দেখা গেলো এতদিন জলে থাকার ফল ফলেছে—ভেতরটায় জল ঢুকে গিয়েছে।

'বিচ্ছিরি কাণ্ড হ'লো তো! ভেতরে জল ঢুকেছে দেখছি। তাহ'লে কি আর ভেতরে যা ছিলো তা আর অটুটু থাকবে?'

বোতলের ছিপিটা খোলবার পর একটা বিশ্রী আঁশটে গন্ধে আশপাশ ঝিমঝিম ক'রে উঠলো।

ভেতরে কিন্তু সত্যি-কিছু আছে। কাগজ? সে-রকমই তো দেখাচ্ছে। কিন্তু ভেতরে সেটা আটকে গিয়েছে—সম্ভবত জলে ভিজে গিয়েই।

'বোতলটা ভেঙে ফেললেই তো হয়?' মেজর ম্যাকন্যাবস অমনি সমাধানটা বাৎলে দিলেন।

'তার চাইতে বরং বোতলের মাথাটাই ভাঙা যাক,' কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসের সুপরামর্শ। 'তাহ'লে হয়তো ভেতরের জিনিশটা নষ্ট হবে না।'

হাতুড়ি ঠুকে বোতলের মাথাটা ভাঙা হ'লো। ঝনঝন ক'রে চারপাশে ছড়িয়ে পড়লো ভাঙা কাচ। সন্তর্পণে কাচের টুকরো ছাড়িয়ে নিয়ে ভেতর থেকে তিন-তিনটে পার্চমেন্ট বার ক'রে এনে বিছিয়ে রাখা হ'লো টান-টান ক'রে।

দেখা গেলো, তিনটে পার্চমেন্টেই জল লেগে লেখা প্রায় ঝাপসা হ'য়ে এসেছে। অনেকক্ষণ ধ'রে আলোর সামনে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন লর্ড এডওয়ার্ড। কী লেখা আছে এগুলোয়?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

## দুই

# একে তিন তিনে এক

ভালো ক'রে দেখে নিয়ে লর্ড এডওয়ার্ড বললেন, 'এ-যে দেখছি তিন-তিনটে আলাদা দলিল। একেকটা একেক ভাষায় লেখা। এটা আলেমান, এটা ইংরেজি—আর এইটে ফরাশিতে লেখা।'

'কী লেখা আছে ? পাঠোদ্ধার করা যায়?' লেডি হেলেনা কৌতূহলী হ'য়ে জিগেস করলেন।

'উঁহু। সব কথা পড়া যাচ্ছে না যে। কিছু-কিছু লেখা জলে মুছে গিয়েছে যে।'

'তিনটে দলিলে যদি একই কথা তিন ভাষায় লেখা হ'য়ে থাকে, তাহ'লে হয়তো তিনটে একসঙ্গে মিলিয়ে প'ড়ে দেখলে একটা মর্মোদ্ধার করা যাবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। আচ্ছা, প্রথমে ইংরেজিটা দেখা যাক।'

ইংরেজিতে লেখা দলিলটা টান ক'রে টেবিলে বিছিয়ে রাখার পর দেখা গেলো, তা থেকে শুধু এটুকুই পাঠোদ্ধার করা যাচ্ছে :

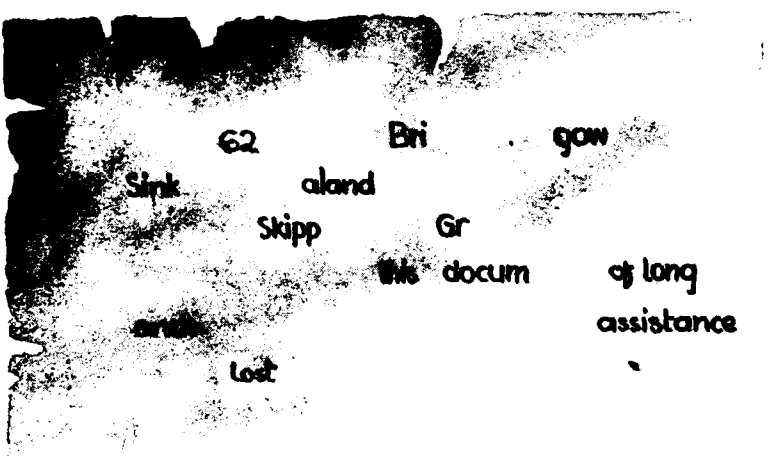


বেশ-খানিকক্ষণ লেখাটা প'ড়ে মর্মোদ্ধার করার ব্যর্থচেষ্টা ক'রে হতাশ হ'য়ে মেজর ম্যাকন্যাবস মন্তব্য করলেন, 'উঁহু, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। একটা বাক্যও আস্ত নেই —কিছু বোঝা যাবে কী ক'রে ?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কোনো গোটা বাক্য না-থাকলেও কতগুলো শব্দ তো আস্ত আছে। এই-যে, দ্যাখো-না, Sink, aland, This, and lost এই শব্দগুলো কিন্তু ঠিকই আছে। আর ঐ Skipp নিশ্চয়ই Skipper কথাটারই গোড়ার দিক। Gr-এটার G বড়োহাতের হরফ ব'লে মনে হয়, কোনোকিছুর নাম। Skipper যদি আমরা ঠিকঠাক ভেবে থাকি, তবে এই Gr হয়তো জাহাজটারই নাম--আর ssistance কথাটা থেকে মনে হয় সাহায্য চাচ্ছে। সম্ভবত Gr জাহাজটা ডুবে গেছে, বা এমনভাবে ভেঙে গিয়েছে যে আর নাব্যতার উপযোগী নেই। সেই জন্যেই এই assistance চাইবার প্রার্থনা।'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস বললেন, 'ssistanceটা যে assistanceএরই শেষাংশ সেটা আপনি ঠিকই ধরেছেন। docum কথাটা সেভাবেই নিশ্চয়ই document কথাটার গোড়ার দিক—শেষটা মুছে গিয়েছে।'

'হয়তো এই অনুমানগুলো ঠিক, তবে যেহেতু অনেকগুলো লাইন নেই, কোনো বাক্যই নেই পুরোপুরি, তাতে আসল ব্যাপারটাই জানা যাচ্ছে না। যদি জাহাজডুবির পর কেউ সাহায্য চেয়ে এই দলিলটা বোতলে পুরে জলে ভাসিয়ে দিয়ে থাকে, ধ'রে নিলুম তা-ই হয়েছে, কিন্তু এই তথ্যগুলো নেই জাহাজটার নাম কী, কোথায় যাচ্ছিলো ; কোন্ দেশের জাহাজ (কারণ বাকিগুলো তো ইংরেজিতে লেখা নয়—আলেমান আর ফরাশিতে) তাও বোঝা যাচ্ছে না। কবে কোথায় গিয়ে জাহাজটা বিপাকে পড়েছে তারও কোনো হদিশ নেই। আমরা যা জানতে পাচ্ছি, তার অনেকটাই অনুমানের ওপর নির্ভর ক'রে—' মেজর ম্যাকন্যাবস জানালেন।

দু-নম্বর পার্চমেন্টটার গায়ের লেখা প্রথমটার চাইতে আরো অবোধ্য—প্রায় পুরোটাই নষ্ট হ'য়ে গেছে। পার্চমেন্টে যা পড়া গেলো, তা এই :

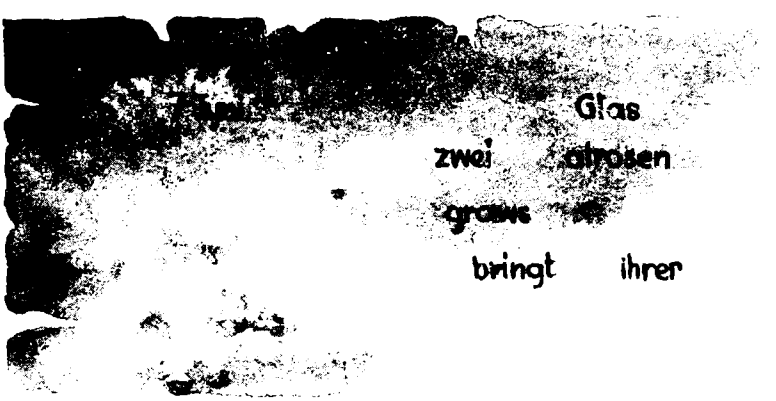


'ৎস্‌ভাই, আট্রোসেন, ব্রিংগট ইরেন—' কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস কথাগুলো জোরে-জোরে উচ্চারণ করলেন। 'আলেমান ভাষা,' বললেন তিনি, 'তাছাড়া হরফগুলো গথিক। সিবেন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউনি অর্থাৎ সাত জুন। ইংরেজি কাগজটার 62 যদি তারিখেরই অংশ হয় তাহ'লে এই দুটো জুড়ে পাওয়া যাচ্ছে সাত জুন, ১৮৬২। আলেমান দলিলে আছে Glass, ইংরেজিতে আছে Gow—জুড়ে দিলে হবে Glassgow, অর্থাৎ জাহাজটা ছিলো গ্লাসগোর। পরের একটা লাইন কিছুই পড়া যাচ্ছে না—শুধু ঝাপসা কালির দাগ। কিন্তু তারপরেই রয়েছে ৎসভাই—zwei—মানে দুই, মাঝে ফাঁক দেখে মনে হয় attrosenএর আগে অন্তত একটা হরফ ছিলো—যদি mattrosen হয় তবে বোঝাবে নাবিক, মাঝিমাল্লা। ঐ graus কথাটার মানে ঠিক ধরতে পারছি না। কিন্তু অন্য দুটো কথা তো আস্তই আছে bringt ihren—মানে bring them—ওদের নিয়ে এসো; এখন ssistance বা assistanceএর সঙ্গে যদি জোড়া যায় তাহ'লে দাঁড়াবে bring them assistance—মানে ওদের কাছে সাহায্য নিয়ে এসো। ওদের সাহায্য করো।'

লর্ড এডওয়ার্ড বললেন : 'সাহায্য চাইছে ? কারা ?'

মেজর ম্যাকন্যবস বললেন : 'তাছাড়া এরা কোন্ ধরনের সাহায্য চাইছে তাও তো আমরা জানি না।'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস তৃতীয় পার্চমেন্টটা নেড়ে-চেড়ে বললেন : 'কী ধরনের সহায়তা পাঠাতে হবে, তা সম্ভবত পরের লেখাটায় চোখ বুলিয়ে নিলেই বোঝা যাবে। যেহেতু ফরাশিতে লেখা, কারুপক্ষেই বুঝতে অসুবিধে হবে না।'

'ত্রোয়া—*trois*—মানে তো তিন, আর mats —সেটা সম্ভবত মাস্তুলই বোঝাচ্ছে —তিন মাস্তুলের জাহাজ।' লর্ড এডওয়ার্ড হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন। 'ইংরেজি আর ফরাশি লেখা মিলিয়ে তো জাহাজটার নামও পাওয়া যাচ্ছে—ব্রিটানিয়া—*Britannia*! অর্থাৎ গ্রেটব্রিটেনের জাহাজ! আর *Austral* ইংরেজিতেও যা বোঝাচ্ছে ফরাশিতেও তা-ই—অর্থাৎ দক্ষিণ গোলার্ধের কথা—'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস বললেন : 'তার মানে, দক্ষিণ গোলার্ধে জাহাজডুবি হয়েছে!'

কথাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে লর্ড এডওয়ার্ড আরো-কতগুলো ব্যাপার আন্দাজ ক'রে নিলেন। শব্দের ভাঙাচোরা টুকরো থেকেই অনুমান ক'রে নিতে হবে গোটা শব্দটা—এবং কোনো নৌযাত্রার সঙ্গেই যেন সে-সব শব্দের একটা সংগতি থাকে। আর এই সূত্রটা ধ'রেই সশব্দে অনুমান দাঁড় করালেন লর্ড এডওয়ার্ড : '*abor* ধ'রে নিলুম *aborder* এর প্রথম অংশ মানে জমিতে নামা। যাত্রীরা ডাঙায় নেমেছে। কিন্তু কোথায়? *Contin*—তা নিশ্চয়ই Continentই বোঝাচ্ছে—কোনো-একটা মহাদেশ—'

'দক্ষিণ গোলার্ধের মহাদেশ?' মেজর ম্যাকন্যাব্‌স তাঁর অনুমানের ঢিল ছুঁড়লেন।

'এটা খেয়াল করেছেন?' কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস ব'লে উঠলেন, '*cruel* শব্দটা থেকে আলেমান শব্দ *graus*-এরও একটা আঁচ পাওয়া যাচ্ছে—*grausam*—অর্থাৎ *gruesome* —ভয়ংকর-নিষ্ঠুর।'

'*Indi* তাহ'লে কি *India*—ভারতবর্ষ? আর *ongit* ই বা কী—আরে! সেটা নিশ্চয়ই *longitude*এরই ধ্বংসাবশেষ—দ্রাঘিমা। তাহ'লে *lat* হ'লো অক্ষরেখা, *latitude*—৩৭ ডিগ্রি ১১। তাতে তো ঠিকানাটাই পেয়ে-যাওয়া গেলো, অন্তত তার একটা মোটামুটি আন্দাজ।'

'দ্রাঘিমা কত না-জানলে আর মোটামুটি ঠিকানা তুমি পেলে কোথায়?' মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স ফ্যাকড়া তুললেন।

'আগে তো তিনটের বয়ান মিলিয়ে সবটা লিখে ফেলা যাক—একসঙ্গে চোখের সামনে যদি থাকে, তাহ'লে হয়তো হেঁয়ালিটার একটা নিষ্পত্তি হবে—' বললেন লর্ড এডওয়ার্ড।

'যারা এই পার্চমেন্টগুলো বোতলে পুরেছিলো, তারা কিন্তু কোনো ধাঁধা বা হেঁয়ালি তৈরি করতে চায়নি—তারা ঠিকঠাক জানাতে চেয়েছিলো কোথায় কী হয়েছে। শুধু প্রকৃতির কৃপাতেই খানিকটা লেখা মুছে গিয়ে জট পাকিয়ে গেছে।' কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস বললেন।

'সেইজন্যেই একসঙ্গে সাজিয়ে নিলে সুবিধে হবে। তাছাড়া লেখাগুলো সব পশ্চিম ইওরোপের নানা ভাষায়—আর আমরা যদি জাহাজের নামটা সঠিক অনুমান ক'রে থাকতে পারি, *ব্রিটানিয়া*, তাহ'লে সেটা মোটেই অস্বাভাবিক হয়েছে ব'লেও মনে হয় না। এবার সবগুলো লেখা একসঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাক তা থেকে জটটা খোলবার কোনো হদিশ মেলে কি না।'

তিনটে পার্চমেন্টের লেখাকেই সাজিয়ে নিয়ে ইংরেজিতে লিখে ফেললেন লর্ড এডওয়ার্ড।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

June 7th 1862 frigate Britannia Glasgow
went down —gonie austral—
by land two sailors
Captain Gr— land
Contin— pr— cruel indi—
thrown this paper in longitude
and latitude 37°11' Take them help
lost

লেখাটা যখন তাঁরা খতিয়ে দেখছেন, তখন মাল্লাদের একজন এসে জানতে চাইলে এবার *ডানকান* জাহাজ কোনদিকে যাবে। পুরোটাই তো এই আনকোরা জাহাজটার মহড়া চলেছে, এমনিতে তার বিশেষ-কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্যই নেই। এবার অবশ্য ঠিক ক'রে নেয়া দরকার *ডানকান* ফিরে যাবে কি না।

প্রশ্ন শুনে লর্ড এডওয়ার্ড বললেন : 'ডামবার্টন চলো। লেডি হেলেনা ম্যালকম কাসল-এ ফিরে যাবেন। আমি তারপর যাবো লণ্ডনে—নৌবাহিনীর দফতরে গিয়ে এটা দেখাতে হবে। তাছাড়া *ব্রিটানিয়া* সম্বন্ধেও খোঁজ-খবর নিতে হবে আমাদের।'

মাল্লাটি নির্দেশ নিয়ে চ'লে গেলে লর্ড এডওয়ার্ড লেখাটা তুলে নিয়ে বললেন : 'আমরা তাহ'লে ধরে নিতে পারি যে ১৮৬২ সালের ৭ই জুন একটা ত্রিমাস্তুল যুদ্ধজাহাজ —*ব্রিটানিয়া*—গ্লাসগো থেকে বেরিয়েছিলো—সেটা কোনো অজ্ঞাত কারণে ডুবে গিয়েছে। কাপ্তেন আর তার সঙ্গে দুজন মাল্লা ৩৭°১১´ অক্ষাংশ থেকে তিনটি ভাষায় খবরটা জানিয়ে সাহায্যের প্রার্থনা ক'রে একটা বোতলে লেখাগুলো পুরে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে যদি তারা উদ্ধার না-পেয়ে থাকে, তাহ'লে দু-বছরেরও বেশি হ'লো কোথাও প'ড়ে আছে—'

'যদি-না এর মধ্যে ম'রে গিয়ে থাকে,' বললেন মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স।

'আর যদি বেঁচেও থাকে, তাদের দশা এখন কী হয়েছে, সেটা খানিকটা কল্পনা ক'রে নেয়া যায়,' এতক্ষণে লেডি হেলেনা মুখ খুললেন।

'খুব-একটা ভালো অবস্থায় নেই সম্ভবত,' লর্ড এডওয়ার্ডকে একটু উদ্বিগ্নই দেখালো। 'কিন্তু একটা মুশকিল হয়েছে, তার সমাধান কী, আমার মাথায় আসছে না। জাহাজটা ডুবেছে সম্ভবত দক্ষিণ গোলার্ধের কোথাও। কিন্তু ঐ gonie শব্দটার মানে কী হ'তে পারে?'

'ওটা তো ফরাশি লেখাটার টুকরো—ফরাশি ভাষায় যাকে Patagonie বলে, ইংরেজিতে তাকেই বলে Patagonia। এটা সেই পাতাগোনিয়া কথাটারই ভগ্নাংশ নয় তো?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পাতাগোনিয়া কি ৩৭° অক্ষরেখায় পড়ে?' মেজর ম্যাকন্যাবস জিগেস করলেন।

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস তক্ষুনি আমেরিকার দক্ষিণভাগের মানচিত্র খুলে দেখিয়ে দিলেন সত্যি তা-ই।

'দক্ষিণ আমেরিকা যদি হয় তাহ'লে ধাঁধার জট আরো-খানিকটা খোলা যায়। Contin—তাহ'লে Continent. pr—হ'তে পারে prisoners, আর cruel indi—সেক্ষেত্রে হ'তে পারে cruel Indians। আর এই অনুমান যদি ঠিক হয় তাহ'লে তারা হয়তো নিষ্ঠুর ইণ্ডিয়ানদের হাতে বন্দী হয়েছে। এবং সেক্ষেত্রে তারা এখনও বেঁচে আছে কি না, সে-সম্বন্ধে সংশয়ও জাগতে পারে।'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস বললেন : 'পাতাগোনিয়া দক্ষিণ আরহেনতিনা আর দক্ষিণ চিলের মধ্যে অবস্থিত—তার একদিকে আন্দেয়াস গিরিমালা অন্যদিকে অ্যাটলান্টিক মহাসাগর। তিয়েররা দেল ফুয়েগো এই পাতাগোনিয়ারই অংশ।'

'যদি আরহেনতিনা বা চিলের দক্ষিণভাগেই তা হ'য়ে থাকে, তবে এটা আশ্চর্য যে অন্যান্য ইওরোপীয় ভাষার সঙ্গে এস্পানিওলে কিছু লেখা নেই। তাছাড়া আরহেনতিনার পাম্পায় বা চিলেয় যে-ইণ্ডিয়ানরা থাকে, তারাই বা কতটা নিষ্ঠুর? অকারণে কাউকে বন্দী ক'রে রেখে তারা কি অত্যাচার করবে?' লেডি হেলেনা প্রশ্ন তুললেন।

'এ-সব তো আমাদের অনুমান মাত্র,' লর্ড এডওয়ার্ড বললেন, 'গ্লাসগো গিয়ে না-হয় খোঁজ ক'রে দেখা যাবে *ব্রিটানিয়া* সত্যি-সত্যি কোথায় যাচ্ছিলো। সেখানে নিশ্চয়ই কোনো নথিপত্রে কিছু লেখা থাকবে।'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস বললেন তাঁর কাছে নৌদফতরের গেজেট আছে—সেখানে হয়তো এক্ষুনি কোনো হদিশ পাওয়া যেতে পারে। দু-বছর আগেকার গেজেট বার ক'রেই একটা জরুরি তথ্য বার ক'রে নেয়া গেলো।

'এখানে গেজেটে একটা জ্ঞাপনী আছে। ১৮৬২ সালের ৩০শে মে কাপ্তেন গ্রাণ্ট কাইয়াও থেকে *ব্রিটানিয়া* জাহাজ নিয়ে গ্লাসগোর উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন।'

'কাইয়াও? সে আবার কোথায়?' মেজর ম্যাকন্যাবস জিগেস করলেন।

'কাইয়াও,' গেজেট থেকে মুখ তুলে কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস জানালেন, 'পশ্চিম পেরুর একটা নগর-বন্দর—লিমার পশ্চিমে, কাইয়াও উপসাগরের তীরে অবস্থিত। তেমন-ছোটো শহরও নয়—দেড় লাখের ওপর লোক আছে—'

লর্ড এডওয়ার্ড কিন্তু কাইয়াওয়ের খবর শুনছিলেন না। তিনি বরং *ব্রিটানিয়া* জাহাজের কাপ্তেনের নাম শুনে চমকে উঠেছেন। 'কাপ্তেন গ্রাণ্ট? সেই যিনি প্রশান্ত মহাসাগরে নোভাস্কোশিয়ার পত্তন করতে চেয়েছিলেন—নয়াস্কটল্যাণ্ড?'

'হ্যাঁ। তিনিই। কিন্তু ১৮৬২ সালে *ব্রিটানিয়া* জাহাজ নিয়ে তিনি কোথায় যে নিরুদ্দেশ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ'য়ে গেছেন তা আজও কেউ জানতে পারেনি।'

'তাহ'লে তো আমরা অনেকটাই জেনে যেতে পেরেছি। ৩০শে মে তিনি কাইয়াও থেকে বেরিয়েছিলেন—৭ই জুন অর্থাৎ ঠিক আটদিন পরে পাতাগোনিয়ার কাছে কোথাও—হয়তো উপকূলেই—জাহাজডুবি হয়। এবার তাহ'লে দ্রাঘিমাটা জেনে যেতে পারলেই আমরা বুঝে যাবো সত্যি-কোথায় তাঁর জাহাজডুবি হয়েছিলো।'

'দ্রাঘিমা যদি নাও জানা যায়,' কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস জানালেন, 'পাতাগোনিয়া বা তিয়েররা দেল ফুয়েগো আমার জানা। আমরা সেখানটায় অনায়াসেই পৌঁছে যেতে পারবো।'

'এবার তাহ'লে গোটা সন্দেশটা লিখে ফেলা যাক,' লর্ড এডওয়ার্ড বললেন, 'অন্তত যে-কথাগুলো সম্বন্ধে আমাদের আর-কোনো সন্দেহই নেই, সেগুলো পর-পর সাজিয়ে দেখা যাক কী দাঁড়ায়।'

১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের সাত তারিখে গ্লাসগোর ত্রিমাস্তুল যুদ্ধজাহাজ *ব্রিটানিয়া* দক্ষিণ গোলার্ধে পাতাগোনিয়ার কাছে কোথাও ডুবে গিয়েছে। দুজন মাল্লা আর কাপ্তেন গ্রাণ্ট দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ডের কোথাও গিয়ে নেমেছিলেন, বা নামবার চেষ্টা করেছিলেন—এবং সম্ভবত নামবামাত্র সেখানকার ইণ্ডিয়ানদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন—তাদের বলা হয়েছে ভয়ংকর অথবা নিষ্ঠুর—নামবার সময় ৩৭°১১´ অক্ষরেখায় তাঁরা সাহায্য চেয়ে একটা বোতলে নানা ভাষায় খুঁটিনাটি জানিয়ে তিনটে চিরকুট ভাসিয়ে দিয়েছিলেন—অন্তত আর-কোনো বোতলে এই বার্তা জানিয়েছিলেন কি না জানা নেই—তবে এটায় তাঁরা তিনটি ভাষায় আবেদন জানিয়েছিলেন—যাতে যারই হাতে পড়ুক সে-ই মূল আবেদনটা পড়তে পেরে সাহায্য পাঠাতে পারে।

এই মর্মার্থটা জানবার পর সকলেরই মত হ'লো যে, ব্যাপারটা বাস্তবিকই নিশ্চয়ই তা-ই হয়েছিলো।

লেডি হেলেনা কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসকে জিগেস করলেন : 'তারপর থেকে আজ অব্দি কি আদৌ কোনো খোঁজ মেলেনি তাঁদের?'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস মাথা নেড়ে জানালেন, 'না।'

'কিন্তু এই চিরকুটগুলো দেখালে কি সরকার থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না? *ব্রিটানিয়া* তো একটা যুদ্ধজাহাজ, ফ্রিগেট—তাতে কামানও তো আছে!'

লেডি হেলেনা বললেন, 'আর কাপ্তেন গ্রাণ্টের পরিবার? তাঁর স্ত্রী বা ছেলে-মেয়ে—'

লর্ড এডওয়ার্ড বললেন, 'এ নিয়ে তুমি মিথ্যে আর ভেবো না। আমিই তাঁদের খবর দেবো। দরকার হ'লে তাঁদের দায়িত্ব নেবো।'

একটু পরে *ডানকান* যখন ডামবারটনের বন্দরে ভিড়লো, লেডি হেলেনাকে নিয়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজর ম্যাকন্যাবস গেলেন ম্যালকম কাসল-এর উদ্দেশে, আর লর্ড এডওয়ার্ড লণ্ডনের ট্রেন ধরবার আগে *টাইমস* আর *মর্নিং ক্রনিকল* কাগজ দুটোয় একটা বিজ্ঞাপনের খশড়া পাঠিয়ে দিলেন ছাপবার জন্যে :

*কেউ যদি ত্রিমাস্তুল মানোয়ারি জাহাজ ব্রিটানিয়ার কোনো খোঁজ নিতে চান তাহ'লে নিচের ঠিকানায় লর্ড এডওয়ার্ড গ্লেনারভনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।—ম্যালকম কাস্‌ল, ডামবারটন, স্কটল্যাণ্ড।*

তিন

## কাপ্তেন গ্রাণ্টের ছেলেমেয়ে

পশ্চিম স্কটল্যাণ্ডের লখ ফাইন-এর কাছে, যেখানে সমুদ্র থেকে একটা লম্বা ল্যাজ যেন দু-দিকে ডাঙা রেখে ভেতরে ঢুকে পড়েছে, তারই কাছে একটা টিলার ওপর তৈরি হয়েছে ম্যালকম কাস্‌ল, মস্ত-একটা দুর্গ, পুরোনো সমস্ত কিংবদন্তি কুয়াশা আর আলোছায়ায় ছাওয়া পরিখাঘেরা কেল্লা, তাকে জড়িয়ে কত-যে গল্প আছে তার ঠিক নেই। সেই কবে থেকেই গ্লেনারভনরা এই কেল্লার মালিক, কত যুদ্ধ-বিগ্রহ চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র কল্পকথা কিংবা প্রেমকাহিনীর সে সাক্ষী—ফার্গাস ম্যাকগ্রেগর বা তাঁরই মতো কেউ-কেউ সে-সব কাহিনীর নায়ক। স্কটল্যাণ্ডে যখন তুলকালাম কাণ্ড চলছিলো, বিদ্রোহ বিক্ষোভ স্বাধীনতার লড়াই, তখন অ্যাংলো-স্যাকসনদের অত্যাচারে কত-যে স্কট দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলো, তার ইয়ত্তা নেই, যদিও গ্লেনারভনরা নানাভাবে টিকে থাকতে চেয়েছেন এখানে এবং টিকেও গিয়েছেন, আর তাঁদেরই সঙ্গে থেকে গিয়েছে—টিকেই গিয়েছে বলা যায়—তাঁদের কিছু অনুচর সহচর—বংশানুক্রমিকভাবে তাদের পরিবাররাও সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে গ্লেনারভনদের সঙ্গে ছিলো। ইংরেজদের অধীনতা মেনে নিতে হয়েছে ব'লে তাদের দুঃখের শেষ নেই। কিন্তু তারই মধ্যে তারা জিইয়ে রাখতে চেয়েছে তাদের স্বাতন্ত্র্য, তাদের সংস্কৃতি—কিল্ট পরে তারা, খাটো হাঁটু অব্দি নামা ছোটো স্কার্ট, কিংবা বলে গেলিকভাষা, কিংবা বাজায় ব্যাগপাইপ, ফ্লুট, হাইল্যাণ্ডের সংগীত। তারা না-থাকলে একা-একা গ্লেনারভনদের এই কেল্লায় থাকা মুশকিলের হ'তো, যতই কেননা ম্যালকম কাস্‌ল মজবুত হোক, কিংবা কাস্‌ল হোক সশস্ত্র, থাকুক জালিকাটা উপরদেয়াল, যেখান থেকে গোলন্দাজদের বন্দুকের নল বেরিয়ে থাকতে পারে হানাদারদের উদ্দেশে। এরা সবাই নির্ভীক, দুঃসাহসী, বেপরোয়া—আর বিশ্বস্ত ও অনুগত। সত্যি-বলতে, তারাই আছে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

*ডানকান* জাহাজে, ওস্তাদ মাল্লা একেকজন, দুর্ধর্ষ, সমুদ্র যখন রাগে ফোঁসে, গর্জায়, একটুও না-টসকে, একটুও বিচলিত না-হ'য়ে, মাথা ঠাণ্ডা রেখে তারা জাহাজ সামলাতে পারে। স্কটল্যাণ্ডের উপকূলে সমুদ্র প্রায়ই অশান্ত হ'য়ে ওঠে, বিশেষত দীর্ঘস্থায়ী বর্ষায়, আর ছেলেবেলা থেকেই সেই জলে বেরোয় ব'লে তারা জানে কেমন ক'রে শামাল দিতে হয় সে-সময়।। তারা শুধু নির্ভরযোগ্য বা নিছক বেপরোয়াই নয়, তাদের দুর্দান্ত দুঃসাহস এসেছে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে, দক্ষতা থেকে, একেকজন তারা ওস্তাদ মাঝি-মাল্লা, চৌকশ, দুর্ধর্ষ।

লর্ড এডওয়ার্ড গ্লেনারভন অজস্র বিত্তসম্পদের মালিক—কিন্তু এই বিপুল অর্থ তিনি কোনো মক্ষিচুষ কঞ্জুসের মতো শুধু সিন্দুকেই তুলে রাখেন না, অকাতরে সে-অর্থ তিনি সে-অঞ্চলের মানুষদের অবস্থা ফেরাবার জন্যে বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যয় করেন, দরকার হ'লে হাউস অভ লর্ডস-এ তাদের জন্যে বাগ্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, লড়াই করেন, তাদের উন্নতির জন্যে নিপুণভাবে যুক্তি সাজিয়ে ও শানিয়ে ভাষণ দেন—সেইসব ভাষণে কেবল যে বুদ্ধির মারপ্যাঁচ থাকে, কূটজাল থাকে যুক্তির, তা-ই নয়—কখনও-কখনও সেইসব কথার সঙ্গে মিশে যায় তীব্র আবেগ—অর্থাৎ নীরক্ত, শীতল, হৃদয়হীন বুদ্ধির প্যাঁচই খেলেন না লর্ড এডওয়ার্ড—এ-দেশের মানুষের জন্য সত্যি ভাবেন তিনি, তাদের কথা ভাবেন সবসময়, আর এই দেশপ্রেম বা দেশবাসীর জন্যে প্রেম আছে ব'লেই অকুতোভয়ে এমন-সব পরিকল্পনা ফাঁদতে পারেন, যে-সব কাজে নামতে গিয়ে অনেক ডাকাবুকো লোকও দু-একবার ইতস্তত করবে। বিপদের সম্ভাবনা দেখে তিনি তাঁর প্রস্তাবিত পরিকল্পনা থেকে পেছিয়ে আসেন না। তিনি রয়্যাল টেমস ইয়ট ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন, তা নিছক খেয়ালি বিত্তবান ব'লেই নন। এটা ঠিক যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নামতে তাঁর ভালোই লাগে, উত্তেজনা জাগে মনে, রক্তে জাগে চাঞ্চল্য, শিহরন। কিন্তু আরো-একটা উদ্দেশ্য থাকে আড়ালে—প্রতিযোগিতায় তিনি কেবল ব্যক্তি হিশেবেই জেতেন না, জেতেন স্কটল্যাণ্ডের প্রতিনিধি হিশেবে, স্বদেশের নাম উজ্জ্বল করবার জন্যে। কিন্তু তাঁর এই দেশপ্রেম তাই ব'লে তাঁকে সংকীর্ণ মানুষ ক'রে তোলেনি—তাঁর চিত্তের ঔদার্যও তাঁকে অন্যদের চাইতে ভিন্ন ক'রে দিয়েছিলো—বিশেষত হাউস অভ লর্ডসে অন্য যে-সব ধনীর দুলাল আভিজাত্যের বড়াই করেন, নাকউঁচু হাম্বড়া দেমাক দেখান, সবসময়েই ভোগেন অহংম্মন্যতায় বা আত্মকেন্দ্রিকতায় তিনি ঠিক তাঁদের মতো নন। এজন্যে তাঁর বিস্তর সুনাম হয়েছিলো। আর তা যে কারু-কারু মধ্যে ঈর্ষার জ্বলুনি জাগিয়ে দিতো না, তাও নয়। কিন্তু বত্রিশবছর বয়সী এই সুপুরুষ ককখনো নিজে থেকে কাউকে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবার সুযোগ দেননি—প্রতিযোগিতা হয় জলে, ইয়টের বাজিতে, আর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জের থাকে ততক্ষণই যতক্ষণ জলের মধ্যে চলে এই রেষারেষি। সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর দরদ এতই সহজে তাঁর স্বভাবটার সঙ্গেই মানিয়ে যেতো যে তাতে কখনও কোনো



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পেতো না। আর তাঁর দরাজ দিলের সঙ্গে সংগতি রেখেই ছিলো তাঁর প্রচণ্ড দুঃসাহস। এটা এমন ধরনের কোনো দুঃসাহস নয় যার মধ্যে দেখানেপনা আছে, শুধু দুঃসাহসী কীর্তি ক'রেই যা তুষ্ট হ'তো, অর্থাৎ নিছক বেপরোয়াভাব প্রকাশ করার জন্যেই তিনি বেপরোয়া কাজেকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তেন না, তার পেছনে তাগিদ থাকতো পরের উপকার করবার। আর এই পরোপকার-প্রবৃত্তি কারু কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশী ছিলো না, বরং কারু জন্যে কোনো কাজ ক'রে দেবার পর সে যদি গদগদ হ'য়ে তাঁকে সম্ভাষণ করতো তবে তিনি যেন লজ্জাই পেয়ে যেতেন, একটু সংকুচিত বোধ করতেন, আড়ষ্ট। তিনি যদি অকাতরে দেশের মানুষের জন্যে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতেন, অন্তত বিলিয়ে দেবার প্রয়োজন এলে তিনি যে তাতে পেছ-পা হতেন না এটা সুনিশ্চিতই ছিলো, তবু তিনি ঠিক চাইতেন না লোকে সেটা জানুক, জেনে তাঁকে বাহবা দিক, শাবাশি জানাক —পারলে নিজেই তিনি প্রসঙ্গটা হয়তো ভুলেই যেতেন।

এহেন লর্ড এডওয়ার্ড বিয়ে করেছেন হেলেনাকে, সাধারণ ঘরের মেয়ে। সুশিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, সংবেদনশীল, কিন্তু তাঁর ধমনীতে নীল রক্ত ব'য়ে যেতো না। অন্যান্য অনেক রূপসী তরুণী—অভিজাতঘরের মেয়ে সবাই—তাঁর প্রেমে পড়বার জন্যে যেন তৈরি হ'য়েই ছিলো। তাদের সঙ্গে লর্ড এডওয়ার্ডের নানা উপলক্ষে মেলামেশাও হ'তো, নাচের মজলিশে, গানের আসরে, পালায়-পরবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, তিনি বিয়ে করলেন উইলিয়াম টাফনেলের এই মেয়েকে—সেই অকুতোভয় টাফনেল, যিনি ছিলেন বিখ্যাত ভ্রমণবিদ, কত-যে দেশবিদেশ ঘুরে বেড়িয়ে এসেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। হেলেনার সঙ্গে যখন লর্ড এডওয়ার্ডের পরিচয় হ'লো টাফনেল পরিবার তখন বিষম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলো। হেলেনার বয়েস তখন সদ্য বাইশ ছুঁয়েছে। বিত্ত, কিংবা নীল রক্ত, কিংবা তথাকথিত জাগতিক খ্যাতি কিছু না-ই থাক, হেলেনার রূপগুণ ছাড়া আরো-একটা জিনিশ ছিলো, যা লর্ড এডওয়ার্ডের প্রণয়প্রার্থী অন্য মেয়েদের ছিলো না—আর তাতেই যেন সবাইকে টেক্কা দিয়ে গিয়েছিলেন লেডি হেলেনা, আর সেটা এই : তিনি স্কটল্যাণ্ডের দুহিতা। হেলেনা যে স্কটিশ, এটাই ছিলো লর্ড এডওয়ার্ডের কাছে একটা বাড়তি আকর্ষণ। অবশ্য স্কটিশ না-হ'লেও হেলেনাকে তিনি বিয়ে করতেন ব'লেই মনে হয়—কেননা প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তেই দুজনে দুজনের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু হেলেনা যে স্কটল্যাণ্ডের দুহিতা—এই তথ্যটা কাটান দিয়েছিলো এই সামাজিক রীতিকে—যে, অভিজাতরাই অভিজাতকে বিয়ে করবেন। লর্ড এডওয়ার্ডের কাছে স্কটল্যাণ্ডের মানুষ মাত্রেই অভিজাত। আর হেলেনা টাফনেল তো বিশেষ ক'রে তা-ই, যেহেতু দুজনের মনের মিল এতটাই হয়েছিলো যে সত্যি-বলতে কোনো সামাজিক রীতিনীতির অযৌক্তিক বিধানকেই নির্বিচারে বিনাতর্কে মানতে দেয়নি।

বিয়ের পর হেলেনাকে তাক লাগিয়ে দেবেন ব'লে লর্ড এডওয়ার্ড একটা বাষ্পেচলা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহাজ তৈরি করাচ্ছিলেন। লোকে মধুচন্দ্রিকা যাপন করতে যায় নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব কোনো ভূস্বর্গে; লর্ড এডওয়ার্ডের ধারণা ছিলো অন্যরকম। তাঁরা বেরিয়ে পড়বেন সমুদ্রে, মধুচন্দ্রিকার সঙ্গে মিশবে প্রমোদভ্রমণ, অর্থাৎ কোথাও গিয়ে আস্তানা গেড়ে বসা নয় —সারাক্ষণই চলতে থাকবেন দুজনে, রোজ নতুন জলে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখবেন —অথচ জাহাজটি এমনভাবে তৈরি করা হবে যাতে সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য থাকে, আরামবিরামের অবকাশ থাকে। সত্যি-বলতে, কোনো ইয়ট ক্লাবের সদস্য মিথ্যে কেন মধুচন্দ্রিকা যাপন করবে ডাঙায়?

আর এই কারণেই তৈরি করা হয়েছিলো *ডানকান*। জাহাজের *নীল-খশড়া*—অর্থাৎ নকশাটা—অনেক ভাবনাচিন্তার পর লর্ড এডওয়ার্ডের মাথা থেকেই বেরিয়েছিলো। একই সঙ্গে মজবুত হবে, সর্বাধুনিক এনজিন থাকবে তার, তরতর ক'রে জল কেটে এগিয়ে যাবে, কিন্তু তাতে থাকবে আরামেরও সব উপকরণ, যাতে কিছুতেই এ-কথা কখনও মনে না-হয় যে এর চাইতে কোনো ভালো হোটেলে গিয়ে উঠলেই হ'তো।

আর তারপরে নতুন-তৈরি জাহাজ *ডানকানকে* নিয়ে মহড়ায় বেরুবামাত্র আকস্মিকভাবে পাওয়া গেলো মুশকিল আসানের তিন তলব—তিন-তিনটে ভাষায় লেখা সাহায্যের প্রার্থনা।

লর্ড এডওয়ার্ড *টাইমস* আর *মর্নিং ক্রনিকলে* বিজ্ঞাপন দুটো পাঠিয়ে দিয়েই রওনা হ'য়ে গেলেন লণ্ডনের উদ্দেশে, নৌদফতরে গিয়ে তিনি বিশদ জানাবেন কী হয়েছে, সেইসঙ্গে খোঁজ-খবরও নেবেন কাপ্তেন গ্রাণ্টের *ব্রিটানিয়া* সম্বন্ধে। আর লেডি হেলেনা চ'লে এলেন ম্যালকম কাস্‌ল-এ।

পরদিনই লণ্ডন থেকে এক তার এসে হাজির। যত-শিগগির-সম্ভব লর্ড এডওয়ার্ড ডামবারটন ফিরে আসবেন; কিন্তু তারের পেছন-পেছন সেদিনই রাত্তিরে এলো এক চিঠি। তার সংক্ষিপ্ত বয়ানের ততোধিক সংক্ষিপ্ত সারমর্ম—লণ্ডন থেকে ফিরতে দেরি হবে। নববিবাহিত বর তার কনেকে খুবই সোজাসুজি জানিয়েছে তাড়াতাড়ি ফেরা সম্ভব হবে না। চিঠিটার বয়ানের ধরন দেখে লেডি হেলেনার একটু ভাবনাই হ'লো। যেন তাড়াহুড়ো ক'রে হঠাৎ লর্ড এডওয়ার্ড *কোনো কারণে* মতি পরিবর্তন ক'রে জানাচ্ছেন লণ্ডনে তাঁর সময় লাগবে। কেন? হঠাৎ আবার কী হ'লো?

এ-চিঠি পাবার পর লেডি হেলেনা যখন সাত-সতেরো অনেককিছুই ভাবছেন অথচ কোনো হদিশই পাচ্ছেন না লর্ড এডওয়ার্ডের আকস্মিক সূচিবদল করার কারণের, এমন সময়ে তাঁর খাশ পরিচারক এসে জানালে অনেক দূর থেকে ট্রেনে ক'রে দুই কিশোর-কিশোরী এসেছে, লর্ড গ্লেনারভনের সঙ্গে এক্ষুনি দেখা করতে চায়, জরুরি দরকার। তাদের নাকি বিষম বিচলিত দেখাচ্ছে।

কারা এরা—লেডি হেলেনা ঠিক বুঝতে পারলেন না। লর্ড এডওয়ার্ডের তাড়াতাড়ি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না-ফেরার সঙ্গে এদের কোনো যোগ আছে? থাকুক বা না-থাকুক, তাদের খুব বিচলিত দেখাচ্ছে এ-কথা শুনেই লেডি হেলেনা তাদের ডেকে পাঠালেন।

ঘরে যারা ঢুকলো, সত্যি তাদের বয়েস বেশি নয়। মেয়েটির বয়েস ষোলো-সতেরো হবে, সে-ই দুজনের মধ্যে বড়ো, পোশাক-আশাক দেখে বোঝা যায় এককালে যদি-বা অবস্থাপন্ন ঘরের মানুষ হ'য়েও থাকে এখন নিশ্চয়ই অবস্থাবিপাকে পড়েছে, কেননা পোশাক তার দামি, তাতে রুচির ছাপ আছে, পরিচ্ছন্নও, কিন্তু দেখে বোঝা যায় এই পোশাক পুরোনো, বহু ব্যবহারে তার রঙ একটু মিইয়ে এসেছে। ছিপছিপে সুশ্রী কিশোরী, ডাগর দুটি চোখ—লাল, ফোলা-ফোলা, দেখে মনে হয় এতক্ষণ কাঁদছিলো। ছেলেটির বয়েস বারো-তেরো, তারও পরনে দামি কিন্তু পুরোনো পোশাক—দুজনেরই মুখের আদলে মিল আছে, সম্ভবত এরা ভাই-বোন। একটু উদ্‌ভ্রান্তই দেখাচ্ছে দুজনকে, উত্তেজিতও। তারা লর্ড এডওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করতে চায়, খবরকাগজে বিজ্ঞাপন প'ড়ে ছুটে এসেছে, কাপ্তেন গ্রান্টের খোঁজ নিতে চায় তারা।

'কাপ্তেন গ্রান্টের খোঁজ?' তাদের উত্তেজিত অধীর চোখমুখ দেখে জিগেস করলেন লেডি হেলেনা : 'কেন, বলো তো? কে তোমরা?'

'কাপ্তেন গ্রান্টের ছেলেমেয়ে।'

*'কাপ্তেন গ্রান্টের ছেলেমেয়ে!'*

'হ্যাঁ।' মেয়েটি প্রায় যেন ফিশফিশ ক'রে কথাটা বললে, 'আমার নাম মেরি, আর এ আমার ভাই, রবার্ট।'

রবার্ট বললে, 'আমরা *টাইমস*-এ একটা বিজ্ঞাপন দেখেছি—কেউ যদি ত্রিমাস্তুল মানোয়ারি জাহাজ *ব্রিটানিয়ার* কোনো খোঁজ নিতে চায় তাহ'লে যেন এখানে এসে হিজ লর্ডশিপের সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু এসে শুনি তিনি এখানে নেই, লণ্ডন গেছেন। অথচ বিজ্ঞাপনে *ব্রিটানিয়া* জাহাজের নাম দেখে আমাদের আর তর সয়নি—'

'আমরা আগে থেকে চিঠি লিখে দেখা করবার জন্যে কোনো সময় ঠিক ক'রে আসিনি, হিজ লর্ডশিপ তো আর জানতেন না আমরা আসবো—' মেরি বললে, 'কিন্তু বাবার জাহাজের নাম দেখেই আমাদের এমন অস্থির লাগলো যে আমরা কোনো নিয়মকানুনের ধার না-ধ'রেই ছুটে এসেছি—'

লেডি হেলেনা তাদের আশ্বস্ত করলেন। 'না-না, সেজন্যে ভেবো না। আসলে লর্ড গ্লেনারভন *ব্রিটানিয়া* সম্বন্ধে কথা বলতেই লণ্ডনে নৌবাহিনীর সদর দফতরে গেছেন।' তারপর লেডি হেলেনা তাদের এক-এক ক'রে খুলে বললেন কেমন ক'রে হাঙরের পেটে বোতলটা পাওয়া গেছে, আর বোতলের ভেতরে তিনটে ছোট্ট পার্চমেণ্ট —তাতেই *ব্রিটানিয়ার* খবর ছিলো। 'লর্ড গ্লেনারভন কালকেই ফিরে আসবেন। তোমরা বরং এখানেই থেকে যাও—কোনো ফর্মালিটি নেই—কাল লর্ড এডওয়ার্ড ফিরে এলেই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাদের সঙ্গে কথা হবে—লণ্ডনে তিনি কী জানতে পারবেন, তা আমিও জানি না, তাই আমিও তাঁর ফেরার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছি।'

লর্ড এডওয়ার্ডকে ম্যালকম কাস্‌ল-এ না-পেয়ে ভাইবোনে যেন একটু চুপসেই গিয়েছিলো। লেডি হেলেনার সদয় ব্যবহারে তারা রীতিমতো মুগ্ধ হ'য়ে গেলো। তারা রাতটা কেল্লাতেই কাটাতে রাজি হ'লো। বিশেষ ক'রে লেডি হেলেনা যখন বললেন যে তিনি কাপ্তেন গ্রাণ্ট সম্বন্ধে বিশেষ-কিছুই জানেন না, ভালোই হ'লো, এই ফাঁকে তাদের কাছ থেকে তাঁর সম্বন্ধে সব জরুরি কথা জেনে নিতে পারবেন। তিনি অবশ্য সব কথা খুলে বলেননি তাদের কাছে, *ব্রিটানিয়া* যে জলে ডুবে গিয়েছে, কাপ্তেন গ্রাণ্ট যে বিদেশ-বিভুঁয়ে ইণ্ডিয়ানদের হাতে বন্দী হয়েছেন—এ-সব কথা ব'লে তিনি ভাইবোনকে ঘাবড়ে দিতে চাননি।

সত্যি-বলতে রবার্ট আর মেরি বাবার কথা বলবার জন্যে যেন উদ্‌গ্রীব হ'য়েই ছিলো। যেন তাদের দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে তারা মনের বোঝা হালকা ক'রে নেবার সুযোগ পেয়েই ব'র্তে গিয়েছে। একটু বিশ্রামের পর, খাবার-টেবিলে ব'সে ভাইবোনে তাঁকে কাপ্তেন গ্রাণ্টের কথা শোনালে।

বেচারারা! বাবার কথা বলতে-বলতে তাদের যেন চোখ ফেটে জল বেরুচ্ছিলো। ছেলেবেলাতেই তারা মাকে হারিয়েছিলো। তারপর তাদের হারাতে হ'লো বাবাকেও।

কাপ্তেন গ্রাণ্ট ডাকাবুকো বেপরোয়া মানুষ। কিন্তু নিছক দুর্দান্ত অ্যাডভেনচারে বেরুনোই নয়, তাঁর চোখে ছিলো স্বাধীন স্কটল্যাণ্ডের স্বপ্ন। স্কটল্যাণ্ড যদি স্বাধীন না-ই হয়, অন্তত সে যদি কোথাও উপনিবেশ স্থাপন করতে পারে, তাহ'লেও হয়। সেই স্বপ্ন ছিলো ব'লেই একদিন তিনি নিজের সব সম্বল দিয়ে মানোয়ারি জাহাজ *ব্রিটানিয়া* নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে বেরিয়ে পড়েছিলেন—কোনো নতুন দ্বীপ খুঁজে বার ক'রে সেখানে একটা উপনিবেশ স্থাপন করবার জন্যে। ছেলেমেয়েকে রেখে গিয়েছিলেন এক আত্মীয়ার কাছে —ইচ্ছে ছিলো, নতুন দ্বীপে বসবাসের ব্যবস্থা ক'রে ফিরে এসে একদিন তাদের সঙ্গে নিয়ে আবার পাড়ি জমাবেন। কিন্তু একদিন খবর এলো, *ব্রিটানিয়া* জাহাজের কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছে না।—হয় সে-জাহাজ ডুবে গিয়েছে, নয়তো এমন-কোনো দুর্বিপাকে পড়েছে যা মৃত্যুরই শামিল—কিংবা হয়তো পড়েছেন মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর কোনো পরিস্থিতিতে। মেরির বয়েস তখন মাত্র চোদ্দ, রবার্ট আরো ছোটো। এমন সময় সেই বৃদ্ধা আত্মীয়াও মারা গেলেন। তারপর থেকে ছোটোভাইটিকে সে সমস্ত দুঃখকষ্টের মধ্যেও আগলে রেখেছে, তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, তাকে মানুষ ক'রে তুলতে চেয়েছে। দু-বছর ধ'রে কাপ্তেন গ্রাণ্টের কোনো খোঁজ না-পেয়ে সে ধ'রেই নিয়েছিলো যে বাবা মারা গেছেন। এখন, কাগজে বিজ্ঞাপনটা প'ড়েই তার মধ্যে এক নতুন আশা জেগে উঠেছে। একমুহূর্তও দেরি না-ক'রে ছুটে এসেছে লর্ড গ্লেনারভনের কাছে। বাবা তাহ'লে মারা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাননি—নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন।

লেডি হেলেনা অবিশ্যি তাদের কাছে নিজের আশঙ্কার কথা খুলে বললেন না। প্রথমত, দু-বছর আগে সাহায্য চেয়ে এই বোতল জলে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিলো। কাপ্তেন গ্রান্ট যদি তখন দক্ষিণ আমেরিকার কোথাও ইণ্ডিয়ানদের হাতে বন্দী হ'য়ে থাকেন, তাহ'লে এখনও বেঁচে আছেন কি না কে জানে! তাছাড়া তাঁরা তো এটা ঠিক ক'রে জানেন না কাপ্তেন গ্রান্ট সত্যি-বলতে কোথায় বন্দী হ'য়ে আছেন। অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার মধ্যে একটা তাঁরা জানেন, দ্রাঘিমারেখা যে কী, সেটার জন্যে তাঁদেরও তো অন্ধকারে হাৎড়ে বেড়াতে হবে। তাছাড়া লর্ড এডওয়ার্ডের ফিরে আসতে দেরি দেখে এটাই ভয় হয় যে নৌদফতর ব্যাপারটাকে কোনো পাত্তাই দেয়নি। তারা হয়তো কোনো সাহায্যই করতে চাইবে না।

ভাইবোনকে শুতে পাঠিয়ে দিয়ে লেডি হেলেনা মেজর ম্যাকন্যাব্‌সের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন। মেজর ম্যাকন্যাব্‌সের মনে হচ্ছিলো লেডি হেলেনার আশঙ্কা হয়তো অমূলক নয়—নৌদফতর হয়তো ঐ হারানো জাহাজের সন্ধানে কাউকেই পাঠাতে রাজি হবে না। কিন্তু মেরির দৃঢ়তায় তিনি প্রায় মুগ্ধই হ'য়ে গেলেন। এইটুকু মেয়ে একটুও ভেঙে পড়েনি—সব দুর্বিপাকের মধ্যেও ছোটোভাইটির দেখাশুনো ক'রে এসেছে। এটা মানতেই হয় যে মনের জোর আছে মেয়েটির। তবে সবসময়ে তো আর শুধু মনের জোরে হয় না, পরিস্থিতি যদি প্রতিকূল হয় তাহ'লে মনের জোর তখন হয়তো ভেঙে পড়তে দেয় না—শুধু প্রতীক্ষা করতে বলে কখন পরিস্থিতি অনুকূল হবে। এতদিন মেরি ধ'রে নিয়েছিলো যে তার বাবা বেঁচে নেই, সে নিজেই এক মনের জোরে সব দুর্বিপাকের মধ্যে ছোটোভাইটির দেখাশুনো করার দায়িত্ব পালন করছিলো। এখন সে বিজ্ঞাপন দেখে আশা ক'রে ছুটে এসেছিলো, এমনকী আজ লর্ড এডওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা না-হ'লেও এই আশা আছে যে কাল দেখা হবেই, কাল বাবার সব খবর জানতে পাবে—অথচ লর্ড এডওয়ার্ড সম্ভবত লণ্ডন থেকে কোনো আশার খবর নিয়েই ফিরবেন না। মেজর ম্যাকন্যাব্‌সের সঙ্গে এই নিয়েই কথা বলছিলেন লেডি হেলেনা, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না এই অবস্থায় কী তাঁর করণীয়। তবে এটা অনুমান করতে দেরি হয় না যে যতদিন রবার্ট আর মেরি মেনে নিয়েছিলো যে কাপ্তেন গ্রান্টের ফিরে-আসার কোনো আশাই নেই ততদিন অন্তত দুঃখকষ্ট মেনে নিয়েই একরকম চলছিলো, অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিলো তাতে, কিন্তু এখন হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো একবার আশা জেগে উঠেই যদি মিলিয়ে যায় তখন হয়তো তাদের কচি মনে আশাভঙ্গের আঘাত আরো-তীব্র হ'য়ে পড়বে।

যতটা আশা ক'রে এসেছিলো, ততটা সম্ভবত আর ছিলো না ব'লেই মেরি নিশ্চয়ই সকালবেলায় একটু আড়ষ্ট ও সংকুচিত বোধ করছিলো; আর সেই অস্বস্তির জন্যেই,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেডি হেলেনা আর মেজর ম্যাকন্যাব্‌স তাদের যতই আপ্যায়ন করার চেষ্টা করুন না কেন, তারা একটু দূরে-দূরেই স'রে থাকছিলো। সেইজন্যেই লর্ড এডওয়ার্ড যখন জুড়ি-গাড়ি চ'ড়ে স্টেশন থেকে চৌদুনে ঘোড়া হাঁকিয়ে ফিরে এলেন, মেরি আর রবার্ট তখন ছিলো বাগানে।

লর্ড এডওয়ার্ড কোনোদিকে না-তাকিয়ে হনহন ক'রে সটান চ'লে গেলেন লেডি হেলেনার কাছে। ইংরেজ সরকারের বানিয়া মনোভঙ্গিতে তিনি বিচলিত; আরো বিচলিত এই কথা ভেবে যে মুখে 'গ্রেটব্রিটেন' 'গ্রেটব্রিটেন' ক'রে চ্যাঁচালেও ইংরেজরা সত্যি-সত্যি স্কটিশ, আইরিশ বা ওয়েল্‌সবাসীদের মানুষ ব'লেই যে মনে করে না, আরো-একবার হাতে-নাতে তার প্রমাণ পেয়ে গিয়েছেন তিনি লণ্ডনে। বিস্তর যুক্তি সাজিয়েও নৌদফতরের কর্তাদের তিনি এ-বিষয়ে আদৌ বোঝাতেই পারেননি, যে হারানো মানোয়ারি জাহাজ *ব্রিটানিয়ার* সন্ধানে বেরিয়ে-পড়া তাঁদের আশু কর্তব্য।

তাঁর মুখচোখের ভাব দেখেই লেডি হেলেনার বুঝতে মোটেই দেরি হয়নি যে লর্ড এডওয়ার্ডের লণ্ডনসফর সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে—শুধু তা-ই নয়, কি-রকম যেন অপমানিতও বোধ করেছেন লর্ড এডওয়ার্ড। গ্লেনারভন যখন উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'খামকাই গিয়েছিলুম নৌ-দফতরে—কোনো কাজই হয়নি,' লেডি হেলেনা তখন আদৌ বিস্মিত হননি। বরং এই আশঙ্কা নিয়েই যে কাল রাতে মেজর ম্যাকন্যাব্‌স আর তিনি বলাবলি করছিলেন, এ-কথা তাঁর মনে প'ড়ে গেলো।

'তাদের মতে *ব্রিটানিয়ার* সন্ধানে বেরুনোটা হবে বুনোহাঁসের পেছনে ছোটা,' আগের কথার জের ধ'রেই বললেন লর্ড এডওয়ার্ড।

এদিকে জুড়িগাড়ি এসে থেমেছে, গটগট ক'রে একজন সে-গাড়ি থেকে নেমে লিভিংরুমের দিকে চ'লে গেছেন, তাঁকে দেখেই অনুচর-পরিচরেরা সেলাম ঠুকেছে—এইসব লক্ষ ক'রে মেরি আর রবার্ট বুঝতে পেরেছিলো যে ইনিই লর্ড এডওয়ার্ড গ্লেনারভন। তারাও, তাই, তাঁর পেছন-পেছন লিভিংরুমে চ'লে এসেছিলো। ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে তারা শুনতে পেলে লর্ড এডওয়ার্ড বলছেন :

'হাজারটা ফ্যাকড়া, হাজারটা ওজর, হাজারটা আপত্তি সরকারের। দু-বছর আগে যে-জাহাজ ডুবেছে—'

'ডুবেছে ব'লে আমরা এখনও সঠিক জানি না,' লেডি হেলেনা বললেন, 'বরং বলতে পারি দু-বছর আগে সে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছে—'

'হ্যাঁ, আমিও তা-ই বলতে চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু তাদের বক্তব্য: ডুবুক বা হারিয়ে যাক—দু-বছর আগে যা ঘটেছে, এতদিন পরে কেউ খামকা এত টাকা খরচ ক'রে তার সন্ধানে যায়! তাছাড়া তাদের মতে ঐ তিনটে পার্চমেণ্টই অসম্পূর্ণ—পুরো হদিশ কোনো পার্চমেণ্টেই দেয়া নেই। কিন্তু, আসল কথা কি জানো, মাত্র তিনজনের জন্যে—সে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনজনও তো পুরোমানুষ নয়, নেহাৎই স্কট—একটা আস্ত গোটা জাহাজ তারা কিছুতেই পাঠাবে না! এরা যে শুধু বানিয়া, শুধু মুনাফাই দ্যাখে—তা নয়—এরা নিজেদের ছাড়া আর-কাউকেই ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না।'

লর্ড এডওয়ার্ড রাগের স্বরে তেড়ে কথা ব'লে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সরকারের ফয়সালা শুনে তক্ষুনি মেরি আর রবার্ট নিজেদের আর সামলে রাখতে না-পেরে অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ ক'রে উঠেছে : 'বাবা! বাবা!' যেন দ্বিতীয়বার মৃত্যু হয়েছে কাপ্তেন গ্রান্টের!

লর্ড এডওয়ার্ড এতটাই রেগে গিয়েছিলেন যে খেয়ালই করেননি কখন এই দুটি অচেনা কিশোর-কিশোরী এসে তাঁর কথা শুনতে লেগেছে। হঠাৎ এই অস্ফুট আর্তনাদ শুনে অবাক হ'য়ে তিনি জিগেস করলেন, 'এরা কে?' তারপর সরাসরি তাদেরই তিনি জিগেস করলেন : 'বাবা! কে তোমাদের বাবা?'

এবার লেডি হেলেনা সব কথা বুঝিয়ে দিলেন তাঁর স্বামীকে। কেমন ক'রে কাপ্তেন গ্রান্টের এই ছেলেমেয়ে দুটি খবরকাগজে বিজ্ঞাপন প'ড়ে তক্ষুনি, তড়িঘড়ি, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চ'লে এসেছে, বিজ্ঞাপনের বয়ান থেকে কতটা আশা তাদের মধ্যে জেগে উঠেছিলো নতুন ক'রে, ভেবেছিলো অবশেষে বুঝি সত্যি হদিশ মিলেছে কাপ্তেন গ্রান্টের—আর এখন তারা তাঁর প্রতিবেদন শুনে কতটাই মর্মাহত হ'য়ে পড়েছে! 'এড, এরা তোমার বিজ্ঞাপন প'ড়েই কাল এখানে চ'লে এসেছে। বলো, এখন এদের কী বলবে?'

'কিছুই বলার নেই, হেলেনা। এতক্ষণ তো সে-কথাই বলছিলুম। নৌদফতর কিছুতেই একজন হারিয়ে-যাওয়া স্কটের উদ্দেশে কোনো জাহাজ পাঠাবে না—'

মেরির আত্মাভিমান প্রখর। এই কচি বয়সেই নানা দুর্বিপাকের মধ্যে প'ড়েও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়েছে তাকে, দেখাশুনো করতে হয়েছে ছোটোভাইটির, অভিভাবকহীন অবস্থাতেও সে কোনোদিন দোরে-দোরে সাহায্য ভিক্ষা ক'রে বেড়ায়নি। এখন পুরো ব্যাপারটা শুনে ইংরেজ সরকারের হৃদয়হীনতা সম্বন্ধে সে যতটাই রেগে যাক, মুখে সে-কথা প্রকাশ না-ক'রে শুধু বললে : 'তাহ'লে আমরা চলি। বাবার খবর যতটুকু পাওয়া গেছে, সেটাই অনেক। অ্যাদ্দিন বাদে অন্তত নতুন ক'রে একটা সম্ভাবনা জেগেছে যে তিনি বেঁচে আছেন। হয়তো একদিন নিজেই কোনো উপায় ক'রে ফিরে আসবেন।' এই ব'লে রবার্টের হাত ধ'রে সে চ'লে যাবার জন্য পা বাড়ালে, বললে, 'চল, রবার্ট, মিথ্যে মনখারাপ করিসনে। উপায় একটা বার করবোই।'

লেডি হেলেনা কাল রাত থেকেই এই অনাথ ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে অনেক ভেবেছেন। এবার একটু শঙ্কিতই হলেন তিনি, বিচলিত হ'য়ে এরা যদি ভয়ংকর-কিছু ক'রে বসে! তিনি বাধা দিয়ে বললেন, 'তোমরা আবার এক্ষুনি কোথায় যাবে?'

দাঁতে দাঁত চেপে মেরি বললে : 'শেষ ভরসা একজনই। যে-ক'রেই হোক মহারানীর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলবো। যদি কোনোভাবে তাঁর মনে দয়া জাগাতে পারি তাহ'লে হয়তো তিনি কোনো-একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।'

অন্যরা যা জানতো, তা মেরিও জানতো। এত সহজে রানীর দেখা পাওয়া যায় না। এতগুলো বাধা আসবে আমলা বা অনুচরদের কাছ থেকে যে কোনোদিনই হয়তো রানীর কাছে গিয়ে পৌঁছুনোই যাবে না। কোনো উটকো যে-সে লোককে রানীর সঙ্গে দেখা করতে দেয়াই হয় না।

'মেরি, শোনো, যেয়ো না,' লেডি হেলেনার গলার স্বর পালটে গিয়েছে। 'এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার কিছু হয়নি। রানীর বদলে আমরা নিজেরাই হয়তো কোনো-একটা ব্যবস্থা করতে পারবো।' তারপর লর্ড এডওয়ার্ডের দিকে ফিরে বললেন : 'এডওয়ার্ড, ইংরেজরা যদি আমাদের মানুষ ব'লেই মনে না-করে, আমরা তবে খামকা তাদের কৃপার জন্যে অপেক্ষা করবো কেন। তুনি তো *ডানকান* জাহাজ বানিয়েছো আমাদের প্রমোদভ্রমণের জন্যে। মজবুত, আধুনিক জাহাজ, বাষ্পে চলে। কিন্তু প্রমোদভ্রমণ তো আর অকারণে যেখানে-সেখানে ভেসে-যাওয়া নয়, জাহাজ যদি জলে ভাসানো হয় তাহ'লে তার একটা গন্তব্য থাকে। পৃথিবীর সেরা দৌড়বীরের চাইতেও সেই লোকটাই দৌড়ের বাজিতে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েছিলো যে ম্যারাথনে দৌড়েছিলো—কেননা তার দৌড়টা নিছক দৌড় ছিলো না, ছিলো তার দেশকে বাঁচাবার উপায়। আমাদের প্রমোদভ্রমণও সার্থক হবে যদি তার সামনে একটা লক্ষ্য থাকে, একটা উদ্দেশ্য থাকে।'

'তুমি কি বলতে চাচ্ছো, হেলেনা ? আমি যা মনে-মনে ভেবেছি তা-ই কি তোমারও মনের কথা ?' লর্ড এডওয়ার্ড প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, এডওয়ার্ড। আমি সত্যিকার সুখী হবো, সত্যিকার আনন্দ পাবো যদি আমাদের প্রমোদভ্রমণ শেষপর্যন্ত আর নিছক-প্রমোদভ্রমণ না-থাকে। আমরা তো এই উপলক্ষে *ডানকান* নিয়ে কাপ্তেন গ্রান্টের খোঁজেই বেরিয়ে পড়তে পারি—সাগরপাড়ি যদি দিতেই হয়, তবে সামনে এই লক্ষ্যটা রাখলেই হয়। দরকার হ'লে সাতসমুদ্র তেরোনদী পাড়ি দিয়েই না-হয় আমরা কাপ্তেন গ্রান্টকে খুঁজে বার ক'রে নিয়ে আসবো!'

লর্ড এডওয়ার্ড আনন্দে যেন ফেটেই পড়বেন। 'জানো, হেলেনা, লণ্ডনে ব'সে-ব'সে আমিও ঠিক এই কথাই ভেবেছিলুম। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারিনি তোমাকে একা ফেলে রেখে এত দূর পথ পাড়ি দেয়া ঠিক হবে কি না। তুমিও যে আমার সঙ্গে যেতে চাইবে, সেটা মোটেই ভাবিনি। জাহাজ যত আধুনিকই হোক বা মজবুতই হোক, দিনের পর দিন অজানা সমুদ্র পাড়ি দেয়ার মধ্যে ধকলও আছে, আবার একঘেয়েমিও আছে। দিনের পর দিন চারপাশে জল দেখতে সকলের সমান ভালো লাগে না কি না!'

মেরি আর রবার্ট গিয়ে ততক্ষণে লেডি হেলেনাকে জড়িয়ে ধরেছে। 'আমরাও সঙ্গে যাবো,' একসঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠেছে তারা, 'আপনারা যদি বাবার খোঁজে জাহাজ নিয়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দূর সাগরে পাড়ি জমান, তাহ'লে আমরাও সঙ্গে যাবো—'

'নিশ্চয়ই যাবে,' লর্ড এডওয়ার্ড বললেন, '*ডানকানে* বিস্তর জায়গা আছে। তাছাড়া হেলেনারও ভালো লাগবে তোমাদের সঙ্গী পেলে—অন্তত একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচবে।'

লেডি হেলেনাও সায় দিলেন : 'তাছাড়া তাড়াটা তো তোমাদেরই বেশি। তোমরা সারাক্ষণ ব'সে-ব'সে অদ্ভুত সব কথা ভাববে, ভাববে *ডানকান* জাহাজের কী হ'লো, বাবার দেখা পেলো কিনা—তার চাইতে সঙ্গেই চলো, একই সঙ্গে আমরা খুঁজে দেখবো কাপ্তেন গ্রান্ট এখন কোথায় আছেন।'

'তোমাদের কোনো অসুবিধেই হবে না। *ডানকান* নেহাৎ ছোটো জাহাজ নয়—দুশো দশ টনের জাহাজ। এর চাইতেও ছোটো-ছোটো শাবেক আমলের জাহাজ নিয়ে ক্রিস্তোবাল কোলোন সম্পূর্ণ অজানা সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন—কোথায় যাবেন, জানতেনই না। আমাদের তো তবু খানিকটা আন্দাজ আছে—অন্তত এটা তো জানি কত অক্ষরেখায় যেতে হবে।'

## চার

## পাড়ি

একবার যখন ঠিক হ'য়ে গেছে যে *ডানকান* জাহাজই *ব্রিটানিয়া* আর কাপ্তেন গ্রান্টের সন্ধানে দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্রে পাড়ি দেবে, তখন আর একমুহূর্তও তর সইছিলো না কারু। কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সকে ডেকে অভিযানের কথা বলতেই তিনি তো একপায়ে খাড়া : সমুদ্র যারা ভালোবাসে, ডাঙায় থাকতে তাদের যে আদপেই ভালো লাগে না, সারাক্ষণ যে তারা উশখুশ করে কবে আবার জলে ভাসতে পারবে, কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সই তার সশরীর প্রমাণ। এখানে অবশ্য আরো-একটা কথা আছে। ইংরেজদের নৌদফতরকে হাতে-নাতে দেখিয়ে দিতে হবে তাদের সাহায্য ছাড়াই কেউ দূর সমুদ্রে পাড়ি জমাতে পারে—শুধু তা-ই নয়, কোনো দায়িত্ব নিয়ে বেরুলে স্কটরা ছিনেজোঁকের মতো লেগে থেকে সে-দায়িত্ব পালনও করতে পারে। অন্তত লর্ড গ্লেনারভনের জেদও যে কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর তাছাড়া আছে মেরি আর রবার্ট—আর-কিছুর জন্যেও যদি না-হয় অন্তত তাদের কথা ভেবেও চট ক'রে অভিযানে বেরিয়ে-পড়া উচিত।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এত-বড়ো একটা অভিযানে বেরুতে গেলে কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই তো আর হুট ক'রে রওনা হওয়া যায় না। কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসের ওপরই ভার পড়লো *ডানকানকে* গ্লাসগোর বন্দরে নিয়ে গিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে অভিযানের জন্যে যা-যা করা দরকার সবকিছুই নিজে তদারক ক'রে করবার।

এটা ঠিক যে *ডানকান* বাষ্পে চলে। কিন্তু ফোরকাস্‌লের সামনে বড়ো মাস্তুলটার ডগায় পাল খাটাবারও ব্যবস্থা আছে—সে কিন্তু নিছকই বিকল্প ব্যবস্থা হিশেবে নয়; হাওয়া যদি তোড়ে বয়, অনুকূল থাকে, তাহ'লে *ডানকান* পালতোলা জাহাজ হিশেবেই চলবে, আর অন্য সময় তো আছেই তার ১৬০ অশ্বশক্তির এনজিন। পুরোনোদিনের পালের জাহাজের সঙ্গে তার এখানেই তফাৎ—তাকে সবসময় অনুকূল হাওয়ার ওপর নির্ভর করতে হবে না। অন্য সময় সে বাষ্পের জোরেই ঘণ্টায় সতেরো সামুদ্রিক মাইল হিশেবে চলতে পারবে। কিন্তু সেই বাষ্প তৈরি করবার জন্য চাই কয়লা, বিস্তর কয়লা—আর এই দূরপাল্লার পাড়িতে সঙ্গে যতটা-সম্ভব কয়লা নিয়ে-যাওয়াই ভালো, না-হ'লে মাঝপথে হঠাৎ কয়লার দরকার হ'লে সব জায়গায় তো তা নাও মিলতে পারে। অপর্যাপ্ত রসদও চাই সঙ্গে, যাতে পথে খাবারের অভাবে ভুগতে না-হয়। তারপর জাহাজের সামনে আত্মরক্ষার খাতিরে একটা কামানও বসাতে হবে—পথে জলদস্যুদের পাল্লায় পড়লে যাতে সামলানো যায়। বইটি আমারবই.কম এর জন্য নির্মিত।

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস প্রায় যেন জলে-জলেই মানুষ, কিন্তু সে তো সাধারণ খালাশিও। কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে জানেন, উদ্ভাবনীশক্তি আছে, আছে অফুরন্ত আর অদম্য প্রাণশক্তি আর সাহস, উপস্থিতবুদ্ধির জোরে কোনো মুশকিলে পড়লে সেটা কাটান দেবার ক্ষমতা রাখেন। ম্যালকম কাসলেই তিনি মানুষ হয়েছেন, গ্লেনারভনদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই নৌবিদ্যায় তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিলো, এখন তিনি অভিজ্ঞতার জোরে বলীয়ান হ'য়ে উঠেছেন। আর তাঁরই সুযোগ্য সহযোগী টম অস্টিন—দক্ষ ও কুশলী নাবিক, কালে তিনিও কোনো জাহাজের পরিচালনভার নিজের হাতে পাবেন। আর তাঁরা দুজনে মিলেই গ্লাসগোর ডকইয়ার্ড থেকে বাছাই ক'রে-ক'রে আরো পঁচিশজন মাল্লাকে *ডানকান* জাহাজে কাজ দিয়েছেন। দক্ষতা আর পরিশ্রমের ক্ষমতা ছাড়া তাদের সকলেরই আরো একটা পরিচয় আছে—তারা সবাই ডামবারটনের মানুষ, গ্লেনারভনদের প্রতি তাদের আনুগত্য অসীম।

প্রমোদভ্রমণের উপযোগী ক'রে আগেই ভালো ক'রে সবচেয়ে-বড়ো ক্যাবিনটা সাজানো হয়েছিলো, কিন্তু তখন তো আর জানা ছিলো না তাঁদের এত দীর্ঘ কোনো অভিযানে বেরুতে হবে। তাই এখন তাঁদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রেখে দীর্ঘদিনের উপযোগী ক'রেই সাজানো হ'লো মাস্টার-ক্যাবিন—সত্যি-বলতে বিয়ের পর এই-প্রথম লর্ড এডওয়ার্ড তাঁর নবপরিণীতা পত্নী লেডি হেলেনাকে নিয়ে দূর সমুদ্রে পাড়ি জমাবেন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—এ তো আর *ডানকান* জাহাজের নিছক কোনো মহড়া নয় কাছেপিঠের সমুদ্রে। তাছাড়া রবার্ট যে কতটা চৌকশ ছেলে সে তো আর গোড়ায় বোঝা যায়নি, কিন্তু পাড়ি জমাবার আগেই দেখা গেলো কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সের সঙ্গে তার ভারি খাতির হ'য়ে গিয়েছে, ছায়ার মতো সে কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সের পেছন-পেছন থাকে; সে-যে কাপ্তেন গ্রাণ্টের ছেলে, গোড়ায় এটাই ছিলো তার প্রতি কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সের অতিরিক্ত একটা আকর্ষণের কারণ, কিন্তু পরে দেখা গেলো এই অভিযানে শেষপর্যন্ত রবার্টেরও সমুদ্রে হাতেখড়ি হবে, তারও রক্তে তার বাবার মতোই অ্যাডভেনচারের নেশা আছে যেন।

এরা ছাড়া সঙ্গে যাবেন মেজর ম্যাকন্যাব্‌সও। বছর পঞ্চাশ বয়স, এমনিতে স্বল্পবাক্ কিন্তু কৌতুকবোধ প্রখর, অনেক অভিজ্ঞতায় পোড়খাওয়া মানুষ মেজর, জানেন, যে বিপদের সময় অহেতুক উত্তেজনা বরং ক্ষতিই করে—তখনই বরং মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। লর্ড এডওয়ার্ডের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু শুধু সেইজন্যেই নয়, অ্যাডভেনচারের সম্ভাবনা দেখেই তিনি *ডানকান* জাহাজে এসে উঠেছেন—তাছাড়া মেরি আর রবার্টের প্রতি তাঁর কেমন-একটা মায়াও জ'ন্মে গিয়েছিলো। এই দুর্ধর্ষ অকুতোভয় মানুষটার মধ্যে ভেতরে কোথাও যে স্নেহের একটা অফুরন্ত প্রস্রবণ ছিলো, এটা তারও একটা প্রমাণ—যদিও তিনি নিজে সে-কথা ঠিক জানেন না—তিনি ভেবেছেন *ডানকানের* লম্বা পাড়িতে তিনি যোগ দেবেন নিছক একঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই পেতে।

এমনিতে হয়তো কোন জাহাজ এলো, কোন জাহাজ গেলো—তাতে লোকের কিছুই এসে-যেতো না। কিন্তু *ডানকান* যে-উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতে চাচ্ছে লোকের মুখে-মুখেই সে-কথা ছড়িয়ে পড়েছিলো। আর তাই যখন ২৫শে আগস্ট ০ঘণ্টায়, অর্থাৎ ২৪আর ২৫এর মাঝরাত্রে, ঠিক বারোটার সময়, জাহাজ ছাড়লো, গ্লাসগোর লোক ঝেঁটিয়ে এসেছিলো জাহাজ দেখতে। চোঙ দিয়ে ভলকে-ভলকে ধোঁয়া উঠলো, ঝগঝগ আওয়াজ উঠলো এনজিনে, চাকাগুলো পাক খেলো, আর *ডানকান* বন্দর থেকে নোঙর তুললো। সকাল ছটার মধ্যেই জাহাজ গিয়ে পড়লো বারদরিয়ায়। *ডানকানের* লম্বা পাড়ি শুরু হ'য়ে গেলো, কতদিনের জন্যে কে জানে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচ

## ভ্রান্তিবিলাস ও অন্যমনস্ক অধ্যাপক

*ডানকান* যখন ছেড়েছিলো, সবাই ভেবেছিলো এখানে স্কটল্যাণ্ডের কাছে সমুদ্র নিস্তরঙ্গ থাকবে, আচমকা এখন ঝড়বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। ঝড়তুফান হয়তো সত্যিই ওঠেনি, কিন্তু হাওয়া ছিলো প্রখর, সমুদ্র ছিলো ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল, আর সমুদ্রযাত্রায় ততটা অভ্যস্ত নন ব'লেই প্রথম দিনে মেরি বা লেডি হেলেনা কেউই নিজেদের ক্যাবিন থেকে বেরোননি। দ্বিতীয় দিনে যখন হাওয়ার তোড় কমলো, সমুদ্র শান্ত হ'য়ে এলো, ঢেউয়ের দোলাও ক'মে এলো। সমুদ্র শান্ত হ'য়ে যেতেই যাত্রীরা ডেকে এসে জড়ো হলেন : ঠিক যেন পুব দিগন্তে সমুদ্রের মধ্য থেকেই উঠে এলো সূর্য, আকাশের গায়ে একটা লালের ছোপ, আর সেখান থেকে রৌদ্রের ছটা বেরিয়ে আসছে, *ডানকানের* শাদা পালে এসে পড়েছে রোদ্দুর। স্নিগ্ধ একটা হাওয়া দিচ্ছে।

কারুই যেন আর তর সইছিলো না। চট ক'রে যদি গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া যেতো, তাহ'লেই যেন খুশি হ'তো সবাই। কিন্তু ইওরোপ থেকে তাঁদের যেতে হবে দক্ষিণ আমেরিকায়, নতুন মহাদেশের তটে—১৪৯২ সালে ক্রিস্তোবাল কোলোন ( বা ক্রিস্তোফোরো কোলোম্বো বা ক্রিস্টফার কলম্বাস ) খুব-তো আর চট ক'রে যেতে পারেননি নতুন মহাদেশে। তাঁদের হয়তো অত সময় লাগবে না, কিন্তু এ তো আর ইওরোপের এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে যাওয়া নয়।

লেডি হেলেনা যেন স্পষ্ট ক'রে মেরির জিজ্ঞাসাটাকেই উচ্চারণ করলেন : 'আমাদের গিয়ে পৌঁছুতে কত সময় লাগবে, এউ ?'

'ম্যাঙ্গলস, আমরা কত জোরে যাচ্ছি বলো তো?'

'ঘণ্টায় সতেরো সামুদ্রিক মাইল। যদি এই চলার এই গতি বজায় থাকে, তাহ'লে আমরা পাঁচ সপ্তাহের মধ্যেই কেপ হর্ন পৌঁছে যাবে।' কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স জানালেন।

'কেপ হর্ন? ভারি অদ্ভুত নাম তো ?'

'কেপ হর্ন আসলে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণতম বিন্দু। ৫৫°৫৯´ দক্ষিণ। তিয়েররা দেল ফুয়েগো হর্ন আইল্যাণ্ডেরই অংশ, মূল ডাঙা হচ্ছে দক্ষিণ চিলে,' কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স জানালেন, 'শিঙের মতো দেখতে ব'লেই অন্তরীপটার নাম কেপ হর্ন। সেখানে পৌঁছুবার পরই খোঁজখবর নিয়ে আমাদের পরবর্তী সূচি তৈরি করতে হবে।

পাতাগোনিয়া যেতে হ'লে ঐ দক্ষিণতম বিন্দু পেরুতেই হবে *ডানকানকে* ।

'পাঁচ সপ্তাহ অবশ্য খুব বেশি সময় নয়—দেখতে-না-দেখতেই এই দিনগুলো কেটে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবে।' লর্ড এডওয়ার্ড ঘুরে মেরির দিকে তাকিয়ে জিগেস করলেন, 'মিস গ্রান্ট, *ডানকান* জাহাজকে কেমন লাগছে?'

*ডানকান* যদি তাকে আর রবার্টকে না-নিয়ে অভিযানে বেরিড়ে পড়তো, তাহ'লে মেরির তা মোটেই ভালো লাগতো না। এখন তার মনে হচ্ছে কাপ্তেন গ্রান্টের সন্ধানে যে-অভিযান রওনা হয়েছে, তাতে তারও মস্ত একটা ভূমিকা আছে। সে উদ্ভাসিত মুখে বললে : 'দারুণ! চমৎকার!'

'রবার্টের কী খবর?' জিগেস করলেন লর্ড এডওয়ার্ড। 'কই? তাকে তো দেখছি না?'

মেরি কিছু বলবার আগেই কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স হেসে বললেন, 'রবার্ট তো আমার প্রধান সহকারী হ'য়ে উঠেছে। এই হয়তো সে আছে এনজিনের সামনে, পরক্ষণেই ফোরকাস্‌ল-এ, বা মাস্তুলের ডগায়। ঐ তো, তাকিয়ে দেখুন না বড়ো মাস্তুলটার দিকে।'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসের কথা শুনে সবাই মাস্তুলটার দিকে তাকিয়ে দ্যাখে, মাস্তুলের ওপরে উঠে রবার্ট দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে। দেখেই, মেরির বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠলো। কী ডাকাবুকো ছেলেই না হয়েছে সে, প্রাণে একটুও ভয়ডর নেই। জাহাজে উঠতে পেরে সে যেন ফুর্তিতে ডগমগ করছে। কিন্তু মেরি আঁৎকে উঠে বললে, 'কী সর্বনাশ! প'ড়ে যাবে যে!'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স কিন্তু তখনও হাসছেন। বললেন, 'মিথ্যে ভয় পাবেন না, মিস গ্রান্ট। দু-দিনেই আপনার ভাইকে ওস্তাদ নাবিক বানিয়ে দেবো—দেখে এমনকী কাপ্তেন গ্রান্টেরও তাক লেগে যাবে।'

'কিন্তু ওভাবে অকারণে—'

'সে-ই তো ভালো। জাহাজ যখন দুলছে না তখনই তো তরতর ক'রে ওপরে ওঠা-নামা অভ্যাস করতে হবে, যাতে পরে দরকারের সময় আচমকা এ-কাজ করতে গিয়ে ভয় না-পায় বা গুবলেট ক'রে না-ফ্যালে। দেখবেন মিস গ্রান্ট, আপনার বাবা বরং তার এইসব ওস্তাদি দেখে তারিফই করবেন।'

'আপনি যদি বলেন,' মেরির গলা থেকে শঙ্কার ভাব তখনও দূর হয়নি। 'আপনার ওপরই কিন্তু ওর ভার রইলো।'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স আবার আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করলেন মেরিকে। 'কিচ্ছু ভাববেন না, মিস গ্রান্ট। আমি সবসময় ওর ওপর কড়া নজর রাখবো।'

লর্ড এডওয়ার্ড প্রসঙ্গটা পালটাবার জন্যে বললেন, 'ম্যাঙ্গল্‌স, আমি বরং এই ফাঁকে এঁদের জাহাজটা ভালো ক'রে দেখিয়ে আনি। তুমি ততক্ষণে স্টুয়ার্ডকে বলো আমাদের ছোটোহাজরির ব্যবস্থা করতে।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজর ম্যাকন্যাবস ডেকের একপাশে রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে সিগার টানছিলেন। একদিন নতুন মহাদেশ থেকেই তামাক এসেছিলো, আর এখন ইওরোপের অজস্র লোকই এই চুরুট খাবার নেশায় আটকে গিয়েছে। তাঁর মধ্যে কোনো চাঞ্চল্যই নেই। সম্ভবত মেজর ম্যাকন্যাবস সকালবেলায় ছোটোহাজরির আগে কোনো বিষয় নিয়েই অস্থির হন না। কোনো লড়াইয়ের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি কী করেন, এ নিয়ে লর্ড এডওয়ার্ড অনেক সময়েই ভাবতেন। মেজর ম্যাকন্যাবস এর আগেই সারা জাহাজ ঘুরে দেখেছেন, ফলে *ডানকান* জাহাজ ঘুরে দেখবার জন্যে তাঁর কোনো কৌতূহল ছিলো না। লর্ড গ্লেনারভন অন্যদের নিয়ে জাহাজের অন্যদিকে চ'লে গেলেন। মেজর ম্যাকন্যাবস একা-একা দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবতে-ভাবতে আনমনে দিগন্তের দিকে তাকিয়েছিলেন। হঠাৎ কাছেই কার পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দ্যাখেন অচেনা এক ভদ্রলোক তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস, তাঁর সহকারীরা, জাহাজে কাজ করতে এসেছে যে-সব মাঝিমাল্লা, তাদের প্রায় সবাইকেই মেজর ম্যাকন্যাবস চেনেন। এটা ঠিক যে নতুন অনেককেই অভিযানের আগে *ডানকান* জাহাজে নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু এই অচেনা ভদ্রলোক যে তাদের কেউ নয়, সে তাঁর চেহারা বা পোশাক-আশাক দেখেই বোঝা যায়। খালাশির পোশাক পরা নেই তাঁর, তাছাড়া খুব হট্টাকট্টা গাট্টাগোট্টা পোড়খাওয়া লোকও নন তিনি। বরং ঢ্যাঙা রোগামতো এই ভদ্রলোককে দেখে মনে হয় একটা সরু লম্বা পেরেকের ডগায় কেউ মস্ত-একটা মাথা গেঁথে দিয়েছে। মাথার সামনের দিকে চুল পাৎলা হ'য়ে এসেছে, ছুঁচলো চিবুক, চোখে পুরু পরকলার চশমা। ভদ্রলোক এখনও যেন ঘুমের ঘোর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি, ঝকঝকে দিনের আলোয় চোখ কুঁচকে আলোটা যেন চোখে সইয়ে নেবার চেষ্টা করছেন। চোখমুখে বুদ্ধির দীপ্তি। আর কেমন-একটা কৌতুকের ছোপ। মাথায় কানঢাকা টুপি, হলদে রঙের বুটজুতো পায়ে, কোমরে সেই রঙের চামড়ারই বেল্ট, গায়ে খয়েরি রঙের মখমলের জ্যাকেট, ট্রাউজার জোড়ার রঙও তা-ই—পকেটগুলোয় রাশি-রাশি কাগজপত্তর, যেন একটা আস্ত টেবিলের সব জিনিশপত্র কোট-প্যান্টের পকেটে এসে আশ্রয় নিয়েছে। গলা থেকে ঝুলছে একটা টেলিস্কোপ। ভদ্রলোক মেজরকে ঘিরে ধুপধাপ আওয়াজ ক'রে একবার পাক খেয়ে নিলেন; এঁরই এই ধুপধাপ শব্দে মেজরের তন্ময়তা ভেঙেছিলো।

মেজর ম্যাকন্যাবস একটু অবাক হ'লেও কোনো কথাই বললেন না—বা তাঁর চোখমুখে বিস্ময়ের কোনো ছাপ দেখা দিলো না। অথচ এমনিতে তাঁর বিস্মিত হবারই কথা ছিলো। তিনি যতদূর জানতেন তাতে তাঁরা কয়েকজন ও মাঝিমাল্লারা ছাড়া *ডানকান* জাহাজে আর-কোনো যাত্রীরই যাবার কথা নয়। তবু মেজর ম্যাকন্যাবস মুখ ফুটে এই অচেনা যাত্রীটির কোনো পরিচয়ই জানতে চাইলেন না। এই ঢ্যাঙা ভদ্রলোকটি কিন্তু জিজ্ঞাসু চোখে হাজারো কৌতূহল নিয়েই মেজর ম্যাকন্যাবসের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স তাঁকে নিজে থেকে কোনো সম্ভাষণ করলেন না দেখে এই অচেনা আগন্তুকটি টেলিস্কোপটা টেনে লম্বা ক'রে দিগন্তের দিকে তাকালেন। তারপর টেলিস্কোপটা একটা ছড়ির মতো রেখে তাতে ভর দিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে ভদ্রলোক টাল সামলাতে না-পেরে প'ড়ে গেলেন, কারণ টেলিস্কোপ তাঁর ভারে ততক্ষণে খোপের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। তাঁর কাণ্ড দেখে কেউ হয়তো এতক্ষণে হেসে ফেলতো, কিন্তু মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স তবু গায়ে প'ড়ে ভদ্রলোক সম্বন্ধে কোনো কৌতূহলই প্রকাশ করলেন না।

ঢ্যাঙা ভদ্রলোক উঠে প'ড়ে জ্যাকেটটা থেকে ধুলো ঝেড়ে টেলিস্কোপটা ফের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে নবাবিচালে হাঁক পাড়লেন। 'স্টুয়ার্ড! স্টুয়ার্ড!'

ঠিক সেই সময়েই কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসের নির্দেশ অনুযায়ী স্টুয়ার্ড অলবিনেট সকলের ছোটোহাজরির ব্যবস্থা করতে ডাইনিংরুমে যাচ্ছিলো। হঠাৎ এমন হাঁক শুনে একটু থতমত খেয়ে ভদ্রলোকের সামনে এসে বললে : 'আপনি কি আমায় কিছু বলছেন?'

'আপনিই কি স্টুয়ার্ড?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি?'

'আমি ছ-নম্বর ক্যাবিনের যাত্রী।'

'ছ-নম্বর ক্যাবিন!' স্টুয়ার্ড অলবিনেট এবার সত্যি হতভম্ব হ'য়ে পড়লো। *ডানকান* তো কোনো যাত্রীবাহী জাহাজ নয়, তাতে আবার ছ-নম্বর ক্যাবিন ব'লে কী আছে?

'হ্যাঁ। তা মঁসিয় স্টুয়ার্ড, আপনার নামটা আমি জানতে পারি? আমার আবার সারাক্ষণ "স্টুয়ার্ড-স্টুয়ার্ড" ক'রে চ্যাঁচাতে ভালো লাগে না।'

'অলবিনেট।' অলবিনেট তখন সত্যি বুঝে উঠতে পারছিলো না কী বলবে। কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স তাকে কখনও এই যাত্রীটির কথা বলেননি।

'তা মঁসিয় অলবিনেট, প্রায় দু-দিন আমার পেটে কোনো দানাপানি পড়েনি। পারী থেকে গ্লাসগো অব্দি প্রায় ছুটেই এসেছি একটানা। চ্যানেল পেরুতে হ'লো—ক্যালে থেকে ডোভার, তারপর এখানে গ্লাস্‌গোতে। তা ছোটোহাজরি হবে কখন?'

অলবিনেট ততক্ষণে তার হতচকিত দশা থেকে বেরুবার চেষ্টা করছে। বললে, 'নটার সময়, ডাইনিংরুমে।'

ভদ্রলোক তাঁর অগুনতি পকেট হাৎড়াতে-হাৎড়াতে শেষে কোন-এক পকেট থেকে একটা ঘড়ি বার ক'রে এনে অতীব মনোযোগ সহকারে সময়টা দেখলেন। 'সবে তো দেখছি আটটা বাজে! আরো-একটি ঘণ্টা! তাহ'লে আমার ক্যাবিনে কিছু পানীয় আর খুচরো-কিছু বিস্কুট পাঠিয়ে দেবেন। খিদেয় আমার জঠর এখন চি-চি করছে। হ্যাঁ, আর, ভালো কথা—কাপ্তেন কোথায় এখন? কিংবা ফার্স্টমেট? জাহাজ তো দেখছি চমৎকার চলেছে, পালে খোলা হাওয়া লাগিয়ে তোফা পাড়ি জমিয়েছে।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টুয়ার্ড ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলো না এই অচেনা অভ্যাগতটিকে নিয়ে সে কী করবে। আর তখনই কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সকে এদিকটায় আসতে দেখে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলে। তার জানা নেই এই যাত্রীমহোদয় সত্যি কে, কাপ্তেন নিশ্চয়ই জানেন। তাই সে পরিচয় করিয়ে দিলে 'ইনিই কাপ্তেন—'

'কাপ্তেন? কাপ্তেন বার্টন, শেষ অব্দি তাহ'লে সাক্ষাৎ হ'লো আপনার সঙ্গে? চমৎকার। আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে ভারি খুশি হয়েছি—' ব'লে হাতঝাঁকুনির জন্যে অচেনা যাত্রীটি হাত বাড়িয়ে দিলেন।

বার্টন? নিজের পিতৃদত্ত দীক্ষান্ত নামটিকে এভাবে আদ্যন্ত বদলে যেতে দেখে কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স বেশ হকচকিয়েই গেলেন। অচেনা যাত্রীটি ততক্ষণে তাঁর হাত ধ'রে ঝাঁকাচ্ছেন, 'নানান গোলেমালে পরশু তো দেখাই হ'লো না। অবশেষে আজ সকালেই একেবারে মুখোমুখি দেখা হ'য়ে গেলো। খুব ভালো লাগছে আমার। তা, কেমন লাগছে এই *এস. এস. স্কটিয়া* জাহাজটাকে?'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস আরো ভড়কে গিয়ে, যেন বিষম খেয়েই, স্টুয়ার্ডের দিকে একবার তাকালেন। তারপর এই প্রথম তিনি সম্ভাষণ করলেন যাত্রীটিকে : '*এস. এস. স্কটিয়া* মানে?'

'যে-জাহাজ নিয়ে পাড়ি দিচ্ছেন, তারই নাম। কী-রকম ছিমছাম ঝকঝকে জাহাজ, দেখেছেন? খাশা! ঠিক রাজহাঁসের মতো ভেসে চলেছে। আচ্ছা, বলুন তো, আপনি কি সেই বিখ্যাত বার্টনের কেউ হন, যিনি আফ্রিকার নানা দুর্গম অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়ে অমন চমৎকার একখানা বই লিখেছেন আফ্রিকা সম্বন্ধে?'

'কিন্তু, সার, আমি বার্টনের কেউ নই—বার্টন আমার নামই নয়।'

'তবে কি আপনি ফার্স্টমেট মঁসিয় বার্ডনেস?'

কাপ্তেনের পেছন-পেছনই গল্প করতে-করতে আসছিলেন লর্ড এডওয়ার্ডরা। তাঁদের দেখেই সাময়িকভাবে কাপ্তেনকে অব্যাহতি দিয়ে তাঁদের দিকে প্রায় ছুটেই চ'লে গেলেন এই অদ্ভুত নবাগত যাত্রী। 'এঁরাও তবে এই জাহাজেরই যাত্রী? বেশ ভালো হ'লো। জমিয়ে আড্ডা দেয়া যাবে—একঘেয়ে নিরেস লাগবে না যাত্রাটা। আসুন, আপনাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে নিই।' লেডি হেলেনাকে সম্ভাষণ করলেন মাদমোয়াজেল, মেরিকে বললেন মাদাম, লর্ড এডওয়ার্ডকে বললেন মঁসিয়—আর খুব ক'রে সবাইকার হাত নেড়ে দিলেন।

প্রহসনটা হুড়মুড় ক'রে ঘাড়মুখ গুঁজড়ে এগুচ্ছে দেখে কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স ততক্ষণে এগিয়ে এসেছেন। তাঁর এই হতভম্ব ভড়কে-যাওয়া দশা এখনও কাটেনি বটে, তবে তাঁর মনে হয়েছে এবারে সমস্ত ব্যাপারটা মাথা ঠাণ্ডা ক'রে একটু ভালো ক'রে অনুধাবন করা যাক। কিন্তু সেটা তাঁর সাধ্যে কুলোলে তো? যেই তিনি বলতে গেছেন, 'ইনি হলেন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেডি হেলেনা, আর উনি লর্ড এডওয়ার্ড গ্লেনারভন,' আগন্তুক অমনি ব'লে উঠেছেন, 'তাই নাকি ? তা জাহাজে প্রথম আলাপেই অত নিখুঁতভাবে সহবৎ মেনে চলা যায় না। তবে *স্কটিয়ার* ওপর দু-দিনেই প্রথম আলাপের এই আড়ষ্টতা কেটে গিয়ে ঘনিষ্ঠতা গজিয়ে উঠবে। তখন কি আর এ-সব তুচ্ছ আদবকায়দার কথা কেউ মনে রাখবে ?'

রকমসকম দেখে সকলেই তাজ্জব। শুধু যে-কথাটা প্রথমেই জিগেস করা উচিত ছিলো, সেই কথাটাই এবার জিগেস করলেন লর্ড এডওয়ার্ড—'কার সঙ্গে আলাপ হ'লো জানতে পারি কি !'

'ও-হো, দুঃখিত। নিজের পরিচয়টাই তো এখনও দেয়া হয়নি। এই অধম পারী ভৌগোলিক সমিতির প্রধান সচিব, এবং বার্লিন, বম্বাই, লাইপজিক, লণ্ডন, সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, হ্যীন, নিউ-ইয়র্ক ভৌগোলিক সমিতির সদস্য জাক-য়েলিয়াস ফ্রাঁসোয়া মারি পাঞয়ল। আমি কিন্তু ইস্ট-ইনডিয়া ইনস্টিটিউটের রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাণ্ড এথনোগ্রাফিক্যাল সোসাইটিরও সদস্য। দুই দশক ধ'রে শুধু আরামকেদারায় ব'সেই ভূগোলের চর্চা করেছি—এবারে সশরীরে যাচ্ছি ভারতবর্ষে, পদব্রজে ঘুরে-ঘুরে ভারতের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলো সরেজমিন তদন্ত ক'রে দেখতে।'

জাক পাঞয়লের নামটা শোনবামাত্র লর্ড এডওয়ার্ডের মধ্যে একটা সম্ভ্রমের ভাব জেগে উঠলো। তিনিও অবসর সময়ে এক-আধটু ভূগোলচর্চা ক'রে থাকেন—আর তাইতেই বিভিন্ন জার্নালে নানা সময়ে জাক পাঞয়লের নানাবিধ তত্ত্ব ও আবিষ্কারের খবর বেরিয়েছে, আর যে-রকম সম্মান দিয়ে সে-সব প্রতিবেদন বেরিয়েছে তাতে বোঝা যায় পণ্ডিতেরা জাক পাঞয়লের বিদ্যাবত্তাকে যথেষ্টই সম্মান ক'রে থাকেন। *ডানকান* জাহাজে যে এভাবে আচমকা তাঁরই সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাবে, এটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। পুরোটাই রীতিমতো চমকপ্রদ এক ভ্রান্তিবিলাস ব'লেই মনে হচ্ছে, আরামকেদারা থেকে পা বাড়াবামাত্র ভূগোলবিদ কোথাও একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে ব'সে আছেন—কিন্তু বিভ্রম যা-ই কিংবা যেভাবে ঘ'টে থাকুক না কেন, লর্ড এডওয়ার্ড ভাবলেন এই ছিটগ্রস্ত অধ্যাপকটিকে সমাদর করা কর্তব্য, এবার তিনি নিজেই তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়ে জিগেস করলেন, 'আচ্ছা, একটা কথা যদি জানতে চাই—'

'একটা কেন ? অনেক কথাই জানতে চাইতে পারেন। কী জানতে চান, বলুন—'

'আপনার কথা থেকে মনে হ'লো আপনি বোধকরি পরশু রাতের বেলা জাহাজে এসে উঠেছেন—'

'হ্যাঁ, রাত আটটায়। তিরিশ ঘণ্টা রেলের ঝাঁকুনি খেয়েছি সমানে, তারপর ঘোড়ার গাড়িতে ক'রে স্টেশন থেকে জাহাজঘাটা—যা ধকল গেছে, কী আর বলবো। আমার তো আর ভ্রমণ ক'রে অভ্যাস নেই। তাই *এস. এস. স্কটিয়ায়* উঠেই সোজা ছ-নম্বর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাবিনে গিয়ে চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে পড়েছি—একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা ঘুমিয়েছি, নইলে আবার অসুখবিশুখ বাধিয়ে মুশকিলে প'ড়ে যেতে হ'তো।'

এতক্ষণে এই বিভ্রমের রহস্য বোঝা গেলো। *ডানকান* ছাড়বার আগে সবাই যখন গির্জেয় গেছে, জাহাজে যে কোনো পাহারার দরকার আছে সেটাও কারু তখন খেয়াল হয়নি, আর রাতের অন্ধকারে বিধ্বস্ত পাঞায়ল *ডানকানকেই এস. এস. স্কটিয়া* মনে ক'রে সোজা গিয়ে ঢুকে পড়েছেন তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট-করা ছ-নম্বর ক্যাবিনে।

'কথা ছিলো সোজা কলকাতার বন্দরে পৌঁছে, সেখান থেকেই স্থলপথে আমাদের ভৌগোলিক অভিযান শুরু হবে। ভৌগোলিক সমিতির পক্ষ থেকে বড়োলাটবাহাদুরকে সেই মর্মেই বিশদ বিবরণ জানানো হয়েছিলো। আমাদের ভৌগোলিক সমিতি জানতে চাচ্ছিলো, তিব্বতের ইয়ারো-জাঙবো-চউ নদীটা হিমালয়ের দক্ষিণদেশ থেকে বেরিয়ে শেষটায় আসামের ব্রহ্মপুত্র নদে গিয়ে পড়েছে কি না। সেটাই সরেজমিন দেখে-আসা আমার উদ্দেশ্য ছিলো। ঐ রাস্তায় বেরিয়ে, নদীর গতিপথ আবিষ্কার করতে গিয়ে, এই '৪৬ সালে ক্রিক ব্যর্থ হয়েছিলেন—আমার ধারণা, আমি নিশ্চয়ই সফল হবো।'

জাক পাঞায়ল যেন দ্বৈতালাপে বিশ্বাসই করেন না, ক্লাসে পড়িয়ে তাঁর অভ্যাসটা এমনই বিগড়ে গেছে যে সারাক্ষণ, *অনর্গল,* মুখ থেকে তুবড়ির মতো বাক্যের ফুলঝুরি ছিটিয়ে চলেন। রেলভ্রমণের ধকলে তিনি কতটা কাহিল হয়েছিলেন এখন আর সেটা বোঝবার কোনো জো নেই—সম্ভবত ঐ ছত্রিশ ঘণ্টা একটানা ঘুমিয়ে নেবার পর শরীরটা তাঁর এতই ঝরঝরে লাগছে, এতই চাঙ্গা লাগছে যে তোড়ে বাক্যবর্ষণ ক'রে যাচ্ছেন। একটু খারাপই লাগলো তাঁর ভুলটা ভাঙিয়ে দিতে, কিন্তু গোড়াতেই ভুলটা ভাঙিয়ে না-দেয়াটাও অন্যায় হবে। 'মঁসিয় পাঞায়ল,' লর্ড গ্লেনারভন খুব স্পষ্ট ক'রে বললেন, 'আপনি কিন্তু মোটেই কলকাতা যাচ্ছেন না।'

তড়াক ক'রে কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন জাক পাঞায়ল, 'অথচ কাপ্তেন বার্টন—'

'আপনি ভুল করেছেন, মঁসিয় পাঞায়ল', ম্যাঙ্গলস বললেন, 'আমি কিন্তু কাপ্তেন বার্টন নই—'

'তাহ'লে *স্কটিয়া*—'

'এবং এটা *এস. এস. স্কটিয়াও* নয়।'

জাক পাঞায়ল শুধু হতচকিত নন, স্তম্ভিত। জীবনে এই-প্রথম সম্ভবত তাঁর কোনো বাক্‌স্ফূর্তি হ'তে চাচ্ছিলো না। এক-এক ক'রে সকলের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে গেলেন তিনি; না, মোটেই কোনো রসিকতা নয় এটা, সকলেরই মুখ গম্ভীর। শুধু কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসের ওষ্ঠাধর মুচকি-এক হাসিতে ফুসকায়িত হ'য়ে আছে। আর তারপরেই তাঁর চোখ পড়লো হালের চাকায়, সেখানে বড়ো-বড়ো হরফে স্পষ্ট ক'রে লেখা :



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

## *ডানকান*

## গ্লাসগো

'অ্যাঁ! *ডানকান*!'

প্রায় অর্ধস্ফুট একটা আর্তনাদের মতোই কথাটা পাঞ্চয়লের মুখ থেকে নিঃসৃত হ'লো। কী-রকম হতাশভাবে ছুটে গিয়ে তিনি ঢুকে পড়লেন তাঁর ঐ ছ-নম্বর ক্যাবিনে।

এই ভ্রান্তিবিলাসে সকলেরই হাসি পাচ্ছিলো, শুধু মেজর ম্যাকন্যাব্‌সই সারাক্ষণ চুপচাপ গম্ভীর হ'য়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

লর্ড গ্লেনারভন বললেন, 'বেচারা! এটা অবিশ্যি সব্বাই জানে যে জাক পাঞ্চয়ল প্রায় গল্পের বইয়েরই চরিত্রের মতো, অন্যমনস্ক অধ্যাপক বলতে যা বোঝায়, উনি তারই সশরীর জলজ্যান্ত প্রমাণ—'

'বেচারি বললে কী হবে,' মেজর ম্যাকন্যাব্‌সের গলা শোনা গেলো এতক্ষণে, 'ওঁকে এখন কলকাতার বদলে আমাদের সঙ্গে পাতাগোনিয়াতেই যেতে হবে—কিছুতেই আর ফেরা হবে না।'

'তবে প্রথম যে-বন্দরে *ডানকান* নোঙর ফেলবে,' লর্ড গ্লেনারভন সহানুভূতির সুরে বললেন, 'সেখানেই বেচারিকে নামিয়ে দেয়া যাবে না-হয়।'

জাক পাঞ্চয়লের এই গোড়ায় গলদের শেষরক্ষা কী ক'রে করা যায়, এ নিয়ে যখন পরামর্শ করতে সবাই ব্যস্ত, ঠিক তখনই তাঁর বিখ্যাত ছ-নম্বর ক্যাবিন থেকে কাঁচুমাচু মুখ ক'রে বেরিয়ে এলেন জাক পাঞ্চয়ল, তাঁকে কেমন-একটু সংকুচিত দেখালো। কোনো কথা না-ব'লে তিনি নিরীক্ষণ করলেন বড়ো মাস্তুলটা, তাকিয়ে দেখলেন সমুদ্রের ফেনোচ্ছল জল, আর দূরের ঝাপসা দিগন্তরেখা। তারপর আস্তে হেঁটে লর্ড গ্লেনারভনের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

'আপনাদের জাহাজ কোথায় যাচ্ছে?'

'চিলেয়—দক্ষিণ আমেরিকায়।'

'সর্বনাশ! সে-যে একেবারে উলটো দিকে—'

'আপনি না-হয় আমাদের সঙ্গে চলুন—'

'উঁহু, তা হয় না। আমাদের একটা আন্তর্জাতিক অধিবেশন রয়েছে যে সামনেই—'

'তাহ'লে মাদেইরাতে নেমে পড়বেন—তারপর সেখান থেকে ফিরতি কোনো জাহাজ ধ'রে ইওরোপেই ফিরে যাবেন না-হয়।'

'*ডানকান* তো আর মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে না, নৌসেনারও জাহাজ নয়—এ তো নিছকই একটা প্রমোদতরণী। আপনারা নিশ্চয় নৌবিহারেই বেরিয়েছেন। তাহ'লে আর কলকাতা বেড়াতে গেলেই বা ক্ষতি কী? তাছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলকাতা, লণ্ডনের পরেই; সেখানে বা তার আশপাশে ঘুরে বেড়িয়ে কতকিছু দেখতেও তো পাবেন। সম্পূর্ণ অন্যরকম এক জীবনযাত্রা, একেবারেই আলাদা এক সংস্কৃতি।'

'আপনি কলকাতা নিয়ে ওকালুতি না-করলেও আমার নিজে থেকেই তো কতকাল ধ'রে কলকাতা—শুধু কলকাতা কেন, আস্ত ভারতভূমিই ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছে হচ্ছিলো। কিন্তু এখন, এই-মুহূর্তে, *ডানকানকে* নিয়ে বঙ্গোপসাগরে বেড়াতে যাবার লোভ আমাকে সংবরণ করতেই হবে। এখন দক্ষিণ আমেরিকা না-গিয়ে আমার কোনোই উপায় নেই।'

লর্ড গ্লেনারভন তখন বিস্তারিতভাবে খুলে বললেন কী উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি পাতাগোনিয়া যাচ্ছেন। একটুও সবুর করার উপায় নেই, এমনিতেই বড্ড দেরি হ'য়ে গেছে, একটা দিনও অন্যকোথাও গিয়ে নষ্ট করা চলবে না। তাছাড়া মেরি আর রবার্টও খুব ব্যাকুল হ'য়ে আছে। এই বেচারিদের কথা ভাবলে মনে হয় জলযানের বদলে কোনো উড়োযানে ক'রে উড়াল দিতে পারলেই ভালো হ'তো—চট ক'রে পেরিয়ে যাওয়া যেতো এই বিপুল জলধি। এককালে হয়তো লোকে কোনো উড়োজাহাজ আবিষ্কার করবে—তখন হয়তো দূর-দূরান্তেও আরো-অল্প সময়ে চ'লে-যাওয়া যাবে।

সব কথা খুলে ব'লে লর্ড গ্লেনারভন পাঞয়লকেও তাঁদের সঙ্গে যেতে আমন্ত্রণ জানালেন। 'তার চেয়ে আপনিই বরং চলুন না আমাদের সঙ্গে। কলকাতা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না—সেখানে পরেও যাওয়া যাবে। তাছাড়া আপনি তো আর দক্ষিণ আমেরিকা চক্ষেও দ্যাখেননি—চর্মচক্ষুতে সব দেখে আপনি নতুন মহাদেশ সম্বন্ধে অজস্র নতুন তথ্য জানতে পারবেন।'

জাক পাঞয়ল প্রস্তাবটায় মোটেই রাজি হলেন না—তবে লেডি হেলেনার দয়ামায়াসহানুভূতির প্রশংসা করলেন সাতকাহন ক'রে, বোতল থেকে উদ্ধার করা সাহায্যের জন্যে তিন তলবও দেখলেন, সে-সম্বন্ধে অবশ্য নতুন-কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারলেন না। কিন্তু যখন জানলেন যে লেডি হেলেনা বিখ্যাত ভূপর্যটক উইলিয়াম টাফনেলের দুহিতা, তখন হৈ-হৈ ক'রে উঠলেন : 'তাই নাকি ! বিল টাফনেল তো আমার বন্ধুমানুষ ! ইনি তাঁরই মেয়ে ! কী আশ্চর্য, দৈব যে কখন কী করে, তা কেউ বুঝতেও পারে না। কে জানতো যে একদিন বিল টাফনেলের মেয়ের সঙ্গে একই জাহাজে ক'রে আমি সাগরপাড়ি দেবো !'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

## ছয়

# জাক পাঞ্জয়লের মতিবদল

আগস্টের তিরিশ তারিখে দেখা গেলো মাদেইরা, উত্তর অ্যাটলান্টিকের ক্যানারি আইল্যাণ্ডসের উত্তরে, এলোমেলো ছড়িয়ে আছে ছোটো-ছোটো কতগুলো দ্বীপ, পোর্তুগালের অধীন এই দ্বীপগুলোর রাজধানী ফুনশাল, 'তিনশো-দুই বর্গমাইল তার বেড়,' আর কী দারুণ আঙুর হয়, 'ওহ, মাদেইরা ওয়াইন দারুণ খেতে,' তবে, 'মূল মাদেইরা দ্বীপ, যার বেড় দুশো পঁচাশি বর্গমাইল, সেখানে খামকা নোঙর ফেলতে চাচ্ছেন কেন? এখানে তো দেখার কিছুই নেই, আগেকার যত ভূগোলবিশারদেরাই তো যা দেখার সবকিছু দেখে গিয়েছেন। হ'তো যদি ব্রাজিল, যেখানে পশ্চিমে আমাজোন থেকে বেরিয়েছে মাদেইরা নদী—পোর্তুগিসরা আশ্চর্য, নতুন-কিছু দেখলেও পুরোনো নামেরই স্মরণ নেয় —এই মাদেইরা নদী মামোরে আর বেনির মোহানায় প'ড়ে বোলিভিয়ার সীমান্তটাকে চিনিয়ে দিচ্ছে, তাহ'লে না-হয় একবার নামা যেতো,'—এত-সমস্ত কথা ভূগোলবিশারদ জাক পাঞ্জয়লের, জাহাজ থেকে না-নামবার অনেকগুলো ছুতোর মধ্যে একটি। 'এখান থেকে নিশ্চয়ই আপনারা ক্যানারি আইল্যাণ্ডে যাবেন, ঐ যে-দ্বীপগুলো আছে অ্যাটলান্টিকে, আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমে, রৌদ্রোজ্জ্বল, চমৎকার, সবশুদ্ধু ২৮০৭ বর্গমাইল, এখনও এস্পানিয়ারই অধীন, তার রাজধানী লাস্ পালমাস্ সান্তা ক্রুস দে তেনেরিফে, সেখানে পাহাড়ের চুড়োয় উঠলে হয়তো অনেককিছু দেখা যাবে। পূর্ব ক্যানারির এই লাস্ পালমাস্ খুব-একটা ছোটো দ্বীপ নয়, সবশুদ্ধু ১২৭৯ বর্গমাইল বেড়, সেখানে অবশ্য ঘুরে-ঘুরে কিছু দেখা যেতে পারে।'

এই মর্মে ছেটোখাটো বক্তৃতা শুনে, এবং মাদেইরায় নামতে এই ভৌগোলিকের অনিচ্ছা দেখে, লর্ড গ্লেনারভন মৃদু একটু হাসলেনই শুধু, কিছু বললেন না। না-হ'লে বলতে পারতেন, মাদেইরার যত খবর আপনি জানেন ততটাই তো আপনি জানেন লাস্ পালমাস-এর, আর জানেন ব'লেই যদি *খামকা* নামতে না-চান মাদেইরায়, তবে সেই একই যুক্তিতে লাস পালমাস-এই বা নামবেন কেন? একটা দ্বীপ পোর্তুগালের, আর অন্যটা এস্পানিয়ার—তফাৎ তো শুধু এটাই। এ-ধরনের কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে যে কোনো লাভ নেই, এটা বুঝতে পেরেই লর্ড গ্লেনারভন মাথা নেড়ে সস্মিত মুখে জাক পাঞ্জয়লের প্রস্তাবটাই মেনে নিলেন।

মাদেইরা থেকে ক্যানারি আইল্যাণ্ডসের দূরত্ব আড়াইশো মাইলের মতো। পরের দিন অপরাহ্ণ দুটো নাগাদ ডেক থেকে দূরে, দিগন্তের কাছে, লাস্ পালমাস্ সান্তা ক্রুস



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দে তেনেরিফের পাহাড়চুড়ো দেখা গেলো, ঘন-সবুজ ছায়ার মতো। জাক পাঞ্চয়লও তখন দাঁড়িয়েছিলেন ডেকে। তাঁকে ডেকে নিয়ে চোখে দুরবিন গুঁজে দিয়ে কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস জিগেস করলেন, 'চিনতে পারছেন—ঐ যে আপনার লাস পালমাস্-এর পাহাড় —তেনেরিফে।' পাঞ্চয়ল যেন দেখেও দেখতে পেলেন না। তিনি আরামকেদারার ভূগোলবিশারদ, জানা পৃথিবীটা তাঁর নখের ডগায়, কিন্তু সেটা স্বচক্ষে দেখে বাড়তি কী আর উৎসাহ দেখাবেন তিনি। তাঁর চোখমুখে কেমন-একটা ঔদাসীন্যের ভাবই লেপটে রইলো। তবে গোল হ'লো তখন যখন কয়েকঘণ্টা পরে খালি চোখেই দেখা গেলো পাহাড়, *ডানকান* এখন তার অনেকটাই কাছে গিয়ে পৌঁছেছে—এমন জলজ্যান্ত দ্বীপটা চাক্ষুষ দেখে ফেলবার পরে আর না-দেখবার ভান করা যায় কী ক'রে? কিন্তু এবার তাঁর মুখচোখ তাচ্ছিল্যের ভাবে ভ'রে গেলো। কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসকে তিনি জানালেন, 'ধুর! ঐ পাহাড়ে উঠে আর কী হবে? ও-পাহাড়ে তো হুমবোল্টও উঠেছে, বঁপ্লাঁও উঠেছে। এ-পাহাড় আর তবে নতুন বা অজানা হ'লো কী ক'রে? হুমবোল্ট তো ঘুরে-ঘুরে পাহাড়ের পাঁচ-পাঁচটা আলাদা-আলাদা জায়গায় গিয়েছিলো, পাহাড়ের উঁচু চুড়োটায় উঠে দেখেছে এস্পনিয়ার সিকিভাগ, তারপর এমনকী আগ্নেয়গিরির ভেতরে গিয়ে পর্যন্ত জমাট লাভার স্তর দেখে এসেছে। ওখানে আর নতুন-কী দেখবো আমি। তার চেয়ে বরং কেপ ভের্দ গিয়ে ঘুরে দেখা যেতে পারে: পশ্চিম আফ্রিকার এই এই দ্বীপগুলো পোর্তুগালের অধীন, রাজধানী প্রাইয়া সাঁউ তিয়াগুর ওপর ঠিক যেন ছবির মতো বসিয়ে রেখেছে কেউ—তাছাড়া সেনেগলের অংশ এটা, আফ্রিকার একেবারে পশ্চিমতম বিন্দু—অন্তরীপটা যেভাবে অ্যাটলান্টিকে ঢুকে এসেছে ১৭°৩০´ তে তাতে মনে হয় গোটা আফ্রিকাই যেন পশ্চিমদিকে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে। আপনারা কেপ ভের্দ-এ থামবেন তো?'

'তা তো থামতেই হবে,' কথার তোড়ে ভেসে যেতে-যেতে কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস জানালেন, 'কয়লা নিতে হবে যে।'

'আমি তাহ'লে সেখানেই নেমে যাবো,' পাঞ্চয়ল অমনি ঘোষণা ক'রে বসলেন, 'ফ্রানসের কিছু লোকজন তো থাকবেই ওখানে, ব্যাবসা করতে যারা ওখানে গেছে। অবশ্য লোকে বলে ওখানেও কিছু দেখার নেই, সেনেগল তো ফরাশিদেরই অধীন—আরেকটা ফ্রানস বানিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে আর-কি ওখানে। তবে চোখ থাকলে, খুঁটিয়ে দেখতে জানলে, অনেককিছুই চোখে প'ড়ে যেতে পারে। অন্তরীপটা সেনেগলের ব'লে ফরাশিদের, দ্বীপগুলো সব পোর্তুগিসদের—পাশাপাশি দেখতে গেলে দুটো দেশের তফাৎ ভালো ক'রে মালুম হ'য়ে যাবে।'

কেপ ভের্দ বা কাপ ভার্দ যখন এলো, সেদিন আকাশ ফেটে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস পরিকল্পনা মতোই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এসে পৌঁছেছেন, দিনটা সেপ্টেম্বরের তিন তারিখ। কিন্তু কেউ যেন আকাশ উপুড় ক'রে ঘড়া-ঘড়া জল ঢেলে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছে। *ডানকান* ঠিক সেনেগলের অন্তরীপে এসে ভেড়েনি, ভিড়েছে দ্বীপের রাজধানী পোর্তু প্রাইয়াতে। কর্কটক্রান্তি পেরিয়ে আসার পর থেকেই আকাশ ছিলো মেঘলা, কালো-কালো মেঘে ঢাকা প'ড়ে গিয়েছিলো সূর্য, তারই মধ্যে মরা মিয়োনো আলোতে দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিলো আগ্নেয়গিরির চুড়াটা—সম্ভবত শ-তিনেক ফুট উঁচু হবে।

পোর্তু প্রাইয়াতে *ডানকান* নোঙর ফেলবামাত্র দেখা গেলো ভূগোলবিশারদ জাক পাঞয়ল তাঁর তল্পিতল্পা জিনিশপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে নামবার জন্যে প্রায় একপায়ে খাড়া, কিন্তু তারই মধ্যে বেশ গজর-গজর ক'রে চলেছেন। তাঁর অন্তহীন বিড়বিড় থেকে অচিরেই অবশ্য মর্মার্থ উদ্ধার করা গেলো। তাঁর সঙ্গে রয়েছে আনকোরা সব দামি-দামি যন্ত্রপাতি, যে-রকম বৃষ্টির ঢল নেমেছে তাতে সব ভিজে-টিজে একেবারে বিকল হ'য়ে যাবে যে।

কেবল এইই নয়—তাঁর ভ্যাজর-ভ্যাজর এমনকী পোর্তু প্রাইয়ার আদ্যশ্রাদ্ধ করে ছাড়লো—অবশ্যই কোনো ভৌগোলিকের দিক থেকে। এ-দেশটায় নাকি উল্লেখ করার মতো নদী নেই—'ভেবে দেখুন, পাহাড় আছে, খাতও আছে, জমি ঢাল থেকে গড়িয়ে গিয়ে পড়েছে সমুদ্রে, অথচ কোনো নদী নেই! তাজ্জব!'—তাছাড়া গাছপালা যা আছে তা নেহাৎই নাকি নামকাওয়াস্তে, বনজঙ্গল নেই—'অথচ এর নাম কি না কেপ ভের্দ—সবুজ অন্তরীপ। এ-রকম বেমানান নাম কখনও শুনেছেন?'—পাহাড় যা আছে তাও তো নিছক বালির ঢিবি—সাঁউ তিয়াগুর আগ্নেয়গিরিটাকে সরেজমিন দেখে গিয়েছেন মঁসিয় দ্য ভিল—তাঁর বর্ণনা থেকেও মনোরম কোনো তথ্য জানা যায়নি। এ-রকম একটা জনবিবর্জিত দ্বীপে দু-দুটো মাস মানুষ থাকে কী ক'রে—দু-মাসের মধ্যে তো আর দেশে ফেরার জাহাজ মিলবে না!

বিড়বিড় ক'রে এমনি সাতকাহন পেড়ে বসলেন পাঞয়ল আর ক্রমশ কেমন যেন মনমরা হ'য়ে পড়তে লাগলেন।

গোড়ায় বেচারি পাঞয়লকে তাতাচ্ছিলেন সবাই, এমনকী মেজর ম্যাকন্যাব্‌স শুদ্ধু : নেমে গেলে ক্ষতিই বা কী। ভৌগোলিকদের তো আর পৃথিবীর আশ্চর্য-সব ভূদৃশ্য নিয়ে মাথা ঘামালেই চলে না—তাঁদের তো অতিসাধারণ দেশ-গাঁ দ্বীপ-মহাদ্বীপের বর্ণনা তৈরি করতে হয়। কিন্তু এ-সব কথায় চাঙ্গা হ'য়ে ওঠার বদলে পাঞয়ল ক্রমেই যেন মিইয়ে পড়তে লাগলেন। শেষটায় তাঁর বেচারা-বেচারা মুখটা দেখে লর্ড গ্লেনারভনের একটু মায়া হ'লো, বললেন, 'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, এখানে আপনার হাত-পা গুটিয়ে মিথ্যেমিথ্যি দু-মাস ব'সে-থাকা ছাড়া আর-কিছুই করার থাকবে না। কিন্তু মঁসিয় পাঞয়ল, এরপর তো *ডানকান* গিয়ে সটান চিলেতে থামবে—একেবারে নতুন-এক মহাদেশে—অন্য-একটা গোলার্ধে। তা চলুন, আমাদের সঙ্গে না-হয় পাতাগোনিয়াতেই চলুন, সেখানকার ইণ্ডিয়ানদের চাক্ষুষ দেখে আসবেন, চলুন। তাদের নিয়ে তো কতরকম গালগল্প ফেঁদেছে লোকে—কিন্তু সত্যি তারা কী-রকম সেটা একটু নিজের চোখে দেখে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেয়া কি ঠিক হবে না?'

'কিন্তু আমার যে তিব্বতে যাবার কথা? আমায় তো ইয়ারো-জাংবো-চৌতে গিয়ে যেখানে কেউ যায়নি সেখানকার সব হালহদিশ জেনে আসতে হবে!'

'আপনার মনে হচ্ছে নদী নিয়েই কারবার। তিব্বতি নদী না-পান আমেরিকার নদী পেয়ে যাবেন। ইয়ারো-জাংবো-চৌ-এর বদলে না-হয় রিও কলোরাদোর উৎস আর মোহানাই দেখবেন না-হয়।'

'তাহ'লে তো গোড়া থেকেই ভারতবর্ষের বদলে পাতাগোনিয়া যাবার পরিকল্পনা করলেই হ'তো। ভৌগোলিক সমিতিকে আগে থেকে ব'লে-ক'য়ে-জানিয়ে এলে অভিযানটা একটা সরকারি রূপ পেতো।' তা-না-না-না ক'রে নিমরাজি হবার ভঙ্গিতে বললেন ফরাশি ভৌগোলিক।

লর্ড গ্লেনারভন একটা নামকাওয়াস্তে কৈফিয়ৎ জুগিয়ে দিলেন। 'নিশ্চয়ই অনেকরকম পরিকল্পনাই ছিলো আপনাদের সমিতির। সে-সব নিয়ে উদ্ব্যস্ত ছিলেন ব'লেই হয়তো তখন ঠিক খেয়াল হয়নি। তাছাড়া খুব কি আর ঝামেলা হবে? ভারতবর্ষে গেলেও দেখতে পেতেন ইণ্ডিয়ান—এই পাতাগোনিয়াতেও দেখতে পাবেন ইণ্ডিয়ান—শুধু এরা যে আমেরিণ্ডিয়ান সেটা মনে রাখলেই হ'লো।'

'মঁসিয় পাঞয়ল,' এবার লেডি হেলেনা তাঁকে উসকে দিলেন, 'আর মিথ্যে ভাবছেন কেন? এই বর্ষায় এখানে কোথাও যাবেনই বা কী ক'রে? তার চেয়ে আমাদের সঙ্গেই চ'লে আসুন। আমরাও না-হয় আপনার ভৌগোলিক অভিযানের সঙ্গী হ'তে পেরে কৃতার্থ হবো। আর এ নিয়ে দ্বিরুক্তি করবেন না।'

'না-না, দ্বিরুক্তি নয়,' পাঞয়লের মুখ উদ্ভাসিত, চোখ ইজ জ্বলজ্বলিং, 'ঠিক ওপর-পড়া হ'য়ে বলতে পারছিলুম না ব'লেই আপনাদের দিক থেকে আমন্ত্রণ আসার অপেক্ষা করছিলুম।' আর-কোনো ওজর-আপত্তির কথা না-তুলে সরাসরি মনের কথাটাই খুলে বললেন ভৌগোলিক : 'আপনাদের জাহাজ, আপনারা যদি না-ডাকেন তো সেই জাহাজে ক'রে যাই কী ক'রে?'

মেরি হাততালি দিয়ে ব'লে উঠলো : 'বাঃ, এই-তো বেশ হ'লো। আমাদের অভিযানে আরো-একজন সঙ্গী বাড়লো।'

আর রবার্ট তো সোজা গিয়ে তাঁকে একেবারে জড়িয়ে ধরলো।

অমনি খুশি হ'য়ে পাঞয়ল ব'লে উঠলেন, রবার্টকে তিনি একেবারে দিগ্‌গজ ভৌগোলিক বানিয়ে তুলবেন। রবার্ট বেচারা নিজে কী হ'তে চায় সেটা জানবার চেষ্টা না-ক'রেই একেকজন তাকে একেকরকম মহদাশয় বানিয়ে দেবার ঘোষণা ক'রে ব'সে আছেন। পাঞয়ল তাকে ভূগোলবিশারদ বানিয়ে দেবার কথা বলার আগে কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস বলেছেন, 'রবার্ট গ্রাণ্ট হবে কাপ্তেন গ্রাণ্টেরই সুযোগ্য সন্তান—তাকে তিনি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বানিয়ে দেবেন ওস্তাদ নাবিক।' মেজর ম্যাকন্যাবস কোন-এক দুর্লভ মুহূর্তে মুখ ফুটে বলেছেন তাকে তিনি বানিয়ে দেবেন দুর্দান্ত ও দুঃসাহসী, অকুতোভয় যোদ্ধা। লর্ড গ্লেনারভন বলেছেন তাকে আদবকায়দা শিখিয়ে একেবারে পাক্কা 'জেন্টলম্যান' বানিয়ে দেবেন। লেডি হেলেনা বলেছেন প্রাণে দয়া-মায়া না-থাকলে অমন মস্ত সর্ববিদ্যাবিশারদ হ'য়েও কোনো লাভ নেই, তিনি দেখবেন সে যাতে দয়াধর্ম শেখে। কেবল মেরি—যে অ্যাদ্দিন রবার্টের দেখাশুনো ক'রে এসেছে—সে-ই কিছু বলেনি, উলটে সবাই তাকে ছাত্রী হিশেবে পাকড়াবার চেষ্টা করেছিলো—ঠিক রবার্টের মতোই আরেকজন, যাকে যেমন-খুশি সবাই গ'ড়ে নিতে পারবে।

কিন্তু রবার্টকে ভূগোলপণ্ডিত তৈরি করার জন্যে পাঞ্চয়ল যে *ডানকান* ছেড়ে না-গিয়ে তাদের সঙ্গেই অভিযানে বেরুবেন ব'লে মনস্থির করেছেন, এতে জাহাজশুদ্ধু সব্বাই ভারি খুশি হ'য়ে উঠলো। পাঞ্চয়ল ভারি মজার মানুষ—একে তাঁর অমন ভুলো-মন, তায় ভীষণ আরামকাতুরে, তায় নানা বিষয়ে অদ্ভুত-অদ্ভুত ফোড়ন কাটেন। তিনি সঙ্গে থাকলে আর যা-ই হোক এ-অভিযান কখনোই একঘেয়ে বা বিরক্তিকর হ'য়ে উঠবে না—সবসময়েই একটা-না-একটা রসালো প্রহসন সৃষ্টি হবে, কতরকম মজা হবে।

চারদিন ধ'রে জাহাজে কয়লা বোঝাই হ'লো, রসদ তোলা হ'লো, শূন্য ভাঁড়ার ভরাট করা হ'লো। বৃষ্টি মাঝে-মাঝে ধ'রে আসে বটে, টিপটিপ, টিপটিপ, কিন্তু কখনোই পুরো থেমে থাকে না। এরই মধ্যে মেজর ম্যাকন্যাবস একাই একদিন বর্ষাতি চাপিয়ে পোর্তু প্রাইয়ায় নেমে সরেজমিন তদন্ত ক'রে এসেছিলেন সব। জাক পাঞ্চয়ল কিন্তু একবারও জাহাজ থেকে নামবারই চেষ্টা করেননি। তিনি বরং ডেকের ওপর পায়চারি করতে-করতে কিংবা ডেকচেয়ারে ব'সে আড্ডা দিতে-দিতেই তাঁর ভূগোলবিদ্যার জ্ঞানের বহর জাহির করতেন। আর বৃষ্টির সময় তো কথাই নেই—তাঁর ঐ বিখ্যাত ছ-নম্বর ক্যাবিন থেকে তিনি একপাও বেরুতেন না।

*ডানকান* যখন তার কয়লা আর রসদ নিয়ে ফের তার অভিযানে রওনা হ'য়ে পড়লো, আর সেপ্টেম্বরের সাত তারিখে পেরিয়ে এলো বিষুবরেখা, সেদিন থেকে জাক পাঞ্চয়ল তাঁর ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিধি প্রকাশ করবার জন্যে আরো-একটি নতুন বিষয় পেলেন। যখন-তখন খাবারটেবিলেই তিনি মস্ত-একটা মানচিত্র বিছিয়ে দিয়ে কাকে বলে নিরক্ষরেখা, কাকে বলে অমুক ডিগ্রি দেশান্তর আর তমুক ডিগ্রি অক্ষরেখা, কখন কার কত ডিগ্রি পেরুলে সময়ের তফাৎ হ'য়ে যায় চার মিনিট—এ-সব বিষয় সোৎসাহে হাত-পা নেড়ে বোঝাতে লাগলেন। স্টুয়ার্ড অলবিনেট বেচারির হ'লো বিষম ঝামেলা—সে বাটি-রেকাবি-কাঁটা-চামচে-ন্যাপকিন-গেলাশ যে কোথায় সাজাবে তা বুঝতে না-পেরে, তার খাবারটেবিলটা এভাবে জবরদখল হ'য়ে যেতে দেখে, পণ্ডিতপ্রবরের সঙ্গে বেজায় খিটিমিটি লাগিয়ে দিতো। অন্যদের কাছে কিন্তু জাক পাঞ্চয়লের ভূগোলের ক্লাস মজাই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগতো। আর কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসও খুশি ছিলেন যে এইসব প্রহসনের মধ্যে যদি মেরি মজা খুঁজে পায়, তাহ'লে অন্তত সেই সময়টুকু সে কাপ্তেন গ্রান্টের কথা ভুলে থাকবে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো কাপ্তেন গ্রান্টকে শিগগিরই খুঁজে-পাওয়া যাবে, তাঁদের এই অভিযান সফল হবে। শুধু মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স এই আরামকেদারার বাহাদুরি আর অবিশ্রাম বকর-বকর শুনতে চাইতেন না।—তিনি নিজে বৃষ্টির মধ্যে গিয়ে পোর্তু প্রাইয়া ঘুরে এসেছেন, কোনো পণ্ডিতি বক্তৃতা দেননি, আর ভূগোলবিশারদ কিনা সর্বক্ষণ মুখে খৈ ফুটিয়ে চলেছেন, অথচ কোনোকিছু গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসবার বেলায় তাঁর যত-সব ওজর-আপত্তি শুরু হ'য়ে যায়।

একটু বোধকরি বিরক্তই হ'য়ে উঠছিলেন মেজর ম্যাক্‌ন্যাবস, বিশেষত খাবার সময়ে ভূগোলের ক্লাসে তাঁর প্রবল অনীহাই ছিলো, কিন্তু হঠাৎ একদিন অবস্থাটা বেশ-খানিকটা বদলেই গেলো। জাহাজের লাইব্রেরিঘরে জাক পাঞয়ল আবিষ্কার ক'রে বসলেন একবাক্স বই, এস্পানিওলে লেখা—নতুন মহাদেশে যাচ্ছেন, দক্ষিণ গোলার্ধে, সেখানে ব্রাজিল বা ওলন্দাজ ইণ্ডিস বা ব্রিটিশ গিয়ানার মতো দু-চারটে জায়গা ছাড়া সর্বত্রই তো এস্পানিওলের চল—বিভিন্ন ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর অবশ্য যার-যার নিজের ভাষা আছে। ভাষাটা জানলে চিলেতে নেমে ভারি কাজে লেগে যাবে। আদানুন খেয়ে পাঞয়ল ভাষাটাকে কব্জা করার জন্যে উঠে প'ড়ে লাগলেন। বই ঘেঁটে-ঘেঁটে নানারকম শব্দ বার করেন, ধাতুরূপ মুখস্থ করেন, ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে হাওয়ার উদ্দেশে ছড়িয়ে দেন এস্পানিওল বাণী। এমনকী, অন্যদের সঙ্গে কথা বলবার সময় যখন-তখন ব্যবহার করেন এস্পানিওল, আর পরক্ষণেই বলেন, থুড়ি, ভুল হ'য়ে গেছে, তোমরা তো কথাটার মানে জানো না, কথাটা ফরাশিতে হ'লো এই, আর ইংরেজিতে হ'লো ঐ। আর এটা সবচেয়ে বেশি হ'তো যখন তিনি রবার্টকে পাকড়ে তাকে আমেরিকার কাহিনী শোনাতে লাগলেন।

'ক্রিস্তোফোরো কোলোম্বো, ক্রিস্তোবাল কোলোন বা ক্রিস্টফার কলম্বাস—যে-নামেই ডাকো না কেন, ক্রিস্তোবাল কোলোন মরবার আগে জেনেই যেতে পারলেন না ইওরোপ থেকে নতুন-একটা মহাদেশে যাবার রাস্তা তিনি আবিষ্কার করেছেন, ভারতবর্ষের ধারে-কাছেও ঘেঁসেননি। সেই প্রথম অভিযানে ১৪৯২তে গিয়েছিলেন কুবায়, আর শেষ অর্থাৎ চতুর্থ অভিযানে ১৫০৮ খ্রিষ্টাব্দে গিয়েছিলেন বারবেডোসে—প্রত্যেকবারই বেচারি ভেবেছিলেন ভারতবর্ষে এসে পা দিয়েছেন, ফলে এখানকার লোকেরা হ'য়ে গেলো ইণ্ডিয়ান, বারবেডোস হ'য়ে গেলো পশ্চিম-ইনডিস—ইণ্ডিয়া কথাটার চল ষোড়শ শতাব্দীর আগে হয়নি—আর তাও ভাশকু ডা গামা ১৪৯৮তে কোড়িকোডে পা দেবার পর সেই রাস্তায় যখন পোর্তুগিস আর ওলন্দাজ বোম্বেটেদের লুঠতরাজ দারুণ বেড়ে গেলো, তারই পর—পোর্তুগিস বোম্বেটেরা আবার আর্মাদা থেকে বদলে গেলো হার্মাদ-এ, নৌসেনা থেকে জলদস্যুতে। ক্রিস্তোবাল কোলোন যে-গণ্ডগোলটা পাকিয়ে গিয়েছিলেন সে শুধু ভূগোলটা ঠিকঠাক জানতেন না ব'লেই—'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমেরিকা মহাদেশের কথা ইওরোপের কেউই জানতো না—তারা জানতো ভূমধ্যসাগর, তারপর আফ্রিকা—তাও মরোক্কো-টরোক্কো-ভারতবর্ষের রাস্তাও জানা ছিলো না তাদের, যদিও আরবদের মারফৎ পেতো মশলিন, মশলা, চিনি আর আরোনানারকম শৌখিন জিনিশ। তো ক্রিস্টফার কলম্বাসই বা কী ক'রে বুঝবেন জলের মধ্যে আস্ত একটা অজ্ঞাত মহাদেশই প'ড়ে আছে, উত্তর-দক্ষিণ দুই গোলার্ধ জুড়ে?' রবার্ট একবার কলম্বাসের ভূগোলবিদ্যায় অজ্ঞতার কারণটা বাৎলাবার চেষ্টা করেছিলো।

'সে-কথাই তো বলছি,' এই কথোপকথনের মধ্যে অন্য শ্রোতারাও যথারীতি জুটে গিয়েছিলেন, তাঁরা শুনতে পেলেন পাঞ্চয়লের সারগর্ভ বয়ান : 'ক্রিস্তোবাল কোলোন তো না-জেনেই মরলেন যে তিনি একটা নতুন মহাদেশে যাবার রাস্তা বার ক'রে ফেলেছেন। বেরিয়ে ছিলেন এশিয়া—বিশেষ ক'রে ভারতে যাবার সোজা রাস্তাটা খুঁজে বার করতে। ফলে মধ্যআমেরিকায় এসে ভেবেছিলেন এসে পৌঁছেছেন ক্যাথে অর্থাৎ চিনদেশে, কিংবা নিপ্পন দেশে, জাপোনে। শুধু ভূগোল না-জানবার ফল—কারণ ভূগোল তো আর কতগুলো নদীপাহাড় নয়, দেশ-বিদেশের মানুষজনেরও কাহিনী। চিন-জাপান সম্বন্ধে একফোঁটা জ্ঞান থাকলে এ-গণ্ডগোল তাঁর হ'তো না। তাঁর চেয়ে ঢের সড়গড় ছিলেন আমেরিগো ভেসপুচ্চি—ফলে তাঁর নাম থেকেই নতুন মহাদেশের নাম হ'য়ে গেলো আমেরিকা। যেমন মাগেলানের নাম থেকে হ'লো মাগেলান প্রণালী, মাগেলান অন্তরীপ—ইত্যাদি।'

*ডানকান* তখন মাগেলান প্রণালীতে ঢুকেছিলো ব'লেই এ-নামটা করেছিলেন পাঞ্চয়ল। এবং সদলবলে ডেকে দাঁড়িয়ে অন্তরীপের কাছে এসে তিনি চর্মচক্ষে পাতাগোনিয়ার ইণ্ডিয়ানদের দেখবার চেষ্টা করলেন—কিন্তু, উঁহু, কাউকেই দেখা গেলো না। তাঁর কৌতূহলের কারণ ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করলেন তিনি। 'একেকজন অভিযাত্রী একেকরকম বর্ণনা দিয়েছেন ইণ্ডিয়ানদের। কেউ বলেছেন এরা সব এগারো ফুট লম্বা দৈত্য, কেউ-বা বলেছেন, উঁহু-উঁহু—এরা সব তিন ফুট লম্বা হয়, সবাই বামন, কেউ-কেউ আবার বলেছেন, তা পাঁচ-ছ ফুট হবে ব'লেই মনে হ'লো। জনাথান সুইফ্‌ট যে লিলিপুট বা ব্রবডিঙনাঙদের কথা বলেছেন, এরা তার কেউই নয়। তবে ডীন সুইফট বোধহয় এ-সব অভিযাত্রীদের গুলগল্প কিংবদন্তি শুনেই একটা দ্বীপে ফেলেছেন খুদে মানুষ লিলিপুশনদের আর অন্য দ্বীপে ফেঁদেছেন ব্রবডিঙনাঙি দৈত্যদের আস্তানা।'

'হ্যাঁ, তা তো বুঝলুম,' সরাসরি মোক্ষম জায়গাতেই প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করলেন লর্ড গ্লেনারভন, 'কিন্তু আসল উচ্চতাটা তবে কী?'

'ব'সে থাকলে উচ্চতা একরকম, দাঁড়ালে আরেকরকম,' অমনি চ্যাটাং ক'রে এলো জবাব—ফোড়ন কাটার মতো—রবার্টের কাছ থেকে।

'তা ঠিকই বলেছে, রবার্ট,' পাঞ্চয়ল বললেন, 'ওদের ধড়টা লম্বা, পা জোড়া খাটো। তবে যাঁরা এদের নিয়ে পণ্ডিতি কেতাব লিখেছেন তাঁরা কিন্তু বলেননি মাপজোক নেবার সময় এরা ব'সে ছিলো, না দাঁড়িয়েছিলো।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত

## *ডানকান*-এর যাত্রীরা পদব্রজে

ক্লাইড ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর ঠিক বিয়াল্লিশ দিন যখন কেটে গিয়েছে *ডানকান* গিয়ে ঢুকলো তালকাউয়ানো উপসাগরে; ঐ নামেই নগর-বন্দর, চিলের দক্ষিণমধ্যে তার অবস্থান, কনসেপসিওনের উত্তর-পশ্চিমে। তালকা নামে যেহেতু চিলের ঠিক মাঝখানে সান্‌তিয়াগোর দক্ষিণে আরো-একটা নগর আছে, তাই এই তালকাকে আলাদা ক'রে বোঝাবার জন্যে নাম দেয়া হয়েছে তালকাউয়ানো। বলাই বাহুল্য, জাক পাঞয়লের একটা ছোটোখাটো উচ্ছ্বসিত বক্তৃতার পরই এই সম্যক জ্ঞান লাভ হ'লো অন্যদের। আর তাঁর বাগ্মিতা এমনই চুলবুল-করানো ছিলো যে তক্ষুনি লর্ড গ্লেনারভনও জাক পাঞয়লের সঙ্গে সরাসরি ডাঙায় এসে নামলেন। বন্দরের রমরমার জন্যেই শহরটায় গিশগিশে ভিড়। পাঞয়ল ভেবেছিলেন, সদ্য-রপ্ত-করা এস্পানিওল ভাষার প্রয়োগনৈপুণ্যে তিনি চট ক'রেই লর্ড গ্লেনারভনকে তাজ্জব ক'রে দেবেন, তাঁর প্রতিভা দেখে সবাই নিশ্চয়ই দারুণ চমৎকৃত হ'য়ে যাবেন। কিন্তু ফরাশি টানে এস্পানিওল বলার ফল অবশ্য তাঁর ঠিক মনঃপূত হ'লো না—কোনো হতভাগা চিলেনো তাঁর কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারলে না। একের পর এক লোককে ডেকে তড়বড় ক'রে কথা বলছেন পাঞয়ল, তোড়ে ছুটিয়ে দিয়েছেন এস্পানিওল ভাষার তুবড়ি, আর তারা গোড়ায় ধন্দে প'ড়ে গিয়েছে, পরে হতভম্ব, এবং কারু-কারু কাছ থেকে জুটেছে কিঞ্চিৎ ভ্রূকুটিও। শেষটায় নিজেই পাঞয়ল ব্যাখ্যা করলেন তাঁর কথা অন্যদের কাছে এমন দুর্বোধ্য—না, না, অবোধ্য—ঠেকার কারণ। 'আসলে আমার জিভেরই আড় ভাঙেনি—নিশ্চয়ই উচ্চারণে গোল পাকিয়ে গিয়েছে।'

তাঁর ভাষাশিক্ষার এহেন পরিণতি দেখে গ্লেনারভন একটু মুচকি হাসলেন শুধু। বললেন : 'চলুন। শুল্ক দফতরের আপিশটায় গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাক।'

শুল্ক দফতরের আপিশে গিয়ে অবশ্য তেমন লাভ হ'লো না, শুধু এ-তথ্যটা জানা গেলো যে ইংরেজ কনসাল থাকেন কনসেপসিওনে—অর্থাৎ চিলের দক্ষিণমধ্যের সেই তুলনায়-বড়ো শহরটায়।

'এখান থেকে কদ্দুর?'

'তা, তেজি ঘোড়া পেলে ঘণ্টাখানেকে পৌঁছে যাবেন।'

ঘোড়া জোগাড় করা হ'লো প্রায় তক্ষুনি—কড়ি ফেললে কীই-বা না-মেলে, আর দুজনে ঘোড়ায় চেপে তক্ষুনি জোরকদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

কিন্তু যতই প্রত্যাশা বা উত্তেজনা থাক, ইংরেজ কনসাল সব শুনে-টুনে তাদের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব প্রত্যাশায় ঠাণ্ডাজল ঢেলে দিলেন। কাপ্তেন গ্রাণ্টের *ব্রিটানিয়া* জাহাজ, তার হালহদিশ, তার সলিলসমাধি—কিছুই তাঁর জানা নেই। লর্ড গ্লেনারভনদের কাজে লাগতে পারলে তিনি *ধন্য* হতেন, *কৃতার্থ* হতেন, কিন্তু...

অতএব, পুনরায়, তালকাউয়ানায় প্রত্যাবর্তন দুজনের। অথচ এখানে হাত গুটিয়ে ব'সে-থাকাও তো চলে না। সুতরাং চর পাঠানো হ'লো উপকূল ধ'রে দূরে-দূরে, রাহাখরচ বাদেও প্রলোভন রইলো কেউ কোনো খবর আনতে পারলেই ইনাম মিলবে, কিন্তু কোনো খবরই মিললো না।

এ-সব করতে-করতেই প্রায় হপ্তা কাবার। ছ-দিন বাদেও কোনো খবর নেই। এতদিন মেরি আর রবার্ট আশায়-আশায় বুক বেঁধে ছিলো, এবার তারা হাল ছেড়ে দিয়ে একেবারে ভেঙে পড়লো।

অতএব ঐ রহস্যময় চিরকুটগুলো নিয়ে আবারও খুঁটিয়ে দেখতে ব'সে গেলেন মঁসিয় পাঞয়ল। শব্দগুলোর মর্মোদ্ধার করতে কোনো ভুল হয়নি তো? এবং তন্নতন্ন ক'রে সবগুলো চিরকুট খতিয়ে দেখে তড়াক ক'রে প্রায় লাফ দিয়েই উঠলেন জাক পাঞয়ল।

'হুম! যা ভেবেছি তা-ই! গোড়াতেই গলদ, তো শেষরক্ষা হবে কী ক'রে?'

তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে সবাই কাছে ঘেঁসে এলেন।

'কী ব্যাপার? গোড়ায় আবার গলদ কোথায়?'

'কয়েকটা শব্দের ভুল মানে করা হয়েছে দেখছি!' জাক পাঞয়লের চোখ জ্বলজ্বল করছে, উদ্ভাসিত বদন বিগলিত। '*বন্দী হবো*—এমন-কোনো কথা তো লেখেননি কাপ্তেন গ্রাণ্ট—সম্ভবত লিখতে চেয়েছিলেন *বন্দী হয়েছি*। সাহায্য চেয়ে এই চিরকুট যখন লিখেছিলেন, তার আগেই নিশ্চয়ই ইণ্ডিয়ানদের হাতে ধরা প'ড়ে গিয়েছেন।'

'তা কী ক'রে হয়?' লর্ড গ্লেনারভন তাঁর যুক্তি উপস্থাপিত করলেন। 'বোতলটা তো জলে ফেলা হয়েছিলো—আর সে নিশ্চয়ই ঐ জাহাজডুবির সময়তেই। না-হ'লে বন্দীশিবির থেকে দিব্বি সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসে সমুদ্রের জলে ফেলবেন কী ক'রে বোতলটা?'

'হয়তো পথে কোনো নদী পড়েছিলো, তার জলেই ফেলেছেন। পরে ভেসে এসেছে সমুদ্রে।'

'তা অবশ্য হ'তে পারে। এ-সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তা, না-হয় ধ'রেই নিলুম, ক্রিয়াপদের ভুত-ভবিষ্যৎ সমস্ত আমরা গুলিয়ে ফেলেছি। কিন্তু তাতে কী দাঁড়ালো? আমাদের আপনি কী করতে বলেন?'

'সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তরাল রেখা যেখানে আমেরিকার উপকূল ছুঁয়েছে, সেখান থেকে রওনা হ'য়ে ঐ রেখা বরাবর সোজা অ্যাটলান্টিক অব্দি যাই, চলুন। আমরা যদি আস্ত



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমান্তরাল রেখাটার বুড়ি ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাই, তাহ'লে কোথাও-না-কোথাও জাহাজডুবির লোকজনদের কারু-না-কারু হদিশ মিলে যাবে।'

মেজর ম্যাকন্যাব্‌সের এ-সব বুনো-হাঁসের-পেছন-ছোটায় কোনো আস্থা নেই। তিনি শুধু ফোড়ন কাটলেন : 'অতীব-ক্ষীণ সম্ভাবনা—এবং অমূলক।'

'এটা ভুলে যাবেন না, মেজর, যে এটাই একমাত্র সম্ভাবনা। আপনি নিশ্চয়ই চান না এক্ষুনি সবাই মিলে হাল ছেড়ে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই শুড়শুড় ক'রে। রিও কলোরাদো কিংবা রিও নেগ্রো নদীর অগুনতি শাখা বেরিয়ে গেছে মহাদেশের ভেতরে—তার কোনোটার ধারে কোনো আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের দল তাঁদের বন্দী করেছে। হদিশ পেলে, সুযোগ-সুবিধে ক'রে নিয়ে, আমরাই উদ্ধার করতে পারবো তাঁদের। তা যদি সম্ভব না-হয়, তবে পূর্ব-উপকূলে *ডানকান* জাহাজের কাছে পৌঁছে ফৌজের লোকজন ডাকবো—আর তখন আপনি স্বয়ং মেজর ম্যাকন্যাব্‌স, আপনিই অভিযানের নেতৃত্ব দিতে পারবেন।'

প্রস্তাবটা মোটেই হাস্যকর নয়। আর অভিযানের নেতৃত্ব পাবার সম্ভাবনাটা দেখে মেজর ম্যাকন্যাব্‌সও তাঁর সামরিক গোঁফে একবার তা দিয়ে নিলেন।

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স তক্ষুনি টেবিলে মানচিত্র বিছিয়ে নিলেন। *ডানকানকে* কোথায় অপেক্ষা করতে বলা হবে, সেটাও ঠিক ক'রে নেয়া জরুরি। সব খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে তিনি প্রস্তাব করলেন : 'আমাদের জাহাজ তাহ'লে কোরিয়েন্তেস অন্তরীপ আর সান্ আন্তোনিওর মাঝে নোঙর ফেলে অপেক্ষা করুক।'

'তা-ই ভালো।'

এই *নূতন মহাদেশের* মাঝখান দিয়ে কে-কে যাবে কাপ্তেন গ্রাণ্টের খোঁজে, অজ্ঞাতের সন্ধানে, অজানার উজানে, তা আলোচনা ক'রে ঠিক করা হ'লো। কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস-এর তো ডাঙার অভিযানে যাবার প্রশ্নই ওঠে না—তিনি যদি জাহাজে না-থাকেন, তবে *ডানকান* জাহাজকে সাগরপাড়ি দেবার সময় সামলাবে কে? আর লেডি হেলেনা বা মেরিরও গিয়ে কাজ নেই, পথে মেয়েদের নিয়ে বেরুলে এই বিদেশ-বিভুঁয়ে অনেক ঝামেলাঝক্কি দেখা দিতে পারে। ইচ্ছে ছিলো, রবার্টকেও বাচ্চা ব'লে অজুহাত দিয়ে ডাঙার অভিযান থেকে নিবৃত্ত করা হয়, কিন্তু সে নাছোড়বান্দা, কারু কোনো ওজর-আপত্তি শুনলে তো? শেষটায় ঠিক হ'লো জাহাজের তিনজন খালাশিকে নিয়ে স্থলপথে যাবেন লর্ড গ্লেনারভন, সঙ্গে থাকবেন মেজর ম্যাকন্যাব্‌স, জাক পাঞ্জল আর রবার্ট তো আগেভাগেই ডাঙায় গিয়ে নেমে একপায়ে খাড়া।

অক্টোবরের চোদ্দ তারিখে এই সাতজনে বেরিয়ে পড়লো অভিযানে—সঙ্গে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে নিয়োগ করা হয়েছে তিনজন ডাকাবুকো হট্টাকট্টা শক্তপোক্ত লোক, আর তাদের সঙ্গেও আছে আরেকটি ছোটোছেলে। গাইডদের সর্দার কিন্তু সত্যি-



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে স্থানীয় লোক নয়, সে একজন ভাগ্যান্বেষী ইংরেজ, কবে কোনকালে—সে প্রায় বিশ বছর হ'লো—কোর্তেসদের মতো লাতিন আমেরিকায় পা দিয়েছিলো সোনারুপো হিরেজহরতের লোভে, কিন্তু লুঠতরাজ যা-যা করার আগেই তা সাঙ্গ ক'রে নিয়েছিলো *কোন্‌কিস্তাদোরেরা,* ফলে আখেরে তার তেমন সুবিধে হয়নি। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে এতগুলো বছর একটানা কাটিয়ে দেবার পর সে ইংরেজি ভাষা প্রায় ভুলতেই বসেছে, এমনকী তার নামটা শুদ্ধু এখন এস্পানিওল হ'য়ে গিয়েছে, লোকে তাকে ডাকে কাতাপাস ব'লে। যে-শৈলশিরাকে এখানকার লোকে বলে কোর্দিইয়েরা, সেই গিরিসংকট পেরিয়ে আরহেনতিনার সীমান্তে গিয়ে পাম্পার কোনো গাইডের হাতে পৌঁছে দেয়াই এখন তার জীবিকা। কতগুলো খচ্চরের পিঠে মালপত্রের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে রওনা হ'লো সবাই। এই পাহাড়ি খচ্চরগুলো—গাধা আর ঘোড়ার মিশোল—দারুণ শক্ত, পাহাড়ি চড়াই-উৎরাই ভাঙতে তাদের মতো জীব আর দ্বিতীয় যেন নেই। বাহন হিশেবে তারা চমৎকার, দিনে জল মোটে একবার খেলেই চলে, আটঘন্টায় পেরিয়ে আসে মাইল তিরিশ এবড়োখেবড়ো উঁচুনিচু পাহাড়িপথ।

এক সমুদ্রতীর থেকে আরেক সমুদ্রতীর যেতে হবে—এই বিস্তীর্ণ দুস্তর পথে কাতাপাস-এর অভিজ্ঞতা জানিয়েছে সরাই-টরাই পথে খুব-একটা পড়বে না। খেতে হচ্ছে জারানো শুখামাংস, মকাই, অথবা ভাত। ক্লান্ত শরীরকে চাঙ্গা ক'রে নেবার জন্যে জলের সঙ্গে সবাই মিশিয়ে নিচ্ছে একটু ক'রে রাম—এখানকার আখের রস নিংড়ে তৈরি-করা।

পাঞ্চয়ল পণ ক'রে বসেছেন তিনি এস্পানিওল ছাড়া আর-কোনো ভাষাতেই কথা বলবেন না—ফরাশিও না, ইংরেজিও না। কিন্তু তাঁর চমকপ্রদ উচ্চারণে এস্পানিওল ভাষার যে-সংস্করণ ফুটে বেরোয়, অন্য-কেউ তা খুব-একটা বোঝে না ব'লেই, প্রায় বাধ্য হ'য়েই, নিজের সঙ্গেই সারাক্ষণ একটা দ্বৈতালাপ চালিয়ে যেতে হচ্ছে; অর্থাৎ, নিজেই প্রশ্ন করছেন, এবং নিজেই মুখ থেকে খসিয়ে ফেলছেন উত্তর। তার ওপর কাতাপাস মানুষটা কথা কম বলে, কাজ করে বেশি। পাঞ্চয়লের তুবড়ির মতো প্রশ্নগুলোর উত্তরে সে হুঁ-হাঁ ছাড়া কিছুই বলে না। খচ্চরগুলোর তদারকি করছে তার দুই অনুচর : বাহনদের তাড়া লাগাবার জন্যে কখনও তারা দুর্বোধ্য কিছু আওয়াজ করে, গলা ছেড়ে চ্যাঁচায়, কখনও হাতের পাচন দিয়ে খোঁচায়, কখনও-বা ঢিল ছোঁড়ে।

তিনদিন একটানা চলার পর দূরে নীলপাহাড় দেখা গেলো। রাস্তা ক্রমেই দুর্গম ও বন্ধুর হ'য়ে উঠছে, মাঝে-মাঝেই পথে পড়ছে পাহাড়ি জলধারা, নদী না-ব'লে অনেকগুলোকে পাহাড়ি সোঁতা বলাই ভালো। এদের বেশির ভাগেরই নাম এ-যাবৎ কোনো মানচিত্রে ওঠেনি, ফলে জাক পাঞ্চয়ল নতুন-নতুন নদী আবিষ্কার করার নেশায় মেতে উঠেছেন, টুকে নিচ্ছেন তাঁর খাতায়, মানচিত্রের খশড়া তৈরি করছেন, লিখে রাখছেন পাশে মানচিত্রের এক ইঞ্চি সমান অত মাইল। যে-নদীগুলোর কথা তিনি আগেই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বইতে পড়েছেন, সেগুলো দেখে আর-কেউ বলার আগে, সোৎসাহে নিজেই চেঁচিয়ে ব'লে দিচ্ছেন নামগুলো। তাঁদের যাবার পথ কাটাকুটি ক'রে আড়াআড়ি গেছে মস্ত-একটা পথ, রীতিমতো রাস্তাই বানানো হয়েছে যেন, দেখেই তিনি উৎফুল্ল কণ্ঠে ব'লে উঠলেন : 'আরে, এ-যে দেখছি লস আনহেলেসে যাবার রাস্তাটা।'

'সত্যি নাকি?' কাতাপাস্‌কে জিগেস ক'রে যাচাই ক'রে নিতে চেয়েছিলেন লর্ড গ্লেনারভন।

'হ্যাঁ,' তার অভ্যাসমাফিক ছোট্ট উত্তরটা দিয়েই কাতাপাস্ কিন্তু মুখে কুলুপ এঁটে ব'সে থাকেনি. বরং উলটে জাক পাঞয়লের দিকে ঘুরে জানতে চেয়েছে : 'এদিকটায় এর আগে কখনও এসেছিলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ,' ভারিক্কিচালে জবাব দিয়েছেন পাঞয়ল।

'দলবল নিয়ে, খচ্চরের পিঠে চ'ড়ে?'

'না। একাই। চেয়ারে ব'সে থেকেই।'

কাতাপাস্ এমন উত্তর শুনে একটু তাজ্জব হ'য়েই পাঞয়লের মুখের পানে তাকিয়েছে, ফ্যালফ্যাল ক'রেই তাকিয়েছে। কথাটার মানে তার মাথায় ঢোকেনি। সে-বেচারি কী ক'রে বুঝবে যে কোনো পড়ার ঘরে ব'সে-ব'সে বইয়ের পাতা উলটে যাওয়াও যে কারু-কারু পক্ষে সত্যির চেয়েও বেশি, আরো-সত্যি, ভৌগোলিক অভিযান।

অবশ্য কথাটা তলিয়ে বোঝবার জন্যে কাতাপাস্ খুব-একটা চেষ্টাও করেনি তখন। কেননা সত্যিকার দুর্গম পথের যাত্রা তো শুরু হ'লো এই এখন। চলাটা আর আগের মতো সহজ নেই, বেশ কষ্টকর। এ-সব পথে যাদের চলাফেরা ক'রে অভ্যাস নেই তাদের কাছে রীতিমতো কঠিনই ঠেকবে। আর তার নীট ফল হবে এই যে চলার গতি ক'মে যাবে অনেকটাই। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে চড়াই ভেঙে-ওঠা আদপেই সহজ কাজ নয়। প্রথম-প্রথম আবার পা ফসকে প'ড়ে যাবার সম্ভাবনাও থাকে—আর কত-যে হোঁচট খেতে হয় তার তো কোনো লেখাজোখা নেই। আন্দেয়াস-এর গিরিপথ পেরুবার জন্যে শেষ অব্দি অনেক ভেবে কাতাপাস্ ঠিক করেছে আনতুকো গিরিসংকট দিয়েই যাবে —তার কারণ সেটা পড়েছে নাকবরাবর, আর কে না জানে যে কোনো সিধে সরলরেখাই হ'লো হ্রস্বতম পথ, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে একটাই—এবং সেটা বেশ বড়োগোছেরই মুশকিল। এই বিষম পথ ধ'রে খচ্চররা যায় না, আর এতটাই দুর্গম যে সিধে পথে গিয়ে সময় বাঁচাবার ফন্দিটাও হয়তো ভেস্তে যাবে। সেইজন্যেই গোড়ায় কাতাপাস্ এ-পথ দিয়ে যেতে চায়নি। কিন্তু পাঞয়লের ভৌগোলিক জ্ঞানে সবাই নেচে উঠেছে। এটাই যদি শর্টকার্ট হয়, যদি কম পথ পেরুতে হয়, তবে এই পথেই যেতে হবে। সকলের একগুঁয়েমি দেখে কাতাপাস্‌কে শেষটায় এ-পথ দিয়ে যাবার প্রস্তাবেই রাজি হ'তে হয়েছে। ভেবেছে, নিজেরা খচ্চরের পিঠের বোঝা ভাগাভাগি ক'রে নিয়ে একটু হালকা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক'রে নিলে বুঝি এই সরু পথটা দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে চ'লে যেতে পারবে; অনেকটা সেভাবে চলেছেও তারা, কিন্তু শেষটায় এমন-একটা জায়গায় এসে পড়েছে যে খচ্চররা সে-রাস্তা পেরিয়ে যেতেই পারবে না, আর জীবজন্তুরা সহজেই টের পেয়ে যায়, কী ক'রে যেন তারা বুঝে ফেলেছে এ-পথ দিয়ে যেতে গেলেই তারা পাহাড়ের ঢাল দিয়ে গড়িয়ে নিচে প'ড়ে যাবে। তারাও জেদ ধ'রে দাঁড়িয়ে পড়েছে, একপাও যাবে না আর। একটা কারণও অবশ্য আছে : দক্ষিণ গোলার্ধের সবই তো উত্তর গোলার্ধের চাইতে একেবারেই উলটো। এখনই এখানে বসন্ত—পাহাড়ের গায়ের জমানো তুষার এখনই মাঝে-মাঝে গ'লে যেতে থাকে —আর পাহাড় থেকে ধস্ নামে। মাটি নরম হ'য়ে যায়, আলগা হ'য়ে যায়, খ'সে পড়ে। সেইজন্যেই কাতাপাস্ এতটা অনিচ্ছুক। এবার আর কাতাপাস্ কোনো অনুরোধ উপরোধ শোনেনি। তার খচ্চরগুলো আর স্যাঙাৎদের নিয়ে সেখান থেকেই সেলাম ঠুকে বিদায় নিয়েছে। যাবার আগে সে বলেছে, সবাই যদি তিনদিনের পথ পেছিয়ে যায়, তবে একটা ঘোরাপথ দিয়ে সে তাদের নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু লর্ড গ্লেনারভনরা রাজি হননি : এতটা এসে আর পেছিয়ে যাবার কোনো মানে হয় না। অগত্যা কাতাপাস তার সাগরেদদের নিয়ে বিদায় নিয়েছে, আর এঁরা নিজেরাই মালপত্র ভাগাভাগি ক'রে নিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠেছেন—ভাগ্যিশ, সঙ্গে *ডানকান* জাহাজের বিশ্বস্ত খালাশি তিনজন ছিলো।

পথে অনেক জন্তুজানোয়ার তাঁদের চোখে পড়েছে। এ-সব জন্তুজানোয়ারের অনেকগুলোই তাঁদের অচেনা। তবে এমন-কোনো শুওর তাঁরা চোখে দ্যাখেননি যাদের নাভিকুণ্ডলি ছিলো তাদের পিঠে, কিংবা এমন পাখিও দ্যাখেননি যাদের পা নেই, অথবা মেয়ে-পাখিগুলো ডিম পেড়ে তা দিচ্ছে পুরুষপাখিগুলোর পিঠে, কিংবা এমন প্রাণীও দ্যাখেননি যাদের বৃদ্ধি আচমকা থেমে গিয়েছে আর তারা সব এর-ওর-তার কাছ থেকে শরীরের সব জিনিশ নিয়েছে—যেমন তাদের মুণ্ডু আর কানগুলো খচ্চরের মতো, শরীরগুলো উটের, পাগুলো হরিণীর, আর চিহি-চিহি ডাকটা ঘোড়ার। সারা রাস্তা বকবক করতে-করতে এসেছেন পাএয়ল। বলেছেন ক্রিস্তোবাল কোলোনরা—পিগাফেত্তারা—কেবল গুল ঝেড়েছেন, আর নয়তো মেস্কাল খেয়ে নেশার ঝোঁকে আজব-সব জীবজন্তু দেখেছেন। এই দুর্গম পথে জীবজন্তুর দেখা পাওয়াই তো বিস্ময়কর—তার ওপর আবার এ-সব কিম্ভূত জীব, যা মানুষ শুধু চোখে দ্যাখে কল্পনায়—কল্পনার লাগামছেঁড়া উড়ালে। 'জানেন,' পাএয়লের মুখে ছিলো একটাই বুলি, 'এইসব আজগুবি জিনিশ লিখে এঁরা সবাই আমাদের—আধুনিক ভৌগোলিকদের—জীবনটাই দুর্বিষহ ক'রে তুলেছেন। এঁদের বিশ্বাস করলে তো নিজের ওপর থেকেই বিশ্বাস হাপিশ হ'য়ে যাবে।'

যত ওপরে ওঠা যাচ্ছে হাওয়া লঘু হ'য়ে আসছে, হালকা, আর নিশ্বাস নিতে গিয়ে অস্থির-অস্থির লাগছে, বুকের খাঁচাটাই যেন ফেটে যাবে, মাড়ি ফেটে বেরিয়ে এসেছে রক্ত, ঠোঁট ফেটে গিয়েছে। রবার্ট এমনি কাহিল হ'য়ে পড়েছে যে শেষটায় *ডানকান*-



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর একজন খালাশিকে তাকে কাঁধে ক'রে ব'য়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। অবশেষে—ঠিক কখন, খেয়াল করার মতো অবস্থা তখন কারু নেই—তখন কেউ খাড়া হ'য়ে হাঁটতেও পারছে না আর, প্রায় হামাগুড়ি দিয়েই এগুতে হচ্ছে, এমনি অবস্থায়, অবশেষে—দূরে ছোট্ট-একটা ফুটকির মতো দেখা গেলো কার একটা পোড়ামাটির বাড়ি, *আদোবা* বাড়ি বলে তাকে এখানকার স্থানীয় লোকেরা।

আন্দেয়াসের চিরতুষারের মধ্যে প্রায় যেন চাপা প'ড়ে গিয়েছিলো এই *আদোবা*। কিন্তু ফৌজের লোকেদের নজরদারি খুব তীক্ষ্ণ হয় ব'লেই বোধহয় মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌সের চোখেই পড়েছিলো কুঁড়েবাড়িটা।

কোনোরকমে তুষার সাফ ক'রে চাঁই-চাঁই জমাট তুষার সারিয়ে সেখানেই রাতটা কাটাবার ব্যবস্থা করা হ'লো। ইণ্ডিয়ানরা ভালোই জানে পোড়ামাটি দিয়ে কেমন ক'রে দেয়াল বানালে শীত ঠেকানো যায়, তাই তুষারের মধ্যেও *আদোবা* বাড়িগুলো মোটামুটি স্বচ্ছন্দ একটা আস্তানা দেয়।

তখন সূর্য ডুবে যাচ্ছিলো চূড়ার আড়ালে। এদিকে এখনও সুপ্ত-জাগ্রত কত আগ্নেয়গিরি আছে। দক্ষিণের আগ্নেয়গিরির মুখটার ওপর আগুনের হলকা, লেলিহান লোল রক্তজিহ্বা, আর তারই প্রতিফলন ঝিকিয়ে উঠছে বরফের স্তূপের ওপর, আর সেই সঙ্গে ঝলসাচ্ছে ডুবে-যেতে-থাকা সূর্যের শেষরশ্মিগুলো। ভয়ংকরের সম্ভাষণ যে এমন নয়নাভিরাম রূপ নিতে পারে, তা চোখে না-দেখলে হয়তো কেউই বিশ্বাস করতো না। কোনো আশঙ্কারও যে এমন সৌন্দর্য হয়, তা কে জানতো?

ভীষণ শ্রান্ত লাগছিলো সকলের। ঠিক হয়েছিলো, তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া সেরে নিয়ে পূর্ণ বিশ্রাম নেবে সবাই। কিন্তু খেতে ব'সেই সবাই কি-রকম আঁৎকে উঠলেন। বাইরে ঐ ধুপধাপ আওয়াজ কিসের? এমন প্রচণ্ড আওয়াজ? তুষার ধ'সে পড়ছে নাকি চূড়া থেকে? খাওয়া মাথায় উঠলো, সবাই ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

না, তুষারধস নয়—জন্তুর দল। তীব্রগতিতে ছুটে আসছে, পালে-পালে। দৃক্‌পাতহীন তাদের ধাবমান পায়ের তলায় পড়লে আর দেখতে হবে না—সেখানেই ভবলীলা সাঙ্গ হবে। দেখেই সবাই মাটিতে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো। মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স ঘর থেকে ছুটে বেরুবার সময় তাঁর শয়ন-স্বপনের সঙ্গী বন্দুকটা সঙ্গে আনতে ভোলেননি। তিনি তাঁর বন্দুকের ঘোড়া টিপলেন, জন্তুদের পালের মধ্য থেকে একটি জন্তু মাটিতে আছড়ে পড়লো, বাকি সবাই দৃক্‌পাতহীন ধুপধাপ ক'রে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে গেলো।

তাদের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই ধড়মড় ক'রে উঠে বসেছিলেন পাঞ্চয়ল। জন্তুগুলোকে ছুটে আসতে দেখে তিনিই সর্বাগ্রে ছিটকে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন, চশমা খুলে প'ড়ে গিয়েছিলো পাশে। হাৎড়ে চশমাটা খুঁজে নিয়ে নাকের ডগায় বসিয়ে দিয়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত জন্তুটাকে নিরীক্ষণ ক'রেই তিনি উৎফুল্ল কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন : 'আরে ! গুয়ানাকো ! বাঃ, তোফা !'

'গুয়ানাকো ?' সে আবার কী ?' ততক্ষণে রবার্টও উঠে বসেছে।

'গুয়ানাকো দক্ষিণ আমেরিকার লামাগোছের জীব। ওপরে ঐ নরম হালকা পাটকিলে লোমগুলো দেখেছো ? খুব ভালোজাতের পশম হয় ওতে। গুয়ানাকোরা উটের বংশেরই কেউ হবে—তাদেরই জ্ঞাতিগুষ্টির কেউ, তবে কুঁজ নেই। কিন্তু এর মাংস খেতে ভারি ভালো—খুবই সুস্বাদু।'

'আপনি জানলেন কী ক'রে? আগে চেখে দেখেছেন বুঝি?'

'না, চেখে দেখিনি, তবে বইয়ে পড়েছি। চমৎকার হ'লো, জারানো শুখামাংসের বদলে গুয়ানাকোর মাংসই খাওয়া যাবে। আমিই রসুই পাকাবো কিন্তু।'

সঙ্গে-সঙ্গে মাংস কাটাকুটি ক'রে রান্নার তোড়জোড় শুরু হ'য়ে গেলো। একটু আগেই ক্লান্ত লাগছিলো সকলের, এখন এই উত্তেজনার পর টাটকা মাংস খাবার লোভে সবাই যেন হঠাৎ চাঙ্গা হ'য়ে উঠেছে।

রান্না তো হ'লো, কিন্তু মুখে দিয়েই—থুঃ থুঃ ! শক্ত আঁশের তৈরি ছিবড়ে যেন, রসকষহীন, একেবারেই বিস্বাদ।

পাঞ্চয়ল তাঁর কেতাবি বিদ্যার এমন সমূহ উৎখাত দেখে একটু যেন ভাবনাতেই পড়লেন। কিন্তু একটা কৈফিয়ৎ খাড়া ক'রে দিতে তাঁর আবার বেশিক্ষণ লাগে না কি ? লাফিয়ে উঠে বললেন : 'ওহো, বুঝেছি ! অ্যান্দুর থেকে ছুটে এসেছিলো ব'লে মাংসটা এমন খারাপ লাগছে—শুধু শুকনো পেশী ব'লেই মনে হচ্ছে—গুয়ানাকোর মাংস খেতে তখনই ভালো লাগে যখন সে স্থির থাকে—'

'কিন্তু এতগুলো গুয়ানাকো দল বেঁধে এমনভাবে ছুটে আসছিলো কেন?' রবার্ট জিগেস করলে : 'তারা কি এমনি প্রাণের ভয়ে পড়িমরি ক'রে সবসময় ছোটে নাকি ?'

নিশ্চয়ই ছোটে না সবসময়। তবে এখন কেন দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটে আসছিলো, সেটা কেমন-একটা ধাঁধার মতোই ঠেকলো, কী-একটা অজানা রহস্য আছে যেন এর ভেতর।

তখনই অবশ্য ধাঁধাটার কোনো সমাধান হ'লো না। রহস্যটা ভেদ করা গেলো অনেক রাত্রে। গুম গুম গুম... প্রচণ্ড গড়িয়ে-যেতে-থাকা গুম গুম শব্দে সকলের ঘুম ভেঙে গেলো।

ভূমিকম্প না কি ? *আদোবা* বাড়িটা অমন দুলছে কেন?

ঘুম ভেঙে আঁৎকে জেগে উঠে আতঙ্ক আর হতভম্ব দশার এক মিশ্র অনুভূতি তখন সকলের। দেখা গেলো দরজার পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে অন্ধকার! তার মানে?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মানে ধস নেমেছে।

*আদোবা* বাড়িটা সমেত পাহাড়ের একটা মস্ত অংশ প্রচণ্ড বেগে নেমে চলেছে নিচে।

কতক্ষণ যে সবাই ভয়ে চোখ বন্ধ ক'রে ছিলো কেউ জানে না—মাঝে-মাঝে একটা থমথমে মুহূর্তকেও মনে হয় অনেকটা সময়। কিন্তু যতক্ষণই কেটে থাকুক না কেন, সংবিৎ ফিরলো আকাশবাতাসফাটানো একটা ভয়াবহ আওয়াজে। ঘরের মধ্যে কে কোনদিকে ছিটকে পড়লো ঠিক নেই। কারু মাথা ঠুকে গেলো দেয়ালে, কারু-বা হাত-পা পড়লো বেকায়দায়। আর... কী-যে হচ্ছে সেটা বোঝবার মতো সজাগ মনও কারু যেন ছিলো না।

সকলের আগে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স—সামরিক বাহিনীতে নবীশী করার পর কেউ হয়তো অন্যদের চাইতে সহজেই সমস্ত ধকল, সমস্ত ঝড়ঝাপটা সইতে পারে। উঠে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখলেন মাটিতে-প'ড়ে-থাকা অন্যদের চিৎ-উপুড় শরীরগুলো।

কে যেন নেই—?

ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলেন ম্যাক্‌ন্যাব্‌স। না, সকলেই আছে, কিন্তু শুধু রবার্টকেই কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

কোথায় গেলো তবে রবার্ট? ঘরশুদ্ধু সবাই ছিটকে, ঢাল বেয়ে, ধসের সঙ্গে নিচে নেমে এসেছে। রবার্ট কি তখন ঘরে ছিলো না? কোথায় গিয়েছিলো ঘর ছেড়ে—রাত-বিরেতে? রবার্টকে সঙ্গে না-নিয়ে কাপ্তেন গ্রাণ্টের কাছে গিয়ে তাঁরা মুখ দেখাবেন কী ক'রে? কে-একজন বললে, 'ধস নামার একটু আগেই রবার্টকে দেখা গিয়েছিলো ঘাসের চাপড়া সজোরে জাপটে থাকতে! অর্থাৎ : বাঁ দিকে অন্তত দু-তিন মাইল জমি খুঁজে দেখা দরকার। কিন্তু তারও আগে প্রশ্ন : এখন তাঁরা এ-কোথায় ছিটকে এসে পড়েছেন?

আন্দেয়াসের পুবদিকের ঢাল দিয়ে গড়িয়ে লর্ড গ্লেনারভনের দল চিলে থেকে সরাসরি চ'লে এসেছেন আরহেন্‌তিনায়—আন্দেয়াসের শিখরের চিরতুষার থেকে একেবারে বিস্তীর্ণ সবুজে। তাজ্জব কাণ্ড! এমনই আশ্চর্য যে কয়েকদিনের পথ কেউ যেন আরব্য উপন্যাসের জাদুগালচেয় ক'রে উড়িয়ে নিয়ে এসে পার ক'রে দিয়েছে। অবশ্য জাদুগালচেয় ক'রে শূন্যে পাড়ি দেবার মতো মসৃণ-নিরাপদ ছিলো না ব্যাপারটা, তবে ভূমিকম্পে যখন ধস নেমেছিলো তখন একটা মস্ত ধসই তাঁদের *আদোবা* বাড়িশুদ্ধু অমনভাবে অতটা পথ পার ক'রে নিচে নামিয়ে এনেছে—প্রায় আলগোছেই বলা যায়। ফটফটে শাদা বরফের বিস্তারের পর এখানে চারদিকে যেন সবুজের উৎসবের একটা ঢল নেমেছে—চোখ না-ধাঁধিয়ে দিয়ে চোখ যেন জুড়িয়েই দিচ্ছে সেই সবুজ।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে-করতে প্রকৃতির এই আশ্চর্য কীর্তি নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তাঁদের নেই এখন। প্রথম কাজ—এবং এইমুহূর্তে একমাত্র কাজ —যে-ক'রেই হোক রবার্টকে খুঁজে বার-করা। অথচ চারপাশে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও রবার্টের কোনো সন্ধানই পাওয়া গেলো না। আস্ত, গোটা দিনটা কেটে গেলো—কিন্তু কোথাও তার কোনো হদিশ নেই, এমনকী এমন-কোনো সূত্র অব্দি কোথাও নেই যার সাহায্যে অন্তত একটা আন্দাজ করা যায় যে রবার্ট কোথায় আছে। বিষম বিমর্ষ হ'য়ে পড়লেন লর্ড গ্লেনারভন : দায়িত্বটা তাঁরই, কী বলবেন গিয়ে তিনি মেরিকে? নিরুদ্দিষ্ট বাবাকে খুঁজতে এসে ছেলেও না-পাত্তা! তাছাড়া অপঘাত মৃত্যুরও একটা সম্ভাবনা আছে —কিন্তু ধস নেমে রবার্ট যদি ম'রেও গিয়ে থাকে, তবে তার মৃতদেহটা কোথাও নিশ্চয়ই থাকবে। লর্ড গ্লেনারভন কিন্তু সারারাত ধ'রে খুঁজে চললেন, পাহাড়ের ঢালে, সমতলে, কখনও নাম ধ'রে চেঁচিয়ে ডাকেন, কখনও হতাশায় গুম হ'য়ে যান—কিন্তু তাঁর ডাকাডাকিতে কারুই কোনো সাড়া আসে না।

পরদিন সকাল কেটে গিয়ে এলো দুপুর—কিন্তু লর্ড গ্লেনারভন কিছুতেই এ-জায়গাটা ছেড়ে নড়তে চান না। যদি রবার্ট নিজে খোঁজ নিতে এদিকে আসে? বেঁচে আছে তো বেচারা?

কিন্তু এই জনশূন্য নিঃঝুম জায়গায় কতক্ষণই বা কাটাবেন তাঁরা? খাবারও ফুরিয়ে এসেছে—শুকনো জারানো মাংস যা ছিলো তা কোথায় ছিটকে পড়েছে। বিস্বাদ ব'লে গুয়ানাকোর মাংসও তাঁরা তখন রাখেননি। এই অবস্থায় অন্তত খাবারের খোঁজেও এখানকার পাট উঠিয়ে যেতে হয়—না-হ'লে সবাই যে অনাহারে মরবে!

মেজর ম্যাকন্যাবসও বিষম মুষড়ে পড়েছিলেন, কিন্তু রবার্ট ছাড়া এখানে তো অন্য-আরো অনেকে আছে। অভিযানের নেতা হিশেবে গ্লেনারভনের তো তাদের কথাও ভাবা উচিত। ম্যাকন্যাবস নিজের মনের ভাব চেপে একটু কড়া সুরেই বললেন : 'আর না —এবার এখান থেকে চলো।'

'হ্যাঁ, যাবো তো বটেই, তবে আর একটু—'

এমন সময়ে আকাশে ঐ কার বিশাল ছায়া? দ্রুত ধাবমান—এই দিকেই?

ভালো ক'রে তাকিয়ে বোঝা গেলো : কণ্ডর : লাতিন আমেরিকার আকাশের রাজা, বিশাল পাখি কণ্ডর!

পাঞ্চয়ল তাকিয়েই ব'লে উঠলেন : 'এ তো দক্ষিণ আমেরিকার গৃধিনী—কণ্ডর —বিশাল এই পাখির একটা পোশাকি কেতাবি নাম আছে অবশ্য—*ভুলতুর গ্রাইফাস*— এ তো থাকে আন্দেয়াসের ওপর, মাথা আর ঘাড়ে কোনো লোম বা পালক নেই। আর সারা গায়ের পালক কেমন নিরেস কালো, শুধু গলাটা শাদামতো, ডানায় মাঝে-মাঝে শাদা ছোপ থাকে। ইনকারা তো কণ্ডরের পুজো করে প্রায়—তাদের পুরাণে-উপকথায়



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর কথা কত আছে! এমন শিকারি পাখি আইরির ঈগলও নয়—হাজার-হাজার ফুট ওপর থেকেও দেখতে পায় নিচে কোথায় ছোট্ট শিকার ঘুরছে। ছোঁ মেরে নিচে নেমেই আস্ত-সব ভেড়া, ছাগল, গুয়ানাকো উড়িয়ে নিয়ে যায় পাহাড়চূড়ায় নিজের আস্তানায়!'—

পাঞ্চয়ল হয়তো তাঁর পুথিপড়া বিদ্যে জাহির ক'রেই চলতেন, কিন্তু অন্যরা তখন চোখ ছানাবড়া ক'রে দেখছেন কেমন ক'রে সেই বিশাল কণ্ডর বৃত্তের মতো গোল হ'য়ে ঘুরে-ঘুরে নামছে নিচে, বাঁ দিকে। তবে কি শিকারের জন্যেই তার এই বিদ্যুৎক্ষিপ্র ছোঁ? কে এই শিকার? রবার্ট?

ম্যাকন্যাবস তাঁর বন্দুক বাগিয়ে টিপ করছিলেন, কিন্তু ঘোড়া টেপবার আগেই পাহাড়ের আড়ালে সেই কণ্ডর উধাও হ'য়ে গিয়েছে। সবাই ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো সে যেদিকে গেছে, সেদিকে। একটু পরেই তাকে দেখা গেলো আবার, সোঁ ক'রে ওপরে উঠছে, তার থাবায় ঝুলছে কে-একজন, ছটফট করছে। প্রায় চোখের পলকেই সে দুশো-আড়াইশো ফুট উঠে গেছে ওপরে।

লর্ড গ্লেনারভনও বন্দুক উঁচিয়ে ধরেছিলেন, গুলি ছুঁড়তে গিয়ে তাঁর হাত কাঁপছে তখন, যদি ঐ দেহটা রবার্ট হয়, যদি তার গায়ে গিয়ে গুলি লাগে! ম্যাকন্যাবস ততক্ষণে ঘোড়ায় চাপ দিতে যাচ্ছেন, কিন্তু ঘোড়া টেপবার আগেই দূর থেকে বন্দুকের আওয়াজ ভেসে এলো। সোজা গিয়ে গুলি লোগছে কণ্ডরের গায়ে। জখম, গুলি-বেঁধা কণ্ডর থাবার বোঝা নিয়েই ঘুরে-ঘুরে আস্তে এসে নেমে পড়েছে নদীর ধারে।

পড়িমরি ক'রে ছুটে গেলেন সবাই। কণ্ডরের ঠিক মাথায় গিয়ে গুলি লেগেছে। বন্দুক যেই ছুঁড়ে থাকুক, তার লক্ষ্য ছিলো অব্যর্থ! আর কণ্ডরের ডানার পালকের মধ্যে নিঃঝুম অচেতন প'ড়ে আছে রবার্টের মাথা। কাঁপা হাতে রবার্টকে টেনে বার ক'রে নিয়ে এলেন লর্ড গ্লেনারভন। বুকে কান পেতে শুনতে পেলেন অস্ফুট ক্ষীণ ধুকধুক আওয়াজ। অমনি আবেগে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বেঁচে আছে—প্রাণের সাড়া আছে এখনও—বেঁচে আছে!'

ম্যাকন্যাবস গিয়ে চট ক'রে পাহাড়ি নদী থেকে জল এনে রবার্টের চোখেমুখে ছিটিয়ে দিলেন।

আস্তে-আস্তে চোখ মেলে তাকালে রবার্ট, কেমন ঘোর-লাগা দৃষ্টি, যেন কিছুই সে এখনও বুঝতে পারছে না। তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে প্রায় কেঁদেই ফ্যালেন বুঝি গ্লেনারভন। তিনি জ্ঞান হারাননি বটে, কিন্তু তাঁরও মাথার মধ্যেটা কেমন করছে, কিছুই বুঝতে পারছেন না যেন তিনি।

গুলিটা তো তাঁরা করেননি—তবে গুলিটা করলে কে? কার এমন অচঞ্চল হাত, অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার উত্তর অবশ্য পাওয়া গেলো তক্ষুনি। হাত-পঁচিশ দূরেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো তাকে। যেন পাথরে-খোদাই-করা, পাহাড়ের গায়ে-বসানো কোনো কিংবদন্তির রাজা।

ছ-ফিটের ওপর লম্বা ঋজু সটান দেহ, কেশরের মতো চুলের ঢাল ফিতে দিয়ে বাঁধা, কপালে শাদা রং লেপা, মুখে লাল রং, দু-চোখের পাশে কালো-রঙের ছোপ। গায়ে পশুলোমের কুর্তা, পায়ে মোটা চামড়ার বুটজুতো, হাঁটু অব্দি ফিতে দিয়ে বাঁধা।

তার পায়ের কাছে প'ড়ে আছে বন্দুক।

তাকাবামাত্র বোঝা যায় কী-প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব তার। চোখমুখ থেকে বুদ্ধির দীপ্তি ফুটে বেরুচ্ছে।

চমকটা ভাঙতেই লর্ড গ্লেনারভন এগিয়ে গিয়ে তাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন—তাঁর বিহ্বল দৃষ্টি, আর মুখের ভাবই কৃতজ্ঞতা এমনভাবে ফুটিয়ে রেখেছে কারুই সেটা বুঝতে দেরি হয় না। গিরি আন্দেয়াসের এই রাজারও তা বুঝতে দেরি হয়নি।

পাঞ্চয়লও তখন এগিয়ে এসে তড়বড় ক'রে এস্পানিওলে কত-কী ব'লে ফেলেছেন। কিন্তু সে-সব কথার কিছু যে এই রাজা বুঝতে পেরেছে এমন-কোনো ইঙ্গিত অবশ্য পাওয়া গেলো না। মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স তাঁর ভাঙা-ভাঙা এস্পানিওলে একটা কথা ব'লেই বুঝতে পেরেছিলেন এই বিশাল মানুষটা এস্পানিওল জানে। আর তাই পাঞ্চয়ল যখন কথার তুবড়ি ছুটিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন সংলাপ হবে—কথার জবাবে কথা, কিন্তু পাঞ্চয়ল অনেক চেষ্টা ক'রেও তাকে তাঁর কোনো কথা বোঝাতে পারলেন না।

'কিছুই বুঝছে না কেন আপনার কথা?' মেজর ম্যাক্‌ন্যাবসের গলার সুরে এবার একটু ব্যঙ্গের সুর! 'এখনও এস্পানিওল উচ্চারণ আপনার রপ্ত হয়নি ? আপনি কি এখনও ফরাশিতে এস্পানিওল ব'লে যাচ্ছেন?'

পাঞ্চয়ল এতক্ষণ কথার ফুলঝুরি ছেটাচ্ছিলেন, মেজরের কথা শুনে একটা বাক্যের মাঝখানেই থেমে পড়লেন। পকেট থেকে একটা দোমড়ানো বই বার ক'রে বললেন, 'কেন-যে এত গণ্ডগোল হচ্ছে বুঝতে পারছি না তো? বই প'ড়ে কি আর উচ্চারণ শেখা যায় না? এত ভালো একখানা বই, ধ্রুপদী—মহাকাব্যই—এই-যে এই দেখুন, *উশ লিসিয়াদাস্—*'

এবার একটু আঁৎকেই উঠলেন লর্ড গ্লেনারভন। 'এ আপনি করেছেন কী, মঁসিয় পাঞ্চয়ল ? এ-যে পোর্তুগিজ মহাকাব্য—ভাশ্‌কু ডা গামার ভারতবর্ষের পথে বেরিয়ে-পড়ার কাহিনী আছে যে এতে—লুইস ভাজ্ দে কামোয়েন্স-এর লেখা—উনি তো ষোড়শ শতাব্দীর পোর্তুগিজ কবি—'

'অ্যাঁ?' আঁৎকে উঠলেন স্বয়ং পাঞ্চয়লও, সম্ভবত জীবনে এই প্রথমবার। 'সে কী ? আমি কি তাহ'লে এস্পানিওল মনে ক'রে এতদিন শুধু পুর্তুগিশই ব'লে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছি? তাই তো বলি, আমি এত কথা ব'লে যাচ্ছি অথচ কেউ কিছু বুঝছে না কেন? যাক, তাতে আর কী হ'লো—এবার ব্রাজিলে গেলেই আমার এই ভাষা শেখা কাজে দেবে—' ব'লেই পাঞ্চয়ল হেসেই কুটিপাটি। বইয়ের ভেতরটা টীকার সাহায্যে তন্নতন্ন ক'রে পড়েছেন—অথচ ককখনো খেয়াল ক'রেও দ্যাখেননি ভাশ্‌কু ডা গামা কোন দেশের লোক—অথবা বহু-ব্যবহারে-মলিন ও হলুদ-হ'য়ে-যাওয়া বইটা কোন ভাষায় লেখা।

শেষটায় অবশ্য নির্ভর হ'লো মূকাভিনয়—আকারে-ইঙ্গিতে, কিঞ্চিৎ কণ্ঠনিঃসৃত আওয়াজ ইত্যাদি মারফৎ এই পাহাড়ি মানুষটার নাম জানা গেলো—ইনি না-থাকলে আজই রবার্টের ভবলীলা সাঙ্গ হ'তো। তার নাম নাকি ত্রোনিদো, অর্থাৎ *বজ্রশব্দ*, সম্ভবত ইণ্ডিয়ানদের ভাষা থেকে তর্জমা ক'রেই এই ত্রোনিদো নাম দেয়া হয়েছে তাকে। পেশায় সে গাইড। আরহেন্তিনার বিশাল প্রেয়ারি, যার নাম তাদের ভাষায় *পাম্পা*, ত্রোনিদো সানন্দেই তাদের সঙ্গে গিয়ে পার ক'রে দিয়ে আসতে রাজি হ'লো। মার্কিন মুলুকে যাদের নাম *কাউবয়*, আরহেন্তিনার ভাষায় তারাই *গাউচো*; ত্রোনিদো গাউচোই ছিলো, বিশাল একটা র‍্যানচের ভার ছিলো তার ওপর। কিন্তু তার পায়ে বোধহয় কুট ক'রে কামড়েছিলো কোনো ঘুরঘুরে পোকা, একজায়গায়—তা সে যত বিশালই হোক—আটকে না-থেকে সারা পাম্পাস-এ ঘুরে-ঘুরে বেড়াবার জন্যেই সে গাইডের কাজ নিয়েছে। এখানকার বুনো ঝোপঝাড়ের পাতা ছেঁচে রবার্টের জখমে তার রস লেপে দিয়ে সে রবার্টকে কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঙ্গা ক'রে তুললো। তারপর সবাই এত উত্তেজনার পর একটু বিশ্রাম ক'রে যখন সুস্থ হ'য়ে উঠেছে, তখন সে তাদের সবাইকে নিয়ে গেলো মাইল-চারেক দূরের এক *পুয়েবলোতে*—ছোট্ট জনপদ, গ্রামই বলা যায়, ছোটো-ছোটো *আদোবা* বাড়ি, তাতে বাস চাষীদের, প্রধানত ভুট্টাই ফলায় তারা—আর ঘোড়ায় চ'ড়ে পাম্পায় টহল দিয়ে বেড়ায়। তাদের সঙ্গে দরাদরি ক'রে অভিযাত্রীদের সে কিনিয়ে দিলে সাতটা টগবগে ঘোড়া। নিজে সে অবশ্য কোনো ঘোড়া কিনলো না—তার দরকার নেই, নিজের ডেরায় তার আস্তাবল আছে, তবে বনে যখন শিকারে বেরোয় তখন সে কোনো ঘোড়া সঙ্গে নেয় না।

সেদিন সন্ধেবেলায় দেখা গেলো পুর্তুগিশ ভাষার চর্চা আপাতত মুলতুবি রেখে জাক পাঞ্চয়ল ত্রোনিদোর কাছে এস্পানিওল ভাষা শিখতে লেগে গিয়েছেন—কাস্তিইয়ের রাজা-রাজড়ার আভিজাত্যে ভরা আধো-আধো থ-থ ভরা এস্পানিওল নয়—লাতিন আমেরিকার কোনকিস্তাদোরেরা এস্পানিওলকে সংস্কার ক'রে অনেকটাই নিজেদের মতো ক'রে নিয়েছে—পাঞ্চয়ল এখন শিখতে শুরু করেছেন তাদেরই ভাষা।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

## সাত

# পাম্পার বিশালে

পরদিনই ত্রোনিদোর নির্দেশমতো অভিযাত্রীরা আরো-পুবের দিকে রওনা হ'য়ে পড়লেন।

পথে বেরিয়েই বোঝা গেলো ত্রোনিদো তার জন্যে কোনো ঘোড়া এখন চায়নি কেন। জঙ্গলের কাছে এসে মুখ থেকে বার করলে লম্বা একটানা এক অদ্ভুত আওয়াজ, লম্বা একটানা শিস যেন—আর অমনি জঙ্গলের মধ্যে থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো আরহেনতিনার এক আশ্চর্যসুন্দর ঘোড়া, পেশল-মসৃণ দেহ, যেন গতিকেই কেউ একটা চামড়ার খাপে পুরে দিয়েছে, সে যখন কদম-কদম হাঁটে, তখনই তাঁর বলিষ্ঠ পেশীগুলো রোদ্দুরে হালকা ঢেউয়ের মতো নেচে-নেচে ওঠে।

ঘোড়া ছিলো ব'লেই যতক্ষণ সূর্য মাথার ওপর রইলো, ততক্ষণ ঘোড়া ছুটিয়ে—জোরে নয়, মোটামুটি দুলকিচালে চ'লেই—পেরিয়ে-আসা গেলো আটত্রিশ মাইল পথ। রাতের বেলায় এক নদীর ধারে ছাউনি ফেলে সবাই মিলে খাওয়াদাওয়া করা হ'লো, ঠিক হ'লো পরদিন ভোরেই ফের রওনা হওয়া হবে।

পরদিন দুপুর অব্দি আগের দিনের মতোই তারা এগিয়েছে, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেলো দূর থেকে ধোঁয়ার মতো কী-একটা তীব্র ঘূর্ণি তুলে এগিয়ে আসছে। শুকনো হাওয়ার ঝড়। তোড়ে ব'য়ে যায় এই হাওয়া পাম্পার ওপর দিয়ে। প্রায় লু-র মতোই তপ্ত। অন্তত ব্যারোমিটারে পারদের চড়চড় ক'রে ওপরে-ওঠা দেখে পাঞ্চয়লের তা-ই মনে হ'লো।

পাঞ্চয়লের মুখে তাই ব'লে কোনো শঙ্কার ছাপ নেই, বরং অন্যদেরও তিনি আশ্বাস দিলেন, বললেন, 'ভয় নেই। পারা যদি নিচের দিকে নামতো তবে বোঝা যেতো যে হারিকেন শুরু হ'য়ে গেছে—সেই ঘূর্ণিঝড় তিনদিনের আগে থামতো কি না সন্দেহ। পথে যা-ই পেতো তাকেই উড়িয়ে নিয়ে দূরে আছড়ে ফেলতো। কিন্তু এ নেহাৎই শুকনো হাওয়ার খেলা, একটুক্ষণ সব তোলপাড় করবে, তারপর যেমন আচমকা এসেছিলো তেমনি আচমকা চ'লে যাবে। ব্যারোমিটারে যখন পারা উঠছে, তখন বোঝা যাবে এই ঝড় থেমে যাবে শিগগিরই—কয়েক ঘন্টার মধ্যেই।'

'আপনি জানলেন কী ক'রে?'

'হুঁ-হুঁ, তার জন্যে কেতাব পড়তে হয়। অভিযাত্রীদের রোমাঞ্চকর কাহিনী।'

'যা পড়েন সব মনে থাকে নাকি আপনার? আপনি কি নিজেই জ্যান্ত-একটা বই হ'য়ে উঠেছেন?'

পাঞ্চয়লের মনে হ'লো এ-কথাটা আসলে তাঁর মস্ত প্রশংসা বই আর-কিছু নয়।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুশি হ'য়ে মুচকি হেসে বললেন, 'বেশ, যা বললুম তা মিলিয়ে নেবেন।'

পুর্তুগিশ ভাষাকে খেয়াল না-ক'রে এস্পানিওল ভেবে চর্চা ক'রে আসছিলেন অ্যাদ্দিন; গল্পের বইতে ঠিক যেমন কোনো অন্যমনস্ক অধ্যাপকের কথা পড়া যায়—ঐ সেই যিনি নাকের ডগায় চশমা থাকা সত্ত্বেও নিজের চশমা খুঁজে বেড়ান—তেমনি একটি ভূমিকায় আবারও অনিচ্ছুক ভূমিকা গ্রহণ ক'রে একটু হয়তো-বা মুষড়েই পড়েছিলেন জাক পাঞয়ল। পরে অবশ্য ত্রোনিদোর কাছে এস্পানিওল শিখতে-শিখতে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এই ব'লে যে, 'যাক, এই সুযোগে প্রায় মুফতেই পুর্তুগিশ ভাষাটাও শেখা হ'য়ে গেলো।' কিন্তু তবু যৎকিঞ্চিৎ মনমরাই ছিলেন বইকি পাঞয়ল। এখন এই শুকনো ধুলোর তুফান সম্বন্ধে তাঁর পুথিপড়া জ্ঞান ফলিয়ে মনে-মনে তিনি আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলেন খানিকটা—তবে একটা ভয় কি মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিলো না? যদি তাঁর কেতাবি বিদ্যেটা না-ফলে? কিন্তু ঐ-যে বলেছিলেন জাঁক দেখিয়ে, 'বেশ, যা বললুম, মিলিয়ে দেখে নেবেন,' সেটা কিন্তু শেষ অব্দি সত্যিই হ'য়ে গেলো। ঝড়টা অভিযাত্রীদের কাছে এলো সন্ধেবেলায়, আর মিলিয়ে গেলো কয়েক ঘণ্টা পরে, রাত একটায়, সবকিছুর ওপর পুরু সরের মতো ধুলোর একটা আস্তর বিছিয়ে রেখে। আর তারপর থেকে তাঁকে আর পায় কে? তাঁর উৎসাহ তারপর থেকে টগবগ ক'রে ফুটে উঠেছে। এই অজানা বিদেশ-বিভুঁয়ে পাড়ি দিতে-দিতে প্রায়-একটা জ্যান্ত বইয়ের মতোই তিনি গাছপালা পাহাড়-পর্বতের নাম শুনিয়ে গেছেন। আর তা শুনে সবচেয়ে অবাক হয়েছে ত্রোনিদো, প্রায় বোমকেই গেছে সে, মুখে অবশ্য কিছু বলেনি—এদিক থেকে সে পাঞয়লের ঠিক উলটো, প্রায় সবসময়েই মুখে কুলুপ এঁটে থাকে, নেহাৎ দরকার না-হ'লে টুঁ শব্দটিও করে না আর তাও যখন পাঞয়লকে ভাষা শেখাতে হয়, শুধু তখনই। কিন্তু পরে একটা সময় এসেছে, যখন তাকেও বেশ স্পষ্ট ভাষায় মত দিয়ে একটা-কিছু বলতে হয়েছে।

ব্যাপারটা ঘটেছে এইভাবে : সড়ক কারমেনের কাছে এসে যখন শুনেছে যে এ-রাস্তা পেরিয়ে আরো-পুবদিকে যেতে হবে তাদের, সে গম্ভীরভাবে ব'লে উঠেছে, 'কিন্তু সেদিকে তো কিছু নেই।'

কিছু না-থাকলেও যে তাঁদের যেতে হবে, এ-কথা বুঝিয়ে বলবার ভার পড়েছে তখন পাঞয়লের ওপর। গোড়ায় কিঞ্চিৎ বাণীবিনিময় হয়েছে বটে, তবে তাতে তেমন সুবিধে হয়নি, পাঞয়লের ভৌগোলিক জ্ঞান যতই থাকুক এস্পানিওল ভাষার জ্ঞান ভাসা-ভাসা, তাই শেষ অব্দি তাঁকে বালির ওপর ছবি এঁকে বোঝাতে হয়েছে তাঁদের ইচ্ছেটা কী। এঁকে দেখাতে হয়েছে রাস্তার এদিকটায় সূর্য ডুবে যাচ্ছে, আর ওদিকটায় সূর্য উঠছে, সেই সঙ্গে সচিত্র বক্তব্যকে পরিস্ফুট করবার জন্যে তাঁকে অঙ্গভঙ্গির সাহায্য নিতে হয়েছে, মুখ দিয়ে দু-চারটে আওয়াজও করতে হয়েছে। গোড়ায় কিছু না-বুঝে ফ্যালফ্যাল ক'রে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছবি দুটোর দিকে তাকিয়ে থেকেছে ত্রোনিদো, তারপর গম্ভীরভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেও ছবির ভাষার পাঠোদ্ধার করতে না-পেরে মাথা চুলকেছে কেবল। তখন পাঞ্চয়ল যেদিকটায় সূর্য উঠছে এঁকেছিলেন সেদিকটাতেই পাশে এঁকে দেখিয়েছেন একটা গাছের গায়ে একজন লোক দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। এবার আর ত্রোনিদোর নিশ্চয়ই ছবির কথা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। মুখ তুলে বলেছে : 'বুঝেছি। পুবদিকে কেউ-একজন বন্দী হ'য়ে আছে। সে কি আপনাদের লোক? আপনারা তাকে খুঁজে বার করতে চাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ,' রবার্টকে দেখিয়ে বলেছেন পাঞ্চয়ল, 'যাকে খুঁজতে যাচ্ছি তিনি এর বাবা।'

ত্রোনিদোর বজ্রকঠোর মুখটা তখন সহানুভূতিতে কোমল হ'য়ে এসেছে। তবে মুখে সে কিছুই বলেনি।

পাঞ্চয়ল তখন জিগেস করেছেন : 'এখানে কি ইণ্ডিয়ানরা কাউকে কয়েদ ক'রে রেখেছে ব'লে শুনেছো?'

'হ্যাঁ,' আর অমনি সবাই চমকে উঠেছে ক্রোনিকোর কথা শুনে, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, সিংহের মতো অকুতোভয় আর বিশালহৃদয় এক শ্বেতাঙ্গকে বন্দী ক'রে রেখেছে এখানকার ইণ্ডিয়ানদের একটা দল—না, না, তারা কেচুয়াও নয়, আইমারাও নয়—অন্য-একটা ছোটো উপজাতি। কিন্তু সে তো বছর দুই আগেকার ব্যাপার।' সে যদিও বলেছে এর বেশি আর-কিছু তার জানা নেই, তবু তার মুখের ভাব দেখে সবাই আন্দাজ করেছে যে যে-কথাটা সে বলতে চায়নি, তা এই : অ্যাদ্দিন পরেও সে-বন্দী কি আর বেঁচে আছে?

তাঁদের সব আশা এই অনুক্ত আশঙ্কায় বেশ-খানিকটা ধাক্কা খেয়েছে বটে, তবু অভিযাত্রীরা কেউ হাল ছেড়ে দেননি। বরং, সে যে জানে একজন-কেউ এখানে বন্দী হয়েছিলো, এই তথ্যটাই তাঁদের উৎসাহ আরো চাগিয়ে দিয়েছে। এতদিনে তাঁরা একটি-বারও তো এমন-কোনো কথাও শোনেননি—এখন তো জানা গেছে যে অন্তত আশপাশে কোথাও ইণ্ডিয়ানদের একটি উপজাতি একজন শ্বেতাঙ্গকে বন্দী ক'রে রেখেছে, আর তিনিই নিশ্চয়ই কাপ্তেন গ্রাণ্ট! ফলে প্রচণ্ড তোড়জোড় ক'রে নবোদ্যমে এগিয়ে গেছেন তাঁরা, পরের দিন পেরিয়েছেন কলোরাডো নদী, ইণ্ডিয়ানদের তৈরি চামড়ার তৈরি ঝুলন্ত সেতুটা পেরিয়ে।

যে-কোনো যাত্রাতেই কখনও-কখনও এমন সময় এসে পড়ে, যখন তেমন-কিছুই ঘটে না। শুধু নিয়মমাফিক এগিয়ে যেতে হয়, কখনও পথের একঘেয়েমিতে নিরুৎসাহিত হ'তে হয় না। কয়েকদিন একটানা চ'লে তাঁরা গিয়ে পৌঁছেছেন মস্ত একটা হ্রদের ধারে, বহুরকম খনিজ পদার্থ মেশানো তার জলে, ফলে সে-জল মোটেই মিষ্টি নয়, বরং কেমন-একটা কটু অম্লকষায় স্বাদ তার জলের, সেইজন্যেই না কি এ-দেশের ভাষায় এই হ্রদের নাম : *যে-জলাশয়ের জল তেতো*।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি ভাবা গিয়ে থাকে যে রবার্টের ফাঁড়া কেটে যাবার পর আর ত্রোনিদোর সঙ্গে ভাব হ'য়ে যাবার পর, অভিযানকারীদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে, তবে বিষম ভুল করা হবে। জাক পাঞয়লের ফোড়ন সত্ত্বেও পরের কয়েকদিন কিন্তু অভিযানকারীদের আর দুর্ভোগের সীমা ছিলো না। *পাম্পা*, অর্থাৎ লাতিন আমেরিকার—বিশেষত আর্হেনতিনার —*প্রেয়ারি*, সব জায়গায় কিন্তু একরকম নয়। কোথাও সে সবুজে সবুজ, তৃণভূমির বিশাল বিস্তার, কোথাও-বা গেরিধূসর, সবুজের একফোঁটাও কোনো চিহ্ন নেই, যেন কোনো মরুভূমিই আচমকা পথ ভুল ক'রে এই তৃণভূমিতে ঢুকে প'ড়ে আর বেরুতে চাইছে না। শুধু তা-ই নয়, সমভূমি যেমন আছে, মাইলের পর মাইল একইরকম, তেমনি আছে বন্ধুর রুক্ষ জমি, উবড়ো-খাবড়ো, অসমতল রূঢ়-কর্কশ মাটি। যদি-বা ইওরোপ থেকে আসার পর এমন সবুজ দেখে গোড়ায় সকলের চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিলো, মুখে আর লাতিন আমেরিকার ভূদৃশ্যের প্রশংসা ধরছিলো না, দু-দিন পরেই যখন রুক্ষধূসর গিরিভূমি নিস্তারহীন ছড়িয়ে গেলো সামনে, আর পানীয় জলের অভাবে শুধু কণ্ঠনালীই নয়, ধুলোমাখা শরীরগুলোও একটু ঠাণ্ডাজলের জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো, তখন পাম্পা সম্বন্ধে গোড়ার ধারণাটা বদলাতে বাধ্য হ'লো সবাই। *গাউচো* অর্থাৎ এখানকার *কাউবয়রা* যখন *পনচোয়* শরীর ঢেকে ঘোড়ায় চ'ড়ে মাইলের পর মাইল টহল দিয়ে বেড়ায়, তখন তারা তাদের চলার পথে গভীর-সব কূপ খুঁড়ে জল বার ক'রে নেয় : তারা জমির ধরন দেখেই টের পেয়ে যায় কোনখানে মাটি খুঁড়লে জল মিলবে। আর *গাউচোরা* এই ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ব'লেই প্রস্তুত ও সুসজ্জিত হ'য়ে আসে—কাপ্তেন গ্রাণ্টের সন্ধানে বেরিয়ে-পড়া লর্ড গ্লেনারভনের দল কিন্তু পাম্পা সম্বন্ধে কিছুই না-জেনে, কোনোভাবেই তৈরি না-হ'য়ে, এখানে ঢুকে পড়েছেন। পরের জলাশয় অনেক দূরে, এখানে আশপাশে এমনকী তেতো জলেরও কোনো কূপ নেই।

শেষটায় প্রায় যেন ধুঁকতে-ধুঁকতেই চলছিলো ক্লান্ত, অবসন্ন, অভিযাত্রীর দল। ঘোড়াগুলো অব্দি তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে আছে। যাত্রার শুরুতে তাদের যে দুর্জয় গতি ছিলো, সেটা এখন প্রায় স্মৃতি মাত্র—অর্থাৎ এই দুর্গম অঞ্চলটা যে তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যাবেন, তারও কোনো জো নেই। শুধু ত্রোনিদো আর তার তেজিয়ান ঘোড়াটাই সুখেদুঃখেনির্বিকার ভঙ্গিতে পথ দেখিয়ে-দেখিয়ে চলেছে।

এরই মধ্যে একদিন হাওয়ায় ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া গেলো। আচমকা হা-হা ক'রে হেসে-ওঠা লেলিহান দাবানল নয়, মানুষের জ্বালানো অগ্নিকুণ্ড। অন্তত সেটাই ছিলো তাদের পথপ্রদর্শকের অভিমত : 'বেঁটে ঝোপগুলোয়, আগাছার বনে, প্রচুর পোকামাকড় থাকে—এ আগুন জ্বালিয়েছে গাউচোরা, পোকা মারবে ব'লে—তবে তা প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর মাইল দূরে হবে। এখানে সমতল প্রান্তর ব'লে অনেক দূর থেকেই গন্ধ আসছে।' শুধু পোকামাকড় নেই ঝোপে-ঝোপে, জায়গায়-জায়গায় আছে মশার ঝাঁক।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোকামাকড়ের কথা শুনে পাঞয়ল তাঁর বিদ্যে জাহির করতে গিয়েছিলেন, পুথিপড়া জ্ঞান ফলিয়ে ফিরিস্তি দিতে বসেছিলেন কত অসংখ্য ধরনের পোকামাকড় পাওয়া যায় এখানে। কিন্তু মশার কামড়ে তাঁর বিদ্যেবাগিশ শরীরখানা যখন চাক-চাক হ'য়ে ফুলে গেলো, মেজর ম্যাকন্যাব্স ফোড়ন কেটেছিলেন : 'সে কী ! হাজার ধরনের পোকামাকড় তো নয়, নিছক একজাতের তুচ্ছ মশা, তার কামড়েই আপনি অমন নাজেহাল হ'য়ে পড়লেন !' পাঞয়ল শুধু চিচি ক'রে বলেছিলেন : 'মশার কামড়ে ঘাবড়ে যাচ্ছি কি সাধে ! এখানকার মশারা পড়েছি ম্যালেরিয়া রোগ ব'য়ে নিয়ে বেড়ায়।' আরেকদিন গাউচোদের একটা ছোটোদলের মুখোমুখি পড়েছিলেন তাঁরা, বেশিরভাগই মেস্তিসো, দো-আঁশলা, শ্বেতাঙ্গ আর ইণ্ডিয়ানদের মিশোল। তারা দূর থেকে এই দলটাকে দেখে অন্যধার দিয়ে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে পিঠটান দিলে ; পাঞয়লের অনুমান, তারা নির্ঘাৎ এঁদের দস্যুদল ব'লে ভেবেছে। মেজর ম্যাকন্যাবসের মন অবিশ্যি এ-কথায় আদপেই সায় দিতে চায়নি। তিনি বরং খুনশুটি ক'রে নানারকম ফোড়ন কেটে পাঞয়লকে চটিয়ে দিতে চাইলেন। তাতে অন্তত পথের কষ্ট একটু লাঘব হবে। এ-সব কথাকাটাকাটিতেই সকলে অন্তত সারাক্ষণই ক্লান্তির কথা ভাববে না। পাঞয়ল প্রায় ফেটেই পড়েছিলেন তাঁর ফক্কুড়িতে, মেজাজ হ'য়ে উঠেছিলো তিরিক্ষি—যেটা একটু আশ্চর্যই, কেননা মানুষটি এমনিতে ভারি দিলখোলা, সদাশয়, একটু মজারও আছেন (যদিও নিজে টের পান না তিনি কতটা মজার মানুষ)।

আর হা-হা ক'রে ব'য়ে যায় রোদ্দুরে-তাতা উদ্দাম হাওয়া, ধুলোর ঝড় তোলে। তবু আশায় বুক বেঁধে সবাই চলেছে কখন পৌঁছুবে পরবর্তী জলাশয়ে—লেক সালিনার তীরে।

কিন্তু পথশ্রমে আর তৃষ্ণায় জেরবার হ'য়ে লেক সালিনায় এসে দেখা গেলো, শুকনো মরা খাত, একফোঁটাও জল নেই, গরমে সব জল শুষে নিয়েছে কেউ যেন এক গণ্ডূষে, খাতটার মাটি প'ড়ে আছে ফুটিফাটা! এবার তাহ'লে খরা কী-রকম ভয়াল হয়েছিলো ? এককালে তো বড়োলোক কোনকিস্তাদোরেরা বুয়েনোস আইরেস থেকে এই জলাশয়ের জল নিয়ে যেতো, যেহেতু এই জলে খনিজ পদার্থ আছে, চিকিৎসকদের মতে তা নাকি প্রায় মৃতসঞ্জীবনী—এত স্বাস্থ্যদায়ক, বলকারক। রোদ্দুরের আঁচে এখন কি না সেই জলাশয়ের জল শুষে গিয়েছে। শুধু কোথাও-কোথাও কাদামাখানো এক-আধফোঁটা জল চিকচিক করছে, শুধু যেন আয়নার মতো কতগুলো হতাশ মুখকে ফিরিয়ে দেখাবে ব'লেই, শুধু ব্যঙ্গ করার জন্যেই যেন এই ক-ফোঁটা জল ব'য়ে গেছে—তলানি।

জল পাবে প্রত্যাশা ক'রে এসেছিলেন ব'লেই জলাশয়ের তলদেশটাকে তাঁদের কাছে ঠেকলো খরামাটির অট্টহাসির মতো। আর সেই সময়ে তাঁদের কাছে একটা নতুন উপায় বাৎলালে তাদের পথপ্রদর্শক। সে বললে দলটাকে দু-ভাগে ভাগ হ'য়ে দু-দিকে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে হবে। একদল যাবে ৩৭° ডিগ্রি সমান্তর ধ'রে নাকবরাবর, সোজা সামনে—তিরিশ-বত্রিশ মাইল দূরে একটা ছোট্ট নদী আছে, গুয়ামিনি, তাকে লক্ষ্য ক'রে। সে-দলটায় লর্ড গ্লেনারভন আর রবার্টের সঙ্গে রইলো পাম্পারই বজ্রনিনাদ—ত্রোনিদো। অন্যদলটা যাবে ঘোরাপথে, মাইল-পঁচাত্তর যেতে হবে তাদের, ঘোরাপথ হ'লেও দক্ষিণগামী এই পথটা সহজতর। অতটা পথ ঘুরে যাবে ব'লেই পথ বেঁকে গিয়ে দল দুটিকে মিলিয়ে দেবে একসময়।

পরের দিন ভোরবেলায়, রোদ তেতে ওঠবার আগেই, বেরিয়ে পড়লো সবাই। ঘোড়ারা টের পায় কোথায় কোন দিকে জল আছে। হাওয়ায় যেন জলের সোঁদা গন্ধ পায় তারা। ত্রোনিদোর ঘোড়াই শুঁকে-শুঁকে শেষটায় বেলা তিনটে নাগাদ তাদের নিয়ে এলো গুয়ামিনি নদীর ধারে—প্রায় মরীয়ার মতো চেষ্টা ক'রেই ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন তাঁরা, তাই বেলা প'ড়ে যাবার আগেই এসে পৌঁছেছেন নদীর ধারে। অবশেষে, তৃষ্ণার শান্তি : জলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে জল খেয়ে বাঁচলো সবাই—ঘোড়া আর মানুষের মধ্যে জলপানের ধরনে কোনো তফাৎই রইলো না। পাম্পা বোধহয় একসময় এইভাবেই আধুনিক মানুষকে আদিম মানুষে বদলে দেয়—উবু হ'য়ে ব'সে, বা শুয়েই বলা যায়, সেই দূর-অতীতের মানুষের মতোই জলপান করলেন লর্ড গ্লেনারভনরা।

জল যেই অবসন্ন মানুষগুলোর সাড় ফিরিয়ে আনলে, অমনি মনে হ'লো এ-কদিন ঠিকমতো খাওয়াদাওয়াও হয়নি—তৃষ্ণার জল ছিলো না ব'লে তখন কারু নজরই ছিলো না ভোজ কী জুটলো। এবার মনে হ'লো অন্যদের জন্যে অপেক্ষা করতে-করতে যদি কোনো শিকার জোটে—তবে নিছক অপেক্ষা ক'রেই সময় কাটাতে হবে না তাদের, বরং অন্যদের জন্যে যদি কোনো ভুরিভোজের ব্যবস্থা করা যায় তবে সকলকেই তাক লাগিয়ে দেয়া যাবে—বিশেষত ত্রোনিদো যখন জানালে এখানে জল আছে ব'লেই আশপাশে জীবজন্তুর দেখা মিলবে—এর আগে তো কেবল গেছে ধূ-ধূ শুকনো খরায়-ফাটা জমি।

শিকারের নামে রবার্ট নেচে উঠেছিলো। তারই উৎসাহে শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন লর্ড গ্লেনারভন। কিছুদূর যাবার পরই দেখা গেলো পিপীলিকাভুকদের—*আর্মাদিলো*—বর্মের মতো কঠিন আঁশেভরা ছোটো-ছোটো জীব—ছোটো-ছোটো কীটপতঙ্গ খেয়েই তারা বাঁচে, প্রধান খাদ্য অবশ্য পিঁপড়েই, যেজন্যে নাম পিপীলিকাভুক; তবে এদের শিকার করা ভারি কঠিন, একটু ভয় পেলেই তারা গুটিয়ে যায় একটা উলের বলের মতো, আর বর্মের মতো কঠিন আঁশ চারপাশে একটা ঢাকা তৈরি ক'রে তোলে। ত্রোনিদো বলেছিলো, এই কঠিন আঁশের তলায় আছে সুস্বাদু নরম মাংস—লাতিন আমেরিকার এই জীব ভয় পেলেই তার বর্মের বলের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে গড়িয়ে গিয়ে গর্তে ঢোকে, বিদ্যুৎবেগে, অতএব দেখবামাত্র গুলি করতে হবে। অনেকবার চেষ্টার পর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবার্ট শেষকালে একটি আর্মাদিলো শিকার করতে পেরেছিলো। সেই মাংসে তাদের দিব্যি ভোজ হ'য়ে গেলো, কিন্তু তবু অন্যদের কোনো দেখা নেই। এদিকে রাত হ'য়ে আসছে।

ত্রোনিদো বলেছিলো জল যেহেতু আছে, অতএব থাকার কোনো আস্তানাও যা-হোক মিলে যাবে। আর মিলেও গেলো অবিশ্যি: একটা ভাঙাচোরা র‍্যানচের কোর‍্যালে—সেই-যেখানে র‍্যানচের জীবজন্তু রাখা হয়, খোঁয়াড়ই আর-কি একধরনের। গাছের গুঁড়ি, ডাল, কাঠের ফালি—সব দিয়ে তৈরি করা, ওপরে একটা ছাউনি আছে, তিনদিক বন্ধ, আরেকদিকে আড়কাঠ দিয়ে আটকানো দরজা, আড়কাঠগুলো গেছে সমান্তরভাবে, সেগুলো তুলে নেয়া যায়, অমনি সামনেটা পুরো হাট ক'রে খোলা যায়। দক্ষিণ আমেরিকায় তারা একে বলে *রামাদা*। অর্থাৎ, একদিক দিয়ে, এখানে শোয়া মানে খোলা জায়গাতেই শোয়া, তবে একদিক থেকে নিশ্চিন্ত। পরিত্যক্ত, ভাঙা র‍্যানচ, কেউ কোথাও নেই; তাছাড়া রামাদার মাথার ওপর তো ছাউনি আছে একখানা। শুতে যাবার আগে কিছু কাঠ জোগাড় ক'রে জড়ো ক'রে রাখলে তারা—কতক্ষণ থাকতে হবে কে জানে, পরে রান্নাবান্নার কাজে সুবিধে হবে। কিছু খড় অব্দি জুটে গেলো তাদের, খড়ের বিছানায় আয়েস ক'রে শোবামাত্র গাঢ় ঘুম, এই ক-দিনের অবিরাম পরিশ্রমের পর শরীর ভেঙে অবসাদ নেমেছিলো, তাই গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে মোটেই কোনো সময় লাগেনি।

কিন্তু নিশুত রাতে, তখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে বোধহয়, কেমন-একটা অস্বস্তিতে ত্রোনিদোর ঘুমটা ভেঙে গেলো। অন্যরা ঘুমিয়ে প্রায় কাদা, চারপাশে অন্ধকার; ত্রোনিদো ঠিক বুঝতে পারলে না অমনভাবে হঠাৎ তার ঘুমটা ভেঙে গেছে কেন। তার জীবনটা শিকারির, রাত-বিরেতে অজানা-অচেনা বনে-বাদাড়ে তাকে শুতে হয় দরকার হ'লে, ঘুমটা তার স্বভাবতই পাৎলা—যেন ঘুমের মধ্যেও তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় সারাক্ষণ সজাগ থাকে। অনেকক্ষণ ধ'রে চুপটি ক'রে সে কোর‍্যালের খুঁটিগুলোর ফাঁক দিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো। উঁহু, না, কিছুরই কোনো সাড়া নেই। কিন্তু তবু তার ঘুম এলো না। তার ইন্দ্রিয়বোধ প্রখর, সজাগ—তারাই তাকে আগে থেকে হুঁশিয়ার ক'রে দেয়। তার অবচেতন মন ঘুমের মধ্যেও যেন কোনো বিপদের গন্ধ পেয়েছে।

ঘোড়াগুলোর মধ্যে তারই ঘোড়াটি শুধু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্ছে—যেন ইশারা পেলেই ছুটবে ক্ষিপ্রগতিতে—তার চটকা ভেঙে যাবে। অন্য ঘোড়া দুটো মাটিতে নেতিয়ে শুয়ে আছে—তাদের সম্ভবত এতটা ধকল সহ্য ক'রে অভ্যেস নেই।

ত্রোনিদো উৎকর্ণ হ'য়ে শুয়ে রইলো, অনেকক্ষণ—বোধহয় একঘণ্টা হবে—শুয়ে রইলো মানে, রইলো ঠিক আধশোয়া অবস্থায়, যে-কোনো মুহূর্তে সে তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠবে, প্রয়োজন বোধ করলে। এই ঘুম আর জাগরণের মধ্যে অস্পষ্টতার মাঝখানে হাজার ক্লান্ত থাকলেও সে কিন্তু সুপ্রস্তুত।

হঠাৎ, দূরে, আঁধার ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো ছোটো-ছোটো কতগুলো আলোর ফোঁটা।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন সময় ত্রোনিদোর ঘোড়াটাও কেমন অদ্ভুত ছটফট ক'রে উঠলো। বিপদের গন্ধ সেও পেয়েছে।

অন্ধকারে, ঘাসের মধ্যে অস্ফুট সর-সর আওয়াজ—কারা যেন স'রে-স'রে যাচ্ছে। হঠাৎ যেন তারই মধ্যে একসঙ্গে গররগর ক'রে উঠলো বুনো খ্যাপা কুকুর আর নেকড়ে। এই অদ্ভুত গর্জন শুনেই ত্রোনিদো তার বন্দুক তুলে অন্ধকার লক্ষ্য ক'রে একটা গুলি ছুঁড়লো—আর বন্দুকের শব্দ মিলিয়ে যাবার পরেই আবার সব আগের মতো নিঃঝুম হ'য়ে এলো। কিন্তু ততক্ষণে, বন্দুকের আওয়াজ শুনে, ধড়মড় ক'রে উঠে বসেছেন লর্ড গ্লেনারভন, আর রবার্টও তথৈবচ।

ত্রোনিদো শুধু অস্ফুট স্বরে ব'লে উঠলো, 'জাগুয়ার!'

অর্থাৎ ট্রপিক্যাল আমেরিকার সেই বৃহৎ বন্যবিড়াল, যে লেপার্ডের চাইতেই যে আকারে বড়ো ও পৃথুল তা-ই নয়, তার চাইতেও ধূর্ত ও শক্তিশালী, খয়রির সঙ্গে হলদে মেশানো পেশল গায়ে কালো-কালো ফুটফুট ছোপ।

ত্রোনিদোর কথাটাকে যেন প্রমাণ ক'রে দিতেই আবার শুরু হ'য়ে গেছে রাগি গরগর আওয়াজ। যেন দল বেঁধে এসেছে কত জাগুয়ার, আর খিদেয় হন্যে হ'য়ে পরস্পরের সঙ্গে যুঝেই যে পারে সামনে এগিয়ে আসতে চাচ্ছে।

একটু আশ্চর্যই। এরা এমনিতে আসে নিঃশব্দে, চুপি-চুপি ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের ওপর, অব্যর্থ কৌশলী লাফে, ছিঁড়ে খায় শিকারকে, তারপর, যেমন নিঃশব্দে এসেছিলো তেমনি নিঃশব্দে মিলিয়ে যায়।

এই রেষারেষি ক'রে গরগর ক'রে নিজেদের জানান দিয়ে কখন এসে চড়াও হয়েছে তখন বোঝাই যায় কতটা ক্ষুধিত এরা, কতটা বুভুক্ষু, আর তাই, কতটা হিংস্র হ'য়ে উঠেছে এখন।

কিন্তু এখন এ নিয়ে ভাবার কোনো ফুরসৎ নেই। এই নিশুত রাতের আতঙ্ককে যে-ক'রেই হোক ঠেকাতে হবে। প্রথমে যত কাঠকুটো ছিলো, সব জড়ো ক'রে র‍্যানচের মুখে জ্বালিয়ে দেয়া হ'লো—এই আগুনের গণ্ডি পেরিয়ে আসতে এরা ভয় পাবে, তাছাড়া অন্ধকার দূর হ'য়ে যাবে ব'লে এই মরণদূতগুলোকে চর্মচক্ষে দেখাও যাবে। আর একটু বেশামাল দেখলেই, বেগতিক দেখলেই, অগত্যা চালাতে হ'লো বন্দুক। অনিচ্ছাসত্ত্বেও। কেননা গুলি বেশি নেই, ভয় পেয়ে সব একসঙ্গে মুহুর্মুহু গুলি ছুঁড়ে খরচ করা চলবে না, গুনে-গুনে হিশেব ক'রে খরচ করতে হবে গুলি, সাবধানে—যাতে একটা গুলিও না-ফসকায়, যাকে তাগ ক'রে গুলি-করা হবে সরাসরি তার গায়ে যেন তা বেঁধে।

কিন্তু গুলি এত কম ছিলো যে তাও একসময় শেষ হ'য়ে গেলো। আহত, ক্রুদ্ধ, হন্যে, ক্ষুধিত নেকড়েরা তখনও হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, গুলিগোলার কোনো পরোয়া না-ক'রেই। ফলে গুলি ফুরিয়ে যেতে শুরু হ'য়ে গেলো বন্দুকের বাঁট আর ছুরি দিয়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মরক্ষার চেষ্টা। আর আগুনের কুণ্ডও ক্রমে, জ্বালানির অভাবে, নিভু-নিভু হ'য়ে আসছে। জাগুয়ারের দল কিন্তু এবার র‍্যানচের পেছন দিয়ে ঢোকবার চেষ্টা করছে। পারলে বুঝি খুঁটিগুলো উপড়েই ফ্যালে।

এবার সটান উঠে দাঁড়ালে ত্রোনিদো, তার ঘোড়াটাও এতক্ষণ বেদম অস্থির হ'য়ে ছটফট করছিলো, নাক দিয়ে নিশ্বাসে ছড়াচ্ছিলো গরম হলকা, চোখ দুটোয় যেন আগুন জ্বলছিলো। লাগাম হাতে নিয়ে তার ঘোড়ার পিঠে যেই সে চাপতে যাবে, অমনি লর্ড গ্লেনারভন তার হাত চেপে ধরলেন।

অস্থির-একটা মূকাভিনয় মারফৎ ত্রোনিদো বোঝাবার চেষ্টা করলে তাঁদের বিপদের মধ্যে ফেলে রেখেই নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে সে পালিয়ে যেতে চাচ্ছে না, বরং সে বেরিয়ে গেলে জাগুয়ারেরা ভাববে যে এতক্ষণে বাগে পাওয়া গেছে শিকারকে, তার পেছন-পেছন ছুট লাগাবে—কিন্তু ত্রোনিদোর ঘোড়া হাওয়ার চাইতেও বুঝি জোরে ছোটে, তাই জাগুয়ারগুলো তার পেছনে প্রাণপণে ছুটে এলেও তার নাগাল ধরতে পারবে না, সে জাগুয়ারগুলোকে প্রলোভন দেখিয়ে টেনে নিয়ে যাবে দূরে, আর তাতে লর্ড গ্লেনারভন আর রবার্ট আপাতত বেঁচে যাবেন।

র‍্যানচের মুখটার কাছে তখন জাগুয়ারেরা নেই। কিন্তু ত্রোনিদো আর লর্ড গ্লেনারভন সন্তর্পণে গিয়ে যখন আস্তানার মুখটা দেখছেন, জাগুয়ারেরা কোথায়, সেই সময়ে দুরন্ত ঝড়ের গতিতে ত্রোনিদোর ঘোড়ায় চেপে তাদের পাশ দিয়ে অন্ধকারে ছুটে চ'লে গেলো রবার্ট, আর পেছন-পেছন অমনি ধেয়ে গেলো হন্যে ও ক্ষুধিত জাগুয়ারেরা।

ত্রোনিদো আর লর্ড গ্লেনারভন শুধু হতভম্ব নন, আঁৎকেও উঠেছেন। এ কী করলে রবার্ট ?

এদিকে ভোর হ'তে তখনও ঘণ্টা দু-এক বাকি। কী-যে করবেন, কিছুই বুঝতে পারছিলেন না লর্ড গ্লেনারভন। শুধু ছটফট করা ছাড়া, অধীর হ'য়ে আলো ফোটবার অপেক্ষা করা ছাড়া, আর কোনোকিছু করণীয় নেই। আলো ফুটতেই আর কালক্ষেপ নয়—দুজনে ঘোড়ায় চেপে পশ্চিমদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

খানিকটা দূর গেছেন, হঠাৎ শুনতে পেলেন পর-পর কতগুলো বন্দুকের আওয়াজ। তাকিয়ে দ্যাখেন, পাঞ্চয়লরা ছুটে আসছেন, আর তাদের সকলের পুরোভাগে স্বয়ং রবার্ট, তাকে দেখে অক্ষতই মনে হয়, গায়ে আঁচড়টুকুও লাগেনি।

লর্ড গ্লেনারভন স্বস্তির শ্বাস ফেলে রবার্টকে জড়িয়ে ধরলেন। জিগেস করলেন, 'তুমি অমনভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়েছিলেন কেন, রবার্ট?'

অমনি, চটপট, সোজা জবাব এলো : 'বা-রে, ত্রোনিদো এর আগে একবার আমায় বাঁচায়নি ? আমায় তো তার একটা প্রতিদান দিতে হয়। তাছাড়া আপনাকেও নিরাপদ রাখা কর্তব্য আমার : কারণ আপনিই তো চলেছেন আমার বাবাকে উদ্ধার করতে।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এহেন যুক্তির কাছে আর কোনো কথাই চলে না, তবে লর্ড গ্লেনারভনের দায়িত্ববোধের মধ্যে রবার্টের এই দুর্দান্ত কাণ্ডটা কাঁটার মতো খচখচ ক'রে বিঁধছিলো। এই কিশোরের যদি কিছু হয়, তবে তার দায় তো তাঁকেই সামলাতে হবে। পরে কখনও রবার্টকে আলাদা ক'রে ডেকে নিয়ে আচ্ছা ক'রে ধমকে দেবেন ভেবে তখন আর এ নিয়ে তিনি কোনো উচ্চবাচ্যই করলেন না, কেননা এই সমূহ বিপদ থেকে এভাবে উদ্ধার পেয়ে সবাই তখন উচ্ছ্বাসে প্রায় যেন ভেসে যাচ্ছে—বলাই বাহুল্য, পাঞ্চয়লের উচ্ছ্বাসটাই অন্যসকলের চাইতে যৎকিঞ্চিৎ বেশি।

উচ্ছ্বাসের মধ্যে একটু রাশ টেনে ধরবার পরেই সবাই দল বেঁধে ফিরে এলেন র‍্যানচে। গত রাতের হুলুস্থুলু যুদ্ধে বেশ-কিছু জাগুয়ার অক্কা পেয়েছে—কিন্তু র‍্যানচের খুঁটিগুলোকে তারা খুব-একটা অক্ষত রাখেনি। হামলাটা যেমন প্রচণ্ড আর ভয়ংকর হয়েছিলো, তেমনি তাদের ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টাটাও হয়েছিলো প্রচণ্ড আর জীবনপণ। কত-যে জাগুয়ার এসেছিলো কে জানে, আর তাদের সঙ্গে লড়েছিলো কি না মাত্র তিনজনে—যতই মরীয়া হ'য়ে লড়াই করুক, সংখ্যায় যে তারা নগণ্যই ছিলো, সে-কথাটা অস্বীকার করবে কে।

অন্যদের জন্যে যৎকিঞ্চিৎ মাংস তুলে রেখেছিলো ত্রোনিদো। তাই দিয়েই হ'লো প্রাতরাশ, বেশ আয়েশ ক'রেই খাওয়া গেলো, তারিয়ে-তারিয়ে, কিন্তু তাতে কি আর সকলের খিদে মেটে! অর্থাৎ উত্তেজনার ধকলটা একটু কমলে ফের তাদের খাদ্যসংগ্রহের কাজটায় মনোযোগ দিতে হবে।

সেই-কবে অক্টোবরের চোদ্দ তারিখে, তাঁরা বেরিয়ে পড়েছিলেন তালকাউয়ানো থেকে। তারপর দিনের পর দিন কেটেছে, কিন্তু আরহেনতিনার এই বিশাল তৃণভূমি যেন আর ফুরোয়ই না। প্রায় একটানাই পথ চলেছেন তাঁরা। বন্য জন্তুর অতর্কিত উপদ্রবে আর হামলায় দু-একবার তাঁদের থমকে পড়তে হয়েছে বটে, কিন্তু সে নেহাৎই সাময়িকভাবে। তাছাড়া আর-কারু সঙ্গেই তাঁদের দেখা হয়নি। অথচ সেটাই বরং একটা প্রহেলিকা। পথের মাঝে-মাঝে ইণ্ডিয়ানদের বসতি চোখে না-পড়ুক, দলছুট কোনো ইণ্ডিয়ানের সঙ্গেও তাঁদের দেখা হয়নি। অথচ এ-সব অঞ্চলে নাকি আরহেনতিনার ইণ্ডিয়ানদের দেখা পাওয়া যায় প্রায়ই। শুধু একবার তিন জন সশস্ত্র ঘোড়সোয়ারকে দেখা গিয়েছিলো দূর থেকে, আর তারা ছিলো ইণ্ডিয়ান—কিন্তু ঐ দূর থেকেই যা দেখা — কেননা তাঁদের দেখেই অন্যদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে তারা ঝড়ের বেগে চোখের আড়ালে চ'লে গিয়েছিলো। এরা কি তবে ইণ্ডিয়ান ছিলো না? ছিলো দো-আঁশলা, ক্রেয়োল বা মেস্তিসো, আর গাউচো বা কাউবয় হিশেবেই যারা খেতখামার সামলায়? পাঞ্চয়লের মতে অবশ্য এরা মোটেই গাউচো নয়, বরং বান্দিতো, দস্যু—তাঁর চোখে সবাইকেই বোধহয় ডাকাতের মতো দেখায়।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেসরা নভেম্বর পাম্পার অন্য প্রান্তে এসে পৌঁছুবার পর ত্রোনিদো পরামর্শ দিলে, আরো ষাট মাইল পথ পেরিয়ে ফোর্ট ইনডিপেনডেন্সে গিয়ে খোঁজ করা যাক, কাপ্তেন গ্রান্টকে যারা পাকড়ে কয়েদ ক'রে রেখেছে সেই ইণ্ডিয়ানদের কোনো খোঁজ মেলে কি না। প্রস্তাবটা সকলেরই মনে ধরলো। এখানে র‍্যানচের মধ্যে খবরদারির চিহ্ন বেশ চোখে পড়লো। এই বিশাল তৃণভূমিতে পালে-পালে গোরুমোষভেড়া চ'রে বেড়াচ্ছে, প্রত্যেকটা জন্তুর গায়ে গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে মালিকের নাম মোহর ক'রে দাগানো, আর তাদের আগলে আর সামলে নিয়ে বেড়াচ্ছে কুকুর। শিক্ষিত কুকুর এ-সব, ভারি ওস্তাদ, নিজের কাজ ভালোই জানে। কখনও-কখনও এমনও হয় যে দু-চারজন মাত্র গাউচো থাকে কোনো র‍্যানচে, তবে তাদের সঙ্গী থাকে দুর্দান্ত সব ঘোড়া আর অনেকগুলি ক'রে পোষমানানো শেখানোপড়ানো কুকুর।

ফোর্ট ইনডিপেনডেন্স বা *আজাদগড়* সমুদ্র থেকে হাজারফিট উঁচুতে।। দেয়াল দিয়ে ঘেরা, যাতে শত্রুর আক্রমণ ঠেকানো যায়। এককালে যখন এটা তৈরি হয়েছিলো তখন লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক ভূগোল অনবরত ভোল পালটাচ্ছে—তখন মুহুর্মুহু চলেছে যুদ্ধবিগ্রহ, আর যতবারই হাত পালটাক সবসময়েই ছিলো একটা সাজো-সাজো রব।

অভিযাত্রীরা অবশ্য এখন *আজাদগড়ে* পৌঁছে একবারেই হতভম্ব হ'য়ে গেলেন।

কেল্লার ভেতরে বেশ উৎসাহভরে এখন যারা কুচকাওয়াজ করছে তারা প্রায় সবাই ছেলেমানুষ। উনিশ-কুড়ি বছরের চাইতে বড়ো-কেউ নেই—কিন্তু দলে-দলে আছে ছোটো ছেলে, তাদের বয়স সাত-আট থেকে শুরু। ছোটোদের পরনে পনচো, কোমরে বেলট দিয়ে বাঁধা। মস্ত লম্বা তলোয়ারগুলো কোনো-কোনো ছেলের নিজের দৈর্ঘ্যের চাইতেও দীর্ঘ হবে, তাছাড়া আছে বন্দুক, আর সে-সব সমেতই তারা ফরাশি কেতায় কুচকাওয়াজ ক'রে চলেছে। বয়েস যার যে-রকমই হোক না কেন, সকলেই গড়ন আর মুখচোখ একই রকম, সম্ভবত একই বাড়ির ছেলে। আর এরা যদি সবাই ভাই-ভাই হয়, তবে তাদের কুচকাওয়াজ করাচ্ছে সবচেয়ে বড়োভাই—সেই-ই স্বভাবতই এই *ইউনিটের* সর্দার। এ-রকম *ইউনিট* নাকি অনেক আছে এখানে—পাঞয়লের পণ্ডিতি বয়ান—কেননা এখানে একেকটা পরিবারে অনেক সন্তান জন্মায়, তবে পাঞয়লের পড়া বিদ্যের বুলি কি না, তাতে একচিলতে নুন ছিটিয়ে নিতে হয় সবসময়।

ফোর্ট ইনডিপেনডেন্স বা আজাদগড়ের তত্ত্বাবধানের দায় সার্জেন্ট মানুয়েলের ওপর। জন্মেছিলেন ফ্রান্সে, কিন্তু এখন এখানকার মেয়ে বিয়ে ক'রে তিনি এখানকারই একজন হ'য়ে গেছেন—কস্মিনকালেও আর ইওরোপে ফেরবার মৎলব নেই তাঁর।

সার্জেন্ট মানুয়েল মানুষটা খোলামেলা, দিলদরিয়া, হাসিখুশি।

উঁহু, না, কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো খোঁজ তিনি রাখেন না। তাঁর নামই তিনি নাকি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

*বাপের জন্মে* শোনেননি। তবে বেশ-কয়েক বছর আগে একজন ইতালীয় আর একজন ফরাশিকে ধ'রে আনে ইণ্ডিয়ানরা। ইতালীয়টির হম্বিতম্বি আর বদমায়েশি দেখে তাকে সাজা দেয়া হয় : প্রাণদণ্ড। তবে ফরাশি *ভাগ্যান্বেষী* বা *ফরচুনহানটার* বা সম্পদশিকারি পালিয়ে যান। না-না, এঁদের কেউই ইংরেজ ছিলেন না—গ্রেটব্রিটেনের এঁরা কেউ নন!

এদিকটায় যে ইণ্ডিয়ানদের কেন দেখা যাচ্ছে না, সেই ধাঁধাটারও একটা সমাধান বাৎলে দিলেন সার্জেন্ট মানুয়েল। পারাগুয়াইয়ের সঙ্গে বুয়েনোস আইরেসের একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলেছে—ইণ্ডিয়ানরা সবাই গেছে সেখানেই—কেউ লড়াই করতে, কেউ-বা লুঠপাট করার সুযোগ খুঁজতে।

সার্জেন্ট মানুয়েলের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা ব'লে একটা ব্যাপারে অন্তত নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো। কাপ্তেন গ্রান্ট এখানকার ইণ্ডিয়ানদের হাতে বন্দী হননি—অর্থাৎ এখান থেকে অ্যাটলান্টিকের তীর অব্দি পুরো তল্লাটটাতেই তাঁর দেখা আর পাওয়া যাবে না। এই মুলুকেই নেই তিনি।

পাঞ্চয়ল বললেন : 'ঐ চিরকুটটা আরেকবার ভালো ক'রে দেখা দরকার। কাপ্তেন গ্রান্ট আদপেই কোনোদিন এই নতুন মহাদেশের মাটিতে তাঁর পা রেখেছেন কি না সন্দেহ। এই বিশাল পাম্পায় যখন নেই, তখন গোটা লাতিন আমেরিকাতেই নেই। অথচ কোথায় আছেন, তার হদিশ দেয়া আছে এই চিরকুটটাতেই। ধাঁধার মতো ঠেকছে বটে, তবে সব ধাঁধারই তো সমাধান হয়। এর সমাধান যদি করতে না-পারি, তাহ'লে আমার নাম আর জাক পাঞ্চয়লই নয়!'

তাঁর এমন লম্বাইচওড়াই আশ্বাস সত্ত্বেও অবশ্য রবার্ট কী-রকম যেন মিইয়ে গেলো। এত-দূরে নূতন জগতে এসেও বাবার কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না!

নয়

## খ্যাপাজল আর পাখির বাসা

আজাদগড় থেকে টানা দেড়শো মাইল গেলেই—অ্যাটলান্টিক।

এতটা পথ যখন পেরিয়ে আসা গেছে, তখন ঐ বাকি দেড়শো মাইল পেরুতেও তেমন কী আর ঝামেলা হ'তে পারে? বিশেষত এখন যখন ধ'রেই নেয়া গেছে যে কাপ্তেন গ্রান্ট আর যেখানেই থাকুন এই নূতন জগতে যখন নেই, তখন নানা স্থানে-অস্থানে থেমে গিয়ে তাঁর খোঁজ না-করলেও হয়তো চলবে! ফলে এই দেড়শো মাইল



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্চয়ই অনায়াসেই পেরিয়ে যাওয়া যাবে।

তবে লোকে ভাবে এক, আর তাতে বাদ সাধেন প্রকৃতিঠাকরুন। এই দেড়শো মাইলের মধ্যেই যে এমন বিপদ তাদের জন্যে ওৎ পেতে বসেছিলো, তা কে জানতো। পথের মাঝখানে ছোটো-ছোটো সব খরগোশকে হুড়মুড় ক'রে লাফিয়ে-লাফিয়ে পালিয়ে যেতে দেখে কারু-কারু অবশ্য সন্দেহ হয়েছিলো যে কিছু-একটা ঘটতে চলেছে। এরা টের পায়, এই ছোটো জীবগুলো—কেমন ক'রে, কে জানে। তাছাড়া বিশাল পাম্পা যেন কেমন ভেজা-ভেজা স্যাঁৎসেঁতে ঠেকছিলো গোড়া থেকেই। মাঝে-মাঝে জল জ'মে আছে—জলাশয় নয়, অথচ মাটি একটু ঢালু হ'লেই কেমন যেন জল আটকে গেছে। আস্ত জায়গাটাই যেন একটা প্রকাণ্ড জলাভূমিতে পরিণত হ'য়ে গেছে। আর এ-সব হঠাৎ-গজানো জলাভূমি যে বেশ-বিপজ্জনক তার প্রমাণও পাওয়া গেলো এক জায়গায় : মাটির মধ্য থেকে গাছের গুঁড়ির মতো উঠে আছে রাশি-রাশি শিং : অর্থাৎ এই জলাভূমি আবার কোথাও-কোথাও চোরাবালিতেও ভর্তি : নিশ্চয়ই একদঙ্গল ষাঁড় এখান দিয়ে যাবার সময় চোরাবালিতে ডুবে গিয়েছে : শুধু তাদের শিংগুলোই জানান দিচ্ছে কীভাবে এই অনিচ্ছুক বুনো ষাঁড়গুলোকে জীবন্ত সমাধি মেনে নিতে হয়েছে। না কি এর পেছনে অন্যকোনো কারণ আছে?

এই শিংগুলো দেখবার পর থেকেই সবাই কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়েছে। এমনকী ত্রোনিদো অব্দি গুম হ'য়ে আছে, যেন ভারি উদ্বিগ্ন। মাঝে-মাঝে এদিক-ওদিক ডানদিকে বামদিকে ছুটে-ছুটে যাচ্ছে, ঘাড় উঁচিয়ে কী-সব লক্ষ করবার চেষ্টা করছে, কপালে ভাঁজ আর ভ্রূকুটি। শেষটায় সে একসময় পাঞ্চয়লকেই খুলে বললে তার দুশ্চিন্তার কারণ। এ-তল্লাটে এ-সময়টায় সাধারণত অত ডোবা, পুকুর বা জলা থাকে না। এখন পর-পর শুধু এ-সব ছোটোখাটো জলাই বা চোখে পড়ছে কেন?

রাত কাটাবার জন্যে সবাই মিলে আশ্রয় নিয়েছিলো একটা ফাঁকা, পরিত্যক্ত র‍্যানচে! সারাদিন পথচলার ধকল গেছে। তার ওপর মাথার মধ্যে যদি সারাক্ষণ কোনো অজানা বিপদের আশঙ্কা হানা দিয়ে ঘুরে বেড়ায় তাহ'লেও খুব কাহিল লাগে। খেয়ে-দেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ঘুম ভাঙলো তুমুল বৃষ্টির জন্যে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, যেন মহাপ্লাবনের আগের রাত। ঘোড়াগুলো কেমন যেন দাপাচ্ছিলো, অনবরত পা ঠুকছিলো। অর্থাৎ কোনো কারণে তারা ভারি অস্থির হ'য়ে পড়েছে, এই ভোররাত্তিরে বৃষ্টি মাথায় ক'রেই বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছে। এরাও নিশ্চয়ই আগে থেকেই বিপদের গন্ধ পায়—নইলে হঠাৎ এমনভাবে পা ঠুকবে কেন অস্থির আর দামাল!

ত্রোনিদো সব্বাইকে জানালে, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে—লক্ষণ খুব-একটা সুবিধের ঠেকছে না।

ঐ ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই দলটা বেরিয়ে পড়লো। পথে এর মধ্যেই জল জ'মে যেতে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুরু করেছে, ঘোড়ার খুর ডুবে যাচ্ছে জলে, কিন্তু তবু তারা নিজে থেকেই, কেউ চেতিয়ে না-দিলেও, তীব্রবেগে ছুটে চলেছে উত্তরে।

আর তাদের এই তাড়ার কারণটা—চোখে না-পড়লেও—কানে শোনা গেলো পরক্ষণেই। পেছন থেকে কানে ভেসে এলো গভীর গম্ভীর গুমগুম শব্দ, যেন কোথাও বাজ গড়িয়ে যাচ্ছে। আর তারই সঙ্গে-সঙ্গে দলে-দলে ছুটে এলো কতরকম জীবজন্তু, জলে ছপছপ ক'রে ছুটে চলেছে তারা, খাদ্য-খাদকেও এখন কোনো ভেদাভেদ নেই, সবাই যেন কোনো-এক বিষম ভয়ে একসঙ্গে এখন ছুটে পালাচ্ছে নিরাপত্তার সন্ধানে। শুধু যে ডাঙার জীবজন্তু তা-ই নয়, মাথার ওপর দিয়ে আর্ত সুরে ডাকতে-ডাকতে উড়ে চলেছে কত-রকম পাখি।

ঘোড়াগুলো তীব্রগতিতে ছুটেছে উত্তরদিকে—ঐ জন্তুদের মতোই। এখন একটু ভাববারও ফুরসৎ নেই। যে-হারে পথে জল বাড়ছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে এ-নিছকই বাদলার জল নয়, আরো-বেশিকিছু আছে সেইসঙ্গে। নিশ্চয়ই কূল ছাপিয়ে ছুটে আসছে নদী—বান ডেকেছে, ঝলকবান, চমকবান, হয়তো বাঁধও ভেঙেছে। হূ-হু ক'রে জল বেড়ে যাচ্ছে। ঘোড়াগুলো এবার যেন সাঁৎরে পেরুচ্ছে, কদম-কদম ছুটতে পারছে না আর।

প্রায় শো-খানেক গজ দূরে ছিলো মস্ত-একটা আখরোটগাছ, আর তার ওপর এসে যখন আছড়ে পড়লো বানের জল, প্রায় তার আদ্ধেকটা ডুবিয়ে দিয়েই, তখনই বোঝা গেলো এই অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত বিপদ কতটা ভয়াবহ। ঘোড়াগুলো ভেসেই গেলো, ছিটকে পড়লো আরোহীরা জলে; শুধু ত্রোনিদোর ওস্তাদ ঘোড়াটাই জলের সঙ্গে অনবরত যুঝে চলেছে, আর তার কেশর ধ'রে ভেসে চলেছে রবার্ট, আর পাওয়লের জামার কলার ধ'রে সাঁৎরে চলেছেন লর্ড গ্লেনারভন। পাওয়ল কিছু-একটা বলবার জন্যে মুখ খুলেছিলেন, সম্ভবত বলতে চাচ্ছিলেন, 'ভয় কী—ঘাবড়াবেন না—আমি তো আছি সঙ্গে।' কিন্তু মুখে একরাশ খ্যাপাজল ঢুকে যাওয়ায় আশ্বাস দেবার বদলে শুধু খাবিই খেলেন, আরেকটু হ'লেই হয়তো বেকায়দায় জল ঢুকে যেতো গলায়।

আখরোটগাছটার কাছে এসে ত্রোনিদো এক-এক ক'রে সবাইকে গাছের ডালে তুলে দিলে। নিচে, ফেনিয়ে, চর্কি দিয়ে জল ছুটছে, আর ত্রোনিদোর ঘোড়া এইবার সেই জলের তোড়ে কাবু হ'য়ে ভেসে গেলো উত্তরে। তা-ই দেখে আর একমুহূর্তও সবুর করেনি ত্রোনিদো, সোজা ফের গাছের ডাল ছেড়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঐ খ্যাপাজলে, প্রাণপণে সাঁতার কেটে গিয়ে নাগাল ধরেছে তার ঘোড়ার, আঁকড়ে ধরেছে তার গলা, আর পরক্ষণেই ঘূর্ণিতোলা খ্যাপাজল ঘোড়া আর মানুষ দুজনকেই ভাসিয়ে নিয়ে গেছে দূরে, উত্তরে।

সেই মেঘলা ভোরবেলায় সবাই ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে-তাকিয়ে শুধু দেখলেন ত্রোনিদোর ভেসে-যাওয়া। এখন তাঁদের কোনো বাহন নেই, পথপ্রদর্শক নেই, তল্পিতল্পা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই, ঠাণ্ডাও লাগছে একটু, এই অচেনা বিদেশ-বিজনে এসেই কি তবে শেষকালে এমনভাবে তাঁদের অভিযান শেষ হ'য়ে গেলো? কাপ্তেন গ্রাণ্টের কোনো সন্ধান তো পাওয়াই গেলো না, এখন উলটে তাঁরা নিজেরা এসে পড়েছেন বিষম বিপদের মাঝখানে, এই তালঢ্যাঙা গাছটার মগডালের কাছে, আর নিচে খ্যাপাজল থৈ-থৈ করছে, ফেনিয়ে চর্কি দিয়ে ছুটছে।

ভাগ্যিশ গাছটা প্রায় একশোফিট উঁচু, আর তার গুঁড়িটাও প্রকাণ্ড—আর ডালপালাগুলো প্রায় ছাতার মতো ছড়িয়ে আছে—অনেকখানি জায়গা জুড়ে, শূন্যে। তার জটিল ঝুরি আর শেকড় মাটির তলায় অনেকটা ছড়িয়ে জড়িয়ে-মড়িয়ে আছে ব'লেই বাঁচোয়া, নইলে এ-গাছটাও কখন বানের ধাক্কায় ভেঙে পড়তো! এখনও যে উপড়ে পড়েনি, তা হয়তো এইজন্যেই যে গাছটা অনেককালের পুরোনো আর প্রকাণ্ড—হয়তো এককালে কোনাকিস্তাদোররা এখানে যে-তাণ্ডব চালিয়েছিলো তারও সে সাক্ষী।

নিচে খ্যাপাজল যেভাবে থৈ-থৈ করছে, তাতে মনেই হ'তে পারতো, এ বুঝি বানের জল নয়, সমুদ্রেরই কোনো খাঁড়ি। এত-বড়ো গাছটা পর্যন্ত জলের ধাক্কায় থরথর ক'রে কাঁপছে। নিচে, জলে ভেসে যাচ্ছে র‍্যানচের ছাদ, ওপড়ানো গাছপালা, মরা জীবজন্তু। ভেলার মতো ভেসে যাচ্ছিলো একটা গাছ—তার ওপর আশ্রয় নিয়েছে কত-যে জাগুয়ার, এখন আর তাদের গরগর আওয়াজে হিংস্র আক্রোশ নেই, বরং সে-আওয়াজ এখন কেমন যেন কাহিল, ক্ষীণ, আর্ত।

লর্ড গ্লেনারভন বেশ-কিছুক্ষণ লক্ষ ক'রে এই সিদ্ধান্তে এলেন, জল এখানে বেশ গভীর বটে, আর তোড়ও ভয়ংকর, তবে জল আর বাড়ছে না—অর্থাৎ বন্যার প্রথম ধাক্কায় যা হবার হ'য়ে গিয়েছে, এরপর আর যদি বৃষ্টি না-পড়ে তবে এ-জল বাড়বার আর সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এ-জায়গাটা একটা ডেকচির মতো ঢালু—দু-পাশে উঁচু জমি, মাঝখানে এই ঢাল, সেইজন্যেই জল এখানে অত গভীর, তাছাড়া জল যদি আর নাও বাড়ে, এই জল সরতে অনেক সময় লেগে যাবে। অর্থাৎ এই গাছকে আশ্রয় ক'রে তাঁদের যে কতটা সময় কাটাতে হবে কে জানে!

হিশেব ক'রে লর্ড গ্লেনারভন যতটা বুঝতে পেরেছেন, তাতে মনে হচ্ছে অ্যাটলান্টিক এখান থেকে আর মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে। মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে *ডানকান* তাঁদের অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছে। কিন্তু শুধু-যে এই চল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করা এখন একেবারেই অসম্ভব তা-ই নয়, *ডানকানেও* কোনো খবর পাঠাবার কোনো উপায় নেই।

তার ওপর এখন, *এক্ষুনি*, আরো-একটা সমস্যার সমাধান করা জরুরি। সেটা হচ্ছে খাবার।

মেজর ম্যাকন্যাব্‌স জলে জবজবে-ভেজা ব্যাগ তুলে দেখালেন। তাতে যা খাবার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে, তাতে হয়তো দিন-দুই চ'লে যাবে। কিন্তু তারপর? এ-জল যে কবে নামবে, কে জানে। দু-দিন পরে তাঁদের খাদ্যের সমস্যা মিটবে কী ক'রে?

লর্ড গ্লেনারভন বললেন, 'গাছে তো বেশ ক-টা পাখির বাসা আছে দেখছি। বড়ো পাখিগুলো পালিয়েছে বটে, তবে তাদের ছানাপোনাগুলো আছে, ডিমও আছে। তাতেও নিশ্চয়ই কয়েকটা দিন চ'লে যাবে।'

'তাহ'লেও গোড়া থেকেই আমাদের সাবধান হ'য়ে খাবার খরচ করতে হবে—র‍্যাশন ক'রে দেয়া ছাড়া উপায় নেই,' মেজর ম্যাকন্যাব্‌স বললেন। 'তবে ত্রোনিদো জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে একটা মস্ত উপকার ক'রে গেছে। তাতে হয়তো একটু সুরাহা হবে—'

'কী?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন লর্ড গ্লেনারভন।

'এই-যে, গুলিভর্তি এই ম্যাগাজিনটা সে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে গেছে—আর এটা জলে ভেজেনি।'

'চমৎকার। তাছাড়া আমাদের দুজনের কাছেই তো রিভলভার আছে?'

'হ্যাঁ। এবার জলটা নামলেই হয়।'

পাঞ্চয়ল একবার নাক সিঁটকোলেন। 'খাবার যা আছে, তা তো কাঁচা। রান্না না-ক'রে খেলেই তো দফারফা হবে—অসুখবিসুখ বাঁধিয়ে বসবো সবাই।'

'কাঁচা খাবার খাবেন কেন? ঝলসে নিলেই হবে?'

'ঝলসে যে নেবেন, আগুন জ্বালবেন কী ক'রে?'

'ধৈর্য ধ'রে একটু অপেক্ষা করুন, এক্ষুনি নিজের চোখেই রন্ধনপ্রক্রিয়া দেখতে পাবেন।'

মগডাল থেকে বেছে-বেছে অপেক্ষাকৃত শুকনো পাতা জড়ো করা হ'লো নিচের ডালে। বৃষ্টিধোয়া ফটফটে আকাশে ততক্ষণে সূর্য উঠেছে—বৃষ্টি ধরতেই মেঘও স'রে গেছে। এখন দেখে কে বলবে যে কাল রাতে এই আকাশই অমন-একটা দুর্যোগ তৈরি করেছিলো। দুরবিনের পরকলার মধ্যে ধরা হ'লো রোদ্দুর, সূর্যের রশ্মি, পরক্ষণেই নিচের ডালের শুকনো পাতায় আগুন ধ'রে গেলো।

প্রথম কাজ তো কোনোরকমে এই আগুনের আঁচে ভেজা জামাকাপড় শুকিয়ে নেয়া। তারপর খাবারগুলো ঝলসে নিয়ে বেশ হিশেব ক'রেই খেয়ে নিলে সবাই। আর জঠরানল প্রশমিত হ'তেই পাঞ্চয়ল দুরবিনটা হাতে ক'রে উঠে পড়লেন মগডালে, সেটা নাকি তাঁর *অবজারভেটরি*, মানমন্দির, সেখান থেকে তিনি এখন দিগন্ত পর্যবেক্ষণ করবেন।

কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো হদিশই তো এই নূতন জগতে পাওয়া গেলো না—এখন তাহ'লে তাঁরা তাঁর খোঁজে আর-কোথায় যাবেন?

নিচের ডালে ব'সে এই নিয়েই বলাবলি করছিলেন তাঁরা।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজর ম্যাকন্যাব্‌সের সুচিন্তিত অভিমত : 'সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তর ধ'রেই না-হয় বরাবর যাওয়া যাক—তবে পথে কী পড়বে সেটাও জানা দরকার—'

'তাহ'লে মঁসিয় পাঞ্চয়লকে জিগেস করা যাক—'

মঁসিয় পাঞ্চয়ল তখন মগডালে ব'সে দুরবিনে চোখ এঁটে আছেন। সেখান থেকেই তিনি হেঁকে বললেন—'সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তরে কী আছে? সেটা বলবার জন্যে নিচে নামবার কোনোই দরকার নেই। সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তর আমেরিকা থেকে বেরিয়ে অ্যাটলান্টিকের ওপর দিয়ে ত্রিস্তান ডা কুনিয়া দ্বীপটা পেরিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপের দু-ডিগ্রি দক্ষিণ দিয়ে ভারত মহাসাগরে আমস্টারডাম দ্বীপ আর সেন্ট পল্‌স দ্বীপের পাশ পেরিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টরিয়া রাজ্যের মাথার ওপর দিয়ে—'

আস্ত ভূগোলবই আওড়াতে গিয়ে মাঝপথেই থেমে গেলেন পাঞ্চয়ল।

অ্যাঁ? কী ব্যাপার? ভৌগোলিক কি তবে জ্ঞান হারিয়ে বাক্যহারা?

না তো। কেননা পরক্ষণেই শোনা গেছে বিষম-একটা বিদঘুটে চীৎকার। তারপরেই দুমদাম আওয়াজ ক'রে কী যেন আছাড় খেয়ে পড়তে লাগলো ঐ মগডাল থেকে।

সাড়ে-সর্বনাশ! এ আবার কী? হাত ফসকে প'ড়ে যাচ্ছেন নাকি জাক পাঞ্চয়ল? মেজর ম্যাকন্যাবস যদি হাত বাড়িয়ে ধ'রে না-ফেলতেন তবে সত্যিই জলে প'ড়ে যেতেন পাঞ্চয়ল : তিনি তখন ডিগবাজি খেতে-খেতে মগডাল থেকে নিচে আছড়ে পড়ছিলেন।

'কী ব্যাপার, বলুন তো? ফের বুঝি ভুলে গিয়েছিলেন কোথায় আছেন?

'ঠিক তাই। ভুলবো না? নিজের আহাম্মুকিতে আমি যে নিজেই জ্ঞানগম্যি হারিয়ে ফেলেছিলুম!'

পাঞ্চয়ল সত্যি আহাম্মক কি না, সে নিয়ে একটা তর্ক তোলাই যায়। তবে অকস্মাৎ তাঁর এই আত্মজ্ঞান লাভের কারণ কী?

'ভাবুন একবার! কাপ্তেন গ্রাণ্টকে আমরা কি না এমন জায়গায় ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি যেখানে তিনি নেই—আদপেই তিনি এ-তল্লাটে আসেননি। কস্মিনকালেও না!'

পাঞ্চয়ল কি তবে এত বিপদ-আপদে সত্যি সব জ্ঞানগম্যি হারিয়ে ফেলেছেন? মাথাটাই বিলকুল গেছে নাকি? এ আবার কেমনতর কথা?

কিন্তু পাঞ্চয়লের মাথার পোকা নতুন ক'রে আর তাঁকে কামড়ায়নি—তিনি যেমন ছিলেন, তেমনি আছেন। সোজাসুজি স্পষ্ট গলায় তিনি ঘোষণা করলেন : 'মুশকিল আসানের ঐ তিন তলবটা আমরা সবাই তিন-তিনবার ভুল পড়েছি। *Austral* একটা গোটা শব্দ নয়—*Australia* শব্দটার ভগ্নাংশ—জলে ঐ *i* আর *a* মুছে গিয়েছে—'

গ্লেনারভন আপত্তি তুললেন। 'ভুল পড়বো কেন? অস্টেলিয়া তো আসলে একটা দ্বীপই—'

'আপনারা কী বলেন, তাতে কিছু এসে-যায় না। ভৌগোলিক মাত্রেই বলবে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্ট্রেলিয়া আস্ত-একটা মহাদেশ।'

'তাই বুঝি ?' পাঞ্জয়লের বক্তৃতাটা সবে শুরু হ'তে যাচ্ছিলো, গ্লেনারভন সেটা চট ক'রে থামিয়ে দিলেন। 'বেশ, তাহ'লে এবার অস্ট্রেলিয়াতেই যাওয়া যাক।' ব্বাস, একটি মোক্ষম কথাতেই সব আলোচনা খতম।

আলোচনা খতম বটে, কিন্তু বলবামাত্রই কি আর যাওয়া যায় ? *ডানকান* এখন কোথায় ? আরো চল্লিশ মাইল পথ যেতে হবে যে—আর তাও যাওয়া যাবে না, যতক্ষণ এখানে জল থৈ-থৈ করবে।

তখন বেলা প'ড়ে এসেছে। চারটে বাজে।

রবার্ট এতক্ষণ মনমরা হ'য়ে বসেছিলো, কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো হদিশ না-পেয়ে বেচারার মুখ দিয়ে একটাও কথা সরছিলো না। এবার যেই পাঞ্জয়লের মুখ থেকে অস্ট্রেলিয়ার কথা বেরুলো, অমনি আবার নতুন উৎসাহের সঞ্চারে সে একেবারে ডগমগ হ'য়ে উঠলো। সব আশা তাহ'লে এখনও শেষ হ'য়ে যায়নি। চাঙ্গা হ'য়ে সে লাফিয়ে উঠে পড়লো—এই একটা-গাছ-দিয়েই-তৈরি *জঙ্গলটায়* এবার সে শিকারে গেলো—মেরে নিয়ে এলো গোটা-কয় ছোটো পাখি। সেইসঙ্গে পাখির বাসা থেকে হাতসাফাই ক'রে আনলে বেশ-কিছু ডিম। ছুঁচ আর সুতো দিয়ে বঁড়শি বানিয়ে কিছু মাছও ধরা হ'লো জল থেকে।

রসুইখানার ভার এবার জাক পাঞ্জয়ল নিজের কাঁধেই তুলে নিলেন। কে না জানে ফরাশিরা রান্নায় ওস্তাদ। আর তিনি তো আপাদমস্তক ফরাশি একজন—না, কি ? রান্নার বাসনকোশন নানাবিধ ফোড়নের মশলা এ-সব বিনাই সেদিন সন্ধেয় তিনি যা-একখানা উপাদেয় ভোজ রাঁধলেন —অথবা, বলা যায়, পাতায় মুড়ে ঝলসালেন—আর তার এমনই তার যে তা যেন সকলেরই মুখে লেগে রইলো।

জল না-কমা অব্দি এই গাছের মধ্যেই কাটাতে হবে তাঁদের। ভ্যাপসা গরম পড়েছে, দারুণ গুমোট, আকাশে ঝুলে আছে থমথমে ভারি মেঘ, এত নিচু যেন এই গাছের ডগাটাই ছোঁয়। হাঁসফাঁস করতে-করতে তারই মধ্যে চলেছে আড্ডা, গল্পগুজব, পাঞ্জয়লের দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা। যে-কোনো বিষয় পেলেই হ'লো : প্রায় সবজান্তার ভঙ্গিতেই পাঞ্জয়ল সেই বিষয় নিয়ে সাতকাহন শুনিয়ে দিতে পারেন।

সন্ধের সময় কিন্তু ঐ নিচু ভারি মেঘ স'রে গেলো, আর আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ফুটফুটে আকাশ, যেখানে অগুনতি তারা ঝকমক করছে। সেইসঙ্গে গুমোটের ভাবটা কেটে গিয়ে ফুরফুরে একটু হাওয়াও দিচ্ছে। গাছের ডালের বাসায় জাঁকিয়ে ব'সে রবার্টকে এবার পাঞ্জয়ল তারাদের নিয়েই মস্ত-একটা বক্তৃতা ফেঁদে শোনালেন। পাতাগোনিয়ার কবিদের কল্পনায় অরিয়ন নক্ষত্র রূপ নিয়েছে তিনটে বোলাস আর একটা ল্যাসোর। কেউ যেন তাদের মহাশূন্যে ছুঁড়ে দিয়েছে গোটা-কয় তারাকে পাকড়াবার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে। অর্থাৎ মাটির শিকার সরাসরি কবিকল্পনায় উঠে গিয়েছে আকাশে।

পাঞ্চয়লের বক্তৃতা যখন জ'মে উঠেছে—রসিকতা, টীকা-টিপ্পনীসমেত—এমন সময় হঠাৎ পুবদিকে দিগন্তের কাছে কালো একটা ফুটকির মতো কী দেখা গেলো, সেটা একটু বাদেই বড়ো হ'য়ে যেন মাটির একটা ঢেলা হ'যে উঠেছে। একটু-একটু ক'রে এগিয়ে এসে সে ঝিকমিক-ঝিকমিক তারাদের ঢেকে দিতে গেলো। আর তারই সঙ্গে তাল রেখেই যেন ঐ ফুরফুরে হাওয়াটাও ম'রে গেলো। আবার কী-রকম থমথমে গুমোটে সবকিছু হাঁসফাঁস করতে লাগলো। নিচে বানের জল থম মেরে আছে। যেন একটা গেরিমাটির আয়নার উপরিতল।

কেউ কোনো মন্তব্য করার আগেই, নক্ষত্রতত্ত্বের প্রসঙ্গে পালটে ফেলে, পাঞ্চয়ল ব'লে উঠলেন : 'লক্ষণ মোটেই ভালো না। সাংঘাতিক একটা বজ্রবিদ্যুতে ভরা ঝড় আসছে। প্রচণ্ড-সব বাজ পড়বে পর-পর। আর আমাদের দশাও তাতে সঙিন হ'য়ে উঠবে—কেননা এদিকটায় তো গাছ বলতে আমাদের এটাই—আর সব গাছকেই তো বন্যার জল উপড়ে ফেলেছে। এ-গাছটার ওপর বাজ না-পড়লেই হয়!'

পাঞ্চয়ল যেন কোনো গানের আসরের কনডাকটার। তাঁর কথাই যেন ছিলো ইঙ্গিত। তাঁর কথা শেষ হ'তে-না-হ'তেই শুরু হ'য়ে গেলো গুমগুম আওয়াজ, আর সেইসঙ্গে জলের ওপর হঠাৎ দেখা দিলে অগুনতি আলোর ফোঁটা। ফসফর নাকি?

পাঞ্চয়ল ঝুঁকে ফস ক'রে হাত বাড়িয়ে জল থেকে টপ ক'রে একটা আলোর ফোঁটা ধ'রে ফেললেন। 'এ-যে দেখছি *তুকো-তুকো*!'

'তুকো-তুকো মানে? জোনাকি?'

'হ্যাঁ, জোনাকিও বলতে পারো—তবে এদের ভাষায় এই ফসফর-পোকা হ'লো জ্যান্তহিরে। এই দ্যাখো, লম্বায় প্রায় ইঞ্চিটাক। এখানকার মেয়েরা এদের ধ'রে-ধ'রে মালা গাঁথে, গলায় পরে, খোঁপায় গোঁজে।'

ফসফরের আলোয় পাঞ্চয়লের হাতের ঘড়িতে দেখা গেলো রাত বাজে দশটা।

যেন দিনক্ষণ দেখেই তক্ষুনি ঝড়টা ফেটে পড়লো। আকাশ চিরে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ, ঘন-ঘন, যেন আগুনের ল্যাসো ছুঁড়ে-ছুঁড়ে কেউ আস্ত আকাশটাকেই পাকড়াবার চেষ্টা করছে। আর তারই সঙ্গে তাল রেখেই গুমগুমগুম ক'রে গড়িয়ে যাচ্ছে বাজ। আর সেইসঙ্গে নামলো মুষলধারে বৃষ্টি। সে কী বৃষ্টি—কী বড়ো-বড়ো ফোঁটা, যেন গায়ে এসে বেঁধে। কুঁকড়িমুকড়ি হ'য়ে পাতার আড়ালে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করলেন সবাই, কিন্তু তাতেও কি আর এই মুষলধারে বর্ষণের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়?

সবে সবাই পাতার ঘন বুনোনের আড়ালে গুটিশুটি হ'য়ে বসেছে, এমন সময় আকাশের আগুন নেমে এলো গাছটাতেই। প্রথমে যেন বিদ্যুতের একটা গোলা ছোটাছুটি করলে ডাল থেকে ডালে, আর ভেজা পাতায় আগুন লেগে উঠলো কালোধোঁয়ার কুণ্ডলি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর বার-কয়েক চর্কিপাক খেয়ে সেই বিদ্যুতের গোলাটা প্রচণ্ড আওয়াজ ক'রে ফেটে গেলো—আওয়াজটা এত-জোরে আর এত-কাছে হ'লো যে মনে হ'লো গোলাটা ঠিক যেন মাথার মধ্যে ফেটেছে। বোঁ ক'রে ঘুরে-ওঠা মাথার হকচকানো দশা ক'মে যাবার আগেই দেখা গেলো, পাঞয়ল যে-ভয় করেছিলেন, তা-ই হয়েছে : গাছে আগুন ধ'রে গিয়েছে। আগুন যেন লাফিয়ে-লাফিয়ে নামছে ডাল থেকে ডালে, পুড়ে যাচ্ছে শুকনো পাতা, ডালপালা, পাখির বাসা—সবকিছু।

ভয় পেয়ে সবাই স'রে এলেন আগুনের কাছ থেকে, পুবদিকে।

এবার আর কারু রেহাই নেই।

নিচে বানের জলে ঘূর্ণি লেগেছে, ওপরে আগুন জ্বলছে লেলিহান।

উইলিয়ামের গায়ে আগুনের হলকা ছ্যাঁকা দিতেই সে লাফিয়ে নেমে পড়েছিলো জলে। কিন্তু পরক্ষণেই সবকিছু ছাপিয়ে ভেসে এলো তার কানফাটানো চীৎকার : 'অ্যালিগেটর! অ্যালিগেটর!'

কুমিরের ভয়াল দোসর এই অ্যালিগেটরদের এ-দেশে কে না ভয় পায়? গাছের তলায় বেশ কয়েকটা—দশ-বারোটা হবে বোধহয়—অ্যালিগেটর জলের মধ্যে গা ভাসিয়ে আছে—ওৎ পেতেই আছে—কখন তাদের খাদ্য টুপ ক'রে খ'সে পড়ে গাছ থেকে, সেই অপেক্ষাতেই আছে।

হঠাৎ দক্ষিণদিক থেকে এলো পাহাড়প্রমাণ একটা মস্ত ঢেউ, আর এত ধকল সামলাবার পর, এতক্ষণে এই-এতবড়ো গাছটা মড়মড় ক'রে উপড়ে গেলো। জলে পড়তেই আগুন নিভে গেলো, অ্যালিগেটরগুলোও ছিটকে গেলো একপাশে, শুধু একটা একটু তেড়িবেড়ি ক'রে ধেয়ে এসেছিলো, শেষে জ্বলন্ত ডালটা তুলে একজন নাবিক তার গায়ে গায়ের জোরে হাঁকাতেই অ্যালিগেটরটা ছিটকে পড়লো জলে, আর তার ল্যাজের আছড়ানিতে যেন জলে হুলুস্থুল বেধে গেলো—যদি অবশ্য হুলুস্থুলের তখনও কিছু বাকি থেকে থাকে।

এই এতবড়ো গাছটাই এখন তাঁদের ভেলা। হাওয়ার দাপটে এই মস্ত বিশাল বেনোজলের ওপর দিয়ে ভেসে চললো গাছটা—কতক্ষণ কে জানে—অন্তত ঝলসে মরার ভয় নেই—এখন কোনোক্রমে শুকনো ডাঙায় গিয়ে পৌঁছুতে পারলে হয়।

তারপর একসময় বৃষ্টিও ধ'রে এলো, সেই মুষলধারের বদলে এখন মিহি ফিনফিনে বৃষ্টির একটা পর্দা ঝাপসা ক'রে রেখেছে সব। আখরোটগাছের ভেলা ভেসেই চলেছে।

শেষরাতের দিকে, তখন সম্ভবত তিনটে বাজে, ভেলাটা যেন মাটির গায়ে ধাক্কা খেলে। তারপরেই ঘষটে-ঘষটে চললো কিছুক্ষণ, প্রায় কুড়িপঁচিশ মিনিট বাদে ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেলো এই অদ্ভুত ভেলাটা।

ফুর্তিটা সবচেয়ে বেশি পাঞয়লেরই। 'মাটি! মাটি!'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুড়দাড় ক'রে সবাই লাফিয়ে নামলে মাটিতে। আর নেমেই—এ কী তাজ্জব দৃশ্য! সামনেই দাঁড়িয়ে ত্রোনিদো, আর তার পাশে দাঁড়িয়ে তার ঘোড়া ক্ষুর ঠুকছে।

ত্রোনিদো পাঞ্চয়লের ঠিক উলটো—সাত চড়েও রা কাড়তে চায় না। তবু দু-চার কথায় সে যা বললে তার সারাংশ হ'লো, বেনোজলের তোড়ে সবাই একসময়-না-একসময় যে এদিকটাতেই ভেসে আসবে, তা সে আন্দাজ করেছিলো। তাই একটা পরিত্যক্ত র‍্যানচে সে সকলের জন্যে খাবার ব্যবস্থা ক'রে রেখে এসেছে।

সেখানেই বাকি রাতটা কাটিয়ে দিলে সবাই। সকাল হ'লেই ফের রওনা হ'তে হবে অ্যাটলান্টিকের পানে।

অ্যাটলান্টিকের তীরে এসে পরদিন যখন পৌঁছুনো গেলো, তখন রাত ক'রে এসেছে, জোর হাওয়া দিচ্ছে, হয়তো আরো-একখানা ঝড়েরই পূর্বাভাস। তীরে *ডানকান* নেই। সে ভাসছে ডাঙা থেকে দূরে, জলের ওপর। তীরে যে নেই, তার কারণ ঝড়ের প্রকোপে ডাঙায় ঘা ঘেয়ে *ডানকান* বেদম জখম হ'য়ে যেতে পারে, তাই *সাবধানের মার নেই* ভেবে তাকে বারদরিয়ার কাছে নিয়ে-যাওয়া হয়েছে।

অর্থাৎ আজ রাতটা তীরেই তাঁদের কাটিয়ে দিতে হবে, ঐ চড়ায়।

অ্যাটলান্টিকে পৌঁছে গেছে, ঐ-যে দূরে ছায়ার মতো *ডানকানকে* দেখা যাচ্ছে, এ-কথা ভেবে অন্যদের মনে যতই স্বস্তির ভাব দেখা দিক, লর্ড গ্লেনারভনের মনে কিন্তু একফোঁটাও স্বস্তি নেই—তিনি সারারাত ছটফট ক'রেই কাটালেন। দক্ষিণ আমেরিকায় পা দেবার পর থেকেই পর-পর যত অপ্রত্যাশিত ঘটনার আবর্তে তাঁরা পাক খেয়েছেন, তাতে *ডানকানে* পা না-দেয়া অব্দি তিনি মোটেই স্বস্তি পাবেন না। আবার অতর্কিতে কোনদিক থেকে কী বিপদ আসে কে জানে!

ভোরের আলো ফুটতেই কিন্তু স্পষ্ট দেখা গেলো *ডানকানকে।* আর দেখেই আকাশ লক্ষ্য ক'রে পর-পর তিনবার বন্দুক ছুঁড়লো ত্রোনিদো—সংকেত। আর তারপরেই *ডানকানের* ডেক থেকে তোপের আওয়াজ এলো—কামান দেগে সংকেতের উত্তর দিচ্ছে। পরক্ষণেই *ডানকান* থেকে ভাসিয়ে দেয়া হ'লো একটা নৌকো।

ত্রোনিদো কিছুতেই তার স্বদেশ ছেড়ে যাবে না—সে এই আরহেনতিনাতেই থাকবে। ত্রোনিদো ছাড়া আর-সবাই উঠে পড়লেন *ডানকানের* নৌকোয়। শুধু রবার্ট নৌকোয় গিয়ে ওঠবার আগে ত্রোনিদো একবার তার হাত চেপে ধরলো। অস্ফুট স্বরে বললে, 'আর তুমি কিশোর নও এখন, বড়ো হ'য়ে গেছো!'

নৌকো যতক্ষণ-না অভিযাত্রীদের নিয়ে গিয়ে *ডানকানে* ভিড়লো, ত্রোনিদো পাষাণমূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিলো তীরে। সবাই একে-একে *ডানকানে* উঠে যেতেই, সে তার তেজি ঘোড়াটার পিঠে লাফিয়ে উঠলো, তারপর *ডানকানের* দিক থেকে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সবেগে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে হয়তো পাম্পারই উদ্দেশে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বি তী য়

# নিরুদ্দিষ্টের সন্ধানে

## এক

## stra মানে কি *Australia*?

পুরো রাস্তাটা যে সবাই মিলে হন্যে হ'য়ে, সব বিপদ-আপদ মাথায় ক'রে, ছুটে বেড়িয়েছেন, সবটাই কি না মিথ্যেমিথ্যি, শুধু-একটা বুনোহাঁসের পেছনে ছোটাই যেন সার হ'লো!

কোথায় দক্ষিণ আমেরিকা, আর কোনখানেই বা মহাদেশ অস্ট্রেলিয়া! কোথায় যেতে গিয়ে কোন্‌খানে! আর সব কি না *গুপ্তলিপিটা* ভুল প'ড়ে! শুধু বর্ণপরিচয় থাকলেই তো হয় না, সব সংকেতের গোপন অর্থটা বার করবার মতো বুদ্ধি বা এলেমও থাকা চাই! এমনিতেই তো যে-কোনো হেঁয়ালির জট খুলতে চাওয়ার ব্যাপারটাই কঠিন—তার ওপর *মুশকিল আসানের এই-যে তিন-তিনটে তলব* নানা ভাষায় পাওয়া গেছে তার অনেক হরফই তো জলে ধুয়ে-মুছে উধাও হ'য়ে গেছে! প্রথমত অসম্পূর্ণ শব্দগুলো —( অসম্পূর্ণ তো ছিলো না, জলই তাদের খেয়ে গেছে )—ঠিকঠাক পূরণ করতে হবে, না-হ'লে আর ধরা যাবে কী ক'রে, কাপ্তেন গ্রাণ্ট সত্যি-সত্যি কোন্ হদিশ দিয়ে সাহায্য চেয়েছিলেন!

মঁসিয় পাঞ্চয়ল অপ্রতিরোধ্য : *এত-সহজে* যদি দ'মে যাবার পাত্র হ'তেন তাহ'লে এই ক্রমবর্ধমান জগৎটির হাল-হকিকৎ সম্বন্ধে এত-বড়ো একজন বিশারদ তিনি হ'য়ে উঠতেন কী ক'রে? *অতএব*, আবারও তিনি নতুন ক'রে আদ্যোপান্ত লিখে ফেলেছেন এই *ক্রিপ্টোগ্রামের* অর্থ, তবে ক্রিপ্টোগ্রামটি হয়তো কোনোকালেই ক্রিপ্টোগ্রাম হ'তে চায়নি, এই বোতলে-ভাসানো চিঠি তো আসলে ছিলো সাহায্য পাবার, উদ্ধার হবার ব্যাকুল অনুরোধ, শুধু জল এসে কিছু কথা মুছে দিয়েছে ব'লেই এখন হয়তো তাকে মনে হচ্ছে *ক্রিপ্টোগ্রাম বা গুপ্তলিপি*, প্রতিবার নতুন ক'রে অভিনিবেশ দেবার পর মঁসিয় পাঞ্চয়ল প্রতিবারই যার নতুন অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন, এ যেন সেই ব্যাসকূট যা বারে-বারেই নব-নব তাৎপর্যে ভ'রে যায়। *অতএব*, এখন নতুন ক'রে এই ব্যাসকূটের মর্মোদ্ধার করার পর তাঁর হতাশ কিন্তু উৎসুক শ্রোতাদের তিনি নাটকীয় ভঙ্গিতে পুরো জবানটাই —*অন্তত তিনি যা ধরতে পেরেছেন*—প'ড়ে শোনালেন :



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৬২ সালের ৭ জুন গ্লাসগোর ত্রিমাস্তুল রণতরী *ব্রিটানিয়া* অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে সলিল সমাধি লাভ করেছে। দুজন নাবিক আর কাপ্তেন গ্রাণ্ট কোনোক্রমে মহাদেশের ডাঙায় গিয়ে উঠেছেন, এবং উঠে প'ড়েই বর্বর ও নিষ্ঠুর আদিবাসীদের পাল্লায় পড়েছেন—এখন তাঁরা তাদের হাতেই বন্দী। এই কাগজটা তাঁরা...দ্রাঘিমা এবং ৩৭°১১´ অক্ষাংশে বোতলে ক'রে ভাসিয়ে দিয়েছেন। সেখানে জাহাজডুবি হয়েছে, সেখানে সাহায্য পাঠান।

মেজর ম্যাকন্যাবস কাজের লোক, অল্পকথার মানুষ। তাঁর জীবনের সারকথা : *কথা কম কাজ বেশি*। কিন্তু এবার তাঁরও মনে হ'লো যৎকিঞ্চিৎ উচ্চবাচ্য না-করলে আবারও হয়তো আলেয়ার পেছনে ছুটতে হবে। তিনি ব'লে উঠলেন, 'সবুর ! সবুর ! একমিনিট। দুম ক'রে একেবারে অস্ট্রেলিয়া যাবার আগে আমাদের বোধহয় আরো-একটু সবকিছু তলিয়ে ভেবে দেখা উচিত। আমরা তো আগের বারে চিরকুটটার ভুল অর্থ করেছিলুম —এবার যে আবার একটা ডাহা-ভুল করছি না তা-ই বা কে জানে ! এবার বরং আরো-হুঁশিয়ার হ'য়ে আঁটঘাট বেঁধে আমাদের ঠিক ক'রে নিতে হবে—'

মেজর ম্যাকন্যাবস তাঁর কথাটা শেষ করতে পারলে তো ? তাঁর পাণ্ডিত্যের ওপর কারু কটাক্ষ সহ্য করার পাত্র অন্তত মঁসিয় পাঞ্চয়ল নন। তিনি প্রায় তিড়িংবিড়িং ক'রে জ্ব'লে উঠে তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন : 'কবুল করি, আগের বার আমার ভুল হয়েছিলো। কিন্তু ভুল তো মানুষমাত্রেই করে—আর সে-ভুল আবার শুধরেও নেয় মানুষই। শুধু যারা হাঁদার হদ্দ, তারাই পুরোনো ভুলটাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকে।'

'উঁহু-উঁহু, আমি মোটেই অত চ'টে যাবার কথা বলিনি।' কথা বলবেন ব'লে যখন স্থির করেছেন মেজর ম্যাকন্যাবস তখন তিনি কথাই বলবেন। 'অতটা মাথাগরম করার মতো কিছুই আমি বলিনি। ৩৭°১১´ অক্ষরেখা ঠিক-ঠিক কোন-কোন দেশের ওপর দিয়ে গেছে, আগে বরং সেটাই খতিয়ে দেখা যাক। আমার কথার বিনীত মর্মার্থ ছিলো এটাই।'

'এই সাঁইত্রিশ ডিগ্রি এগারো মিনিট অক্ষরেখা যেখান দিয়ে গেছে, সেখানে বেশিরভাগ জায়গাতেই আছে জল। জানেনই তো, পৃথিবীতে ডাঙার চাইতে জলের ভাগই অনেক-বেশি। এই-যে, এই দেখুন, দক্ষিণ আমেরিকার পরেই পড়ছে ত্রিস্তান ডা কুনিয়া দ্বীপটা—কিন্তু ধন্ধে-ফেলা চিরকুটটায় এই দ্বীপের কোনো নামগন্ধও নেই। ফলে তাকে আপাতত বাদ দেয়া যেতেই পারে। তারপর আসছে ভারত মহাসাগরে ওলন্দাজদের ঘাঁটি—আমস্টারডাম আইল্যাণ্ডস—তারও কোনো নামগন্ধ নেই এই চিরকুটে। তারপর আমরা পৌঁছে যাচ্ছি সরাসরি অস্ট্রেলিয়াতে—ইংরেজিতে লেখা চিরকুটায় আছে stra আর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরাশিতে লেখা চিরকুটটায় আছে *austral*—এ-দুটোই *Australia* র কথা বলছে সেটা বুঝতে মগজে ধূসর পদার্থ বেশি লাগে না।'

'*ততঃকিম্?*'

'অস্ট্রেলিয়ার পর, এই-যে, এই দেখুন নিউ-জিলাণ্ড—সে মোটেই কোনো মহাদেশ নয়—সাউথ আইল্যাণ্ড আর নর্থ আইল্যাণ্ড এই দুইকে মিলিয়েই এই *নবসিন্ধুসৈকত* গ'ড়ে উঠেছে। কিন্তু তারও তো কোনো উল্লেখই নেই কোনো চিরকুটে।'

'ঠিক আছে। না-হয় নিউ-জিলাণ্ডকেও বাদ দেয়া গেলো।'

'তবেই দেখুন—দক্ষিণ আমেরিকা আর নিউ-জিলাণ্ডের মাঝখানে এই অথৈ সমুদ্রের মাঝখানে ঐ সাঁইত্রিশ ডিগ্রি এগারো মিনিট অক্ষরেখায় পড়ছে কেবল আরেকটা প্রায় খাঁ-খাঁ মরুভূমির মতো দ্বীপ—মারিয়া তেরেসা। কিন্তু এই মারিয়া তেরেসার নামের উল্লেখও তো চিরকুটে কোথাও পাচ্ছি না। তাহ'লে নিজেরাই ঠিক ক'রে বলুন, কোথায় যাবেন, কোথায় যাওয়া সমীচীন হবে।'

'হুম, তাহ'লে তো দেখা যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া যাবার তোড়জোড় করাই ভালো।'

অমনি এককথায় সবাই রাজি। 'বেশ, চলো তবে অস্ট্রেলিয়ায়।'

'হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়া যাওয়াই উচিত, তবে পথে আমস্টারডাম আইল্যাণ্ডস আর ত্রিস্তান ডা কুনিয়া দ্বীপে জাহাজ ভিড়িয়ে এই খোঁজটা অন্তত নেয়া দরকার *ব্রিটানিয়া* সে-সব দ্বীপে কখনও থেমেছিলো কি না,' মেজর ম্যাকন্যাব্‌সের মাথা কিন্তু সকলের এত উৎসাহ ও উত্তেজনার মধ্যেও দিব্বি ঠাণ্ডা আছে—সত্যি-সত্যি কী করা উচিত, সে-কথাটা এই ভবি সহজে ভোলেন না।

'সে আর বেশি কথা কী,' লর্ড গ্লেনারভন বললেন, 'ঐ দ্বীপগুলো তো পথেই পড়বে—সেখানে জাহাজ ভিড়িয়ে খোঁজখবর নেবার জন্যে আমাদের তো একেবারে অন্য রাস্তায় গিয়ে পড়তে হবে না।'

এবং এই সিদ্ধান্তটাই মনঃপূত হ'লো সকলের। এবং *ডানকান* ছুটলো পুরোদমে, গন্তব্য অস্ট্রেলিয়া হ'লেও অন্য দ্বীপগুলোর বুড়ি ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যেতে হবে তাকে। আর কারুই যেহেতু আর একফোঁটাও তর সইছিলো না, প্রায় একটা নজিরই গ'ড়ে দিলে *ডানকান*, দশদিনেই পেরিয়ে এলো ২১০০ মাইল—দূর থেকে, দিগন্তে মেঘের মধ্যে ঝাপসা ভেসে উঠলো সমুদ্রতল থেকে সাতহাজার ফিট উঁচু ত্রিস্তান ডা কুনিয়ার গিরিচূড়া।

ত্রিস্তান ডা কুনিয়া দক্ষিণ অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের কতগুলো দ্বীপ নিয়ে গ'ড়ে উঠেছে, ব্রিটিশ উপনিবেশ সেণ্ট হেলেনার সে অংশ, আর সেই সেণ্ট হেলেনার রাজধানী হ'লো জেমসটাউন। ত্রিস্তান ডা কুনিয়া নাম থেকেই মালুম হয় এটা এককালে ছিলো পুর্তুগালের উপনিবেশ—কিন্তু সাম্রাজ্য নিয়ে ইওরোপের বিভিন্ন শক্তির মধ্যে যখন খেয়োখেয়ি লেগে গিয়েছিলো, তখন অস্ট্রেলিয়া দখল করার কাছাকাছি সময়েই ইংরেজরা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই দ্বীপগুলো পর্তুগিশদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। হোক-না ছোটো-ছোটো দ্বীপ—দ্বীপ না-ব'লে বলা ভালো হয়তো সমুদ্রের জল থেকে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সেই-কবে মাথা তুলে দাঁড়ানো পাহাড়ের চুড়ো, কিন্তু সাম্রাজ্য বানাবার রাক্ষুসে খিদে এই আগ্নেয়গিরির চুড়োগুলোকেই বা খামকা আর-কারু কাছে ছেড়ে দেবে কেন?

এই ছোট্ট গিরিপাহাড়দ্বীপে সচরাচর যেহেতু নেহাৎ বেকায়দায় না-পড়লে কোনো জাহাজই ভেড়ে না, তাই *ডানকান* স্বেচ্ছায়, তার পরিকল্পনামাফিক এখানে এসে তত্ত্বতালাশি নেবে ব'লেই থেমেছে শুনে, এখানকার গবর্নর প্রায় যেন গদগদ হ'য়েই খাতির করলেন লর্ড গ্লেনারভনকে। এই ছোট্ট নামকাওয়াস্তে দ্বীপটার এ-মাথা থেকে ও-মাথা অব্দি সবকিছু ঘুরিয়ে দেখালেন তাদের—নৌকোয় ক'রে দ্বীপের চারপাশও ঘুরে-আসা হ'লো, কিন্তু না, মঁসিয় পাওয়লের আন্দাজই সম্ভবত ঠিক, কাপ্তেন গ্রান্ট বা *ব্রিটানিয়ার* কোনো খোঁজই পাওয়া গেলো না এখানে।

যখন বোঝা গেলো এখানে *ব্রিটানিয়ার* খোঁজ পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তখন সে-রাত্তিরেই দ্বীপ থেকে নোঙর তুললো *ডানকান*, এবং আবার ভাসলো অথৈ জলে, অকূলপাথারে, পরবর্তী থামবার জায়গা আমস্টারডাম দ্বীপ।

মাঝখানে একবার কয়লা নেবার জন্যে থামতে হয়েছিলো *ডানকানকে*, কিন্তু সে শুধু কয়লা নেবার জন্যেই—অন্যকোনো কাজ ছিলো না তার, কোনো শুলুকসন্ধান নেবার কথাও ওঠেনি। আমস্টারডাম দ্বীপগুলোয় পৌঁছুবার আগে অব্দি কোথাও কোনো খবর নেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য এই তথাকথিত আমস্টারডামেও কাউকে কিছু জিগেস করার কোনো মানে নেই। এই ২৯০০ মাইল পাড়ি দেবার পর এই বাহারে নামের দ্বীপটায় পৌঁছে দেখা গেলো, এই একরত্তি ডাঙাকে দ্বীপ না-ব'লে দ্বীপের কোনো *লিলিপুশন* সংস্করণ বলাই চলে। কিংবা হয়তো দূর থেকে দেখে কারু ভ্রম হ'তে পারে যে এ বুঝি কোনো তিমিঙ্গিলের পিঠ—জলে গা ভাসিয়ে দিয়ে বুঝি রোদ পোহাচ্ছে। শুধু একটুক্ষণের জন্যেই সেখানে নোঙর ফেলেছিলো *ডানকান*। কেননা খোঁজাখবর নিতে কোনো সময়ই বোধকরি লাগলো না—যেন ঘড়ির কাঁটার মধ্য থেকে কয়েকটা মুহূর্তকে বগলদাবা ক'রে বার ক'রে নিয়ে গিয়েই জিজ্ঞাসাবাদ সারা হ'লো—যেন ঘড়ির কাঁটা তাতে ঘোরেইনি। কেননা দ্বীপের বাসিন্দা বলতে কুললে তিনজন লোক, একজন ফরাশি, আর দুজন দোআঁশলা, মুলাটো, কালাআদমি। তিনজনেই এককথায় জানিয়ে দিলে, উঁহু, কই, *ব্রিটানিয়া* তো কস্মিনকালেও এখানে থামেনি—কিংবা ঐ জাহাজের কেউই দ্বীপে কখনও পা দেয়নি।

উচিত ছিলো, এ-কথা শোনবামাত্র তক্ষুনি ফের নোঙর গোটানো, কিন্তু এবার যেহেতু শেষ-ভরসা অস্ট্রেলিয়াতেই পাড়ি জমাতে হবে, সেইন্যেই বোধহয় সব্বাই এখানে একটু থেমে নিয়ে বুকের মধ্যে সাহস আর আশা সঞ্চয় ক'রে নিতে চাচ্ছিলো।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাছাড়া ছিলো-তো, অফুরন্ত আমোদের খনি, জাক পাঞ্জয়লের শ্রীমুখনিঃসৃত অনর্গল বুকনি। মাঝে-মাঝে তথ্য আর কল্পনায় সবকিছু তালগোল পাকিয়ে না-ফেললে জাক পাঞ্জয়লকে হয়তো বলাই যেতো জীবন্ত একখানা বিশ্বকোষ, যে-রকম বিশ্বকোষ প্রণয়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন ভোলতেয়াররা। সেই যবে থেকে ইয়ন হার্ট আর জেরার্ড মের্কাটোর নামে দুই ওলন্দাজ চমৎকার বাঁধাই ক'রে মানচিত্রের একটি সংগ্রহ বার করেছিলেন ( মঁসিয় পাঞ্জয়লের এমনকী সালতারিখও দিব্বি মনে থাকে—সেটা নাকি ছিলো ১৬৩৬ সাল ), তারপর থেকে কতই যে *কার্টোগ্রাফার* অর্থাৎ মানচিত্রআঁকিয়েরা আসর জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছিলেন। সেই প্রথম সংগ্রহটার মুখপত্রে ছিলো বিশালদেহী অ্যাটলাসের ছবি, গ্রিকপুরাণের সেই দেবতা, যে কাঁধে ক'রে ব'য়ে বেখেছিলো আস্ত পৃথিবীটাই। সেই থেকেই নাকি মানচিত্রের বইয়ের নাম হ'য়ে গেলো *অ্যাটলাস*। তো, এই অ্যাটলাস সেই সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পরের পর বেরিয়েই চললো; যত-যত লোক ভৌগোলিক অভিযানে বেরিয়েছিলো তাদের আঁকা নকশা দেখে-দেখে কার্টোগ্রাফাররা নিজেদের কেরামতি দেখিয়েই চললেন—কোথায় পাহাড়, কোথায় নদী, কোথায় সাগর, কোথায় ডাঙা, কোথায় আগ্নেয়গিরি আর কোনখানেই-বা মরুভূমি, কোথায় দুর্গম নিবিড় বনানী আর কোথায়ই-বা জনপদ—সব আস্তে-আস্তে যেন লোকের চোখের সামনে খুলে যেতে লাগলো। আস্ত পৃথিবীটাই যেন ক্রমে বড়ো হ'য়ে যেতে লাগলো, বেড়ে যেতে লাগলো—আবিষ্কৃত হ'লো এমনকী আস্ত নতুন মহাদেশও।

মঁসিয় পাঞ্জয়ল যখন কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে এ-সব কথা বলতে শুরু করেন, সবাই তখন তাঁকে ঘিরে ব'সে হাঁ ক'রে তার কথা শোনে, আর তাঁর জ্ঞানের পরিধি দেখে তাজ্জব হ'য়ে যায়। গত ক-দিন ধ'রে তিনি অস্ট্রেলিয়াকে নিয়েই পড়েছিলেন। কারা-কারা অস্ট্রেলিয়া গিয়েছেন, কোথায়-কোথায় পড়েছিলো তাঁদের পদধূলি, কী তাঁরা দেখেছেন *আউটব্যাকে*—কেননা অস্ট্রেলিয়ায় জনবসতি নাকি শুধুই সমুদ্রের তীর ঘেঁসে, তারপর ভেতরে মাইলের পর মাইল গেছে বিশাল জমি, পাহাড় পর্বত গাছপালা জীবজন্তু সবই নাকি অন্যরকম—আর সেই বিশাল ভিতরদেশকেই—মজার না?—তারা বলে *আউটব্যাক*—'বাইরে, পেছনে'। এমন কোনো নাম যার মগজ থেকে বেরিয়েছিলো, তার কল্পনার বাহাদুরি ছিলো মানতেই হয়। মঁসিয় পাঞ্জয়ল যখন একে-একে অভিযানকারীদের নাম বলতে লাগলেন, নির্ভুল সালতারিখ শুদ্ধু, তখন ঐ ছিটগ্রস্ত পণ্ডিতের ওপর বেশ সম্ভ্রমই বোধ হ'তে থাকে সকলের। অস্ট্রেলিয়ার *কিছুই নয়* ইওরোপের মতো—'কিছুই নয়' মানে তার গাছপালা জীবজন্তু সবই অন্যরকম, এমনকী দক্ষিণ গোলার্ধে ব'লে তার আকাশটা অন্যরকম, উলটোরকম, তারাগুলো আকাশের পটে যেন ঠিক উলটে দিয়েছে কেউ, এমনকী উলটে দিয়েছে ঋতুগুলোকেও। ইওরোপে যখন হি-হি হিম শীত, সেখানে তখন বিকট দমবন্ধকরা গরম। ফলে বড়োদিনে যখন ইওরোপ গান গায় *হোয়াইট*



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

*ক্রিসমাসের*, বরফঢাকা প্রান্তরের ওপর দিয়ে স্লেজে ক'রে আসছে সান্তা ক্লস, বা সন্ত নিকলাউস, তখন গরমে এখানকার লোকের প্রাণ আঁইটাই যাই-যাই, বেচারা সান্তা ক্লস তার গরম জামাকাপড় খুলে হাসফাঁস করতে-করতে যেন দরদর ক'রে ঘামে।

সান্তা ক্লসের দুর্দশাটা এমন মজার ভাবে বর্ণনা করেন জাক পাঞ্জয়ল যে রবার্ট আর মেরি তো হেসেই কুটিপাটি, অন্যরাও মুচকি-মুচকি হাসেন বটে, আর এতে একদিক থেকে ভালোই হয়—ছেলেমেয়েরা অন্তত সাময়িকভাবে ভুলে যায় কেন তারা এই অভিযানে বেরিয়েছে, কাপ্তেন গ্রান্টের কথাটা তখন যেন মনের কোনো চিলতে খুপরিতে অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

কিন্তু এত-সবের মধ্যেও চিরকুটটাকে নিয়ে প্রায়ই মাথা খাটায় সবাই মিলে। সত্যি কি মর্মোদ্ধার করা গেছে এই আর্তোদ্ধারের আহ্বানের—চিরকুটগুলো নিয়ে যত বসা যায় ততই মনে হয় সেগুলো যেন গভীর, গভীরতর রহস্যে ভ'রে যাচ্ছে, ধাঁধাটা যেন এমন জটপাকানো যে তার ভেতর বুঝি সহজে কোনো আলো ফেলাই যাবে না। যেমন, এই-যে খটকাটা জেগেছে, তার উত্তরটা কী? পেরুর উপকূল ছেড়ে বেরুবার পর এক-সপ্তাহের মধ্যেই জুনমাসের সাত তারিখে কি *ব্রিটানিয়া* ভারত মহাসাগরে গিয়ে পৌঁছুতে পারে?

খোদ পাঞ্জয়লও *সবজান্তা হ'য়েও* কেমন-একটা ধাঁধার মধ্যে প'ড়ে গিয়েছিলেন। একদিন তাই সরাসরি কাপ্তেন জন ম্যাঙ্গল্‌সকেই তিনি জিগেস ক'রে বসলেন, 'আমরা যে-সমুদ্রপথ দিয়ে যাচ্ছি সেই সমুদ্র দিয়ে কি কোনো জাহাজ একমাসেই গিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছুতে পারে?'

'দেখতে হবে জাহাজের এনজিনের জোর কতটা—কত অশ্বশক্তি আছে,' বুঝি প্রায় না-ভেবেই উত্তর দিয়েছেন কাপ্তেন, 'দিনরাত একটানা যদি চলে, চব্বিশ ঘণ্টায় যদি দশমাইল পথ পেরুতে পারে, তবে একমাসেই অস্ট্রেলিয়া পৌঁছে যেতে পারে বৈ কি!'

'তাহ'লে চিরকুটগুলোয় নিশ্চয়ই 7 তারিখের আগে। অথবা 2 ছিলো—জল লেগে মুছে গিয়েছে। তার মানে, আমি বলতে চাচ্ছি, কাপ্তেন গ্রান্ট সম্ভবত 17 অথবা 27 তারিখ গিয়ে পৌঁছেছিলেন ভারত মহাসাগরে।'

'হুম, এটা হ'লেও হ'তে পারে। এই সম্ভাবনাটার কথা মোটেই উড়িয়ে দেয়া যায় না,' কমকথার মানুষ মেজর ম্যাকন্যাব্‌স-এর মুখ থেকে আজকাল যে নানারকম *সদুক্তিকর্ণামৃত* বেরোয়, এই মন্তব্যটা তারই আরেকটা নজির।

জাক পাঞ্জয়ল অমনি সবজান্তার ভূমিকায় পুনর্বার অবতীর্ণ হলেন। মাঝখানে যে একটা প্রশ্ন ক'রে তিনি এমন দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন যে এমনকী তাঁরও সবকিছু জানা নেই, সম্ভবত সেই ঘাটতিটা পুষিয়ে নেবার জন্যেই বোধকরি। এমন-সব সারগর্ভ উক্তি ক'রে চললেন পর-পর, তাতে তাঁর জ্ঞানের বহর দেখে সব্বাই প্রায় কুপোকাৎ। কেমন-



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন একটা হীনম্মন্যতারই বোধ জেগে ওঠে, যদি দেখা যায় আরেকজন-কেউ—মানুষই তো বটে—একটা স্বয়ংচল স্বয়ংক্রিয় বিশ্বকোষই হ'য়ে উঠেছে।

শেষটায় মেজর ম্যাকন্যাব্‌স আর তুবড়ির মতো ছোটা জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা সহ্য করতে না-পেরে হেসেই যদিও কথাটা বললেন বটে, তবু তার মধ্যে দিয়ে একটু জাতিবিদ্বেষ ফুটে বেরুলো বৈকি। ফরাশি সেনাদের ধরাচুড়ো পরার পর অনেকটা ব্যাঙের মতো দেখায়, সেইজন্যেই কি তাদের *ফ্রগ্‌স* বা ব্যাঙ বলে? নাকি ব্যাঙের ঠ্যাঙ তাদের একটা মুখরোচক খাদ্য ব'লেই তাদের *ফ্রগ্‌স* বলে? তার উত্তর অবিশ্যি মেজর ম্যাকন্যাব্‌স নিজেই জানেন না। কিন্তু একবার যখন পাঞয়লের কথার তোড় একটু ক'মে এসেছে, তিনি ফাঁক বুঝে, তাঁকে খানিকটা তাতিয়ে দেবার জন্যেই হয়তো, জিগেস ক'রে বসলেন, 'আচ্ছা, মঁসিয় পাঞয়ল, এটা কি আপনি বলতে পারবেন অস্ট্রেলিয়ায় কেন ফরাশিদের এত রমরমা? ইংরেজরা কেন ফরাশিদের হাতেই দখলদারি ছেড়ে দিয়ে এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে সটকে পড়েছে?'

পাঞয়ল বুঝি আচমকা এমন প্রশ্ন শুনে একটু অপ্রস্তুতই বোধ করেছেন। থতমত খেয়ে বলেছেন : 'কেন?'

'অস্ট্রেলিয়ার ব্যাঙের ডাক শুনে ভয়ে আঁৎকে উঠে ইংরেজ কাপ্তেনরা জাহাজ নিয়ে চম্পট দিয়েছিলেন ব'লে—আর-ককখনও অনেকদিন ওমুখো হয়নি। সেই-ফাঁকে ঐ ব্যাঙের লোভেই ফরাশিরা, তাদের স্বজাতির খোঁজে এসে, এখানে বেশ জম্পেশ ক'রে জমিয়ে বসেছে।'

হেসে ফেলেছেন জাক পাঞয়ল, তবে একটু আপত্তি জানাতেও ছাড়েননি। 'ইংরেজরা না-হয় চারপাশে সাম্রাজ্য ছড়িয়ে ব'সে অন্যসব লোকদের সম্বন্ধেই নাক শিঁটকোয়, তাদের আর মানুষ ব'লেই মনে করে না। কিন্তু আপনি তো স্কট, হাইল্যাণ্ডের লোক, তাদের দেখাদেখি আপনি কেন আমাদের *ফ্রগ* বলবেন—আমরা ফরাশিরাও কিন্তু খুব-একটা কুয়োর ব্যাঙ নই—আমরাও পৃথিবীর নানান মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছি।'

জ্ঞান বিতরণের ফাঁকে-ফাঁকেই, মওকা পেলেই, মেজর ম্যাকন্যাব্‌স তাঁকে একটু তাতিয়ে না-দিয়ে উসকে না-তুলে ছাড়তেন না। একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রায় এ-সব আড্ডায় বরং একঘেয়ে জল দেখে-দেখে বিকল চিত্ত অন্যকোনো বিষয়ে কথাকাটাকাটি শুরু ক'রে দিতে পারে। তাছাড়া মেরি আর রবার্ট যেভাবে মনমরা হ'য়ে আছে, তাতে তাদেরও এতে কথঞ্চিৎ দুর্ভাবনা বা হতাশা থেকে মুক্তি দেয়া যায়। যতদিন তারা জানতো যে কাপ্তেন গ্রাণ্ট-এর কোনো হদিশ নেই, মারাই পড়েছেন বুঝি-বা, তারা একরকম ক'রে এই দুর্ভাগ্যের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিলো। এখন, যখন আবার কাপ্তেন গ্রাণ্ট-এর হদিশ পাবার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তিনি যে বেঁচে আছেন এমন-একটা সম্ভাবনা যে আর নিছকই কল্পনার স্তরেই সীমাবদ্ধ হ'য়ে নেই, অথচ তবু তিনি যে কোথায়



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছেন সত্যি-সত্যি, এবং কীভাবে আছেন, তার কিছুই জানা যাচ্ছে না, তখনই বরং আশা-নিরাশার দোলায় তাদের মন অনবরত পেণ্ডুলামের মতো দোল খেয়ে যাচ্ছে।

তারপরেই, বিশে ডিসেম্বর, কেপ বার্নউইলিতে গিয়ে পৌঁছুলো *ডানকান*। এতদিন কেটে গিয়েছে, দু-দুটো বছর তো বটেই, এর মধ্যে *ব্রিটানিয়া* জাহাজের ধ্বংসাবশেষ নিশ্চয়ই এখন আর এখানে প'ড়ে নেই। সব লুঠপাট হ'য়েই গেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তবু তো খোঁজখবর কিছু নিতেই হয়। এতদিন নিরুদ্দিষ্টের সন্ধানে তাঁরা কত-কত জায়গায় ঢুঁড়ে বেরিয়েছেন, কোনো খবরই পাননি—এখানে ভাঙাচোরা *ব্রিটানিয়াকে* পাওয়া যাক বা না-যাক, হয়তো লোকমুখে কিছু-একটা খবর পাওয়া যাবে। আর শেষ অব্দি এখানেও যদি কোনো খোঁজ না-মেলে, তাহলে না-হয় ফের ইওরোপেই ফিরে যাবে *ডানকান*। কেননা *ব্রিটানিয়া* এখানকার দরিয়ায় না-ডুবে যদি অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে কোথাও সলিলসমাধি লাভ ক'রে থাকে—মঁসিয় জাক পাঞ্জয়লের সুচিন্তিত অভিমত—তাহ'লে কাপ্তেন গ্রান্ট নিশ্চয়ই অনেক আগেই ইওরোপে ফিরে যেতেন। পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় ইংরেজদের উপনিবেশ বেশ জাঁকিয়েই বসেছে, সেখান থেকে ইওরোপ ফিরে-যাবার জাহাজও যাতায়াত করে হরদম, ফলে কাপ্তেন গ্র্যান্টের পক্ষে কোনো-একটা জাহাজে উঠে-পড়া খুবই সম্ভব। বরং যখন *ডানকান* যেখানে এসে পৌঁছেছে, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায়, সেখানে এখনও কোনো বড়ো বসতি গ'ড়ে ওঠেনি, *আউটব্যাক* শুরু হয়েছে প্রায় সমুদ্রতীর থেকে একটু-ভিতরে গিয়েই, আর এই *আউটব্যাকে* খাঁ-খাঁ করছে রুক্ষ ঊষর তপ্তবালির মরুভূমি।

অনেক ঝক্কিঝামেলা পুইয়ে ডাঙায় নেমেই দেখা গেলো দূরে একটা উইণ্ডমিলের চাকা হাওয়ায় অনবরত পাক খেয়ে যাচ্ছে। উইণ্ডমিল আছে—অর্থাৎ এখানে লোকজনও আছে আশপাশে কোথাও, নিশ্চয়ই ছোটোখাটো হ'লেও চাষ-আবাদের কোনো-একটা ব্যবস্থা আছে। আর, সত্যি তা-ই, একটু এগুতেই দেখা গেলো খানকয়েক বাড়ি একটা জায়গায় যেন জটলা পাকাচ্ছে, সামনেই সবুজ মাঠ, সেখানে গোরু-ভেড়া চরছে, ঘোড়াও আছে, কাছেই যে খেতখামারের ব্যবস্থা আছে, তারই চিহ্ন হিশেবে আছে একটা গোলাবাড়িও।

এঁদের এগুতে দেখে, সবচেয়ে বড়োবাড়িটা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এলেন একজন প্রৌঢ়, বিশাল দশাসই চেহারা—এত বয়েস হওয়া সত্ত্বেও কোথাও বয়সের কোনো ছাপ পড়েনি। তাঁর পেছনে ঘেউ-ঘেউ করতে-করতে ছুটে এসেছে চারটে তাগড়াই কুকুর। প্রৌঢ়ের সঙ্গে-সঙ্গে আরো বেরিয়ে এসেছে চারজন বলিষ্ঠ তরুণ, লাল চুলের ঢল নেমেছে তাদের মাথায়, যেন আগুনের শিখা জ্ব'লে উঠেছে ঐ ঝাঁকড়াচুলে। নিশ্চয়ই আয়ারল্যাণ্ডের মানুষ, ইংরেজদের অত্যাচারে দেশে তিষ্ঠোতে না-পেরে অজানায় ঝাঁপ খেয়ে ভাসতে-ভাসতে শেষকালে এরা সবাই এই পশ্চিম অস্ট্রেলিয়াতেই এসে পৌঁছেছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রৌঢ় সরাসরি তাঁদের সামনে এসে এগিয়ে এলেন। বললেন : 'স্বাগতম। ওয়েলকাম—প্যাডি ও'মুরের বাড়িতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই।'

'আপনি—?'

'হ্যাঁ, আমি আয়ারল্যাণ্ডেরই লোক। যা অবস্থা, তাতে দেশে থাকলে কবেই না-খেতে পেয়ে মারা যেতুম, এখানে এসে চাষ-আবাদ ক'রে মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যেই আছি। আসুন, ভেতরে আসুন সবাই—তারপর ভালো ক'রে আলাপ করা যাবে। কতকাল যে এখানে বাইরের লোকের পা পড়েনি—মাঝে-মাঝে একেবারে হাঁপ ধ'রে যায়।'

প্রৌঢ় তাদের নিয়ে গেলেন মস্ত-একটা ঘরে, যার মাঝখানে রয়েছে বিশাল-একটা টেবিল, বাসনকোশন খাবারদাবার দেখে মালুম হ'লো এটাই এই খামারের *ডাইনিং হল*। বোঝাই গেলো, সবাইকে নিয়ে প্রৌঢ় খেতে বসছিলেন, এবার অভ্যাগতদেরও তাঁদের সঙ্গেই বসিয়ে দিলেন খাবারটেবিলে। তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'আপনাদের অপেক্ষাতেই ছিলুম।'

'আমাদের অপেক্ষায়?' বিস্ময়ে লর্ড গ্লেনারভনের বুঝি বাকস্ফূর্তিই হ'তে চাচ্ছিলো না।

'রোজই অতিথিদের অপেক্ষা করি কিনা—যদি কেউ দৈবাৎ পথভুল ক'রে এখানে এসে পড়ে। আমার দরজা সারাবছর ঐ অনাগত অতিথিদের জন্যে খোলা থাকে। অবশেষে এখন, যা-হোক, আপনারা এসে পৌঁছেছেন।'

নির্জনবাসের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই লর্ড গ্লেনারভনের। কিন্তু এ-কথা থেকে এটুকুই শুধু বুঝতে পারলেন যে, সারাদিন না-হয় খেটেখুটে কাজে-কর্মে কাটিয়ে দেয়া যায়, কিন্তু অবসর সময়ে দুটো কথা কইতে না-পারলে পেট ফেঁপে যায়, বুঝি দম আটকেই যায়, গলার কাছে এত কথা জ'মে থাকে! ড্যানিয়েল ডি-ফো *রবিনসন ক্রুসো*-র গল্পটা বোধহয় ফেঁদেছিলেন জাহাজডোবা নাবিক আলেকজাণ্ডার সেলকার্ককে নিয়ে—কিন্তু ফ্রাইডে যদি না-আসতো তাহ'লে একদিন একা থাকতে-থাকতে ক্রুসোর দশা যে কী হ'তো, সেটা ভাবতেই বুক শুকিয়ে যায়।

প্যাডি ও'মুর—সেটাই তো এই দিলদরিয়া প্রৌঢ়ের নাম, তা-ই না?—অ্যাদ্দিন বাদে অচেনা-কারু সঙ্গে কথা বলতে পেরে অনর্গল কথা ব'লে যাচ্ছেন, কথার যেন ফুলঝুরি ছুটছে। খেতে-খেতেই নিজের কাহন শোনালেন সাত-সতেরো। তারপর একসময় শুনলেন গ্লেনারভনদের সাগরপাড়ির পেছনকার কাহিনীটা। সারা আমেরিকা চুঁড়ে বেরিয়েও এখনও তাঁরা কাপ্তেন গ্রাণ্টের কোনো সন্ধান পাননি—যেন মরীচিকার পেছনে ছুটেছেন—এবারে এই অস্ট্রেলিয়াতেও *ব্রিটানিয়ার* কোনো হদিশ না-পেলে, বাধ্য হ'য়ে, শেষটায় এই বেচারা ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে ঘরের ছেলেকে ঘরেই ফিরে যেতে হবে।

লর্ড গ্লেনারভন যেমনভাবে কাপ্তেন গ্রাণ্টের কাহনীটা ফেঁদেছিলেন, তাতে তা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকলেরই মর্মস্পর্শ করেছিলো। শুনতে-শুনতে কখন যে সবাই কাঁটাচামচে নাড়ানো বন্ধ ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে এই করুণ কাহিনীতে মগ্ন হ'য়ে পড়েছিলো, তা কেউই খেয়াল করেনি। হঠাৎ চমক ভাঙলো কার কথায়, স্তব্ধতার জন্যেই সম্ভবত অতর্কিত কথাগুলোকে ঠিক দৈববাণীর মতো শোনালো :

'কাপ্তেন গ্রান্ট যদি এখনও বেঁচে থাকেন, তবে অস্ট্রেলিয়াতেই আছেন!'

## দুই

## আকাশবাণী এবং আয়ারটন

যেন বিদ্যুৎ স্পর্শ করেছে, এমনিভাবে ঝাঁকুনি খেয়ে লাফিয়ে উঠলেন লর্ড এডওয়ার্ড।

'কে? কে এ-কথা বললে?'

'*আমি*,' টেবিলের ওপাশ থেকে শান্ত ধীরগলায় জবাব দিলে প্যাডি ও'মুর-এরই এক সাগরেদ।

আর তার দিকে তাকিয়ে এবার তাজ্জব হওয়ার পালা খোদ প্যাডি ও'মুর-এরই। 'তুমি? আয়ারটন?'

'হ্যাঁ। এঁদের মতো আমিও হাইল্যাণ্ডার—স্কটল্যাণ্ডেরই মানুষ। *ব্রিটানিয়া* জাহাজে আমিও ছিলুম।'

এটা যেন দ্বিতীয়-আরেকটা বজ্রাঘাত।

কী বলছে এই লোকটা, এই-যাকে *আয়ারটন* ব'লে সম্বোধন করেছেন প্যাডি ও'মুর? *ব্রিটানিয়া*-য় ছিলো এ? কাপ্তেন গ্রান্টের সঙ্গে?

মেরি প্রায় যেন মূর্ছাই যাবে!

জন ম্যাঙ্গল্‌স, জাক পাঞ্চয়ল, রবার্ট গ্র্যান্ট—সবাই ততক্ষণে যে-যার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে এসে ঘিরে ধরেছেন আয়ারটনকে।

রুক্ষ, হট্টাকট্টা চোহারা আয়ারটনের, অনেকদিন সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবার জন্যেই বোধ-করি লোনা হাওয়ায় রোদে-জলে গায়ের রঙ প্রায়-তামাটে। ঘন জোড়াভুরু, ঝোপের মতো ঢেকে রেখেছে তার তীব্র দুটি চোখকে। দড়ির মতো পাকানো—কিন্তু কঠিন জোয়ান নাবিকশরীরে পেশী ছাড়া যেন আর-কিছুই নেই—মেদবর্জিত বাহুল্যবর্জিত ঋজু শরীর। লম্বা তেমন নয়, কিন্তু প্রকাণ্ড চওড়া কাঁধ, বলিষ্ঠ, ক্ষিপ্র, তেজিয়ান। মুখের মধ্যে একটা বেপরোয়া দুঃসাহসী তেজের ছাপ।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি ছিলে *ব্রিটানিয়ায়*?' লর্ড এডওয়ার্ডের গলার স্বরে একইসঙ্গে যেন বিস্ময়, অবিশ্বাস, আর হঠাৎ-মাথা-চাড়া-দেয়া একটা আশার ভাব।

'আমি ছিলাম কোয়ার্টারমাস্টার—আমার ওপরই ভার ছিলো হালের, সিগন্যালের, সারেঙের—'

'জাহাজডুবির পর তুমিও কি কাপ্তেন গ্রান্টের সঙ্গে গিয়ে ডাঙায় উঠেছিলে?'

'না, আমি হঠাৎ এক প্রচণ্ড ধাক্কায় ডেক থেকে ছিটকে প'ড়ে যাই জলে—'

'আমরা যে-চিরকুট পেয়েছি তাতে দুজন নাবিকের কথা লেখা আছে। তুমি *তাহ'লে* সে-দুজনের কেউ নও?'

'না। কিন্তু কোন-চিরকুটের কথা বলছেন? আমি তো কোনো চিরকুটের কথা জানি না। আমি ভেবেছিলাম, আর-সকলের সাথে কাপ্তেন গ্রান্টেরও বুঝি সলিলসমাধি হয়েছে, শুধু আমি একাই কোনোমতে প্রাণে বাঁচতে পেরেছি—'

'কিন্তু তুমি তো নিজেই এইমাত্র বললে যে কাপ্তেন গ্রান্ট বেঁচে আছেন—'

'তা তো বলিনি। বলেছি, কাপ্তেন গ্রান্ট *যদি এখনও* বেঁচে থাকেন—'

'বলেছো, তবে তিনি অস্ট্রেলিয়াতেই আছেন!'

'হ্যাঁ। বেঁচে গিয়ে থাকলে এখানেই কোথাও তিনি আছেন।'

এতক্ষণে, ফাঁক পেয়ে, মেজর ম্যাকন্যাব্‌স আসল প্রশ্নটা করলেন। '*ব্রিটানিয়া* ঠিক কোনখানে ডুবেছিলো?'

আসলে প্রথম প্রশ্নটা এইটেই হওয়া উচিত ছিলো। উত্তেজনায় সব তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিলো লর্ড এডওয়ার্ডের, তাই এতক্ষণ তিনি উলটোপালটা নানান প্রশ্ন ক'রে যাচ্ছিলেন—তিনি এখনও ঠিক বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারেননি যে কাপ্তেন গ্রান্টের সঙ্গে *ব্রিটানিয়া* জাহাজের সেই কপালমন্দ-পাড়িতে ছিলো, এমন-কারু সঙ্গে সত্যি তাঁদের দেখা হয়েছে।

'অস্ট্রেলিয়ার কাছেই, প্রায় তীরে এসে। প্রকাণ্ড একটা ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজ থেকে আমি ছিটকে প'ড়ে যাই। জাহাজ নিশ্চয়ই তারপরেই ডুবেছে।'

এবার জন ম্যাঙ্গলসের আরো-একখানা মোক্ষম প্রশ্ন, এ যদি সত্যি *ব্রিটানিয়ার* কোয়ার্টারমাস্টার হ'য়ে থাকে তবে এ-প্রশ্নের উত্তর তার জানা উচিত। 'কত অক্ষরেখায়?'

'সাঁইত্রিশ ডিগ্রি—'

'পশ্চিম উপকূলে?'

'না, পূর্ব উপকূলে।'

যেমন দুমদাম ক'রে প্রশ্ন আসছে, তেমনি দুমদাম ক'রে আয়ারটন উত্তর দিচ্ছে। উত্তর দিতে একমুহূর্তও দেরি হচ্ছে না তার, একটুও দ্বিধা বা দোনোমনার ভাবও নেই।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সেটা কত তারিখ ছিলো?'

'১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দের সাতুই জুন—রাতের বেলায়, সেইজন্যেই জলে ছিটকে পড়ার পর গোড়ায় আমি অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাইনি—তা ছাড়া সমুদ্রেও খ্যাপা তাণ্ডব চলছিলো, বড়ো-বড়ো সব ঢেউ, ঢেউয়ের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে একেবারে জেরবার হ'য়ে যাচ্ছিলাম—'

কিন্তু তার স্মৃতিচারণ থামিয়ে দিয়ে ততক্ষণে লর্ড এডওয়ার্ড ব'লে উঠেছেন, 'তারিখ তো মিলে যাচ্ছে!' এতক্ষণে তাঁর গলায় হর্ষের একটু আভাস এসেছে।

জেরা চললো, *তারপরেও*, অনেকক্ষণ। কত-যে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেলো আয়ারটন, গলার সুরে দ্বিধা নেই, চোখের পাতা কাঁপেনি, কখনও একটু থতমতও খায়নি।

আর যতক্ষণ ধ'রে জিজ্ঞাসাবাদ চলেছে, সারাক্ষণ প্রায়-পলকহীন চোখে তারই দিকে তাকিয়ে থেকেছে মেরি। এতদিনে বুঝি একটু আশার আলো দেখা যাচ্ছে—বুঝি অবশেষে বাবার সঙ্গে আবার তার দেখা হবে—প্রায় মৃত্যুর মধ্য থেকে ল্যাজারাসের মতো অন্ধকার ফুঁড়ে এবার উঠে আসবেন কাপ্তেন গ্রান্ট। *ব্রিটানিয়ার* একজনের খোঁজ যখন পাওয়া গেছে, তখন অন্যদেরও দেখা মিলতে আর কি বেশি দেরি হ'তে পারে?

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস আর মেজর ম্যাকন্যাবস কিন্তু এত-সহজে কোনো অভাবিত উটকো দাবি মেনে নিতে রাজি নন। বিশেষত, সমুদ্রে-যারা-ঘুরে-বেড়ায় তারাই জানে অনেক ভাগ্যান্বেষী ফেরেব্বাজ চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কানাঘুষোয় তারা শুনতে পায় কোথায় কোন জাহাজডুবি হয়েছে, তারপর জাহাজের মালিক বা জাহাজের কাপ্তেনের বাড়ির লোকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে সাতকাহন ফেঁদে এ-ধরনের লোক তাদের নিংড়ে টাকাকড়ি বার ক'রে নেবার চেষ্টা ক'রে থাকে। বিশ্বাসপ্রবণ লোকদের ঠকাবার জন্যে কত লোকই যে ওৎ পেতে থাকে—এ যেন ঝোপে-ঝোপে সব নেকড়ে, উৎপাত বাধাবার জন্যে সবসময়েই প্রস্তুত। ফলে কাপ্তেন আর মেজর আরো-নানা কথা জিগেস ক'রে জেনে নিতে চাচ্ছিলেন, এই আয়ারটন যা-যা বলছে, সে-সব কথা ঠিক কি না। না-যাচাই ক'রে, না-বাজিয়ে নিয়ে চোখবুজে অনায়াসে সবকিছু বিশ্বাস ক'রে নেয়া চলে না। বিশেষত তাঁরা দুজনেই এইদলের মধ্যে সবচেয়ে সন্দেহপ্রবণ, সবচেয়ে পোড়খাওয়া লোক। এটা অন্তত তাঁদের জানতে বাকি নেই যে সমুদ্রের ধারে বাতাসে যে-সব কথা ভেসে বেড়ায় তাতে সালতারিখ মিলিয়ে কাউকে ধাপ্পা দেয়া খুবই সহজ কাজ।

কিন্তু আয়ারটন যখন *ব্রিটানিয়ার* এই এতবড়ো সাগরপাড়ি দেবার আগেকার ঘটনা নির্ভুলভাবে সব ব'লে গেলো, তাঁদের সন্দেহও আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগলো। তার কথা থেকে এও বোঝা গেলো যে মেরি আর রবার্টকেও সে চেনে এইটুকু বয়েস



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকেই।

একবার—রবার্টের বয়েস তখন মাত্র দশ হবে—শেরিফকে নিয়ে একটা আপ্যায়নসভার আয়োজন হয়েছিলো জাহাজের ডেকে, ধুমধাম ক'রে ভোজসভা বসেছিলো, এমন সময়ে হঠাৎ রব উঠেছিলো রবার্টকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না—তারপর অনেক খুঁজে দেখা গেলো সে মাস্তুল বেয়ে ওপরে উঠে গিয়েছে, পাল আঁকড়ে ধ'রে ল্যাগব্যাগ ক'রে দোল খাচ্ছে শূন্যে।

অমনি রবার্ট সায় দিয়ে উঠলো, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক এমনটাই হয়েছিলো। কিন্তু সে-তো কবেকার কথা। তখন আমি ভারি দুষ্টু আর দুরন্ত ছিলুম!' এমন ভঙ্গি ক'রে কথাটা সে বললে যেন এখন আর সে অমনতর ডানপিটেটি আর নেই।

এ-রকম একটা নয়, পর-পর অনেকগুলো ছোটোখাটো গল্পই ব'লে গেলো আয়ারটন। মেরি চোখ গোল-গোল ক'রে হা ক'রে সব কথা শুনছে, আর যতই বাবার কথা শুনছে ততই যেন চোখের কোল ভিজে উঠছে তার। সে প্রায় ধরাগলাতেই জিগেস করলে তার বাবার কথা।

আয়ারটন বললে কাপ্তেন গ্রাণ্টের নাকি পরিকল্পনা ছিলো পাপুয়া-নিউগিনির পশ্চিম উপকূলে একটা নয়া উপনিবেশের পত্তনি করবেন, তার নাম দেবেন নিউস্কটল্যাণ্ড, ওলন্দাজরা যেমন কতগুলো দ্বীপের নাম দিয়েছিলো নিউ-আমস্টারডাম। সেবার কাইয়াও পেরিয়ে ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে তিনি ইওরোপ ফিরছিলেন—এমন সময় হঠাৎ আকাশ কালো ক'রে জমলো ঘন মেঘ, আর তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুরন্ত ঘূর্ণিহাওয়া। ঝড়টা যেমন প্রচণ্ড ছিলো, তেমনি এসেছিলোও আচম্বিতে, অতর্কিতে। এমন দুর্যোগ তার এত বছরের নাবিক জীবনেও আয়ারটন আগে আর-কখনও দ্যাখেনি। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বৃষ্টিও নেমেছিলো মুষলধারে—কেউ যেন আকাশ থেকে অবিশ্রাম পিপে-পিপে জল ঢেলে দিচ্ছিলো। দেখতে-না-দেখতে জাহাজের খোলে পর্যন্ত গিয়ে জল ঢুকলো, এতটাই যে জাহাজটা কাৎ হ'য়ে প্রায় বুঝি ডুবেই যায়। এরই মধ্যে প্রায়-ডুবুডুবু জাহাজ নিয়েই যেন ধুঁকতে-ধুঁকতে এগুচ্ছিলো *ব্রিটানিয়া*, আর বাইশে জুন সেই দুর্যোগের মধ্যেই দূর থেকে আবছা দেখা গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার উপকূল। যখন সবাই ভাবছে এবার বুঝি কোনোরকমে জাহাজটাকে নিরাপদে নিয়ে গিয়ে তীরে ভেড়ানো যাবে, তখন একটা চোরা ডুবোপাহাড়ে ঘা লেগে থরথর ক'রে কেঁপে উঠেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো *ব্রিটানিয়া*। সেই-তখনই ঐ অতর্কিত ঝাঁকুনিতে আর ঢেউয়ের ঝাপটায় আয়ারটন ছিটকে পড়েছিলো জাহাজ থেকে। তারপর থেকে কাপ্তেন গ্রাণ্ট বা *ব্রিটানিয়ার* আর-কোনো খবরই পায়নি সে। ধ'রে নিয়েছিলো, সেখানেই অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব-উপকূলের কাছেই *ব্রিটানিয়া* ডুবে গিয়েছে—সেই দুর্যোগের মধ্যে আর-কেউই আত্মরক্ষা করতে পারেনি। কিন্তু এখন খাবারটেবিলের কথাবার্তা থেকে সে বুঝতে পেরেছে যে, কাপ্তেন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্র্যান্ট দুজন সঙ্গীসমেত বেঁচে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁর অবস্থা এখন মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর—কেননা তাঁদের পাকড়েছে বুনো আদিবাসীরা, জংলিরা—কথা শুনে সে বুঝতে পেরেছে যে কোনোরকমে একটা বোতলে নিজেদের দুরবস্থার কথা চিরকুটে লিখে কাপ্তেন গ্রান্ট বোতলটা জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন।

আয়ারটন নিজেও তীরে ভেসে এসে জংলিদের হাতে ধরা পড়েছিলো। তারা তাকে পাকড়ে গভীর দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে আটকে রেখেছিলো—তার ওপরে নাকি তারা অকথ্য অত্যাচার করেছে, সে-সব নির্যাতনের চিহ্ন এখনও আছে তার শরীরে। সেখানে দু-বছর বিস্তর দুর্ভোগ পোহাবার পর সে কোনোরকমে প্রাণ হাতে ক'রে পালায়—কেমন ক'রে সে প্রাণে বেঁচেছে, হাজারো বিপদ উপেক্ষা ক'রে এতদূর পথ পাড়ি দিয়েছে সে-ও প্রায়-এক অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর কাহিনী। মাত্র দু-মাস হ'লো, এখানে প্যাডি ও'মুরের খামারে কাজ পেয়ে সে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে—এখন অন্তত প্রাণের কোনো আশঙ্কা নেই, খাটবে আর খেয়ে-প'রে বাঁচবে—খাটতে সে ডরায় না, কিন্তু এত-সব দুর্ভোগের পর এখন একটু নিশ্চিন্ত জীবন চাই তার।

এতক্ষণ সবাই প্রায় রুদ্ধশ্বাসেই তার এই রগরগে আখ্যান শুনছিলো। কিন্তু তাকে দম ফেলবার কোনো ফুরসৎ না-দিয়েই মেজর ম্যাকন্যাব্‌স হঠাৎ জিগেস ক'রে বসলেন : '*ব্রিটানিয়ার* কোয়ার্টারমাস্টার ছিলে তুমি? *পেটি-অফিসার?*'

আয়ারটন ঘাড় নেড়ে বললে, 'হ্যাঁ।' ব'লেই বুঝতে পারলো যে এখনও তাঁদের সন্দেহ ঘোচেনি। তাই সে আরো জুড়ে দিলে : 'এত দুর্বিপাকের মধ্যেও আমি কিছু-কিছু কাগজপত্র বাঁচাতে পেরেছি—আর সে-সব আমার সঙ্গেই আছে। দাঁড়ান, দেখাচ্ছি।'

শাবুদ এসে হাজির করলে সে প্রায় মিনিটখানেকের মধ্যেই : কাপ্তেন গ্রান্টের স্বাক্ষর-সংবলিত চিলতে একটুকরো কাগজ, তাতে এই মর্মে একটা বয়ান যে অমুক মিস্টার আয়ারটন... *ব্রিটানিয়া* জাহাজের কোয়ার্টারমাস্টারের পদে নিযুক্ত হয়েছে। কাগজটা সে তুলে দিলে মেজর ম্যাকন্যাব্‌স-এরই হাতে, কেননা তাঁর হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছিলো তিনি খুব-একটা কড়ামেজাজের লোক, আর্মির কোনো কেউকেটা, শাবুদ ছাড়া কোনোকিছু এককথাতেই বিশ্বাস ক'রে ফেলার পাত্তর তিনি নন। কিন্তু যখন এই জিজ্ঞাসাবাদ ও সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিল করার প্রক্রিয়াটা চলেছে, তখনই প্যাডি ও'মুর একটু মিনমিন ক'রে বলেছিলেন : 'আয়ারটনকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, মেজর। গত দু-মাস ধ'রে তো একে আমি দেখছি—খুব চটপটে কাজের লোক। জাহাজডুবির কথা সে আগেই আমাকে বলেছিলো—তবে অবশ্য এতটা খুঁটিনাটি সমেত বিশদ ক'রে বলেনি।'

মেজর ম্যাকন্যাব্‌স কাগজের ওপর একবার চোখ বুলিয়েই সেটা চালান ক'রে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছিলেন লর্ড এডওয়ার্ডের হাতে। গ্লেনারভনও সেটা আগাপাশতলা খুঁটিয়ে দেখে নিলেন। তারপর সকলের উদ্দেশেই বললেন : 'এখন তাহ'লে কী করা উচিত আমাদের ? আচ্ছা, আয়ারটন, তুমিই বলো—এ-অবস্থায় কী করা যায় ?'

আয়ারটন প্রথমটায় খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কী যেন ভাবলে। তারপর বললে : 'আমাকে যে আপনাদের বিশ্বাস হয়েছে, সেজন্যে আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার নিজের একটা কথা মনে হচ্ছিলো। আমি যে-রকমভাবে তীরে সাঁৎরে উঠে এসে বুনোদের খপ্পরে প'ড়ে গিয়েছিলাম, আমার মনে হয় কাপ্তেন গ্রাণ্টরাও যদি ওরই কাছাকাছি কোথাও ডাঙায় উঠে থাকেন, তাহ'লে *নির্ঘাৎ* জংলিদেরই কবলে পড়েছেন। ওঁদের খোঁজ করতে হ'লে আমাদের গোড়ায় অকুস্থলে যেতে হবে—ঠিক যেখানটায় জাহাজডুবি হয়েছিলো, সেখানে। প্রথম খোঁজখবর সেখান থেকেই শুরু করা উচিত।'

এবার কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস বললেন : 'কিন্তু সেটা তো এক্ষুনি করা যাবে না। জাহাজ মেরামত করতে হবে—তাতে খানিকটা সময় লাগবে। বিশেষত এখানে যেহেতু কোনো জাহাজসারাইয়ের উপযুক্ত বন্দর বা কারখানা নেই, আমাদের তাই একটু অসুবিধের মধ্যেই কাজ করতে হবে।'

এতক্ষণ জাক পাঞায়ল যে কী ক'রে চুপচাপ ব'সে-ব'সে অন্যদের কথাবার্তা বিনাবাক্যব্যয়ে শুনছিলেন, সেটাই আশ্চর্য। তাঁর নিশ্চয়ই কথা বলার জন্যে সারা মুখটাই চুলবুল করছিলো। এতক্ষণ তিনি কেবল উশখুশই করেছেন, কিন্তু লাগসই কোনো কথা ভেবে বার করতে পারেননি। এবার সুযোগ পেয়েই তিনি সরাসরি একটা সিদ্ধান্তই ঘোষণা ক'রে বসলেন—তাঁর একার নেয়া সিদ্ধান্ত : 'তাহ'লে আমরা সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তর বরাবর ডাঙার ওপর দিয়েই যাবো—তাতে এ-অঞ্চলটা সরেজমিন জরিপ ক'রে দেখাও হবে।'

'কিন্তু *ডানকান* ?' জাহাজের নামটার ওপর একটু জোর দিয়েই জিগেস করলে আয়ারটন।

'কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস যদি সঙ্গে থাকেন, তাহ'লে আমরা সোজা ভিক্টরিয়া চ'লে যাবো—না, না, মেলবোর্নেই যাবো—*ডানকান* যেখানে ঠিকভাবে কারখানায় সারাই হবে, সেখানে। আর মেলবোর্নে তাঁদের না-পাওয়া গেলে, *ডানকান* আমাদের তুলে নিয়ে যাবে টুফোল্ডে। এছাড়া মনে রাখতে হবে, আমাদের সঙ্গে মহিলারাও থাকবেন।' পাঞায়ল এ-কথাটা বললেন মেরি আর লেডি হেলেনার দিকে একটি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে।

'আপনি কি ঠাট্টা করছেন নাকি, মঁসিয় পাঞায়ল ?' লর্ড এডওয়ার্ড একটু বুঝি অবিশ্বাসের ভঙ্গিতেই বললেন।

'*ঠাট্টা* ? উঁহু, মোটেই না। কতটাই বা যেতে হবে, ভাবুন তো ? মাত্র তো সাড়ে-তিনশো মাইল পথ। সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তর বরাবর কোথাও যে বুনোরা আছে, এমন কথা আমি কোনো বৃত্তান্তেই পড়িনি। তেমন-কোনো গভীর জঙ্গলই নেই তো জংলিদের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা পাবেন কোথায় ? কোনো হিংস্র জন্তুজানোয়ারও নেই—যদিও এখানে এমন-অনেক জীবজন্তু আছে যা পৃথিবীর অন্য-কোথাও নেই। অনেকটা রাস্তায় রেললাইন আছে, *সুসভ্য শ্বেতাঙ্গরা* আছে ( এখানে *সুসভ্য* কথাটায় বেশ জোরই দিলেন পাঞ্চয়ল, সম্ভবত *বুনো বর্বরদের* সঙ্গে তাদের ব্যবধানটা কথাটায় চাপ দিয়েই তিনি বোঝাতে চাচ্ছিলেন ), গাড়িঘোড়া আছে, বাড়িঘর আছে, বসতি আছে, একটা শাসনযন্ত্র অর্থাৎ সরকারি দফতরও আছে। একটা গাড়িতে ক'রেই, রোজ যদি বারো মাইল পথও চলি, তবে খুব-বেশি ধকল পোহাতে হবে না—একমাসের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাবো অস্ট্রেলিয়ার ও-মাথায়—আপনারা যেমন এডিনবরা থেকে লণ্ডন যান, এ অনেকটা তারই মতো হবে আর-কি !'

এমন-একটা ভঙ্গি ক'রে পাঞ্চয়ল কথাটা বললেন যেন অস্ট্রেলিয়ায় এতটা পথ পাড়ি দেয়া মোটেই কোনো সমস্যাই নয়।

তাঁর জ্ঞানের বহরকে আস্থা জ্ঞাপন ক'রেই লর্ড এডওয়ার্ড এবার লেডি হেলেনাকে জিগেস করলেন—'কী ? যাবে নাকি ?'

লেডি হেলেনা মৃদুহেসে বললেন : 'এক্ষুনি। এতে তো একটা দেশও দেখা হ'য়ে যাবে। স্কটল্যাণ্ডে কতজন ফিরে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার গল্প শোনায় আমাদের ? যত স্কট এখানে আসে, তারা তো সবাই এখানে থেকেই যায়। আমরা বরং ফিরে গিয়ে সবাইকে মেলবোর্নের গল্প শোনাতে পারবো।'

এবার আয়ারটনের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে লর্ড এডওয়ার্ড জিগেস করলেন : 'আর, আয়ারটন ? *তুমি* ?'

আয়ারটন কিন্তু তক্ষুনি হ্যাঁ বা না কিছুই বললে না। কী খানিক ভাবলে একটু। তারপর জিগেস করলে : 'কিন্তু আপনারা কোথায় গিয়ে উঠবেন *ডানকানে* ?'

'অস্ট্রেলিয়ার এ-মাথা থেকে ও-মাথা ঢুঁড়ে ফেলবার আগেই যদি কাপ্তেন গ্রাণ্টের পাত্তা পাওয়া যায়, তবে মেলবোর্নেই গিয়ে আমরা জাহাজে চাপবো। আর, তা *না-হ'লে*, একেবারে পূর্ব-উপকূলে।'

'আর কাপ্তেন ?'

'তিনি জাহাজ নিয়ে মেলবোর্নে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন।'

'ঠিক আছে। প্যাডি ও'মুর যদি আমায় ছেড়ে দিতে রাজি থাকেন, তবে আপনাদের সঙ্গে যেতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কাপ্তেন গ্রাণ্টকে খুঁজে পেলে তাঁকে গিয়ে বলবো—*আই, আই, কাপ্তেন*, বান্দা আবার কাজে যোগ দিতে এসেছে।'

তার এ-কথা শুনে সবাই এতক্ষণ গভীর-গম্ভীর আলোচনার পর একটু যেন স্বস্তির দেখা পেলেন। কথাটা আয়ারটন এমনভাবে বলেছে যে কাপ্তেন গ্রাণ্টের সঙ্গে যেন অচিরেই সকলের দেখা হ'য়ে যাবে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয়ারটনকে ছেড়ে দেবার কথায় প্যাডি ও'মুর তক্ষুনি রাজি হ'য়ে গেলেন। আয়ারটন চৌকশ, চটপটে, কাজের লোক বটে, তবে এঁদের দরকার আরো-বেশি, আরো-জরুরি।

জাহাজ থেকে ছুতোর নিয়ে এলো তার সব সাজসরঞ্জাম—লর্ড এডওয়ার্ড তক্ষুনি তাকে গাড়ি তৈরির কাজে লাগিয়ে দিলেন। এ-সব ব্যাপারে অকারণে ধানাইপানাই ক'রে সময় নষ্ট করা তাঁর ধাতে নেই—সিদ্ধান্ত একবার নিয়ে ফেললে তক্ষুনি সে-কাজটায় লেগে না-পড়লে তিনি যেন স্বস্তি পান না। সমস্ত কাজটা তদারক করার দায়িত্ব নিলে আয়ারটন—সেও তক্ষুনি কাজে লেগে পড়তে চায়। ছ-জোড়া বলদে-টানা কুড়ি ফিট লম্বা চারচাকার গাড়ি হবে—তাতে যাবেন মহিলারা। পুরুষরা সবাই ঘোড়ার পিঠে। গাড়ির মধ্যেই রসুই পাকাবার ব্যবস্থা থাকবে, রসদ থাকবে।

কাজকর্মের প্রাথমিক প্রস্তুতিটা সারা হ'তেই আয়ারটনকে *ডানকানে* নিয়ে এলেন লর্ড এডওয়ার্ড। *ডানকান* মূলত প্রমোদতরী—বিলাসব্যবস্থার কোনো ঘাটতি নেই তাতে—কিন্তু বিলাসের এতসব উপকরণের দিকে আয়ারটনের কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। সে সরাসরি এসে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলো এনজিনঘর, জাহাজের গড়ন, খোল, মাস্তুল, বয়লার। ঘণ্টায় সতেরো নট যেতে পারে *ডানকান*—এ-কথা শুনে এতটাই অবাক হ'লো যে তার চোখদুটো যেন চকচক ক'রে উঠলো। তাহ'লে তো সবচেয়ে-তেজি সবচেয়ে-ক্ষিপ্র যুদ্ধজাহাজও পাল্লা দিতে পারবে না এই জাহাজের সঙ্গে।

'তা তো পারবেই না,' একটু গর্বের সুরেই বললেন লর্ড এডওয়ার্ড, '*ডানকানকে* তৈরিই করা হয়েছে দৌড়ের বাজিতে জেতবার জন্যে।'

'ওজন কত জাহাজের?'

'দুশো দশ টন।'

ঘুরে-ঘুরে সারা জাহাজটাকেই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে নিলে আয়ারটন। তার কৌতূহলের যেন শেষ নেই কোনো। দেখে নিলে কোথায় কী হাতিয়ার, কোথায় কী অস্ত্রশস্ত্র আছে। একেবারে-ঝকঝকে একটি অত্যাধুনিক কলকব্জায় তৈরি জাহাজ, এনজিনের শক্তি কত শুনে সে গোড়ায় যেন কথা বলবার শক্তিই হারিয়ে ফেললো। আজকাল যে এ-রকম শক্তিশালী সব জাহাজ তৈরি হচ্ছে এটা জেনে সে বললে, 'আমরা যখন ব্রিটানিয়াকে ঝড়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা ক'রেও ব্যর্থ হচ্ছি, তখন ইওরোপ কিনা এমন-সব জাহাজ বানাচ্ছে যা সবচেয়ে দুরন্ত ঝড়কেও আর ভয় পায় না। ঈশ, যদি এ-রকম একটা জাহাজ থাকতো আমাদের, তাহ'লে অমনভাবে ঝড়ে-খেপে-যাওয়া সমুদ্রে আমাদের জাহাজডুবিও হ'তো না—অমন দুর্ভোগও পোহাতে হ'তো না।'

'তখন না-হোক, এখন তো এ-জাহাজে তুমি কাজ করতে পারো,' তার অমন খুশি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখে বললেন লর্ড এডওয়ার্ড, 'হয়তো একদিন তুমিও এ-রকম কোনো জাহাজের কাপ্তেন হ'য়ে বসতে পারো।'

'*যদি হ'তে পারি*,' এমন ভাবে আয়ারটন কথাটা বললে তাতে মনে হ'লো, এ-রকম কোনো জাহাজ হাতে পেলে সে বুঝি স্বর্গসুখও প্রত্যাখ্যান করতে রাজি আছে।

আয়ারটনকে বেশ ভালো লেগে গিয়েছিলো লর্ড এডওয়ার্ডের। আয়ারটন জাহাজ থেকে নেমে গেলে লর্ড এডওয়ার্ড মন্তব্য করলেন, 'লোকটা সত্যি খুবই সপ্রতিভ আর বুদ্ধিমান—কাপ্তেন গ্রাণ্ট সম্ভবত লোক চিনতে পারতেন—'

'তা জানতেন কিনা, কে জানে,' বললেন মেজর ম্যাকন্যাব্‌স, 'তবে লোকটা বোধহয় অতিরিক্ত-বুদ্ধিমান। এত-বুদ্ধি সইলে হয় !' তাঁর বিচ্ছিরিভাবে মুখবেঁকানো দেখে বোঝা গেলো আয়ারটনকে তাঁর আদপেই পছন্দ হয়নি। খাবারটেবিলেও তিনিই আয়ারটনকে সবচেয়ে-বেশি কূট প্রশ্ন করছিলেন।

গাড়িটা তৈরি হ'য়ে যেতেই, আর যেন তর সইলো না কারু। ২৩শে ডিসেম্বর ১৮৬৪ সালের সকালবেলায় শুরু হ'লো দক্ষিণ গোলার্ধের এই অন্যমহাদেশটায় তাঁদের অভিযান। বলদে-টানা গাড়িটায় রইলেন মেরিকে নিয়ে লেডি হেলেনা, আর গাড়োয়ান হ'লো আয়ারটনই—এদিককার পথঘাট অন্যদের তুলনায় তারই বেশি চেনা। পেছনে চললো সশস্ত্র সাতজন অশ্বারোহী—লর্ড গ্লেনারভন, মেজর ম্যাকন্যাব্‌স, জাক পাঞ্চয়ল, রবার্ট গ্রাণ্ট, কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স—আর *ডানকানেরই* দুজন বাছাই-করা নাবিক।

আয়ারটন শুধু একবার বলেছিলো এখানকার পথঘাটে নিরাপত্তার জন্যেই সঙ্গে আরো লোক থাকা দরকার। আরো-কয়েকজন নাবিক সঙ্গে থাকলে তার মতে আরো-নাকি বেশি-নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো। কিন্তু লর্ড এডওয়ার্ড আর কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স আলোচনা ক'রে এই সিদ্ধান্ত পৌঁছুলেন যে, মেলবোর্নে গিয়ে জাহাজ মেরামতের কাজটা তাড়াতাড়ি সারবার জন্যে বেশি নাবিক থাকা দরকার জাহাজটাতেই। তাছাড়া প্রত্যেকের সঙ্গেই যেহেতু যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র আছে, তাতে এই সাত অশ্বারোহীই পথে কোনো গণ্ডগোল হ'লে সব সামলাতে পারবে।

আগেই আলোচনা ক'রে স্থির হ'য়েছিলো এই দলটা যখন ডাঙায় কাপ্তেন গ্রাণ্টের খোঁজ নিতে-নিতে মেলবোর্নের দিকে যাবে, তখন টম অস্টিনই জাহাজ নিয়ে যাবে মেলবোর্নের জাহাজসারাইয়ের ঘাঁটিতে। টম অস্টিন কাজের লোক, দায়িত্ব সম্বন্ধে সে পুরোপুরি সচেতন, আর ভালো নাবিক হবার যেটা সবচেয়ে বড়োগুণ সেটাও তার আছে—গভীর সংকটের সময়ও সে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

## তিন

# ছুঁড়ে মারলেও যা হাতে ফিরে আসে, ফের

অস্ট্রেলিয়া একটি বিশাল মহাদেশ, কিন্তু এর বেশিরভাগ অংশই জনমানবহীন, কোথাও দুর্গম অরণ্য, কোথাও-বা দুরারোহ পর্বত, এই যদি উপত্যকার মস্ত অংশ জুড়ে থাকে ঝোপঝাড় গাছপালা—পরক্ষণেই বিশাল বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তৃষ্ণায় জিভ চাটে রুক্ষ, ঊষর, ধূ-ধু ধুলোর মরুভূমি। লোকালয় যা আছে, সবই সমুদ্রের তীর ঘেঁসে গ'ড়ে-ওঠা উপনিবেশে; সমুদ্রতীর থেকে যত-দূরে কেউ যাবে, যত দেশটার ভেতরে ঢুকবে, ততই দেখতে পাবে আস্তে-আস্তে বিরল হ'য়ে আসছে বসতি, ক্রমে চোখে পড়বে যে কোথাও কোনো মানুষজন নেই—এমনকী দেশটার আদি বাসিন্দারা অব্দি খুব-একটা অভ্যন্তরে যায় না। আর এই ভিতরদেশকেই বলে *আউটব্যাক*।

এখানে আকাশটা অব্দি অন্যরকম, ভিন্নরকম। যে-তারা ইওরোপের লোক দ্যাখে আকাশের পুবে, এখানে সেটা ওঠে পশ্চিমে—যেটা দেখা যায় ইওরোপের গ্রীষ্মেবসন্তে, সেটা এখানেও দেখা যায় গ্রীষ্মেবসন্তে—কিন্তু এখানে যে ঋতুগুলোই উলটে গিয়েছে। তাঁরা রওনা হয়েছেন ডিসেম্বরের শেষে, আর দু-দিন পরেই বড়োদিন, অথচ এখানে তাপমানযন্ত্র দেখায় গরম এমনকী ১১০ ডিগ্রি ফারেনহাইটকেও ছাপিয়ে গিয়েছে, যেখানে-যেখানে পথে গাছপালা পড়ে তার পাতাটুকু অব্দি নড়ছে না, হলকায় যেন ঝিম ধ'রে আছে সব, প্রায় যেন থমথমে, নিশ্চল। আর এই ধরনের আবহাওয়ায় অনভ্যস্ত এই অভিযাত্রীরা গরমে যেন ধুঁকতে শুরু ক'রে দিয়েছেন, যেটা হ'লো হাঁসফাঁস করারও পরের অবস্থা।

দেশটা গ'ড়ে উঠেছে—আদিবাসিন্দাদের যথাসম্ভব পরিকল্পনামাফিক খতম ক'রে দেবার পর অথবা *আউটব্যাকে* রে-রে ক'রে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার পর—*ফরচুনহা'টার্সদের* দ্বারা, যে-সব ডাকাবুকো গাটাগোট্টা লোকেরা নিজেদের নাম বলে *ভাগ্যান্বেষী*, কেউ হ'য়ে যায় *বুশম্যান*, ঝোপ-ঝপ্পড়ের দস্যু, অতর্কিত চড়াও হয় জনপদে, আর ছিনিয়ে নিয়ে যায় সবকিছু—এইসব বাপেতাড়ানো মায়েখেদানো দুর্দান্ত গুণ্ডার দল। এরা নিজেদের দেশে হয়তো খেতে পেতো না, জমিদারের অত্যাচারে জেরবার হ'য়ে যেতো, সংগঠিত প্রতিবাদ করবারও সাহস হ'তো না কখনও, কাজেই দু-একটা হাতিয়ার আর নিজের প্রাণটা সম্বল ক'রে এরা এই দূর-দেশে, অন্য-একটা গোলার্ধেই, আরেকটা *হেমিস্ফিয়ারেই*, পাড়ি জমিয়েছে। অন্য-যারা আছে তারা অধিকাংশই কয়েদি—কেননা ইংরেজ সরকার এই উপনিবেশটা গ'ড়ে তুলেছে *পিনাল কলোনি* হিশেবে—ইংলণ্ডের মতো ছোট্ট দ্বীপ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে—নির্বাসনই, কেননা আস্ত-একটা মহাদেশকে তো আর দ্বীপান্তর বলা যায় না—যতরাজ্যের দুষ্কৃতকারীদের ; সেইসঙ্গে রাজনৈতিক কারণে যারা সরকারের চক্ষুশূল, তারাও বাদ যায়নি—আর অনেকে পালিয়ে এসেছে স্বেচ্ছায়, যখন শুনেছে সরকারের চরদের নেকনজর পড়েছে তাদের ওপর। আর এইসব কয়েদিদের দিয়ে *বিনামজুরিতে* খাটিয়ে নেবার কাজটা করাবার জন্যে আছে নির্মম নিষ্ঠুর যত ওয়ার্ডেন আর ওয়ার্ডারের দল—ইওরোপ থেকে প্রায়-একটা আস্ত কঠোরনির্মম শাসনব্যবস্থাই পরিকল্পনামাফিক তুলে এনে বসিয়ে দিয়েছে ইংরেজরা, যাদের রাজত্ব এখন এতই বিশাল, আর এতই ছড়ানো যে সে-রাজত্বে নাকি ককখনো সূর্যও ডোবে না, মনুষ্যত্ব যদি সাগরজলে সমাধি পায় তো সে অন্যকথা। শুধু-যে অচেনা প্রকৃতিই এখানে বিরূপ তা-ই নয়, মানুষজনগুলোও বুঝি তারই সঙ্গে মানিয়ে হ'য়ে উঠেছে রুক্ষ, কর্কশ, আর সারাক্ষণ তারা নিজেরাই খাটে অথবা তাদের দিয়ে উদয়াস্ত খাটিয়ে নেয়া হয় ব'লে, পিঠ বাঁকিয়ে সারাক্ষণ নুয়ে ঝুঁকে কাজ করতে হয় ব'লে তীব্রতীক্ষ্ণ রোদ্দুরে যাদের ঘাড় চিংড়িমাছের মতো টকটকে-লাল হ'য়ে গেছে, আর সেইজন্যেই যাদের নাম হয়েছে *রেডনেক*, আর *রেডনেক* বললেই বুঝতে হবে যে ঘরে ব'সে পুথিপত্তর প'ড়ে দর্শন আলোচনা করার কপাল ক'রে তারা জন্মায়নি। শাসনযন্ত্র, *স্বাভাবিকভাবেই*, এর সঙ্গে মানানসই। রাজপুরুষরা আছে, আর আছে সেপাইশান্ত্রী, উর্দি, সমরবাহিনী, কাড়ানাকাড়া, বিউগল, আর তারই সঙ্গে জড়ানো যাবতীয় আনুষঙ্গিক লেজুড়। পৃথিবীটাকে এখানে উলটে দিয়ে যেন অন্য-গোলার্ধের যাবতীয় বিষয়বস্তুও এখানে এনে পুঁতে দেয়া হয়েছে। তবে প্রকৃতি তো শূন্যতার স্বভাববিরোধী—সে এই মানুষগুলোকে দিয়েই গান গাওয়ায়, ব্যালাড বা গাথা, অভিযাত্রীদের কাহিনী, বীরদের কাহিনী, দস্যুদের কাহিনী, সেই-যে এক দস্যু ছিলো যার নাকি পায়ের আঙুল ছিলো সাতটা—না, তার গোড়ালি অবশ্য ওলটানো ছিলো না।

তাই এই অভিযাত্রীরা বেরুবার আগে আয়ারটন ভয়ে-ভয়েই বলেছিলো, সঙ্গে আরো-কয়েকজন সশস্ত্র নাবিক নিয়ে গেলে হ'তো না—আত্মরক্ষার সুবিধে হ'তো যদি অতর্কিতে কোনো ঝোপঝপ্পড় থেকে বিপদ এসে ঝাঁপিয়ে পড়তো লর্ড গ্লেনারভনের এই বহরটার ওপর। কেননা লোকালয়গুলো এতই দূরে-দূরে যে হঠাৎ আক্রান্ত হ'লে সাহায্য আসার সম্ভাবনা তো সুদূরপরাহত। কিন্তু লর্ড গ্লেনারভনের হিশেবটা ছিলো অন্যরকম। সাঁইত্রিশ ডিগ্রি অক্ষরেখা বরাবর অঞ্চলটা তেমন জনমানবহীন নয়—সমুদ্র দূরে নেই ব'লেই এখানে একটু পরে-পরেই উপনিবেশের লোকেরা বসতি বসিয়েছে।

অতর্কিতে কোনো হামলা হ'লে তাকে সামলাবার জন্যে সবাইকেই সবসময় সজাগ থাকতে হবে, অলিখিত নির্দেশটা দেয়া ছিলো এ-রকমই। কিন্তু যে-হামলাটা শুধু আচম্বিত নয়—হয়তো অপ্রত্যাশিতও ছিলো—শুধু হামলার বহর আর বাহারটাই নিশ্চয়ই জানা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলো না—সেই হামলাটা যখন এলো তখন তাকে ঠেকাবার ক্ষমতা দেখা গেলো কারুই প্রায় নেই। হামলাটা এলো খুদে-খুদে সব পোকামাকড়ের কাছ থেকে, মশার কাছ থেকে, কামড়ে ফুলিয়ে ঢোল ক'রে দেয় এমন-জাতের মাছির কাছ থেকে। বীলজেবাবকে যে *পবিত্র ধর্মগ্রন্থে* অর্থাৎ *বাইবেল*-এ পতঙ্গদেব বলেছে, *লর্ড অভ দ্য ফ্লাইস্* বলেছে, তা কি এইজন্যেই? কেননা সেই সকাল থেকে একটানা চ'লে যখন *আউটব্যাকের* মধ্যে অর্থাৎ গাছপালাবিহীন বিশাল একটা প্রান্তরে এসে পৌঁছুলো বহর, তখনই প্রথম দেখা হ'লো পতঙ্গদেবের এইসব অনুচরদের সঙ্গে, এবং প্রথম সাক্ষাতেই তাদের বিকট মাখামাখিতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্ব'লে গেলো, যেন সর্বাঙ্গে কতগুলো কাঁকড়াবিছে কামড়েছে।

তাদের এই নাছোড় আদরে সবাই যখন কাৎরাচ্ছে তখন আয়ারটনের পরামর্শে গায়ে অ্যামোনিয়া ঘ'সে কোনোরকমে জ্বলুনি একটু কমলো। একে অসহ্য গরম, তারপর এই মশামাছির উৎপাত : সোনার ওপর যেন সোহাগা। ঠা-ঠা রোদ্দুরে একটুও ছায়া নেই কোথাও। গাছপালা থাকলে তো ছায়া থাকবে। সন্ধের দিকে অবশ্য তাপমানযন্ত্র একটু দয়া করলো, আর এবার ছোটোখাটো ঝোপঝাড়ও দেখা দিতে লাগলো—অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ার সেই বিখ্যাত *বুশ*—যার আড়ালে নাকি লুকিয়ে থাকে ডাকাতরা, এখানকার লোকে যার নাম দিয়েছে *বুশ-রেনজার*, ঝোপঝপ্পড়বাজ।

শুধু কাপ্তেন গ্রাণ্টের কোনো খোঁজ পাবার তাড়াতেই যেন এই জনমানবহীন প্রান্তর পেরিয়ে এলো বহর, দু-দিন প্রায়-একটানা চ'লে পেরুলো ষাট মাইল। এই খাঁ-খাঁ প্রান্তরে, ধূ-ধূ মাঠে কোথায় কার কাছে জিগেস ক'রেই বা জানা যাবে কাপ্তেন গ্রাণ্টের হদিশ কেউ জানে কি না। যতক্ষণ-না কোনো লোকালয় আসে, ততক্ষণ এভাবেই হুড়মুড় ক'রে চলতে হবে তাঁদের। সবাই ভেবেছিলো মেরি আর রবার্ট বুঝি পথের এই ধকলে একেবারে কাহিল হ'য়ে পড়বে। কিন্তু একবার যখন আয়ারটন তাদের জানিয়েছে এই অস্ট্রেলিয়ার কাছে এসেই ডুবেছে *ব্রিটানিয়া* আর কাপ্তেন গ্রাণ্ট যদি সলিলসমাধি থেকে বেঁচে থাকেন, তবে এই অস্ট্রেলিয়াতেই নিশ্চয়ই কোথাও আছেন, তারপর থেকেই যেন স্নায়ুর উত্তেজনা তাদের টানটান ক'রে রেখেছে, পথের কোনো কষ্টই তারা গায়ে মাখছে না।

যদি-বা এখনও কাপ্তেন গ্রাণ্টের কোনো সন্ধান না-পেয়ে তারা মুষড়ে প'ড়ে থাকে, তবে অন্যদের মতো তাদেরও আমোদ (না কি প্রমোদ) জোগাবার জন্যে তো আছেনই জাক পাঞয়ল, আরামকেদারার ভূগোলতাত্ত্বিক, পুঁথির পাতায় যা-যা পড়েছেন, তাতেই যেন অস্ট্রেলিয়া তাঁর একেবারে নখদর্পণে এসে গিয়েছে। এই মহাদেশ সম্বন্ধে যা-সব তাজ্জব কাহিনী তিনি শোনালেন, তার কতটাই যে সত্যি আর কতটাই যে মনগড়া, তা-ই বা বিচার করবে কে?

সে-রাতে যখন *ক্রাউন ইন* নামে একটা সরাইখানায় বড়োদিনের ভোজের আসর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জমেছিলো, সেদিনই গোটা ভোজসভাটাই মাত ক'রে দিয়েছিলেন পাঞ্চয়ল, এই মহাদেশ সম্বন্ধে বিচিত্র-সব *তথ্য* শুনিয়ে। এখানকার নাকি সবকিছুই অদ্ভুত—একবার তো তিনি স্বীকারই ক'রে ফেললেন যে এখানকার জল-মাটি-আকাশ এতই বিস্ময়কর যে প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা নাকি এখনও এই মহাদেশের ভূসংস্থানের রহস্যটাই ভেদ করতে পারেননি। যেন একটা চ্যাপটা বাটির মতো এই মহাদেশটা, কিনারটা উঁচু, মাঝখানটা নিচু হ'য়ে এসেছে। মাটি খুঁড়লে এখনও নাকি পাওয়া যায় সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল, জীবাশ্ম—হয়তো বহুকাল আগে কোনো প্রকাণ্ড অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই সাগরতল থেকে উঠে এসেছিলো এই দেশ, আর মাটির তলায় এখনও এমন-সব অদ্ভুত চিহ্ন র'য়ে গেছে যা থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে আস্ত এই মহাদেশটাই একদিন—সে-যে কতকাল আগে কেউ জানে না—ছিলো সমুদ্রের তলায়। এখন এর নদীগুলো অব্দি শুকিয়ে যাচ্ছে, কত জায়গায় যে মরা নদীর সোঁতা দেখা যায় তার ইয়ত্তা নেই। ক্রমশই বিকট হা ক'রে এগুচ্ছে এর মরুভূমিগুলো, আর জলমাটিআকাশবাতাস থেকে শুষে নিচ্ছে সব আর্দ্রতা। অথচ এখানে এমন-অনেক গাছ আছে যারা প্রতিবছর তাদের পাতা ঝরায় না, শুধু গাছের বাকলগুলো খ'সে পড়ে—যেন সাপের মতো তারা খোলশ পালটাচ্ছে। অন্যসব দেশে পাতাগুলো সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, এখানে যেন রোদ্দুর এড়াবার জন্যে তারা একটু পাশ ফিরে থাকে—ফলে যেখানে গাছপালা আছে সেখানেও তারা ছায়া দেয় না। এখানকার ঝোপঝাড়গুলো বেঁটে-বেঁটে, শুধু ঘাসগুলো মাথা ছাড়িয়ে ওঠে, এমনই রাক্ষুসে তাদের বাড়।

আর তারপর যখন জীবজন্তুর কথা পাড়লেন জাক পাঞ্চয়ল, তখন বড়োদিনের ভোজসভা হ'য়ে উঠলো যেন জীববিদ্যারই ক্লাস। তাঁর ধারণা, অস্ট্রেলিয়ায় যেন চিরকাল ধ'রে একটা *গো অ্যাজ ইউ লাইক* অর্থাৎ ভোল পালটে সকলের সামনে অন্যবেশে আবির্ভূত হবার একটা প্রতিযোগিতা চলেছে।

রবার্ট মাঝখানে ফোড়ন কেটেছিলো : 'তার মানে এখানকার জীবজন্তুরা কি সবসময়েই অন্য জীবজন্তুর চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ? তাহ'লে তো তারা অন্য জীবজন্তুই —যতক্ষণ-না আমরা তাদের *সত্যিকার চেহারা কী*, সেটা জানতে পারছি—'

'না, তা বলছি না। তবে আমরা যে-সব জীবজন্তু দেখে অভ্যস্ত, সে-রকম জীবজন্তুর চাইতে অন্যরকম জীবজন্তুরাই বেশি এখানে।'

'তাহ'লে তাদের অন্য নাম দিন পণ্ডিতরা—কেন তারা বলবেন যে অমুক জীব তমুক জীবের ভোলটা নিয়ে গিয়ে অন্যভাবে সেজেছে।'

এবার মেজর ম্যাকন্যাবস একটা সুচিন্তিত টিপ্পনী কাটলেন। 'লোকে যেখানেই যায়, সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায় নিজের দেশ, নিজের ভাষা, নিজের সংস্কৃতি। অর্থাৎ অচেনা জায়গায় তারা সঙ্গে ক'রে ব'য়ে নিয়ে যায় নিজেদের অ্যাদ্দিনকার চেনা চৌহদ্দিটাই।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি যেখানেই যাও, নিজেকে এড়িয়ে তুমি যাবে কোথায়?'

জাক পাঞয়ল এবার তাতে সায় দিয়েছেন। 'হ্যাঁ, এ-কথাটা ঠিক। কোনো চতুষ্পদ জন্তু যদি মুখটা শান দেয়া ছুরির ফলার মতো ছুঁচলো ক'রে পাখির মতো চঞ্চু নিয়ে ঘুরে বেড়ায়—'

'তাহ'লে সারস আর শেয়ালের নেমন্তন্ন খাবার যে-গল্প ঈশপ এককালে ফেঁদেছিলেন, সে-গল্প এখানে মোটেই খাপ খাবে না।'

'বিখ্যাত পর্যটকরা কত সময়েই কত-কিছু যে নিজের চোখে দেখেছেন ব'লে দাবি করেছেন, তার আর-কোনো ইয়ত্তা নেই। কেউ দাবি করেছেন তিনি দেখেছেন এমন বিরাট সরীসৃপ যে নাকি অনবরত মুখ দিয়ে আগুনের হলকা বার ক'রে দিচ্ছে। একজন হলফ ক'রে বলেছেন তিনি নাকি এমন শুওর দেখেছেন যাদের নাভিকুণ্ডলি ছিলো তাদের পিঠে—পেটে নয়। একজন তো এমনও বলেছেন তিনি এমন-সব বেঁটেখাটো জীব দেখেছেন যাদের মুণ্ডু আর কানগুলো খচ্চরের মতো, শরীরটা উটের, পাগুলো হরিণের, আর তারা নাকি ঘোড়ার মতোই চিহি-চিহি ডাকে। কেউ যদি দিব্বি গেলে বলেন তিনি দেখেছেন গ্রিফিন, কিংবা ফিনিক্স পাখি, যদি বলেন জ্বলন্ত আগুনের কুণ্ড থেকেই তিনি একটা পাখিকে উঠে আসতে দেখেছেন, যে তার ডানা ছড়িয়ে আকাশে উড়ে চ'লে গেলো, তবে হয় আমরা তাঁর কথা বিশ্বাস করবো, আর নয়তো বলবো গাঁজাখুরি, উদ্ভট, কিম্ভূত—' লর্ড এডওয়ার্ড হয়তো আরো-সব তাজ্জব নমুনা হাজির করতেন নামজাদা-সব পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে, কিন্তু জাক পাঞয়ল তাঁকে কথা শেষ করতে না-দিয়েই থামিয়ে দিয়েছিলেন। কোনো আসরের মধ্যে তিনি হাজির থাকতে আর-কেউ যে মধ্যমণির মুখ্য ভূমিকাটা কুক্ষিগত করবে, এটা যেন আদপেই তাঁর মনঃপূত নয়।

'প্রকৃতি অন্তত কখনও উদ্ভট-কিছু বানিয়ে কোনো এক্সপেরিমেণ্ট করে না। সে জীবজন্তু তৈরি করে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়েই। ফলে সে যদি এমন জীব তৈরি করে যে তার ছানাগুলোর বাসা নিজের শরীরের সঙ্গেই ব'য়ে নিয়ে যাবে, তবে নিশ্চয়ই বুঝতে হবে যে মায়ের দেহের সঙ্গে এঁটে না-থাকলে পরিবেশ ঐ ছানাগুলোকে বাঁচতেই দেবে না। ক্যাঙারু যদি তার ছানা *রু-দের* পেটের মধ্যে থলে বানিয়ে তাতে পুরে রাখে, আর ছানাগুলো যদি ঐ পেটের থলে থেকে মাঝে-মাঝে চোখ ছানাবড়া ক'রে চারদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দ্যাখে, তবে প্রথম দেখে অপ্রস্তুত-কেউ ব্যাপারটা না-জেনেই ভেবে বসতে পারে যে সে এমন-কোনো জীব দেখেছে যার দু-জোড়া চোখ আছে—একজোড়া কপালে, একজোড়া পেটে। কিংবা কেউ যদি দ্যাখে মরালের মতো কোনো পাখি জলে ভেসে বেড়াচ্ছে অথচ যে-কিনা কুচকুচে কালো তবে সে হয়তো ভাববে কবিরা এতকাল যে কালো মরালের কথা ব'লে এসেছিলো, সে বুঝি তা-ই দেখেছে। স্থানীয় লোকে যে তার অন্য কোনো নাম দিতে পারে এটা তার মাথাতেই আসবে না।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সুতরাং?' রবার্ট মোক্ষম প্রশ্নটা ক'রে বসেছে তখন।

'সুতরাং, এটা ধ'রে নিতেই হবে যে, গোড়ায় লোকে চেনা জীবজন্তুর সঙ্গেই তার আদল খুঁজে বার ক'রে চেনা নামেই ডেকেছে তাদের, বলেছে এটা রাজহাঁস বটে, তবে ধবধবে-শাদা নয়, বরং কালো মরালই এটা। অন্তত এটা তো মানতেই হবে যে অস্ট্রেলিয়া অন্যরকম—তার জীবজন্তুও অন্যরকম হবে। এই-তো, আজ বড়োদিন, কিন্তু কোথায় সেই *হোয়াইট ক্রিসমাস*—ঠাণ্ডা কোথায়, বরফ কোথায়, সান্তাক্লসের শ্লেজগাড়ি কোথায়। আমরা তো এখন লু-বওয়া তপ্ত হাওয়ায় ধুঁকছি! এমন সৃষ্টিছাড়া বড়োদিনে কেউ কি *ক্যারল* গাইবে এখন যে *হোয়াইট নাইট সাইলেন্ট নাইট* যখন রাতচরা পাখিগুলো কেউ ঠকঠক, কেউ সাঁই-সাঁই, কেউ কর্কশ ধাতব স্বরে ডেকে উঠছে—রাত মোটেই চুপচাপও নয়, শাদাও নয়।'

এমন অকাট্য প্রমাণের পর অবশ্য সবাই একবাক্যে তখন স্বীকার ক'রে নিয়েছেন যে অস্ট্রেলিয়ার সবকিছুই সৃষ্টিছাড়া বেয়াড়া, উদ্ভট।

*ক্রাউন ইন*-এ বড়োদিন কাটাবার পর থেকে সমানে এগিয়ে চলেছে বহর—কখনও বিশাল তরুলতাউদ্ভিদবিহীন প্রান্তর, কখনও-বা সেই বেঁটে ঝোপঝাড়, অথবা উঁচু-উঁচু ঘাসবন। আর এ-রকমই একটা ঘাসবনের কাছে এসে একদিন দেখা গেছে মস্ত আরেকটা বহর চলেছে ঘাসবনের মধ্যে দিয়ে—ঘাস খেতে-খেতে। মানুষের সঙ্গে কুকুর আর ঘোড়া নিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে অজস্র গোরুমোষ, কয়েক হাজার ভেড়া, এমনকী সওয়ারবিহীন বেশকিছু ঘোড়াসমেত। এই বিরাট শোভাযাত্রা পাশ দিয়ে চ'লে যেতে অনেকক্ষণ লাগিয়ে দিয়েছে। আয়ারটন জানিয়েছে এদের নাকি শস্তায় কেনা হয়েছে নীলগিরিতে—অর্থাৎ ব্লুমাউন্টেনে—হাড়জিরজিরে রোগাপটকা সব জীব, উপযুক্ত খাদ্য নাকি সেদিকটায় নেই, এবারকার খরায় সেদিকে সব জ্ব'লে-পুড়ে গিয়েছে। এখন ঘাসবনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে-যেতে এদের খাইয়ে-দাইয়ে নধর করা হচ্ছে, তারপর মাঠে চরিয়ে তাকৎ ফিরিয়ে এনে বিক্রি করবে চড়া দামে—যাদের খেতখামার আছে তারা এ-সব বেশিদাম দিয়েই কিনে নেবে।

তারপর সামনে পড়লো—এই-প্রথম—এমন-একটা সোঁতা, যাতে সত্যি-সত্যি কুল কুল ক'রে জল ব'য়ে যাচ্ছে—মরানদী নয়, জলজ্যন্ত নদী-একটা। তার নাম উইমেরা নদী।

অ্যাদ্দিন পথে পড়েছে মরানদীর খাত, কিংবা সরু সুতোর মতো এইটুকু জলের ধারা। ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে পেরিয়ে যেতে কোনো মুশকিলই হয়নি, বলদে-টানা গাড়িটা অনায়াসেই পেরিয়ে গেছে সেইসব স্রোতোধারা। এবার কিন্তু বলদে-টানা গাড়িটা নদী পার করতে গিয়ে বিস্তর বেগ পেতে হ'লো, শুধু আয়ারটনের বুদ্ধিমত্তা আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বেই কোনো অপঘাত দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেলো বহর। জায়গাটা নাকি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে যখন টহল দিয়ে বেড়িয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়, এ-মোড় থেকে ও-মোড়, তখনই চিনে নিয়েছে। ফলে সে জানে উইমেরা নদীর কোনখানে জলের ঢল বেশি, কোথায় সেখানে শুধু হাঁটুজল থাকে।

মেজর ম্যাকন্যাব্‌স অবিশ্যি মাথা নেড়েছেন দু-একবার। আয়ারটন যদি *ব্রিটানিয়া* জাহাজ থেকে ছিটকে প'ড়ে থাকে জলে, আর তারপর কাজের ধান্ধায় জীবিকার খোঁজে পুরো অঞ্চলটা চ'ষে ফেলেও থাকে *একবার*, তবু এখানকার সবকিছু সে তার নিজের হাতের চেটোর মতো এমনই ভালোভাবে চেনে যে মনেই হয় না মাত্র একবারই সে এ-সব অঞ্চলে এসেছিলো।

নদী পেরুবার পর অন্যপারে এসেই আয়ারটন একটু ছুটি চাইলে। এই নদী পেরুতে গিয়ে বলদগুলো বেকায়দায় টান দিয়েছিলো ব'লে গাড়িটা কয়েক জায়গায় জখম হয়েছে, নড়বোড় করছে, আরেকটু ধকল গেলেই জোড়গুলো হয়তো খুলে আসবে। তাছাড়া কারু-কারু ঘোড়ার নালও খুলে গিয়েছে, সেগুলো লাগাতে হবে। 'এখান থেকে মাইল-বিশেক দূরে *ব্ল্যাকপয়েন্ট* নামে একটা রেলস্টেশন আছে,' আয়ারটন জানিয়েছে, 'সেখানে ছোটোখাটো একটা লোকালয় গ'ড়ে উঠেছে। আর সেখানে মিস্ত্রি আছে, ছুতোর, কামার, তাঁতি থেকে হাতুড়ে ডাক্তার অব্দি। গাড়িটা মেরামত করতে হবে, ঘোড়ার নালও লাগাতে হবে—আমি শুধু যাবো, আর মিস্ত্রি নিয়ে ফিরে আসবো। সব ঠিকঠাক হ'লে মাত্র চোদ্দ-পনেরো ঘণ্টা লাগবে আমার।'

'ঠিক আছে, আয়ারটন।' লর্ড এডওয়ার্ড বলেছেন, 'তুমি ফিরে না-আসা অব্দি আমরা সবাই তাঁবু খাটিয়েই ব'সে থাকবো। তাছাড়া এ-কদিনের রাস্তার ধকলে সবাই বেশ ক্লান্তও হ'য়ে পড়েছে, এই উপলক্ষে একটু বিশ্রাম ক'রে নিয়ে ফের বেশ টাটকা হ'য়ে নেয়া যাবে। তাছাড়া সন্ধেও হ'য়ে এসেছে—এমনিতেই আমাদের এখন না-হোক একটু পরেই তাঁবু খাঁটাতে হ'তো।'

আয়ারটন যখন বলছিলো যে তাকে ব্ল্যাকপয়েন্ট স্টেশনে গিয়ে মিস্ত্রি ডেকে আনতে হবে, তখন মেজর ম্যাকন্যাব্‌স পাশে দাঁড়িয়েই সব কথাবার্তা শুনছিলেন। এভাবে তার একা-একা, সঙ্গীসাথী বিনাই, তাঁবু ছেড়ে চ'লে যাবার প্রস্তাবটা ম্যাকন্যাব্‌সের মোটেই মনে ধরেনি। কী-একটা বলতে গিয়েও কথাগুলো তিনি যেন গিলে ফেললেন। মিথ্যেমিথ্যি তাঁর সন্দেহের কথাটা উঠিয়ে লাভ কী? তাছাড়া, সত্যি-তো, এ-সন্দেহের পেছনে সত্যিকার-কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ তো তাঁর নেই, শুধু-একটা অনুভূতি, মনের ভেতরে কোথায় যেন অস্পষ্ট-একটা কোণে খচখচ ক'রে কী-একটা কাঁটা বিঁধছে—আর এ-ধরনের অনুভূতিকে পাত্তা দেয়াটা তাঁর ধাতে নেই, যুদ্ধক্ষেত্রে কেউ নিছক অনুভূতির ওপর নির্ভর ক'রে কোনো রণকৌশল তৈরি করে না, সবসময়েই সেখানে চাই হাতেনাতে কোনো প্রমাণ।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্বেগটা মেজর ম্যাকন্যাব্‌সের যে একারই ছিলো তা নয়, স্বয়ং লর্ড এডওয়ার্ডও কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কিন্তু তাঁর অস্বস্তির প্রকৃতিটা ছিলো সম্পূর্ণই অন্যরকম। আয়ারটন যদি কোনো মিস্ত্রি না-পায়, তাহ'লে ভাঙা গাড়ি সারিয়ে নিতে বেশ-কিছুদিন সময় নষ্ট হবে। অথচ তিনি চাচ্ছিলেন পারলে এক্ষুনি তাঁর অভিযানটায় বেরিয়ে পড়তে।

দিন ফুটতে-না-ফুটতেই কিন্তু অস্বস্তিটা কেটে গেলো। মিস্ত্রি নিয়ে ফিরে এলো আয়ারটন, ধূলিধূসর ও ক্লান্ত—সারারাত সে একটুও বিশ্রাম করেনি, সোজা গেছে সে ব্ল্যাকপয়েন্টে, তারপর খোঁজখবর ক'রেই মিস্ত্রিকে নিয়ে ফের ফিরতিরাস্তা ধরেছে।

তবে যে-মিস্ত্রিকে সে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে, তাকে দেখতে ঠিক যেন কোনো ডাকাতের মতো। প্রকাণ্ড, দড়িপাকানো চেহারা, সারা শরীরে মেদ বলতে কিছু নেই —শুধু পেশী যেন নেচে বেড়াচ্ছে। লোকটা কথা কম বলে, পারলে হয়তো মুখে কুলুপ এঁটেই থাকতো সারাক্ষণ, কিন্তু কাজ জানে।

কোনো লোককে প্রথম দেখবামাত্র কেন ডাকাত-ডাকাত ব'লে মনে হয়, এটারও কোনো সদুত্তর জানা নেই লর্ড এডওয়ার্ডের। সম্ভবত সেদিন যখন জাক পাঞ্চয়ল অস্ট্রেলিয়ায় কারা-কারা ভাগ্যের সন্ধানে এসেছে, এ-সম্বন্ধে জ্ঞান দিচ্ছিলেন, তখনই মনের মধ্যে অবিশ্বাসের একটা বীজ বুনে দেয়া হয়েছে। ইওরোপ থেকে এত-দূরে যারা এসেছে তারা হয় কয়েদি—নয়তো আইনের হাত থেকে পালাবে ব'লেই এখানে এসেছে, ডাকাবুকো সব লোক, সম্ভবত স্বয়ং লুসিফারকেও ভয় পায় না।

লোকটা যে সত্যি-সত্যিই মিস্ত্রি একজন, তা তার কাজ করবার ধরন দেখেই বোঝা গেছে। আড়াই ঘণ্টাও লাগেনি, সে পাকাহাতে ওস্তাদের মতো গাড়ি মেরামত ক'রে দিয়েছে।

মেজর ম্যাকন্যাব্‌স কিন্তু সবসময়েই সঙ্গে-সঙ্গে ছিলেন, সজাগ চোখে সব খেয়াল ক'রে যাচ্ছিলেন। আর এতটা সজাগভাবে খুঁটিয়ে লক্ষ করেছেন ব'লেই একসময়ে তাঁর চোখে পড়েছে লোকটার কব্জিটা—*সেখানে কোনো-একটা আঁটো বালার মতো একটা কালচে দাগ ফুটে আছে*। কীসের দাগ এটা? লোকটা যখন ঘোড়ার নাল পরাচ্ছে, তখন হঠাৎ নজরে এলো, নালগুলোর তলা থেকে তেকোণা খানিকটা অংশ যেন কেটে নেয়া হয়েছে। অবাক হ'য়ে গিয়ে মেজর ম্যাকন্যাব্‌স তার কারণটা জানতে চাইলেন—আয়ারটন বললে, 'এখানকার সব ঘোড়ার মালিকরাই তাদের ঘোড়ার নালে বিশেষ-বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করে—যাতে ঘোড়া হারিয়ে গেলে বা চুরি হ'য়ে গেলে, সেই বিশেষ নালের ছাপ দেখে তাকে খুঁজে বার করা যায়—বা অনেক ঘোড়ার মধ্য থেকে তাকে শনাক্ত করা যায়। এটা ব্ল্যাকপয়েন্টের চিহ্ন।'

ঘোড়াগুলোর নাল পরাতে আধঘণ্টার বেশি লাগলো না তার। কাজ শেষ হবামাত্র মজুরি আর দরাজ বখশিশ নিয়ে লোকটা সেলাম ঠুকে চ'লে গেলো।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে চ'লে যেতেই, তোড়জোড় ক'রে ফের শুরু হ'লো অভিযান—কাপ্তেন গ্র্যান্টের সন্ধানে। কিছুক্ষণ যাবার পরই দূর থেকে ভেসে এলো রেলের এনজিনের বাঁশি—তীক্ষ্ণ প্রলম্বিত ধাতব কু-উ-উ আওয়াজ। তারপরেই দেখা গেলো রাস্তাটা যেখানে গিয়ে রেলপথের গায়ে পড়েছে, সেখানে ভুশ-ভুশ ক'রে কালোধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে আর তীক্ষ্ণ সুরে বাঁশি বাজাতে-বাজাতে একটা এনজিন কোত্থেকে যেন এসে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লো। ঘোড়াটায় ছপটি মেরে লর্ড এডওয়ার্ড কাছে এগিয়ে গেলেন—হঠাৎ এভাবে মাঝপথেই ট্রেনের এনজিন থেমে পড়লো কেন?

কিন্তু কাছে গিয়েই আঁৎকে উঠলেন লর্ড গ্লেনারভন। ভাঙা সেতুর তলায়, নদীর পাড়ে আর জলের মধ্যে কতগুলো বগি ভাঙাচোরা প'ড়ে আছে। শুধু মাল রাখবার জন্যে যে-লাগেজভ্যানটা ছিলো, সেটা সম্ভবত পেছনে ছিলো ব'লেই দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে।

এরই মধ্যে দলে-দলে লোক ছুটে আসছে অকুস্থলে, দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখতে। এই-যে এনজিনটা বাঁশি বাজাতে-বাজাতে এখানে এসে থেমেছে, তাতে ক'রে স্বয়ং সার্ভেয়ার জেনারেল এসেছেন ব্যাপারটা সরেজমিন তদন্ত ক'রে দেখতে। লর্ড গ্লেনারভন নিজেই এগিয়ে গেলেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে। পরস্পরের পরিচয় আদানপ্রদানের কাজটা শেষ হয়েছে কি হয়নি, হঠাৎ একটা বিষম কোলাহল উঠলো। তারপরেই লোকজন ধরাধরি ক'রে নিয়ে এলো গার্ডের মৃতদেহ—লাশটার বুকে বিঁধে রয়েছে একটা ছোরা, প্রায় বাঁটশুদ্ধুই যেন ঢোকানো।

'ঠিক এই ভয়টাই করছিলুম,' সার্ভেয়ার জেনারেল জানালেন। 'পুলিশ জানিয়েছে যে ব্রিজটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভাঙেনি, কারা যেন বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ ট্রেনটা যাতে এখানে এসে অতর্কিতে উলটে পড়ে, তারই ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে কেউ বা কারা। ট্রেনদস্যুরা ইচ্ছে ক'রেই মৎলব এঁটেছিলো সামনের কামরাগুলো যাতে নদীতে প'ড়ে যায়—তারপর তারা পরমানন্দে পেছনের লাগেজভ্যানের মালপত্র লুঠ করতে পারে।'

'এ-রকম হয় নাকি এখানে?'

'হবে না-ই বা কেন? গোটা অস্ট্রেলিয়াই তো সবচেয়ে কুখ্যাত অপরাধীদের আস্তানা। তাছাড়া অনেক কয়েদিকেও তো সাজার মেয়াদ শেষ হবার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তারা এখানে যা-খুশি ক'রে বেড়ায়। এখন দেখবেন, লর্ড এডওয়ার্ড, এই ডাকাতির জের কতদূর গড়ায়।'

'দুর্ঘটনাটা ঘটলোই বা কখন?'

'কাল নিশুতরাতে। সোয়া-তিনটে নাগাদ।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লর্ড গ্লেনারভন বেশ-চিন্তিতভাবেই ফিরে এলেন তাঁর বহরের কাছে। এই ব্যাপারটা তাঁকে শুধু-যে ভাবাচ্ছে তা-ই নয়, তাঁকে কী-রকম যেন সশঙ্ক ক'রে তুলেছে। এই ডাকাতদের প্রাণে মায়াদয়া ব'লে কিছু নেই। কিছু মালপত্র লুঠ করতে পারবে ব'লে যারা একটা যাত্রীবাহী ট্রেন ও-রকমভাবে উলটে দিতে পারে, অনেক নিরীহ নির্বিরোধী লোককে বিনাবাক্যব্যয়ে খতম ক'রে দিতে পারে, তাদের নজর একবার যদি এই বহরের ওপর পড়ে, তাহ'লেই সর্বনাশ! আয়ারটন বোধহয় ঠিক কথাই বলেছিলো। আরো-কয়েকজন সশস্ত্র নাবিক সঙ্গে নিয়ে এলে ডাকাতদের আচম্বিত হামলা ঠেকাতে সুবিধে হ'তো। এখন অবিশ্যি দিনরাত কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

সেদিন বহর যখন একটা কবরখানার পাশ দিয়ে যাচ্ছে—না, কোনো গির্জে নেই আশপাশে, কবরখানা বলতে একজায়গায় কতগুলো ক্রুশকাঠ বসানো, এইটুকুই শুধু —তখন দেখা গেলো সেখানে ঐ ক্রুশকাঠগুলোর মধ্যেই প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমুচ্ছে একটা বাচ্চা ছেলে। কত আর বয়েস হবে ? আট কি নয়, গায়ের রং কালো। নিশ্চয়ই অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসিন্দাদেরই কেউ। ছেলেটার মুখচোখে ঝকঝকে বুদ্ধির ছাপ। তার গলায় ঝুলছে একটা টিকিট—তাতে লেখা : অমুক জায়গায় নিয়ে গিয়ে তমুকের হাতে তুলে দেবার জন্যে এই টোলিন নামের ছেলেটিকে অমুক কুলির সঙ্গে ট্রেনে ক'রে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু ছেলেটি একাই শুয়ে আছে এখানে—আশপাশে আর-কেউ নেই। তার মানে ঐ ট্রেনদুর্ঘটনায় কুলিটি নিশ্চয়ই মারা গেছে, আর এই ছেলেটি কেমন ক'রে যেন প্রাণে বেঁচে গিয়েছে। অকুস্থল থেকে সে পালিয়ে এসেছিলো চটপট—তারপর ক্লান্ত হ'য়ে এখানে প'ড়ে টানা একটা ঘুম লাগাচ্ছে।

ছেলেটিকে দেখেই তাঁর বলদে-টানা গাড়ি থেকে নেমে এসেছিলেন লেডি হেলেনা। তাকে এইরকম গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন দেখে, আর পুরো ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝে নিয়ে, লেডি হেলেনার কেমন যেন মায়া প'ড়ে গেলো ছেলেটির প্রতি। তিনি যখন ঝুঁকে প'ড়ে ছেলেটির গলায় বাঁধা টিকিটটা পড়ছেন, অমনি ছেলেটির ঘুম ভেঙে গেলো। চোখ রগড়াতে-রগড়াতে সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো। যখন সে তার ডাগর চোখদুটি মেলে আশপাশে তাকালে, তখন তার দৃষ্টিতে একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে ভয়, বিস্ময় আর কৌতূহলের ছাপ।

লেডি হেলেনা তাকে জিগেস করতেই সে নিজের পরিচয় দিলে—স্পষ্ট, পরিষ্কার ইংরেজি উচ্চারণ তার। মিশনারি স্কুলে থেকে সে ইংরেজ মিশনারিদের কাছে পড়াশুনো করে। পরীক্ষা শেষ হ'য়ে গিয়ে ফল বেরিয়েছে, এখন বেশ-কিছুদিন ছুটি—বড়োদিন আর নববর্ষের। ছুটি কাটাতেই সে বাড়ি যাচ্ছিলো মা-বাবার কাছে। পরীক্ষায় ভালোভাবেই উৎরেছে সে, কিন্তু সবচেয়ে ভালো করেছে সে *জিওগ্রাফিতে*, ভূগোলে সে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতক্ষণ লেডি হেলেনাই কথা বলছিলেন ব'লে জাক পাঞ্চয়ল মাঝে প'ড়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি। কিন্তু যেই শুনলেন ছেলেটি ভূগোলে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে, অমনি তাঁর মাথায় কুট ক'রে যেন একটা পোকা কামড়ালো। কেমনতর ভূগোলের জ্ঞান ছেলেটির? তিনি নিজে কি তার পরীক্ষা নিয়ে যাচাই ক'রে দেখবেন একবার? কিন্তু দু-একটা প্রশ্ন ক'রেই যা উত্তর শুনলেন তাতে তাঁর চোখ কপালে উঠলো। তাজ্জব-সব জিনিশ শিখিয়েছে তাকে ইংরেজ মিশনারিরা। উপনিবেশের শিক্ষাব্যবস্থা যে এমনতর উদ্ভট-সব তথ্যে ভরা তা তাঁর জানা ছিলো না। না, শুধু তাঁরই নয়, অন্যরাও ছেলেটির কথা না-শুনলে কিছুতেই তা আন্দাজ করতে পারতেন না।

ইংরেজ মিশনারির ছেলেটিকে শিখিয়েছে, এই ধরাধামের একচ্ছত্র অধীশ্বর ইংরেজরাই—স্বর্গটা প্রভু জিশুর, পৃথিবীটা ইংরেজদের। তার প্রমাণই হ'লো যে ইংরেজ রাজত্বে সূর্য কখনও অস্ত যায় না। এ-দেশে যখন রাত, অন্যদেশে তখন দিন। এমনকী গোটা ইওরোপটাও ইংরেজদের পদানত—ফ্রান্স শুদ্ধু।

এই *ফ্রান্স* শুদ্ধু কথাটা শুনেই ফ্রান্সের ভূগোলপণ্ডিত জাক পাঞ্চয়লের চোখ আরো-ছানাবড়া হ'য়ে গেছে। কী-একটা বলতে গিয়ে চেপে গেলেন—তারপরেই হা-হা ক'রে অট্টহাসি হেসে উঠলেন।

তারপর হাসি থামিয়ে যা বললেন তার সারাংশ হ'লো এই : ইংরেজরা ঝুড়ি-ঝুড়ি মিথ্যেকথা বলে, এটা কেই বা না-জানে। কিন্তু বাচ্চা ছেলেদেরও ধ'রে-ধ'রে এমন আজগুবি আর উদ্ভট কথাবার্তা শেখালে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার। অতএব—তিনি মনস্থির ক'রে ফেলেছেন—অতএব এই ছেলেটির ভূগোলের জ্ঞান শুধরে দেবার দায়টা তিনি স্বয়ং এই-মুহূর্ত থেকে নিজেদের কাঁধে তুলে নিলেন। ভারতবর্ষ বলতে যে গোটা এশিয়া বোঝায় না, আর কলকাতা যে সমগ্র এশিয়ার রাজধানী নয়—এ-সব তথ্য যদি এক্ষুনি শুধরে না-দেন, তাহ'লে তো ছেলেটির যাবতীয় লেখাপড়া শেখাই মাটি হবে।

এবং যেমন কথা, তেমনি কাজ। তক্ষুনি। লর্ড গ্লেনারভনের যে-ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ছিলো ঐ বলদে-টানা গাড়িটায়, সেখান থেকে তক্ষুনি পাঞ্চয়ল রিচার্ডসনের লেখা ভূগোলবইটা নিয়ে এনে দিলেন ছেলেটিকে, বললেন মন দিয়ে যেন এ-বইটা সে দেখে নেয়, পরে তিনি তার পরীক্ষা নেবেন।

কিন্তু পরের দিন ভোরবেলায়—হায়-রে কপাল!—কোথায় গেলো জাক পাঞ্চয়লের নতুন *রংরুট-করা* ছাত্র। গোটা তাঁবুতে শুধু নয়, আশপাশে কোথাও সে নেই। রিচার্ডসনের ভূগোলবইটা রয়েছে পাঞ্চয়লের কোটের পকেটে, আর লেডি হেলেনার বুকের ওপর রয়েছে একগুচ্ছ ফুল—এই শুখা মরশুমে অস্ট্রেলিয়ায় এমন টাটকা ফুল দুর্লভ বৈ-কি! টোলিন কেন চ'লে গিয়েছে, কে জানে! সে পথ চিনে-চিনে যেতে পারবে তো তার মা-বাবার কাছে? কিংবা যদি বুদ্ধি ক'রে চার্চের স্কুলেও ফিরে যায় তাহ'লেও বাঁচোয়া



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—নইলে এমন লোকালয়হীন খাঁ-খাঁ প্রান্তরে সে যাবে কোথায়?

রাস্তা এখান থেকে শুধু রুক্ষ বা উষরই নয়, উবড়োখাবড়ো, বন্ধুর। বহরের গতি স্বভাবতই ঢিমে হ'য়ে এলো, বিশেষ ক'রে এই অসমতল পথ দিয়ে বলদে-টানা গাড়ির যেতে অসুবিধে হচ্ছিলো খুবই—এমনভাবে গাড়ির ভেতরটা দুলছে একাৎ-ওকাৎ হচ্ছে যেন ঝড়ের সমুদ্রে পড়েছে কোনো নৌকো। এত ঝাঁকুনি লাগে যে হাড়গোড় বোধহয় চুর-চুর হ'য়ে যাচ্ছে। আর এইভাবেই যেতে-যেতে অবশেষে দূর থেকে দেখা গেলো একটা পাহাড়। আয়ারটন জানালে এই পাহাড়ের নাম নাকি আলেকজাণ্ডার—এখানে নাকি *প্রসপেক্টররা* মাটি খুঁড়ে সোনা পেয়েছে।

সেদিন বছরের শেষদিন, ৩১শে ডিসেম্বর, অসহ্য গরম, যেন লু বইছে, আর তারই মধ্যে বহর এসে পৌঁছুলো মাউণ্ট আলেকজাণ্ডারে। সোনা এমন-একটা ধাতু যার নাম শুনলেই কেমন যেন চোখ চকচক ক'রে ওঠে সকলের, আর সেটা নিশ্চয়ই নিছক সৌন্দর্যতৃষায় নয়—কেননা প্রায় সবধাতুরই নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, কিন্তু সোনার মতো আর-কিছু এমন ক'রে মানুষকে আকৃষ্ট করেনি। মাউণ্ট আলেকজাণ্ডারের কথা শোনবামাত্র সকলেরই ইচ্ছে হ'লো একবার গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসেন সোনার খনি। এমনিতে, অনেক সময়েই বড়ো-বড়ো সোনার ডেলার বদলে সুতোর মতো সোনার একটা রেখা চ'লে যায় পাথরের মধ্যে, অথবা মিশে থাকে মাটির ঢেলায়। কখনও-বা মিশে থাকে বালিতেও। তাকে ঝাঁঝরির মধ্য দিয়ে সাফ ক'রে নিতে হয়; পাথর ভেঙে বার ক'রে নিতে হয় সোনার সুতো; মাটির ঢেলা থেকে সোনা আলাদা ক'রে নেবার জন্যে অনেক সময় এমনকী জল ও মাটিকে গুলে নেয়া হয়, তারপর সেই জল পরিস্রুত ক'রে নেয়া হয়, ঘোলাজল নিয়ে যায় মাটি, প'ড়ে থাকে সোনার গুঁড়ো। কীভাবে সোনা খুঁড়ে তোলা হয় সেটা যেমন দেখে এলেন সবাই, তেমনি দেখে এলেন সোনা তোলবার পর দুর্গের মতো দুর্ভেদ্য যে-বাড়িটার কোষাগারে সে-সব জমা দেয়া হয়। সেখান থেকে প্রত্যেক *প্রসপেক্টরকেই* রসিদ দেয়া হয়, কে-কত আউন্স সোনা তুলেছে, তারপর সেগুলো চালান দেবার ব্যবস্থাও করা হয়, কড়া পাহারা থাকে সবসময়, বন্দুকের ঘোড়ায় থাকে তাদের হাত, আর সে-হাত প্রায়-সবসময়েই চুলবুল ক'রে ওঠে, একটু-কিছু সন্দেহজনক দেখলেই গুলিগোলা চলে হরদম। বিশেষত ডাকাতের উৎপাত বেড়ে যাবার পর থেকে কড়াকড়ি বেড়েছে প্রচুর। এখানকার ডাকাতরা যেমন প্রাণের ভয় করে না, এখানকার সেপাইশান্ত্রীরাও প্রায় সে-রকম । যারা সেপাই হয়েছে, তারাও যেমন অবস্থাবিপাকে ডাকাত হ'য়ে যেতে পারতো, ডাকাতরাও অনেকে ঠিকমতো সুযোগ পেলে সেপাইশান্ত্রী হ'য়ে উঠতে পারতো। সেপাই বা ডাকাত—দুয়েরই স্বভাবপ্রকৃতি বা মনের ধাতের মধ্যে তফাৎ যা আছে, তা সামান্যই। এখানে তো উর্দি দেখেও বোঝবার জো নেই কে যে কী। তার ওপর এই মাউণ্ট আলেকজাণ্ডারে আবার সোনা খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানারকম দামিপাথর, সেগুলো আবার থরে-থরে সাজানো আছে কোষাগারের সংগ্রহশালায়। কতরকম রঙবেরঙের পাথর, পাথর না-ব'লে তাদের হয়তো রত্ন বলাই উচিত। এত-সব ঘুরে ঘুরে দেখতে-দেখতে পণ্ডিতপ্রবর জাক পাঞ্চয়লের চোখের মণিও কেমন জ্বলজ্বল ক'রে উঠেছিলো। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিলো যদি একটা সোনার ঢেলা সঙ্গে ক'রে নেয়া যেতো।

তাঁর হাবভাব দেখে মেজর ম্যাকন্যাব্স একবার শুধু চিবিয়ে-চিবিয়ে বলেছিলেন: 'খামকা আর ছোট্ট-একটা সোনার ঢেলা নিয়ে গিয়ে কী করবেন, মঁসিয় পাঞ্চয়ল? তার চেয়ে—ঐ দেখুন দামিপাথর আছে এখানে—খুঁজলে হয়তো পরশপাথরই পেয়ে যাবেন একটা। জগতের দার্শনিকরা তো তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন চিরকাল—তা-ই না? আপনিও খুঁজে দেখুন না—পরশপাথর খুঁজে পেয়ে গেলে ফ্রান্সে ফিরে যা-ই ছোঁবেন, তা-ই তো সোনা হ'য়ে যাবে। এখান থেকে অত ওজন ব'য়ে নিয়ে যেতে আর হবে না তাহ'লে।'

তাঁর এই অপরূপ তাত্ত্বিক ইয়ার্কিটি শোনবার পর সেখানে যে নিছক হাসির হররাই উঠলো তা নয়, মঁসিয় পাঞ্চয়লের ভুতুড়ে আবেশটাও একনিমেষে কেটে গেলো।

নতুন বছরের প্রথম দিনটাও কাটলো সেই স্বর্ণ-উপত্যকা পেরিয়ে আবার অপেক্ষাকৃত সমতলভূমিতে নেমে আসতে। তারপর জানুয়ারির দুই তারিখে বহর এসে পৌঁছুলো সারি-সারি ইউক্যালিপটাস গাছের দুরতিক্রম্য এক জঙ্গলে। এত-নিবিড়ভাবে গাছগুলো সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে ফাঁকফোকর দিয়ে গ'লে বলদে-টানা গাড়িটা নিয়ে-যাওয়াই দায়। তার ওপর আবার এই ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা গাছগুলোর রুপোলি ঢালে রোদ্দুর প'ড়ে ঝলসে ওঠে—চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আর কেমন-একটা ঝিমধরা গন্ধ, সুগন্ধই বলা যায়, কিন্তু এতগুলো গাছ থেকে এই গন্ধ বেরুচ্ছে যে হাওয়া যেন তাতে কেমন ভারি হ'য়ে আছে। পাঞ্চয়ল সুযোগ পাবামাত্রই জ্ঞান দেখিয়ে ব'লে উঠেছেন: 'এই ইউক্যালিপটাস নামটা এসেছে গ্রিক *কালুপ্তোস* থেকে, সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে লাতিন ইউ। কালুপ্তোস মানে ঢেকে ফেলা, কারণ এর ফলগুলো পাপড়ি মেলবার আগে টুপির মতো কিছু দিয়ে ঢাকা থাকে, যাতে রোদ্দুর থেকে বাঁচে।'

রবার্ট কৌতূহলী হ'য়ে জিগেস করলে, 'আর এই গন্ধ? সে কি ঐ *মুদিত কুসুমকলি* থেকেই আসে?' পাঞ্চয়লের সঙ্গে কথা বলবার সময় রবার্ট ফাজলেমি ক'রে মাঝে-মাঝে সাধুভাষা ব্যবহার করতে শুরু করেছে। 'না কি গাছের ঐ রুপোলি বাকল থেকে?'

'না, না, গাছটার গুঁড়ি বা কাণ্ড কাঠ হিশেবে ব্যবহার করা হয়—গন্ধ মূলত আসছে এর বাহারে, সতেজ আর সবুজ পাতাগুলি থেকে, ঐ পাতাগুলো নিংড়েই বার ক'রে নেয়া হয় ইউক্যালিপটাসের তেল—আর সে-সব লোকে অ্যান্টিসেপটিক হিশেবে ব্যবহার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে ?'

'কিন্তু এ-গাছ তো কই আমি আমাদের দেশে দেখিনি।'

'গাছটা প্রধানত হয় অস্ট্রেলেশিয়ায়—সেখানে রীতিমতো চাষ করা হয় এর। এই বনটাকে দেখে মনে হচ্ছে এটাও কারু আবাদ হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু এর মজা হচ্ছে একবার লাগালেই হ'লো, কোনো তদারক আর করতে হয় না বিশেষ। মাটি থেকে রস শুষে নেয়। ঐ যাকে বলেছো *মুদিত কুসুমকলি*, শুখা সময়ের জন্যে তার ভেতরেই গাছ তার প্রাণরস জমিয়ে রাখে। কিন্তু কালুপ্তোস মানে তো ঢেকে দেয়া—ছেয়ে দেয়া, যেন সবকিছু ছেয়ে আছে—সোজা সরলরেখায় উঠে যায় এই গাছ, কখনও-কখনও দুশো ফিট অব্দি লম্বা হয়। ঐ ওপর থেকেই বোধহয় নজর রাখে সবকিছুর ওপর, ঢেকে রাখে তলার জমি।'

বক্তৃতার একটা মনোমতো বিষয় পেলে জাক পাঞয়ল আর-কিছু চান না—তুবড়ির মতো জ্ঞানগর্ভ বাক্য বেরিয়ে আসতে থাকে মুখ থেকে। ছুটলে কথা থামায় কে ? অন্তত কোনো ফরাশির মুখ বন্ধ করবে কে—কথার জাহাজ একেকজনে—মেজর ম্যাকন্যাব্‌সের মতে, সেইজন্যেই তারা সবাই কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা।

পরের দিন সূর্য ডোববার সময় জঙ্গলের পাশেই দেখা গেলো ছোট্ট একটা লোকালয় —শহর ঠিক নয়, বরং ছোটো-একটা গ্রাম। নাম সীমূর। কিন্তু অজ পাড়াগাঁ হ'লে কী হবে, এখানে একটা সরাইখানা আছে। সেই সরাইখানাতে আশ্রয় নেবার পর রবার্টকে সঙ্গে ক'রে পাঞয়ল গোটা গ্রামটায় একটা টহল দিয়ে এলেন। এবং সারাক্ষণই চললেন নানা বিষয়ে জ্ঞান বিলোতে-বিলোতে। রবার্ট সেদিক দিয়ে খুব-ভালো শ্রোতা—মাঝে-মাঝে ফোড়ন কাটে, উসকে দেয়, আর পাঞয়লের শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হ'তে থাকে কথার ফুলঝুরি। আর তাই, নিজের বক্তৃতায় এতটাই মশগুল ছিলেন পাঞয়ল, যে খেয়ালও করেননি গোটা গ্রামটায় এত উত্তেজনা আর চাঞ্চল্য কেন।

ঐ দুর্ধর্ষ ট্রেনডাকাতির পর থেকেই গোটা *ভিক্টরিয়া* রাজ্যই অত্যন্ত হুঁশিয়ার হ'য়ে উঠেছে। রাতে তারা বারে-বারে এসে লক্ষ ক'রে যায় দরজা-জানলা ঠিকঠাক বন্ধ ক'রে রেখেছে কি না। লর্ড গ্লেনারভনের বহরও এই ক-দিন অত্যন্ত সাবধান হ'য়ে পথ চলেছে, কড়ানজর রেখেছে চারপাশে, সারাক্ষণই থেকেছে সজাগ। সেইজন্যে এই সীমূরের লোকদের চাঞ্চল্যটা পাঞয়লের একটু খেয়াল ক'রে দেখা উচিত ছিলো। কিন্তু নিজের কথা শুনতে তাঁর এতই ভালো লাগে যে চারপাশে যে একটা চাপা ফিশফিশ গুজুর-গুজুর উত্তেজনা চলেছে সেটা তিনি আদপেই লক্ষ করেননি।

কিন্তু সরাইখানার মালিকের সঙ্গে দু-চারমিনিট এটা-সেটা নিয়ে কথা ব'লেই উত্তেজনার মূল কারণটা জেনে ফেলেছিলেন মেজর ম্যাকন্যাব্‌স। জেনেও, তিনি রাটি কাড়েননি। চুপচাপ বসেছিলেন খাবারটেবিলে, ছুরি-কাঁটা-সুপের বাটিতেই মনোনিবেশ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক'রে বসেছিলেন। পরে যখন লেডি হেলেনা ও মেরির সঙ্গে রবার্টও শুতে চ'লে গেলো, তখনই মেজর ম্যাকন্যাব্‌স কথাটা পাড়লেন ঠাণ্ডা চাপাগলায়।

'*অস্ট্রেলিয়ান অ্যাণ্ড নিউ-জিল্যাণ্ড গেজেটে* খবর বেরিয়েছে—ডাকাতদলের নাকি খোঁজ পাওয়া গেছে।'

সঙ্গে-সঙ্গে, কেমন-একটু চঞ্চল স্বরেই বুঝি, আয়ারটন জিগেস করলে, 'ধরা পড়েছে?'

গত কয়েকদিন ধ'রে ডাকাতদের ভয়ে যেভাবে রাতের ঘুম মাথায় উঠে গিয়েছিলো, তাতে এই খবরটা শুনে একটু চাঞ্চল্য তো হবেই। যাক, এবার তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যাবে।

মেজর খুবই ছোট্ট উত্তর দিলেন। কাটা-কাটা গলায় বললেন, 'না।'

লর্ড এডওয়ার্ড জিগেস করলেন : 'খোঁজ পাওয়া গেছে মানে? এরা কারা—সে-খবর কি জানা গেছে?'

কথাটি না-ব'লে মেজর ম্যাকন্যাব্‌স লর্ড এডওয়ার্ডের দিকে খবরকাগজটা এগিয়ে দিলেন। চক্ষের নিমেষে খবরটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন গ্লেনারভন। যেন গোগ্রাসে গিললেন খবরটাকে।

আয়ারল্যাণ্ড থেকে দ্বীপান্তরে পাঠাবার সময় বেপরোয়া উনত্রিশজন ডাকাত ছ-মাস আগে পুলিশপাহারার নজর এড়িয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো। এদের পাণ্ডাটির নাম বেন জয়েস—যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি দুঃসাহসী; কিন্তু শুধু প্রচণ্ড দুঃসাহসই তার নেই, মাথায় প্রচণ্ড বুদ্ধি। এতই ধূর্ত যে পুলিশ এর আগে এই নরাধমের কোনো নাগালই পায়নি, তো পাকড়াবে কী ক'রে? কী ক'রে সে যে এখন অস্ট্রেলিয়ায় এসে হাজির হয়েছে, সেটাও একটা দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা। স্যাণ্ডহার্স্ট রেলপথে ট্রেনটা উলটে দিয়ে দুর্ঘটনাটা ঘটিয়েছে এরাই—যাতে অনায়াসেই লুঠের কাজ চালাতে পারে।

প'ড়েই লর্ড এডওয়ার্ডের চোখ কপালে উঠে গেলো। তাহ'লে কি স্থলপথে যাবার পরিকল্পনাটা খারিজ করতে হবে? তবে কি মেলবোর্নে গিয়েই উঠে পড়বেন *ডানকানে*?

তাঁর প্রশ্নটা শুনে মেজর ম্যাকন্যাব্‌স সরাসরি আয়ারটনকেই জিগেস ক'রে বসলেন : 'আয়ারটন, তুমি কী বলো? আমাদের পক্ষে এখন কী করলে ঠিক হবে? মনে রেখো, এই মক্কেলের নাম বেন জয়েস—পুলিশের কর্তারা অব্দি তাকে ডরান।'

আয়ারটন কী যেন একটু ভেবে বললে, 'আমরা এখনও মেলবোর্ন থেকে দুশো মাইল দূরে রয়েছি। এতটা পথ পেরিয়ে সেখানে পৌঁছুতে আমাদের অনেকটাই সময় লেগে যাবে। এ-রাস্তার কোনখানে কোন বিপদ ওৎ পেতে লুকিয়ে আছে, তা কে বলবে?'

লর্ড এডওয়ার্ড জিগেস করলেন, 'তাহ'লে কী করবো?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দেখুন,' আয়ারটন বিশদ ক'রে বললে, 'বিপদের ভয় যদি করেন, তবে এটা মানতেই হয় যে বিপদ যে-কোনোদিক থেকেই আসতে পারে। আমরা মেলবোর্নের পথই ধরি, কিংবা সোজা নাকবরাবর এগুই—কোথাও আমরা খুব-একটা নিরাপদ নই। বেন জয়েসের দল কোথায় আছে, কেউ জানে না—সে যদি আমাদের ওপর হামলা করতে চায় তবে যেদিকেই যা-ই না কেন, সেদিকেই সে এসে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আমরা আটজন লোক যদি সজাগ থাকি আর দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের ঠেকিয়ে রাখতে চাই, তাহ'লে আমার মনে হয় আমরা আটজনেই ঊনত্রিশজন ডাকাতকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবো। আমাদের শুধু খেয়াল রাখতে হবে, বিপদের সময় আমরা যাতে ঘাবড়ে গিয়ে কোনো গণ্ডগোল না-ক'রে বসি—যেন সবসময় মাথা ঠাণ্ডা রাখি। আমরা যদি খুব-বিচলিত বোধ না-করি, তাহ'লে বলবো আমরা যেদিকে চলেছি, সেদিকেই বরং ক্রমাগত এগিয়ে যাই।'

'হ্যাঁ, আমাদের ছকটা হঠাৎ দুম ক'রে পালটে ফেলার কোনোই মানে হয় না,' পাঞ্চয়ল সায় দিয়ে বললেন, 'তাছাড়া কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো খোঁজ তো অ্যাদ্দিনেও পাওয়া যায়নি—সেটা পাওয়া যেতে পারে শুধু সামনের দিকে এগিয়ে গেলেই।'

'তবে,' আয়ারটন বললে, 'সাবধানের মার নেই। আমরা যদি খোলাখুলি *ডানকান* জাহাজে খবর পাঠিয়ে দিই, তবে তারাও অহেতুক আমাদের নিয়ে ভাববে না।'

জাহাজের কথাটা উঠতেই কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসের মনে হ'লো, এবার আলোচনাটায় তাঁরও অংশ নেয়া উচিত। 'খামকা ওদের খবর পাঠিয়ে লাভ কী হবে? এখনও নিশ্চয়ই মেরামতের কাজ শেষ হয়নি। আমরা যদি হঠাৎ দুম ক'রে আমাদের বাদ দিয়েই *ডানকানকে* চ'লে যেতে বলি, তাহ'লে পরে আমাদেরই মুশকিলে পড়তে হ'তে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে হঠাৎ কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো খবর এলে আমাদের হয়তো জলপথেই বেরিয়ে পড়তে হ'তে পারে। জাহাজ যদি আগেই ছেড়ে যায় তবে হয়তো দরকারের সময় আমরা গিয়ে মেলবোর্নে জাহাজ ধরতে পারবো না।'

'হ্যাঁ, আগেকার প্ল্যানমাফিক *ডানকানের* যেখানে থাকবার কথা, সে না-হয় সেখানেই থাকুক—তাদের অযথা খবর পাঠিয়ে বিব্রত ক'রে কোনো লাভ নেই,' এই মন্তব্যটা খোদ লর্ড এডওয়ার্ডের। আর তা শুনে আয়ারটন আর সে নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করলে না। বরং বললে, 'ঠিক আছে। তা-ই না-হয় হোক। তাহ'লে কাল ভোরেই আমরা এখান থেকে রওনা হ'য়ে পড়বো।'

জানুয়ারি মাসের পাঁচতারিখ সন্ধেবেলায় বহর যেখানে এসে পৌঁছুলো, সেটা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের রাজ্য। এ-অঞ্চল সংরক্ষিত, রিজার্ভড। অর্থাৎ শাদাআদমিরা এখানে যেখানে-খুশি যেতে পারবে, এবং যা-খুশি তা-ই করতে পারবে, কিন্তু এই কালো আদিবাসীরা এর চৌহদ্দি পেরিয়ে কোথাও যেতে পারবে না। এমনিতেই শাদারা কালোদের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বিচারে হত্যা করেছে অ্যাদ্দিন, কিন্তু পাঁচবছর আগেও যে-সব আদিবাসী এখানে ছিলো, যে যার নিজেদের দেশে—এটা তো তাদেরই দেশ, না কী ?—তারা ইচ্ছেমতো চলাফেরা ক'রে বেড়াতে পারতো—তাদের অনেক স্বাধীনতা ছিলো। কিন্তু তাদের বাঁচিয়ে রাখার বাহানা ক'রে—এটা একটা ছুতো বই আর-কিছু না, কারু স্বাধীনতা কেড়ে নেবার একটা অছিলাই তো শুধু—তাদের এই জঙ্গলে এনে ট্যাঁড়া কেটে গণ্ডি এঁকে ব'লে দেয়া হয়েছে, 'তোমরা আর-কখনও এই গণ্ডির বাইরে যেতে পারবে না।

পাঞ্চয়ল বলছিলেন : 'কিছুদিন আগেও, এই এতটা-রাস্তা পেরুবার সময় অস্ট্রেলিয়ায় যারা আগে থেকেই থাকতো, তাদের অনেককেই আমরা হয়তো দেখতে পেতুম। এবং আর-কিছুদিন পরে হয়তো কোথাও কোনোখানেই তাদের একজনকেও দেখতে পাবো না। অস্ট্রেলিয়া হ'য়ে উঠবে শাদাদেরই দেশ—যেন কেউ জাদুগালচেয় ক'রে ইওরোপটাকেই এখানে এনে বসিয়ে দেবে—তবে বেশির ভাগ লোকই যে ব্রিটেনের হবে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। এমনকী তারা এ-দেশটার বিভিন্ন অঞ্চলের নামও দেবে নিজেদের দেশের মাতব্বরদের নামে। ভাষাতাত্ত্বিকেরা জানতেও পাবেন না এখানকার লোকে জায়গাগুলোর নাম কী দিয়েছিলো। এই-যেমন, মেলবোর্ন রাজ্যের রাজধানীর নাম দেয়া হয়েছে *ভিক্টরিয়া*। এটা নিশ্চয়ই অস্ট্রেলিয়ার আদিমানুষদের ভাষার কোনো শব্দ নয়।'

'কিন্তু এ-কথাটা আর নতুন কী? শাদারা যেখানেই গেছে, সুযোগ পেলেই খুন করেছে, বা হঠিয়ে দিয়েছে সে-দেশের আগেকার অধিবাসীদের। মার্কিন মুলুকের কথাই ধরুন না কেন ? ইয়াঙ্কিরা ইণ্ডিয়ানদের কটা উপজাতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে, বলুন ?' এ-কথাটা মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স-এর।

পাঞ্চয়ল একটু ক্ষুব্ধ স্বরেই বলেছিলেন : 'আমার এক-এক সময়ে সন্দেহ হয় এ-সব সংরক্ষিত এলাকা তৈরি করার গোপন মানেটাই হ'লো আদিবাসীদের সব্বাইকে একটা ছোটো জায়গায় ঠুশে ঢুকিয়ে দাও—তাদের বাকি-সব জমিজমা কেড়ে নাও—তারপর দরকার হ'লে গোটা জাতিকে জাতি লোপাট ক'রে দিতে হ'লে আর ভাবনা কী—সব্বাইকেই তো একজায়গায় পেয়ে যাচ্ছো !'

এই কথাগুলো ঠিক কারুই পছন্দ হচ্ছিলো না, এমনকী পাঞ্চয়লের নিজেরও না। বেন জয়েসের লুঠপাটের সঙ্গে সরকারের আইনমাফিক ডাকাতির তফাৎটা কেবল মাত্রায় —সরকার যেটা বিরাট তোড়জোড় ক'রে আইনমাফিক করতে পারে, বেন জয়েস সেটা পারে না—তাছাড়া সে-যে নরাধম তার প্রমাণই তো হ'লো এই তথ্য যে সে শাদাদের হত্যা ক'রে শাদাদের জিনিশপত্র লুঠ ক'রে নেয়।

সংরক্ষিত এলাকার পাশেই তাঁবু খাটানো হয়েছিলো। সন্ধের অন্ধকার নেমে এসেছে তখন। আর তারই মধ্যে হঠাৎ দেখা গেলো আবছামতো কী-একটা জীব ইউক্যালিপটাস



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাছগুলোর ডাল থেকে ডালে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে দূরে মিলিয়ে গেলো।

কোন জীব এটা?

সন্দেহ ভঞ্জন করেছিলেন পাঞ্জয়লই। 'নিশ্চয়ই ঐ আদিবাসীদেরই একজন হবে—আমাদের ওপর নজর রাখছিলো—এখন অন্যদের খবর দিতে চ'লে গেলো।'

পরের দিন ভোরবেলায় গ্লেনারভনের বহর যখন সরাসরি সংরক্ষিত এলাকায় ঢুকে পড়লো—শাদাদের তো এখানে যেতে কোনো বারণ নেই—তখন খানিকটা এগিয়ে যাবার পরই তুলনায়-খোলামেলা একটা জায়গায় দেখা গেলো আদিবাসীদের ছাউনিগুলো—ডজন খানেক তাঁবুর মতো ঝুপড়ি, আর তার আড়াল থেকেই উঁকি দিচ্ছে ত্রস্ত ও চঞ্চল সব আদিবাসীদের মুখ। ইওরোপের পণ্ডিতদের কথাই আলাদা। কোন-একজন নৃতাত্ত্বিক নাকি অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের দেখে বলেছেন, বাঁদর থেকে মানুষ হ'য়ে যাবার যে-স্তর-পরম্পরা আছে তার মধ্যে একটার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি; এতকাল তাকেই বলতো *হারানো যোগসূত্র*—মিসিংলিঙ্ক। এই পণ্ডিতের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছিলো অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরাই নাকি সেই হারানো যোগসূত্র।

তা এই *মিসিংলিঙ্কদেরও* নিজেদের ভাষা আছে, তারা তাদের সেই ভাষাতেই নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ ক'রে, খবরের আদানপ্রদান ক'রে, নিজেদের পূর্বপুরুষের গল্প শোনায় ছোটোদের, এই ভাষাতেই তারা গান করে, স্বপ্ন দ্যাখে, আর এতকাল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকরকম জল্পনাও করতো—তবে আজকাল তারা জেনে গেছে যে তাদের ভবিষ্যৎ ব'লে আর-কিছু নেই, ফলে এখন আর হয়তো পরেরদিন কী হবে তা নিয়ে তারা আর মাথাই ঘামায় না।

আয়ারটন বললে যে সে নাকি এদের ভাষা জানে—জাহাজডুবির পর সে নাকি এ-রকমই ছোটো-একদল আদিবাসীদের সঙ্গে দু-দুটো বছর কাটিয়েছে—সে বলতে চাচ্ছিলো গোলামি ক'রে কাটিয়েছে, কিন্তু তাকে দিয়ে যে-সব কাজ করানো হ'তো, আদিবাসীরা নিজেরাও উদয়াস্ত সেই কাজই করতো, আর তাকে দেখবামাত্র তাকে তারা নির্যাতনও করেনি—অথবা মেরে ফেলবার কথাও ভাবেনি। তবে কাজের বড়ো অংশটাই এখানে করতে হয় মেয়েদের, ছেলেরা শিকার করে, রক্ষণাবেক্ষণ করে, এখন আবার সবসময় হুঁশিয়ার হ'য়ে থাকে—কখন শাদারা এসে হাজির হয়।

আয়ারটন বললে, 'কাপ্তেন গ্রাণ্ট যদি সত্যি-সত্যি বেঁচে থাকেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই এইরকমই কোনো আদিবাসীদের দলের মধ্যে আছেন—আর আমাকে যেমন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হ'তো, তাকেও নিশ্চয়ই সেইরকম ভাবেই এদের জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হচ্ছে।'

'কিন্তু তুমি তো এদের চোখে ধুলো দিয়ে সটকে আসতে পেরেছো,' মেজর ম্যাকন্যাব্‌স বললেন : 'এরা কি বন্দীদের ওপর কড়া পাহারা রাখে না?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পালিয়ে-যাওয়া খুব-একটা কঠিন নয় হয়তো, কিন্তু আসল কষ্ট শুরু হয় এদের হাত থেকে পালিয়ে আসার পরেই। দেখছেনই তো এই সংরক্ষিত এলাকার আশপাশে শাদাদের কোনো লোকালয় নেই। তাছাড়া অজানা অচেনা জায়গায়—কোথায় কী আছে আপনি জানেন না। পালিয়ে আসার মানে তো আপনি ঝাঁপ খাবেন সরাসরি অজ্ঞাতের মধ্যে—'

এ-সব কথা যখন চলছে তখন আদিবাসীদের মধ্যে একটা কলরব উঠলো হঠাৎ। এমু পাখিদের একটা ঝাঁক নাকি দেখা গেছে। পাখি বটে, কিন্তু ওড়ে না, ছোটে—আর এত-জোরে ছোটে যে পলক-না-ফেলতেই তারা চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যায়। এদের মাংস খুব সুস্বাদু ব'লেই তাদের আত্মরক্ষার জন্যে পা দুটোকে এমন তীব্রগতিতে ব্যবহার করতে হয়। ডানাগুলো কেমন বেঢপ, আর কেমন যেন মাংসের ঢিবির মতো। তাই উড়তে পারে না বটে, তবে সবচেয়ে-দ্রুত ঘোড়ার চেয়েও জোরে ছোটে। তাই এদের কুপোকাৎ করতে হয় বিস্তর বুদ্ধি খাটিয়ে। একজন আদিবাসী এমুর একটা খোলশ প'রে, *এমু সেজে*, এমুদের মতো আওয়াজ করতে-করতে এমুর ঝাঁকটার কাছে গিয়ে আচমকা বেধড়ক লাঠি চালিয়ে পাঁচ-পাঁচটা এমুকে ঘায়েল ক'রে ফেললে।

কিন্তু তারপরেই শিকার করবার আরো-একটা অদ্ভুত উপায় দেখতে পেলেন গ্লেনারভনরা। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে এসেছিলো কাকাতুয়ার মতো নীলরঙের অচেনা পাখির একটা ঝাঁক। চুপি-চুপি, কোনো শব্দ না-ক'রে একজন আদিবাসী গাছের আড়ালে স'রে গিয়ে গাঢাকা দিয়ে দাঁড়ালে। তার হাতে কঠিন একটা বাঁকানো কাঠ—প্রায় চাঁদের ফালির মতো বাঁকা। কেউ কিছু বুঝে ওঠবার আগেই সাঁ ক'রে কোমরের কাছ থেকে ঐ বাঁকা ফালিকাঠটা হাতের একটা ঝটকায় বিদ্যুৎবেগে ছুঁড়ে দিলে, আর হঠাৎ প্রায় চল্লিশ হাত পথ কোমরসমান উঁচু দিয়ে উঠে গিয়েই আচমকা সেটা সটান একলাফে উঠে গেলো অনেক ওপরে, তারপর সেই নীলপাখিদের ডজনখানেককে একসঙ্গে ঘায়েল ক'রে ফের বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে সোজা সেই আদিবাসীর কাছে ফিরে এলো, ধুপ ক'রে পড়লো তার পায়ের কাছে।

পাঞ্চয়ল যেন এই অচেনা অস্ত্রটার মধ্যেই চেনা-কিছুকে খুঁজে পেলেন। বিস্ময়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন : 'অ্যাঁ! ব্যুমেরাং। নেহাৎ ছোট্ট একটা কাঠের ফালি—কিন্তু ছোঁড়বার কায়দাটাই আসল আর সেটা জানে অস্ট্রেলিয়ার এই *অ্যাবওরিজিনিরাই* শুধু!'

'সবদেশের আদিবাসিন্দারাই মাথা খাটিয়ে শিকারের সব বিচিত্র উপায় উদ্ভাবন ক'রে নিয়েছে,' লেডি হেলেনা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখছিলেন দৃশ্যটা। 'আমেরিকায় তারা বার করেছে ল্যাসো, এমন কায়দায় দড়ির ফাঁস ছোঁড়ে যে বুনোমোষকেও কব্জা ক'রে ফেলতে পারে। এরা বানিয়েছে ব্যুমেরাং! মাথায় যদি প্রখর বুদ্ধি না-থাকে তাহ'লে এমন-কোনো হাতিয়ারের কথা কেউ ভাবতেই পারতো না। অস্ত্রটা নষ্ট হয় না আদৌ—যেন একটা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্ত্রেই আস্ত একটা অস্ত্রাগার—কেননা যেটাকে ছুঁড়ে মারা হ'লো, সেটাই আবার কাজ হাঁসিল ক'রে ফিরে এলো! সত্যি, মানুষ যে কত কী-ই না মাথা খাটিয়ে বার করতে পারে!'

'হুম!' মেজর ম্যাকন্যাব্স বললেন, 'এরা আবার মানুষ নাকি? শোনেননি মঁসিয় পাঞ্চয়লের কাছে? কোন-একজন মস্ত পণ্ডিত নাকি বলেছেন এরা বাঁদরও নয়—মানুষও নয়—তারই মাঝামাঝি-কিছু—মাথা খাটিয়ে এই পণ্ডিত এর একটা নামও দিয়েছেন—*মিসিংলিঙ্ক*। আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। মানুষ যে কত কী-ই বার করতে পারে মাথা খাটিয়ে!'

## চার

## *ডানকান* গেলো কোথায়?

রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর শিবিরে যখন আড্ডা জমেছে, হঠাৎ—আশ্চর্য কাণ্ড!—অস্ট্রেলিয়ায় ইওরোপ থেকে অনেকদূরে, জঙ্গলের মধ্যে ভেসে এলো মোৎসার্টের অপেরার সুর : কারা যেন *ডন জোভান্নি* গাইছে।

এখানে? বনের মধ্যে? *ডন জোভান্নি*?

পাঞ্চয়ল সবে কী-একটা প্রসঙ্গে তাঁর পাণ্ডিত্য জাহির করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কারা গাইছে দা পোন্তের ইতালিয় ভাষায় লেখা ডন হুয়ানের কাহিনী—ভোল্‌ফগাঙ আমাডেউস মোৎসার্ট যার সুর দিয়েছিলেন, যে-অপেরা প্রথম প্রযোজিত হয়েছিলো বোহিমিয়ার প্রাহায়, ১৭৮৭ সালে—সেখানে ডন হুয়ানকে পাতালে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো পাথরের অতিথি!

স্তব্ধতার মধ্যে খানিকক্ষণ শুধু দূর থেকে ভেসে-আসা মোৎসার্টের সুর ছাড়া আর-কিছুই নেই। তারপর, খানিকক্ষণ বাদে তাও মিলিয়ে গেলো রাতের হাওয়ায়।

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্স জিগেস করলেন : '*ডন জোভান্নি* না?'

'হ্যাঁ, *ডন জোভান্নিই*!' যথারীতি পাঞ্চয়লেরই সবজান্তা গলা বিশদ তথ্য জানাবার জন্যে চুলবুল ক'রে উঠেছে। 'অপেরাটার আসল নাম অবশ্য ছিলো *ইল্ দিসোলুতো পুনিতো, ও সিয়া ইল্ ডন জোভান্নি* অর্থাৎ *লম্পটের শাস্তি অথবা ডন জোভান্নি*। আর সে-বার বোহিমিয়ায় প্রথম প্রযোজনার সময়ই দারুণ হুলুস্থুল হয়েছিলো এটাকে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে—'

'হ্যাঁ। তা না-হয় বোঝা গেলো, কিন্তু এত-রাতে এখানে সেই অপেরা গাইছে কারা?' লর্ড এডওয়ার্ড গান শুনে বেশ হতভম্বই হ'য়ে পড়েছিলেন।

কারা যে গাইছিলো, সে অবশ্য পরদিন সকালেই জানা গেলো, যখন দেখা গেলো দুটি যুবক চলেছে ঘোড়ায় চ'ড়ে, সঙ্গে একপাল শিকারি কুকুর।

এঁদের শিবির দেখে যুবকরাই নিজে থেকে কৌতূহলী হ'য়ে ঘোড়া থামিয়েছিলো।

আলাপ হবার পর যুবক দুটিকে ভালোই লেগে গেলো সকলের । কথায়-কথায় জানা গেলো তাদের বাবা লণ্ডনের এক ধনকুবের, ব্যাঙ্কার। ছেলেদের ঝোঁক কেবল গানবাজনায়—এটা ব্যাঙ্কব্যবসায়ীর খুব-একটা পছন্দ হয়নি। অনেকবার নাকি চেষ্টা করেছেন ব্যাঙ্কের ব্যাবসায় এদের ভিড়িয়ে দিতে, কিন্তু এইসব পাউণ্ড-শিলিং-পেন্স জমা-খরচ সুদ-মূলধন—এইসবে কিছুতেই তাদের মন ওঠেনি। তারা বরং কোথায় কোন গানবাজনার আসর বসেছে, তার খবর রাখতেই বেশি-উৎসাহ বোধ করেছে। শেষটায় একদিন তাদের বাবা তাদের ডেকে বলেছিলেন, 'বুঝতে পারছি যতদিন আমার এখানে থাকবে, ততদিন ভাববে পায়ের উপর পা তুলে কাটালেই চলবে। কীভাবে যে সংসার চলে সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তোমাদের হবে না। তার চাইতে তোমাদের টাকা দিচ্ছি, লণ্ডন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ো—যেখানে খুশি যাও, ভালো হয় ইওরোপ ছেড়ে গেলেই। গিয়ে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করো। নটা-পাঁচটা আপিশ যদি ভালো না-লাগে, তো অন্যকিছু করো—কিন্তু অন্য-কোথাও, এখানে নয়। যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারো তো ভালো, না-হ'লে বুঝবো দুটো অকম্মার ধাড়ি এককাঁড়ি টাকা জলে ফেলেছে। আমি না-হয় ধ'রে নেবো যে তবু তো নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে এরা টাকাগুলো খুইয়েছে। কিন্তু এভাবে আর চলবে না—'

বাবার কথা বলার ভঙ্গি দেখে এরা বুঝেছিলো, সত্যিই, এভাবে আর চলবে না। শেষটায় অনেক ভেবে তারা এসে হাজির হয়েছে পৃথিবীর একেবারে অন্যপ্রান্তে—এই অস্ট্রেলিয়ায়। এখানে এসে তারা *ক্যাটলফার্ম* খুলে বসেছে, গোরু-ভেড়ার ব্যাবসা, আর তাদের *র‍্যানচটা* হয়েছে এখানকার অন্য *র‍্যানচগুলোর* চাইতে একেবারেই অন্যরকম। অজস্র গোরু-ভেড়া সামলাচ্ছে বটে, কিন্তু সেটা সামলাতে গিয়ে এখানে তারা তাদের *র‍্যানচকে* কেন্দ্র ক'রে আস্ত-একটা জনপদই গ'ড়ে তুলেছে। শুধু তাদের নিজেদের জন্যে যে মস্ত একটা প্রাসাদই বানিয়েছে তা নয়—তার আশপাশে তাদের কাছে যারা কাজ করে তারাও নিজেদের ঘরবাড়ি বানিয়েছে। জেনারেটর বসিয়েছে—সেখানে তড়িৎকোষ থেকে বিজলি উৎপাদিত হ'য়ে যে শুধু আলোই জোগায় তা-ই নয়, তারা বসিয়েছে টেলিগ্রাফভবন, যাতে বড়ো শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে সবসময়, চেষ্টা করেছে এই দূর জঙ্গলেও জীবনযাত্রার মান যাতে আদিম অতীতে ফিরে না-যায়, বরং বিজ্ঞানকে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজে খাটিয়ে আজ মানুষ জীবনযাত্রাটা যতটা সহজ ক'রে তুলেছে, এখানেও যেন সেই সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের ছাপ পড়ে।

এখানে তারা খুব-ভালো আছে। সারাদিন সকলের সঙ্গে খাটে, *র‍্যানচের* তদারকি করে, এক *কোর‍্যাল* থেকে আরেকটা *কোর‍্যালের* সংযোগ রাখে, রাত্তিরে শুতে যাবার আগে মাঝে-মাঝে তাদের মনে প'ড়ে যায় বেটোফেন বা মোৎসার্টকে, আর কাল রাত্তিরে তাঁরা তাদের সেই গানই শুনেছেন।

সাধারণত যারা *র‍্যানচ* চালায় তাদের ধরন-ধারণ হয় রুক্ষ, কর্কশ, একটু হয়তো-বা অমার্জিতও। এরা কিন্তু মোটেই সে-রকম নয়। খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর তারা অভিযাত্রীদের আমন্ত্রণই জানিয়ে বসলো, 'আসুন না, আমাদের খামারটা দেখে যাবেন একবার।'

এদের সঙ্গে আলাপ ক'রে অভিযাত্রীরা বেশ খুশিই হয়েছিলেন। তাছাড়া, এ-কদিন একটানা পথের ধকলে বেশ-একটু ক্লান্তিও লাগছিলো। একটা দিন না-হয় একটু অন্যরকম ভাবে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-পথশ্রম ছাড়াই কাটানো গেলো।

সারাটা দিন কাটলো এই *ক্যাটলফার্ম* ঘুরে বেড়িয়ে। এই যুবক দুটি কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিশাল বনের পাশে ইওরোপকে এনে বসিয়ে দেয়নি। বরং অস্ট্রেলিয়ার ভূদৃশ্যের সঙ্গে সংগতি রেখেই, মানানসইভাবেই, সবকিছু গ'ড়ে তুলেছে। তাদের এই ছোট্ট গ্রামটা গ'ড়ে তুলতে গিয়ে তাদের অনেক গাছপালা কাটতে হয়েছে, এটা সত্যি—কিন্তু তারা নির্বিচারে গাছ কেটে বনকে বন সাফ ক'রে দেয়নি, বরং *র‍্যানচটা* গ'ড়ে তুলেছে এক বিস্তীর্ণ তৃণভূমির পাশে, যাতে গোরু-ভেড়া চ'রে বেড়াতে পারে, পরের পর গাছপালা কেটে তারা এই চারণভূমি গ'ড়ে তোলেনি। কেননা এটা তারা জানে যে এমনিতেই অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি *আউটব্যাকে* এমনভাবে হা ক'রে থাকে যে যত গাছপালা কাটবে, ততই মরুভূমি এগিয়ে আসবে, বৃষ্টি পড়বে না—ঘাসও গজাবে না, এমনকী সব জীবজন্তুও এখান থেকে উধাও হ'য়ে যাবে। তারা চেয়েছে যাতে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশটাকে কাজে খাটিয়েই তাদের খামার গ'ড়ে তোলা যায়।

অর্থাৎ তৃণভূমিটাকে ঘিরেই জটিলঝুরি মস্ত গাছপালা নিয়ে মোটামুটি অক্ষতই থেকে গেছে এই নিবিড় বনানী—আর তার জীবজন্তুরাও আশ্রয় খুইয়ে এখান থেকে পালিয়ে যায়নি।

'চলুন-না, আজ একটু বনের ভেতরে গিয়ে শোভা দেখে আসা যাক।'

খাওয়াদাওয়ার পর তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো।

বনের শোভা অবশ্য এই দিনগুলোয় যথেষ্টই দেখেছেন সবাই, কিন্তু এখানকার বনে নাকি এমন-সব জীবজন্তু আছে, যা আর কোথাও সহজে দেখা যাবে না।

এ-কথা শুনে সকলের আগে উৎসাহে লাফিয়ে উঠেছিলো রবার্টই। আর তার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসাহ দেখে অন্যরাও আর-কোনো আপত্তি তোলেননি। কিন্তু তাতে অবশ্য একটা বিপত্তিই ঘটতে বসেছিলো। তাদের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গিয়েছিলো ক্যাঙারুদের একটা ঝাঁকের—অনেক ছানা-রুর সঙ্গে মা-ক্যাঙারু। আর ক্যাঙারুর স্বভাবই এমন যে যদি তারা ভাবে আচমকা কোনো বিপদ এসে হাজির হয়েছে, তখন তারা গোড়ায় চেষ্টা করে লাফিয়ে-লাফিয়ে পালিয়েই যেতে—ক্যাঙারুর লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটে-চলার দৃশ্য ভারি অদ্ভুত, কেমন হাসিও পায়—কিন্তু ব্যাপারটা খুব-একটা হাসির থাকে না, যদি তারা মনে করে যে সহজে পালিয়ে যেতে পারবে না। তখন উলটে তারা লাফিয়ে এসে হামলাই চালায়—তখন তারা লাথি কষায়, আর সেই চাঁট খেয়ে বড়ো-বড়ো জন্তুও একেবারে ঘায়েল হ'য়ে যায়।

ক্যাঙারুরা নিরামিষাশী—উদ্ভিদভোজী। শুধু অস্ট্রেলিয়া আর নিউগিনিতেই তাদের দেখা যায়। লম্বা ল্যাজ, আর শরীরের পেছন দিকটা এমন সবল-সুগঠিত যে তাতেই তারা একেক লাফে বড়ো-বড়ো দূরত্ব অতিক্রম ক'রে যেতে পারে। আর প্রকৃতি যেমন তাদের আত্মরক্ষা করার জন্যে শক্তিশালী পশ্চাদ্দেশ আর সুগঠিত পা দিয়েছে, তেমনি এই ব্যবস্থাও করেছে বিপদের সময়, কোনঠাশা হ'য়ে গেলে, যাতে তারা ঐ পায়ের লাথি কষাতে পারে।

রবার্ট ঠিক টের পায়নি, বরং আগ্রহের বশে বড্ড-কাছে গিয়ে পড়েছিলো এক ছানা-রুর, যে-তখন মার বুকের থলে থেকে বেরিয়ে নিজেই চ'রে বেড়াচ্ছিলো। কিন্তু মা-ক্যাঙারুর ছিলো সজাগ কড়ানজর; সে রবার্টকে কাছে আসতে দেখেই একলাফে তার কাছে এসে প'ড়ে প্রায় লাথি কষাতেই গিয়েছিলো। কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস হুঁশিয়ার না-থাকলে রবার্টকে আর দেখতে হ'তো না—কিন্তু কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস গায়ের জোরে ধেয়ে-আসা ক্যাঙারুর বুকে তাঁর ছোরাটা বসিয়ে দেয়াতেই রবার্ট সে-যাত্রায় বেঁচে গেলো।

এই বিপত্তির পর সবাই বেশ-একটু মনখারাপ ক'রেই ফিরে এসেছিলো। মিথ্যেমিথ্যি কোনো ক্যাঙারুকে মারার ইচ্ছে বোধহয় কারুই ছিলো না।

'ক্যাঙারু নিরামিষাশী হ'লে কী হয়—আমাদের কিন্তু বিপদে ফ্যালে প্রায়ই,' একটু সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতেই ভাইদের একজন বললে, 'শুধু লতাপাতা উদ্ভিদ খায় ব'লেই এঁদের খাই-খাই থেকে শস্যবাঁচানো একটা বিষম মুশকিলের ব্যাপার। ক্যাঙারুর ঝাঁক আসতে দেখলে আমরা নিজেরাও প্রায়ই উলটে ওদের মারতে বাধ্য হই।'

'হ্যাঁ, একেই বলে জঙ্গলের নিয়ম। তুমি যদি নিজের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না-করো, তবে তোমার দেখাশুনো করবার জন্যে এই বিজনবিভুঁয়ে আর কেই-বা থাকবে?' অন্যভাই সায় দিয়ে বলেছিলো।

বিশ্রামটা যদিও অবিমিশ্র নিশ্চিন্ত হয়নি, তবু বোধহয় এই একটা দিন জিরিয়ে নেয়া ভালোই হয়েছিলো। কারণ পরদিন ভোরেই লর্ড গ্লেনারভনের বহর অস্ট্রেলিয়ার এমন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঞ্চলে পৌঁছে গেলো যেখানটা অত্যন্ত দুর্গম ব'লেই এখনও মানুষের অজ্ঞাত থেকে গেছে।

বহর এখন যেখানে এসে পৌঁছেছে মাউন্ট কশ্‌চিউস্কোর কাছে, যে-পর্বতশ্রেণী দক্ষিণপূর্ব নিউসাউথ ওয়েল্‌স-এর পাশ দিয়ে উঠে গেছে ৭৩১৬ ফিট উঁচু, অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে-উঁচু পর্বতশ্রেণী—গ্রেট ডিভাইডিং রেন্‌জের মধ্যেও সবচেয়ে-উঁচু। ইওরোপ থেকে মানুষ গিয়ে তাকে একটা ইওরোপিয় নামই দিতে চেয়েছে, তাকে বলেছে অস্ট্রেলিয়ার আল্‌প্‌স —একদিকে পূর্ব-ভিক্টরিয়া, আর দক্ষিণদিকে নিউসাউথ ওয়েল্‌স —বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে চ'লে গিয়েছে পর্বতশ্রেণী। অস্ট্রেলিয়ার এই আল্‌প্‌সের সবখানে এখনও কোনো অভিযাত্রীদলই যেতে পারেনি, ফলে প্রায়ই নতুন-নতুন তথ্য জড়ো হ'তে থাকে এই মাউন্ট কশ্‌চিউস্কো সম্বন্ধে। এঁদের বহর অবশ্য এটা অতিক্রম ক'রে যাবে না, শুধু-যে দুর্গম তা নয়, এটা দুরারোহও—তাছাড়া কোথায় যে কী আছে, তাও জানা নেই—ফলে আগে থেকেই ঠিক ছিলো এর পাদদেশ ঘিরেই, এর পাশ কাটিয়ে, যাবে বহর।

কিন্তু তাহ'লেও ঠিক কোনখান দিয়ে গেলে যে এর পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে, সেটা জানা নেই—কোনো মানচিত্রেও এ-সম্বন্ধে কোনো হদিশ দেয়া নেই। এখানকার কারু কাছে জিগেস ক'রে পথঘাট সম্বন্ধে জেনে নিতে পারলেই ভালো হ'তো। সেইজন্যেই পথে যখন একটা সরাইখানা পড়লো, সেখানে গিয়ে জিগেস ক'রে সব ঘাতঘোঁৎ জেনে নেয়া ভালো ব'লেই ঠিক হ'লো।

সরাইওলা বোধহয় সত্যিকার একজন *রেডনেক*, খুবই রুক্ষ আর রূঢ় তার চেহারা, কথাবার্তাও কাটা-কাটা, কেমন যেন রাগি-রাগি। আয়ারটনের প্রশ্নের উত্তরে সে অবশ্যি একটা অপেক্ষাকৃত সহজ পথের কথা বাৎলে দিলে, সেখান দিয়ে গেলে পাহাড়ের ল্যাজের দিকটা ডিঙোনো যাবে—কিন্তু এই হদিশটুকু দেবার কোনো ইচ্ছে বোধহয় তার ছিলো না—ভাবটা এমন, যেন সে তার সিন্দুক থেকে মহামূল্যবান কোনো সম্পত্তি বার ক'রে দিচ্ছে।

সরাই থেকে বেরিয়ে আসার সময়েই ইশ্‌তেহারটা চোখে পড়লো লর্ড এডওয়ার্ডের। বেন জয়েসকে ধরিয়ে দেবার কোনো খবর দিতে পারলে একশো পাউণ্ড পুরস্কার দেবে পুলিশ।

মেজর ম্যাকন্যাবস হুলিয়াটা দেখে মন্তব্য করলেন : 'এই বেন জয়েসের কুকীর্তিগুলো সম্বন্ধে যত খবর পাচ্ছি, ততই মনে হচ্ছে একে হয়তো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড না-দিয়ে ফাঁসিতে লটকানোই উচিত ছিলো।'

'লোকে যতটা বলে যদি সত্যিই সে এতটাই কুখ্যাত হয়, তাহ'লে মাত্র একশো পাউণ্ড দাম হবে কেন তার মাথার?' আয়ারটন একটা টিপ্পনী কাটলে। 'আমার মনে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়, এ-সব রটনার মধ্যে অনেকটাই বাড়াবাড়ি আছে—'

'যতই অতিরঞ্জন থাক না কেন,' লর্ড এডওয়ার্ডের মন্তব্য, 'বেন জয়েস যে খুব-একটা সুবিধের লোক নয়, এটা ঠিক। না-হ'লে পুলিশ এমন হন্যে হ'য়ে তাকে খুঁজতো না। কিংবা যে-সব জায়গায় খুব-বেশি লোকজন নেই, সেইসব দূর-দূর জায়গায় এসে এমনভাবে হুলিয়া টাঙিয়ে দিতো না।'

'অর্থাৎ,' মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স বললেন, 'সে-যে কখন কোথায় থাকে, পুলিশ সে-সম্বন্ধে কোনো খবরই রাখে না। তারা শুধু আন্দাজে ভর ক'রে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছে—'

এত-সব কথাবার্তার মধ্যে পাঞ্চয়ল যে কোনো মন্তব্য করবেন না, তা তো আর হয় না। তিনি ব'লে উঠলেন, 'এইভাবেই কিংবদন্তির জন্ম হয়। যার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা নেই, তার সম্বন্ধেই সব উলটোপালটা উদ্ভট আজগুবি খবর বেরিয়ে যায়—আর লোকে ভাবে সে বুঝি সাধারণ মানুষের চাইতে একেবারেই অন্যরকম।'

বেন জয়েসকে জড়িয়ে কত-কী গল্প রটেছে, সে-সম্বন্ধে আলোচনাটা অবশ্য আপাতত মুলতুবি রইলো। এখন এই মাউন্ট কশ্‌চিউস্কোর ল্যাজটা ডিঙিয়ে অস্ট্রেলিয়ার আল্‌পস-এর পাল্লা থেকে বেরিয়ে-যাওয়াই জরুরি আর অব্যবহিত কাজ।

এবং কাজটা যে সহজ নয়, ক্রমাগতই তার প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগলো।

স্কটল্যাণ্ড যতই পাহাড়ি জায়গা হোক, হাইল্যাণ্ডের উচ্চভূমি যতই উবড়োখাবড়ো বা রুক্ষবন্ধুর হোক, এবং স্কটল্যাণ্ডর পাহাড় সম্বন্ধে তাঁদের যতই অভিজ্ঞতা থাক, এই পাহাড় টপকাতে তা মোটেই কাজে লাগবে না, এই মাউন্ট কশ্‌চিউস্কোর যে-দিকটা অপেক্ষাকৃত নিচু, সেদিক দিয়েও পাহাড় টপকানো নেহাৎ সহজ কর্ম ছিলো না—বিশেষত এত-সব ঘোড়া আর বলদ নিয়ে। মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পুরো ব্যাপারটার তত্ত্বাবধান করছিলেন। বিশেষত যখন একবার বলদে-টানা গাড়িটার একটা চাকা হঠাৎ-একবার দুম ক'রে খুলে এলো, আর তারপর রহস্যময়ভাবে মুখ থুবড়ে পড়লো কয়েকটি বলদ আর একটা ঘোড়া। কেন-যে ওভাবে দুম ক'রে তারা পপাত ধরণীতলে এবং মমার চ, সেটা প্রায়-যেন একটা দুর্বোধ্য হেঁয়ালিই র'য়ে গেলো। ক্লান্ত, অবসন্ন, রুক্ষ পাহাড়ি পথের বন্ধুর পাথরে হোঁচট খেয়েছে—এত-সব কথা ভেবেও বোঝা গেলো না তারা মাটিতে পড়বামাত্র মরলো কেন।

তারপর যখন বিশেষ-সাবধানে ধীরমন্থর গতিতে পাহাড়ের শীর্ষদেশটা ডিঙিয়ে তাঁরা ওপাশটায় পৌঁছেছেন, তখন চলতে-চলতে হঠাৎ জাক পাঞ্চয়লের ঘোড়াটাও কেমন বিচ্ছিরিভাবে পাগুলো দুমড়ে-মুচকে প্রায় হুমড়ি খেয়েই পড়লো এবং আর উঠলো না, তখন প্রায় চোখ ছানাবড়া হবার অবস্থা সকলের। কী কারণ থাকতে পারে এই বলদগুলো আর ঘোড়াগুলোর এমনভাবে চিৎপাত হ'য়ে ঠ্যাং ছড়িয়ে প'ড়ে যাওয়ার ? পাঞ্চয়লকে নিয়েই যখন তাঁর ঘোড়াটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো, তখন তাঁর মুখচোখের ভাব যদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছবি এঁকে ফুটিয়ে তোলা যেতো! তাঁর মুখ দিয়ে বাক্য প্রায় সরছিলোই না, শুধু কোনোমতে অস্ফুট স্বরে বলতে পেরেছিলেন : 'অদ্ভুত!'

অদ্ভুত তো বটেই! এখন যে বাকি রইলো মাত্র পাঁচটা ঘোড়া আর চারটে বলদ। এগুলোর যদি কিছু হয়, তাহ'লে বহর একেবারে অকেজো হ'য়ে যাবে, জনমানবহীন রুক্ষ পার্বত্যঅঞ্চলে বিষম বিপদের মধ্যে পড়বে। লর্ড এডওয়ার্ড এতটাই বোমকে গিয়েছিলেন, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। শুধু মেজর ম্যাকন্যাবস জাক পাঞ্জয়লের অস্ফুট আর্তনাদ, *অদ্ভুত!*-এর উত্তরে চাপাগলায় দাঁত চেপে বলেছিলেন : *'খুবই অদ্ভুত!'*

কিন্তু বিপদ আর প্রহেলিকা বোধহয় একা আসে না। সেই রাতেই মারা গেলো আরো-একটা ঘোড়া, আর বলদ। আর কেন-যে এরা হঠাৎ এভাবে পর-পর মারা যাচ্ছে, সেই হিংটিংছট প্রশ্নটার কোনোই সমাধান হ'লো না। মেজর ম্যাকন্যাবস যতই আপৎকালীন সতর্কতা নিয়ে চোখকানখুলে পুরো ব্যাপারটা আঁচ করবার চেষ্টা করুন না কেন, কেবল তাঁর মুখটা গম্ভীর হ'য়ে-যাওয়া ছাড়া আর-কিছুই হ'লো না—এবং তাঁর ললাটদেশে কেবল কতগুলো বাড়তি কুঞ্চনরেখা পড়লো।

আর আয়ারটন কেমন যেন হতভম্ব হ'য়ে আছে। সে ঘোড়া আর বলদগুলোর বিশেষ তোয়াজ করছে, পরিচর্যা করছে, কিন্তু কিছুতেই তার মাথায় ঢুকছে না হঠাৎ এতটা পথ পেরিয়ে এসে এই পাহাড়েই এমন তাজ্জব কাণ্ডটা হচ্ছে কেন!

আপদের সেখানেই শেষ নয়। সাবধানে বাকি পথটা চলতে-চলতেও যখন পরের দিন জানুয়ারির তেরো তারিখে স্নোয়িনদীর আধমাইলের মধ্যে এসে গাড়ির চাকা ডেবে গেলো কাদায়, তখন সকলের একেবার মাথায় হাত। কোনোরকমে ঠেলেঠুলে গাড়িটাকে কাদার মধ্য থেকে তোলা হ'লো বটে, কিন্তু ঠিক হ'লো এখানেই আপাতত ছাউনি ফেলে রাতটা কাটিয়ে দেয়া হবে। তাতে এই জন্তুগুলো অন্তত বিশ্রাম করবার একটা সুযোগ পাবে—হয়তো পথের ধকল কাটিয়ে উঠতে পারবে।

সবাই যখন গুছিয়ে ব'সে এইসব আকস্মিক উৎপাত সম্বন্ধে আলোচনা করছেন, তখন আয়ারটন আবার নতুন ক'রে তার প্রস্তাবটা দিলে।

'সামনেই একটা মোটামুটি সুগম রাস্তা আছে—নাম লক্ষ্ণৌ রোড—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না-দিয়েই জাক পাঞ্জয়ল বললেন, 'কী মুশকিল! লোকেরা কি আর নতুন নাম পায় না কোথাও! পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যদি একই নাম দিতে থাকে, তাহ'লে আমরা যারা ভূগোল নিয়ে চর্চা করি—আমরা কোথায় যাই? এই পর্বতশ্রেণীর নাম গ্রেট ডিভাইড রেনজ—মার্কিন মুলুকেও এমনি-একটি গ্রেট ডিভাইড আছে। কোথায় জানতুম ভারতবর্ষে লক্ষ্ণৌ নামে একটা জায়গা আছে, সিপাহিবিদ্রোহের সময় সেখানে একটা প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিলো। এখন, এইখানে কি না একটা লক্ষ্ণৌ রোড এসে হাজির। এই রাস্তা ধ'রেই কি আমরা সাতসাগর ডিঙিয়ে সোজা ভারতবর্ষে গিয়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ্ণৌ পৌঁছুবো নাকি ?'

ভৌগোলিকের এই বিমর্ষ সমস্যায় সবাই কোথায় সহানুভূতি দেখাবেন—না, সবাই হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। আবহাওয়া গত ক-দিন ধ'রেই কেমন ভারি হ'য়ে ছিলো, তাঁর কথা শোনবার পর হঠাৎ যেন সব মেঘ কেটে গেলো, পরিবেশটা বেশ হালকা হ'য়ে গেলো।

হাসিটা একটু থামতেই আয়ারটন ফের নাছোড়ের মতো কথাটা পাড়লে। 'আমাদের তো একের পর এক বিপদ লেগেই আছে। কবে যে সবাই মিলে আমরা পুরো রাস্তাটা পেরুতে পারবো কে জানে। তার চাইতে, কাছেই যখন লক্ষ্ণৌ রোড আছে, তখন আমায় বরং মেলবোর্নেই পাঠিয়ে দিন—*ডানকানের* খোঁজে। যাতে *ডানকান* সোজা পুব উপকূলে চ'লে যায়, সেই-মর্মে বরং একটা চিঠি লিখে দিন, যাতে আমাদের কাজ খানিকটা এগিয়ে থাকে।'

আর-কেউ কিছু বলবার আগেই মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স বাধা দিলেন। *ব্রিটানিয়া* যে ঠিক কোথায় ডুবেছে, তা জানা আছে একমাত্র আয়ারটনেরই। তাকে কী ক'রে এখন সবাইকে ছেড়েছুড়ে একা চ'লে যেতে দেয়া যায় ?

সঙ্গে-সঙ্গেই মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌সের কথায় সায় দিলেন কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স। তাঁরও মত : *ডানকান* ফার্স্টমেট টম অস্টিনের তত্ত্বাবধানে যা করছে করুক—কিন্তু কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো হদিশ না-পাওয়া অব্দি আয়ারটনের মূল বহর ছেড়ে যাওয়া চলবে না।

আয়ারটন যখন বললে যে 'আমি শুধু আমাদের কাজটা খানিকটা এগিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম,' তখন তার মুখে যে হাঁড়িপানা ভাব ফুটে উঠেছিলো, সেটা আর-কেউ খেয়াল করুক বা না-করুক, মেজর ম্যাক্‌ন্যাবস বেশ লক্ষ করেছিলেন। এ-কথায় তার অতটা নিরাশ হ'য়ে পড়ার কী আছে ? আয়ারটনের হাবভাবের মধ্যে কী-একটা যেন আছে, যেটা মেজর ম্যাক্‌ন্যাবসের আদপেই ভালো লাগছে না। অথচ স্পষ্ট ক'রে তিনি নিজেই জানেন না—সেটা কী? তাই এ নিয়ে তিনি আর-কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। মনে-মনে ঠিক ক'রে নিলেন, আয়ারটনের ওপর এখন থেকে কড়ানজর রেখে চলতে হবে।

সম্ভবত মনের মধ্যে কোথাও-একটা অস্বস্তি খচখচ করছিলো ব'লেই সে-রাতে একটা নাগাদ ঘুম ভেঙে গেলো মেজর ম্যাকন্যাবসের। গোড়ায় তিনি বুঝতেই পারেননি হঠাৎ এত-তাড়াতাড়ি তাঁর ঘুম ভেঙে গেলো কেন। আর তারপরেই চোখ কচলে ধড়মড় ক'রে তিনি উঠে বসলেন।

তাঁরা যেখানে ছাউনি ফেলেছিলেন, সেখানে প্রায় আধমাইল জায়গা ফসফর-ফার্নের হালকা-নীল আলোয় আলো হ'য়ে আছে—কিন্তু সেটাই তাঁর ধড়মড় ক'রে উঠে-বসার কারণ নয়। একটু-দূরে কয়েকটা কালো-কালো ছায়া, অথবা আরো-ভালো ক'রে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলা যায় ছায়ার মতো মানুষ, ঝুঁকে প'ড়ে ছায়মূর্তিগুলো যে মাটির ওপর কী-সব চিহ্ন খুঁটিয়ে দেখছে।

তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে প্রায় ছুটেই যেতে চেয়েছিলেন মেজর, কিন্তু শেষটায় লম্বা-লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে প্রায় গুঁড়ি মেরে এগুলেন তিনি। কী ব্যাপার? এরা কারা?

মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স ছাউনি ছেড়ে ওভাবে ঘাসবনের মধ্যে মিলিয়ে যাবার খানিকক্ষণ বাদেই বৃষ্টি নামলো। বড়ো-বড়ো ফোঁটা, যেন পিপে-পিপে জল ঢেলে দিচ্ছে কেউ আকাশ থেকে। *ঝলকবান* হবে নাকি? পাঞ্চয়ল আধোঘুমের মধ্যে খানিকটা ভিজে গিয়েই বললেন, 'এমন মুষলধারে বৃষ্টি পড়লেই এদিকটায় *ঝলকবান* ডাকে—*ফ্ল্যাশফ্লাড*—বন্যার মতো জল গড়িয়ে যায় পাহাড় থেকে, সামনে যাকে পায় সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়।' আর কথা কটা জড়ানো সুরে বলতে-বলতেই সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়ে পুরোপুরি ঘুম ভেঙে গেলো তাঁর। 'নাঃ, এই তুমুল বৃষ্টি এই তাঁবুর মধ্যে আর থাকতে দেবে না দেখছি!'

বৃষ্টির ঝমঝম শব্দেই শুধু নয়, বৃষ্টির ঝাপটায় ভিজে গিয়ে একটু আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো লর্ড এডওয়ার্ডের। এবার বুঝলেন পাঞ্চয়ল ঠিকই বলেছেন—এমন বৃষ্টিতে এই তাঁবুর মধ্যে আর টেঁকা যাবে না। সবাইকে সাথে নিয়ে তক্ষুনি তিনি গিয়ে আশ্রয় নিলেন সেই বলদে-টানা গাড়িটায়, মেরিকে নিয়ে লেডি হেলেনা যেখানে এই প্রচণ্ড বৃষ্টিতেও খানিকটা সুরক্ষিত আছেন।

ভালো ক'রে কারুই ঘুম হয়নি, তার ওপর বৃষ্টিতে ভিজে-ভিজেই গাড়িতে এসে আশ্রয় নিতে হয়েছে, আর পাঞ্চয়লের *ঝলকবানের* কথা শুনে সবাই একটু আঁৎকেও উঠেছিলো—উত্তেজনায় সকলেই যেন একসাথে কথা কইছিলেন। সকলেই—কিন্তু মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স নন। এ-সব তালেগোলে কেউ খেয়ালও করেননি মাঝখানে কিছুক্ষণ তিনি কোথায় যেন উধাও হ'য়ে গিয়েছিলেন।

*ঝলকঢলের* আশঙ্কাটা মোটেই উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছিলো না। আর-কিছু না-হোক, এ-ভয়টা তো আছেই এই তুমুল বর্ষায় স্নোয়ি নদীর জল ফুলে-ফেঁপে উঠতে পারে। তাই বৃষ্টির মধ্যে কেউ-না-কেউ মাঝে-মাঝে বেরিয়ে গিয়ে খোঁজ ক'রে এলেন জল বাড়ছে কি না।

বৃষ্টির কাণ্ডটা অদ্ভুতই বলতে হবে। যেই ভোর হ'লো, অমনি বৃষ্টিও থেমে গেলো। আকাশ দেখে কে বলবে যে একটু আগেই সে তুলকালাম ঢল নামিয়ে দিয়েছিলো। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে বটে, কিন্তু আকাশের মুখ হাঁড়িপানা, ঘন কালো মেঘ ঢেকে দিয়েছে সূর্যকে। কিন্তু কাদায়-আটকে-যাওয়া গাড়িটাকে এখনই টেনে-তোলা দরকার, না-হ'লে আরো-ফ্যাসাদে পড়তে হবে। শুধু বলদগুলোকে তাড়া লাগিয়ে কোনো লাভ হবে না, এই বৃষ্টির পর নরম কাদামাটিতে গাড়িটা যেভাবে এঁটে বসেছে তাতে একে টেনে-তোলা শুধু এই কটা বলদের কাজ নয়, বলদ ঘোড়া মানুষ সকলের সম্মিলিত শক্তি দরকার।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু বনের মধ্যে যেখানে বলদ আর ঘোড়াগুলো রেখে আসা হয়েছিলো, সেখানে গিয়ে দেখা গেলো সব ভোঁ-ভাঁ—জন্তুগুলোর একটাও সেখানে নেই!

কাণ্ড দেখে, সকলেরই চোখ কপালে উঠে গেলো, হতভম্ব ভাবটা তো আছেই, কিন্তু বিপদের গুরুত্বটা উপলব্ধি করতে কারু একমুহূর্তও দেরি হয়নি। এমনিতেই তো গত ক-দিনে বেশ-কিছু ঘোড়া আর বলদ টেঁশে গিয়েছে—তাতেই যা অসুবিধে হচ্ছিলো, তা আর কহতব্য নয়! এখন এ-জন্তুগুলোর একটাকেও জায়গামতো না-দেখে সকলেরই মাথায় হাত। কী হবে এখন?

ঘণ্টাখানেক প্রায় আশপাশের বনজঙ্গল তোলপাড় ক'রে খোঁজা হ'লো জন্তুগুলোকে —কিন্তু যতই হাঁকডাক চীৎকার-চ্যাঁচামেচি করুন না কেন, এই জন্তুগুলোর কোনো সাড়াই পাওয়া গেলো না। এরা যেন কোন্ ফুশমন্তরে হাওয়ায় উবে গিয়েছে।

হাল ছেড়ে দিয়ে বিমর্ষভাবে যখন কাদায়-ডেবে-বসা গাড়িটার দিকে ফিরছে সবাই, তখন আচমকা ক্ষীণ চিহি-চিহি ডাক শোনা গেলো। হন্তদন্ত হ'য়ে-ছুটে গেলেন সবাই। সেই নিবিড় লম্বা ঘাসের বনে হাতের ঝটকায় পথ ক'রে নিয়ে একটু এগিয়ে যেতেই দেখা গেলো—সেই বড়ো-বড়ো ঘাসগুলোর মধ্যে ঠ্যাং তুলে ম'রে প'ড়ে রয়েছে তিনটি ঘোড়া আর দুটি বলদ। চিল-শকুনরা পাক খাচ্ছে মাথার ওপর, কাকেদের ওড়াউড়ি, গাছের ডালে-ডালে ব'সে আছে গৃধিনীরা। আজ তাদেরই ফূর্তি সবচেয়ে-বেশি—এতবড়ো-একটা ভোজের ব্যবস্থা হওয়া মানে তো তাদের মহোৎসব।

লর্ড এডওয়ার্ড স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন—আক্ষরিকভাবেই যেন কোনো স্তম্ভ হ'য়ে গেলেন, স্ট্যাচু। একটু পরে যখন কথা বলবার ক্ষমতা ফিরে এলো, সে-কথা এতই ক্ষীণ শোনালো যে মনে হ'লো তাঁর গলা দিয়ে যেন কোনো আওয়াজ বেরুতে চাচ্ছে না। 'আয়ারটন,' কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে তিনি বললেন—যেন কোনো ভুতুড়ে দুঃস্বপ্ন থেকে এখনও তিনি আবেশ কাটিয়ে জেগে উঠতে পারেননি, 'বাকি ঘোড়া আর বলদটাকে নিয়ে যাও।'

প্রায় টলতে-টলতেই যেন গাড়ির কাছে ফিরে এলেন সবাই, মোহ্যমান, এইটুকু পথ আসতে বুঝি আধঘণ্টাই লেগে গেলো তাঁদের।

এতক্ষণ মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স টু-শব্দটি করেননি। নীরবে সবকিছু দেখে যাচ্ছিলেন। এবার লর্ড গ্লেনারভনের দশা দেখে আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না তিনি। 'এর আগের বার নদী পেরুবার সময় সব কটা ঘোড়ার পায়ে নাল লাগানো হ'লে এমন অবস্থা কিছুতেই হ'তো না।

'এ-কথা কেন বলছেন?' একটু হতভম্ব হ'য়েই জিগেস করলে আয়ারটন।

'যে-ঘোড়াটার পায়ে নাল লাগানো হয়েছিলো, শুধু সেইটেই বেঁচে গেছে ব'লে—'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরে! তা-ই তো!' কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স সবিস্ময়ে ব'লে উঠলেন। 'এ-যে দেখছি তাজ্জব ব্যাপার!'

মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌সের দিকে তাকিয়ে আয়ারটন বললে, 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা আপনি ঠিকই ধরেছেন।'

মেজর ততক্ষণে ফের তাঁর মুখে যেন কুলুপ এঁটে দিয়েছেন—আর একটা কথাও বললেন না। গ্লেনারভনের ভারি-কৌতূহল হচ্ছিলো—এখনও তিনি ঠিক ধ'রে উঠতে পারেননি ঘোড়ার পায়ে নাল লাগাবার সঙ্গে এই অপঘাত মৃত্যুগুলোর কী সম্পর্ক। মেজর কিন্তু তখন অপলকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছেন অন্যান্য নাবিকদের নিয়ে আয়ারটন কীভাবে কাদার মধ্য থেকে গাড়িটাকে টেনে তোলবার ব্যবস্থা করছে। মেজরের মুখ থেকে হেঁয়ালিটার কোনো ব্যাখ্যা না-পেয়ে শেষটায় কাপ্তেনকেই জিগেস করলেন গ্লেনারভন, 'আচ্ছা, ম্যাঙ্গল্‌স, ম্যাক্‌ন্যাব্‌স তখন কী বলতে চাচ্ছিলো?'

'বুঝতে পারছি না।' কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সের গলায় চিন্তার ছাপ। 'তবে মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স সাধারণত উটকো-কোনো মন্তব্য করেন না—কারণ থাকলেই কিছু বলেন।'

এবার খুব নিচুগলায় লেডি হেলেনা জানালেন : 'আমার মনে হয় মেজর কোনো কারণে আয়ারটনকে বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারছেন না—এ-সবকিছুর জন্যে তাকেই সন্দেহ করছেন—'

'কিন্তু কেন?' পাঞ্চয়লও এবার একটু চমকে গেছেন। 'আয়ারটন আবার কী করেছে?'

'ম্যাক্‌ন্যাব্‌স যদি ভেবে থাকে, আয়ারটনই এই জন্তুগুলোর মৃত্যুর জন্যে দায়ী, তাহ'লে সে একটা মস্ত ভুল করেছে।' একটু ভেবে নিয়ে বললেন গ্লেনারভন। 'কিন্তু কাউকে সন্দেহ করার আগে তার উদ্দেশ্যটা নিয়ে ভাবতে হবে তো? খামকা আয়ারটন এমন কাজ করতে যাবে কেন? এতে তার কী লাভ হবে?'

'এটা ঠিক যে জন্তুগুলো মারার পেছনে আয়ারটনের কী মৎলব আছে আমরা সেটা জানি না,' কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স বললেন, 'কিন্তু মেজর এ-সম্বন্ধে সত্যি-সত্যি কী বলতে চান, সেইটেই আগে জানা দরকার।'

পাঞ্চয়ল এতক্ষণে একটু ঘাবড়ে যাবার ভঙ্গিতেই বলেছেন : 'ঐ পালিয়ে-যাওয়া কয়েদিগুলোর সঙ্গে মিলে কোনো ঘোঁট পাকায়নি তো?'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সকে নিয়ে এবার লর্ড গ্লেনারভন পাঁকে-পড়া গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলেন। গাড়িটাকে টেনে তুলতে গিয়ে এতজন দশাসই জোয়ান বলদ আর ঘোড়াকে কাজে লাগিয়েও কিছু করতে পারেনি। গাড়িটার চাকাগুলো যেন সেখানে খুঁটি গেড়ে রয়েছে। আর-বেশি জোরাজুরি করতে গেলে এবার না গাড়িটাই ভেঙে যায়। তার অবস্থাও তো ভালো নয়। এরই মধ্যে একবার তাকে মেরামত ক'রে নিতে হয়েছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাল ছেড়ে দিয়ে, লর্ড গ্লেনারভন মেজাজ খারাপ ক'রে সবাইকে ডেকে ফের ফিরে এলেন তাঁবুতে। একটা জরুরি পরামর্শসভা বসানো ছাড়া এখন আর-কোনো উপায় নেই। তাঁরা এখন যেখানে আছেন সেখান থেকে মেলবোর্ন প্রায় শো-দুয়েক মাইল দূরে, আর টুফোল্ড উপসাগর সে-তুলনায় অনেকটাই কাছে—সত্তর-পঁচাত্তর মাইল দূরে হবে। এখন যখন মোটঘাট নিয়ে পায়দলেই যেতে হবে, তখন কোনদিকে যে যাওয়া উচিত, সে-সম্বন্ধে দ্বিতীয় কোনো মতই ছিলো না। পায়ে হেঁটে যেতে হবে যখন, তখন টুফোল্ড উপসাগরের দিকেই যাওয়া উচিত।

লেডি হেলেনা বললেন : 'আমি আর মেরি রোজ কম ক'রেও মাইল-পাঁচেক হাঁটতে পারবো। আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না।'

পাঞ্চয়ল বললেন, 'একটা-কোনো বড়ো জনপদে গিয়ে একবার পৌঁছুতে পারলেই মেলবোর্নে আমরা খবর পাঠাতে পারবো। চাই-কি, নতুন-কোনো গাড়ি-ঘোড়াও জোগাড় ক'রে নেয়া যাবে। সেদিক থেকে ইডেনে যাওয়াই ভালো। তাহ'লে টুফোল্ড উপসাগর অব্দি আর যেতে হয় না।'

'তার চাইতে,' আয়ারটন কী যেন ভেবে নিয়ে বললে, 'এখান থেকেই *ডানকানে* খবর পাঠিয়ে সোজা টুফোল্ড উপসাগরে গিয়েই জাহাজে উঠলে ভালো হয় না কি?'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসের দিকে তাকিয়ে লর্ড এডওয়ার্ড বললেন, 'জন, তুমি কী বলো?'

'টুফোল্ড উপসাগর বেশ-দূরে। অদ্দুর যাবার আর দরকার কী? তার চাইতে ইডেনেই না-হয় যাওয়া যাক—কিছুটা তাড়াহুড়ো করলে চার-পাঁচদিনেই পৌঁছে যাবো।'

'যতই তাড়া করুন না কেন, পনেরো-বিশদিনের আগে ওখানে পৌঁছুনো যাবে না,' আয়ারটন জানালে।

'ঐটুকু রাস্তা যেতে *অ্যাদ্দিন* লাগবে?' লর্ড এডওয়ার্ডের গলার বিস্ময় চাপা থাকেনি।

'তার চাইতেও বেশিদিন লাগতে পারে,' আয়ারটন সকলের সব আশায় ঠাণ্ডাজল ঢেলে দিতে চাচ্ছে, 'ভিক্টরিয়ার সবচেয়ে দুর্গম জায়গা দিয়ে যেতে হবে—এখানটায় লোকজন সাধারণত আসে না—ফলে কোনো রাস্তা তৈরি হয়নি। মনে রাখবেন, আমাদের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ ক'রে যেতে হবে। চার-পাঁচদিনে যাওয়া মোটেই সম্ভব হবে না।'

'বেশ-তো,' ম্যাঙ্গলস যেন খুব-একটা পাত্তাই দিলেন না, 'বেশ, তাহ'লে না-হয় পনেরো-বিশদিন পরেই *ডানকানে* টম অস্টিনকে খবর পাঠানো যাবে। আমরা যদি অ্যাদ্দিন দেরি করতে পারি, তবে এ-কদিনে তেমন-একটা তফাৎ আর কী হবে?'

'কিন্তু আমি তো সবচেয়ে-বড়ো মুশকিলটার কথা এখনও বলিনি,' আয়ারটন আবার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একখানা বিপত্তির কথা তুলেছে, 'যতদিন-না সব জল নেমে যাচ্ছে, আমাদের তো তদ্দিন এখানে নদীর ধারেই ব'সে থাকবে হবে।'

'ব'সে থাকতে হবে কেন?' ম্যাঙ্গল্‌স একটু অবাকই হলেন। 'নদী কি কাছে কোথাও একটা সরু হ'য়ে যায়নি যে হেঁটে পেরুনো যায়?'

'মনে হয় না। সকালে আমি তারও খোঁজ করছিলাম—কিন্তু রাতের বৃষ্টির ঢল নেমে জল ফুলে-ফেঁপে উঠেছে—এতটাই বান ডেকেছে যে জলে কেউ নামলেই কোথায় যে ভেসে যাবে, কেউ জানে না।'

লেডি হেলেনা সরাসরি জিগেস করলেন, 'কিন্তু কত চওড়া এ-নদী?'

'মাইলখানেক তো হবেই—এই তীর থেকে ওই তীর খুব স্পষ্ট দেখা যায় না। তার ওপর এমন সাংঘাতিক স্রোত যে—'

'কিন্তু ভেলা বা ক্যানু তো যাবে,' রবার্ট বললে, 'এখানে তো আর গাছপালার অভাব নেই।'

এতক্ষণে একটা কাজের কথা হ'লো। শুনেই কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স উৎসাহে লাফিয়ে উঠেছেন। 'রবার্ট ঠিকই বলেছে। হাত-পা গুটিয়ে ব'সে না-থেকে অন্তত কিছু-একটা তো করা যাবে।'

আয়ারটনের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে লর্ড গ্লেনারভন জিগেস করলেন, 'তুমি কী বলো, আয়ারটন? সেটা করাই তো ঠিক হবে, তা-ই না?'

'কিন্তু যা-ই করুন না কেন, এখানে আমাদের অনেকদিন ব'সে থাকতে হবে—অন্তত যদ্দিন-না বাইরে থেকে কোনো সাহায্য আসে—'

আয়ারটনের কথা শেষ করতে না-দিয়ে একটু উত্ত্যক্ত ভঙ্গিতেই ব'লে উঠেছেন কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স, 'সবসময় বাইরের সাহায্যের জন্যে ব'সে থেকে কী হবে? তোমার মাথায় যদি অন্যকোনো প্ল্যান থাকে তো সেটাই বলো।'

'সেটাই এতক্ষণ ধ'রে বলবার চেষ্টা করছি। আমরা যতক্ষণ এখানে অপেক্ষা করবো, *ডানকান* ততক্ষণে টুফোল্ড উপসাগরে এগিয়ে এলে অনেকটা সময় বাঁচে—আর সবকিছুর একটা হিল্লে হ'য়ে যায়।'

'সেই থেকে দেখছি তুমি বারে-বারে *ডানকানের* কথাই তুলছো। কিন্তু তাতে ফায়দাটা কী হবে? সাহায্যটা আসবে কোত্থেকে? তাছাড়া *ডানকানকেই* বা আমরা খবর পাঠাবো কী ক'রে?'

এমন সোজাসুজি কথাটা বলা হ'লো যে আয়ারটন একটু থতমত খেয়ে গেলো। কতটা বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছে, সেটা সে এতক্ষণে বুঝতে পারলে। একটু দোনোমনা ক'রে কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে বললে, 'কী করলে একটু তাড়াতাড়ি ঝামেলাটা মেটে, এতক্ষণ আমি শুধু সে-কথাটাই বলতে চাচ্ছিলাম। আমি গায়ে প'ড়ে কোনো পরামর্শ দিতে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাইনি, সেই স্পর্ধাও আমার নেই। আপনারা আলোচনা ক'রে যা ঠিক করবেন, তা-ই হবে।'

এবার একটু অসহিষ্ণু হ'য়েই গ্লেনারভন বললেন, 'কিন্তু সেটা কোনো উত্তর হ'লো না। আমরা তো আলোচনাই করছিলুম। তোমার কী মত, সেটাই বলো। কী করলে আমরা আপাতত এই সমস্যাটা থেকে উদ্ধার পাই, সেটাই তো ভাবতে হবে—'

'আমরা এখানেই ব'সে থেকে বিশ্রাম করি। ততক্ষণে *ডানকান* টুফোল্ডে এসে আমাদের সাহায্য পাঠাবার ব্যবস্থা করুক। এখান থেকে কেউ-একজন গিয়ে টম অস্টিনকে খবর দিক। ততক্ষণে আর বৃষ্টি না-হ'লে নদীর জলও ক'মে যাবে। তখন না-হয় দেখা যাবে কোনখানে নদী পেরুনো যায়। দরকার হ'লে তখনই ক্যানু বানিয়ে নেয়া যাবে।'

'এটা অবশ্য মন্দ বলোনি। দেরি তো এমনিতেই হচ্ছে—তবে মাঝখান থেকে অনেকগুলো ঝামেলার হাত থেকে বাঁচা যাবে। আমাদের ঘোড়া আর বলদগুলো না-থাকায় সত্যিই তো এইভাবে এতটা পথ হেঁটে-হেঁটে যাবার চেষ্টা করা খুব বিপজ্জনক সন্দেহ নেই।'

এতক্ষণ মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স একটাও কথা বলেননি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এই কথা-কাটাকাটি শুনছিলেন। এবার সকলকে অবাক ক'রে দিয়ে ম্যাক্‌ন্যাব্‌স বললেন, 'হ্যাঁ, এই প্রস্তাবটাই সবচেয়ে-ভালো। আয়ারটন যা বলেছে, আমিও এতক্ষণ তা-ই ভাবছিলুম।'

এবার যেন হতভম্ব হওয়ার পালা আয়ারটনের। সে একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে মেজরের মুখের দিকে তাকালে। এতদিন যখনই সে *ডানকানের* কথা তুলেছে, তখনই মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স কোনো-না-কোনো আপত্তি তুলেছেন। অথচ এখন কেমন যেন তড়িঘড়ি বড্ড চট ক'রেই তার কথায় রাজি হ'য়ে যাচ্ছেন!

অন্যরাও বেশ অবাক হয়েছিলো। কিন্তু প্রস্তাবটায় মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌সের সম্মতি আছে দেখে এই প্রস্তাবটাই গ্রহণ করা হ'লো। শুধু কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স তখন একটা বাস্তব অসুবিধের কথা তুললেন—'আমরা যদি নদী পেরুতে না-ই পারি, তবে টম অস্টিনের কাছে যে যাবে, সে-ই বা নদী পেরুবে কী ক'রে?'

আয়ারটন এবার তড়িঘড়ি তার পরামর্শ নিয়ে খাড়া। 'খামকা কাউকে নদী পেরুতে হবে কেন? আমাদের তো এখনও একটা ঘোড়া আছে। সেই ঘোড়ায় চেপে সে লক্ষ্ণৌ রোডে ফিরে যাবে—সেখান থেকে সোজা চ'লে যাবে মেলবোর্নে। ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে বেশিদিন লাগবে না। চট ক'রেই পৌঁছে যাবে মেলবোর্ন—সেখান থেকে টুফোল্ডের মুখে আসতে আর ক-দিনই বা লাগবে?'

সঙ্গে-সঙ্গে মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স কথাটায় সায় দিলেন। 'এই কথাটা আগেই আমাদের ভাবা উচিত ছিলো। এতেই সবচেয়ে-তাড়াতাড়ি ঝামেলাটার একটা সুরাহা হবে।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিন্তু যাবে কে? আমাদের তো কারুই এখানকার পথঘাট জানা নেই,' লর্ড গ্লেনারভন জিগেস করলেন।

'আমাকে এই রাস্তা দিয়েই বুনোদের হাত থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছিলো,' আয়ারটন বললে, 'আমি এখানকার রাস্তাঘাট একটু-আধটু জানি। আপনি যদি হুকুম করেন তো আমিই যেতে পারি। একটা চিঠি লিখে টম অস্টিনকে নির্দেশ দিন—একসপ্তাহের মধ্যে *ডানকানকে* নিয়ে টুফোল্ডের মুখে এসে হাজির হ'য়ে যাবো।'

'না-না, তুমি কেন যাবে?' আপত্তি তুলেছেন জন ম্যাঙ্গলস। 'তুমি চ'লে গেলে, *ব্রিটানিয়া* কোথায় ডুবেছিলো, সে-জায়গাটা চিনিয়ে দেবে কে? অন্তত সে-জায়গাটা শনাক্ত ক'রে দেবার জন্যেও তোমার এখানে থাকা উচিত।'

কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপত্তিটাকে নস্যাৎ ক'রে দিলেন ম্যাকন্যাব্‌স। 'না কাপ্তেন, আয়ারটনের প্ল্যানটাই ভালো—সে এখানকার রাস্তাঘাট চেনে, সে চট ক'রে পৌঁছে যেতে পারবে মেলবোর্নে। তাছাড়া আমরা তো এখন এখানে নদীর জলের শোভা দেখবো, ঢেউ গুনবো আর হাওয়া খাবো—আমরা তো আর এখান থেকে নড়ছি না এখন, যে *ব্রিটানিয়া* কোথায় ডুবেছিলো সে-জায়গাটা খুঁজতে বেরিয়ে যাবো। সেই-অর্থে, আয়ারটনের তো এখানে কোনো কাজ নেই। সে-ই বরং বার্তাটা নিয়ে যাক।'

'তাহ'লে এই কথাটাই ঠিক হ'লো,' লর্ড এডওয়ার্ড বলেছেন, 'আয়ারটনই যাবে।' ব'লে তক্ষুনি তিনি চিঠি লিখতে ব'সে গিয়েছেন।

আর, অমনি, পলকের জন্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে আয়ারটনের মুখ, চোখের তারায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছে। আর-কারু চোখে না-পড়লেও জন ম্যাঙ্গলসের সেটা চোখ এড়ায়নি।

লর্ড এডওয়ার্ড যখন চিঠিটার মুসাবিদা করছেন, কাঁধের কাছে মুখ এনে মেজর ম্যাকন্যাব্‌স ফিশফিশ ক'রে বলেছেন তাঁকে, 'আয়ারটন বানানটা জানা আছে তো?'

'বাঃ রে, যা হয়, তা-ই। আ-য়া-র-ট-ন।'

'না। আমরা বলি আয়ারটন, তবে লেখার সময় বেন জয়েস।'

নিচু গলাতেই বলেছিলেন মেজর ম্যাকন্যাব্‌স কিন্তু স্তব্ধ তাঁবুর মধ্যে তবু যেন নামটা গমগম ক'রে বজ্রের মতো ফেটে পড়েছিলো।

হতচকিত, কেউ কিছু বুঝে ওঠবার আগেই, আয়ারটনের হাতে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে ছোট্ট-একটা আগ্নেয়াস্ত্র, আর রিভলভারটি থেকে পর-পর তিনবার গুলি ছুটেছে। গুলি খেয়ে তক্ষুনি আছড়ে পড়েছেন লর্ড এডওয়ার্ড, কলমটা তাঁর হাত থেকে ছিটকে প'ড়ে গিয়েছে।

কিন্তু এই তিনবার-ছোঁড়া গুলির আওয়াজ বুঝি অন্য কোনোকিছুর সংকেতই ছিলো —কেননা ঠিক তার প্রতিধ্বনি তুলেই বাইরে পর-পর শোনা গেছে আরো আগ্নেয়াস্ত্রের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আওয়াজ।

হুটোপাটিটা শুরু হবার আগেই আয়ারটন উধাও। কাপ্তেন জন ম্যাঙ্গল্‌স অন্য মাল্লাদের নিয়ে ছুটে গিয়েও আয়ারটনের নাগাল ধরতে পারেননি, তিন লাফেই সে যেন গিয়ে ততক্ষণে পৌঁছেছে বনের পাশে—যেখানে তার সাগরেদরা এতক্ষণ ধ'রে ইঙ্গিতটারই অপেক্ষা করছিলো।

এই তাঁবুর মধ্যে থাকলে সবাই তাহ'লে দুশমনদের সহজ-চাঁদমারি হ'য়ে উঠবে—তাঁবুটা তাগ ক'রেই এই নৃশংস দস্যুগুলো তাহ'লে মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণ করবে।

লর্ড এডওয়ার্ডের প্রাথমিক অপ্রস্তুত অবস্থাটা কেটে যেতেই তিনি লাফিয়ে উঠেছেন—তাঁর আঘাত ততটা গুরুতর নয়, গুলিটা তাঁর কাঁধ ঘেঁসে আছে, কেননা আয়ারটন তখন গুলি চালিয়েছিলো এলোপাথারি, তাগ ঠিক করবার মতো অবসর পায়নি। আর একমুহূর্তও সবুর করেননি লর্ড এডওয়ার্ড, মেরি আর হেলেনাকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বলদে-টানা গাড়িটার পেছনে—গাড়ির ওপরের ছাউনিটা মোটা-মোটা চামড়া আর কাঠে বানানো। অন্য-সবাই ততক্ষণে বন্দুক তুলে নিয়েছেন হাতে, এই দুশমনদের যে-ক'রেই-হোক ঠেকাতে হবে। বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করা চলবে না।

কয়েক ঝাঁক গুলি ছুটেছিলো, তারপরেই সব হঠাৎ এখন চুপ হ'য়ে গেছে, সব ঠাণ্ডা, শত্রুদের আর-কোনো সাড়াশব্দ নেই। কিন্তু বনের পাশে সব ভোঁ-ভাঁ, কোনো জনপ্রাণীর চিহ্নও নেই। আয়ারটন অথবা বেন জয়েস—যে-ই হোক না কেন, সে এই ফাঁকে তার তাঁবেদারদের নিয়ে চম্পট দিয়েছে—শুধু বারুদের গন্ধ আর ধোঁয়াই বুঝিয়ে দিচ্ছে একটু আগেই এখান থেকে গুলি ছুটেছিলো।

মেজর ম্যাক্‌ন্যাবস তক্ষুনি কাপ্তেনের সঙ্গে ছুটে গিয়েছেন ধাওয়া ক'রে—লড়াইটা সামনাসামনিই হোক, অমন আড়াল থেকে শত্রুর মোকাবিলা করা যাবে না। কিন্তু অপ্রস্তুত অবস্থাটা কাটিয়ে উঠে ছুটে আসতে যতটা সময় লেগেছিলো তাতে শত্রুরা পালিয়েছে।

'পালিয়েছে কি না কে জানে।' বলেছেন মেজর। 'হয়তো কোথাও ওৎ পেতে আছে—সুযোগ পেলেই অতর্কিতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এতে বরং বিপদ আরো বাড়লো। কোথায় কোন কোণ থেকে হামলা আসবে, কে জানে। এ-জায়গাটা তো এদের নিজেদের হাতের চেটোর মতোই চেনা। মুখোমুখি বাঘের সঙ্গে লড়াই করার চাইতে ঘাসের আড়াল থেকে সরসর ক'রে এগিয়ে-আসা সাপের ছোবল ঠেকানো অনেক কঠিন।'

'আমাদের সারাক্ষণ হুঁশিয়ার হ'য়ে থাকতে হবে।' মেজরের সঙ্গে গাড়িটার পাশে ফিরে আসতে-আসতে বলেছেন কাপ্তেন। 'সবসময় কাউকে-না-কাউকে পাহারায় থাকতে হবে।'

দুজন মাল্লাকে বনের দিকে কড়ানজর রাখতে ব'লে তাঁরা তারপর গাড়ির আড়ালে এসেছেন। ততক্ষণে মেরি আর হেলেনা লর্ড এডওয়ার্ডের জখমটার শুশ্রূষা করতে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেগেছে। আঘাতটা, ভাগ্যিশ, তেমন-গুরুতর নয়, গুলিটা চামড়া ছ'ড়ে বেরিয়ে গেছে। রক্তস্রাব হচ্ছে, সেটা এক্ষুনি ব্যানডেজ বেঁধে বন্ধ করা চাই।

ব্যানডেজ বাঁধা হ'য়ে যেতেই মেরি আর লেডি হেলেনাকে হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছেন লর্ড গ্লেনারভন। 'সাবধানে থেকো তোমরা। এই গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ো না একবারও। সবচেয়ে-ভালো হ'তো যদি মাথার পেছনে দুটি ক'রে বাড়তি চোখ থাকতো —তাহ'লে সামনে-পেছনে দু-দিকেই নজর রাখা যেতো।' এই রসিকতা ক'রে থমথমে অবস্থাটা একটু হালকা ক'রে দিয়ে তারপর তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন মেজরের দিকে।

একটু আগেই যা ঘটেছে, তার আকস্মিকতায় লেডি হেলেনা একেবারে বোমকে গিয়েছিলেন। ভয় পাবেন ব'লে, আগে তাঁকে কেউ পলাতক কয়েদি, রেলগাড়ির হামলা, ইনাম ঘোষণা ক'রে হুলিয়া বেরুনো—এর কোনো কথাই কখনও বলেননি। এখন তাঁকে সবকিছু খুলে বলতে হয়েছে, একেবারে গোড়া থেকে—অন্তত যতটুকু তাঁরা জানেন।

মেজর আগেকার কথাটা বলতে-বলতে পকেট থেকে বার ক'রে *অস্ট্রেলিয়ান অ্যাণ্ড নিউজিলাণ্ড গেজেটের* সেই বিশেষ সংখ্যাটা দেখিয়েছেন, যেখানে দুর্ধর্ষ দস্যু বেন জয়েসের পালাবার খবর বেরিয়েছিলো।

'আয়ারটনকে আমার গোড়া থেকেই সন্দেহ হচ্ছিলো—তার হাবভাব খুব-একটা ভালো লাগেনি কখনোই। স্পষ্ট ক'রে কোথাও আঙুল রেখে বলতে পারবো না যে এই একটা খুঁটিনাটি থেকে বুঝতে পেরেছি যে তাকে দেখে যা মনে হয়, সে আসলে তা নয়। কিন্তু কেন যেন তার কোনো কথাই আমার ঠিক বিশ্বাস হয়নি—একেবারে গোড়া থেকেই। কী জানি, সন্দেহ করা হয়তো আমার বাতিক। কিন্তু সন্দেহটা পাকিয়ে উঠেছিলো আরো, যখন পর-পর আপাতদৃষ্টিতে কতগুলো তুচ্ছ ব্যাপার নজরে পড়েছিলো। সেই যেবার গাড়ি সারাই করার জন্যে মিস্ত্রি এনেছিলো আয়ারটন, তখন সন্দেহটা আরো দানা বাঁধে। আমি দেখেছিলুম, গাড়ি সারাতে-সারাতে তারা ইশারা-ইঙ্গিতে চোখে-চোখে কথা কইছে। তাছাড়া আরো-একটা খটকা ছিলো প্রথম থেকেই। কোনো লোকালয় কাছে এলেই আয়ারটন এড়িয়ে-এড়িয়ে যায় কেন, কেন কোনো গ্রামে বা শহরে ঢুকতে চায় না।'

'হ্যাঁ,' জন ম্যাঙ্গল্‌স বলেছেন, 'এটা আমিও খেয়াল করেছিলুম। আয়ারটন সবসময়েই বলতো একজন কারু গাড়ির কাছে থেকে লটবহরের ওপর নজর রাখা উচিত। আর সেই দায়িত্ব সবসময়েই আগবাড়িয়ে সে নিজের কাঁধেই তুলে নিতো।'

'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে,' জ্ঞানগর্ভ বাণী আউড়েছেন জাক পাঞ্জয়ল, 'এখন হয়তো তার সমস্ত আচার-আচরণ থেকেই আমরা নতুন-নতুন সব অর্থ নিংড়ে নিতে পারবো।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই স্বতঃসিদ্ধ আর্ষবচনকে কোনো পাত্তা না-দিয়েই মেজর ফের নিজের কথার জের তুলে নিয়েছেন। 'তাছাড়া আরো-একটা ব্যাপারে আমার কেমন অস্বস্তি লাগছিলো। *ডানকানকে* যাতে টুফোল্ড উপসাগরে নিয়ে-আসা হয়, সেজন্যে সে কী-রকম ঘ্যানঘ্যান করতো, মনে আছে ? প্রায় যেন জেদ ধ'রেই বসেছিলো—যে-ক'রেই-হোক, *ডানকানকে* উপসাগরের মুখে নিয়ে আসতে হবে। তাছাড়া, এটা কেউ খেয়াল করেছে কি না জানি না—বলদ আর ঘোড়াগুলোর দেখাশুনো করবার ভার ছিলো ওরই ওপর। অথচ সেগুলো সব পর-পর রহস্যময়ভাবে অজানা কোনো রোগে মারা গেছে!'

'এত-সব জেনেও আমাদের কাউকে কিছু না-বলা ঠিক হয়েছে ?' লেডি হেলেনা জিগেস করেছেন।

'শুধু সন্দেহের ওপর ভর ক'রে তো কারু দিকে আঙুল তুলে বলা যায় না—তুমি লোকটা খলনায়ক, তোমাকে সবকিছুর কৈফিয়ৎ দিতে হবে। আমাকে ব'সে থাকতে হয়েছে অকাট্য প্রমাণের জন্যে—আর সব সন্দেহ বুকের মধ্যে চেপে রেখেছি ব'লে ক্রমশই আমার অস্বস্তি বেড়েছে। তারপর শেষটায় কালরাতে যখন উটের পিঠে শেষখড় পড়লো, তখন আর আমার সন্দেহ আর নিছক-সন্দেহ থাকেনি—প্রায় হাতে-নাতেই প্রমাণটা পেয়ে গিয়েছিলুম।'

'কেন ?' বেশ-কৌতূহলী হ'য়েই প্রশ্ন করেছেন লেডি হেলেনা।

'কাল রাতে বৃষ্টি শুরু হবার আগে, হঠাৎ কেন যেন আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি-যে তখন উঠে তাঁবুর বাইরে গিয়েছিলুম, সেটা কেউ জানে না। ফসফর-ফার্নের নীলচে আলোয় দেখি কাদার ওপর আমাদেরই ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখে-দেখে চুপিসাড়ে আসছে তিনটে ছায়ামূর্তি—গুঁড়ি মেরে কাছে গিয়ে দেখি সেই-তিনজন ছায়ামূর্তির মধ্যে একজন সেই মিস্ত্রি—সেই-যে লোকটা ভাঙাগাড়ি মেরামত করতে এসেছিলো—ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখি লোকটার হাতে কালো-কালো গোল দাগ—সম্ভবত হাতকড়ারই দাগ। অন্তত আমার তা-ই মনে হয়, এখানে কয়েদিদের হাতে আঁটো ক'রে হাতকড়া পরানো হয়।'

রুদ্ধশ্বাসে লেডি হেলেনা বলেছেন : 'তারপর?'

'শুনি যে, সেই লোকটাই বলছে—"একটা বাদে সবগুলো ঘোড়াই ঢেঁশে গিয়েছে।" উত্তরে অন্য-কে-একজন বলেছে—"মরবে না মানে ? এত বিষ হাতিয়ে নিয়ে এসেছিলাম যে একটা গোটা ক্যাভালরির ঘোড়াগুলোকেই খতম ক'রে দেয়া যেতো।" তৃতীয় লোকটা তখন বলেছে—"বেন জয়েসের এই প্ল্যানটা সফল হ'লে বলতে হবে যে ওর মতো বাহাদুর কোয়ার্টারমাস্টার আর-কোথাও জন্মায়নি—খোদ ওয়ালটার র‍্যালেকেও বুদ্ধির খেলায় ও হারিয়ে দিতে পারতো।" এ-সব কথা শোনবার পর আমার আর কিছু জানতে বাকি থাকেনি। সব কী-রকম জলের মতো সরল হ'য়ে এসেছিলো।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয়ারটন কী ব'লে নিজের পরিচয় দিয়েছিলো, মনে আছে? সে বলেছিলো, সে নাকি *ব্রিটানিয়ার* কোয়ার্টারমাস্টার ছিলো। এরপর আর দুয়ে আর দুয়ে যোগ করতে কত বিদ্যে লাগে? বেন জয়েস তাহ'লে *তারই নাম*? দস্যুরা তারপর বনের মধ্যে মিলিয়ে যেতেই সে ফের ফিরে এসেছিলো তাঁবুতে।'

সবকিছু শুনে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে থেকেছেন সবাই, বাক্যহারা।

তারপর প্রায় বারুদে আগুন লাগার মতো ক'রে ফেটে পড়েছেন লর্ড এডওয়ার্ড। 'নচ্ছার, পাজি, বেইমান! আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে ভুলিয়েভালিয়ে এই জনমনুষ্যহীন অঞ্চলটায় নিয়ে এসেছিলো সব্বাইকে খুন ক'রে সবকিছু লুঠ ক'রে নিয়ে যেতে—'

'নিশ্চয়ই তা-ই ওর মৎলব ছিলো।'

'তার মানে আগের বার সেই নদী পেরুবার সময় থেকেই—যখন ও গিয়ে মিস্ত্রি ডেকে এনেছিলো—ওর স্যাঙাৎগুলো আমাদের পাছু নিয়েছিলো।'

'নিশ্চয়ই,' মেজর বলেছেন, 'এখন আর এতে কোনো সন্দেহই তো নেই।'

'বিলজিবাবের বাচ্চা! তাহ'লে ও কোনোকালেই *ব্রিটানিয়ায়* কোনো কাজ করেনি। শুধু আমাদের ভাটকি দিয়েছে অ্যাদ্দিন!'

'না, এ-ব্যাপারটায় বোধহয় ধাপ্পা দেয়নি। আমার মনে হয়, *ব্রিটানিয়ায়* ও নিশ্চয়ই কখনো-না-কখনো কাজ করেছিলো। না-হ'লে কাপ্তেন গ্রাণ্টের কথা ও জানলো কী ক'রে। আমার তো মনে হয়, আয়ারটনই ওর আসল নাম—বেন জয়েস ওর ছদ্মনাম —হয়তো আরো-অনেক নাম আছে লোকটার—'

'তাহ'লে *ব্রিটানিয়ার* কোয়ার্টারমাস্টার সেজে সে অস্ট্রেলিয়ায় আসে কী ক'রে?'

'সেই ধাঁধাটার উত্তর গোয়েন্দারাও খুঁজে পায়নি। হয়তো পরে কোনোদিন সব ফাঁস হ'য়ে যাবে। জানা যাবে, ও কীভাবে এখানে এসেছিলো।'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স বললেন, 'গোয়েন্দারা আর কতটুকুই-বা জানে? তারা কি এটা জানে যে আয়ারটন আর বেন জয়েস আসলে একই লোক?'

'তার মানে—ও যে খামারে কাজ নিয়েছিলো, সেটা কোনো বদ মৎলব নিয়েই?' জিগেস করেছেন লেডি হেলেনা।

'সেখানেও নিশ্চয়ই কিছু-একটা বিষম গোল বাঁধাবার তালে ছিলো—হঠাৎ আমরা গিয়ে পড়ায় তার চেয়েও বড়ো-একটা প্রলোভন পেয়ে গেছে!'

'মিস গ্রাণ্ট,' কেমন উৎকণ্ঠিত স্বরেই জিগেস করেছেন কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স, 'মিস গ্রাণ্ট, আপনাকে অমন অসুস্থ দেখাচ্ছে কেন? কী হয়েছে?'

কাপ্তেনের কথায় অমনি সকলের চোখ গিয়ে পড়েছে মেরির ওপর। তার মুখ শুকিয়ে আমশি হ'য়ে গিয়েছে। এক্ষুনি যেন চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসবে—মনে হয়েছে সকলের।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেরি ধরাগলায় শুধু বললে, 'তাহ'লে বাবা—'

মেরির এই কথাটায় আবার সবাই যেন একঝটকায় বাস্তবের মধ্যে ফিরে এলো। আয়ারটন যদি বেন জয়েস হয়, তাহ'লে কাপ্তেন গ্রান্টকে খুঁজে পাবার যে-আশাটা ছিলো, সেটা এখন গেলো। *ব্রিটানিয়া* মোটেই টুফোল্ড উপসাগরের মুখে ঝড়ের পাল্লায় পড়েনি, সে যে কোথায় ডুবেছে কে জানে, অর্থাৎকাপ্তেন গ্রান্ট মোটেই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পা দেননি।

*অর্থাৎ* আবারও একবার চিরকুটগুলো প'ড়ে ভুল-একটা মানে বার করেছেন জাক পাঞয়ল—তাঁর এত পাণ্ডিত্য কোনো কাজেই তাহ'লে এলো না! এবার মুখ শুকিয়ে গেলো স্বয়ং জাক পাঞয়লের।

মেরির জন্যে সকলেরই কেমন মায়া হচ্ছিলো, কিন্তু সবজান্তা পাঞয়লের মুখচোখ দেখেও মায়াই হয়েছে সকলের। বেচারি তো চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেননি, মাথাখাটিয়ে কোনো-একটা অর্থ তো বার করেছেন—যতটা তাঁর বুদ্ধিতে কুলিয়েছে।

লর্ড এডওয়ার্ড গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছেন তারপর। সম্ভবত বুঝতে পারেননি মেরিকে এখন কী ব'লে সান্ত্বনা দেবেন। বাইরে এসে দ্যাখেন, মাল্লাদের দুজন রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে।

এদিকে মেঘ কেটে গিয়ে আলো ক'রে এসেছে তখন—কত নাম-না-জানা পাখির কলরব উঠেছে গাছের ডালে। ঐ-যে, একটা ক্যাঙারু লাফাতে-লাফাতে গিয়ে বনের মধ্যে ঢুকলো, ছানা-রু তার বুকপকেট থেকে মুখ বার ক'রে চারদিক সাগ্রহে দেখে নিচ্ছিলো। ক্যাঙারুর নিশ্চিন্ত ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেলো, আশপাশে নিশ্চয়ই কোনো মানুষ নেই—বেন জয়েস নিশ্চয়ই তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে দূরে-কোথাও কেটে পড়েছে। সম্ভবত মাত্র এই কজন অনুচর নিয়ে সে এখন কোনো মুখোমুখি সংঘর্ষে আসতে চায় না। সম্ভবত গেছে দলের বাকি লোকগুলোকে নিয়ে আসতে—তারপর এসে রাতের আঁধারে শিবিরটার ওপর চড়াও হবে।

রাগে লর্ড এডওয়ার্ডের সর্বাঙ্গ জ্ব'লে যাচ্ছিলো। *পতঙ্গদেব বিলজিবাবের* এমনতর কোনো সুসন্তানের সঙ্গে এর আগে এমনভাবে তাঁর কখনও দেখা হয়নি।

আশপাশে একটু টহল দিয়ে তারপর তিনি ফিরে এসেছেন অন্যদের কাছে।

অন্যরা সেখানে ব'সে-ব'সেই তখনও উত্তেজিতভাবে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। লর্ড এডওয়ার্ডকে দেখেই কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স ব'লে উঠেছেন: 'আমাদের কিন্তু এখন হাত-পা গুটিয়ে অসহায়ভাবে ব'সে থাকলে চলবে না। এখানে এই মাউন্ট কশচিউস্কোর আশপাশে হা ক'রে ব'সে থেকে আমাদের কী হবে?'

'তুমি তাহ'লে কী করতে বলো আমাদের?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখানে বরং রাত্তিরে কখনও বেন জয়েসের হামলার মুখে পড়তে হবে আমাদের। তার চেয়ে বেন জয়েস যা করতে যাচ্ছিলো, ঠিক তা-ই করা দরকার আমাদের।'

'*অর্থাৎ ?*'

'ঘোড়া তো একটাই আছে এখনও। সেটায় ক'রে কেউ-একজন এক্ষুনি মেলবোর্নের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ুক—তারপর যত তাড়াতাড়ি পারে—সাত থেকে দশদিনের মধ্যে—*ডানকানকে* ডেকে নিয়ে আসুক টুফোল্ডের মুখে !'

ম্যাঙ্গলস ঠিকই বলেছেন। এক্ষুনি একটা-কিছু ব্যবস্থা করা দরকার।

জ্যান্ত ঘোড়া যেহেতু মাত্র একটাই, অতএব মাত্র একজন ছাড়া আর-কারু যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। যাবার কথায় কিন্তু সকলেই লাফিয়ে উঠেছেন—এমনকী রবার্টের উৎসাহটাই মনে হচ্ছিলো সবচেয়ে-বেশি। প্রত্যেকেই পারলে যেন তক্ষুনি ঘোড়া ছুটিয়ে টগবগ-টগবগ ক'রে মেলবোর্ন চ'লে যাবে। এই নিয়ে এমন তর্কাতর্কি বেঁধে গেলো যে লেডি হেলেনার প্রস্তাব হ'লো লটারি ক'রেই না-হয় ঠিক করা হবে কে যাবে। শেষপর্যন্ত সেই প্রস্তাবটাই মেনে নিয়েছে সবাই। আর লটারিতে শেষটায় নাম উঠে গেলো মাল্লাদের মধ্যে একজনের। ঠিক হ'লো, খাওয়াদাওয়ার পর রাত আটটাতেই সে বেরিয়ে পড়বে।

যাত্রার যখন প্রস্তুতি চলেছে, তখন মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স সবাইকে ডেকে আরেকটা বিষয়ে হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছেন।

'মনে আছে, ঘোড়াগুলোয় কী-রকম বিশেষ জাতের নাল পরানো হয়েছিলো?'

হঠাৎ এ-কথা শুনে একটু বুঝি হতভম্বই হ'য়ে গেছে সবাই।

মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স নিজেই তারপর হেঁয়ালিটার সমাধান ক'রে দিয়েছেন। 'ঐ বিশেষ নাল পরানো হয়েছিলো এই জন্যে যাতে ঘোড়ার খুরের ছাপ দেখে-দেখে বেন জয়েসের লোকেরা জেনে নিতে পারে আমরা কোথায় কোন্‌পথ দিয়ে যাচ্ছি। এখনও নিশ্চয়ই এরা আমাদের ওপর কড়া নজর রেখে যাচ্ছে। আয়ারটন তো জানেই যে আমাদের এখনও একটা সতেজ ঘোড়া র'য়ে গেছে—সেটাতে ক'রেই তার মেলবোর্নে যাবার কথা হচ্ছিলো। তারা নির্ঘাৎ টের পেয়ে যাবে যে আমরা নিশ্চয়ই কাউকে মেলবোর্ন পাঠাবো —আর তার পেছন নিতে তাদের কোনোই অসুবিধে হবে না—ঐ ঘোড়ার নালের ছাপ দেখে-দেখেই তারা ব্যাপারটা জেনে যাবে। কাজেই আমাদের পক্ষে উচিত হবে ঐ বিশেষ মার্কামারা নালটা খুলে ফেলে নতুন-কোনো নাল পরিয়ে-দেয়া। তা না-হ'লে কারু পক্ষেই আর মেলবোর্ন যাবার মানে হয় না—পথেই তারা তার ওপর হামলা চালাবে।'

মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌সের কথা শুনে আশঙ্কাটা যে একেবারেই অমূলক নয়, এটা বুঝতে কারুই আর দেরি হয়নি। তক্ষুনি ঘোড়ার খুর থেকে বিশেষ মার্কার নালগুলো খুলে ফেলে নতুন নাল লাগিয়ে দেয়া হ'লো, যাতে দস্যুদল কিছুতেই ঘোড়সোয়ার যে কে, কাদের জন্যে সাহায্য আনতে যাচ্ছে, সেটা বুঝতে না-পারে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তখনও সবচেয়ে-জরুরি কাজটাই বাকি ছিলো। টম অস্টিনকে একটা চিঠি লিখতে হবে। এতক্ষণ উত্তেজনায় লর্ড এডওয়ার্ড তাঁর কাঁধ আর হাতের ব্যাথাটাকে তেমন আমল দেননি—এখন লিখতে ব'সে আবিষ্কার করেছেন হাতটা একটু নাড়লেই অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। দু-একবার যখনই চেষ্টা করতে গেছেন, তখনই তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে বিষম যন্ত্রণার ছাপ। শেষটায় পাঞ্চয়লই বসেছেন তাঁর হ'য়ে চিঠিটা লিখে দিতে —লর্ড এডওয়ার্ড মুখে-মুখে ব'লে যাবেন চিঠির বক্তব্য, আর পাঞ্চয়ল তা-ই শুনে গুছিয়ে লিখে দেবেন। কিন্তু পাঞ্চয়লের মন তখন যে কোথায় প'ড়ে ছিলো, কে জানে। তখনও তিনি ভেবে চলেছেন বোতলে-পাওয়া চিরকুটগুলোর মানে কী হ'তে পারে—আবারও তাহ'লে তিনি চিরকুটগুলোর সত্যিকার-মানে বুঝতে পারেননি। অন্যমনস্কভাবে লিখতে ব'সে প্রথমে খানিকক্ষণ কাগজ-কলমের সামনে তিনি হাঁ ক'রে ব'সে থেকেছেন, লর্ড এডওয়ার্ড তাঁকে যা লিখতে বলছিলেন, তার কিছুই যেন তাঁর কানে ঢুকছিলো না।

লর্ড গ্লেনারভনও আবারও বলেছেন, কিঞ্চিৎ বিরক্ত হ'য়েই : 'কী হ'লো? লিখুন—'

'অ্যাঁ?' ব'লে মঁসিয় পাঞ্চয়ল ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়েছেন তাঁর মুখের পানে।

'লিখুন যে : টম অস্টিনকে জানানো হচ্ছে, এই এত্তেলাপাবামাত্রই যেন *ডানকানকে* নিয়ে—'

এ-তো মহামুশকিল হ'লো। মঁসিয় পাঞ্চয়ল এখন ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে আছেন সামনে প'ড়ে-থাকা *অস্ট্রেলিয়ান অ্যাণ্ড নিউ-জিলাণ্ড গেজেট*-এর সংখ্যাটার দিকে। ভাঁজ-করা কাগজটার নামটার শুধু একটা টুকরোই পড়া যাচ্ছে।

'কী হ'লো, মঁসিয় পাঞ্চয়ল? লিখুন—'

'ও-হ্যাঁ, লিখছি। কিন্তু... অ্যালাণ্ড...অ্যালাণ্ড...অ্যালাণ্ড? অ্যালাণ্ড মানে?' তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে আবার কেমন হতভম্বভাবে তিনি ব'সে পড়েছেন। 'হাঁ, বলুন কী লিখতে হবে—'

'টম অস্টিনকে জানানো হচ্ছে, এই এত্তেলাটা পাবামাত্র যেন *ডানকানকে* নিয়ে এক্ষুনি যেন অস্ট্রেলিয়ার পুব উপকূলে চ'লে আসে।'

'অস্ট্রেলিয়া?' আবার কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছেন মঁসিয় পাঞ্চয়ল। 'ও-হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়া!'

কলের পুতুলের মতো চিঠিটা কোনোমতে লিখে শেষ করেছেন মঁসিয় পাঞ্চয়ল, তারপর লর্ড এডওয়ার্ডকে দিয়েছেন চিঠিটায় সই করবার জন্যে। অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও, দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধ'রে, কোনোরকমে নিজের নামটা সই করেছেন লর্ড এডওয়ার্ড। তারপর চিঠিটা ভাঁজ ক'রে যথারীতি সীলমোহর ক'রে দেয়া হয়েছে। আর কম্পিতহাতে লেফাফায় ঠিকানাটা লিখেছেন মঁসিয় পাঞ্চয়ল :



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিস্টার টম অস্টিন, বরাবরেষু
ফার্স্টমেট, *ডানকান*
মেলবোর্ন

তারপরেই ধড়মড় ক'রে উঠে প'ড়ে বেরিয়ে গেছেন বাইরে, তখনও বিড়বিড় ক'রে তিনি ব'কে যাচ্ছেন অদ্ভুত-একটা শব্দ : 'অ্যাল্যাণ্ড...অ্যালাণ্ড...আল্যাণ্ড !'

মঁসিয় পাঞ্জয়লের খ্যাপামির ধরনধারণ অ্যাদ্দিনে সকলেরই বেশভালোভাবে জানা হ'য়ে গেছে। ফলে তাঁর দিকে আর আলাদা নজর না-দিয়েই সবাই ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন, কখন অন্ধকার হয়, কখন দূত রওনা হবে মেলবোর্নের উদ্দেশে। *সাবধানের মার নেই* ভেবে শুধু-যে ঘোড়ার পায়ের নালগুলোই বদলে দেয়া হয়েছে তা নয়, ক্ষুরগুলো বেঁধে দেয়া হয়েছে কাপড় দিয়ে যাতে ছোটবার সময় খটাখট আওয়াজ না-হয়।

কিন্তু এত-সব সাবধানতা সত্ত্বেও কি আর আশঙ্কাটা কমে ? রাতের আঁধারে কোনখানে যে বেন জয়েস (*না কি সে আয়ারটন ?*) তার সাগরেদদের নিয়ে ওৎ পেতে আছে, তা কে জানে। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে ঘোড়াটা যেতে পারলে হয়। আবার বইতে শুরু করেছে ঝোড়োহাওয়া, আর বানভাসি নদীটার জলে প্রখর ঢেউয়ের আওয়াজও উঠছে তার সঙ্গে তাল রেখে। আর তারই সঙ্গে ছন্দমিলিয়ে যেন বুকে ঢিপঢিপ শব্দ বেড়ে যাচ্ছে! আটটার পরেই অন্ধকার লক্ষ ক'রে ঘোড়াটা যখন ছুটে চ'লে গেলো, তখন রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠার সঙ্গে সবাই প্রার্থনা করছেন, যাত্রাটা যাতে নির্বিঘ্ন হয়। আর ঠিক এমন সময়েই বুকের ঢিপঢিপ শব্দ আরো বেড়ে গেছে, যখন হাওয়ার শোঁ-শোঁ আর জলের ছলছল ছাপিয়ে ভেসে এসেছে তীক্ষ্ণ একটা শিসের শব্দ। শিসের শব্দই তো ? না কি পাখির ডাক ?

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স বলেছেন, সন্দেহ নেই, কেউ কাউকে এই তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে যেন সংকেত দিচ্ছে। তাঁর অনুমানটা ভুল নয়, যেন সেটা বোঝাতেই দ্বিতীয় আরেকবার সব শব্দ ছাপিয়ে আবার রাতের অন্ধকার চিরে গেছে সেই শিসের আওয়াজ। আর তারপরেই দূর থেকে ভেসে এসেছে গুলির আওয়াজ—ঠিক যেদিকটায় ঘোড়াটা গেছে, সেদিক থেকে।

তার মানে—নিশ্চয়ই তার কোনো বিপদ হয়েছে !

লর্ড এডওয়ার্ড কী-রকম ক্ষিপ্ত জ্বরাতুর ভঙ্গিতে সেই গুলির শব্দের দিকেই ছুটে যেতে চাচ্ছিলেন, কোনোরকমে তাঁকে আটকে রেখেছেন মেজর ম্যাক্‌ন্যাবস।

'এটা তো একটা ফাঁদও হ'তে পারে ! ওরা হয়তো মৎলব এঁটেছে যে গুলির আওয়াজ পেয়ে সবাই সেদিকটাতেই ছুটে যাবেন—আর এই ফাঁকে ওরা ছুটে এসে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরক্ষিত গাড়িটায় মেয়েদের ওপর হামলা চালাবে—'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসও সায় দিয়েছেন। 'এই পাজির পাঝাড়াগুলো হয়তো এ-রকমই একটা ফন্দি করেছে। দিনের আলো ফোটবার আগে কিছুই বোঝা যাবে না। আমাদের বরং এখানে আরো-হুঁশিয়ার হ'য়েই থাকা উচিত—'

লর্ড এডয়ার্ডের গায়ে যেন মত্ত হাতির বল। তিনি এ-সব কথা শুনলে তো? কোনোরকমে ধস্তাধস্তি ক'রে তাঁকে আটকে রেখেছেন মেজর ম্যাক্‌ন্যাবস, আর এমন সময়ে কানে ভেসে এলো কার যেন কাতর আর্তনাদ—কে যেন অন্ধকারের মধ্যে গোঙাচ্ছে :

'বাঁচাও ! বাঁচাও!'

এই গোঙানিটা শোনবার পর মনস্থির করতে আর একফোঁটাও দেরি হয়নি কারু। সেই আর্তনাদের শব্দ শুনেই সেদিকপানে ছুটে গিয়েছেন মেজর, আর তাঁর পেছন-পেছন কাপ্তেন।

ঐ তো ঝোপের মধ্য থেকে কে যেন কাৎরাতে-কাৎরাতে প্রায় গড়াগড়ি দিতে-দিতেই বুকে হেঁটে আসছে।

হ্যাঁ, তাঁদের সেই দূত। রক্তে তার সারা শরীরটা ভেসে যাচ্ছে। পিঠে আমূল বিঁধে আছে একটা ছোরা।

অমনি তাকে তাঁরা ধরাধরি ক'রে নিয়ে এসেছেন গাড়ির ভেতর। গলগল ক'রে রক্ত বেরুচ্ছে ক্ষত থেকে, ছুরিটা বাঁটশুদ্ধু বসানো; সে-যে বাঁচবে—এমন মনে হয়নি। কী-রকম নিস্তেজ হ'য়ে প'ড়ে থেকেছে বেচারি, আর কী-রকম যেন অস্ফুটস্বরে জড়ানো গলায় আর্তনাদ ক'রে বলছে : 'চিঠি...চিঠি...বেন জয়েস !' তারপরেই যে জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে থেকেছে। লেডি হেলেনা আর মেরি তবু তার শুশ্রূষা ক'রে গেছেন—ক্ষতটায় কোহল দিয়ে পরিষ্কার ক'রে তাতে বেঁধে দেয়া হয়েছে ব্যানডেজ। আর তারই মধ্যে তার পকেট হাৎড়ে দেখেছেন কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস। না, টম অস্টিনকে লেখা চিঠিটা তার কাছে নেই।

ভোরের আলো ফুটলে একবার সরেজমিন তদন্তে বেরিয়েছেন মেজর ম্যাক্‌ন্যাবস। তাঁর মুখে গভীর কালোছায়া, কপালে চিন্তার ভাঁজ। আর ঝোপের পাশে তিনি আবিষ্কার করেছেন দস্যুদের দুজনের মৃতদেহ—কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসের মাল্লা যে ছোরার ঘা খাবার আগে যুঝেছিলো প্রাণপণে, এ তারই প্রমাণ। দস্যুদের দুজনের মধ্যে একজন চেনা—সেই মিস্ত্রি, আয়ারটন যাকে গিয়ে নিয়ে এসেছিলো সে-বার।

আরো-খানিকক্ষণ পরে মাল্লাটির জ্ঞান ফিরে এলো, কিন্তু অবিশ্রাম রক্তক্ষরণে এখনও কী-রকম যেন নেতিয়ে আছে সে। ভাঙা-ভাঙা দু-চার কথায় সে যা বললে, তার সারমর্ম দাঁড়ালো এইরকম : সে যখন অন্ধকারে ঘোড়া ছুটিয়ে খানিকটা দূর গেছে,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখনই হঠাৎ তার দু-পাশে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে দস্যুরা। সে এলোপাথারি গুলি ক'রে শুধু দুজনকেই ঘায়েল করতে পেরেছিলো, কিন্তু কে যেন পেছন থেকে তার পিঠে সজোরে ছুরি বসিয়ে দেয়। অমন ভয়ংকর আঘাত খেয়ে আর সে তাদের কোনো বাধা দিতে পারেনি। দস্যুরা নিশ্চয়ই ভেবেছিলো যে সে বুঝি খতম হ'য়ে গেছে। তার পকেট হাৎড়ে তারা শুধু চিঠিটা বার ক'রে নেয়।

'দেখি, দেখি, চিঠিটা,' বলেছিলো বেন জয়েস—অথবা সে কি আয়ারটন? 'এবার আমাদের আর পায় কে? আমরাই ঐ *ডানকান* জাহাজের মালিক হ'য়ে বসবো। আমি এই ঘোড়ায় চেপেই *ডানকানে* চ'লে যাচ্ছি—তোমরা বরং চ'লে যাও টুফোল্ড উপসাগরের মুখে, কেম্পল পায়ার ব্রিজের কাছে। *ডানকান* একবার আমাদের দখলে এলেই জগৎ জানতে পাবে জলদস্যু কাকে বলে—ওয়ালটার র‍্যলে আর ফ্রান্সিস ড্রেকও আমাদের কাছে হার মেনে যাবে!'

ব'লেই, সে আর একটুও দেরি করেনি, ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিলো অন্ধকারে।

এই আশঙ্কাটাই করেছিলেন সবাই। ফলে, পুরো ব্যাপারটা যে অপ্রত্যাশিত, সেটা বলা যায় না। কিন্তু তবু বাস্তব তার আঘাতে কেমন যেন ঘায়েলই ক'রে ফেলেছিলো লর্ড এডওয়ার্ডকে, ব'লে উঠেছিলেন : '*ডানকান* কি না শেষকালে জলদস্যুদের দখলে চ'লে যাবে!—'

হঠাৎ সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠেছিলেন মঁসিয় পাঞ্জয়ল। 'ককখনো নয়। বেন জয়েসের দলবল টুফোল্ডের মুখে পৌঁছুবার আগেই আমরা সেখানে পৌঁছে যাবে।'

'কেমন ক'রে?'

'কেন? রাস্তাটার কথাটা তো বেন জয়েসই ফাঁস ক'রে দিয়ে গেছে। ঐ কেম্পল পায়ার ব্রিজ দিয়ে। ব্রিজটা তো এখান থেকে কয়েক মাইল মাত্র দূরে—এক্ষুনি গিয়ে দেখে আসছি নদীতে বান ডাকলেও ব্রিজটা এখনও অটুট আছে কি না।'

এবং যেমন কথা, তেমনি কাজ। কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসকে নিয়ে তক্ষুনি অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েছেন মঁসিয় পাঞ্জয়ল।

ফিরে যখন এসেছেন, তখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে।

এবং ফিরে এসেছেন হতাশ ও বিধ্বস্ত। বানের জল ফেনিয়ে চর্কি দিয়ে ছুটেছে—কিন্তু ব্রিজটার কোনো চিহ্নই নেই কোথাও। দস্যুরা নিজেরা নদী পেরিয়ে যাবার পর সেতুটায় আগুন ধরিয়ে গেছে—আর ধ্বংসের কাজটা সাঙ্গ করেছে দুরন্ত ক্ষিপ্ত বানের জল!

এবার তাহ'লে বুঝি বোম্বেটেদের হাত থেকে *ডানকানকে* আর বাঁচানো গেলো না!

কাপ্তেন গ্রান্টের হদিশ করার চাইতেও এখন সবচেয়ে-জরুরি যে-ক'রেই হোক,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখান থেকে সবচেয়ে-কাছের কোনো লোকালয়ে গিয়ে *ডানকানের* সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা। নিজেদের অসহায় অবস্থায় সবচেয়ে-বেশি ভেঙে পড়েছেন লর্ড গ্লেনারভনই। তাঁর এত-সাধের *ডানকান* কি না শেষটায় জলদস্যুদের কবলে গিয়ে পড়বে!

মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স আর কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস যতই তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করুন না কেন, তাঁরাও এই বিষম সঙিন অবস্থায় প্রচণ্ড হতাশ হ'য়ে পড়েছিলেন। অসহায় আক্রোশে নিজেদের হাত কামড়ানো ছাড়া আর-কিছুই যেন তাঁদের করার নেই!

শেষচেষ্টা অবশ্য একটা ক'রে দেখতেই হয়। পরদিন ভোরবেলাতেই কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস তাঁর লোকজন নিয়ে একটা ভেলা তৈরি করার কাজে লেগে গেলেন। কাঠের গুঁড়ি আর গাছের বাকল আর দড়ি দিয়ে বেঁধে কোনোরকমে যদি একটা ভেলা তৈরি ক'রে ফেলা যায়, তবে এই বানের জলে ভেসে গিয়ে তাঁরা কোনো লোকালয়ে পৌঁছে যাবেন।

তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে প্রথম ভেলাটা বোধকরি পলকাই হয়েছিলো খুব—মোটেই পোক্ত ছিলো না। জলে নামাতে-না-নামাতেই সেটা ঐ তীব্র স্রোতের আবর্তে প'ড়ে ভেঙে গেলো।

শেষকালে আরো-মজবুত ক'রে আরো-একটা ভেলা বানানো হ'লো—আর একুশে জানুয়ারি স্রোতের তোড় যখন খানিকটা কমেছে, লর্ড এডওয়ার্ড তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে তাতেই উঠে বসলেন। গাড়িটা প'ড়ে রইলো ঐ বনের পাশে, কাদার মধ্যে। সঙ্গে নেয়া হ'লো সামান্য যা খাবারদাবার ছিলো, আর অস্ত্রশস্ত্র।

কিন্তু স্রোতের মুখে যেন খড়কুটোর মতোই ভেসে গেলো তাঁদের ভেলা। যতই মজবুত ক'রে বানাবার চেষ্টা করুন না কেন, মাঝনদীতে সেটা বুঝি এবারও ভেঙে যায়। গাছের গুঁড়িগুলো যেন দড়ির বাঁধন খুলে আলাদা হ'য়ে যাবে। কোনোরকমে যখন ওপারে পৌঁছুনো গেলো, তখন তাঁরা ধুঁকতে-ধুঁকতে কোনোমতে শুধু নিজেদেরই বাঁচাতে পেরেছেন। খাবারদাবার খুব-একটা বাঁচানো গেলো না, অস্ত্রশস্ত্রও না—শুধু মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌সের রাইফেলটা তিনি কিছুতেই হাতছাড়া করেননি—সেটা যেন ছিলো তাঁর নিজের শরীরটারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোনো দুর্ঘটনা ঘটবার আগেই তাঁরা যে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তীরে নেমে পড়তে পেরেছেন, সেটাই যেন অনেকখানি।

তারপর কেমন ক'রে যে তাঁরা শ্রান্তক্লান্ত অবসন্ন বিধ্বস্ত দেহে টুফোল্ড উপসাগরের মুখ থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে *ডেলিগেট* নামে একটা ছোট্ট অজপাড়াগাঁয় এসে পৌঁছেছেন, সে-কথা তাঁরা যেন নিজেই জানেন না।

সেখানে সরাইতে যখন সবাই খেয়েদেয়ে কোনোরকমে বিধ্বস্ত দেহে একটু প্রাণের সাড় ফিরে পেয়েছে, লর্ড এডওয়ার্ড সরাইখানার মালিককে জিগেস করেছেন কোনো



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া যাবে কি না।

'এমনিতে কোনো গাড়ি পাবেন না। তবে ডাকের গাড়ি ছাড়বে আজ—সেটায় যেতে পারেন,' সরাইওলা বলেছে।

সেটাতেই যাবার ব্যবস্থা হ'লো। কিন্তু দু-দিন দু-রাত যখন একটানা চ'লে ডাকের গাড়ি সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তরে সমুদ্রের কাছে পৌঁছুলো, তখন—

কোথায় *ডানকান*?

শুধু ক্ষিপ্ত সমুদ্র গর্জাচ্ছে সেখানে, দিগন্ত অব্দি সব ফাঁকা। কোথাও কোনো জেলেডিঙিরও দেখা নেই, কোনো জাহাজ তো দূরের কথা।

তবে কি টম অস্টিন সোজা টুফোল্ডের মুখে ইডেনেই চ'লে গিয়েছে?

ডাকের গাড়ি তক্ষুনি ছুটেছে ইডেনে। কিন্তু সেখানেও *ডানকানের* চিহ্নমাত্রও নেই।

একটা সরাইতে উঠেই লর্ড গ্লেনারভন প্রথমেই গেছেন ডাক-তারের আপিশে। মেলবোর্নে টেলিগ্রাম করা হ'লো—*ডানকান* কোথায় গেছে, এক্ষুনি তার ক'রে জানাতে বলেছেন তিনি বন্দর কর্তৃপক্ষকে।

তারপর সময় যেন আর কাটতেই চায়নি। শুধু অস্থির হ'য়ে খ্যাপা বাঘের মতো ছটফট করেছেন লর্ড এডওয়ার্ড।

টেলিগ্রামের উত্তর এলো দুপুর গড়িয়ে যাবার পর, বেলা দুটোয়।

লর্ড এডওয়ার্ড গ্লেনারভন
ইডেন
টুফোল্ড উপসাগর

১৮ জানুয়ারি *ডানকান* মেলবোর্ন থেকে রওনা হয়েছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না। একটু অপ্রত্যাশিতভাবেই হঠাৎ নোঙর তুলে বারদরিয়ায় চ'লে গিয়েছে।

উটের পিঠ যদি আরো-মজবুত হ'তো, তবু বোধহয় এই শেষখড়টাকে আর বইতে পারতো না—ঘাড়মুখ গুঁজে ছেৎড়ে প'ড়ে যেতো। এবার সত্যি-সত্যি *আক্ষরিকভাবেই* মাথায় হাত দিয়ে বসলেন লর্ড গ্লেনারভন। আশঙ্কাটা তাহ'লে সত্যি হ'লো শেষপর্যন্ত। *ডানকান* তবে বেন জয়েসের হাতে প'ড়ে শেষটায় বোম্বেটে জাহাজ হ'য়ে গিয়েছে!

তাহ'লে এখন কাপ্তেন গ্রান্টের খোঁজে তাঁরা যাবেন কী ক'রে? মেরি আর রবার্টকে তবে এখন কী বলবেন লর্ড গ্লেনারভন?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয়

# রাক্ষসমুলুকের শাদা শয়তান

## এক

## সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তর

এ-কদিন যেন একটা ঘোরের মতো কেটেছে। দুঃস্বপ্নের ঘোর।

সে-ই যখন আয়ারটনের খোলশটা খুলে বেরিয়ে এসেছে কুখ্যাত দস্যু বেন জয়েস, যার নামে হুলিয়া বেরিয়েছে, সেই যার সম্বন্ধে এতগুলো কথা ব'লে গেলেন মেজর ম্যাকন্যাব্‌স, তারপর থেকে মেরি যেন আচ্ছন্নের মতোই হ'য়ে গিয়েছিলো। সেবাশুশ্রূষায় সে সাহায্য করেছে লেডি হেলেনাকে, প্রথমে লর্ড গ্লেনারভনের শুশ্রূষা, আর তারপর ঐ মাল্লাটি যখন ফিরে এলো, প্রায় হতচৈতন্য, ক্ষত থেকে অনর্গল রক্ত বেরুচ্ছে, পিঠে ছুরি-বেঁধা, তখন তাকেও শুশ্রূষা করেছে মেরি, লোকটা মনে হচ্ছে এ-যাত্রায় যেন বেঁচেই গেলো, এমনই তার কচ্ছপের প্রাণ, কিন্তু সারাক্ষণ মেরির মনে হচ্ছিলো সে যেন একটা কলের পুতুল, চারপাশে কোথায় কী হচ্ছে, সে যেন সব চোখে দেখে যাচ্ছে, অথচ কিছুই খেয়াল করছে না, কিছুই যেন তার আচ্ছন্ন মনটায় কোনো দাগ কেটে যেতে পারছে না। কেউ যদি তাকে জিগেস করে, এর পর কী-কী ঘটেছে, কোথায়-কোথায় গেছেন অভিযাত্রিদল, কী-কী করেছেন, তবে সে সম্ভবত কিছুই তার গুছিয়ে বলতে পারবে না, অথচ সে সবসময়েই দলের সঙ্গে ছিলো, সবাই যা-যা করেছে সেও সে-সমস্তই করেছে, কিন্তু স্বপ্নে যেমন হড়বড় ক'রে কত-কী ঘ'টে যায় অথচ তারপর তার ঝাপসা স্মৃতি ছাড়া আর-কিছুই থাকে না, ঠিক তেমনি হয়েছে তার—সবসময়েই মনে হয়েছে অ্যাদ্দিন তারা কোন বুনোহাঁসের পেছনে ছুটছিলো, কিন্তু এখন সেই বুনোহাঁস আর কোথাও নেই—সেও কোন্ দূরে দিগন্তের পরপারে মিলিয়ে গেছে।

আর তারপর—*এখন*—এখন এই কাণ্ড। *ডানকান* জাহাজ গিয়ে পড়েছে বেন জয়েসের হাতে, লর্ড গ্লেনারভনের এত-সাধের *ডানকান*; আর তাঁরা যে সেই *ডানকান* নিয়ে সাতসমুদ্রতেরোনদী পেরিয়ে দু-দুটো মহাদেশ পেরিয়ে, এক গোলার্ধ থেকে অন্য গোলার্ধে এসে পড়েছে, সে তো তারই জন্যে, না, শুধু তার নয়, রবার্টও আছে, আর আছে সেই-ক'বে শেষ-যাঁকে দেখেছিলো সেই বাবার স্মৃতি, কাপ্তেন গ্রাণ্টের স্মৃতি।

আর কী হবে এখন মিথ্যেমিথ্যি এই দুরাশার পেছনে ছুটে? মেরিকে যেন একটা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হালভাঙা ভেলার মতো দেখাচ্ছিলো, সেই-যে ভেলাটায় ক'রে তারা পাড়ি জমিয়েছিলো ক-দিন আগেই ঐ বানভাসি নদীতে, আর জলের তোড়ে যে-ভেলা ভেঙে গিয়েছিলো, সে যেন এখন সেইরকমই এক ভেঙে-পড়া ভেলা। কেউ যদি তাকে জিগেস করে তার মনের অনুভূতিগুলোকে পর-পর সাজিয়ে বলতে, তবে তাও সে পারবে না, শুধু-একটা হালছাড়া হতাশ আচ্ছন্নভাব, তা ছাড়া আর-কিছুই না।

আর *নিশ্চয়ই সেজন্যেই* প্রস্তাবটা প্রথমে এলো মেরির কাছ থেকেই। ধরাগলায় থেমে-থেমে সে যা বললে, তার সারমর্ম হ'লো : আর কেন, ঢের তো হ'লো, এবার বরং ফিরেই যাওয়া যাক ইওরোপে। আয়ারটনের সঙ্গে আচমকা ঐ খামারে দেখা হবার পর দপ ক'রে নতুন-একটা আশা জ্ব'লে উঠেছিলো মনে, আর এ-যেন ঠিক দীপ নেভবার আগে শিখা যেমন দপদপ ক'রে, অনেকটা সেইরকম। এখন তো বোঝাই যাচ্ছে আয়ারটন তাদের ধাপ্পা দিয়েছিলো, হতভাগা ফেরেব্বাজ, সে সম্ভবত কোনোদিনই চিনতো না কাপ্তেন গ্রান্টকে। শুধু কতগুলো জনরব শুনেছে *ব্রিটানিয়া* সম্বন্ধে আর নয়তো হয়তো *সত্যিকার-আয়ারটন*, এই *বেন জয়েস-আয়ারটন* নয়, তার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো কোথাও, এই জঙ্গলে সবই সম্ভব, তারপর তার কাগজপত্তর হাতিয়ে নিয়ে এসেই শেষে তা তাদের দেখিয়েছে তাদের প্রতারিত করবার জন্যেই। কিন্তু এখন আর খামকা দুরাশার পেছনে ছুটে লাভ কী ? বরং এবার সবাই মিলে ফিরেই যাওয়া যাক ইওরোপে, সত্যি-তো, লর্ড গ্লেনারভন তাদের জন্যে অনেক করেছেন, অনেক লোকসান হয়েছে তাঁর, এমনকী প্রাণহানিও হয়েছে এই অভিযানে বেরিয়ে, আর কেন, বাবাকে তো আর পাওয়াই যাবে না, এবার বরং—

এমনি-সব কথা, ভেঙে-ভেঙে, থেমে-থেমে, ছেঁড়া-ছেঁড়া কতগুলো শব্দ দিয়ে সাজানো। হাজার সান্ত্বনা, হাজার প্রবোধ, হাজার সহানুভূতিও এখন বোধহয় তাকে আর ঐ দুঃসহ হতাশা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

কিন্তু কাপ্তেন জন ম্যাঙ্গল্‌সও দমবার পাত্র নন। কাপ্তেন গ্রান্টের মতো তিনিও ডাঙার নন, জলেরই মানুষ যেন। তিনিও নাছোড় ব'লে গেলেন কেমন ক'রে তিনি খুঁজে বার করবেন কাপ্তেন গ্রান্টকে, *বার করবেনই*, দমবার পাত্র নন তিনি, হাল ছেড়ে দেয়া তাঁর ধাতেই নেই মোটেই, একদিন-না-একদিন ঠিক তিনি মেরিকে মুখোমুখি দেখা করিয়ে দেবেন তার বাবার সঙ্গে, আর তাতেই প্রমাণ হ'য়ে যাবে তিনি, জন ম্যাঙ্গল্‌স, তিনি কাপ্তেন, জাহাজি, *কাপ্তেন* কথাটা তাঁর পোশাকি বাহারে অভিধা নয়—সেটা তাঁর নামেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সেদিনটা তারপর এমনি-সব কথার পিঠে কথায় কেটে গেলো, ক্লান্তিটা কেউ যেন গায়েই মাখছিলেন না,—মেরির দিকে তাকানো যাচ্ছে না, তাকে অন্তত ঐ সর্বনেশে হতাশা থেকে বার ক'রে আনতেই হবে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরের দিন ভোরবেলাতেই জন ম্যাঙ্গলস বেরিয়ে গেলেন জাহাজঘাটায়, মেরিকে তিনি কথা দিয়েছেন—অভিযান চলবে, সন্ধান চলবে, তাই গোড়াতেই দরকার একটা জাহাজ—যদি মেলবোর্নে যাবার কোনো জাহাজ জোটে। কিন্তু ইডেন ছোট্ট জায়গা, টুফোল্ড উপসাগরের মুখে জাহাজ খুব-একটা আসে না, সমুদ্র এখানে উত্তাল, ক্ষিপ্ত, বন্য—তাছাড়া ঠিক-এদিকটায় লোকালয়ও তেমন গ'ড়ে ওঠেনি। অনেকক্ষণ জাহাজঘাটায় ঘুরেও মেলবোর্নগামী কোনো জাহাজের খোঁজ পাওয়া গেলো না। কী করবেন তাহ'লে এখন?

আর ঠিক সেইসময়েই মঁসিয় পাঞ্চয়াল মুশকিল আসানের ভঙ্গিতে খবরটা দিলেন। মেলবোর্ন যে যেতেই হবে, এমন মাথার দিব্বি কে দিয়েছে? এখন যখন *ডানকান* আর ওখানে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে নেই তাঁদের অপেক্ষায়, তখন মেলবোর্ন না-গিয়ে অন্য-কোথাও গেলেই তো হয়। আগের দিনই তো জাহাজঘাটায় গিয়ে দেখে এসেছিলেন নিউ-জিল্যাণ্ডের অকল্যাণ্ডে যাবার জন্যে একটা জাহাজ তোড়জোড় করছে। সেটায় ক'রে অকল্যাণ্ড চ'লে গেলেও তো হয়, সে যখন একটা দেশের রাজধানী, তখন সেখানে ইওরোপে যাবার মতো কোনো-না-কোনো জাহাজ পাওয়া যাবেই। অকল্যাণ্ড এখান থেকে বেশি-দূরে নয়, তিনি শুনে এসেছেন দিন-দশেকের বেশি লাগবে না এই হাজার মাইল পাড়ি দিতে। কিন্তু তাঁর চেয়েও বড়ো-একটা কথা খতিয়ে দেখে নেয়া উচিত। অকল্যাণ্ড পড়েছে সাঁইত্রিশ ডিগ্রি অক্ষরেখায়—প্রথম থেকেই তো, সেই যখন তাঁরা দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছেছিলেন, তাঁরা এই সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তর ধ'রেই পাড়ি জমিয়েছেন। এই সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তরেই কোথাও নিশ্চয়ই কাপ্তেন গ্রাণ্টকে পাওয়া যাবে।

শেষচেষ্টার পরেও একটা *বিশেষ-শেষ চেষ্টা*, যদি সে-রকম কিছু কখনও হয়।

যখন সমস্ত ব্যাপারটাকে নিছক পণ্ডশ্রম ব'লে মনে হচ্ছে, তখন যদি এমনকী একটা উটকো উড়োখবরও এসে পৌঁছোয়, তখন কেমন যেন নতুন ক'রে একটা উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হ'য়ে যায়। সাফল্য সম্বন্ধে কোনো ভরসাই হয়তো নেই, কিন্তু তবু তো... আর এই তবু অব্যয়টা যথার্থই অব্যয়, সেটা আর-কখনও মরে না—সবসময়েই যেন ঝোড়োসমুদ্রে উত্তাল উথালপাথাল ঢেউয়ের মধ্যে দূরের-কোনো আলোকস্তম্ভের মতো আলো দেখাতে থাকে। যখন মেলবোর্নে আপাতত যাওয়া হবে না ব'লে সবাই মনখারাপ ক'রে আছে, তখন এই প্রস্তাব—যেটা নিছক-একটা বিকল্প ব্যবস্থার চাইতেও বেশি!

আর সেটাকে তক্ষুনি যেন সজোরে আঁকড়ে ধরলেন সবাই। আর একমুহূর্তও সময় নষ্ট না-ক'রে লর্ড গ্লেনারভনকে নিয়ে কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস সটান গিয়ে হাজির সেই জাহাজে। জাহাজিদের নিজেদের মধ্যে নিশ্চয়ই আলাদা-একধরনের বনিবনা থাকে, তাছাড়া জাহাজিদের পরিভাষাও তো কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসের জানা। ফলে জাহাজটা যতই হতচ্ছাড়া মালবওয়া জাহাজ হোক না কেন, জাহাজের কাপ্তেন বিল হ্যালি যতই রুক্ষ, বেপরোয়া, গোঁয়ার গোছের লোক হোক না কেন, না-ই বা সে জানুক ভদ্রতা বা সহবৎ, পাইপ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেনে-টেনে যতই কেন-না ঠোঁট দুটো কালো ক'রে ফেলুক, কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স তাকে কিন্তু একটুক্ষণের মধ্যেই পটিয়ে ফেললেন। হুম, এটা জানবেন মালবওয়া জাহাজ, কোনো প্রমোদতরী নয়, মাল্লাদেরই থাকার ভালো কোনো ব্যবস্থা নেই, তার ওপরে আবার মহিলা, শ্বেতাঙ্গিনী, উঁহু, তাঁদের থাকার ব্যবস্থা তাঁদেরই করতে হবে, এমনকী খাবারদাবারের ব্যবস্থাও, এখানকার খাবার দাঁতে কাটা যায় না, এমন অখাদ্য, আর-হ্যাঁ, যখন বিপদে পড়েছেন, নিয়ে যেতে পারি, তবে পঞ্চাশ পাউণ্ড ভাড়া লাগবে, আর সেটা আগাম, হাতে-হাতে চাই, ফ্যালো কড়ি মাখো তেল, এ-জাহাজে যাত্রীও যা মালের বস্তাও তা-ই—বরং খোল ভর্তি মাল আরো-দামি, সেগুলো সময়মতো অক্ষত পৌঁছে দিতে না-পারলে শেষটায় তাকেই উলটে খেসারৎ দিতে হবে...ইত্যাদি, এবং ইত্যাদি।

কিন্তু তা-ই সই। কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসের মাল্লারা নিজেরাই একটু জায়গা ঝাঁট দিয়ে, ধুয়ে-পুঁছে, সাফসুতরো ক'রে নিলে। ব্যাঙ্কে গিয়ে সেদিনই লর্ড গ্লেনারভনের চেক ভাঙিয়ে নগদ টাকা তুলে এনেছেন মেজর ম্যাকন্যব্‌স। তা থেকে আগাম পঞ্চাশ পাউণ্ড চুকিয়ে দেয়া হয়েছে বিল হ্যালিকে। মঁসিয় পাঞ্জয়লকে কিনে দেয়া হয়েছে নিউ-জিল্যাণ্ডের একটা ম্যাপ। অস্ত্রশস্ত্র সব তো গেছে ভেলাটার সঙ্গে, শুধু তাঁর নিজের রাইফেলটাই বেঁচে ছিলো, এবার সবার জন্যেই নতুন ক'রে অস্ত্রশস্ত্র কেনা হ'লো। আবার একটা নতুন দেশে চলেছেন সবাই—কোথায় কোন্ আপদ তাঁদের জন্যে ওৎ পেতে আছে, সেজন্যে সাবধান থাকাই ভালো। যাত্রীদের নিয়ে বিল হ্যালির কোনো মাথাব্যথা নেই, ছপ্পড় ফুঁড়ে এই অপ্রত্যাশিত কড়কড়ে পাউণ্ড পেয়েই সে খুশি, তাঁদের কার কী নাম, কার কী ধাম—সে-সম্বন্ধে তার কোনো উটকো কৌতূহল নেই—'জাহাজ ছাড়বো কাল ঠিক দুপুরবেলায়, কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক সময়ে জাহাজে না-এলে আমি কিন্তু ফালতু সবুর করবো না। আপনাদের না-নিয়েই আমায় জাহাজ ছেড়ে দিতে হবে—আমার বাপু সাফ কথা।'

জাহাজে ওঠবার আগে, শেষবার, এখানেই সাঁইত্রিশ ডিগ্রি অক্ষরেখার কাছে সমুদ্রতীর দেখে এসেছেন লর্ড গ্লেনারভন, বেন জয়েস *ডানকান* দখল ক'রে নেবার পর টম অস্টিন আর অন্য মাল্লাদের কী হাল করে কে জানে। যদি ধ'রে-ধ'রে একেকটা ক'রে মৃতদেহ ভাসিয়ে দিয়ে থাকে জলে, আর সেগুলো যদি ভেসে এসে ডাঙায় ঠেকে থাকে!

লর্ড গ্লেনারভনের সঙ্গে ছিলেন কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স। না, তীরে কারু মৃতদেহ প'ড়ে নেই। তবে *ডানকান* যে এখানে এসেছিলো, তারই চিহ্ন তীরের কাছে ঐ তাঁবু খাটাবার দাগ, আর নিভে-যাওয়া আগুনের কুণ্ড, কয়েদিদের একটা উর্দিও পাওয়া গেছে তার পাশে, আয়ারটন ( না কি বেন জয়েস ) তো বলেছিলো এখানে *ডানকানকে* নিয়ে এসে তার স্যাঙাৎদের জাহাজে তুলে নেবে। এসেছিলো নাকি তাহ'লে? এ-সব কি তারই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিহ্ন ?

ইডেনের শাসনকর্তার সঙ্গে একটা মোলাকাৎ অবশ্য হয়েছিলো। এখানকার ম্যাজিস্ট্রেটকে লর্ড গ্লেনারভন জানাতে গিয়েছিলেন যে তাঁর জাহাজ দখল ক'রে জেলপালানো কয়েদিরা বারদরিয়ায় পাড়ি জমিয়েছে। যদি ভেবে থাকেন যে ম্যাজিস্ট্রেট তাই শুনে বিষম উত্তেজিত হ'য়ে উঠে *ডানকান* জাহাজের উদ্ধারের জন্যে তোড়জোড় শুরু ক'রে দেবেন, তবে ভুল ভেবেছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট উত্তেজিত হয়েছিলেন বটে, তবে উল্লাসে, আনন্দে প্রায় আত্মহারাই যেন, জেলপালানো দুর্ধর্ষ খুনে-ডাকাতগুলো আর অস্ট্রেলিয়ায় নেই—জাহাজে ক'রে জলে ভেসেছে—এতে অন্তত রাতের ঘুমটা এখন থেকে নির্বিঘ্নে হবে—তাদের ভয়ে আর সারাক্ষণ আধমরা হ'য়ে থাকতে হবে না—সারাক্ষণই তো শঙ্কা ছিলো কোথায় কোন আতঙ্ক লেলিয়ে দেয় বদমায়েশগুলো—এখন বরং হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেলো। খুশি হ'য়ে তিনি চারপাশে তারবার্তা পাঠিয়ে দিলেন—'জোর খবর! খুশির খবর! কয়েদিগুলো অস্ট্রেলিয়ার ডাঙায় আর নেই—জাহাজে ক'রে জলে ভেসেছে!'

সত্যি, এই ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে কাপ্তেন বিল হ্যালির যে কী তফাৎ, সেটাই বোঝা দায়। সবাই আছে যে যার তালে। অন্য মানুষদের বিপদে-আপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজের শান্তি নষ্ট করে কোন্-সে গাড়ল।

এত-সব জায়গা থেকে বিভিন্ন টুকিটাকি সেরে এসে কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স দ্যাখেন মঁসিয় পাঞ্জয়ল কি-রকম ছটফট করছেন সারাক্ষণ, একটা খাঁচায় পোরা বাঘের মতো তাঁর দশা।

'কী ব্যাপার, মঁসিয় পাঞ্জয়ল? আপনাকে যে খুব অস্থির দেখাচ্ছে—আবার-কিছু নতুন উৎপাত জুটেছে নাকি।'

'উৎপাত নয়!' মঁসিয় পাঞ্জয়ল যেন ফেটেই পড়েছেন। 'আমরা যে নিউ-জিল্যাণ্ড যাচ্ছি হুট ক'রে!'

'কেন? নিউ-জিল্যাণ্ড যাবার প্রস্তাবটা তো আপনার কাছ থেকেই এসেছিলো।'

'তা বটে। তবে কি জানেন তখন নতুন দেশে যাবার উত্তেজনার চোটে ভুলেই গিয়েছিলুম যে নিউ-জিল্যাণ্ডে গেলে কেউ নাকি আর-কখনও ফেরে না! এখন ভাবছি কোন কুক্ষণেই যে বাড়ির পড়ার ঘরটা থেকে পা বাড়িয়েছিলুম। কপালে এখন আরো-কত দুর্ভোগ আছে, দেখবেন! আমার ধারণা, এ-যাত্রাতেও আমরা নির্বিঘ্নে দিন কাটাবার বরাৎ ক'রে আসিনি।'

অমন ক'রে ভাগ্যকে উসকে না-দিলেই পারতেন বোধহয় মঁসিয় পাঞ্জয়ল। কোন সূক্ষ্ম লুতাতন্তুর জালে যে মানুষের ভাগ্য ঝোলে আর কোন খেয়ালে আপন মনেই যে সে দোল খায় পেণ্ডুলামের মতো, এদিক থেকে ওদিক, তা-ই বা কে জানে। তবে গতিক



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে খুব সুবিধের ঠেকছে না তা পরদিন জাহাজে ওঠবামাত্রই টের পাওয়া গিয়েছিলো। বিল হ্যালির কাছ থেকে কেউই খুব বিনীত ভদ্র সুবোধ ব্যবহার আশা করেনি, সে-যে জাহাজে মহিলাদের দেখে বিগলিত হ'য়ে গিয়ে নিজের ক্যাবিনটা তাদের ছেড়ে দেবে না—এটা তো জানা কথাই। কিন্তু পাইপমুখে এই হট্টাকট্টা ইয়াজোয়ানের কাছে প্রত্যাশা করা গিয়েছিলো যে সে আর কিছু না-হোক, অন্তত নৌচালনবিদ্যেটা ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছে—না-হ'লে একটা আস্ত সচল জাহাজের কাপ্তেন হ'লো কী ক'রে। পরে অবশ্য দেখা গেলো এ-ব্যাপারটা যদি তার জানা থেকেও থাকে, জাহাজ ছাড়বার পর নিখুঁতমসৃণ-ভাবে সেটাকে চালাবার কোনো মাথাব্যথাই নেই তার। নিজে গিয়ে মাল টেনে প'ড়ে থেকেছে নিজের ক্যাবিনে, জাহাজ কোথায় কোন চোরাগোপ্তা ডুবোপাহাড়ে ধাক্কা খেলো কি খেলো না—তাতে হয়তো তার থোড়াই আসে যায়। আর যেমন কাপ্তেন, তেমনি তার মাল্লারা। তারাও কাপ্তেনের পন্থা অনুসরণ ক'রে অল্পক্ষণবাদেই মদের ঘোরে বেহুঁশ হ'য়ে পড়লো। 'এ-কী আপদ রে, বাবা! এ-কোন কাপ্তেনের পাল্লায় এসে পড়লুম!' এ-কথা ভেবে, নিজে থেকে যেচে, আগবাড়িয়ে কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস একবার তাকে জাহাজ বিষয়ে পরামর্শ দিতে গিয়েছিলেন, অমনি সে তাঁকে হুংকার দিয়ে নিজের ক্যাবিন থেকে বার ক'রে দিয়েছে : 'বলি, এ-জাহাজের কাপ্তেন কে? আপনি, না আমি? আমি আমার যেমন-খুশি তেমনিভাবে আমার জাহাজ চালাবো, তাতে আপনি ফোঁপরদালালি ক'রে নাকগলাতে এসেছেন কেন?'

গতিক দেখে ফের মাথায় হাত লর্ড গ্লেনারভনের। জলপথের কোনো-একটা চলনসই চার্ট পর্যন্ত ঝুলছে না সারেঙের ঘরে, যে, সেটা দেখে কোনো অনুমতি বিনাই কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস জাহাজের হাল ধরবেন—আক্ষরিক অর্থেই ধরবেন। ইডেন থেকে অকল্যাণ্ড যায় এ-জাহাজ, আবার সেখান থেকে ফেরে—ফলে পথটা বিল হ্যালির চেনা। কিন্তু সে তো এখন বেহুঁশ প'ড়ে নাক ডাকাচ্ছে!

'আগেই বলেছি কোন কুক্ষণেই যে বাড়ি থেকে পা বাড়িয়েছিলুম,' মঁসিয় পাঞ্চয়ল ফের তাঁর কপাল চাপড়াতে লেগে গেছেন, 'এ-যে দেখছি রাক্ষসমুলুকে পা দেবার আগে থেকে অবস্থা সঙিন হ'য়ে উঠলো!'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস জিগেস করলেন : 'রাক্ষসমুলুক? সে আবার কী? আমরা তো যাচ্ছি অকল্যাণ্ডে—নিউ-জিল্যাণ্ডে!'

'আরে-হ্যাঁ—তার কথাই তো বলছি। এই মাওরিদের দেশটা যে রাক্ষসদের দেশ—সে তো সব্বাই জানে।' মঁসিয় পাঞ্চয়ল একটু তেতে উঠেই বললেন।

'রাক্ষসদের দেশ মানে?'

'মানে ক্যানিবালদের রাজত্বি—পড়েননি মঁতেইন—কী-সব লিখে গেছেন এই ক্যানিবালদের বিষয়ে? নরখাদক একেকটা—মানুষখেকো!'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথোপকথনের ধরনটা দেখে কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স-এর ধারণা হ'লো ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে। 'তা আপনার মঁতেইন এই মাওরিদের দেশে এসেছিলেন বুঝি? প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন? একেবারে রাক্ষসদের পেটের ভেতর থেকে তাঁর বাণী বিতরণ করছেন? না-না, মঁসিয় পাঞয়ল, মঁতেইন কোথায় কোন্ দেশ সম্বন্ধে কী বলেছেন আমি জানি না। জানবার ইচ্ছেও নেই। শুনেছি, মহাকবি শেক্সপীয়ার নাকি এই ক্যানিবাল কথাটা ওলোটপালোট ক'রে দিয়েই ক্যালিবানকে পেয়েছিলেন। কিন্তু সেও —যদ্দুর জানি—আর যা-ই হোক, মানুষখেকো নয়। তা আপনি কি নিউ-জিল্যাণ্ডে যেতে চান না নাকি? সত্যিকার মানুষখেকো তো বাঘসিংহ—তা তাই ব'লে কেউ কি বাঘসিংহের দেশে যায় না?'

এ-কথায় হয়তো যৎকিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হ'লো মঁসিয় পাঞয়লের। তিনি একটু আপোষ করার ভঙ্গিতে বললেন, 'না-না, আমি নিউ-জিল্যাণ্ডে যদি-বা যাইও—উপকূল ছেড়ে ভেতরে যাচ্ছি না। কে জানে, বাপু, কোথায় কোন্ বিপদ উৎকট একটা লাফ দেবে ব'লে উদ্যত হ'য়ে আছে!'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স নিজের ঘাড়ে হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, 'কী জানেন, মঁসিয় পাঞয়ল? আমি তো সাগরজলের মানুষ! ঘাড়েগর্দানে নোনা ধ'রে গেছে। আপনার ঐ রাক্ষসরা হয়তো আমার ঘাড়ে দাঁত বসিয়ে থুঃ থুঃ ক'রেই উগরে ফেলে দেবে। আর, তাছাড়া, মাওরিরা কেমন লোক, সেটা আপনার ঐ প্রচীন পণ্ডিতদের মতো আমিও জানি না। তবে শাদা শয়তান আমি কয়েকটা দেখেছি—এই আপনার বেন জয়েসের কথাই ধরুন না কেন—পৃথিবীর কোন ক্যানিবালই বা তার চেয়ে অধম হবে, বলুন?'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস মঁসিয় পাঞয়লের এই জুজুর ভয় দেখে ততটা ভড়কে যাননি। তাঁর বরং ভয়ই হচ্ছিলো, এই ফরাশি পণ্ডিত এমনিতেই একটু ছিটগ্রস্ত আধাপাগলা লোক ছিলেন। এখন এইসব বিদঘুটে উদ্ভট আজগুবি কথাবার্তা যে বলছেন সে কি তার মাথাটা পুরোপুরি বিগড়ে গেছে ব'লেই? না-হ'লে ইনি কেন অবিশ্রাম *কনটিন—কনটিন—আল্যাণ্ড—আল্যাণ্ড* ক'রে ব'কে মরছেন। যতই কনটিন ব'লে বিড়বিড় করুন না কেন, এটা তো সব্বাই জানে যে নিউ-জিল্যাণ্ড মোটেই কোনো কনটিনেণ্ট নয়—সেটা বরং দুটো দ্বীপ মিলিয়ে তৈরি—নর্থ আইল্যাণ্ড আর সাউথ আইল্যাণ্ড। তবে কি ফের আরেকবার তিনি চিরকুটগুলোর নতুন অর্থ বার করবার জন্যে খেপে উঠেছেন? তিনি কি ভাবতে শুরু ক'রে দিয়েছেন যে কাপ্তেন গ্রাণ্টের *ব্রিটানিয়া* শেষটায় ভেঙে পড়েছিলো নিউ-জিল্যাণ্ডেরই কোনো উপকূলে? তাহ'লেই তো সাড়ে-সর্বনাশ! তিনি একবার ক'রে চিরকুটগুলোর একটা নতুন অর্থ বার করেন, আর তাঁদের ছুটে মারতে হয় এই মুলুক থেকে সেই মুলুকে! শেষটায় কি কিউয়ি পাখির এই দেশটাতে তাঁদের একবার এ-দ্বীপ একবার ও-দ্বীপ ক'রে চর্কি ঘুরতে হবে? তা যদি হয় তাহ'লেই ভাবনার কথা। কোনো-



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা সম্ভাবনা ঘুণাক্ষরেও যদি দেখা যায় তাহ'লে কি আর লর্ড গ্লেনারভন সেটার শেষ না-দেখে ছাড়বেন ?

ছ-দিন হ'লো পাঞ্চয়ল কেবল *কনটিন—কনটিন* করেছেন, আর ছ-দিন হ'লো জাহাজ দিব্বি পাল খাটিয়ে জোরালো হাওয়ায় তরতর ক'রে ভেসে চলেছে, তবে সমুদ্রে জাহাজ চালানোর সময় এমনিতেই সবসময়ে খেয়াল রাখতে হয় খুব যেন দোল না-খায় অথবা ঝাঁকুনি লাগে। হ্যালির জাহাজ যেন ছুটে চলেছে নিজের খেয়ালখুশি মাফিকই, জাহাজের গতি মসৃণ না ঝাঁকি-খেতে-খেতে-চলা, সে-বিষয়ে নজর রাখার জন্যে আর যে-ই থাকুক, অন্তত বিল হ্যালি যে নেই, সেটা হয়তো না-বললেও চলে। অতএব ঝাঁকুনির চোটে যদি সকলেরই মনে হয় সিন্ধুপীড়ার দাপটে পেটের নাড়িভুঁড়ি শুধুই উলটে আসতে চাচ্ছে, তবে বলতেই হয় যে সেটা এ-কদিনে কারুই আর তেমন অপ্রত্যাশিত ব'লে মনে হয়নি।

তার ওপর ফের শুরু হয়েছে দক্ষিণ গোলার্ধের গ্রীষ্মকালের সেই সুবিখ্যাত বর্ষা। বৃষ্টির ঝাপট আর দাপট এমনই প্রচণ্ড যে খোলের ভেতরে সেঁধিয়েও যেন তার হাত থেকে নিস্তার নেই। শেষটায় মেরিকে নিয়ে লেডি হেলেনাকে বেরিয়ে আসতে হ'লো খোল ছেড়ে বাইরে। একে তো মালপত্রের জন্যে একফোঁটাও জায়গা নেই, তার ওপর এই বিষম খেলা চলেছে সমুদ্রের, এই সাগরদোলা নাগরদোলার দাপট এমনই যে শেষটায় বাধ্য হ'য়েই মেরিকে নিয়ে খোল থেকে বেরিয়ে আসতে হ'লো। এমন তুলকালাম ঝাঁকুনির মধ্যে মালপত্রের গায়ে বেমক্কা ধাক্কা খাওয়ার চাইতে ডেকে গিয়ে সকলের সঙ্গে সমানভাবে জাহাজের দুলুনিটা ভাগ ক'রে নেয়াও ভালো। মঁসিয় পাঞ্চয়ল অবশ্য ফরাশিদের স্বভাবসুলভ *শিভালরিবশত* মহিলাদের মনস্তুষ্টির জন্যে বিস্তর প্রমোদ জোগাবার চেষ্টা করলেন, তবু সবদিক বিবেচনা ক'রে বলতেই হয় এমন অবস্থায় কি কারু মুখেই হাসি ফুটতে পারতো ?

কিন্তু মেরি বা লেডি হেলেনার চাইতেও অনেকবেশি কাহিল দশা খোদ লর্ড গ্লেনারভনের। তাঁর বেজায় মনখারাপ। বার-বার ডেকে এসে পায়চারি করেন, তাকিয়ে থাকেন বৃষ্টিতে-ঝাপসা দিগন্তের দিকে, আর ভিজে নেয়ে একশা হ'য়ে যান। শেষটায় আর থাকতে না-পেরে, লর্ড গ্লেনারভনকে চোখে দুরবিন সেঁটে দিগন্ত হাৎড়াতে দেখে, কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স সরাসরি জিগেসই ক'রে বসলেন : 'কী খুঁজছেন, বলুন তো?'

'*ডানকানকে*।'

'ঈশ্বর করুন আমরা যেন *ডানকানকে* আর না-দেখি।'

'এ-কী কথা, জন ? কী বলতে চাচ্ছো তুমি ?'

'ঠিক কথাই বলছি। *ডানকান* এখন জলদস্যুদের জাহাজ। আমাদের দেখতে পেলে বে-হাল ক'রে ছাড়বে। এটা কি খেয়াল আছে যে আমাদের সঙ্গে মহিলারা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছেন ?'

কী-রকম মিইয়ে গিয়ে লর্ড গ্লেনারভন বললেন : 'এদিকে তো ডাঙার চিহ্নমাত্র দেখছি না। ছত্রিশ ঘণ্টা আগেই তো আমাদের ডাঙা দেখতে পাবার কথা।'

ঝড়ের তোড় ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বেলা শেষ হ'য়ে রাত যখন নামলো, হাওয়ার গর্জানি তখনও একফোঁটাও কমেনি। বিল হ্যালির শরীরে বোধহয় রক্তের বদলে আছে কোহল আর সমুদ্রের নোনাজল। এটা জানতে তার ঠিকে ভুল হয়নি যে গতিক খুব-একটা সুবিধের না। মত্ত অবস্থাতেই টলতে-টলতে সে চ'লে এলো ডেকে, রক্তরাঙা চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলো দুর্যোগকে, তারপর পাল ঠিক ক'রে দিলে।

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলেন তার পাকাহাতের কাজ, কিন্তু কোনো কথা বললেন না। একবার যখন সাহায্য করার প্রস্তাব নিজে থেকেই উপযাচক হ'য়ে গিয়েছিলেন, তখন বিল হ্যালি তাঁকে যেভাবে তাঁর অধিকারের মাত্রা সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দিয়েছিলো, সেই অপমানের কথা তিনি এখনও ভুলে যাননি।

সমুদ্র যেন খেপে উঠেছে। বড়ো-বড়ো উথালপাথাল ঢেউ। জাহাজ একবার ঢেউয়ের ওপর উঠছে, পরক্ষণেই কাৎ হ'য়ে নেমে আসছে। ডেকের ওপর দিয়ে ক-বার বড়ো-বড়ো ঢেউ গড়িয়ে গেলো। ঢেউয়ের জল প্রবলবেগে বেরিয়ে যাবার সময় একবার লম্বা ছিপটাকেও নিয়ে গেলো সঙ্গে—ভাসিয়ে নিয়ে গেলো দূরে—বাঁধন ছিঁড়ে গেছে তার।

ঝড়ের মধ্যেই ডেকে দাঁড়িয়ে রইলেন গ্লেনারভন আর ম্যাঙ্গল্‌স। দুশ্চিন্তায় দুজনেরই চোখ কপালে উঠেছে। এই অচেনা সাগরে শেষটায় এই জাহাজ ডুবে যাবে না তো ?

রাত যখন সাড়ে-এগারোটা, তখন মিশকালো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ভেসে এলো অন্যরকম একটা শব্দ—এবার যেন ঢেউ গিয়ে কোনো বালিয়াড়ির গায়ে ভেঙে পড়ছে।

'ডাঙা !' কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স ব'লে উঠলেন, 'ডাঙা!'

শিশের ওজন বাঁধা দড়ি জলে ফেলে দিয়ে জলের গভীরতা মাপলে একজন মাল্লা। হিশেব ক'রে বললে, 'তিন ফ্যাদম !'

শোনবামাত্র কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স আর স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। বিল হ্যালিকে গিয়ে বললেন : 'সর্বনাশ হ'তে চলেছে যে! জাহাজ যে এখন ডুবোপাহাড়ের ওপর দিয়ে চলেছে !'

বিল হ্যালির হিশেবে একটা মস্ত ভুল হয়েছিলো। সে ভেবেছিলো, ডাঙা বুঝি এখনও ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে আছে। ঝড়ের মধ্যে মদের ঘোরে সে দূরত্বটা ঠাহর করতে পারেনি। এখন মাত্র মাইল-আষ্টেক দূরে ডাঙা চ'লে এসেছে দেখে সে কী-রকম যেন ঘাবড়ে গেলো। আর তার ঐ বেকুব রাঙা দৃষ্টির ফ্যালফ্যাল ভাবটা দেখে এবার খোদ ম্যাঙ্গল্‌স গিয়েই হাল ধরলেন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুশকিলটা কম ছিলো না। এখানকার সমুদ্রের চার্ট কখনও দ্যাখেননি ম্যাঙ্গল্‌স, এখানে নৌচালনার অভিজ্ঞতাও নেই। এটুকু শুধু আন্দাজ করা যাচ্ছে, এখানকার জলে চারদিকেই ডুবোপাহাড় গিশগিশ করছে। একে ঘুটঘুটে অন্ধকার, হাওয়ার অবিশ্রাম শোঁ-শোঁ, ঢেউয়ের উত্তাল কলরোল—শুধু অনুমানে ভর দিয়েই জাহাজ চালাতে হবে, একটু এদিক-ওদিক হ'লেই ডুবোপাহাড়ের গায়ে আছড়ে প'ড়ে জাহাজের তলি ফেঁসে যেতে পারে। আর, বুঝি তা-ই হ'তে চলেছে। আচমকা কীসের সঙ্গে একটা প্রচণ্ড ঘা লেগে থরথর ক'রে কেঁপে উঠেই দাঁড়িয়ে গেলো জাহাজ। তলিটা তাহ'লে কোনো চড়ায় গিয়ে লেগেছে! পরক্ষণেই বিশাল এক ঢেউ এসে লাফিয়ে পড়লো জাহাজে, একধাক্কায় তাকে আরো ভালো ক'রে নিয়ে গেলো চড়ার ওপর। ফোরকাসল ভেঙে পড়লো, বিষম একটা আর্তনাদ ক'রে যেন মাস্তুল ভেঙে পড়লো। ক্যাবিনগুলোর কাচের শার্শি ঝনঝন ক'রে উঠলো, ভাঙলোও বোধহয়। ম্যাঙ্গল্‌স-এর বুঝতে অসুবিধে হ'লো না জাহাজ ডাঙায় উঠে পড়েছে। কিন্তু এ-কোন ডাঙা—?

এই হুলুস্থুল সংঘর্ষ ও ঝাঁকুনির পর সকলেই বেরিয়ে এসেছিলেন ডেকে। উৎকণ্ঠিত সুরে গ্লেনারভন জিগেস করলেন : 'ভেঙে গেছে নাকি জাহাজ? ডুবছে?

'না। তবে এখন এই অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না। সকাল না-হ'লে বোঝা যাবে না কোথায় এসে পৌঁছেছি। সকাল হ'লে নৌকো নামানো যাবে।'

বিল হ্যালি আর তার মাল্লারা ঠিক বুঝতে পারছে না কী করবে। তারা অস্থির হ'য়ে ছুটোছুটি করছে।

গ্লেনারভন যাত্রীদের নিয়ে খোলে নেমে পড়লেন। ওপরে ডেকে অনেকক্ষণ ধ'রে বিল হ্যালির সাগরেদদের চীৎকার চ্যাঁচামেচি ছুটোছুটি চললো। তারপর একসময়ে সমুদ্র শান্ত হ'য়ে এলো, ঝড় থেমেছে, অন্তত ঐ প্রচণ্ড তুফানটা আর নেই, আর তার সঙ্গে তাল রেখে বোধহয় বিল হ্যালি আর তার অনুচরদের দাপাদাপিও অনেকটা ক'মে এসেছে।

সকালবেলায় আলো ফুটতেই ম্যাঙ্গল্‌স ছুটে চ'লে এলেন ডেকে।

দূরে ডাঙা দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু জাহাজে বিল হ্যালি বা তার মাল্লারা কেউ নেই। একমাত্র যে-নৌকোটা অক্ষত ছিলো সেটা নিয়েই ঝড় থামতেই তারা কেটে পড়েছে।

তাহ'লে এঁরা এখন ডাঙায় যাবেন কী ক'রে? তীর দেখা যাচ্ছে, অথচ সেখানে যাবার উপায় নেই।

'উপায় যদি থাকতোও,' এরই মধ্যে মঁসিয় পাঞ্চয়ল আবার গোঁ ধরেছেন, 'তাহ'লেও আমি নামতুম না। ক্যানিবালদের পাল্লায় পড়তে চাই না—শুনেছি এখানকার আদিবাসীরা সবাই মানুষখেকো। এ একটা রাক্ষসের দেশ।'

'তা যদি হয়, তবে জাহাজকে এখান থেকে সরিয়ে নেয়া দরকার।' কাঁটা-কম্পাস-



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেক্সটান্ট দিয়ে হিশেব করতে-করতে বললেন কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস। 'আমরা অকল্যাণ্ড থেকে আরো-দক্ষিণে চ'লে এসেছি—৩৮° ডিগ্রি অক্ষরেখায়। আরো অন্তত কুড়ি মাইল গেলেই আমরা নিউ-জিল্যাণ্ডের রাজধানীতে পৌঁছুতে পারবো।'

তারপরেই নিজেদের মাঝিমাল্লা নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন জন ম্যাঙ্গলস। খোলের মধ্যে প্রায় দুশো টন চামড়া ছিলো—সেটা ফেলে দেয়া হ'লো, আর জাহাজ অমনি ঐ ওজনটা ফেলে দিতেই খাড়া হ'য়ে দাঁড়ালো। চড়ায় ঘা লেগে যে-দিকটা কাৎ হ'য়ে পড়েছিলো, সেদিকটায় একটু ভাঙচুর হয়েছে। দ্রুত হাতে তামার তাপ্পি লাগিয়ে সেদিকটা মেরামত করা হ'লো। জোয়ার এলেই যাতে যাওয়া যায়, সেজন্যে তৈরি থাকতে হবে।

কিন্তু জোয়ার যখন এলো, জাহাজ দাঁড়িয়ে রইলো যেমনকে তেমন। একটুও নড়লো না। শুধু একদিকে নোঙর ফেলে কোনোরকমে জাহাজটাকে খাড়া করাই গেলো। অর্থাৎ পরের জোয়ারের জন্যে সবুর ক'রে থাকতে হবে।

আর তারই মধ্যে পাঞয়ল বায়না ধরেছেন, তিনি নিউ-জিল্যাণ্ডের অচেনা মাটিতে পা-ই দেবেন না। অকল্যাণ্ডের মতো রাজধানী শহর হ'লে না-হয় কথা ছিলো, সেখানে শাদারা বসতি বানিয়েছে, শাসনের একটা ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যে-সব জায়গায় মাওরিদের রাজত্ব এখনও কায়েম হ'য়ে আছে, সেখানে পদে-পদে বিপদ হ'তে পারে। এই রাক্ষস মুলুকে নামবে কে? জলপথে না-হয় এখান থেকে ভেসে চ'লে যাবারই ব্যবস্থা করতে হবে—সোজা অকল্যাণ্ড অব্দি।

পরের বার জোয়ার যখন এলো, নিশুত রাতে, জাহাজ একটু দুললো বটে, কিন্তু এমনভাবে চড়ায় আটকে গিয়েছে যে তাকে নড়ানো গেলো না।

'উঁহু, এভাবে ব'সে থাকলে চলবে না,' দেখা গেলো কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস-এর এই কথায় লর্ড গ্লেনারভনেরও সায় আছে। 'ঐ ভাঙা মাস্তুল, কাঠের সিন্দুক—এ-সব দিয়েই একটা ভেলা বানিয়ে নিতে হবে আমাদের—হাত-পা গুটিয়ে ব'সে-থাকা মানেই বিপদকে ডেকে নিয়ে আসা। আরেকবার যদি অমন তুলকালাম তুফান ওঠে, তাহ'লে এই নড়বোড়ে জাহাজটাকে আর দেখতে হবে না—ভেঙে টুকরো-টুকরো হ'য়ে যাবে।'

সঙ্গে-সঙ্গে ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে সবাই ভেলা বানানোর কাজে হাত লাগালেন। ভেলাটার ওপর পর-পর কাঠের বাক্স চাপিয়ে, কোনোরকমে একটা পাটাতনমতো তৈরি হ'লো, যাতে ঢেউ উঠলেও জল এসে পাটাতনে পৌঁছুতে না-পারে, একটা মাস্তুলও বসানো হ'লো, যাতে পাল খাটানো যায়। আর একদিকে রইলো হাল, অন্যদিকে নোঙর।

জাহাজ থেকে ভেলায় নামিয়ে নেয়া হ'লো বিস্কুট আর নোনা মাছ। কিন্তু সর্বাগ্রে ভেলায় তোলা হ'লো অস্ত্রশস্ত্র, এগুলি এখন অত্যন্ত জরুরি হ'য়ে উঠেছে।

এইবারে সত্যি-সত্যি বোঝা যাবে জন ম্যাঙ্গলসের কেরামতি। নৌচালনায় তিনি যে কতটা ওস্তাদ, এটা যেন তারই একটা হাতেকলমে পরীক্ষা।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেমন ক'রে যে তারপর সেই ভেলায় ক'রে পাড়ি দিয়েছেন তাঁরা, সেটা কেউ স্পষ্ট ক'রে জানেনই না যেন। কোনো *লগবুক* নেই যে নথি রাখবে কেউ। দশ মাইল পথ পেরুতে দু-দিন লাগলো। অবিরাম যুঝতে হ'লো আদিম দেবতাদের সঙ্গে—জল, হাওয়া—আর মাঝে-মাঝেই আকাশের মুখ কালো হ'য়ে যায় ঘন মেঘে। তবে, না, সে-রকম তুফান নয়। শুধু পাগল হাওয়া যখন ভেলাটাকে একঝটকায় একটা চোরা পাথরে এনে আছড়ে ফেললো, তখন কয়েক পা এগুলেই মূল মাটি।

কোনোরকমে সাবধানে, কত জল দেখে নিয়ে, ঐ কয়েক পা পেরিয়ে এলেন সকলে। আর অবশেষে পা দেয়া গেলো ডাঙায়, বিজনবিভূঁয়ে।

লর্ড এডওয়ার্ড বলেছিলেন, এই অচেনা জায়গায় আর সবুর না-ক'রে সরাসরি হাঁটা দেবেন অকল্যাণ্ডের উদ্দেশে। কিন্তু আকাশ কালো ক'রে যেমন ক'রে মেঘ এলো, তাতে এই ইচ্ছেটা আপাতত স্থগিত রাখতে হ'লো। এক্ষুনি বরং কোনোরকমে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেয়া উচিত। বৃষ্টি নামবার আগেই।

জায়গাটা ফাঁকা, উঁচুনিচু পাথর, পাঞ্জয়ল পাথরের নমুনা দেখে বললেন যে আগুনের পাহাড় ছিলো এখানে—নিয়মিত যে অগ্ন্যুৎপাত হ'তো, তারই প্রমাণ এই ছড়ানো পাথর।

উইলসন যখন একটা গুহা আবিষ্কার করলে, ততক্ষণে মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। একমুহূর্তও দেরি না-ক'রে, ভিজতে-ভিজতেই, ছুটে এসে গুহায় ঢুকলেন সকলে। ভেতরটা কিন্তু, আশ্চর্য, দিব্বি শুকনো। বোঝা গেলো, এই গুহায় সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস ঢোকে না। বিস্তর শুকনো ঘাসপাতা পড়েছিলো ভেতরে—তা যেন প্রায় একটা জাজিমের মতো বিছিয়ে রেখেছে প্রকৃতি। কিছু ঘাসপাতা নিয়ে যাওয়া হ'লো গুহার মুখে—আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে নিতে হবে।

বৃষ্টি ধরলেই অকল্যাণ্ড রওনা হওয়া যাবে।

কিন্তু কাজটা যে খুব সহজ হবে, তা নয়। বেশ ক-বছর ধ'রেই মাওরিদের সঙ্গে ইংরেজদের ফাটাফাটি লড়াই চলেছে। মিথ্যে ধাপ্পা দিয়ে শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকরা দখল ক'রে বসতে লাগলো নিউ-জিল্যাণ্ডের প্রধান দ্বীপ দুটো—নর্থ আইল্যাণ্ড আর সাউথ আইল্যাণ্ড, যারা দ্বীপ দুটোর সত্যিকার মালিক, তারা ক্রমশ পিছু হঠতে লাগলো। আর স্বাধীনতা বিপন্ন দেখে মরণপণ ক'রে মাওরিয়া লড়াই চালাতে লাগলো ইংরেজদের সঙ্গে। সে-লড়াই এখনও চলছে, কিন্তু মাওরিরা বাধ্য হচ্ছে দ্বীপগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ছেড়ে দূর-দুর্গম অঞ্চলে চ'লে যেতে। কিন্তু তাই ব'লে হার স্বীকার ক'রে আত্মসমর্পণ করেনি এখনও।

'খুবই বিপজ্জনক মুহূর্তে এখান এসে পৌঁছেছি আমরা,' মঁসিয় পাঞ্জয়ল বললেন, 'অকল্যাণ্ডে পৌঁছুতে পারলেও না-হয় কথা ছিলো। কিন্তু এখানে, পথের মাঝখানে,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতর্কিতে যদি মাওরিদের সঙ্গে আমাদের দেখা হ'য়ে যায়, তারা যে আমাদের ছেড়ে কথা কইবে না—এটা মনে রাখা উচিত।'

'তাহ'লে আমরা কী করবো এখন ?'

'আমরা যেখানটায় এসে নেমেছি, সেখানটতেই বিষম যুদ্ধ চলেছে এখন—এই এখান থেকে অকল্যাণ্ড অব্দি—ফলে বিপদ এখানটাতেই সবচেয়ে-বেশি।'

'কিন্তু এখানে এই গুহায় ব'সে থাকলে তো চলবে না—অকল্যাণ্ডে আমাদের যেতে হবেই—' লর্ড গ্লেনারভন মনে করিয়ে দিয়েছেন।

'উত্তরদিক দিয়ে অকল্যাণ্ডে যাবার চেষ্টা করাই ভালো—ঘোরাপথ হবে বটে, তবু খেপে-যাওয়া মাওরিদের মুখে পড়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু সমুদ্রের ধার দিয়ে যাওয়া চলবে না—সেদিকটা মোটেই নিরাপদ নয়। বরং চেষ্টা করতে হবে ওয়াইপো আর ওয়াইকাতো নদীর মোহানায় যদি পৌঁছুনো যায়—'

'এবার বুঝতে পারছি,' কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স বললেন, 'ঝড় কমতেই ঐ একটা মাত্র নৌকোয় ক'রে বিল হ্যালি তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে সট্‌কে পড়েছে কেন। সে নিশ্চয়ই ঐ ক্ষুব্ধ মাওরিদের মুখোমুখি পড়তে চায়নি।'

পরদিন বৃষ্টি ধরতেই রওনা হলেন সবাই। পাঞ্চয়লের কথামতোই ঘোরাপথটাই বেছে নেয়া হ'লো। উত্তরে তিরিশ মাইল পথ যেতে হবে। কোনোরকমে ঐ নদী দুটির মোহানায় পৌঁছুতে পারলে পরের পঞ্চাশ মাইল পথ যেতে আর তেমন অসুবিধে হবে না।

তৃতীয় দিনের দিন ধুঁকতে-ধুঁকতে অভিযাত্রীরা পৌঁছুলেন দুই নদীর সংগমে। প্রচণ্ড গর্জন ক'রে স্রোত লাফিয়ে পড়ছে পাথর থেকে পাথরে, ছিটকে উঠছে জল, মিহি একটা কুয়াশার আস্তর ঢেকে রেখেছে সব, এদিকে সন্ধেও হ'য়ে এসেছে। ক্লান্তিতে সকলের শরীর এলিয়ে আসছিলো। পথে কখনও কৌটো থেকে নোনা মাছ খেয়েছেন তাঁরা, একবার বেলাভূমি থেকে ঝিনুক কুড়িয়েও খেয়েছিলেন। এখন একটু নোনা মাছ আর শুকনো বিস্কুট খেয়ে ক্লান্ত অভিযাত্রীরা বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। কাল দিনের আলো ফুটলে এখান থেকে যত-তাড়াতাড়ি-সম্ভব আরো এগিয়ে যেতে হবে।

...

কুয়াশাটা প্রধানত তৈরি করেছিলো জলের ঝাপটা, আর তা থেকে ছিটকে-পড়া মিহিজলের কুচি। সেই কুয়াশা দেখা গেলো সকালবেলাতেও আছে। পরে যখন রোদের তেজ বাড়লো, শুধু তখনই কুয়াশা স'রে গেলো—আর অমনি উন্মোচিত হ'লো ওয়াইপা আর ওয়াইকাতো নদী দুটো—যেখানে এসে তারা মিলেছে, গোড়ায় খানিকটা গেছে পাশাপাশি, তারপরেই দুটো খাত পুরোপুরি এক হ'য়ে গেছে—আর সেখান থেকেই বিশাল ধারা অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে এগিয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর সেই নদী দিয়েই ছুটে চলেছে বিশাল-একটি ক্যানু—তার গলুই প্রায় সত্তর ফিট লম্বা, আর দু-ধার দিয়ে প্রায় তিন ফিট উঠে গিয়েছে ধার। সরু লম্বা ছিপ, তরতর ক'রে ছুটে চলেছে মাঝনদী দিয়ে। মস্ত-একটা দেবদারু গাছ ফোঁপরা ক'রে নিয়ে তার খোলটা দিয়ে বানানো হয়েছে এই ক্যানু, ভেতরটায় ঝাউ-দেবদারুর পাতা আর ঝুরি বিছিয়েই তৈরি করা হয়েছে পুরু আর নরম একটা জাজিম। আটজোড়া দাঁড় সামনে জলে পড়ছে, প্রায় যেন পিছলে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ক্যানুকে। শক্ত হাতে হাল ধ'রে আছে আরো-একজন। সে মাওরি, ঠিক তার সঙ্গীদের মতোই; শক্ত সুঠাম দেহ, বুকের খাঁচাটা চওড়া, যেমন চওড়া তার কাঁধ। বলিষ্ঠ বাহুতে আর পায়ের গোছে যেন নেচে বেড়াচ্ছে পেশীগুলো। কপালে জটিল ঝুরির মতো কত-যে রেখা কাটাকুটি ক'রে গেছে। সারা গায়ে উলকি-কাটা, এমনকী মুখেও। তার ভাবভঙ্গি দেখে এটা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয় যে সে হেজিপেঁজি কেউ নয়, বরং সাধারণ মাওরিদের চাইতে একটু আলাদাই। অর্থাৎ কোনো-একটা গোষ্ঠীর সর্দারই হবে সে। গায়ে তার বুনোকুকুরের ফারের আলখাল্লা, কানে পোখরাজের দুল, আর মাওরিরা যাকে পুনা পাথর ব'লে সেই পাথরের মালা গলায়, তার কাঁধে ঝুলছে একটা বন্দুক, নিশ্চয়ই ইংরেজদের কারখানাতেই তৈরি—নইলে এরা আর আগ্নেয়াস্ত্রর নির্মাণকৌশল জানবে কী ক'রে, আর আছে একটা দু-হাত লম্বা খঞ্জর—তার দু-দিকের ফলাতেই ধার, রোদ প'ড়ে ঝিকিয়ে উঠছে ফলাটা, আর সবুজ পাথরের হাতলটাও রোদ্দুরে ঝলমল ক'রে উঠেছে।

সর্দারের পাশে ব'সে আছে আরো নজন সশস্ত্র যোদ্ধা। যারা দাঁড় টানছে তারা নিশ্চয়ই সর্দারের অনুচর—যোদ্ধারা যদি সহযোগী হয়, এরা তবে অনুগত প্রজা।

আর ক্যানুর, ঠিক মাঝখানে প'ড়ে আছে পা-বাঁধা দশজন শ্বেতাঙ্গ বন্দী—তাদের হাতে অবশ্য কোনো বাঁধন নেই। এঁরা আর-কেউ নন : অভিযাত্রীরা : লর্ড ও লেডি গ্লেনারভন, মেরি ও রবার্ট গ্রান্ট, মঁসিয় পাঞ্জয়ল, মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স, কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স, আর *ডানকানের* স্টুয়ার্ড অলবিনেট আর দুজন মাল্লা—উইলসন আর মূলারাডি।

কাল রাত্তিরে একটা মস্ত ভুল হ'য়েছিলো অভিযাত্রীদের। একে ঘুটঘুটে কালো রাত্রি, তায় পাঁজা-পাঁজা কুয়াশা, আর তারই জন্যে তাঁরা খেয়াল করেননি যে তাঁরা মাওরিদের একটা আড্ডায় ঢুকে পড়েছেন। তাঁরা ঘুমিয়ে পড়তেই মাওরিরা নিঃশব্দে এসে পাকড়েছে তাদের, পা বেঁধে ফেলেছে, কেড়ে নিয়েছে যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র, কিন্তু কোনোরকম শারীরিক নির্যাতন করেনি।

সর্দারের নাম *কাই-কুমু*—নামের মানে *দুশমনের হাত যে চিবিয়ে খায়*—আক্ষরিকভাবে খায় না হয়তো, কিন্তু আলংকারিক ও সম্প্রসারিত অর্থ দাঁড়ায় যে শত্রুদের ঠুটো ক'রে ফ্যালে। *কাই-কুমুর* মতো বেপরোয়া ডাকাবুকো লোক সহজে দেখা যায় না; যেমন দুর্ধর্ষ তেমনি দুর্দান্ত। ইংরেজরা তার মাথার জন্যে ইনাম ঘোষণা করেছে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—জীবিত বা মৃত তাকে ধ'রে দিতে পারলেই পুরস্কার। অতিসম্প্রতি মুখোমুখি একটা সংঘর্ষে হেরে যেতে হয়েছে *কাই-কুমুকে*, তাই সে তার কয়েকজন বিশ্বস্ত সহযোদ্ধাকে নিয়ে সে চলেছে ওয়াইকাতো নদীর উৎসের দিকে—সেখানে গিয়ে আরো লোকজন জড়ো ক'রে ফের গিয়ে আক্রমণ শানাবে।

পর-পর যত ঘটনা ঘটেছে, তাতে বোধহয় লর্ড গ্লেনারভনের আঁৎকে ওঠার ক্ষমতাটাও বিলুপ্ত হয়েছিলো। তাছাড়া, কপালের লেখা কে খণ্ডাবে—কপালে যদি আরো-নতুন-কোনো দুর্ভোগ লেখা থাকে, তবে তা-ই হবে। এ ঠিক সুখেদুঃখে-নির্বিকারবাদী *স্টোয়িকদের* মনোভাব নয়, বরং নিয়তিমানা কোনো মানুষের মনের ধাত। এবং এই মাওরিরা তো তাঁদের সঙ্গে গায়ে প'ড়ে কোনো বাড়তি দুর্ব্যবহারও করছে না, শুধু অস্ত্রগুলো ছিনিয়ে নিয়েছে, আর পা বেঁধে রেখেছে। সর্দারকে একবার জিগেসও করেছিলেন : 'আমাদের ধ'রে নিয়ে যাচ্ছো কেন? আমাদের নিয়ে তোমরা কী করবে?' উত্তরে সর্দার বেশ স্পষ্টগলায় ইংরেজিতেই বলেছিলো : 'ইংরেজদের হাতে আমাদের যারা বন্দী হ'য়ে আছে, তাদের সঙ্গে তোমাদের বদল করতে চাই। ইংরেজরা তোমাদের চায় কি না তারই ওপর তোমাদের জীবন নির্ভর করছে। বদল না-করতে চাইলে তোমাদের অবশ্য মেরে-ফেলা হবে।'

তার স্পষ্ট কথা শুনে লর্ড গ্লেনারভন এটুকু অন্তত বুঝেছিলেন যে আপাতত এদের হাতে তাঁর কোনো ভয় নেই। যতক্ষণ-না তারা বন্দী বদলাবদলির ব্যাপারটায় একটা ফয়সালা করছে, ততক্ষণ অন্তত তাঁদের কিছু করবে না। নিশ্চয় মাওরিদের যে-যোদ্ধারা ইংরেজদের হাতে বন্দী হ'য়ে আছে তাদের জীবন এদের কাছে বিশেষ-মূল্যবান। এবং তাই কোনো-একটা বিনিময়ের সুযোগ এরা সহজে হাতছাড়া করতে চাইবে না।

এই ওয়াইপা আর ওয়াইকাতো নদীদুটো নিউ-জিল্যাণ্ডের আদিবাসিন্দাদের বেজায় গর্বের বস্তু। ওয়াইকাতো নদী সবশুদ্ধ ২২০ মাইল অর্থাৎ ৩৫৪ কিলোমটার লম্বা—নর্থ আইল্যাণ্ডের উত্তরপশ্চিম থেকে বেরিয়ে এসে তাসমান সাগরে পড়েছে। ঠিক এমনি একটা নদী বেরিয়েছে সাউথ আইল্যাণ্ডের দক্ষিণপুব থেকে—সেটা ১৩৫ মাইল অর্থাৎ ২১৭ কিলোমিটার লম্বা—সোজা পুব-দক্ষিণপুব ধ'রে সেটা নেমে এসে পড়েছে প্রশান্ত মহাসাগরে। ওয়াইকাতোরই বুকে এসে পড়েছে ওয়াইপো। মানচিত্র দেখে এবং অন্য পর্যটকদের বিবরণ মনে করবার চেষ্টা ক'রে মঁসিয় পাঞয়ল অনুমান ক'রে নিতে চাচ্ছিলেন এই ওয়াইকাতোর উৎসমুখে কী আছে।

সর্দার যখন তার সহযোদ্ধাদের সঙ্গে কথা বলছিলো তখন দু-একটা কথা বারে-বারেই কানে ভেসে আসছিলো—তার মধ্যে এই কথা কটি কেমন যেন চেনা-চেনা লাগলো মঁসিয় পাঞয়লের : তুয়াকাউ, তুয়াহেনি পয়েন্ট, তুয়াই, তাইরাঙা। এ-সব নাম শুনে সবকিছু স্পষ্ট বোঝা না-গেলেও এটুকু মোটামুটি ধ'রে নেয়া গেলো নর্থ আইল্যাণ্ডের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দক্ষিণের দিকে চলেছেন তাঁরা—ওয়েলিংটন পেরিয়েই হয়তো, পার্বত্যঅঞ্চলে, সম্ভবত সেখানেই কোনো হ্রদ থেকে বেরিয়ে এসেছে ওয়াইকাতো নদী। যেভাবে সহজসাবলীল ভাবে ক্যানু ছুটেছে, তাতে রাতে বিশ্রামের সময় বাদ দিয়ে, অনুমান করা যায় দিন-চারেক পরে তাঁরা ওয়াইকাতোর উৎসমুখে গিয়ে পৌঁছুবেন।

এমনিতে সারাদিন ক্ষিপ্রবেগে চলে ক্যানু, যারা দাঁড় টানে তারা যে কী-রকম ওস্তাদ সেটা বোঝা যায় যে-রকম মসৃণ সাবলীল ছন্দে ক্যানু এগোয়, বোঝাই যায় কাই-কুমু তাদের এইজন্যেই দাঁড় বাইবার কাজে লাগিয়েছে, রাত হ'লেই তীরে এসে ক্যানু বেঁধে ডাঙায় তারা রাত কাটায়। এইভাবে দু-দিন কেটে যাবার পরে আরো-একটা ক্যানু এসে কাই-কুমুর নাগাল ধরলে। তারা যে সদ্য-কোথাও-থেকে লড়াই ক'রে ফিরছে, সে তাদের রক্তমাখা অস্ত্রশস্ত্র দেখেই অনুমান করা যায়। তারা কিন্তু বন্দীদের দেখে অযথা কোনো কৌতূহল দেখালে না, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাতেই তারা তন্ময়—উটকো কয়েকজন শ্বেতাঙ্গকে নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

তারও দু-দিন পরে ক্যানু পৌঁছুলো এমন-এক জায়গায় সেখানকার জল যেন সবসময়েই টগবগ ক'রে ফুটছে। বুড়বুড়ি উঠছে জলে, আর সেগুলো ফেটে গিয়ে কী-রকম যেন গ্যাস বেরুচ্ছে অবিশ্রাম। হাওয়ায় গন্ধকের গন্ধ, মাটিতে লৌহ আকরিকের রক্তিম আভা। দু-পাশের তীর ধ'রে সার-সার গেছে উষ্ণ প্রস্রবণ, ফুটন্ত জল ফোয়ারার মতো উঠে যাচ্ছে শূন্যে, আর সূক্ষ্মজাল জলের শীকরে রোদ্দুর ঠিকরোচ্ছে, ছিটিয়ে দিচ্ছে রামধনুর সাতরঙের বর্ণালি। নিউ-জিল্যাণ্ডের জ্যান্ত আগ্নেয়গিরি টোনাগারি আর ওয়াইকেরির জ্বালামুখ দিয়ে তপ্ত বাষ্প আর জ্বলন্ত তরল বেরুবার পথ না-পেয়ে যেন পাহাড়ের হাজার চিড় আর ফাটল দিয়ে হাজার ধারায় বেরিয়ে আসছে টগবগে জল আর বাষ্প। হাওয়া পর্যন্ত কেমন যেন থমথমে, তপ্ত, এমনকী নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। তারই মধ্যে প্রায় আড়াই মাইল পথ গিয়ে বাঁক ফিরে হ্রদের মধ্যে ঢুকলো ক্যানু—দু-পাশে দুটো বিশাল-উঁচু পাহাড়, রক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে মাঙ্গাকিনো আর মাঙ্গাপেহি, আর তারই মধ্যে এই হ্রদ। হ্রদের একপাশে একটা কুঁড়ে। তার মাথায় উড়ছে একটা নিশেন।

মাওরিদের জাতীয় পতাকা।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

## দুই

# প্রাণ হাতে ক'রে পালিয়ে

হ্রদের দুই পাশে উত্তুঙ্গ দুই পর্বত—মাঙ্গাকিনো আর মাঙ্গাপেহি, তার একটু দূরেই মোকাই—একটা জনপদ। নর্থ আইল্যাণ্ডের প্রায় মাঝখানে এই দুটি পাহাড়—অকল্যাণ্ড থেকে যতটা দূরে, প্রায়-ততটা দূরেই আছে ওয়েলিংটন। অর্থাৎ মাওরিরা দু-দিক থেকে ইংরেজদের হাতে মার খেতে-খেতে শেষটায় একেবারে নর্থ আইল্যাণ্ডের দুর্গম-মাঝখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে—সম্ভবত শ্বেতাঙ্গ কোনো পর্যটক এখনও এখানে পা দেয়নি, হয়তো জানেই না যে এখানে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সানুদেশে স্বাধীন মাওরিরা তাদের স্বাধীনতার শেষ লড়াই লড়বার জন্যে এসে জড়ো হয়েছে।

এতটা রাস্তা পেরিয়ে এসে এখানে ঢোকবামাত্র মনে হয় যেন ভূস্বর্গে এসে পৌঁছেছে কেউ। বিস্তীর্ণ শনখেতে ফুল ফুটে আছে, আর সেই ফুলের মধু খাবে ব'লে হরেক রঙের জানা-অজানা পাখি উড়ছে সেখানে। শনের ডাঁটা থেকে আঠা হয়, প্রায় মোমের মতো ঘন—কত-যে কাজে লাগে। পাতা থেকে তৈরি হয় কাগজ, আর শুকনো পাতা থেকে হয় জ্বালানি, শন কেটে পাকিয়ে দড়ি আর সুতো দিয়ে বোনা হয় গায়ের ঢোলা জামা, মাদুর, চাটাই। মাওরিরা লাল আর কালো রঙে রাঙিয়ে নেয় এই জামা, আর এটাই সম্ভবত তাদের প্রিয়পসন্দ—কেননা অনেকেরই পরনে এই লাল-কালো আলখাল্লা। একটা গোটা অর্থনীতিই শধু নয়, জীবনযাপনের যাবতীয় উপকরণ যেন জোগায় এই শনখেত—যা গজায় উর্বর জলাভূমিতে—কোনো হ্রদ বা নদীর ধারে—কিংবা সমুদ্রতীরে।

তীর থেকে দুই ফার্লং দূরে পাহাড়ের ঢালে মাওরিদের একটা নগরদুর্গ—তাদের ভাষায় তারা তাকে ব'লে পাহ্। এই পাহ্ ঘেরা তিন দিক থেকে তিন পল্লা বেড়া দিয়ে—বাকি দিকটা যেন পাহাড়ের ঢালে বসানো।

প্রথম বেড়া ছুঁচলো লাঠি দিয়ে তৈরি—প্রায় পনেরো ফিট উঁচু। তারপর শক্ত খুঁটির বেড়া, সবশেষে পাকানো বেত বেঁকিয়ে আরেকটা পল্লা। তারই মধ্য দিয়ে গেছে ভেতরে যাবার দরজা। বেড়া তিনটে পেরিয়ে গিয়ে দেখা যায়, পাহাড়ের গায়েই সমতল খানিকটা জায়গা। সেখানে পর-পর সাজানো রয়েছে চল্লিশটা কুঁড়েঘর।

কিন্তু যে-দৃশ্যটা দেখে আতঙ্কে বন্দীদের চোখ বিস্ফারিত হ'য়ে গেলো, সেটা আর কিছু নয়, দ্বিতীয় বেড়ার খুঁটিগুলোর ওপরে সারি-সারি গেঁথে-রাখা নরমুণ্ড, শূন্য কোটর থেকে মণিবিহীন চোখ মেলে পলকহীন যেন বন্দীদের দিকেই তাকিয়ে আছে নরমুণ্ডগুলো। শত্রুপক্ষের লোকদের মুণ্ড কেটে এইভাবে সাজিয়ে-রাখার রীতিই আছে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাওরিদের মধ্যে—তারা সেই রহস্য বার ক'রে ফেলেছে, সেই প্রক্রিয়াটা, যার সাহায্যে নৃমুণ্ডের অভ্যন্তর থেকে মগজ এবং চোখের কোটর থেকে চোখের তারা বার ক'রে এনে দীর্ঘ দিন অবিকৃত রেখে দিতে পারে মুণ্ডগুলো। আর এগুলো তো তাদের পুঁথিপুরাণইতিহাসের অংশ—একেকটা মুণ্ডর সঙ্গে জড়ানো আছে শৌর্যবীর্য-দেশদ্রোহিতা-বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম—প্রত্যেকটা মুণ্ডই যেন একেকটা কাহিনী শোনাতে চাচ্ছে।

কাই-কুমুর কুঁড়েঘরটা এই নগরদুর্গ পাহ্-এর একেবারে শেষমাথায়। দৈর্ঘ্যে বিশ ফিট, প্রস্থে পনেরো ফিট আর উচ্চতায় দশফিট—এই কুঁড়ের ঢাল ঘরের দেয়াল ছুঁয়ে মাটি অব্দি নেমে গিয়েছে। কুঁড়ের সামনে প'ড়ে আছে খানিকটা ফাঁকা জমি, সেখানে দরকার হ'লে অন্য কুঁড়ে থেকে লোকজন এসে জমায়েৎ হয়, কখনও-কখনও এই ফাঁকা জমিতেই ব্যবস্থা হয় রণসাজে-সেজে কুচকাওয়াজের। ঘরের দেয়ালগুলো কিন্তু অজস্র ছবিতে ভরা—যেমন আছে গাছপালা জীবজন্তুর ছবি—ঐ-তো একটা কিউয়ি পাখির ছবি—তেমনি আছে ঘটনাপরম্পরারও ছবি—যেন সরল ও গতিময় টানটোনের মধ্যে শিল্পী ধ'রে রাখতে চেয়েছে তাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি। দুরমুশপেটানো মাটির মেঝেয় শুকনো ঝাউপাতা দেবদারুপাতা বেছানো, আর তার ওপরেই পেতে রাখা হয়েছে টাইফা-পাতার মাদুর, লাল আর কালোয় তার ওপরেও আছে অলংকরণ। মেঝের ঠিক মাঝখানটাতেই পাথরঢাকা একটা মস্ত গর্ত—এটাই তাদের চুল্লি—আর তারই মাথাবরাবর চালেও একটা ফোকর—সেখান দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যায় বাইরে। নর্থ আইল্যাণ্ডের প্রচণ্ড ঠাণ্ডার দিনে ঘর গরম রাখবার জন্যে এভাবেই ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে এরা—এদের *ফায়ারপ্লেস*ও কোনোদিক থেকেই কম কাজের নয়।

যেখানে তার শোবার ব্যবস্থা-করা, তার পাশেই তার ভাঁড়ারঘর। অনেক ধরনের উদ্ভিদ, গাছের পাতা, শেকড়বাকড় জমানো রয়েছে সেখানে। একপাশে রসুই পাকাবার জন্যে তোলাউনুন রয়েছে—আর তারপরেই তার *কোর‍্যাল*—শুওর ছাগল রাখার জায়গা—সেই যবে কাপ্তেন কুক এই জীবজন্তুগুলোকে নিউ-জিল্যাণ্ডে আমদানি করেছিলেন, সেই-থেকেই এরা ক্রমাগত বংশবৃদ্ধি ক'রে মাওরিদের খাদ্য জুগিয়ে গেছে।

কাছেই ফাঁকা একটা কুঁড়েঘরে বন্দীদের নিয়ে ঢোকানো হ'লো। এখনও অব্দি মাওরিদের কাছ থেকে ব্যবহারে ভয় পাবার মতো কিছু পাওয়া যায়নি, আবার আশ্বস্ত হবার মতো কোনো ভরসাও কোথাও জোটেনি—তাঁদের সম্বন্ধে সকলেরই মধ্যে নির্লিপ্ত ও নির্বিকার-একটা ঔদাসীন্যের ভাব বন্দীরা লক্ষ করেছেন। সোজা একেবারে *পাহ্*-এর অর্থাৎ নগরদুর্গের মধ্যে এনে হাজির করেছে ব'লেই বন্দীদের উৎকণ্ঠার ভাবটা বেশি। কী মর্জি হবে এদের, কে জানে। শুধু-কি সর্দারের ইচ্ছেতেই সবকিছু হয়, না কি অন্যসকলের কাছ থেকেও মতামত চাওয়া হয়? ভাবগতিক দেখে কিছুই বোঝবার জো নেই। বন্দীবিনিময়ের প্রস্তাবটায় যদি ইংরেজ কর্তৃপক্ষ রাজি না-হয়, তাহ'লে নিশ্চয়ই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরা তাঁদের গায়ে আঁচড়টি না-কেটেই ছেড়ে দেবে না? মনের মধ্যে আরো-কোনো দুরভিসন্ধি নেই তো?

কাই-কুমুর মনের মধ্যে কী আছে না-জানা গেলেও অন্যদের মনের ভাব যে কী, তা একটু জানা গেলো যখন দল বেঁধে মেয়েরা এসে হাজির হ'লো বন্দীদের দেখতে। কোলাহল-কলরবের মধ্যে থেকে দু-একটা যা ইংরেজি কথাবার্তা কানে এলো, তা থেকে বোঝা গেলো—এরা কেউই মোটেই করুণাময়ী বা মমতাময়ী দেবীপ্রতিমা নয়—বরং সকলেরই সাধ যেন বন্দীদের প্রকাশ্যে মুণ্ডচ্ছেদ হয়। প্রতিশোধ নেবার জন্যে তেরিয়া মেজাজ একেকজনের। এদেরই কারু ছেলে, কারু ভাই, কারু স্বামী ইংরেজদের আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে প্রাণ হারিয়েছে—এতদিন ধ'রে এই সংঘর্ষ চলেছে যে কতজনের যে জীবননাশ হয়েছে তার ঠিক নেই; নানারকম নিগ্রহ-নিপীড়ন হয়তো সহ্য করতে হয়েছে এদের প্রত্যেককেই, মৃত্যু হানা দিয়েছে অনবরত, আর ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তাদের আপনজনদের। এদের চক্ষু দিয়ে যদি অনবরত দয়ার অশ্রু দরদর ক'রে ব'য়ে যেতো, তাহ'লেই বরং অবাক হবার কিছু থাকতো। না-জেনে, অপ্রস্তুত অবস্থায়, নিউ-জিল্যাণ্ডের ইতিহাসের এমন-একটা দুঃসময়ে তাঁরা এখানে এসে পা দিয়েছেন, যে এখন তাঁদের নিজেদেরই জীবন বিষম একটা সংকটে পড়েছে।

বেশিক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হ'লো না। একটু পরেই সামনের ফাঁকা মাঠটায় দলে-দলে মাওরিরা এসে হাজির হ'লো, আর তাদের আসতে দেখে মাওরি মেয়েরাও গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিলে। নানা বয়সের সব মানুষ। নেহাৎই কচি-কচি সব কিশোর থেকে মুখে বলিরেখার কুঞ্চনেভরা অতিবৃদ্ধ মাওরি—কেউই বোধহয় বাদ যায়নি। সকলেরই মুখ গম্ভীর, শোকাচ্ছন্ন। কেউ এখানে ফুর্তি করতে আসেনি, এটা তাদের জীবনে উৎসবের কোনো মুহূর্ত নয় যে তারা আনন্দের হাট বসাবে। যারা লড়াই করতে গিয়েছিলো, তাদের মধ্যে অধিকাংশই আর ফিরে আসেনি। কাই-কুমু নিশ্চয়ই তার সঙ্গে মাত্র এই ক-জন সহযোদ্ধা নিয়ে যায়নি—তাকেও রণস্থল থেকে ফিরতে হয়েছে বেশিরভাগকেই পেছনে ফেলে রেখে।

কাই-কুমু কী যেন বললে সবাইকে সম্ভাষণ ক'রে; শান্ত হ'য়ে চুপচাপ তার কথা শুনলে সবাই। কিন্তু তার কথা থামতেই শুরু হ'য়ে গেলো বিষম কোলাহল—সকলেই যেন একসঙ্গে কথা কইতে চাচ্ছে; বুড়ো-বুড়িরা কেউ কপাল চাপড়াচ্ছে, কেউ-বা চাপড়াচ্ছে বুক। হাত-পা ছুঁড়ে অন্যরা যা বলছে, তা জানবার জন্যে হয়তো ভাষাও জানতে হয় না—কেননা তাদের বলার স্বর ক্রুদ্ধ ও রুষ্ট, প্রায় যেন সহ্যের শেষসীমায় এসে পৌঁছেছে তারা।

বন্দীরা তাঁদের খুপরিটা থেকে সবাই যেন চোখ দিয়ে গিলছিলেন। কানে যা আওয়াজ আসছিলো, তার মর্মার্থ বুঝতে এখন আর বাকি নেই। জমায়েতের বেশির



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাগেরই মনোভাব ঠিক তাঁদের অনুকূলে নয়। তবে তাঁদের নিয়ে এরা যে কী করবে এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কারণ আবার একটা হাত তুলে কাই-কুমু সবাইকে থামিয়ে দিয়েছে, তারপর সবাই চুপ করলে পর কী যেন বলেছে তাদের হাত-পা নেড়ে। তারপরেই দেখা গেলো কাই-কুমুর পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা একজন মাওরি এই বন্দীদের খুপরিটার দিকে আসছে।

এখনই তবে জানা যাবে জমায়েতের সিদ্ধান্ত কী হ'লো।

হঠাৎ লেডি হেলেনা লর্ড এডওয়ার্ডের কাছে এসে তাঁর হাতটা ধ'রে শান্ত কিন্তু ধরাগলায় বললেন, 'এডওয়ার্ড, অন্তত একটা জিনিশ তোমাকে করতেই হবে। জীবন থাকতেও আমাকে বা মেরিকে এই মাওরিরা যেন তোমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে যেতে না-পারে। মরতে হ'লে সবাই একসঙ্গে মরবো।' তারপর জামার ভাঁজের মধ্য থেকে একটা ছোট্ট চকচকে রিভলভার বার ক'রে লর্ড এডওয়ার্ডের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন : 'এই রিভলভারটা আমি আমার পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলুম। এরা কেউ আমার গায়ে হাতও দেয়নি, আমাকে তেমন ক'রে খানাতল্লাশও করেনি—সেইজন্যেই এতক্ষণ লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলুম। এখন এটা আমি তোমাকেই দিলুম। তুমি এটা দিয়ে যা ভালো বোঝো, তা-ই কোরো।'

লেডি হেলেনার হাতে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে একটা চাপ দিয়ে লর্ড এডওয়ার্ড চট ক'রে সেটা তাঁর পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে ফেললেন। তাঁর মুখটা কি-রকম কালো হ'য়ে গিয়েছে, শুকনো, ছায়াবিধুর আর গম্ভীর।

ঠিক সময়মতোই রিভলভারটা লুকোতে পেরেছিলেন লর্ড এডওয়ার্ড, কেননা পরক্ষণেই খুপরিটার দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো একজন মাওরি, লোকটা তাঁদের চেনা —ক্যানুতে সে কাই-কুমুর সঙ্গেই ছিলো, হয়তো তার ডানহাতই সে। সে ইঙ্গিতে সবাইকে বললে তাকে অনুসরণ ক'রে বাইরে বেরিয়ে আসতে।

তারই পেছন-পেছন, জমায়েতের একটা ধার দিয়ে, কাই-কুমুর কাছে গিয়ে হাজির হলেন সবাই। জমায়েতের লোকেরা চুপচাপ হা ক'রে তাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে—তাদের মধ্যে উত্তেজনার একটা ঢেউ খেলে গিয়েছে, যেই তাঁরা পর-পর এসে দাঁড়িয়েছেন কাই-কুমুর সামনে। তাদের চোখমুখ দিয়ে আগুন ঝরছে; মানুষের দৃষ্টি যদি কাউকে ভস্ম ক'রে ফেলতে পারতো, তাহ'লে এক্ষুনি হয়তো তাঁরা জীবন্তই ঝলসে মরতেন।

কাই-কুমুকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের অনেককেই আগে তাঁরা দেখেছেন ক্যানুতে। পরে মাঝপথে আরো-একটা ক্যানুতে ক'রে যারা এসে যোগ দিয়েছিলো তাদেরও কাউকে-কাউকেও সেখানে জটলার মধ্যে দেখা গেলো। দ্বিতীয়-ক্যানুর সর্দারটিকে লর্ড এডওয়ার্ডের মনে ছিলো, কেননা প্রায় একটা দৈত্যের মতো আকার তার, মুখে ভয়-ডরের কোনো লেশ নেই, সর্বাঙ্গের উলকিগুলোয় ভীষণ-সব জীবজন্তুর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হা করা মুখ, যেন গিলে খাবে শত্রুকে। তার বয়েসও বেশি নয়, অন্তত চল্লিশের বেশি হবে না। হট্টাকট্টা জোয়ান। পথে কাই-কুমুকে দেখা গিয়েছিলো এর সঙ্গে বেশ সমীহ ক'রেই কথা বলতে। নিশ্চয়ই দলের লোকদের ওপর তার প্রচণ্ড প্রভাব আছে—কাই-কুমু তাতে যদি মনে-মনে একটু ঘাবড়ে গিয়েও থাকে, মুখে সেটা সে প্রকাশ করেনি—তবে একে চটিয়ে দেবার মতোও কিছু করেনি, এমন খাতির ক'রে চলেছে যেন সে কিছুতেই কাই-কুমুর ওপর খেপে না-যায়। মাওরিরা যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকার ও দাবিদাওয়া নিয়ে লড়ছে, তখন সে অহেতুক কোনো গৃহযুদ্ধের কারণ ঘটতে দিতে চায় না—দুজনের মধ্যে দ্বেষবিদ্বেষ রেষারেষি যা আছে তা না-হয় আপাতত চাপাই থাকুক। এই বেপরোয়া মাওরিটির নাম কারা-টিটি—আর এমন নামেই মালুম তার প্রকৃতিটা কী—কারণ তাদের ভাষায় কারা-টিটি কথার মানে *রগচটা, বদমেজাজি*। সে এখন কাই-কুমুর পাশে দাঁড়িয়ে বেশ-তালেবর ভঙ্গিতে সবকিছুর ওপর নজর রেখে যাচ্ছে। বন্দীদের আসতে দেখেই তার মুখচোখে উৎকট-একটা হাসি ফুটে উঠলো।

লর্ড গ্লেনারভন কাছে এসে দাঁড়াতেই কাই-কুমু জিগেস করলে : 'তোমরা কারা? *ইংলণ্ডের লোক?*'

'হ্যাঁ।'

'তোমাদের যদি আমরা ইংরেজ সরকারের হাতে তুলে দিই, তবে কি তারা এর বিনিময়ে আমাদের দলের লোকদের ছেড়ে দেবে? বিশেষ ক'রে আমাদের পুরুৎ তোহোনগাকে?'

'জানি না।'

'জানো না মানে?'

'আমরা নেহাৎই সাধারণ লোক। আমরা যে এখানে এসেছি, তা-ই ইংরেজ সরকারের কেউ জানে না। তাছাড়া আমরা কেউ জাঁদরেল সেনাপতিও নই, পুরুৎও নই।'

'কিন্তু আমরা তোমার বদলে আমাদের পুরোহিতকে ফেরৎ চাই। তোমাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'আমি কী ব্যবস্থা করতে পারি—সরকারের কাছে আমার তো কানাকড়িও দাম নেই।' তারপরেই লর্ড গ্লেনারভনের চোখ প'ড়ে গেলো লেডি হেলেনা আর মেরির ওপর। অমনি গলার স্বর পালটে তিনি বললেন : 'তবে সরকার হয়তো এঁদের কথা বিবেচনা করবেন।' মেয়েদের দিকে দেখালেন তিনি। 'এঁরা আমাদের দেশের অভিজাত সমাজের মানুষ—সরকারের কাছে নিশ্চয়ই এঁদের মূল্য অনেক।'

কথাটা কানে যেতেই কাই-কুমুর মুখে একটা ধূর্ত মৃদুহাসি খেলে গেলো।

'তুমি কি আমাদের বোকা ঠাউরেছো? ভেবেছো, যা-খুশি তা-ই বাৎলে দিয়ে পার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাবে ? কাই-কুমুর চোখকে ধুলো দেবে?' শেষ কথাটা বলবার সময় কাই-কুমুর গলার স্বরে যেন যতরাজ্যের উষ্মা ঝ'রে পড়লো। আঙুল তুলে লেডি হেলেনাকে দেখিয়ে সে বললে : 'এ তো তোমার বৌ—এ যদি কোনো ওপরমহলের মেয়ে হয়, তাহ'লে তুমি বুঝি ওপরমহলের কেউ নও ?'

লর্ড গ্লেনারভন কিছু বলবার আগেই কাই-কুমুর পাশ থেকে এগিয়ে এলো কারা-টিটি, সোজা গিয়ে লেডি হেলেনার একটা হাত ধ'রে বললে : 'এ যদি ওর বৌ না-হয়, তবে তো বোঝাই যাচ্ছে—এ আমার বৌ—'

কারা-টিটি আর কী বলতো, কোনোদিনই জানা যাবে না। কেননা তার কথা শেষ হবার আগেই তড়িৎগতিতে লর্ড গ্লেনারভনের হাতে উঠে এসেছে সেই খুদে রিভলভারটা, আর এমনকী ঠিকমতো তাগ ঠিক না-ক'রেই লর্ড গ্লেনারভন ঘোড়াটা টিপে দিয়েছেন : 'গুড়ুম !' এবং, পরক্ষণেই, মাটিতে লেডি হেলেনার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে কারা-টিটির প্রাণহীন দেহ, ব্যাপারটা ঘটতে সময় লেগেছে বোধহয় চোখের একটা পলক, কেননা কারা-টিটির দেহটা যখন মাটিতে আছড়ে পড়েছে তখনও রিভলভারের নল থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

কিন্তু ততক্ষণে লর্ড গ্লেনারভনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে কাই-কুমুর দেহরক্ষীরা—এক হ্যাঁচকা টেনে কেড়ে নিয়েছে তাঁর হাতের রিভলভারটা। তারা হয়তো লর্ড গ্লেনারভনকে ছিঁড়েই ফেলতো, যদি-না সেই মুহূর্তে শোনা যেতো কাই-কুমুর বজ্রনির্ঘোষ : 'ছাড়ো ! ছাড়ো ! এর গায়ে হাত দেয়া চলবে না ! *অমঙ্গল ! অমঙ্গল !*'

আর যেন মন্ত্রের মতো কাজ করেছে কথাগুলো—প্রায় ছিটকেই লর্ড গ্লেনারভনের কাছ থেকে স'রে গিয়েছে দেহরক্ষীরা, যদি ধর্মবিরুদ্ধ ব'লে কাউকে স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ ক'রে দেয়া হয়, যদি *ট্যাবু* বলা হয় তাকে, যদি বলা হয় অমঙ্গল, যেমন বলে পলিনেশিয়ার আদিবাসিন্দারা, তবে কেউ তাকে ছোঁয় সাধ্য কী !

*ট্যাবু* কথাটা এসেছে পলিনেশিয়ার দ্বীপের আদিবাসিন্দার ভাষা *তোঙ্গান* থেকে—আর তাদের এই *ট্যাবুর* প্রয়োগই দেখা গেছে ভিন্ন-ভিন্ন দ্বীপে ও দেশে—তাদের আদিবাসীদের মধ্যে, তারা কখনও বলেছে অমঙ্গল বা অভিশাপ, কখনও-বা বলেছে ধর্মবিরুদ্ধ বা দেবতার রোষ, আর কতগুলি বস্তু বা জীবকে পুরে দিয়েছে নিষেধের পটভূমিকায় ।

আর এমন না-ক'রে তাদের কোনো উপায় ছিলো না। বেঁচে থাকার জন্যেই তাদের এমন ক'রে নিতে হয়েছিলো। আর এই পুরো ধারণাটা উৎসারিত হয়েছিলো আদিম একটা প্রবৃত্তি—ভয় থেকে, আতঙ্ক থেকে। বিশেষ ক'রে কাউকে যদি থাকতে হয় কোনো একটা দ্বীপে, যেখানে সমুদ্র গর্জায় আক্রোশে, ঝঞ্ঝা হানে ধ্বংস, অগ্ন্যুদ্গার করে আগ্নেয়গিরি, যেখানে যা অজানা, অচেনা তারই মধ্য থেকে হঠাৎ দুম ক'রে বেরিয়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসে সর্বনাশ, যেমন ঐ-যে শিকড়বাকড় তা থেকে যদি আসে গরল, ঐ-যে লতাপাতা ঐ-যে সুন্দর দেখতে ফল তার ভেতর লুকিয়ে থাকে হলাহল, তাহ'লে সাবধান না-থেকে উপায় নেই, কেননা সাবধানের মার নেই—আবার মারেরও তো সাবধান নেই —কোত্থেকে যে সে কখন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক কী। যেমনভাবে মা তার শিশুকে ভয় দেখায় না-না, আগুনে হাত দিতে নেই, তেমনিভাবেই কোনো-কোনো গোষ্ঠীকে ঠিক ক'রে নিতে হয়—না-না, এটা ছোঁয়াও চলবে না, ছুঁলেই বিপদ হবে, সর্বনাশ হবে, ভয়ংকর-কিছু-একটা হবে যেটাকে আর-কিছুতেই শামাল দিয়ে ওঠা যাবে না। এমনতর যে হ'লো, তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এই রুক্ষ বন্ধুর সিন্ধুজলে ঘেরা মাটির একরত্তি একটা জায়গাতে এসেই প্রাণ তার জয়ের নিশান উড়িয়েছে, আর সে-জায়গাটাকে সুরক্ষিত রাখতে হবে, সাবধানে আগলে-আগলে রাখতে হবে, ঐ তো দ্যাখোনি সেবার বন্যায় সব কুঁড়েবাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে গেলো, নদী কী-রকম ফুলে ফেঁপে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো গোটা লোকালয়ের ওপর—ফলে নদীকে কখনও চটতে দিলে চলবে না, দেখতে হবে কিছুতেই নদীর যেন আবার মেজাজ খারাপ না-হয়, সে যেন আবার সকলের ওপর রাগ না-ক'রে বসে ! তেমনি আগুনের পাহাড়টাকেও চটিয়ে দিলে চলবে না, ঝড়ের রাতের ঐ বাজবিদ্যুৎকেও না; বরং যে-সব জায়গায় থাকলে অতর্কিতে মরণ এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, সে-সব জায়গা থেকে হাজার হাত দূরে থাকাই ভালো, এখনও তো ভালো ক'রে জানা নেই কেন মাটি কেঁপে ওঠে হঠাৎ-হঠাৎ আর পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে বড়ো-বড়ো পাথরের চাঁই, ভেঙে পড়ে গাছপালা, ঘরবাড়ি, গোটা-গোটা সবপাহ। অমঙ্গল! অমঙ্গল ! ঘোর অমঙ্গল ! ছিটকে দূরে স'রে এসো তার কাছ থেকে—কিছুতেই আর তার সঙ্গে গা ঘেঁসাঘেঁসি করতে যেয়ো না--বন্ধুভাবেও না, শত্রুভাবেও না—জানো না তো কীসে সে খেপে উঠবে, তারপর একেবারেই আর বাগ মানানো যাবে না তাকে।

আর এই বোধ থেকেই জন্ম নিলো রীতিনীতি পালপার্বণ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান। কেননা কাকে কীভাবে ছুঁলেই যে তার ভেতর জেগে ওঠে প্রচণ্ড অতিপ্রাকৃত শক্তি অথবা সে দূষিত হ'য়ে গিয়ে সবকিছু বিপজ্জনকভাবে নষ্ট ক'রে যায়—তার কোনো হদিশই তো জানা নেই। ন্যায়নীতিই হোক, রুচিকুরুচিই হোক—কোনো-কোনো জিনিশ তাই গর্হিত, কোনো-কোনো কাজের মধ্যে তাই মারাত্মক ঝুঁকি আছে, কোনো-কোনো বস্তুর মধ্যে তাই লুকিয়ে আছে অপরিসীম রহস্যময় কোনো শক্তি, মানুষের-চাইতেও-বড়ো,—যেটা হয়তো পান থেকে চুন খসলেই লাগামছেঁড়া কোনো দুর্যোগের মতো ধেয়ে আসবে।

আর এই মঙ্গল-অমঙ্গলের বোধই ধ'রে রেখেছে গোটা সমাজটাকে।

যে-মুহূর্তে তাই কাই-কুমু চেঁচিয়ে উঠলো : 'ছাড়ো-ছাড়ো! এর গায়ে হাত দেয়া চলবে না ! *অমঙ্গল! অমঙ্গল !*', অমনি তার দলের লোকেরা আঁৎকে উঠে পেছিয়ে এলো,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লর্ড গ্লেনারভনকে ছেড়ে দিলো।

লর্ড গ্লেনারভনকে ধ'রে তার দলের লোকেরা যখন ছিঁড়ে ফেলতে গেছে, তখনই কেন কাই-কুমু *অমঙ্গল! অমঙ্গল!* ব'লে চেঁচিয়ে উঠেছে? সে কি তবে ভেবেছে যে তাঁর মধ্যে অতিপ্রাকৃত কোনো শক্তি আছে—যার বলে নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও জামার ভেতর থেকে বার-ক'রে এনেছেন আগুনওগরানো রিভলভার? না কি সে ভেবেছে, লর্ড গ্লেনারভনকে মেরে ফেললে কিছুতেই আর দরকষাকষি করা যাবে না ইংরেজদের সঙ্গে, তাঁর বিনিময়ে মুক্তি কিনে-আনা যাবে না তাদের জাদুজানা অসীম শক্তিধর পুরুৎপ্রধান তোহোনগা'র? না কি সে হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে বসেছে এই লর্ড গ্লেনারভনের জন্যেই এখন অপসৃত হয়েছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী, তারই পদাকাঙ্ক্ষী রগচটা ঐ কারা-টিটি, আর তাই এইমুহূর্তে সে কৃতজ্ঞতার বশেই প্রাণে মারে ফেলতে চায়নি লর্ড গ্লেনারভনকে?

কারণ যা-ই থাক না কেন, কাই-কুমুর নির্দেশে মাওরিরা লর্ড গ্লেনারভনের সঙ্গে অন্য বন্দীদেরও টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেলো পাহাড়ের ঢালে, আরো-ওপরে, যেখানে তাদের দেবতার মন্দির। তারপর মন্দিরের ভেতরে তাঁদের ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে চ'লে গেলো মাওরিরা—বাইরে কড়াপাহারায় রইলো সশস্ত্র একদল প্রহরী।

আর ঠিক তক্ষুনি লর্ড গ্লেনারভন আবিষ্কার করলেন, মঁসিয় পাঞ্জয়ল আর রবার্ট ছাড়া তাঁরা সবাই আছেন এখানে। মেরির অবস্থা ক্রমশই সঙিন হ'য়ে উঠছে। আর তাকে সান্ত্বনা দেবার মতো কোনো কথাও ঠিক খুঁজে পাচ্ছেন না লেডি হেলেনা। জন ম্যাঙ্গলস সমুদ্রের তুলকালাম ঝড়েও কোনো ভয় পান না, এখন তিনিও কী-রকম যেন ঘাবড়ে গিয়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছেন। মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌সকে সবাই জানে হাজার বিপদেও চিরকাল মাথাঠাণ্ডা রাখেন, আর মাথা হয়তো এখনও তাঁর ঠাণ্ডাই আছে, কিন্তু এটা তিনি জানেন না মাঙ্গাকিনো আর মাঙ্গাপেহির মাঝখানে, এই পাহাড়ঘেরা উপত্যকায়, মাওরিদের এই মন্দিরে এইভাবে যে তিনি বন্দী হ'য়ে আছেন—এই অবস্থায় তিনি ঠিক কী করবেন। কারা-টিটিকে ও-রকম অতর্কিতে অপ্রত্যাশিতভাবে হত্যা করার জন্যে লর্ড গ্লেনারভনকে একটা মাশুল দিতেই হবে, এবং সেটা মৃত্যু—আর একবার যদি তাঁকে এরা হত্যা করে, তবে অন্যদেরও এরা নিশ্চয়ই ছেড়ে কথা কইবে না। কাই-কুমুর মনের মধ্যে যে সত্যি কী আছে, সেটা অনুমান করাও অসম্ভব—যতই 'অমঙ্গল! অমঙ্গল!' ব'লে সে চেঁচিয়ে *ট্যাবুর* স্মরণ নিক, তাঁদের সে অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে দেবার জন্যেই নিশ্চয়ই এখানে বন্দী ক'রে আনেনি। আর—কোথায় গেছে রবার্ট গ্রান্ট—আর সেই সঙ্গে, ঐ আধপাগলা ফরাশি পণ্ডিত—জাক পাঞ্জয়ল? তাদের কি এর মধ্যেই বধ্যভূমিতে নিয়ে গেছে এরা? কোথায় তাহ'লে সেই বধ্যভূমি?

এইসব বিদঘুটে সব ভাবনায় তাঁর মাথার মধ্যেটা কেমন যেন অস্থির হ'য়ে উঠতে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাচ্ছে। ছটফট ক'রেই কেটেছে সারা রাত—কিন্তু রবার্ট আর জাক পাঞ্জয়লের কী হ'লো, সেটা জানবার কোনো উপায় খুঁজে পাননি মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স—বাইরে যে সশস্ত্র যোদ্ধার দল পাহারা দিচ্ছে, তারা হয়তো জানে ঐ দুজনের হদিশ—কিন্তু তাদের জিগেস করবার কোনো সুযোগ হয়নি—কেননা তারা কখনও এমনকী এই বন্দীশালার দরজার কাছেও আসেনি।

অথচ সময় যখন থেমে গেছে ব'লে মনে হচ্ছে, তখনও একসময় ভোর হ'য়ে এলো। মাওরিদের দিক থেকে তবু কোনো সাড়া এলো না। সারাদিন কাটলো সেই অস্থির জিজ্ঞাসায়—কী করতে চাচ্ছে এরা, তাঁদের বন্দী ক'রে রেখে? যদি দেবতার কাছে বলি দেবে ব'লেই ঠিক ক'রে থাকে, তাহ'লে তাদের আর খোঁজখবর নিচ্ছে না কেন? পুরুৎরা কি কোনো বিশেষ লগ্নের অপেক্ষায় আছে এখন? তারা কি এমন-কোনো বিশেষ ক্ষণের অপেক্ষা করছে, যখন এই-যারা তাদের অমঙ্গল ডেকে এনেছে, তাদের মহাধুমধাম ক'রে বলি দিলে দেবতারা আর রুষ্ট হবেন না? না কি বন্দী-বিনিময়ের ভাবনাটাই কাই-কুমু এখন বাতিল ক'রে দিয়েছে?

নিজেদের মধ্যে কথা বলতেও ইচ্ছে হচ্ছিলো না। মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌সের শুধু মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছিলো, কারা-টিটিকে হত্যা ক'রে লর্ড গ্লেনারভন বোধকরি কাই-কুমুর শত্রুকেই উৎপাটিত করেছেন—তার হয়তো মনে হয়েছে যে সে কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলেছে, যে-প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে তার পথ থেকে সরাতে চাচ্ছিলো, তাকে হত্যা ক'রে লর্ড গ্লেনারভন হয়তো তার সাহায্যই করেছেন?

পর-পর তিন দিন বাইরে শয়ান রইলো কারা-টিটির মৃতদেহ, প্রায় রাজকীয় শোকপালনের মতোই যেন ব্যাপারটা। তারপরে তারা তার অন্ত্যেষ্টি সারবে, আর তখনই নিশ্চয়ই বন্দীদের সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেবে। অন্তত তিনদিন পরে যখন বন্দীশালার দরজা খুলে দেয়া হ'লো, তা-ই মনে হ'লো মেজর ম্যাক্‌ন্যাবসের : এবার একটা-কিছু ফয়সালা হবে। কারণ নগরদুর্গের বড়ো চকটায় জড়ো হয়েছে কয়েকশো মাওরি নারীপুরুষ—আবালবৃদ্ধবনিতা—কিন্তু তারা কেমন থম মেরে আছে, অস্বাভাবিক শান্ত, যেন ঠিক ঝড়ের আগেকার আকাশ-বাতাস।

কাই-কুমু এসে উঠে দাঁড়িয়েছে একটা ছোট্ট ঢিবির ওপর। তার পেছনে চাঁদের কলার মতো অর্ধবৃত্তাকারে গোল হ'য়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন মাওরি যোদ্ধা। আর পাহারারা এসে বন্দীদের নিয়ে গেলো কাই-কুমুর সামনে।

বন্দীরা সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই, গম্ভীরগলায় লর্ড গ্লেনারভনকে জিগেস করলে কাই-কুমু : 'কারা-টিটিকে তুমি হত্যা করেছো?'

এমন প্রশ্নের উত্তর কী হয়? 'হ্যাঁ।'

'কাল সকালে সূর্যোদয়ের সময় তোমার মরণ হবে।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শুধু আমার?'

'শুধু তোমার। অন্যরা থাকবে, তোহোনগাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে তাদের চাই —বদলাবদলির জন্যে দরকার হবে।'

ঠিক এমন সময়ে একটা উত্তেজিত কোলাহল উঠলো জমায়েতের একপ্রান্তে। দেখা গেলো, দ্রুতপায়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে একজন যোদ্ধা, তার সারা-গা ধূলিধূসর, মুখে প্রচণ্ড ক্লান্তির ছাপ, কিন্তু কোন-এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় সে তবু এগিয়ে আসছে এইদিকেই।

তাকে দেখেই কাই-কুমু কেমন যেন উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলো। বন্দীরা যাতে বুঝতে পারে, সম্ভবত সেইজন্যেই পরিষ্কার ইংরেজিতে জিগেস করলে : 'পাকিহাদের (শ্বেতাঙ্গদের) শিবির থেকে আসছো ?'

সে শুধু ঘাড় নেড়ে জানালে, 'হ্যাঁ।'

'এখনও কি তোহোনগা সেখানে আছে? তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে ?'

'দেখেছিলাম একবার, যখন ইংরেজরা তাকে একটা খুঁটির গায়ে বেঁধে গুলি ক'রে মেরে ফেললো !'

এইই তবে শেষ! ফায়ারিংস্কোয়াডের গুলিতে তোহোনগার এই মৃত্যু বন্দী-বিনিময়ের সমস্ত চেষ্টাকেই যেন বিষম উপহাস ক'রে একধাক্কায় ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েছে।

ঘুরে দাঁড়ালে কাই-কুমু। 'কাল সকালে সূর্য ওঠবার সময়,' খুব শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে সে বললে, 'তোমাদের প্রত্যেককে মরতে হবে।'

ব'লেই সে আবার ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো। তার নিজের ভাষায় সে অনুচরদের দিকে ফিরে হুকুম দিলে কারা-টিটির অন্ত্যেষ্টির—আর অমনি জমায়েতের মধ্য থেকে উঠলো হাহাকারের রোল—বুক চাপড়ে টেনে-টেনে সুর ক'রে কাঁদতে লাগলো মাওরিরা।

আসলে এই অপঘাতমৃত্যু তো শুধু কারা-টিটির নয়—তার সঙ্গে-সঙ্গে এখন পরলোকে যেতে হবে তার স্ত্রীকেও—কেননা মৃত্যুর পরপারে গিয়েও তাকে সঙ্গ দিতে হবে তার স্বামীকে, যাতে সে একা-একা হন্যে হ'য়ে প্রেতলোক থেকে ফিরে এসে পুরো পাহ্-র ওপর আর হানা না-দেয়। বেঁচে থাকবার সময় কারা-টিটি যেভাবে জীবনযাপন করতো, মৃত্যুর পরেও সে যাতে সেইভাবেই তার দিন কাটাতে পারে, সেইজন্যে শুধু তার স্ত্রীকেই নয়, যারা তার সেবা করতো সেই অনুচর-পরিচরদেরও এবার মৃত্যুর পরপারে যেতে হবে তাকে সঙ্গ দেবার জন্যে। আর এরা যাতে মৃত্যুর জন্যে তৈরি হ'তে পারে, সেইজন্যেই কারা-টিটির মৃত্যুর পর তার অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করতে এই তিনটে দিন গেছে। অর্থাৎ, মরা নেতার যাতে সেবার কোনো ত্রুটি না-হয়, সেইজন্যে মরতে হবে অন্য মানুষদেরও। বহুযুগের ওপার থেকে এই-যে অনড় এবং অমোঘ নিয়ম চ'লে আসছে, এটা সমাজের সবাই জানে: এই ব্যবস্থাই তো চ'লে আসছে যুগ থেকে যুগে, স্মরণাতীত কাল থেকে। এই নিয়ম যে কখনও বাতিল ক'রে দেয়া যায়, এটা কখনোই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারু মাথায় আসে না—সবাইকেই বরং বিনাপ্রতিবাদে মেনে নিতে হয় এই মৃত্যু—এবং যারা মরবে তাদের ঘিরে বেজে-ওঠে ডুকরে-ওঠা হাহাকার; কিন্তু এই হাহাকার বোধহয় যারা এখন মরবে, তাদের জন্যে নয়, বরং যে আগেই ম'রে গিয়েছে, তার জন্যে। মাঙ্গাপোহি পাহাড়ের চূড়ায়, এখান থেকে দূরে, তৈরি হয়েছে সমাধিভবন—তার চারপাশে লালরং-করা সারি-সারি খুঁটি বসানো—একটা চৌখোপ-মতো—সেখানে নিয়ে-যাওয়া হবে স্বামী-স্ত্রীর মৃতদেহ, সঙ্গে তাদের সেবকদের প্রাণহীন দেহও যাবে—সেখানে এর মধ্যেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রেতাত্মাদের তৃপ্তির জন্যে খাদ্য ও পানীয়, আর চারপাশে থরে-থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অস্ত্রশস্ত্র, বাসনকোশন, গয়নাগাটি আর সাজগোজের আয়োজন —যাতে কোনোরকম কষ্টই না-হয় এই মৃতদের। আর একবার সেখানে তাদের রেখে আসার পর ঐ লাল খুঁটি দিয়ে ঘেরা জায়গায় আর-কারু যাবার অধিকার থাকবে না —এটা তখন হ'য়ে যাবে কারা-টিটির জায়গা, বাকিদের কাছে এ-জায়গা হবে নিষিদ্ধ, সেখানে অনধিকার প্রবেশ ক'রে মৃতের শান্তিভঙ্গ করার কথা এমনকী দুঃস্বপ্নেও আর-কারু মনে হবে না, এ-জায়গাটা অন্যদের কাছে *ট্যাবু* হ'য়ে যাবে, অমঙ্গলের অকুস্থল —কেননা যে-ই এখানে পা দেবে তারই কাঁধে চেপে বসবে প্রেতাত্মা—আর গোটা গোষ্ঠীর জীবনই তাতে বিপন্ন হ'য়ে উঠবে।

যখন শোভাযাত্রা ক'রে মৃতদেহ নিয়ে-যাওয়া হ'লো ঐ লাল খুঁটিতে ঘেরা প্রেতভবনে, বন্দীদের ফের ফিরিয়ে আনা হ'লো মন্দিরের সেই বন্দীশালায়। পরদিন মাঙ্গাকিনোর ওপর সূর্যের প্রথম আলো পড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই বন্দীদের নিয়ে-যাওয়া হবে বধ্যভূমিতে। মাত্র একটা রাত, তারপরেই সব শেষ হ'য়ে যাবে।

এরই মধ্যে তাঁদের জন্যে বন্দীশালায় খাদ্য ও পানীয় রেখে গেছে প্রহরীরা। নিঃশব্দে সবাই তাঁদের শেষ-পানভোজন শেষ করলেন—কারু মুখে টুঁ শব্দটি নেই, কে যে কী ভাবছে কেউ জানে না; সত্যি-তো, কী ভাবে লোকে, যখন জানে আর কয়েক ঘণ্টা বাদেই অমোঘ মৃত্যু এসে হানা দেবে? কিশোরী মেরি গ্র্যান্ট কী ভাবছে এখন; কাপ্তেন জন ম্যাঙ্গলসের সঙ্গে তার যে মন-দেয়া-নেয়ার পালা শুরু হয়েছিলো এই দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায়, তার যে পরিণাম এমন হবে, সে কি কখনও তা স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলো —ব্যর্থ, বিফল, অপূর্ণ! আর লেডি হেলেনা ও লর্ড গ্লেনারভন—তাঁরা সবে তাঁদের প্রমোদতরণী তৈরি ক'রে মহড়া দিতে বেরিয়েছিলেন সমুদ্রে, আর হঠাৎ একটা হাঙরের পেট থেকে বেরিয়ে পড়লো একটা বোতল—আর জলে-ধুয়ে-যাওয়া তিনটে চিরকুট! আর সেটাই যেন ছিলো নিয়তির ডাক—এত-পথ তাঁদের নাকেদড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে শেষটায় এনে হাজির করেছে এই-কোন বিদেশ-বিভুঁয়ে, ঠিক মৃত্যুর আগের রাতটায়! বেচারি রবার্ট গ্রান্ট—ভেবেছিলো কাপ্তেন গ্রান্টের মতোই জাহাজ চালাবে, সে এমনকী জাহাজ চালাবার ঘাতঘোঁৎ এখনও শিখে উঠতেই পারেনি, যতই কেননা তার থাক দুর্মর অধ্যবসায়



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর দুর্জয় উৎসাহ! আর কাপ্তেন জন ম্যাঙ্গল্‌স—সদ্য একটা চমৎকার স্টিমশিপের পূর্ণদায়িত্ব পেয়েছিলেন—আর মনে হয়েছিলো এই বুঝি তাঁর জীবনে সুদিন সবেমাত্র শুরু হ'লো, কেননা প্রায়-তৎক্ষণাৎ তাঁর পরিচয়—*আর ঘনিষ্ঠতাও*—হ'লো তরুণী মেরি গ্রান্টের সঙ্গে—কিন্তু সব পথ এসে শেষকালে শেষ হ'য়ে গেলো এই মৃত্যুপুরীতে! মেজর ম্যাকন্যাব্‌স—তাঁর এই পঞ্চাশ বছরের জীবনে কম বার তো মুখোমুখি হননি মৃত্যুর—কিন্তু তিনিও কি কখনও ভাবতে পেরেছিলেন এমনিভাবে একদিন মৃত্যু তার ভয়াল চোখ মেলে তাঁর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকবে?

চারদিন আগে লাঞ্ছনার ভয়ে নিজের জামার মধ্যে লুকোনো রিভলভারটা লর্ড গ্লেনারভনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন লেডি হেলেনা, 'যদি দ্যাখো আমার ইজ্জতে টান পড়েছে, আমাকে গুলি ক'রে মারতে দ্বিধা কোরো না,' বলেছিলেন এইরকম কোনো কথা, এখন সেই রিভলভার কেড়ে নিয়ে গেছে মাওরিরা—কারা-টিটিকে গুলি করার পর। এখন আর-কোনো অস্ত্রই নেই তাঁদের হাতে। না কি আছে কোনো শেষঅস্ত্র?

গ্লেনারভন চাপাগলায় জন ম্যাঙ্গল্‌সকে জিগেস করলেন : 'জন, মেরি তোমাকে যা বলেছে, সেটা তুমি করতে পারবে তো? হাত কাঁপবে না তো?'

'নিশ্চয়ই,' ব'লেই জামার ভেতর থেকে একটা ছোরা বার ক'রে দেখালেন কাপ্তেন, 'আপনি কারা-টিটিকে গুলি করবামাত্র যে-হুলুস্থুলু বেঁধে গিয়েছিলো, সেই সুযোগে আমি কোমর থেকে ছুরিটা টেনে নিয়েছিলুম।'

মেজর ম্যাকন্যাব্‌স শান্তগলায় শুধু বললেন, 'দুম ক'রে হঠাৎ কিছু ক'রে-বসা ঠিক হবে না।'

লর্ড গ্লেনারভন দৃঢ়স্বরে বললেন : 'আমরা তো সবাই মরতেই বসেছি—তাহ'লে মিথ্যে আর মরণকে অত ভয় পাবো কেন? কিন্তু মৃত্যুর বাড়াও একটা জিনিশ আছে—সেটা কারু ইজ্জৎ, মানসম্মান—তাতে কোনো আঁচড় পড়ুক, তা আমি চাই না।'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স উঠে গেলেন একবার, দরজায় মাদুরের পল্লা ঝোলানো, সেটার একটা কোণা তুলে উঁকি দিলেন বাইরে। দূরে, ঘন অন্ধকারের মধ্যে একটা আগুনের কুণ্ড জ্বলছে। তার পাশ থেকেই জনাপঁচিশ সশস্ত্র প্রহরা কড়ানজর রেখে যাচ্ছে এইদিকে। সেখান থেকে সরু-একটা পথ পাঁহাড়ের গা বেয়ে উঠে এসেছে দরজাটা অব্দি—সজাগ পাহারার চোখ এড়িয়ে এ-পথ দিয়ে দু-পাও যাওয়া যাবে না। এছাড়া এই বন্দীশালার দু-পাশ দিয়ে নেমে গেছে গভীর খাদ, কম ক'রেও একশোফিট গভীর খাদ—পাহাড়ের ঢাল নেমে গেছে সোজা, খাড়াই, সরাসরি ঘন অন্ধকারের মধ্যে—সেখান দিয়ে বেয়ে পালাতে পারবে শুধু-কোনো সরীসৃপ, আর-কেউ নয়। অর্থাৎ : পালাবার কোনো রাস্তা নেই কোথাও।

আকাশটা ঘুটঘুট্টে অন্ধকার, ঘন মেঘে ঢাকা পড়েছে চাঁদ আর তারারা, কেমন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন থমথম করছে সব, শুধু উদ্দাম হাওয়ার ঝাপটা আসছে মাঝে-মাঝে, আর দপদপ ক'রে লাফিয়ে উঠছে আগুনের শিখা। অমনি চোখে প'ড়ে যাচ্ছে পাহারাদের, কেউ ব'সে কেউ-বা দাঁড়িয়ে, তাদের কারু চোখে ঘুম নেই।

ঘুমকে অবশ্য বিদায় দিয়েছেন বন্দীরাও, সেইসঙ্গে বিদায় নিয়েছে কথা, হয়তো এখন আর চিন্তারও কোনো অবকাশ নেই কারু মনের মধ্যে—বুকের মধ্যেটা কি-রকম ফাঁকা লাগছে, যেন যেখানে হৃৎপিণ্ড ছিলো সেখানে শুধু ফাঁকা-একটা গহ্বরের মধ্যে ধুপ-ধাপ শব্দ ছাড়া আর-কিছুই নেই।

আর কখন যে এরই মধ্যে রাত চারটে বেজে গেছে কারু খেয়াল ছিলো না। হঠাৎ অন্যমনস্ক মেজরের কানে কি-রকম অস্পষ্ট একটা আওয়াজ এসে পৌঁছুলো। উৎকর্ণ হ'য়ে শুনলেন মেজর—আওয়াজটা যেন আসছে বন্দীশালার পেছন দিক থেকে। কীসের আওয়াজ ওটা? কেউ যেন মাটি আঁচড়াচ্ছে। না-না, কেউ বোধহয় মাটি খুঁড়তে চাচ্ছে।

নিঃশব্দে মেজর ম্যাক্‌ন্যাবস উঠে গেলেন লর্ড গ্লেনারভন আর জন ম্যাঙ্গলসের কাছে। ঝুঁকে, চাপাগলায়, প্রায় ফিশফিশ ক'রেই যেন, বললেন, 'ঐ শোনো!'

আওয়াজটা যেন ক্রমশই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। কেউ যেন কোনো ধারালো যন্ত্রের ঘায়ে মাটি খসিয়ে দিচ্ছে—একটা খশখশ শব্দ হচ্ছে, আর ঝুরঝুর ক'রে গুঁড়োমাটি ঝ'রে প'ড়ে যাচ্ছে।

কেউ নিশ্চয়ই বাইরে থেকে গর্ত খুঁড়ে এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে!

তক্ষুনি এদিক থেকেও হাত লাগিয়ে দিলেন এঁরা। ছোরা আছে একটাই, সেটা কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসের কাছে, কিন্তু তার জন্যে যেন আর তর সইছিলো না—আর-কিছু না-থাকে তো আঙুল তো আছে, আঙুলে তো নখ আছে। এরই মধ্যে একবার মাদুরের পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে এলো মুলারাডি। না, প্রহরীরা কিছু টের পায়নি। তারা সজাগ কিন্তু নিশ্চিন্ত ব'সে আছে এখন-নিভুনিভু ঐ আগুনের কুণ্ডটা ঘিরে।

এদিকে আওয়াজটা এখন আগের চাইতে অনেক জোরালো হ'য়ে উঠেছে। নিশ্চয়ই কেউ একটা ফাঁকফোকর তৈরি করতে চাচ্ছে দেয়ালে। কিন্তু কেন? মৎলব কী তার? সে কি কোনো অজ্ঞাত বন্ধু? শত্রুই যদি হবে, মাওরিদেরই কেউ, তাহ'লে সে খামকা কেন এভাবে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে চাইবে?

এ-কথা ভাবামাত্র পাঁচজোড়া হাত চললো দুনো উৎসাহে ভর দিয়ে। নখের ডগা ভেঙে গেলো, রক্ত ঝরতে লাগলো, বিশ্রীরকম ব্যথা করছে, কিন্তু তবু কারু মধ্যে দ'মে যাবার কোনো লক্ষণ নেই। প্রায় হাত-তিনেক গর্ত হ'য়ে যাবার পর হঠাৎ ধারালো একটা-কিছুতে হাত কেটে গেলো মেজর ম্যাক্‌ন্যাবসের। অস্ফুট আর্তনাদটা গিলে ফেলে ম্যাকন্যাবস একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে হাতটা সরিয়ে আনলেন।

আর অমনি দেয়ালের গায়ের ফোকর দিয়ে বেরিয়ে এলো ছুরি-সমেত একটা হাত।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু না-ভেবেই তক্ষুনি কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস্ শক্ত ক'রে চেপে ধরেছেন মণিবন্ধটা, আর কব্জিতে চাপ পড়তেই ছুরিটা মুঠো থেকে খ'সে প'ড়ে গেলো। কিন্তু হাতটা কার? এ তো কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের চওড়া ও কঠিন মণিবন্ধ নয়। কোনো মেয়ের? কোনো অল্পবয়সি ছেলের? কিন্তু যারই হাত হোক না কেন—এটা কোনো মাওরির হাত নয়, একজন শ্বেতাঙ্গের হাত।

নিচুগলায় অনুমানটা উচ্চারণ ক'রেই ফেললেন লর্ড গ্লেনারভন : '*রবার্ট*!'

এইসব অর্ধস্ফুট আওয়াজে ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো লেডি হেলেনার। মেরি নামটা শুনেই প্রায় যেন ছিটকে চ'লে এলো ফোকরটার কাছে, সরু মণিবন্ধটা চেপে ধ'রে কম্পিত বিহ্বল স্বরে ব'লে উঠলো : 'রবার্ট! রবার্ট!'

ফোকরটার মধ্য দিয়ে ভেসে এলো রবার্টের গলা : 'হ্যাঁ, আমি সব্বাইকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'ছেলেটা দেখছি বেপরোয়া—একটুও ভয়ডর নেই,' গ্লেনারভন ব'লে উঠেছেন তখন।

ওধার থেকে নিচুগলায় আওয়াজ এলো : 'আগে দেখে নিন—ওখানে পাহারারা কী করছে?'

মুলারাডি জানালে, 'শুধু চারজন দাঁড়িয়ে আছে—বাকিরা বোধহয় ব'সে-ব'সে ঢুলছে।'

এদিকে কিন্তু সেই গর্তের মুখটা বড়ো ও সুপরিসর করার কাজ অবিশ্রাম চলেছে। আর তারপরেই তার মধ্যে দিয়ে বুকে হেঁটে ভেতরে গ'লে এলো রবার্ট। সারা গায়ে জড়ানো ঐ শনের দড়ি—যে-শন দিয়ে সব কাজই সারে মাওরিরা।

'কেমন ক'রে পালিয়েছিলি তুই,' এতক্ষণে আবেগবিহ্বল মেরির মুখে বুলি ফুটেছে।

'ঐ যখন হুলুস্থুল প'ড়ে গেলো—কারা-টিটি ম'রে যেতেই—কেউ কি তখন আর অন্য কোনোদিকে তাকাচ্ছিলো নাকি? দু-দিন দু-রাত জঙ্গলের মধ্যে ঘাপটি মেরে লুকিয়েছিলুম, তারপর মাওরিরা যখন অন্ত্যেষ্টির জন্যে দলে-দলে নিজেদের কুঁড়ে ছেড়ে বেরিয়ে গেলো, তখন ফাঁকা-একটা কুঁড়েঘরের মধ্য থেকে এই দড়ি আর ছোরা নিয়ে এসেছি তোদের নিয়ে যেতে। বুনো আগাছার চাপড়া আর কাঁটাগাছের ঝোপ ধ'রে ওপরে বেয়ে উঠেছি কোনোরকমে—তারপর বেশ-খানিকটা উঠে আসার পর একটা পইঠার মতো পেয়ে গেলুম—ধস নেমে একটা জায়গা বেশ-একটা সিঁড়ির ধাপের মতো হ'য়ে উঠেছে। তারপর ছোরার ঘায়ে মাটি খসাতে-খসাতে—এই-তো, আমি এখন তোদের কাছে এসে হাজির। চল, আর দেরি নয়। দিন হবার আগেই আমাদের কেটে পড়তে হবে।'

'মঁসিয় পাঞ্চয়ল বুঝি নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন?' গ্লেনারভন জিগেস



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন।

এবারে করিৎকর্মা রবার্টের একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাবার পালা। 'কই—না তো?'

'মঁসিয় পাঞ্জয়ল তোমার সঙ্গে পালাননি?'

'না। আমি তো ভেবেছি উনিও আপনাদের সঙ্গেই বন্দী হ'য়ে আছেন।'

আরো হয়তো কথা চলতো, কিন্তু মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স তাড়া লাগিয়েছেন তখন—'মঁসিয় পাঞ্জয়লের কথা পরে বরং ভেবে দেখা যাবে। এখন চটপট এখান থেকে আমাদের স'রে-পড়া উচিত।'

ঐ গর্তটা দিয়ে কোনোরকমে শরীরটা গলিয়ে নিয়ে এক-এক ক'রে সবাই নেমে এলেন পাহাড়ের গায়ে ধস-নেমে-গ'ড়ে-ওঠা সেই খাঁজটায়—রবার্ট যেটাকে সিঁড়ির ধাপ ব'সে বর্ণনা করেছিলো। তারপরেই কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স একটা তেরচামতো প্রকাণ্ড পাথরের গায়ে বেঁধে দিয়েছেন দড়ি। ঐ দড়ি বেয়েই নেমে যেতে হবে নিচে, খুব-সাবধানে, একটু ফসকালেই নিচে খাদে প'ড়ে যেতে হবে।

সবচাইতে আগে নেমে গেলো রবার্ট—দড়ি ধ'রে ঝুলতে সে ওস্তাদ, কতবার *ডানকানের* মাস্তুলের দড়ি বেয়ে-বেয়ে সে ওঠানামা করেছে। তারপর একে-একে নামলেন ম্যালকম কাস্‌লের তরুণ দম্পতি—লর্ড গ্লেনারভন ও তাঁর স্ত্রী। আর লেডি হেলেনার পা বোধহয় একটু বেকায়দায় পড়েছিলো পাহাড়ের ঢালে—কতগুলো আলগা নুড়িপাথর বেশ শব্দ ক'রেই খ'সে পড়লো নিচে।

অমনি ওপর থেকে নিচুগলায় '*শ্‌শ্‌শ!*' ব'লে সাবধান ক'রে দিলেন কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স। গ্লেনারভনরা তখনও পুরো নেমে যেতে পারেননি, দড়ি ধ'রেই তাঁরা শূন্যে ঝুলতে লাগলেন।

উইলসন তখনও পাহারায় ছিলো বন্দীশালার মাদুরের পাশে। সে দেখতে পেলে, ঐ পাথর খ'সে-পড়ার আওয়াজ শুনে পাহারাদের একজন এদিকে চ'লে আসছে ব্যাপার কী দেখতে, আর অমনি সে সাবধান ক'রে দিয়েছে কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সকে। মাওরিটি কিন্তু বন্দীশালার দরজার কাছে এসেও ভেতরে ঢোকেনি বা মাদুরের পর্দাটা সরিয়ে ভেতরে মাথা গলায়নি—হয়তো তার সেই অধিকার ছিলো না। সে একটুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কানখাড়া ক'রে রইলো, কিন্তু আর-কোনো সন্দেহজনক আওয়াজ না-শুনে সে আবার আগুনের কুণ্ডের দিকেই ফিরে গেলো।

উইলসন হালকা একটা শিস দিয়ে জানালে, রাস্তা সাফ, অমনি কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স সবাইকে জানালেন সাবধানে নিচে নেমে যেতে, খুব হুঁশিয়ার, ও-রকম শব্দ যেন আর না-হয়।

তারপর নেমে এলেন কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স নিজে, মেরিকে নিয়ে, এবং তারপর এক-এক ক'রে বাকি সবাই।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং সবাই নেমে আসতেই আর দেরি নয়। সবাই খুব-সন্তর্পণে প্রেতপাহাড়ের দিকে চললেন। পা টিপে-টিপে, চুপি-চুপি, প্রাণ হাতে ক'রে—একটুও শব্দ যেন না-হয়, অথচ যত-তাড়াতাড়ি-সম্ভব পালাতে হবে। আর একটু পরেই দিনের আলো ফুটবে—আর তারপরেই ফাঁস হ'য়ে যাবে বন্দীশালায় কেউ নেই, বরং পেছনের দেয়ালে একটা গর্ত—যেটা দেখে সবচেয়ে আকাট বোকারও বুঝতে অসুবিধে হবে না বন্দীরা কোন্ পথ দিয়ে পালিয়েছেন।

আর তারপরেই উঠে এলো সূর্য!

আর অমনি চারপাশে খ্যাপা কোলাহল, চীৎকার, চ্যাঁচামেচি, হুলুস্থুল!

পুরো পাহাড়টাই যেন ঘুম ভেঙে ধড়মড় ক'রে উঠে পড়েছে। আর তাঁদের পেছনে হৈ-হৈ ক'রে ছুটে চ'লে আসছে মাওরিরা, হন্যে, ক্ষিপ্র, সশস্ত্র।

এবার আর গোপনে গাঢাকা দিয়ে চলা নয়—প্রাণ হাতে ক'রে ছোটা!

আরো অন্তত শোখানেক ফিট উঠে গেলে, পাহাড়ের চুড়োয় পৌঁছুনো যাবে, তারপর ছুটে নামতে হবে অন্যদিকের ঢালটা বেয়ে। কোথায় যাবে—কারু জানা নেই। কিন্তু যে-ক'রেই হোক, এখন এদের নাগাল থেকে পালাতে হবে। এবার এদের কবলে পড়লে শুধু-যে মৃত্যুই অবধারিত তা নয়—নিশ্চয় তার আগে নৃশংসভাবে তাদের নির্যাতন করবে মাওরিরা। হাতের শিকার এভাবে পালিয়ে গেলে কেউই খুব-একটা খুশি হয় না। পেছনের রে-রে চীৎকার আর হৈ-হৈ হাঁকডাক ক্রমেই কাছে গিয়ে আসছে। আরো জোরে না-ছুটলে প্রায় ধ'রেই ফেলবে তাঁদের।

'চলো, চলো, পেছনে তাকিয়ো না, সোজা ছোটো সামনে।' লর্ড গ্লেনারভন কেবল তাতাচ্ছেন সহযাত্রীদের। অনবরত কথা ব'লে তিনি যেন নিজের ভেতরকার সব শঙ্কাকেও দূর ক'রে দিতে চাচ্ছেন।

হাঁফাতে-হাঁফাতে যখন গিরিশিখরে পৌঁছুলেন সকলে, শুধু তখনই মনে হ'লো পেছন ফিরে তাকিয়ে একঝলক দ্যাখেন, যারা তাঁদের তাড়া ক'রে আসছে, তারা এখন কতদূরে আছে। মাওরিদের তখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—দু-দলের ব্যবধান তখন পাঁচশো ফিটও হবে কি না সন্দেহ। আরেকটু পরেই নিশ্চয়ই তারা নাগাল ধ'রে ফেলবে। এক্ষুনি যদি শিখর থেকে অন্যদিকে নেমে না-আসেন, তাহ'লে আর রক্ষে নেই। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অন্যদিকে নেমে গেলেও যে নিস্তার আছে তা হয়তো নয়। কিন্তু এই উঁচু থেকে নিচে দেখা যাচ্ছে, রোদ প'ড়ে ঝিকিয়ে উঠেছে তাওপো হ্রদের স্বচ্ছনীল জল। ডানদিকে দূরে টোনগারিরো পাহাড়ের জ্বালামুখ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, কিন্তু পুবদিকে দাঁড়িয়ে আছে ওয়াইহিতির ছোটো-বড়ো শিখরগুলো—হয়তো ঐ দিকেই কোনো ছোটো শুঁড়িপথ পাওয়া যাবে কোথাও!

আবার তাড়া লাগালেন লর্ড গ্লেনারভন, 'চলো! চলো! ছুটে নামো—আর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একফোঁটাও সময় নেই!'

ক্লান্তিতে তখন সকলের হাঁটুর জোড়া যেন খুলে আসতে চাচ্ছে। এমনভাবে পাহাড় বেয়ে ছুটে ওঠা বা নামার অভ্যাস নেই কারু—শেষটায় এতটা পালিয়ে এসেও ধরা প'ড়ে যেতে হবে কাই-কুমুর লোকজনদের হাতে!

ছুটে নামতে যাবেন, হঠাৎ বাধা দিলেন মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স, 'থামো! আর বোধহয় প্রাণ হাতে ক'রে ছুটতে হবে না আমাদের। ঐ দ্যাখো, কী-রকম অদ্ভুতভাবে থমকে পড়েছে মাওরিরা! আশ্চর্য! ওরা আর তাড়া ক'রে আসছে না কেন?'

আশ্চর্যই বটে! যেন আচমকা একটা অদৃশ্য দেয়ালে এসে ধাক্কা খেয়েছে কাই-কুমুর দলবল। দূরে দাঁড়িয়েই তারা চ্যাঁচাচ্ছে, নানারকম উৎকট অঙ্গভঙ্গি করছে, কিন্তু একপাও এগুচ্ছে না কেউ! সে-কার অদেখা হাত তার অঙ্গুলিহেলনে মন্ত্রবলে থামিয়ে দিয়েছে তাদের? সে-কোন মন্ত্রবলে পায়ে শিকড় গজিয়ে তারা থমকে থেমে পড়েছে পাঁচশো ফিট দূরে?

হঠাৎ অস্ফুট চেঁচিয়ে উঠেছেন জন ম্যাঙ্গল্‌স, সামনেই চূড়ার পাশে কী-একটা যেন দেখাচ্ছে তাঁর হাত!

মাত্র কয়েক পা দূরে, সারি-সারি লাল-লাল খুঁটি ঘিরে আছে একটা ছেটো কুঁড়ে!

দেখেই লাফিয়ে উঠলো রবার্ট : 'কারা-টিটির সমাধিভবন!'

'তা-ই বুঝি?' জানতে চেয়েছেন লর্ড গ্লেনারভন।

'হ্যাঁ, কারা-টিটিরই সমাধিভবন! দু-দিন জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে থেকে আমি সব খেয়াল ক'রে দেখেছি। দেখেছি, অন্ত্যেষ্টির সময় ওরা কোনদিকে ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছিলো মৃতদেহগুলো—'

না, কোনোই ভুল হয়নি রবার্টের। তাঁরা যে কখন প্রাণ নিয়ে ছোটবার সময় এই সমাধিভবনের দিকেই হুড়মুড় ক'রে এগিয়ে এসেছেন, সেটা কেউ এতক্ষণ খেয়ালই করেননি।

আর মৃতের এই আবাসই তাঁদের বাঁচিয়ে দিয়েছে।

এই পাহাড় এখন নিষিদ্ধ অঞ্চল মাওরিদের কাছে—*ট্যাবু*—অমঙ্গলভূমি। প্রাণ গেলেও তারা আর এদিকে এগুবে না। কারণ এটা এখন প্রেতাত্মার আবাস—সদ্য তারা এখানে রেখে গেছে কারা-টিটিকে। তার ক্ষুধিত প্রেতাত্মা এখনও শান্ত হয়নি—পুরো অঞ্চলটা এখন তার দখলে। এখানে তার দলের কারু আসারই অধিকার নেই আর। কেউ যদি ভুল ক'রেও এদিকটায় পা দেয়, তবে তার যা পাপ হবে, তাতে সবাই শুদ্ধু মরবে, সর্বনাশ হ'য়ে যাবে কারা-টিটির গোষ্ঠীর। হয়তো প্রকৃতি গা ঝাড়া দেবে আচম্বিতে, হয়তো জ্বালামুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে আগুনের হলকা আর তরল লাভা! কার সাধ্যি, এখন এই অমঙ্গলের গণ্ডি পেরিয়ে আসে!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর তাদের জন্মজন্মান্তরের বিশ্বাস, তাদের রীতিনীতিসংস্কার, *ট্যাবু* সম্বন্ধে তাদের আতঙ্ক—সব মিলিয়ে এখন বাঁচিয়ে দিয়েছে পলাতকদের। অন্তত এই জায়গাটায় আপাতত মাওরিরা কেউ আর আসবে না।

সমাধিভবনের দিকে এগুতে গিয়েও, এবার যেন কোন-এক আতঙ্কের হ্যাঁচকা টানে, থমকে পেছিয়ে এলেন পলাতকেরাই।

ঐ-তো, কে-একজন ব'সে আছে সমাধিভবনে!

মাওরিরা তবে কি আজকাল আর *ট্যাবু* মানে না? নিষিদ্ধ ভূমিতেও পা দেয়? না কি কেউ-একজন বেপরোয়া স্পর্ধায় অস্বীকার ক'রে বসেছে তার জাতির বিশ্বাস?

মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌সের যেন বাক্‌স্ফূর্তি হ'তে চাচ্ছিলো না : 'প্রেতের বাসায় জ্যান্ত মানুষ? অসম্ভব!'

'অসম্ভব নয়—ঐ দ্যাখো—সত্যি—'

ভেতরটা অন্ধকারে ঢাকা। কিন্তু তারই মধ্যে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে কে-একজন মাওরিদের ঐ লাল-কালো ঢোলা জামায় গা-মাথা মুড়ে ব'সে আছে—শুধু-যে ব'সে আছে তা-ই নয়—ব'সে-ব'সে একমনে কী যেন খাচ্ছে। কোনোদিকেই তার কোনো দৃক্‌পাত নেই। আপাতত যেন ক্ষুণ্নিবৃত্তির এই প্রক্রিয়াটা ছাড়া আর-কিছুই সে জানে না।

লর্ড গ্লেনারভন কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মুখের কথাটা তাঁকে তক্ষুনি খপ ক'রে গিলে ফেলতে হ'লো। সেই লাল-কালো জামায় আপাদমস্তক মোড়া লোকটা হাত নেড়ে তাঁদেরই ডাকছে, উচ্চারণে তার বিদেশীর গলার সুর, কিন্তু ইংরেজিভাষাটা স্পষ্ট, পরিষ্কার, প্রাঞ্জল :

'ব'সে পড়ুন, লর্ড গ্লেনারভন। ছোটোহাজরি তৈরি—চটপট ডান হাতের কাজ শুরু ক'রে দিন!'

গলার সুর শুনে চিনতে কারুই ভুল হ'লো না।

মঁসিয় পাওয়ল!

'আপনি এখানে! কিন্তু মাওরিরা কোথায়?'

'মাওরিরা আবার কোথায় থাকবে—যেখানে ছিলো, সেখানেই আছে! এ-জায়গাটা ওদের কাছে নিষিদ্ধ না? *ট্যাবু* না? এখানে তো অমঙ্গল ওৎ পেতে আছে!'

সত্যি, পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখা গেলো, মাওরিরা সেই অদৃশ্য গণ্ডির কাছে এসে তেমনি থমকে দাঁড়িয়ে আছে—হাত-পা নাড়ছে, উৎকট নাচ জুড়ে দিয়েছে, চীৎকারও করছে—কিন্তু একপাও আর এগোয়নি।

'কিন্তু নিষিদ্ধ কেন? কালকেই তো এখানে এসেছিলো!'

'আর তাইতেই তো গোল বাধিয়েছে! কাল এখানে এসে কারা-টিটিকে এখানে সমাহিত করেছে না? তারপর থেকেই এ-জায়গাটা শুধু অপবিত্র হ'য়ে যায়নি, অমঙ্গলের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিপো হ'য়ে গেছে। সোজা কথা নাকি? ভূত-পেত্নি দত্যিদানার আস্তানা! কার ঘাড়ে ক-টা মাথা আর একপা এগুবে? প্রেতাত্মা তার অশীরীরী হাত বাড়িয়ে ঘাড় মটকে দেবে না?'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ কারা-টিটিকে কাল ওরা এখানে মাটির তলায় শুইয়ে রেখে গেছে ব'লেই আজ আমরা এখানে নিরাপদ। এটা যে ওদের কাছে নিষিদ্ধ এলাকা হ'য়ে গেলো, সেইজন্যেই তো সকলের চোখে ধুলো দিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছি আমি!'

'কিন্তু ওরা যে এখনও ওখানে দাঁড়িয়ে আছে! এ তো একটা মানুষের তৈরি পরিখা হ'য়ে গেলো আর-কি! আমরা কি তাহ'লে আর এ-জায়গা ছেড়ে একপাও নড়তে পারবো না—এখানেই ঠায় ব'সে থাকতে হবে আমাদের?'

'তা কেন? এটুকু ঠিক যে ওরা মাঝখানের ঐ জমিটা পেরিয়ে অ্যাদ্দুর আর আসবে না। কিন্তু এখান থেকে কেটে পড়বার একটা উপায় বার ক'রে নিতে হবে আর কি আমাদের। নিন, হাত লাগান, কিছু খাবার দাঁতে কাটুন।'

এই প্রায়-কল্পনাতীত উপায়ে আপাতত রেহাই পেয়ে গিয়ে অভিযাত্রীরা সব উত্তেজনার শেষে এখন যেন গা ছেড়ে দিয়েছেন। সত্যি-তো, এখানে যখন আচমকা কোনো হামলা হবে না, তখন উদ্ধারের কথা না-হয় একটু ধীরে-সুস্থে পরেই ভাবা যাবে, সবদিক বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে তো!

জায়গাটা অবিশ্যি মৃতের সুখ-সুবিধে-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবেই তৈরি, জ্যান্ত মানুষের কথা আদৌ ভাবেনি মাওরিরা, সেটা তাদের রীতিও নয়, তবে সুখের চাইতে স্বস্তি ভালো। অন্তত এক্ষুনি তো আর প্রাণ হাতে ক'রে পালাতে হবে না!

কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার! মঁসিয় পাঞ্রয়ল কারু-অনুরোধেই নিজের কাহন নিয়ে একটি কথাও বলতে চাচ্ছেন না। সকলের সব প্রশ্নের উত্তরেই ইলেকট্রিক ঈল মাছের মতো হাত পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছেন যেন। সেদিন তিনি ঐ হৈ-চৈ-এর মধ্যে মাওরিদের হাত এড়িয়ে কীভাবেই যে প্রাণ নিয়ে সটকেছিলেন, সে-সম্বন্ধে যেন টু-শব্দটি করতে তিনি রাজি নন।

ব্যাপার দেখে সবচেয়ে অবাক মানলেন মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স। এ-কী কাণ্ড! মঁসিয় পাঞ্রয়ল হঠাৎ এমন পালটে গিয়েছেন কী ক'রে? যিনি সবসময় হাজার কথায় নিজের কেরামতি দেখাতে পারলে আর-কিছুই চান না, তাঁর স্বভাবের এমন আদ্যোপান্ত বদল সম্ভব হ'লো কী ক'রে? শেষটায় কারা-টিটির প্রেতাত্মা এসেই তাঁর কাঁধে ভর করেছে নাকি? তার ওপর, এ আবার কী কাণ্ড? তাঁর দিকে তাকালেই কী-রকম যেন কুঁকড়ে গুটিয়ে যাচ্ছেন। গায়ে জড়িয়ে রেখেছেন ঐ শনের ফেঁসোর তৈরি লাল-কালো আলখাল্লা, পারলে যেন গুটিয়ে কোনো খোলের মধ্যে ঢুকে যাবেন শামুকের মতো!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাক-গে! মঁসিয় পাঞ্জয়লের মাথায় যে ছিট আছে, সবাই জানে। কোনো নতুন খেয়াল চেপেছে হয়তো মাথায়। খামকা এ নিয়ে আর প্রশ্ন ক'রে তাঁকে বিব্রত ক'রে লাভ কী? কারা-টিটির ভূত এসে যতই তাঁর ঘাড়ে চেপে বসুক না কেন, একসময়-না-একসময় তো পেট ফুলে ম'রেই যাবেন ভূগোল-বিশারদ এই পণ্ডিতমানুষ—পেটের মধ্যে যত কথা গিজগিজ করছে, সে-সব তিনি কতক্ষণ আর চেপে রাখবেন।

তাঁকে মিথ্যে নানা প্রশ্ন ক'রে উত্ত্যক্ত না-ক'রে, তাঁর পরামর্শমতো কাজ করাই বরং ভালো এখন। পেটে যখন যতরাজের ছুঁচো ডনবৈঠক দিচ্ছে তখন তাঁর সাজিয়ে-রাখা ছোটোহাজরির সদ্ব্যবহার করাই ভালো।

অন্যদের মতো মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌সও শেষটায় খাবারের দিকে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন।

## তিন

## একদিকে তপ্ত তাওয়া অন্যদিকে জ্বলন্ত আগুন

কথা বলাবার জন্যে শ্রীল-শ্রীযুক্ত জাক-য়েলিয়াস ফ্রাঁসোয়া মারি পাঞ্জয়লকে সাধ্যসাধনা করতে হচ্ছে, এমনটা তো সাধারণত হয় না। তার মানেই হ'লো বিষম গোলমেলে কিছু-একটা হয়েছে, বিদঘুটে কোনো-এক বিড়ম্বনা, আর তাইতেই রয়্যাল জিওগ্র্যাফিক্যাল অ্যাণ্ড ঈস্ট-ইণ্ডিয়া ইন্‌স্টিটিউটের এই মাননীয় সদস্য এতটা বিব্রত বোধ করছেন। অতএব আপাতত তাঁকে আর ঘাটানো খুব-যে সুবিবেচনার কাজ হবে, এমনটা লর্ড গ্লেনারভনের বোধ হ'লো না।

কিন্তু কথা সম্ভবত হাঁচোড়পাঁচোড় ক'রে পেট থেকে বেরুতে চাচ্ছিলো, ফলে তাঁদের এই প'ড়ে-পাওয়া ছোটোহাজরি শেষ হবার আগেই অবশ্য পাঞ্জয়ল তাঁর কাহন শুনিয়ে ফেললেন। তারও মধ্যে তো-তো বিব্রতভাব, কিন্তু শেষ অব্দি তিনি যা বললেন তার সারসংক্ষেপ করলে এইরকম দাঁড়ায় :

রবার্টের মতোই, কারা-টিটির মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়বার সময়, যে-হুলুস্থুল কাণ্ড শুরু হ'য়েছিলো, তারই সুযোগ নিয়ে সটকে পড়েছিলেন পাঞ্জয়ল। কিন্তু কপাল মন্দ হ'লে যা হয়। চম্পট দিতে গিয়ে পড়বি তো পড়, পড়লেন আরেকদল মাওরির খপ্পরে। এদের সর্দারের চেহারাছিরি ভালো, ঘটের মধ্যে বুদ্ধিও ধ'রে ঢের—সে শুধু নামকাওয়াস্তেই বাপঠাকুর্দার দৌলতেই সর্দার হ'য়ে বসেনি, বেশ জানে-শোনে; তাছাড়া



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজ মিশনারিদের সঙ্গে এককালে বেশ মাখামাখি হয়েছিলো ব'লে ইংরেজি ভাষা বলতে-কইতেও পারে, শাদাআদমিদের ধরনধারণ ভালোই জানা ছিলো তার। পাঞয়লকে দেখেই বেশ ক'রে জড়িয়ে ধ'রে নাকে নাক ঘ'ষে যথাবিধি অভ্যর্থনাও জানিয়েছিলো সে। ককখনো এমনভাব করেনি যে পাঞয়ল তাদের বন্দী। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই হাড়ে-হাড়ে টের পাওয়া গিয়েছিলো যে ঐ সর্দার সঙ্গে না-থাকলে কোথাও এক পাও যাবার অধিকার নেই তাঁর—সারাক্ষণই সে তার পায়ে-পায়ে ঘুরঘুর করছে, ছায়ার মতোই লেপটে থাকছে পাশে।

নাম তার *হি-হি*, যার মানে রোদ্দুর। মানুষটা দিব্বি। পাঞয়লের নাকের ডগায় চশমা আর বুকে-ঝোলানো দুরবিন দেখে শ্রদ্ধায় এতটাই অভিভূত হ'য়ে গিয়েছিলো যে তাঁকে সে কোথায় রাখবে—পায়ে, না মাথায়—এটাই বোধহয় ঠিক করতে পারেনি—সেইজন্যেই অনেক মাথা খাটিয়ে সে একটা উপায় বার ক'রে নিয়েছিলো, দড়ি দিয়ে একেবারে নিজের সঙ্গেই বেঁধে রেখে দিয়েছিলো তাঁকে। এইভাবেই গেছে তিন-তিনটে দিন। এ যেন তপ্ত তাওয়া থেকে পালাতে গিয়ে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ খাওয়া।

'তবে যে বললেন, রীতিমতো আদর ক'রেই রেখেছিলো—কখনও আপনাকে বুঝতেই দেয়নি যে আপনি *হি-হি-র* বন্দী?' মৃদু হেসে জিগেস করেছেন গ্লেনারভন।

পাঞয়ল উত্তরে বলেছেন : 'কথাটা ঠিক। বন্দীও বটে, আবার নয়ও বটে। এমনিতে দারুণ খাতিরদারি করছে, আরামেগরমে রাখছে—অথচ কাছ ছাড়ছে না একমুহূর্তের জন্যেও। একে যদি বন্দিত্ব বলে, তবে তা-ই। মোটমাট এইভাবেই কেটেছে তিনটে দিন —কিন্তু শেষটায় এত আদরযত্ন আমার আর সহ্য হয়নি। শেষটায় একদিন *হি-হি* যেই একটু চোখ মুদেছে, অমনি দড়ি কেটে ফের চম্পট দিয়েছি।'

আর এবার পালিয়ে এসে দেখতে পেলেন, বেশ-জমকালো অনুষ্ঠান ক'রেই কারা-টিটিকে অন্ত্যেষ্টির জন্যে মিছিল ক'রে এই পাহাড়টায় নিয়ে-আসা হচ্ছে। 'ও-সব *ট্যাবু-ফ্যাবুর* কথা আমার বেশ জানাই ছিলো। এর আগে পারী থেকে একপাও না-বেরুলে কী হয়, পলিনেশিয়ার কোথায়-কোথায় *ট্যাবুর* চল আছে, সে-সব আমি পুথি প'ড়ে একেবারে গুলেই খেয়েছিলুম, ফলে এটাও তক্ষুনি ধরতে পেরেছিলুম যে একবার পাহাড়ের এই অনুষ্ঠানটা শেষ হ'য়ে গেলেই এ-পাহাড়টা এদের কাছে নিষিদ্ধ পাহাড় হ'য়ে যাবে—আর-কেউ ভুলেও এ-তল্লাট পায়ে মাড়াবে না। তাই মাওরিরা সবাই চ'লে যাবার পর লুকিয়ে এই পাহাড়ে এসে সোজা এই সমাধিভবনেই আশ্রয় নিয়েছি আমি। আপনাদের কার কী গতি হ'লো—সেটা না-জেনে কোথায় যাই, বলুন? সেজন্যেই সেই থেকে এখানেই র'য়ে গেছি।'

জাক পাঞয়ল এত-সব বললেন বটে, তবু খটকাটা কিন্তু কাটলো না। তিনি যেন সব কথা খুলে বলছেন না, কী যেন এখনও চেপে যাচ্ছেন, কিন্তু সেটা যে কী তা হয়তো



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর পেটে বোমা মারলেও এখন আর জানা যাবে না। ফের কখনও শুভলগ্ন এলে তিনি নিজেই হয়তো সব ফাঁস ক'রে দেবেন, এই কথা ভেবে তাঁকে আর কেউ খোঁচালেন না। বরং এখন তো শিরে-সংক্রান্তি—এখানে মৌরসি পাট্টা গেড়ে ব'সে থেকে তো কোনো লাভ নেই—বরং এখন ভাবতে হবে, এখান থেকে কী ক'রে পালানো যায়। পালাবার রাস্তা তো একটাই—এই অন্য ঢালটা দিয়ে নেমে গিয়ে একবার ঐ উলটোদিকের পাহাড়ের মধ্যে ঢুকতে পারলে আপাতত অন্তত কাই-কুমুর রোষ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। গ্লাসগো থেকে তাঁরা সেই-কবে-যেন বেরিয়েছিলেন *ব্রিটানিয়ার* খোঁজে, তো সেই *ব্রিটানিয়ার* কোনো হদিশ তো মিললোই না—বরং এখন তাঁদের হন্যে হ'য়ে খুঁজতে হবে তাঁদের নিজেদের জাহাজ *ডানকান* কোথায় গেছে। আর *ডানকানকে* খুঁজে পেতে হ'লেও তো এইসব পাহাড়পর্বত পেরিয়ে উপকূলের দিকে যেতে হয়, যেখানে সমুদ্রে আছে। অন্তত কোনো বন্দরে গিয়ে জাহাজিদের কাছে এই খোঁজটা নেয়া যায়—*ডানকান* কোথায় গেছে, সে-খবর তারা কেউ জানে কি না।

আলোচনা ক'রে আপাতত এটাই সাব্যস্ত হ'লো যে এই পাহাড়ের ঢাল থেকে নেমে দূরের ঐ অন্য পাহাড়গুলোর মধ্যে অন্তত ঢুকে-পড়া যাক। আর সে-চেষ্টা করতে গিয়েই বোঝা গেলো, কাই-কুমু মোটেই অমন হাঁদা নয়। খুব-একটা মাথা না-খাটিয়েও সেও এটা ধরতে পেরেছে যে পলাতকেরা এখন এই অন্য ঢালটা দিয়ে নেমেই কেটে পড়বার তালে থাকবে। সেইজন্যে সে তক্ষুনি কড়া পাহারা বসিয়ে দিয়েছে। পাহারা অবশ্যি দূরেই থাকবে, এদিকটার ছায়াও মাড়াবে না কেউ, কিন্তু রাইফেলের গুলি তো আর এখানে আসতে ভয় পাবে না—দূর থেকে এঁদের তাগ ক'রে গুলি করলেই বাছাধনদের আর এখান থেকে বেরুতে হবে না।

নিশ্চয়ই এ-কথাই ভেবেছিলো কাই-কুমু। কেননা একটু নেমে যাবার পরেই তাঁদের তোপ দেগে সম্বর্ধনা জানাবার মতো ক'রেই ঝাঁকে-ঝাঁকে ছুটে এলো বন্দুকের গুলি। ফের ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে পাহাড়ের চুড়োয় আশ্রয় নিয়ে তবে স্বস্তি।

কতগুলো কাগজ উড়ে এসেছিলো বন্দুকের গুলির সঙ্গে। পাঞয়লের কৌতূহল উদগ্র—তাছাড়া বইয়ের পাতা দেখলে সেটায় কী লেখা আছে না-জানা অব্দি তাঁর শান্তি নেই। একটা কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে প'ড়ে দেখলেন পাঞয়ল। 'আরে! এ-যে দেখছি *বাইবেল*-এর একটা পাতা। হতচ্ছাড়ারা দেখছি *বাইবেলের* পাতা ছিঁড়ে বন্দুকে বারুদ ঠাশে। এই শুনুন, কী লিখেছে—"*মহাবিপদে পতিত হইয়া আমি কায়মনোবাক্যে সদাপ্রভুকে ডাকিয়াছিলাম, এবং প্রভু তাহা শুনিয়াছিলেন*"।'

'ঠিক কথা—প্রভুকে কায়মনোবাক্যে ডাকলে তিনি তা শুনবেন না কেন?' এই বিপদের মধ্যে *বাইবেল*-এর এই বয়ান একটু পরিহাসের মতোই ঠেকেছিলো গ্লেনারভনের, কিন্তু এটাও মনে হ'লো হঠাৎ *বিশেষ ক'রে এই পাতাটা* কুড়িয়ে পাবার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যেই হয়তো ঈশ্বরের অপার করুণার কোনো ইঙ্গিত আছে। 'আমরা তো সেই থেকে তাঁকেই একমনে ডেকে যাচ্ছি—নিশ্চয়ই এই সংকট থেকে তিনিই আমাদের উদ্ধার করবেন।'

আর যেন ঠিক তাঁর কথার উত্তরেই পায়ের তলায় থেকে-থেকে কেঁপে উঠলো পাহাড়। কাকতাল? না অন্যকিছু? আরো-কোনো বিষম সংকটের ইঙ্গিত নাকি এই ভূকম্পন?

মাটির নিচে পাতালে আগুন জ্বলছে—আর তারই ধাক্কায় কি পাহাড় কেঁপে উঠছে এখন? অসম্ভব নয়। এখানটায় আসবার সময় যখন ওয়াইকাতো পেরিয়ে আসছিলেন, তখনই দেখেছিলেন অগুনতি উষ্ণ প্রস্রবণ।...মনে প'ড়ে গেলো ভাপে দম আটকে যেতে চাচ্ছিলো, গন্ধকের গন্ধ ঝিম ধরিয়ে দিয়েছিলো হাওয়ায়।

অর্থাৎ আগুনের পাহাড় আছে এখানে—হয়তো পুরো তল্লাটটা জুড়ে ভূগর্ভে একটাই মস্ত আগুনের কুণ্ড জ্বলছে, আর তার জ্বালামুখও আছে অজস্র। মাটি এখানে যেন ঝাঁঝরা হ'য়ে গেছে—কোথাও একটু ফাটল থাকলেই তার ফাঁক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে আগুন, তপ্ত খ্যাপাজল, গন্ধকের গন্ধেভরা কুণ্ডলিপাকানো বাষ্প। সেইজন্যেই হাওয়া এখানে কেমন ঝিম-ধরা, যেন থম মেরে গেছে সবকিছু।

কোন্‌টাকে যে বেশি ভয় পাওয়া উচিত—কাই-কুমুর লোকদের গুলিবর্ষণ, না পাহাড়ের এই আচম্বিতকম্পন—সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছিলো না। পাঞয়ল বললেন, 'এই পাহাড়ও একদিন আগুন ওগরাবে। মাটির তলায় যত গ্যাস জ'মে আছে, তা পাহাড় ফাটিয়ে বেরিয়ে আসবে।'

'কিন্তু এখন? হঠাৎ এমনভাবে মাটি কাঁপছে কেন?' গ্লেনারভন বুঝি একটু শঙ্কিত বোধ করেছেন। '*ডানকানের* বয়লারও তো জাহাজ যখন জোরে ছোটে, কেমন থরথর ক'রে কাঁপে? এও কি সে-রকমই কিছু? না কি একটা-কোনো মারাত্মক—'

তাঁর মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিয়েই যেন বলেছেন মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স : 'বয়লারও পুরোনো হ'লে ফেটে যায়। অথবা তাকে দিয়ে যদি তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু করাবার চেষ্টা করা হয়—'

পাঞয়ল সায় দিয়ে বলেছেন, 'হ্যাঁ। ব্যাপারটা সুবিধের ঠেকছে না। এখানে বেশিক্ষণ থাকা আদৌ নিরাপদ নয়। হঠাৎ পাহাড়ের এই জেগে-ওঠাটাকে খুব ভালো লক্ষণ ব'লে মনে হচ্ছে না। এ যেন হঠাৎ আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠবার চেষ্টা করছে।'

গত্যন্তর না-দেখে আবার এসে কারা-টিটির সমাধিভবনে ঢুকেছেন পলাতকেরা—আর দূর থেকেই তা দেখে মাওরিরা যেন আরো চ'টে গেছে। শুধু গায়ের ঝাল মেটাবার জন্যেই এলোপাথারি গুলি চালাতে শুরু করেছে তারা, যদিও জানে যে এত-দূর অব্দি তাদের গুলি পৌঁছুবে না।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্ত কাঠের খুঁটি বসিয়ে মজবুত বেড়া বেঁধেছে মাওরিরা এই সমাধিভবনের চারদিকে। ভেতরে মৃত যোদ্ধার স্মরণে রেখে গিয়েছে বিস্তর গোলাবারুদ আর পান্নার হাতল দেয়া খঞ্জর—যাতে প্রেতাত্মা অস্ত্রের অভাবে শিকার করা থেকে বঞ্চিত না-হয়। তাছাড়া রয়েছে অন্তত ক-দিনের উপযোগী খাবারদাবার অর্থাৎ ফলমূল, আর পানীয় জল। আছে রাঙাআলু, নানারকম কন্দমূল, আলুও—কিন্তু ফলমূল কাঁচা যদি-বা খাওয়া যায়, ঐ আলু ইত্যাদি রান্না না-ক'রে খাওয়া যাবে কী ক'রে? এখানে কতদিন এভাবে আটকে থাকতে হবে কে জানে। রান্না না-ক'রে এ-সব তাঁরা খাবেন কী ক'রে ? ভাঁড়ারের হাল দেখে মস্ত-একটা সমস্যাতেই প'ড়ে গেছেন পলাতকেরা।

কিন্তু পাঞয়লের মগজে কতরকম যে উদ্ভবনীকৌশল খেলে যায়। ফাটল দিয়ে গ্যাস বেরুচ্ছে দেখে তাঁর মাথায় চমৎকার একটা মৎলব খেলে গিয়েছে। এ-সব আলু রাঙাআলুকে মাটিতে পুঁতে দিলেই তো হয়—দিব্বি গ্যাসের আঁচে ঝলসানো যাবে এদের।

এবং অলবিনেটকে ডেকে তার ব্যবস্থা করতেই ব'লে দিয়েছেন পাঞয়ল। 'কোনো তাপমানযন্ত্র থাকলে বোঝা যেতো ঐ-সব ফাটলের কাছে জমি কতটা তেতে আছে —প্রায় দেড়শো ডিগ্রি ফারেনহাইট তো হবেই। তবে আর ভাবনা কী ?'

তাঁর পরামর্শ শুনে মাটি খুঁড়তে গিয়ে অলবিনেট তো বুঝি নিজেই জ্যান্ত ঝলসে মরে। একটু গর্ত করা মাত্র সেখান দিয়ে হিসহিস ক'রে বেরিয়ে এলো গরম বাষ্প—আরেকটু হ'লেই ছোবল মারতো বুঝি অলবিনেটকে। সে যদি আঁৎকে চিৎপটাং হ'য়ে না-পড়তো, তবে আর-কিছু না-হোক, তার শ্রীমুখটি যে ঝলসে যেতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অবস্থা সঙিন দেখে হুড়মুড় ক'রে ছুটে এলেন মেজর ম্যাক্‌ন্যাবস—আরো দুজন মাল্লাও এলো সঙ্গে। তাড়াহুড়ো ক'রে মাটি আর পাথর দিয়ে বুজিয়ে দেয়া হ'লো গর্তের মুখ—কিন্তু পাতালের ঐ গ্যাসের গায়ে যেন হাজারটা দানবের শক্তি ('দানবের নয়, অশ্বশক্তি বলুন,' তো-তো ক'রে বলতে চেয়েছেন পাঞয়ল)—ঐ পাথর *ঠেলেই* যেন সে বেরিয়ে আসবে। বোতলের ছিপি খুলে দিতেই যেমন বিপদ হয়েছিলো *আরব্যরজনীর* জেলেটির—বেরিয়ে এসেছিলো জিন—সে তো এই বাষ্পের মতোই। গর্তের মুখটায় কিছুতেই যেন আর এই মাটিপাথরের ছিপিটা আটকানো যাচ্ছে না।

গোড়ায় পাঞয়লের মুখটা একটু বিমর্ষ হ'য়ে উঠেছিলো। তাঁর পরামর্শই তো নতুন ক'রে একটা ভয়ংকর কেলেঙ্কারি ঘটাতে যাচ্ছিলো। কিন্তু তাঁর মগজে হরদম নতুন-নতুন ভাবনা খেলে যায়—হয়তো মাথার খুলি ফাটিয়েই বেরিয়ে আসতে চায় ঐ বাষ্পের মতো। কেননা পরক্ষণেই তিনি লাফিয়ে উঠেছেন। '*ইউরেকা! ইউরেকা!*' নিজেকে বোধহয় ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন-কোনো আর্কিমিদেস ব'লেই মনে হয়েছে তাঁর। 'আবার আমাদের কপাল ভালো। একবার পেলুম কারা-টিটির জন্যে রেখে-যাওয়া খাবার, এখন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাচ্ছি মাটির তলার আগুন। এ-যে দেখছি মেঘ না-চাইতেই জল! এ-পাহাড় তো আমাদের সবকিছু জুগিয়ে দিচ্ছে!'

'হ্যাঁ, তা জোগাচ্ছে—যতক্ষণ-না বয়লারের মতো ফেটে যায়,' কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস অন্তত জাহাজের বয়লারের তুলনাটা সহজে ভোলবার পাত্র নন।

'আরে! এতে এত ভয় পাবার কী আছে!' পাঞ্জয়ল অভয় দেবার ভঙ্গিতে বলেছেন। 'এত বছর যখন পাহাড়ের খোলটার বাঁধন সয়েছে, তখন নিশ্চয়ই আরো ক-দিন সইতে পারবে। আর তার মধ্যেই আমরা পালাবো। কিছু-একটা উপায় তার মধ্যে বার ক'রে নিতে পারবোই।'

পাহাড়ের দুলুনি কমেনি বটে, তবে গোড়ায় যেমন থরহরি কাঁপছিলো, এখন আর সে-রকম কাঁপছে না।

'ছোটোহাজরি তৈয়ার,' গম্ভীরভাবে জানালে অলবিনেট। ভাবখানা এমন, যেন সে *ডানকান* জাহাজেই তার স্টুয়ার্ডগিরির কেরামতি দেখাচ্ছে।

ঝাউগাছের শেকড় আর পোড়া রাঙাআলু খিদের মুখে তেমন মন্দ লাগেনি। চটপট ডানহাতের কাজ সেরেই তাজা হ'য়ে গিয়ে পরামর্শসভা বসাতে হবে।

আর পরামর্শসভায় ঐক্যমত্য হ'তে একটুও দেরি হ'লো না। আজ রাতের আঁধারেই গা ঢাকা দিয়ে পালাতে হবে। মাওরিদের গুলির আওয়াজ থেমে গিয়েছে এখন—তবে তারা নিশ্চয়ই কাছে-পিঠেই আছে সজাগচক্ষু পাহারায়। ঠিক হ'লো, গোড়ায় লর্ড গ্লেনারভনই ম্যাঙ্গলসকে নিয়ে একটা সরেজমিন তদন্ত ক'রে আসবেন মাওরিরা কোথায়-কোথায় ঘাপটি মেরে আছে। পথ পরিষ্কার কি না দেখে এসে জানালে সবাই মিলে বেরুতে হবে। পথ না-থাকলেও যে-ক'রেই হোক একটা পথ ক'রে নিতে হবে—পথ কেউ অমনি-অমনি দেয় না।

তাঁরা যখন সমাধিভবন থেকে বেরুলেন, তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাশে একটাও তারা নেই—মেঘ ঝুলে আছে নিচু আর ভারি আর কালো। ঐ দূরে ছোট্ট-একটা আগুনের কুণ্ড জ্বলছে—নিশ্চয়ই সেখানে কাই-কুমু সদলবলে ওৎ পেতে আছে পাহারায়। সরু যে-আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথটা নিচে নেমেছিলো, সেটা ঐ মাওরিদের ঘাঁটির পাশ দিয়েই গেছে। সেইজন্যেই রাস্তা আটকে তারা ওখানটাতেই আগুন জ্বালিয়েছে। কিন্তু সেই আগুনের আলো কতদূর অব্দি পৌঁছুবে? যদি কোনোমতে আলোর নাগালের বাইরে আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে ওটুকু পথ পেরুনো যায়, তাহ'লেই তাঁদের আর পায় কে? কিন্তু তা বুঝি আর হয় না। গ্লেনারভন আর ম্যাঙ্গলস যেই চুপিসাড়ে একটু এগিয়ে গেছেন আগুনের কুণ্ড লক্ষ্য ক'রে, অমনি আচমকা তাঁদের সব আশায় বাদ সেধে ডানদিক থেকে পর-পর কতগুলো বন্দুক গ'র্জে উঠেছে! দুটো গুলি তো গ্লেনারভনের কাঁধ ঘেঁসেই বেরিয়ে গেছে! আমনি ছুটে পালিয়ে আসতে হয়েছে তাঁদের।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসম্ভব! এরা বন্দুক চালাতে জানে, মোটেই আনাড়ি নয়; তাছাড়া অন্ধকারে বনে-জঙ্গলে থেকে-থেকে এদের চোখ যেন বেড়ালের মতোই অন্ধকারেও দেখতে পায়। এদের নজর এড়িয়ে পালানো যাবে না।

তাহ'লে উপায়?

আধোঘুম আর আধোজাগরণের মধ্যেই কারা-টিটির সমাধিভবনের মধ্যে রাত কাটিয়ে দিলেন সবাই। তারপর যখন দিনের আলো ফুটলো, বাইরে এসে দাঁড়ালেন সবাই। দিনের আলোয় দূরের ঐ আগুনের কুণ্ডের আলো এখন মিইয়ে এসেছে—কিন্তু কাই-কুমুর সাঙ্গোপাঙ্গরা যে ওখানেই আছে এবং সজাগই আছে, তার প্রমাণ হ'লো, তাঁদের বাইরে বেরুতে দেখেই তারা সমস্বরে বিকট আওয়াজ ক'রে উঠেছে!

একটু ঘাবড়ে গেলেও এটা তারা জানেন যে ঐ দূর থেকেই তারা খ্যাপার মতো চ্যাঁচাবে, এই *ট্যাবু* ভেঙে যে ওপরে উঠবে সেই দুঃসাহস তাদের আর হবে না।

চারদিক থেকে কুয়াশা তখনও মেলায়নি। কিন্তু ঝিরঝিরে একটা হাওয়া দিয়েছে। হাওয়ার জোর অবশ্য এমন নয় যে সে এক্ষুনি এক ঝটকায় এই কুয়াশাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

হঠাৎ ফের পাঞ্চয়লের মাথায় যেন কারা-টিটির ভূত এসে চেপেছে। তিনি ফের চেঁচিয়ে উঠেছেন : '*ইউরেকা! ইউরেকা!*'

তাঁর মাথায় কোনো ফন্দি এলেই তিনি যে কেন গ্রিক বলেন, সেটা বোঝা দায়!

'আমরা এদের বিশ্বাস আর সংস্কারকেই কাজে লাগাবো।'

মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স বুঝি অনবরত তাঁর এই *ইউরেকা! ইউরেকা!* হুংকার শুনে একটু বিরক্তই হচ্ছিলেন। মনের ভাবটা না-চেপেই তিনি ব'লে উঠেছেন, 'কিন্তু সেটা কীভাবে কাজে লাগাবেন তা এই অধমদের একটু খুলে বললেই পারেন।'

'এদের তো বিশ্বাস এটাই যে *ট্যাবু* ভেঙে যে-ই এই পাহাড়ের ওপরে উঠবে, দেবতাদের রোষ তাকে প্রাণে মারবে। বেশ-তো, কাই-কুমু তাহ'লে ভেবে নিক যে আমরা *ট্যাবু* না-মানার জন্যে জ্যান্ত ঝলসে মরেছি—দেবতাদের অগ্নিচক্ষু আমাদের ভস্ম ক'রে ফেলেছে! একবার যদি তাদের মনে হয় যে আগুনের দেবতা আমাদের কাউকেই রেহাই দেয়নি, তাহ'লে তারা তাদের পাহারা তুলে নিয়ে যে যার নিজের জায়গায় ফিরে যাবে। তখন ফাঁকা রাস্তা পেয়ে আমরাও এখান থেকে কেটে পড়বো।'

'সেটা আপনি ওদের বিশ্বাস করাবেন কী ক'রে?' একটা ফ্যাকড়া তুলেছেন লর্ড গ্লেনারভন। 'বিশ্বাস করাতে পারলে হয়তো মুশকিল আসান হ'তো। কিন্তু ওরা তো দেখেছে—দিব্বি চব্বিশ ঘণ্টার ওপর হ'লো আমরা বহাল তবিয়তে এখানে কাটিয়ে দিয়েছি—ওদের দেবতা আমাদের গায়ে আঁচড়টিও কাটেননি।'

'কাটবেন, কাটবেন,' আশ্বাস দিয়েই বলেছেন পাঞ্চয়ল। 'দেবতার রোষ তো দাউ-



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাউ জ্বলছেই মাটির তলায়—এখন ছিপি খুলে তাকে বের ক'রে আনলেই হয়!'

'সর্বনাশ!' ম্যাঙ্গল্‌স যেন চোখের সামনে বিভীষিকা দেখেছেন। 'আপনি কি আগ্নেয়গিরির কাঁচাঘুমটা ভাঙিয়ে দিতে চাইছেন নাকি? মুখ খুলে দিতে চাচ্ছেন জ্বালামুখের? জানেন তো, বোতলের ছিপি খুলে দেবার পর জিন এসে প্রথমে যাকে পায় তারই ঘাড় মটকে দেয়।'

'আগ্নেয়গিরিকে জাগিয়ে দেবার কথা কে বলছে?' পাঞ্চয়ল যেন বোকা ছাত্রদের মাথায় গজাল মেরে কথাটা ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছেন। 'আমরা একটা নকল অগ্ন্যুৎপাত বানাবো—যেটা আমরা নিজেদের বশে রাখতে পারবো, নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবো। যে-সব ফাঁকফোকরফাটল দিয়ে আগুন বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে, আমরা তাকে আর বাধা দেবো না—বরং সহজে যাতে বেরিয়ে আসতে পারে, তারই ব্যবস্থা ক'রে দেবো। নকল একটা লাভার স্রোত বইয়ে দেবো, যাতে তারা ভয় পেয়ে যায়। মনে রাখতে হবে, সেটা স্রেফ ওদের ধাপ্পা দেবার জন্যেই করতে হবে—আমরা আস্ত আগ্নেয়গিরিটাকে জাগিয়ে দিতে চাচ্ছি না।'

'যদি অগ্ন্যুদগারটাকে নিজের বশে রাখতে পারেন,' মেজর ম্যাকন্যাব্‌সের কথায় তারিফ আর অবিশ্বাসের একটা বিচ্ছিরি মিশোল ছিলো, 'তবে পাগলা ঘোড়াকে বশে আনার চাইতেও সেটা অনেক কঠিন। যদি ভাবনারা হ'তো পক্ষিরাজ ঘোড়া—' আউড়েছেন তিনি পুরোনো প্রবচন।

'আমরা শুধু এমন-একটা ধারণার সৃষ্টি করবো, যাতে ওরা ভেবে নেয় যে ওদের দেশের অগ্নিদেবতা আমাদের তাঁর লেলিহান লোলশিখায় ঝলসে খেয়েছেন। আসলে যখন এখান দিয়ে আগুন বেরুবে, আমরা সবাই কারা-টিটির সমাধিঘরে গিয়ে লুকিয়ে থাকবো!'

'কিন্তু কতক্ষণ লুকিয়ে থাকবো?' গ্লেনারভনের সংশয় যেন কিছুতেই যাবে না। 'একবার আগুনের লকলক শিখা যদি পাতাল থেকে বেরিয়ে এসে আকাশ চাটতে শুরু ক'রে দেয়, তবে আগুন কি আমাদের দেখেশুনে ছেড়ে দিয়ে শুধু বেছে-বেছে অন্যকিছু ভস্ম ক'রে দেবে?'

'তাছাড়া সত্যি আমরা পুড়ে মরেছি কি না দেখবার জন্যে ওরা যদি পাহাড় বেয়ে উঠে আসে?' ম্যাঙ্গল্‌সের সংশয়ও মোটেই কাটেনি।

'আসবে না,' আহাম্মক কতগুলো ছাত্র জুটেছে যেন পাঞ্চয়লের, সহজ কথাটা পর্যন্ত বুঝতে চায় না। 'নিষিদ্ধ পাহাড়ে এসে আস্তানা গেড়েছি ব'লেই তো আগুন আমাদের খেলো। তারপরও তারা *ট্যাবু* ভেঙে পাহাড়ে উঠতে সাহস করবে নাকি? তারা তো নিজের চোখেই জুলজুল ক'রে দেখবে—*ট্যাবু* ভাঙলে কী মারাত্মক সাজা পেতে হয়।'

'আমাদের যখন এমনিতে এখান থেকে পালাবার কোনো রাস্তাই খোলা নেই,' সম্ভবত



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজর ম্যাকন্যাব্‌সের এখন এই ফন্দিটা আর তেমন আজগুবি ঠেকছে না, 'তখন একবার চেষ্টা ক'রে দেখাই যাক না। এমনিতেও তো এখানে হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে থাকলে আমাদের তিলে-তিলে মরতে হবে—তার চেয়ে বরং আগুন-লাভাকে বশে না-রাখতে পারলে একঝাপটাতেই ম'রে যাবো। তপ্ত তাওয়া থেকে যখন জ্বলন্ত উনুনে পড়ে মাছ —তখন তার দশা খুব-একটা পালটায় কি? অবস্থার কি খুব-একটা হেরফের হয় তার?'

ঠিক হ'লো, দিনের বেলায় কিছু করা হবে না, রাতের আঁধার নামলে পরই উসকে দিতে হবে আগুন, খুঁচিয়ে তুলতে হবে পাতালের ঐ অগ্নিকুণ্ড—কিন্তু এদিকটাতেও নজর রাখতে হবে যাতে অগ্ন্যুদ্গারটা এমন প্রচণ্ড না-হয় যে তাঁদের পালাবার পথই আটকে গেলো। মাওরিদের যেটা এতকালের সংস্কার, এতকালের বিশ্বাস, শুধু সেটাকে আরো-চাগিয়ে তোলবার জন্যে যতটুকু আগুন আর লাভা চাই, শুধু ততটুকুরই ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু এ কী আর ইয়র্কশিয়র পুডিং নাকি—নিজের মনোমতো হুকুমমাফিক একটা অগ্ন্যুৎপাত তৈরি করা যাবে? একটু এদিক-ওদিক হ'লেই সাড়ে-সর্বনাশ : নকল অগ্ন্যুৎপাত হ'লেও উৎপাতটা তৈরি করবে তো আসল আগ্নেয়গিরিই। আর সে কি কারু হুকুমের চাকর যে যা বলা হবে তা-ই '*জো হুজুর*' ব'লে তামিল করতে লেগে যাবে? একটা বদ্ধ জায়গা থেকে বাষ্প, লাভা আর গ্যাসকে টেনে বার করবার পর তাকে কি আর পোষমানানো যাবে? একটু আগেই তো অলবিনেট বেচারির চিৎপটাং দশা থেকে একটু শিক্ষা নেয়া উচিত ছিলো। কিন্তু কিছু না-ক'রে হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকলেও তো রেহাই নেই। একবার যদি মাওরিদের মনে বিশ্বাসটা উসকে দেয়া যায় যে দেবতার অভিশাপ লেগেছে, *ট্যাবু* ভাঙবার জন্যে অগ্নিদেবতা খেপে উঠেছেন, জুড়ে দিয়েছেন তাঁর তাণ্ডবনাচ—তাহ'লে তারা প্রাণের ভয়ে শুধু যে এখান থেকে ভোঁ-দৌড় দেবে তা-ই নয়, পালাতে-পালাতে ভাববে, উচিত শিক্ষাই পেয়েছে শাদারা, যেমন নিষেধ মানেনি তেমনি উপযুক্ত সাজাই পেয়েছে।

পরিকল্পনাটা উলটেপালটে, চিৎ ক'রে, উপুড় ক'রে, নানাদিক থেকে দেখা হ'লো —কিন্তু তাতেও যেন সময় আর কাটতেই চায় না। একেকটা ছোট্ট মুহূর্তকেই কে যেন টেনে বিষম লম্বা ক'রে দিয়েছে। তবে শুধু আলোচনাই করেননি সারাক্ষণ, পলাতকেরা পালাবার সমস্ত আয়োজনও সাঙ্গ করেছেন, ছোটো-ছোটো পুঁটুলি ক'রে বেঁধে নিয়েছেন খাবার, কারা-টিটির সমাধির পাশে যত অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ ছিলো, তাও নিজেদের সঙ্গে নিয়েছেন। অলবিনেট সন্ধে ছ-টা নাগাদ খাবার পরিবেষণ করলে—এটাই তাঁদের *লাস্ট সাপার* বা শেষ ভোজ কি না কে জানে। আর খেতে-খেতেই দেখা গেলো মেঘ জমছে দিগন্তে, দু-একবার বিদ্যুৎও চমকালো। আর তাই দেখে পাওয়ল বেশ খুশিই হ'য়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠলেন। একবার তাঁরা নিজেরাই একসঙ্গে জল আর আগুনের লীলাখেলা দেখেছেন সেদিন—অভিজ্ঞতাটা তাজ্জব হ'লেও তেমন মুখরোচক হয়নি। এবার মাওরিরাও দেখবে —ওপরে ঝড় গর্জাবে, নিচে পাহাড় ফেটে আগুন ছড়াবে। আর তাতে হয়তো তারা ভাববে যে *ট্যাবু* ভাঙায় আদিম দেবতারা সব্বাই এতটাই রেগে গিয়েছেন যে আজ বুঝি আর-কারু রক্ষে নেই।

আটটা বাজতে না-বাজতেই অন্ধকার যেন নিশ্ছিদ্র হ'য়ে নেমে এলো। এমনিতে হয়তো আকাশে চাঁদ আর তারা থাকতো— কিন্তু মেঘের দাপটে আজ রাতে তারাও কোথায় মুখ লুকিয়েছে। আর এটাই সুবর্ণসুযোগ। মাওরিরা জঙ্গলে অন্ধকারে থেকে অভ্যস্ত হ'লেও আজকের মতো নিরেট-নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ভেদ ক'রে এতদূরে কিছুই দেখতে পাবে না—দেখতেই পাবে না এই উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা উটকো শ্বেতাঙ্গরা কী করছে।

কারা-টিটিকে যেখানে মাটিচাপা দেয়া হয়েছে, তা থেকে প্রায় তিরিশ হাত দূরে মস্ত একটা ভারি পাথর ছিলো—দেখে মনে হ'তে পারতো এই মস্ত পাথরটা দিয়ে কেউ যেন কোনো খুদে জ্বালামুখের মুখে ছিপির মতো আটকে দিয়েছে। কেননা পাথরটার চারপাশ দিয়ে সামান্য যা ফাটল আছে—পুরো মুখটা বোধহয় খাপে-খাপে বোজেনি— তা দিয়ে এতক্ষণ হিস-হিস ক'রে গ্যাস বেরুচ্ছিলো। এখন পাথরটাকেই ঠেলে সরিয়ে দিতে হবে—তাহ'লেই, মুখটা খুলে যেতেই বেরিয়ে আসবে জ্বলন্ত বাষ্প, আগুনের শিখা, তপ্ততরল লাভা—আর বিজ্ঞান তো বলে তরল পদার্থ গড়িয়ে নিচে নেমে যায়, ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠে না— অতএব সে-সব নেমে যাবে নিচের দিকে, কারা-টিটির সমাধিভবনের দিকে বেয়ে-বেয়ে উঠে আসবে না।

কিন্তু তার আগে মাটি কেটে একটা খাত তৈরি ক'রে দিতে হবে, যাতে সেই খাতটা দিয়েই নিচে গড়িয়ে নামে লাভা। পাথরটাকেও ঠেলে সরাতে গেলে খেয়াল রাখতে হবে সেটা যাতে এলোপাথারি নিচে নেমে না-যায়—ঐ খাত ধ'রেই সে যেন গড়গড় ক'রে নেমে যায়। সমাধিভবনের একটা কাঠের খুঁটি উপড়ে এনে সেটা খাঁজের মধ্যে পাথরের তলায় আড়কাঠের মতো চালান ক'রে দিয়ে সবাই মিলে 'হেঁইয়ো-জোয়ান' ব'লে একটা বিষম হ্যাঁচকা চাড় দিলেন। আর আচমকা ঠেলা লেগে পাথরটা যে শুধু কাৎই হ'লো, তা নয় —ঐ খাঁজ-কাটা খাত দিয়ে গড়িয়ে পড়লো।

আর অমনি যেন শুরু হ'লো প্রলয়। দুম ক'রে ফেটে গেলো মাটির পাৎলা আস্তর —গর্ত ফেটে বেরিয়ে এলো জ্বলন্ত গ্যাস, আর তারপর একটার পর একটা বিস্ফোরণ, মাটি কেঁপে উঠলো, যেন অ্যাটলাসের কাঁধের ওপর আস্ত পৃথিবীটাই বিষম ন'ড়ে উঠেছে, আর তরল আগুনের স্রোত নামতে শুরু করলো ঢাল বেয়ে।

নিশ্চয়ই কুণ্ডলি পাকিয়ে নিচে থেকে এতক্ষণ অবিশ্রাম ঠেলা দিচ্ছিলো গ্যাস, একটু



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাঁক পেয়ে এখন এমন তোড়ে বেরুতে শুরু করেছে যে চারপাশের মাটির চাঙাড় ভেঙে নিচে প'ড়ে গেলো, আর জ্বালামুখের বেড়টা আচমকা অনেকটাই বড়ো হ'য়ে গেলো, গলগল ক'রে বেরুতে লাগলো লাভা।

আর ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়বার সময় সেই লাভা সঙ্গে ক'রে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে নুড়িপাথর কাঠকুটো যা সামনে পাচ্ছে তা-ই। আঁৎকে, সবাই হুড়মুড় ক'রে গিয়ে ঢুকলেন কারা-টিটির সমাধিঘরেই। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার! সেদিন গ্লেনারভনের হাতেই মরেছে কারা-টিটি, কিন্তু বারে-বারে তাঁকে আর তাঁর সঙ্গীদের ফিরে আসতে হচ্ছে যেখানে সে তার শেষনিদ্রায় শুয়ে আছে—কিছুতেই সে যেন এঁদের কাউকেই তার কাছ ছেড়ে যেতে দেবে না—কোন্-এক তাজ্জব আর অদৃশ্য বাঁধন দিয়ে সে যেন আটকে রেখে দিতে চাচ্ছে সবাইকে।

সারাটা আকাশ ততক্ষণে লালে-লাল! এ কোনো যেমন-তেমন লাল নয়, রাগি লাল, খ্যাপা লাল! আর নিচে মাওরিদের মধ্যে হুলুস্থুল প'ড়ে গিয়েছে। নিষিদ্ধ পাহাড়ে পা দিয়েছে ব'লে খেপে গিয়েছেন পাতালের আগুনদেবতা, আগুন ওগরাতে শুরু করেছে নিষিদ্ধ পাহাড়, পালাও, পালাও, প্রাণ হাতে ক'রে পালাও, এক্ষুনি! 'অমঙ্গল! অমঙ্গল!' সম্মিলিত চীৎকার : '*ট্যাবু! ট্যাবু!*' আর সেই আতঙ্কের চীৎকারও এখন মিশে যাচ্ছে অগ্ন্যুদ্গারের নির্ঘোষের সঙ্গে।

পাঞয়লের বুদ্ধিটা বোধহয় সর্বনাশই নিয়ে এসেছে ডেকে! এতদিন যা ছিলো পাথরচাপা, এখন তা খোলা মুখ পেয়ে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসছে। এতকাল এখানকার বাষ্পের চাপ টোনগারিরোর জাগ্রত জ্বালামুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতো, কিন্তু এখন সব গ্যাস, সব লাভা বেরিয়ে আসছে এই নতুন মুখটা দিয়ে। আর বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠছে সমস্ত পাহাড়। অ্যাটলাস বুঝি আর তার কাঁধের ওপর বইতে পারছে না পৃথিবীকে—তার বুঝি পা টলছে। আর এই ভূকম্পন, বিস্ফোরণ আর অগ্নিবমনের সঙ্গে তাল রেখেই খেপে উঠেছে আকাশ, বিদ্যুৎ ফালা-ফালা ক'রে চিরছে অন্ধকারকে, বজ্র হুংকার দিয়ে উঠছে ঘন-ঘন।

*'অবরুদ্ধ ছিলো বাষ্প, বিস্ফোরণ দীর্ণ করে ঢাকা—*
*উদ্দাম বেরিয়ে আসে পাতালের চাপা-পড়া রোষ—*
*তরল আগুনে নাচে ক্ষিপ্তলাল মৃত্যুরই পতাকা—*
*সমস্ত না-ধ্বংস হ'লে শান্ত বুঝি হবে না আক্রোশ!'*

হঠাৎ কার যেন একটা কবিতার টুকরো মনে প'ড়ে গেলো পাঞয়লের।

সারারাত আগ্নেয়গিরি তার আক্রোশ ঢেলে দিলে লাভার আকারে। ভোরবেলাতেও



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার রোষ আদৌ প্রশমিত হয়নি। ঝড়ও সমানতালে বাজ ফাটাচ্ছে—যেন হাততালি দিচ্ছে দৃশ্যটাকে। আর, নিচে, মাওরিদের মধ্যে আতঙ্ক যেন ক্রমশই সব সীমা ছাপিয়ে যাচ্ছে।

তারই মধ্যে কাই-কুমু এসে নতুন ক'রে *ট্যাবু* জারি ক'রে গেলো, শুধু-যে আগুনের পাহাড়টাই পুরোপুরি নিষিদ্ধ হ'লো, তা নয়—নিষিদ্ধ হ'লো পাহাড়তলিও। আর তারপর এই রাক্ষুসে-অমঙ্গলের জায়গা ছেড়ে চ'লে গেলো মাওরিরা—আজ থেকে এই তল্লাটই তারা আর মাড়াবে না।

সেই অর্থে পাঞয়লের ফন্দিটা কাজে খেটে গেছে। এখন শুধু অপেক্ষা করতে হবে কখন থামে আগুনের এই সংহারলীলা।

আর অপেক্ষাতেই কাটলো সারাটা দিন। বিকেলের দিক থেকে অগ্ন্যুদগারের প্রথম চোটটা একটু কমলো। রাত নটা নাগাদ শান্ত হ'য়ে এলো পাহাড়, জ্বালামুখ দিয়ে শুধু ধোঁয়া উঠছে এখন—বাষ্পের সেই তেজ আর নেই, আর বেরুচ্ছে না তরল আগুন। কিন্তু এটা যে একটা অগ্ন্যুদগার থেকে আরেকটা অগ্ন্যুদগারের মধ্যকার সাময়িক বিরতি নয়, তা কে জানে? আর একমুহূর্তও দেরি নয়। পলাতকেরা ঠিক করেছেন, এক্ষুনি এখান থেকে নেমে যাবেন, সোজা ছুটবেন উপসাগরের দিকে। পাঞয়ল সমস্ত বিপদ-আপদের মধ্যে একবারে জন্যেও নিউ-জিল্যাণ্ডের মানচিত্র কাছ-ছাড়া করেননি। তিনি মোটামুটি ছক ক'ষে নিয়েছেন—কোন্‌দিকে গেলে উপসাগর পড়বে। এখন শুধু সেদিক দিয়েই তাঁদের চলতে হবে, যতক্ষণ-না তাঁরা গিয়ে উপসাগরের তীরে পৌঁছোন।

সেই-যে তাঁরা চলতে শুরু করেছেন, তারপর যে কতক্ষণ কেটেছে, কারু খেয়াল ছিলো না। সকাল নটায় ক্লান্ত দেহগুলিকে প্রায় টেনেহিঁচড়েই যেন নিয়ে যেতে হচ্ছিলো তাঁদের। শুধু স্নায়ুর জোর আর অপ্রশম্য উত্তেজনাই একনাগাড়ে প্রায় বারো ঘণ্টা হাঁটিয়ে নিয়ে এসেছে তাঁদের। সামান্য বিশ্রামের পর আবার শুরু হ'লো তাঁদের পথচলা। এখন তাঁরা যে-জায়গাটার মধ্যে দিয়ে চলেছেন, সেটাকে প্রায় আগুনের দেশই বলা যায়—এখনও তাঁরা আগ্নেয়গিরির পাল্লা থেকে বেরুতে পারেননি। মাইলের পর মাইল জুড়ে পর-পর এসেছে ছোটোবড়ো আগুনজ্বালা হ্রদ, ফোয়ারার মতো গরম বাষ্পে ভরা জল আকাশ লক্ষ্য ক'রে উগরেছে উষ্ণ প্রস্রবণ, গন্ধকের ঝর্না থেকে বেরিয়ে এসেছে ঝাঁঝালো দমআটকানো গন্ধ।

পাঞয়ল মোটামুটি আন্দাজ ক'রে নিয়েছেন কোনদিক দিয়ে যেতে হবে—কিন্তু দু-একটা ছোটোখাটো হুঁ-হাঁ ছাড়া তাঁর মুখে আর-কোনো বুলি নেই, যে-মুখে সারাক্ষণ খই ফুটতো সে-মুখ এখন চুপ, কেমন যেন গম্ভীরও, কী-একটা অদ্ভুত বদল এসেছে তাঁর মধ্যে, সেই লাল-কালো আলখাল্লাটা মুড়ি দিয়ে সারাক্ষণ কী যেন ভাবতে-ভাবতে কলের মতো পথ চলেছেন তিনি।

আর এইভাবেই দিনের পর দিন। কখন ছাড়িয়ে এসেছেন আগ্নেয়গিরির অঞ্চল,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবে ঢুকেছেন গভীর জঙ্গলে, কবে যে পেরিয়ে এসেছেন সেই জঙ্গলও, সেটাই যেন কারু খেয়াল নেই। শুধু হুঁশিয়ার থাকতে হয়, যখন মনে হয় কাছেই আছে মাওরিদের বসতি, না-হ'লে শুধু ধুঁকতে-ধুঁকতে একটানা চলো, যতক্ষণ-না চোখের সামনে দেখতে পাও বিশাল-নীল জলের বিস্তার। যেন একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে চলেছেন সবাই, কি-রকম একটা আচ্ছন্নভাব, তার মধ্যে আশাও নেই—হতাশাও নেই, শুধু মোহ্যমান বিধুর দশা—যেন পাঞয়লেরই ছোঁয়াচে রোগটা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, সকলের মুখ থেকেই সব কথা ফুরিয়ে গিয়েছে, কেউ যেন আর-কিছু ভাবতেও চাইছে না, কে যেন অদৃশ্য থেকে সমানে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাঁদের।

আর এইভাবে যখন শেষটায় প্রশান্ত মহাসাগরের কাছে বসতির মধ্যে এসে পৌঁছুলেন সবাই, তখন আবার নতুন-একটা বিভীষিকারই যেন মুখোমুখি হ'তে হ'লো। একটা বিধ্বস্ত গ্রাম। শূন্য-সব কুঁড়েবাড়ি। ছারখার সব খেতখামার। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মাওরিদের মৃতদেহ—সেগুলো প'চেও যায়নি। যার মানে হ'লো সদ্য সেখানে শাদাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিলো মাওরিদের, আর ত্রস্ত ও বিপর্যস্ত—যে যেদিকে পারে পালিয়েছে, যারা পালাতে পারেনি—শিশুনারীবৃদ্ধ—তাদের মৃতদেহ প'ড়ে আছে শেয়াল ও শকুনের খাদ্য হবে ব'লে।

আর একটু দূরেই দেখা যাচ্ছে, ডাঙাটা অন্তরীপের মতো সরু ফালি হ'য়ে ঢুকে পড়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের জলে। মৃতের এলাকায় এসে যতটা মনখারাপ হয়েছিলো, এই দূর নীল জলের ঢেউ ঠিক ততটাই নূতন উদ্যম এনে দিলে সকলের মাঝে। আর তারপরেই একটা হৈ-হৈ রৈ-রৈ চীৎকারে যেন চটকাটাই ভেঙে গেলো আচমকা। পেছনে রে-রে ক'রে তেড়ে আসছে একদল মাওরি। হয়তো তারা তাকে-তাকে ছিলো, কীভাবে বদলা নেবে, কীভাবে শাদাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে তাদের প্রতিহিংসা, আর এই বিধ্বস্ত ছোট্ট দলটাকে দেখেই আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে তাড়া ক'রে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই চেঁচিয়ে উঠেছেন কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স : 'নৌকো! নৌকো!'

কছেই, সমুদ্রের ধারেই, বালিয়াড়ির মধ্যে প'ড়ে আছে ছয়-দাঁড়ের একটা ছিপছিপে ক্যানু। ভাবার কোনো সময় নেই। তক্ষুনি ক্যানুতে চেপে সেটা তাঁরা ভাসিয়ে দিলেন সাগরজলে, দেখতে পেলেন মাওরিরা ডাঙায় দাঁড়িয়ে তাঁদের দিকে চেয়ে অস্ত্রশস্ত্র নেড়ে উৎকট আস্ফালন করছে। কিন্তু এদের হাত এড়িয়ে তো জলে ভেসে-পড়া গেছে। আর ভয় কী ? ম্যাঙ্গল্‌স তীর থেকে বেশি-দূরে নিয়ে যেতে দেননি ক্যানুটা, তীরের সমান্তরাল প্রায় মাইলখানেক দূর দিয়ে যাবেন ব'লেই হালে ব'সে দিক ঠিক করেছেন, আর অন্যরা সবেগে দাঁড়া বাইছে।

কিন্তু কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সের পরিকল্পনায় জলাঞ্জলি দিতে হ'লো কয়েক মিনিটের মধ্যেই। অন্তরীপের মুখ থেকে তাঁদের ক্যানুকে লক্ষ্য ক'রে ছুটে আসছে মাওরিদের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনটে ক্যানু—সেগুলো আরো-লম্বা, আরো-বেশি দাঁড়ের, আরো-দ্রুতগামী। নাগাল প্রায় ধ'রেই ফ্যালে দেখে প্রমাদ গুনলেন কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স। কিছু না-ভেবেই ক্যানুটার মুখ ঘুরিয়ে দিলেন বারদরিয়ার দিকে।

আর শুরু হ'লো নৌকোর বাইচ। অসমান এক প্রতিযোগিতা। এঁরা সবাই পথের ধকলে ধুঁকছেন, মাওরিরা যুদ্ধে বিপর্যস্ত হ'লেও এঁদের মতো এখন নেতিয়ে পড়েনি, বরং প্রচণ্ড তেজেই এগুচ্ছে। আর তারপর যেই পাল্লার মধ্যে এসেছে তাঁদের ক্যানু, মাওরিদের কাছ থেকে সম্ভাষণ এসেছে ঝাঁকে-ঝাঁকে বন্দুকের গুলিতে।

সামনে অথৈ দরিয়া, পেছনে বন্দুকের গুলি! কিন্তু বন্দুকের গুলি তো সাক্ষাৎ মৃত্যু! তার চেয়ে বরং সমুদ্র লক্ষ্য ক'রে চলাই ভালো। মরণ যদি আসে, তবে সে আসুক সিন্ধুজলেই। তাঁরা তো *ডানকান* নিয়ে জলেই ভেসেছিলেন একদিন—কবে, সে এখন স্বপ্নের মতো মনে হয়, কিন্তু দূরের সমুদ্রের দিকে তাকিয়েই গ্লেনারভন চীৎকার ক'রে উঠলেন খ্যাপার মতো : 'জাহাজ! জাহাজ!'

অমনি পাওয়ল তাঁর চোখ রাখলেন তাঁর টেলিস্কোপে, যে-টেলিস্কোপ তাঁর বুকেই ঝোলে সারাক্ষণ, দড়ি দিয়ে বাঁধা।

সত্যি-তো, একটা স্টীমশিপ ছুটে আসছে এদিকটায়, আর ছুটে আসছে পুরোদমে, ভলকে-ভলকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে তার চোঙ দিয়ে, পেছনে শুধু ঢেউয়ের রেখা এঁকেই এগুচ্ছে না, আকাশেও যেন এঁকে দিচ্ছে ধোঁয়ার পুচ্ছ!

আর এটাই যেন নতুন উৎসাহ এনে দিয়েছে সকলের মধ্যে। চৌদুনে সবাই দাঁড় চালাচ্ছে এখন। বাষ্পেচলা জাহাজটা অনেকটাই কাছে এসে পড়েছে এখন। দুটো মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। পেছনে কিন্তু মাওরিদের ক্যানুগুলো থেকে বিরামহীন গুলি আসছে ঝাঁকে-ঝাঁকে। তবে যদি জাহাজটাকে ধ'রে ফেলা যায় এক্ষুনি—

পরক্ষণেই দুরবিনে চোখ লাকিয়ে গ্লেনারভনের মুখ পাংশু হ'য়ে গেলো—এক-নিমেষে কেউ যেন সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে তাঁর মুখ থেকে। '*ডানকান*! বোম্বেটেজাহাজ *ডানকান*!'

কেউ কি কখনও ভেবেছিলো, একদিন লর্ড গ্লেনারভন নিজের এত সাধের জাহাজটাকে দেখে আতঙ্কে নীল হ'য়ে যাবেন? এটা যদি নিয়তির নির্মম পরিহাস না-হয়, তবে পরিহাস আর কাকে বলে?

'*ডানকান*!' সঙ্গে-সঙ্গে হাল থেকে লাফিয়ে উঠেছেন জন ম্যাঙ্গল্‌স। *ডানকান* শুধু লর্ড গ্লেনারভনেরই জাহাজ নয়—তাঁরও জাহাজ! তিনিই ঐ জাহাজের কাপ্তেন।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, *ডানকান*!' গ্লেনারভন বোধহয় এবার পাগলই হ'য়ে গেছেন বুঝি। 'সামনে মৃত্যু—*ডানকান*! পেছনেও মৃত্যু—মাওরিদের ক্যানু!'

আর যেন তাঁর খ্যাপা হাহাকারের উত্তরেই *ডানকানের* ডেক থেকে গ'র্জে উঠলো



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামান—তুলকালাম আওয়াজ ক'রে মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেলো কামানের গোলা। আর পেছন থেকে, সমানে তখনও বন্দুকের গুলি ছুটে আসছে তাঁদের ক্যানু লক্ষ্য ক'রে।

সামনে কামান, পেছনে বন্দুক! দুইই আগুন ওগরাচ্ছে! সামনে বোম্বেটেরা—পেছনে মাওরিরা! দু-দলই মায়াদয়ার ধার ধারে না!

কিন্তু ততক্ষণে জন ম্যাঙ্গল্‌সকে সজোরে আঁকড়ে ধরেছে রবার্ট : 'টম অস্টিন! টম অস্টিন! ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে ডেকের ওপর! হ্যাঁ-হ্যাঁ, টম অস্টিনই! আমাদের চিনতে পেরেছে—ঐ যে মাথার টুপি খুলে নাড়ছে—সে-তো আমাদের দেখেই—'

জন ম্যাঙ্গল্‌স ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলেন *ডানকানের* দিকে! এও কি সম্ভব? কিন্তু পরক্ষণেই *ডানকানের* ডেক থেকে আবার গ'র্জে উঠলো কামান। আর গোলাটা এবার চাঁদমারি খুঁজে পেয়েছে। মথার ওপর দিয়ে তীব্র ও ধারালো শিস্ তুলে ছুটে গিয়েছে মাওরিদের একটা ক্যানুর দিকে—আর সেটা গোলার ঘায়ে দু-টুকরো হ'য়ে যেতে-যেতে যেন জল থেকে একটা বিষম লাফ দিয়েছে শূন্যে!

আর মাঝখানের ক্যানুটা গোলায় উড়ে যেতেই থমকে পড়েছে অন্য ক্যানু দুটো।

তারপর আবারও একটা কামানের গর্জন!

আর এই তৃতীয় গোলাটা উড়ে গিয়ে মাওরিদের কোনো ক্যানুতে পড়বার আগেই মাওরিরা বেগতিক দেখে, প্রায় যেন হতভম্বভাবেই, উলটোদিকে—তীরের দিকে—তাদের ক্যানুর মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে!

কখন যে তারপরে লর্ড গ্লেনারভনেরা নিজেদের জাহাজের ডেকে পা রেখেছেন, তা তাঁরা নিজেরাই জানেন না। পুরো ব্যাপারটাই কোনো অতিকায় স্বপ্ন নয়তো? স্বপ্নে যেমন সব থাকে ছেঁড়া-ছেঁড়া, কার্যকারণসম্পর্কবিহীন, কাকতালের উল্লাসে ভরা এলোমেলো সংলগ্ন-অসংলগ্ন সব দৃশ্য—এও তার মতো কিছু নয়তো?

তাঁরা কি তবে সত্যি এসে উঠেছেন *ডানকানে*? সে কি তবে বোম্বেটের জাহাজ নয় এখনও?

## চার

## কৌতুকের ঘূর্ণিপাকে

মাত্র তিনমাস আগে যাঁরা, আশায় ভরপুর, *ডানকান* থেকে নিঃশঙ্ক চিত্তে ও উৎফুল্ল আননে নেমে গিয়েছিলেন, আজ তাঁরাই—না, পরিকল্পনামাফিক নয়, বরং মানুষের কষা সমস্ত



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণিতকেই বানচাল ক'রে দিয়ে—অপ্রত্যাশিতভাবে যেন নেহাৎ কপালজোরেই ফিরে এসেছেন *ডানকানের* ডেকে। কিন্তু এ-কী হতশ্রী চেহারা তাঁদের? ছেঁড়াখোঁড়া জীর্ণ পোশাক, উদভ্রান্ত ব্যাকুল শুষ্কশীর্ণ মুখ, চোখে এ-কী-রকম অসহায় ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি? গ্লেনারভন এমন কল্পনাতীতভাবে *ডানকানে* উঠে এসে তখনও যেন বুঝে উঠতে পারেননি গোটাটাই কোনো স্বপ্ন, না কি সত্য। জাহাজের মাঝিমাল্লারা অবশ্যি হঠাৎ তাঁদের ফিরে পেয়ে তুমুল হৈ-চৈ জুড়ে দিয়েছে। কিন্তু লেডি হেলেনা আর লর্ড এডওয়ার্ডের দশা যেন তাদের পুনর্মিলনের উৎসবে একটু ঠাণ্ডাজলই ঢেলে দিলে।

খিদেয় প্রায় নুয়ে পড়েছেন, অবসাদে দেহ ভেঙে পড়ছে—তবুও লর্ড গ্লেনারভন কিন্তু প্রথমেই টম অস্টিনের কাছে জানতে চাইলেন, টুফোল্ড উপসাগরের মুখে না-গিয়ে-*ডানকান* নিউ-জিল্যাণ্ডের পুব-উপকূলে কী করতে এসেছে? তবে কি জাহাজটাকে নরাধম দস্যু বেন জয়েস দখল করতে পারেনি? তাছাড়া জেল থেকে পালানো সেইসব কয়েদিরাই বা কোথায়?

'জেলপালানো কয়েদি?' টম অস্টিন যেন আকাশ থেকেই পড়েছে। এ-কথার অর্থ? লর্ড গ্লেনারভন কি জানেন, তিনি কী-সব আবোলতাবোল বকছেন?

'হ্যাঁ-হ্যাঁ! ঐ যারা জাহাজটা দখল ক'রে নেবে ব'লে হানা দিয়েছিলো?'

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়! এবারে বিভ্রান্ত ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি বুঝি-বা টম অস্টিনেরই। 'জাহাজে হানা দিয়েছিলো? কারা? কোন জাহাজে?'

'কেন? *ডানকানে*! বেন জয়েস আসেনি *ডানকানে*?'

'কে বেন জয়েস? আমি তার নামও শুনিনি কখনও, চোখে দেখা তো দূরের কথা।'

'দ্যাখোনি? তাহ'লে টুফোল্ডের মুখে না-গিয়ে *ডানকান* এখানে—নিউ-জিল্যাণ্ডের এই পূর্ব-উপকূলে কী করছে?'

'বাঃ রে, সে তো আমরা আপনার হুকুমেই এখানে এসেছি।'

'*আমার হুকুমে*?!'

'নিশ্চয়ই। না-হ'লে আমরা খামকা মেলবোর্ন ছেড়ে বেরুবো কেন? চোদ্দই জানুয়ারি যে-চিঠি পাঠিয়েছিলেন, কালবিলম্ব না-ক'রে তক্ষুনি তা পালন করেছি—অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্র থেকে বেরিয়ে পড়েছি।'

'আমার চিঠি? আমি তোমাকে চিঠিতে অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে নিউ-জিল্যাণ্ডে চ'লে আসতে বলেছিলুম?'

এ-কোন চিঠির কথা বলছে টম অস্টিন? একটা চিঠি তিনি লিখেছিলেন—না, তিনি নিজের হাতে লেখেননি, জখম হ'য়ে গিয়ে ব্যথায়-অবশ হাতটা তিনি তখন প্রায় নাড়তেই পারতেন না, তবে তাঁরই বয়ান অনুযায়ী সেটা গোটা-গোটা হরফে স্পষ্ট ক'রে লিখে দিয়েছিলেন জাক পাঞ্জল। তিনি চিঠিটা না-প'ড়েই কোনোমতে শুধু তলায় নাম সই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক'রে দিয়েছিলেন।

গ্লেনারভনের মাথাটা আবার কেমন যেন ঘুরে গেলো। সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে। অন্যরা পাশেই দাঁড়িয়ে এতক্ষণ এই কথোপকথন শুনছিলো, তারাও সবাই কি-রকম যেন বোমকে গিয়েছে। টম অস্টিন যে কী বলতে চাচ্ছে, তা-ই কারু মাথায় ঢুকছে না। *ডানকান* যে নিউ-জিল্যাণ্ডের পূর্ব-উপকূলে সমুদ্রে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, তা নাকি লর্ড গ্লেনারভনেরই নির্দেশমাফিক!

আবেশটা কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা করেছেন তখন গ্লেনারভন। 'এ আমি কোনো স্বপ্ন দেখছি না তো? .. আচ্ছা, এক-এক ক'রে সব শুনি। প্রথমেই—টম, সত্যি ক'রে বলো, তুমি কি আমার কোনো চিঠি পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। পেয়েছি।'

'মেলবোর্নে?'

'মেলবোর্নেই। আমরা তখন *ডানকানের* মেরামতি নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম।'

'চিঠিটা কী-রকম? আমার লেখা?'

'না, হাতের লেখাটা আপনার ছিলো না বটে, আপনার বকলমে নিশ্চয়ই আর-কেউ লিখেছিলেন, তবে তলায় আপনার নাম সই ছিলো।'

'চিঠিটা কে নিয়ে এসেছিলো? বেন জয়েস? সেই ভয়ংকর দস্যু, যার নামে অস্ট্রেলিয়ায় হুলিয়া বেরিয়েছিলো?'

'কই, না তো। চিঠি যে নিয়ে এসেছিলো তার নাম তো আয়ারটন। সে তো *ব্রিটানিয়া* জাহাজের কোয়ার্টারমাস্টার ছিলো।'

'আয়ারটন আর বেন জয়েস একই লোক। কিন্তু কী লেখা ছিলো চিঠিতে?'

'লেখা ছিলো : চিঠি পাবামাত্র যেন একমুহূর্তও দেরি না-ক'রে—'

অত কথা শোনবার মতো ধৈর্য বুঝি তখন ছিলো না গ্লেনারভনের। 'অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব-উপকূলে টুফোল্ড উপসাগরের মুখে যেতে বলেছিলুম।'

এবার আবারও হতভম্ব হবার পালা বেচারা টম অস্টিনের। '*অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব-উপকূলে?* না তো। স্পষ্ট ক'রে লেখা ছিলো, একমুহূর্তও দেরি না-ক'রে যেন নিউ-জিল্যাণ্ডের পূর্ব-উপকূলে চ'লে আসি।'

'*না! না! না!*' এতক্ষণ যারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে এই কথোপকথন শুনছিলো, এবার তারা সকলেই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছে।

টম অস্টিন এবার সত্যি ঘাবড়ে গিয়েছে। একটা চিঠিও কি সে ঠিকমতো পড়তে পারে না? মাত্র দু-তিনটে লাইন? চিঠি প'ড়ে সে তো যেমন নির্দেশ ছিলো তা-ই করেছে। তবে কি চিঠিটা পড়তেই তার ভুল হয়েছে?

এতদিন সে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই সব কাজ ক'রে এসেছে। সকলেই বলতো,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। একদিন নিজেই সে কোনো জাহাজ চালাবার ভার পাবে—খোদ কাপ্তেন হ'য়ে উঠবে। আর ঠিক যখনই একটা জাহাজ নিজে থেকে চালাবার ভার পেয়েছে, মহড়া দিচ্ছে কাপ্তেনগিরির, *ট্রায়াল রান* যাকে বলে, ঠিক তখনই এত-বড়ো একটা মারাত্মক ভুল ! তার এতদিনের সুনামের পাশে অ্যাদ্দিনে একটা মস্ত কালো ঢ্যাঁড়া প'ড়ে গেলো ? পারলে সে যেন কোনো শামুকের মতো এক্ষুনি তার খোলার ভেতর গুটিয়ে যেতো!

তার লাল-হ'য়ে-যাওয়া মুখটা দেখে কেমন যেন দয়াই হয়েছে গ্লেনারভনের। তিনি সান্ত্বনার সুরে বলেছেন : 'অত মনখারাপ কোরো না। তোমার ভুলে বরং শাপেবরই হয়েছে —ঐ ভুলটা না-করলে আজ আর তোমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে পারতুম না।'

ততক্ষণে টম অস্টিন নিজেকে সামলে নিয়েছে। 'মাপকরবেন, মি-লর্ড। এত-বড়ো কোনো ভুল আমি করতেই পারি না। সে-চিঠি শুধু আমিই পড়িনি, আয়ারটনও পড়েছে। সে বরং চিঠি প'ড়ে হম্বিতম্বি করছিলো। বলছিলো, চিঠিতে ভুল লেখা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব-উপকূলে জাহাজটাকে নিয়ে যাবার জন্যে সে বরং জোরজবরদস্তি করতে চাচ্ছিলো।'

'*আয়ারটন* ?!'

'হ্যাঁ। সে ধুয়ো ধরেছিলো, চিঠিতে নাকি ভুল লেখা হয়েছে। আপনি নাকি *ডানকানকে* টুফোল্ড উপসাগরের মুখেই নিয়ে যেতে বলেছেন।'

এতক্ষণে অকুস্থলে নেমে পড়েছেন মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স। তাঁর মাথার মধ্যে সমস্তকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিলো। 'টম, চিঠিখানা কোথায়? সেটা দেখলেই তো সব ভুলবোঝাবুঝি দূর হ'য়ে যাবে।'

'আনছি।' ব'লেই ঊর্ধশ্বাসে নিজের ক্যাবিনে ছুটে গিয়েছে টম অস্টিন।

আর সে চ'লে যেতেই সবাই একসঙ্গে কলরব ক'রে উঠেছেন। এ আবার কেমনতর প্রহেলিকা! ছিলো অস্ট্রেলিয়া, হ'য়ে গেলো নিউ-জিল্যাণ্ড! ব্যাঙাচির ল্যাজ খ'সে পড়লে ব্যাঙ হ'য়ে যায়, এটা সবাই জানে। কিন্তু কোথায় AUSTRALIA, আর কোথায় NEW ZEALAND!

মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স এই কলরবে যোগ না-দিয়ে বরং সরাসরি জাক পাঞ্চয়লের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন। 'মঁসিয় পাঞ্চয়ল, ব্যাপারটা খুব গোলমেলে হ'য়ে গেলো না তো?'

'গোলমেলে ? মানে?' জাক পাঞ্চয়ল কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন।

আর তক্ষুনি হন্তদন্ত হ'য়ে চিঠিটা হাতে ক'রে নিয়ে এসেছে টম অস্টিন। নাঃ, চিঠিটায় কোনো গোলমাল নেই—কেউ চিঠিটা জাল করেনি। এটা সেই চিঠিই, যা লিখেছিলেন মঁসিয় পাঞ্চয়ল, আর যাতে স্বাক্ষর করেছিলেন লর্ড গ্লেনারভন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টম অস্টিন চিঠিটা লর্ড গ্লেনারভনের দিকেই বাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, 'আপনিই পড়ুন।'

গ্লেনারভন পড়লেন :

'টম অস্টিনকে হুকুম দিচ্ছি সে যেন এক্ষুনি *ডানকানকে* নিউ-জিল্যাণ্ডের পূর্ব-উপকূলে নিয়ে যায়।'

'নিউ-জিল্যাণ্ড!' গ্লেনারভনের হাত থেকে চিঠিটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়েছেন মঁসিয় পাঞয়ল। আর চিঠিটার ওপর চোখ বুলিয়েই তিনি যেন আঁৎকে উঠেছেন। '*নিউ-জিল্যাণ্ড!*' তাঁর চোখদুটো ছানাবড়া হ'য়ে উঠেছে, তাতে সাতরাজ্যের বিস্ময়, আর হাত থেকে খ'সে প'ড়ে গিয়েছে চিঠিটা।

মেজর ম্যাকন্যাবস তাঁর কাঁধে হাত রেখেছেন। প্রায় তারিফ করার ভঙ্গি ক'রেই বলেছেন : 'বাহবা, মঁসিয় পাঞয়ল। আপনি যে *ডানকানকে* কোচিন-চিনে পাঠিয়ে দেননি, এজন্যে আপনাকে শাবাশি দিতেই হবে!'

বেচারা জাক পাঞয়ল ! জাহাজশুদ্ধু সবাই এমনভাবে হো-হো ক'রে হেসে উঠেছে যে তাঁর মনে হয়েছে পারলে বুঝি কোনো-একটা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে সেঁধিয়ে যান।

কিন্তু এ-কী ! মেজর ম্যাক্‌ন্যাবসের ঠাট্টায় পাঞয়লের মাথাটা পুরোপুরি বিগড়ে গেলো নাকি? তাঁর মুখচোখের চেহারা দুম ক'রে পালটে গিয়েছে। একটু আগেই যেন লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিলো, এখন এক তুলকালাম উৎসাহে একবার দৌড়ে গেলেন জাহাজের সামনে, একবার পেছনে, প্রায় একটা পুরো পাকই খেয়েছেন জাহাজের ডেকে। তিড়িং-তিড়িং ক'রে লাফিয়েছেন। কী-যে করবেন, কিছুই যেন ভেবে পাচ্ছেন না। মাথা নাড়ছেন আপন মনে, কী যেন বিড়বিড় ক'রে বকছেন—খেয়ালই নেই কখন কোথায় যাচ্ছেন ! হনহন ক'রে একবার উঠে গেছেন ক্যাবিনের সিঁড়ি বেয়ে, পরক্ষণেই তিন লাফেই ফের নেমে এসেছেন ডেকে, সোজা ছুটে গেছেন ফোরকাসলের দিকে, আর তারপরেই ঘটেছে দুর্ঘটনাটা! হঠাৎ পা জড়িয়ে গেছে কুণ্ডলিপাকানো কাছিতে, মুখ থুবড়ে পড়তে-পড়তে সজোরে চেপে ধরেছেন সামনে যে-দড়িটা ঝুলছিলো তাকেই—

আর তক্ষুনি প্রচণ্ড আওয়াজ ক'রে গ'র্জে উঠেছে কামান, গোলা ছুটে গিয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের অস্থির জলের ওপর দিয়ে। বারুদঠাশা কামানের দড়িটা পাকড়ে ধ'রেই প'ড়ে যেতে-যেতে টাল সামলেছেন পাঞয়ল। আর কামানের এই তুলকালাম আওয়াজ শুনে বেজায় ভড়কে গিয়ে পিছোতে গিয়ে চিৎপাত পড়েছেন হালের চাকার ওপর। প'ড়েই নটনড়নচড়ন নট কিচ্ছু। এ আবার কোন্ ফ্যাসাদ—ভদ্রলোক হার্টফেল ক'রেই ম'রে গেছেন নাকি? সবাই হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে গেছেন তাঁর দিকে। না, মারা যাননি পাঞয়ল, তবে ভির্মি খেয়েছেন, কেমন একটা দাঁতকপাটি লেগে গেছে! সবাই তাঁকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে এলো জাহাজের পেছন দিককার উঁচু মাচাটায়।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেচারি পাঞ্চয়লের দশা দেখে ততক্ষণে মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছে সবার। মেজর ম্যাকন্যাব্স ফৌজে থাকার সময় কতবারই কতজনের প্রাথমিক চিকিৎসার ভার নিয়েছেন, ফার্স্টএইড দিয়েছেন। তিনি ঝুঁকে প'ড়ে পাঞ্চয়লের সেই একমেবাদ্বিতীয়ম লাল-কালো ঢোলাজামাটা ক্ষতস্থান দেখবেন ব'লে যেই না হাত দিয়েছেন, অমনি তিড়িং-বিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠেছেন ভির্মি-খাওয়া মানুষটা—যেন তাঁর দেহে বিদ্যুৎ ঝাঁকুনি দিয়েছে।

'না, না, ককখনো না,' ছোঁড়াখোঁড়া জামাটা টেনেটুনে এমনি তড়িৎগতিতে তিনি ফের সারা গা ঢেকে দিয়েছেন যে সবাই ভারি তাজ্জব হ'য়ে গেছেন। মাথায় চোট খেয়ে শেষটায় পুরোপুরিই বিগড়ে গিয়েছে নাকি মগজটা?

মেজর তো-তো ক'রে শুধু বলতে চেয়েছেন—'কিন্তু, তাহ'লে—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়েই বলেছেন পাঞ্চয়ল—'গায়ে হাত দিলে ভালো হবে না বলছি!'

'এ তো আচ্ছা জ্বালা হ'লো দেখছি! দেখতে হবে না হাড়গোড় কোথাও ভাঙলো কি না!'

'যা ভেঙেছে, সেটা সারাতে ছুতোর লাগবে।'

'অ্যাঁ!'

'কী ভেঙেছে!'

'এ-যে মাথাটাই গেছে!'

সাবাইকার একসঙ্গে এই ধরনের কথাবার্তার উত্তরে পাঞ্চয়ল ভাবলেশহীন মুখে জানিয়েছেন—'ভেঙেছে তো খুঁটিটা—যেটার ওপর আছাড় খেয়েছিলুম!'

এবার আর হেসে না-উঠে পারেননি কেউই। যাক, ভদ্রলোক শুধু পাগলই নন—নিরেটও। কামানের সঙ্গে কোলাকুলি করার পরিণামে তাঁর দেহে অন্তত কোনো জখম হয়নি—কিন্তু কোথায় কোনো আঁচড় পড়েছে কি না, সেটা ঠিক বোঝা যায়নি। তা, তিনি যখন কাউকেই দেখাতে দেবেন না কী হয়েছে, তখন বোঝাই যাচ্ছে তেমন গুরুতর কোনো আঘাত লাগেনি।

গ্লেনারভন কিন্তু নাছোড়ের মতো লেগে রয়েছেন। 'আচ্ছা, এবার পুরো ব্যাপারটার জট খুলে দিন তো, মঁসিয় পাঞ্চয়ল! চিঠি লেখার সময় আপনি এই মস্ত ভুলটা না-করলে *ডানকান* বোম্বেটেজাহাজ হ'য়ে যেতো ঠিকই—আর আমরাও হয়তো মাওরিদের হাত থেকে কিছুতেই রেহাই পেতুম না। আপনার এই ভুলটার কাছে তাই আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। কিন্তু আমি যেটা বুঝতে পারছি না আপনি এই ভুলটা করলেন কী ক'রে? অস্ট্রেলিয়া লিখতে গিয়ে নিউ-জিল্যাণ্ড লিখতে তো দুর্দান্ত প্রতিভা লাগে—ব্যারন মুনখাউসেনের প্রতিভাতেও তা সম্ভব হ'তো কি না, কে জানে!'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শুনুন তবে, লর্ড এডওয়ার্ড। সর্বসমক্ষে আমি কবুল করছি আমি একটা আস্ত গাড়ল, আকাট বোকা! সেই গোড়া থেকেই একটার পর একটা ভুলই ক'রে চলেছি শুধু।'

এমন স্বীকারোক্তির পর কী-যে বলা যায়, সেটা এমনকী দুঁদে ম্যাক্‌ন্যাবসেরও মাথায় আসেনি।

কিন্তু গ্লেনারভন এবার ফের টম অস্টিনকে নিয়েই পড়েছেন। 'আচ্ছা, টম, হঠাৎ নিউ-জিল্যাণ্ড যাবার হুকুম পেয়ে তোমার মনে কোনো খটকা জাগেনি?'

'জেগেছিলো। আমি একটু অবাকই হয়েছিলুম। কিন্তু আমি জাহাজের ফার্স্টমেট —ওপর থেকে হুকুম এলে আমার দিক থেকে প্রশ্ন করা মানায় না—আমি শুধু হুকুম তামিল করতেই শিখেছি। আমি যদি নির্দেশমতো কাজ না-করতুম আর আপনাদের যদি মস্ত কোনো বিপদ ঘ'টে যেতো, তবে আমিই কি তার জন্যে দায়ী হতুম না? আচ্ছা, কাপ্তেন,' ম্যাঙ্গলসের দিকে কাতরভাবে তাকিয়ে সে জিগেস করেছে, 'আপনি হ'লে কী করতেন?'

'তুমি যা করেছো, তা-ই করতুম।' কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসের কথায় কোনো দ্বিধা নেই।

'কিন্তু এ-রকম একটা অদ্ভুত হুকুম প'ড়ে তোমার কিছুই মনে হয়নি?' গ্লেনারভন জেদ ধরেছেন: ব্যাপারটার একটা ফয়সালা না-ক'রেই তিনি ছাড়বেন না।

'আমার মনে হয়েছিলো, আপনারা নিশ্চয়ই কাপ্তেন গ্রাণ্টের কোনো খোঁজ পেয়ে একমুহূর্তও সবুর না-ক'রে সোজা নিউজিল্যাণ্ডের পুব-উপকূলের দিকে অন্যকোনো জাহাজে ক'রে চ'লে গিয়েছেন—আমাকেও আসতে বলেছেন *ডানকান* নিয়ে। তাই কাউকে কিছু না-ব'লেই আমি তৎক্ষণাৎ জাহাজ ছেড়ে দিই। বারদরিয়ায় পড়ার আগে জাহাজের আর-কেউই জানতে পারেনি আমরা কোথায় যাচ্ছি। কিন্তু তারপরেই এমন-একটা ঘটনা ঘটলো যে সব তালগোল পাকিয়ে গেলো।'

'কী ঘটলো?'

'জাহাজ ছেড়ে দেবার পরেরদিন আয়ারটন যখন শুনলে যে জাহাজ যাচ্ছে—'

'*আয়ারটন*! সে এখনও জাহাজে আছে নাকি?'

'হ্যাঁ। আছে। ঐ সামনের ক্যাবিনে। পাহারার জন্যে আমি একজনকে মোতায়েন ক'রে রেখেছি। চব্বিশ ঘণ্টাই পাহারা থাকে।'

'কেন? ওকে কয়েদ করেছো কেন?'

'*ডানকান* নিউ-জিল্যাণ্ডে যাচ্ছে শুনে সে এমনই খেপে যায় যে তাকে সামলানোই দায় হ'য়ে পড়ে। বলে যে জাহাজের মুখ ঘোরাতেই হবে, জোরজুলুমও করেছিলো, এমনকী মাঝিমাল্লাদের খেপিয়ে তুলে একটা মিউটিনি বাধাবারও চেষ্টা করে। অগত্যা, নাচার হ'য়েই, আমাকে তাকে বন্দী করতে হয়।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ, এটা ঠিকই করেছো। কিন্তু তারপর?'

'তারপর থেকে ঐ ক্যাবিনেই আছে। আর ওকে বেরুতে দেয়া হয়নি।'

'ঠিক আছে। তাহ'লে ওকে এক্ষুনি এখানে নিয়ে-আসার ব্যবস্থা করো।'

আয়ারটন যখন এসেছে, সঙ্গে পাহারা, তখন তার পা একবারও কাঁপেনি। মুখটা শুকনো, গম্ভীর, কিন্তু তাতে একটা তেরিয়া জেদেরও ভাব। গ্লেনারভনের সামনে এসে সে বুকের ওপর দু-হাত ভাঁজ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকেছে জেরার প্রতীক্ষায়।

'আবার তাহ'লে আমাদের দেখা হ'লো, আয়ারটন,' কোনো ভনিতা না-ক'রে সোজাসুজি বলেছেন গ্লেনারভন। 'অবশ্য দেখা হ'লো সেই জাহাজেই যেটা তুমি জেলপালানো দস্যুদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলে।'

আয়ারটনের মুখচোখ গোঁয়ারের মতো। সে কোনো কথা না-ব'লে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেছে।

গ্লেনারভনও নাছোড়। 'কী? জবাব দাও, আয়ারটন। বলো, তোমার কী বলার আছে। আমি তোমার কাছ থেকে একটা জবাবদিহি চাই।'

আয়ারটনের চোখদুটো একবার জ্ব'লে উঠেই পরক্ষণেই নিভে গিয়েছে। ঠাণ্ডাগলায় বলেছে, 'আমার কৈফিয়ৎ দেবার কিছু নেই। আমাকে নিয়ে আপনারা যা প্রাণে চায় করতে পারেন।'

'এ-কথা বললে তো চলবে না, আয়ারটন। আমি সোজাসুজি কয়েকটা প্রশ্ন করবো তোমাকে, এবং এও চাইবো যে তুমিও সোজাসুজি সে-সব কথার জবাব দেবে। আমার প্রথম প্রশ্ন হ'লো : তুমি কি কোনোকালে সত্যি-সত্যি *ব্রিটানিয়ার* কোয়ার্টারমাস্টার ছিলে?'

প্রশ্নটা যেন আয়ারটনের কানেই ঢোকেনি। সে বিকারহীন মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেছে।

গ্লেনারভনের ধৈর্যের বাঁধ বোধহয় ভেঙেই যেতে চেয়েছে। '*ব্রিটানিয়া* জাহাজ থেকে তুমি অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিলে কীভাবে? এবং কেন?'

আয়ারটন দাঁড়িয়ে থেকেছে নিরুত্তর।

'আয়ারটন, আমি তোমার ভালোর জন্যেই জিগেস করছি। আমি এই প্রশ্নগুলোর জবাব চাই।'

এবার আয়ারটন সোজাসুজি তাকিয়েছে গ্লেনারভনের চোখে। 'আমার কিছুই বলার নেই। আমার বিরুদ্ধে আপনার যদি কোনো অভিযোগ থাকে, তবে সেটা প্রমাণ করবার দায় আপনার—আমার নয়।'

'*প্রমাণ*? প্রমাণ করাটা কি খুব কঠিন হবে?'

'কঠিন নয়!' এবার টিটকিরি দিয়েছে আয়ারটন। 'আপনি তালেবর লোক,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লর্ডসাহেব, তাই তড়িঘড়ি সব ঠিক ক'রে ফেলছেন। কিন্তু কোনো আদালতের সবচেয়ে কড়া হাকিমও আমাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারবে না। কাপ্তেন গ্রাণ্ট যখন নেই তখন কে এসে বলবে যে আমি অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিলাম কেন? এবং আমিই যে বেন জয়েস, তা-ই বা কে বলবে? পুলিশ তো আমায় কখনও পাকড়াতে পারেনি। আমার যারা সাগরেদ ছিলো, তারাও তো সবাই পুলিশের খপ্পর থেকে পালিয়েছে। আমি যে সত্যি-সত্যি কোনো অপরাধ করেছি, সেটা প্রমাণ করবে কে? আমি যে জেলপালানো দস্যুদের হাতে এ-জাহাজটা তুলে দিতে চেয়েছিলাম, তা কি কেউ জোর দিয়ে বলতে পারবে? কেউ পারবে না। আপনি শুধু কতগুলো সন্দেহের কথা তুলেছেন—কিন্তু শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে কারু কখনও সাজা হয় না। যতক্ষণ-না সাক্ষীসাবুদ প্রমাণ জোগাড় করতে পারছেন ততক্ষণ আমি *ব্রিটানিয়ার* কোয়ার্টারমাস্টার আয়ারটন ছাড়া আর-কেউ নই।'

গ্লেনারভন এতক্ষণ তার কথায় কোনো বাধা দেননি। এবার সে থামতেই বলেছেন, 'আমি তোমায় বিচার করতে বসিনি, আয়ারটন—তোমাকে সাজা দেবার কোনো বাসনাও আমার নেই। আমি এও জানতে চাচ্ছি না তুমি নিজের অপরাধের জন্য কতরকম ওজর বা কৈফিয়ৎ খাড়া করো। অন্তত এটুকু বলো, কোথায় গেলে তাঁকে খুঁজে পাবো।'

আয়ারটনের মুখে কোনো বিকার নেই। সে ঘাড় গুঁজে চুপ ক'রে থেকেছে।

'*ব্রিটানিয়া* ঠিক কোন্‌খানে ডুবে গিয়েছিলো, সেটা বলতে নিশ্চয়ই তোমার কোনো আপত্তি নেই?'

'আছে।'

এবার গ্লেনারভন কী-যে করবেন, ভেবেই পাননি। একটু চুপ ক'রে থেকে শেষটায় বলেছেন, 'আয়ারটন, অন্তত এই ছেলেমেয়ে দুটির মুখ চেয়ে বলো কাপ্তেন গ্র্যাণ্ট এখন কোথায় আছেন?'

এই-প্রথম আয়ারটনের মুখটা কেমন কোমল হ'য়ে এলো, একটু যেন দোটানায় পড়েছে সে। যেন ভেবেই পাচ্ছে না কী বলবে। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের দুর্বলতা। পরক্ষণেই রুক্ষস্বরে ব'লে উঠেছে। 'উঁহু, আমি এ-বিষয়ে কিছুই বলবো না। কী করবেন? আমাকে ফাঁসি দেবেন!'

'ফাঁসি দেবো?' এবার গ্লেনারভনও আর রাগ সামলাতে পারেননি। 'না, আয়ারটন, না। আমি জজসাহেবও নই, জল্লাদও নই। কোনো জজ থেকে জল্লাদ হ'তে চাই না আমি। প্রথমে যে-বন্দরে গিয়ে পৌঁছুবো, সেখানেই নৌ কর্তৃপক্ষের হাতে তোমাকে তুলে দেবো। তোমাকে নিয়ে নৌ কর্তৃপক্ষ কী করবে, সে তাদের ভাবনা।'

'আমিও তো তা-ই চাইছি।' ব'লেই আয়ারটন ফিরে গিয়েছে নিজের ক্যাবিনে—সঙ্গে গেছে জাহাজের দুজন মাল্লা, তার সর্বক্ষণের পাহারা।

আয়ারটন ভাঙবে, তবু মচকাবে না। তাকে কিছুতেই টলানো গেলো না।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এখন তাহ'লে তাঁরা কী করবেন? *ব্রিটানিয়ার* কোনো হদিশই আজ অব্দি পাওয়া যায়নি। বোতলে-পাওয়া সেই চিরকুটগুলো জুড়ে দিয়েও আজও তার কোনো অর্থোদ্ধার করা যায়নি। ৩৭° দেশান্তরে আর তো কোনো ডাঙা নেই। তাহ'লে কি ইওরোপেই ফিরে যাবে *ডানকান*?

*অগত্যা*। জাহাজে যা কয়লা আছে, তাতে বড়োজোর দিন-পনেরো চলবে। কাজেই *ডানকান* তালকাউয়ানো উপসাগরে ফিরে গিয়ে কয়লা ও অন্যান্য রসদ নিয়ে কেপ হর্ন ঘুরে ফের অ্যাটলান্টিক পেরিয়ে ফিরে যাবে স্বদেশেই।

সেই মর্মেই নির্দেশ দিয়েছেন লর্ড গ্লেনারভন, এবং আধঘণ্টা বাদেই জাহাজের মুখ ঘুরেছে সেই পথে। তার খানিক বাদে পেছনে দিগন্তে মিলিয়ে গেছে নিউ-জিল্যাণ্ডের তটরেখা।

জাহাজ চলেছে, যেহেতু সে কলের জাহাজ, বয়লার জ্বলছে, সারেঙ দিক ঠিক ক'রে দিচ্ছে, কিন্তু মানুষগুলো?

অভিযান শুরু যখন শুরু হয়েছিলো তখন কী উৎসাহ ছিলো সবাইকার, কতটা আশা, কতটা উদ্দীপনা। এখন কে যেন নিংড়ে বার ক'রে দিয়েছে সব। কি-রকম হতাশ, ব্যর্থ, নিষ্ফল লাগছে সবাইকার, কী-ভীষণ মনখারাপ। কাপ্তেন গ্রাণ্টের কোনো হদিশ যে জানে, সে ঐ আয়ারটন। কিন্তু সে তার মুখে কুলুপ এঁটে ব'সে আছে। কানে গুঁজেছে তুলো, পিঠে বেঁধেছে কুলো। লর্ড গ্লেনারভনের কোনো ক্ষমতাই নেই যে তার মুখ থেকে টু-শব্দটি বার করবেন।

মেরি আর রবার্টের দিকে এখন আর তাকানোই যাচ্ছে না। যে-রবার্ট সারাক্ষণ টগবগ ক'রে ফুটতো, পথের এত বিপদেও যার মুখ থেকে কখনও হাসিটি মিলিয়ে যায়নি, সে পর্যন্ত কেমন যেন বিধ্বস্ত, মনমরা, হতাশ। ত্রোনিদো একদিন তাকে বলেছিলো, '*এখন তুমি আর ছোট্টটি নও, রবার্ট, এখন তুমি বড়ো হ'য়ে গেছো*'; সেই ত্রোনিদোই এখন তাকে দেখতে পেলে ভাঙাগলায় হয়তো ব'লে উঠতো, 'তুমি তো বড়ো হওনি, রবার্ট, তুমি যে একেবারে বুড়িয়ে গেছো!' আর মেরি? সে গিয়ে সটান ঢুকেছে তার ক্যাবিনে, গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়েছে।

এ-সব দেখে লেডি হেলেনা আর থাকতে পারেননি। তিনি কি কিছু করতে পারেন না? তিনি কি বোঝাতে পারবেন না আয়ারটনকে? তিনি কি একবার শেষচেষ্টা ক'রে দেখবেন না? গ্লেনারভনকে ব'লে-ব'লে শেষটায় রাজি করিয়েছেন হেলেনা, তিনি নিজে আয়ারটনের ক্যাবিনে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবেন, সঙ্গে থাকবে শুধু মেরি, আর-কেউ নয়। অন্য-কারু সামনে হয়তো আয়ারটন কোনো কথা বলবে না। যদি শুধু তাঁদের কাছেই মুখ খোলে...

পাঁচই মার্চ আয়ারটনের ক্যাবিনেই মেরিকে নিয়ে গিয়েছেন লেডি হেলেনা।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একঘন্টারও ওপর কত কাকুতিনিনতি, কত সাধ্য-সাধনা করেছেন তাকে, কত বুঝিয়েছেন—কিন্তু আয়ারটনের বোধহয় বুক নেই, হৃদয় যেখানে থাকে সেখানে বোধহয় আছে শুধু পাষাণ—সে একফোঁটাও টলেনি।

লেডি হেলেনার কিন্তু জেদ চেপে গিয়েছিলো। ফিরেই তো চলেছেন—কিন্তু ফিরে যাবার আগে কোনোমতে যদি আয়ারটনের মুখ থেকে একটা কথা খসানো যায়—! পরদিন তিনি আবার গেলেন আয়ারটনের ক্যাবিনে, এবার একেবারে একা, মেরিকেও নিয়ে যাননি। মেরি বেচারি আয়ারটনের নির্বিকার নির্লিপ্তভাব সইতে পারেনি, সে বরং আরো ভেঙে পড়েছে। তারপর দু-ঘন্টা লেডি হেলেনা মুখোমুখি ব'সে থেকেছেন আয়ারটনের, তাকে বুঝিয়েছেন, একবারও মেজাজ খারাপ করেননি, তর্ক করেননি, হুমকি দেননি, শুধু অনুনয়-বিনয়।

আর বাইরে অস্থিরভাবে পায়চারি করেছেন অন্যরা। কী-রকম হাত কামড়াতে ইচ্ছে করেছে সকলের, এমন অসহায় আর অক্ষম লাগছিলো।

দু-ঘন্টা পরে লেডি হেলেনা বেরিয়ে আসতেই অধীরস্বরে গ্লেনারভন শুধিয়েছেন : 'কী ? মুখ খুলেছে ?'

'না। তবে তোমার সঙ্গে নিরিবিলি দেখা করতে চাচ্ছে।'

'তাহ'লে কি একটু টলেছে ওর মন?'

'বোধহয়।'

'তুমি কি ওকে কোনো কথা দিয়ে এসেছো? কোনো প্রতিশ্রুতি ?'

'আমি তোমার হ'য়ে ওকে কথা দিয়েছি যে ওর শাস্তিটা যাতে লঘু হয় সেজন্যে তুমি তোমার পক্ষে যতটা করা সম্ভব, তা-ই করবে।'

'বেশ। তাহ'লে আমি এক্ষুনি ওকে ডেকে পাঠাচ্ছি।'

আয়ারটন যখন গ্লেনারভনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন তার মুখচোখে তেমন কোনো বদল দেখা যায়নি যা থেকে মনে হ'তে পারে অকস্মাৎ তার কোনো হার্দ্য পরিবর্তন হয়েছে।

'এবার তুমি আমার কাছে সব কথা খুলে বলবে তো, আয়ারটন ?'

আয়ারটন ঘাড় হেলিয়ে তার সম্মতি জানিয়েছে। তারপর বলেছে :

'তবে আমি যখন কথা বলবো তখন এখানে যদি মঁসিয় পাঞ্চয়ল আর মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স উপস্থিত থাকেন, তাহ'লে ভালো হয়।'

'কার ভালো হয় ?'

'আমার।' খুব শান্তস্বরে আয়ারটন বলেছে।

তার দিকে তাকিয়ে তার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করেছেন গ্লেনারভন। তারপর ডেকে পাঠিয়েছেন পাঞ্চয়ল আর ম্যাক্‌ন্যাব্‌সকে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁরা এসে হাজির হ'তেই গ্লেনারভন বলেছেন : 'এবার বলো।'

আয়ারটন কী যেন ভেবে নিয়ে বলেছে : 'দুই পক্ষের মধ্যে যখন কোনো রফা হয়, তখন সাক্ষী থাকলে ভালো হয় ব'লেই আমি মেজর ম্যাকন্যাবস আর মঁসিয় পাঞ্চয়লকে এখানে থাকতে বলেছি। কেননা আমি এখন আপনার সঙ্গে একটা রফানিষ্পত্তিতে আসতে চাই।'

'রফানিষ্পত্তি? কী-ধরনের রফা?'

'আপনি চান এমন-কিছু খবর যা শুধু আমিই জোগাতে পারি। আর আমি চাই এমন-কিছু সুবিধে যা শুধু আপনিই আমাকে দিতে পারবেন।'

'হ্যাঁ,' মঁসিয় পাঞ্চয়ল এই ভনিতায় একটু অধীর হ'য়ে উঠেছেন, 'কিন্তু, কী এমন খবর তুমি আমাদের দিতে পারো, যা আর-কেউই জোগাতে পারবে না?'

'উঁহু,' গ্লেনারভন তাঁকে থামিয়ে দিয়েছেন, 'আমি জানতে চাই কী এমন সুবিধে আমি তোমাকে দিতে পারি, যার জন্যে তুমি এমন দরাদরি করছো?'

'আপনি তো আমাকে ইংরেজ গবর্নরের হাতে তুলে দিতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ।'

'অর্থাৎ আপনি আমাকে ছেড়ে দিতে চান না?'

এ একটা বিষম সংকটের মধ্যে পড়েছেন গ্লেনারভন। উত্তরে তিনি কী বলবেন তার ওপরই নির্ভর করছে কাপ্তেন গ্রাণ্টের ভাগ্য—তাছাড়া মেরি আর রবার্টের কথাও তাঁকে ভাবতে হবে। অথচ আয়ারটন যে-ভয়ানক অপরাধ করেছে, তার যদি কোনো সাজা না-হয়, তাহ'লে তো ন্যায়নীতি ব'লে কিছুই থাকবে না। শেষটায় কঠিনসুরে তিনি বললেন, 'না, আয়ারটন। আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না। কেউ যদি কেউ ছেড়ে দিতে পারেন, তবে সে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ।'

'কিন্তু আমি তো তা চাইছি না?'

'তবে তুমি কী চাচ্ছো?'

'আমি কখনও এ-কথা বলিনি যে আমাকে আপনারা এমনি-এমনি ছেড়ে দিন। আমি ফাঁসির দড়িও চাইছি না—অথবা বেকসুর খালাশ পেতেও চাইছি না—চাইছি এরই মাঝামাঝি কিছু-একটা।'

'সেটা কী?'

'আমাকে বরং প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো নির্জন দ্বীপেই ছেড়ে দিন আপনারা, সঙ্গে দিন সামান্য-কিছু খাবার-দাবার। কষ্টেসৃষ্টেই না-হয় দিন কাটাবো সেখানে—আর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো।'

ঠিক এমন-কোনো প্রস্তাব যে আসতে পারে, গ্লেনারভন সেটা প্রত্যাশাই করেননি। কী-রকম অপ্রস্তুত চোখে ম্যাকন্যাবস আর পাঞ্চয়লের মুখের ওপর চোখ বুলিয়েছেন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি। দুজনের কারু কাছ থেকেই কোনো সাড়া আসেনি। যা সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সেটা নিতে হবে স্বয়ং গ্লেনারভনকেই। সারা সেলুনঘরটা হঠাৎ কী-রকম যেন স্তব্ধ হ'য়ে গেছে। শুধু জানলা দিয়ে একটানা ভেসে আসছে জলের ছলছল আর এনজিনের গুঞ্জন। একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে শেষটায় গ্লেনারভন বলেছেন, 'তোমার কথা যদি রাখি, তবে তুমি যা জানো সব বলবে তো, আয়ারটন?'

'হ্যাঁ, মি-লর্ড। কাপ্তেন গ্র্যান্ট আর *ব্রিটানিয়া* সম্বন্ধে যা জানি, সব খুলে বলবো। কোনো কথাই বাদ দেবো না।'

'সব বলবে? *সত্যি?*'

'সত্যি। আমি হলফ ক'রে বলছি—'

কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে একটু অসহিষ্ণুস্বরেই গ্লেনারভন ব'লে উঠেছেন, 'কিন্তু তুমি যে সত্যিকথা বলছো, তা আমরা বুঝবো কী ক'রে? তুমি যে আগের মতোই সব বানিয়ে-বানিয়ে বলবে না, তা আমরা যাচাই ক'রে নেবো কী ক'রে?'

'বিশ্বাস আপনাকে করতেই হবে। আমি বদমায়েশ, বিশ্বাসঘাতক, মহাপাতক—তবুও আমার কথা আপনাদের বিশ্বাস করতেই হবে। এছাড়া তো আর-কোনো চাড়া নেই।'

'বেশ। আমরা তাহ'লে ধ'রেই নেবো যে তুমি যা বলছো, তার কিছুই মিথ্যে নয়।'

'যদি পরে দ্যাখেন, আমি আবার আপনাদের সঙ্গে ফেরেব্বাজি করেছি, তাহ'লে তো অনায়াসেই কঠোর-সাজা দিতে পারবেন—'

'কীভাবে?'

'যে-জনমানবহীন দ্বীপটায় আমাকে নামিয়ে দেবেন, সেখান থেকেই ফের আমায় পাকড়ে আনতে পারবেন।'

এ-কথার পর অবশ্য আয়ারটনকে আর অবিশ্বাস করার কোনো কথাই ওঠে না।

আয়ারটন বলেছে, 'আপনাদের আমি গোড়াতেই ব'লে দিতে চাই—আমার কাছ থেকে আপনারা বেশি-কিছু প্রত্যাশা করবেন না। কাপ্তেন গ্রান্ট সম্বন্ধে খুব-বেশি কথা আমি জানি না।'

'সে-কী? তাহ'লে—'

'হ্যাঁ, মি-লর্ড। আমি যতটুকু জানি, ততটুকুই আমার খবর। কিন্তু তা থেকে *ব্রিটানিয়া* জাহাজ যে কোথায় ডুবেছে, সে-কথা আপনারা জানতেই পারবেন না—'

ঘরটার মধ্যে যেন বিনামেঘেবজ্রাঘাত হয়েছে। এই কথাবর্তার সূচনায় সবাই ভেবেছিলেন, এতদিনে বুঝি শেষটায় কাপ্তেন গ্রান্টের ঠিকানা মিললো। আর এখন কি না আয়ারটন নিজেই বলছে যে সে যা বলবে তা থেকে কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো পাত্তাই পাওয়া যাবে না।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয়ারটন ফের বলেছে, 'আমি আপনাদের আগেই বলেছি, মি-লর্ড, এই রফায় যদি কারু কোনো সুবিধে হয়, সে আমার। আপনাদের কোনো লাভই হবে না।'

'ঠিক আছে। তোমার প্রস্তাবটাই মেনে নিচ্ছি,' বলেছেন গ্লেনারভন। 'কিন্তু মনে রেখো, প্রশান্ত মহাসাগরের যে-দ্বীপটায় তোমাকে নামিয়ে দেবো, সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য হবে—'

'আমি তো তা-ই বলেছি, মি-লর্ড। কোনো নিরিবিলি দ্বীপে আমি পুরোপুরি-একা আমার নিজের মুখোমুখি হ'তে চাই।'

ভারি-অদ্ভুত একটা কথা বলছে আয়ারটন। *নিজের মুখোমুখি হবে। একা-একাই।* অথচ তার মুখে অনুশোচনার কোনো চিহ্নই নেই। সম্পূর্ণ বিকারহীন একটা মুখ। মনে হচ্ছে—সে যে সব কথা খুলে বলতে রাজি হয়েছে, তা যেন নিজের কথা ভেবে নয় —অন্য-কারু কথা ভেবেই।

গ্লেনারভন এবার শুরু করেছেন একেবারে গোড়া থেকে। 'আচ্ছা, আগে তুমি তোমার পরিচয় দাও। সত্যি ক'রে বলো, তুমি কে।'

'আমার নাম টম আয়ারটন। আর এ-কথাটাও মিথ্যে নয় যে আমি *ব্রিটানিয়ার* কোয়ার্টারমাস্টার ছিলাম। কিন্তু গোড়া থেকেই কাপ্তেন গ্রান্টের সঙ্গে তুচ্ছ-সব কারণে খটাখটি লাগছিলো। শেষটায় আমি অন্য মাঝিমাল্লাদের খেপিয়ে দিয়ে *ব্রিটানিয়া* দখল ক'রে নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি ভালো ক'রে ঘোঁট পাকাবার আগেই কাপ্তেন গ্রান্ট আমায় অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে নামিয়ে দিয়ে চ'লে যান।'

'অস্ট্রেলিয়ায়?' এবারে চমকে উঠেছেন মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স। 'তার মানে *ব্রিটানিয়া* যখন কাইয়াওতে পৌঁছোয়, তখন তুমি জাহাজে ছিলে না?'

'না। কাইয়াওতে যাবার আগেই আমাকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেয়া হয়েছিলো। প্যাডি ও'মুরের খামারবাড়িতে যে কাইয়াওর নাম বলেছিলাম, সে শুধু আপনাদের মুখে পুরোকাহনটা শোনবার পরই।'

'হুঁ!' জিগেস করেছেন গ্লেনারভন, 'কিন্তু তারপর কী হ'লো?'

'অস্ট্রেলিয়ায় আমার সঙ্গে একদল জেলপালানো কয়েদির সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায়। ক-দিনের মধ্যেই আমি তাদের পাণ্ডা হ'য়ে উঠি, আড়াই বছর ধ'রে অবাধে খুনজখম লুঠতরাজ চালিয়ে যাই। সেখানে বেন জয়েস নামেই পুলিশ আমাকে চিনতো—আমার সত্যিকার পরিচয় কারু জানা ছিলো না। আমাকে আগে যারা চিনতো, তারা সবাই *ব্রিটানিয়ার* সঙ্গেই অথই পাথারে ভেসে গিয়েছিলো। কিন্তু পুলিশ যখন বেন জয়েসের নামে হুলিয়া বার ক'রে দিলে, আর অনবরত পুলিশের সঙ্গে তার সংঘর্ষ হ'তে লাগলো, তখন আমি ভেবেছিলাম—ধুর-ছাই, ডাঙায় আর নয়। আর তাই ১৮৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফের আয়ারটন সেজে প্যাডি ও'মুরের খামারে গিয়ে চাকরি নিয়েছিলাম।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু-যে পুলিশের চোখে ধুলো দেয়াই উদ্দেশ্য ছিলো তা নয়। প্যাডি ও'মুরের খামারটা সমুদ্রের একেবারে গা ঘেঁসে ব'লেই অনবরত জাহাজ এসে ভেড়ে সেখানে। মৎলব ছিলো, সুযোগ পেলেই কোনো-একটা জাহাজে দখল ক'রে বসবো। তারপর আর আমায় পায় কে? পুরো সমুদ্দুরটাই আমার দখলে চ'লে আসবে। অনবরত আর পুলিশের সঙ্গে টক্কর দিতে হবে না। আমিই যে বেন জয়েস, প্যাডি ও'মুর সেটা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি। আমার কাজে সে মোটামুটি খুশিই ছিলো। হঠাৎ এমন সময় দু-মাস বাদে একদিন এসে হাজির *ডানকান* । আপনাদের মুখেই খাবারটেবিলে ব'সে-ব'সে জানতে পেলাম যে কাইয়াও যাবার পথে হঠাৎ একদিন *ব্রিটানিয়া* নিখোঁজ হ'য়ে গেছে—বোতলে-পাওয়া একটা চিরকুট প'ড়ে শুধু এটুকুই জানা গেছে সে নাকি সাঁইত্রিশ ডিগ্রি দেশান্তরের কোথাও। অমনি মনে-মনে ফন্দি এঁটে ফেললাম, এটাই সুযোগ, এই *ডানকানকেই* দখল ক'রে নিতে হবে। নৌবাহিনীর সেরা জাহাজটাকেও টেক্কা দিতে পারে *ডানকান*—যদি কোনো জাহাজ নিয়ে সমুদ্রকে শাসন ক'রে বেড়াতে হয় তবে তো এমন-কোনো জাহাজই চাই। কিন্তু *ডানকানকে* ছোটোখাটো ভাঙচুর মেরামত করতে হবে শুনে তখন আর তাকে বাধা দিইনি, মেলবোর্নে যেতে দিয়েছি। আপনাদের গাইড সেজে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছি অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব-উপকূলে। *ডানকানের* হদিশ পেয়েই আমি আর আমার দলের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম, তারা আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই চলেছিলো, কখনও আমাদের আগে-আগে গেছে, কখনও গেছে পেছন-পেছন। তারাই মিছেমিছি ট্রেন উলটে দিয়ে, ক্যামডেন ব্রিজের কাছে লুঠতরাজ চালায়—তখন ঠিক এভাবে নিজেদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা ওদের উচিত হয়নি। সেটাই আমাদের চালে সবচেয়ে বড়ো ভুল হয়েছিলো। আমি অনেক-বড়ো স্বপ্ন দেখেছিলাম, ভেবেছিলাম অত-বড়ো সমুদ্র ছাড়া আর-কিছুতেই আমি আঁটবো না। পথ দেখিয়ে আপনাদের নিয়ে এসেছিলাম স্নোয়ি নদী অব্দি, পথে একটা-একটা ক'রে মেরেছি ঘোড়া আর বলদগুলোকে, যাতে আপনারা মেলবোর্ন অব্দি পুরো রাস্তাটা একসঙ্গে যেতে না-পারেন। শেষটায় একদিন কাদার মধ্যে গাড়িটাকে ডাবিয়ে দিয়েছি আমিই। মঁসিয় পাঞ্রয়ল যদি অন্যমনস্ক হ'য়ে চিঠিটায় নিউ-জিল্যাণ্ড কথাটা না-লিখতেন অ্যাদ্দিনে আমিই তবে *ডানকানের* মালিক হ'য়ে বসতাম। এছাড়া আর-কিছুই আমার বলার নেই, মি-লর্ড। কাপ্তেন গ্রাণ্ট কোথায় আছেন আমি জানি না। কিন্তু আপনারা তো আমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন—আমারই সুবিধে হবে জেনেও আপনারা আমায় কোনো-একটা নির্জন দ্বীপে নামিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন।'

আয়ারটনের পুরো কাহনটা শেষ হবার পরেও বেশ-কয়েক মিনিট কারু মুখে কোনো কথা নেই। বাইরে জলের উচ্ছল রোল আর এনজিনের গুঞ্জন। ঘরের মধ্যে সবাই চুপচাপ। এটুকু অন্তত তিনজনেই বুঝতে পেরেছেন, আয়ারটন নরাধম হ'তে পারে, কিন্তু এবার সে একটাও মিথ্যেকথা বলেনি। তার সব ষড়যন্ত্র ভণ্ডুল হ'য়ে গেছে মঁসিয় পাঞ্রয়লের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যমনস্কতায়। কারু-কোনো অন্যমনস্কতাও যে অনেক সময় মহাবিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারে, এটা বোধহয় তারই অনন্য নজির। আবার কৌতুক এটাই যে পাঞ্চয়লের অন্যমনস্কতায় নরাধম আয়ারটনের মুঠোর মধ্যে এসেও হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে *ডানকান*।

'কবে তোমাকে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে নামিয়ে দেয়া হয়েছিলো?' জিগেস করেছেন মেজর ম্যাক্‌ন্যাবস। '১৮৬২ সালের আটই এপ্রিল?'

'হ্যাঁ।'

'কাপ্তেন গ্রান্ট কোথায় যাবেন ব'লে ঠিক করেছিলেন?'

'ঠিক জানি না।'

'যতটুকু জানো, বলো।'

'নিউ-জিল্যাণ্ড যেতে চেয়েছিলেন। কাইয়াও থেকে বেরিয়ে নিশ্চয়ই ঐদিকেই গিয়েছিলেন। চিরকুটের তারিখের সঙ্গে কিন্তু *ব্রিটানিয়ার* ডুবে-যাবার তারিখটাও মিলে যাচ্ছে।'

এবার পাঞ্চয়লও সায় দিয়েছেন। 'তা ঠিক।'

কিন্তু গ্লেনারভন সে-কথা শুনতেই চাননি। 'কিন্তু নিউ-জিল্যাণ্ডের কোনো নামগন্ধই তো নেই চিরকুটগুলোয়।'

'এ-বিষয়ে আমার ঠিক কিছুই জানা নেই,' বলেছে আয়ারটন। 'নিউ-জিল্যাণ্ড যাবার কথা আলোচনা হয়েছিলো অবশ্য *ব্রিটানিয়ায়*।'

গ্লেনারভন বলেছেন, 'যাক-গে। তুমি তোমার কথা রেখেছো যখন, তখন আমিও আমার কথা রাখবো। জবানের কোনো নড়চড় হবে না। ঠিক কোন দ্বীপে যে তোমায় নামিয়ে দেয়া যায়, এবার সেটাই ঠিক করা যাক।'

'আমার কোনো পছন্দ নেই। যেখানে হয় নামিয়ে দিলেই হবে।'

'বেশ, তাহ'লে এখন তোমার ক্যাবিনে ফিরে যাও।'

পাহারারা আয়ারটনকে তার ক্যাবিনে নিয়ে গেছে তারপর।

সে চ'লে যেতেই বেশ-খানিকটা আপশোশ ক'রেই বলেছেন গ্লেনারভন : 'আয়ারটনের জন্যে আমার ভারি কষ্ট হয়। লোকটা কু-পথে না-গেলে অনেক উঁচুতে উঠতে পারতো। ওর মাথা আছে, সাহস আছে, নিজের ক্ষমতার ওপর অপরিসীম বিশ্বাস আছে। কিন্তু আয়ারটনের কথা এখন থাক। এটা বোধহয় ধ'রেই নেয়াই যেতে পারে যে কাপ্তেন গ্রান্টের আশা এবার আমাদের ছাড়তে হবে। কেউ জানে না তিনি কোথায়। শেষ ভরসা ছিলো আয়ারটন—এখন তো সেটাও গেলো।

'কেউ জানে না মানে?' হঠাৎ পাঞ্চয়ল উত্তেজিত হ'য়ে ব'লে উঠেছেন। 'আমি জানি। আমি—জাক পাঞ্চয়ল।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গত ক-দিন ধরেই মুখে কুলুপ এঁটে ছিলেন পাঞয়ল। আর হঠাৎ এমন বোমা ফাটালেন সেই-তিনিই।

'*আপনি জানেন?*'

'আলবৎ।'

'কীভাবে জানলেন?'

'ঐ চিরকুটগুলো প'ড়েই।'

'ধেত্তেরি,' যাও-বা আশা হয়েছিলো, তাও চুপসে গেলো। মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স আর-কখনও ঐ চিরকুট নিংড়ে কোনো অর্থ বার করবার কথা বিশ্বাসই করেন না।

এবার পাঞয়ল প্রায় খেপেই উঠেছেন। 'কথাটা আগে শুনে নিন, ফুঃ ক'রে উড়িয়ে দেবেন পরে। অ্যাদ্দিন কিছু বলিনি কেউই আমার কথা বিশ্বাস করবে না ব'লে। কিন্তু এখন আর আমার কোনো সন্দেহ নেই। আয়ারটনও আমার কথায় সায় দিয়ে গেছে এইমাত্র। সেইজন্যেই আজ আমি সব কথা খুলে বলবো—'

'নিউ-জিল্যাণ্ডে—'

কী-একটা বলতে চেয়েছেন গ্লেনারভন, কিন্তু পাঞয়ল অধীরভাবে তাঁকে থামিয়ে দিয়েছেন। 'কথাটা আগে শুনুন। স্লেয়ি নদীর তীরে বলদে-টানা গাড়িটার মধ্যে ব'সে আপনার শ্রুতিলিখন শুনে-শুনে চিঠিটা লেখবার সময় ভুলটা আমার অকারণে হয়নি। আমার মাথায় তখন নিউ-জিল্যাণ্ড শব্দটাই ঘুরছিলো। NEW ZEALAND। *অস্ট্রেলিয়ান অ্যাণ্ড নিউ-জিল্যাণ্ড গেজেটটা* ভাঁজ-করা প'ড়ে ছিলো মেঝেয়—এমনভাবে যে শুধু ALAND হরফগুলোই দেখা যাচ্ছিলো। আর তা-ই দেখেই আমার মাথায় নিউ-জিল্যাণ্ড শব্দটা বিদ্যুতের মতো খেলে গিয়েছিলো। মনে আছে নিশ্চয়ই—চিরকুটে aland কথাটাও ছিলো —কিন্তু আমরা তার অন্যরকম অর্থ করেছিলুম।'

'তখনই যদি কথাটা আপনার মাথায় খেলে গিয়ে থাকে, তবে অ্যাদ্দিন মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলেন কেন?' জিগেস করেছেন গ্লেনারভন।

'ফের মিথ্যে একটা আশা দিয়ে সবাইকে নাচিয়ে তুলতে চাইনি ব'লে। তাছাড়া চিরকুটে লেখা সাঁইত্রিশ ডিগ্রি দেশান্তর অনুযায়ী অকল্যাণ্ডের দিকেই তো যাচ্ছিলুম।'

'কিন্তু সে-রাস্তা থেকে এখন তো আমরা স'রে এলুম,' গ্লেনারভন প্রায় চেপেই ধরেছেন তাঁকে, 'যখন *ডানকানের* মুখ ঘোরানো হয়েছে ফিরতিপথে, তখনও কেন সে-কথা বলেননি?'

'ব'লে কোনো লাভ হ'তো না ব'লে। কাপ্তেন গ্রাণ্টের হদিশ আপনি পেতেন কোথায়?'

'তার মানে?'

'নিউ-জিল্যাণ্ডের উপকূলে জাহাজডুবির পর দু-বছর যে-মানুষের খোঁজ নেই, হয়



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি ডুবে মরেছেন, আর নয়তো মিশেল মঁতেইন-এর ক্যানিবালদের পেটেই গেছেন। এটা তো রাক্ষসমুলুক—না, কী?'

গ্লেনারভন এতক্ষণ দুই হাতের মধ্যে মাথা রেখে চুপচাপ ব'সে থেকেছেন। ম্যাকন্যাবসের মুখেও কোনো কথা নেই। একটুবাদে হাতের ফাঁক থেকে মুখ তুলে কী-রকম যেন জীর্ণগলায় গ্লেনারভন বলেছেন, 'মঁসিয় পাঞ্জয়ল, আমায় যে-কথা বলেছেন --বলেছেন। খবরদার—এ-কথা আর-কাউকে বলবেন না। কাপ্তেন গ্রান্টের ছেলেমেয়েদের যা বলবার আমিই সময়সুযোগমতো ব'লে দেবো।'

## পাঁচ

## অন্যমনস্কতা, জিন্দাবাদ!
## দীর্ঘজীবী হোক, ভুলোমনেরা!
## দীর্ঘজীবী হোক, কিউয়িপাখি!

অথচ তবু কেমন ক'রে যেন সারা জাহাজেই খবরটা ছড়িয়ে গিয়েছে।

আয়ারটন জানে না, কাপ্তেন গ্রান্ট কোথায়। আর সেইজন্যেই প্রশান্ত মহাসাগরের অজস্র জনমানবহীন ছোটো দ্বীপের একটায় তাকে নামিয়ে দিয়ে *ডানকান* ইওরোপে ফিরে যাবে।

পাঞ্জয়ল আর ম্যাঙ্গলস—দুজনেই মানচিত্রের ওপর হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে আছেন। সাঁইত্রিশ ডিগ্রি দেশান্তর বরাবর একটা জনমানবহীন পাথুরে দ্বীপ আছে, যেটা আমেরিকা থেকে ৩৬০০ মাইল আর নিউ-জিল্যাণ্ড থেকে ১৫০০ মাইল দূরে। দ্বীপটায় কোনো মানুষ থাকে না। হয়তো শুধু গাংচিলেরাই উড়তে-উড়তে ক্লান্ত হ'য়ে গেলে এই দ্বীপে নেমে অবসন্ন ডানা জিরিয়ে নেয়—কোনো জাহাজই সমুদ্রের সে-দিকটায় মাড়ায় না। একেবারেই বিজনবিভূঁই একখণ্ড মস্ত পাথর যেন একদিন সমুদ্র থেকে মাথা বার ক'রে আকাশ হাৎড়েছিলো।

আয়ারটন কিন্তু সেই দ্বীপটাতেই নামতে রাজি হয়েছে। দ্বীপটায় কেউ কখনও যায় না বটে, তবু তার একটা বাহারে নাম আছে : *মারিয়া তেরেসা*। *ডানকান* এখন সেই দ্বীপটা লক্ষ্য ক'রেই চলেছে।

দু-দিন দু-রাত একটানা যাবার পর পর একদিন শেষবিকেলের আলোয় দূরে দেখা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলো *মারিয়া তেরেসাকে*। প্রায় তিরিশ মাইল দূর থেকে দেখা গেলো, দ্বীপটার ওপর সরু সুতোর মতো পাকিয়ে-পাকিয়ে শূন্যে উঠে গেছে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলি। আশ্চর্য! দ্বীপটা কি তবে কোনো আগ্নেয়গিরি? প্রশান্ত মহাসাগরের এমন কত দ্বীপ আছে, যা একদিন জলের ওপর মাথা তুলেছিলো কোনো অগ্ন্যুৎপাতের ফলে, তারপর একদিন আবার আগুনের উদিগরণেই ফের সমুদ্রের তলায় ডুবে গিয়েছে। এ কী তাহ'লে সেইরকমই কোনো আগ্নেয় দ্বীপ? দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ছোটো-বড়ো কয়েকটা পাহাড়ের চূড়োও।

তখন বিকেল পাঁচটা। পাঞ্চয়ল তাঁর টেলিস্কোপে চোখ রেখে দ্বীপটাকে দেখছিলেন। কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস শুধোলেন : 'কী মনে হচ্ছে? কোনো আগ্নেয়গিরি?'

'কী জানি, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। কোনো ভৌগোলিকের বিবরণেই তো মারিয়া তেরেসার কোনো উল্লেখ নেই। তবে হয়তো অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই একদিন জলের মধ্য থেকে মাথা তুলেছিলো—ফলে এ যদি আগ্নেয়গিরি হয়ও, তাতে অবাক হবার কিছুই নেই।'

'কিন্তু,' গ্লেনারভন একটু শঙ্কিত স্বরেই বললেন, 'অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যদি দ্বীপটা গজিয়ে থাকে, তবে তো অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই একদিন জলের তলায় ফের তলিয়ে যেতে পারে।'

'তা নাও হ'তে পারে। মারিয়া তেরেসা দ্বীপ অন্তত কয়েকশো বছরের পুরোনো।'

গ্লেনারভন জিগেস করলেন, 'জন, রাত্তিরেই দ্বীপে নামা যাবে তো?'

'নামা হয়তো যাবে—তবে নামা কিন্তু ঠিক হবে না। যদি কোথাও কোনো চোরা-পাহাড় থেকে থাকে, তাহ'লে *ডানকান* বিপদে পড়বে।'

রাত তখন আটটা, মারিয়া তেরেসা দ্বীপের প্রায় পাঁচ মাইল দূরে এসেই *কাপ্তেন* তার এনজিন বন্ধ ক'রে দিলেও আস্তে-আস্তে তারই দিকে ভেসে চলেছে *ডানকান*, শুধু পালের হাওয়ার ওপর নির্ভর ক'রেই। নটা নাগাদ দ্বীপ যখন আরো-কাছে এগিয়ে এলো, তখন অন্ধকারের মধ্যে একটা নিবাতনিষ্কম্প স্থির উজ্জ্বল আলো দেখা গেলো।

'এ আলো কি আগ্নেয়গিরিরই চিহ্ন না কি?' পাঞ্চয়ল একটু আঁৎকেই উঠলেন।

'কিন্তু অগ্ন্যুৎপাতের কোনো আওয়াজ তো শুনছি না,' কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস একটু অবাক সুরেই বললেন।

'এ হয়তো এমন আগ্নেয়গিরি যে শুধু আগুনই ছড়ায়, কোনো আওয়াজ করে না। নিঃশব্দেই নিজের কাজ ক'রে যেতে ভালোবাসে।'

কিন্তু জাক পাঞ্চয়লের এই ব্যাখ্যানায় কোনো কান না-দিয়েই জন ম্যাঙ্গলস চেঁচিয়ে উঠলেন : 'এ-কী! ঐ-যে আরেকটা আগুন দেখছি! ঐ দেখুন—তীরে—বালিয়াড়ির ওপর! দেখুন! দেখুন! এ-আলোটা যে নড়ছে!'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, জন ম্যাঙ্গলসের দেখায় কোনো ভুল হয়নি। সত্যিই একটা আলো জ্বলছে বেলাভূমিতে। হাওয়ায় কখনও নিভু-নিভু হ'য়ে যাচ্ছে, পরক্ষণেই আবার দ্বিগুণ তেজে জ্ব'লে উঠছে।

'তার মানে,' গ্লেনারভন ব'লে উঠলেন, 'এ-দ্বীপে লোক থাকে। এ আলো প্রকৃতির দান নয়—মানুষেরই হাতে জ্বালানো!'

'তাহ'লে তো আয়ারটনকে এই দ্বীপে নামানো যাবে না!'

'না।' মেজর ম্যাকন্যাবস সায় দিয়ে বললেন, 'দ্বীপে যদি বন্য বর্বরেরা থেকে থাকে, তাহ'লে আয়ারটনের কপালে দুঃখ আছে। জেনে-শুনে এমন দ্বীপে আয়ারটনকে রেখে আসা যাবে না।'

রাত এগারোটার সময় কাপ্তেন শুদ্ধু সবাই যে যাঁর ক্যাবিনে চ'লে গেলেন। ভোর না-হওয়া অব্দি *ডানকান* তীরের কাছে এখানেই অপেক্ষা করবে। তারপর দিনের আলোয় অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

কেউ যখন ডেকে নেই, এমন সময় ডেকে এসে দাঁড়ালে মেরি আর রবার্ট। আর সবাই হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু তাদের চোখে কোনো ঘুম নেই।

রেলিঙে ভর দিয়ে দুজনেই তাকিয়ে রইলো ফসফর-জ্বলা নীল জলের দিকে। কে জানে, তাদের দুজনের জন্যে ভবিষ্যৎ কী সাজিয়ে রেখেছে। কিন্তু এখন তো অতীতও গেলো। কাপ্তেন গ্রাণ্টের কোনো খবরই আর পাওয়া যাবে না। তিনি কি এখনও বেঁচে আছেন? কোথায় আছেন? *কোথায়?*

হঠাৎ স্তব্ধতা ভেঙে ফিশফিশ ক'রে রবার্ট ব'লে উঠলো: 'মেরি! আমি কিন্তু এখনও আশা ছাড়িনি। কখনও ছাড়বোও না। বাবাকে আমি খুব-ভালো ক'রে চিনি। সহজে হাল ছেড়ে দেবার মানুষ তিনি নন।'

মেরি তেমনি ফিশফিশ ক'রেই জিগেস করলে, 'কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস কী বলেন? উনি কি এখনও কোনো আশা রাখেন?'

'নিশ্চয়ই। কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস আমাদের সত্যিকার বন্ধু—উনি আমাদের কিছুতেই হতাশার মুখে ঠেলে দেবেন না। ওঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে—উনি আমাকে জাহাজ চালাতে শেখাবেন। আমিও একদিন জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়বো। বাবাকে খুঁজতে বেরুবো।'

'বাঃরে, তাহ'লে তো তোর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হ'য়ে যাবে।'

'তা হয়তো হবে—কিন্তু একলা তো থাকবি না। লেডি হেলেনা কিছুতেই তোকে কাছছাড়া করবেন না। তাছাড়া কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসের ইচ্ছে যে—'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসের ইচ্ছেটা যে কী, সেটা মেরিরও অজানা নেই। তবু রবার্টের মুখ থেকে কথাটা বেরুতেই তার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠছিলো, ভাগ্যিশ এত-রাত ব'লে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেকে আলোছায়ার খেলা চলছিলো, রবার্ট নিশ্চয়ই তার মুখখানা দেখতে পায়নি। কিন্তু রবার্টের কথাটা যেমন অসমাপ্ত র'য়ে গেলো, মেরির লজ্জাবিজড়িত ভাবনাটাও তেমনি মাঝখানে কোন-এক হ্যাঁচকা টানে যেন ছিঁড়ে গেলো।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্য থেকে কার যেন অস্ফুট কাতর স্বর ভেসে এসেছে : 'বাঁচাও ! বাঁচাও !'

রবার্ট অমনি কথা ঘুরিয়ে বললে : 'মেরি, তুই কিছু শুনতে পেলি !'

রেলিঙ ধ'রে ঝুঁকে পড়লো দুজনে। অন্ধকারের মধ্যে ভালো ক'রে কিছুই ঠাহর হয় না।

কিন্তু কোন-এক তীব্র আবেগে মেরির আরক্ত মুখটা হঠাৎ পাংশু হ'য়ে উঠলো। ধরাগলায় বললে, 'রবার্ট...রবার্ট...মনে হ'লো...না, না, তা কী ক'রে হবে... আমি বোধহয় ভুলই শুনেছি !'

সঙ্গে-সঙ্গে হাওয়া ভাসিয়ে নিয়ে এলো আবার সেই আর্ত হাহাকার : 'বাঁচাও! বাঁচাও !' মনে হ'লো ঢেউয়ের ফসফরের মধ্য দিয়েই আবছা নীল আলোর মতো ভেসে এলো স্বরটা।

এবং এবার রবার্টের আর ভুল হ'লো না। আর সে নিজেকে সামলে রাখতে পারলে না। আকুলস্বরে ডেকে উঠলো : 'বাবা ! বাবা !' যেন অন্ধকারের মধ্যেই তার গলার স্বর বাবাকে খুঁজতে সিন্ধুহাওয়ায় উড়ে চ'লে গেলো।

মেরি আর সহ্য করতে পারেনি, ততক্ষণে সে তীব্র আবেগের চাপেই বুঝি মূর্ছিত হ'য়ে প'ড়ে যেতো—যদি-না শেষমুহূর্তে রবার্ট তাকে ধ'রে ফেলতো। রবার্ট যে কী ভেবেছিলো কে জানে। মেরির মূর্ছিত চেতনাহীন দেহটা জড়িয়ে ধ'রেই সে চেঁচিয়ে উঠলো : 'কে কোথায় আছো ! এক্ষুনি এসো! বাবা ডাকছেন ! এসো, বাঁচাও !—'

যে-সব মাল্লারা যে-যার কাজে তখনও ব্যস্ত ছিলো, তারা সবাই ছুটে এলো! চীৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গিয়েছে অন্যদের। তাঁরা সবাই যে যার ক্যাবিন থেকে ছুটে এসেছেন।

এই মাঝরাত্তিরে এ-কী ব্যাপার! কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো খোঁজ আর পাওয়া যাবে না জানবার পরে দুই ভাইবোনের কি মাথাই বিগড়ে গেছে নাকি! ঢেউয়ের দিকে আঙুল তুলে বুকভাঙা আর্তস্বরে রবার্ট শুধু একই কথা বলছে : 'বাবা ! বাবা ! ঐ-যে ঐখানে, অন্ধকারে...' মেরিকে সে তখন ব্যাকুলভাবে আঁকড়ে ধ'রে আছে। 'কী ? শুনতে পাচ্ছেন না ? বাবা আছেন—সাহায্য চেয়ে ডাকছেন—ঐ-যে—শুনুন... *বাঁচাও ! বাঁচাও !* মেরিও শুনেছে, শুনে আর নিজেকে সামলাতে পারেনি—জ্ঞান হারিয়ে গেছে ওর... কিন্তু ঐ শুনুন...'

এ কী নিশির ডাক শুনেছে নাকি ? এখনও কি স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে আছে? ঠিক জানে, সে কী বলছে?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবার্টের কাঁধে হাত রেখে লর্ড গ্লেনারভন জিগেস করলেন : 'কী বলছো রবার্ট ? তুমি কাপ্তেন গ্রাণ্টের গলা শুনতে পেয়েছো?'

'হ্যাঁ...হ্যাঁ...মেরিও শুনেছে। একজনের ভুল হ'তে পারে, কিন্তু একসঙ্গে দুজনেরই একই ভুল হবে কী ক'রে? হঠাৎ গলাটা শুনতে পেয়েই তো মেরি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে—'

লেডি হেলেনা এসে ততক্ষণে মেরির দেহটা ধ'রে দাঁড়িয়েছেন।

ত্রোনিদো যতই বলুক না কেন, 'এখন তুমি বড়ো হ'য়ে গেছো, রবার্ট,' তবু তো রবার্ট সত্যি এখনও ছেলেমানুষই আছে ! কী শুনতে কী শুনেছে...আর ঠিক নিজের ইচ্ছাপূরণের মতো ক'রেই রাতের হাওয়ায় শুনে ফেলেছে বাবার গলা !

কিন্তু যতই ইচ্ছাপূরণের অলীক কল্পনা হোক না কেন, এর ভুলটা তো এখুনি, বেশি দেরি হ'য়ে যাবার আগেই ভাঙিয়ে দিতে হয় ! হাল ধ'রে যে-নাবিকটি দাঁড়িয়েছিলো, তাকেই ডেকে গ্লেনারভন জিগেস করলেন: 'হকিন্স, মিস মেরি অজ্ঞান হ'য়ে যাবার সময় তুমি হালেই ছিলে তো ?'

'হ্যাঁ, মি-লর্ড।'

'কিছু শুনেছো ?'

'না, মি-লর্ড। জলের আর হাওয়ার শব্দ ছাড়া আর-কিছুই শুনিনি। শুধু ওখানে দাঁড়িয়ে ওঁরা দুজনে কথা বলছিলেন !'

'না-না। আমি সত্যি শুনেছি। খুবই চাপা অস্ফুট স্বর—হকিন্স হয়তো খেয়াল করেনি, তাই শুনতে পায়নি—কিন্তু নৌকো নিয়ে একবার চলুন না দ্বীপটায়—ওখানে গিয়েই তো সন্দেহভঞ্জন করা যায়—'

পাঞ্চয়ল হঠাৎ রেলিঙ ধ'রে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সবাইকে চুপ করতে বললেন। সকলেই উৎকর্ণ হ'য়ে আছেন, যদি কিছু কানে আসে। কিন্তু জলের একটানা ফিশাফিশ শব্দ ছাড়া আর-কোনো শব্দই শোনা যাচ্ছে না— এমনকী হাওয়াও এখন ম'রে এসেছে— হাওয়ার শোঁ-শোঁ শব্দও আর শোনা যাচ্ছে না এখন।

পাঞ্চয়ল নিজের মনেই অস্ফুট স্বরে বললেন, 'অদ্ভুত ! সত্যিই, বুদ্ধিতে এর কোনো ব্যাখ্যাই চলে না। আবেগ আর অনুভূতির কোন চরম বিপর্যয়ের মধ্যে যে মানুষ নিজের ইচ্ছাপূরণ করার জন্যে কত-কী শুনতে পায় ! অদ্ভুত ! ভারি অদ্ভুত !'

লর্ড গ্লেনারভন নিজেই রবার্টকে ধ'রে-ধ'রে নিয়ে গেলেন তাঁর ক্যাবিনে। লেডি হেলেনা ততক্ষণে মেরিকে নিয়ে চ'লে গিয়েছেন। আজ রাতে তো আর কিছুই করার নেই, কাল দিনের আলোয় না-হয় দ্বীপে নেমে দেখা যাবে।

পরের দিন, আটই মার্চ, ভোর হবামাত্র রবার্ট আবার ডেকে এসে দাঁড়ালে। সারারাত সে একফোঁটাও ঘুমোয়নি। উদভ্রান্ত চোখমুখ। যেন বড়ো-একটা ঝড় ব'য়ে যাবার পর কোনো একটা গাছ আবার সোজা হ'য়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আস্তে-আস্তে অন্ধকার থেকে ফুটে উঠেছে দ্বীপটা—*ডানকান* মাত্র একমাইল দূরে নোঙর ফেলেছে।

অন্যরাও ততক্ষণে ডেকে এসে হাজির হয়েছেন। সবাই টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে দেখতে চাচ্ছে দ্বীপটাকে।

হঠাৎ আবার চীৎকার ক'রে উঠলো রবার্ট, গত রাত্তিরের মতোই। এবার সে কিন্তু শোনেনি, বরং দেখেছে যে দুজন লোক একটা পতাকা নাড়তে-নাড়তে বেলাভূমির দিকে ছুটে আসছে!

দুরবিনে চোখ লাগিয়েই চীৎকার ক'রে উঠলেন কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস—'এ-কী! এ-যে *ইউনিয়ন জ্যাক*, গ্রেটবিটেনের পতাকা!'

ততক্ষণে জাক পাএয়ল কেমন বিস্ফারিত চোখে, তাঁর টেলিস্কোপ থেকে নজর সরিয়ে কেমন-একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছেন রবার্টকে। শুধু বললেন: 'হ্যাঁ, এটা ইউনিয়ন জ্যাকই!'

এতই হকচকিয়ে গিয়েছেন সবাই যে পরের কয়েকটা মুহূর্ত কারু মুখেই কোনো কথা নেই! তারপরেই প্রচণ্ড আবেগে রবার্টের কম্পিত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো: 'মি-লর্ড! মি-লর্ড! এক্ষুনি যদি নৌকো না-নামান তো আমি কিন্তু জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সাঁৎরেই চ'লে যাবো! দয়া করুন, মি-লর্ড! আমায় যেতে দিন!'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসের নির্দেশে ততক্ষণে একটা নৌকো নেমে পড়েছে জলে। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে পর-পর নেমে এলেন লর্ড গ্লেনারভন, কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস আর জাক পাএয়ল, তারপর মেরি আর রবার্ট। ছ-জন মাল্লা বসলো দাঁড় টানতে, আর কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস নিজে গিয়ে বসলেন হালে।

তীর থেকে যখন বিশ-পাঁচিশ হাত দূরে, তখনই উত্তেজিত স্বরে মেরি চেঁচিয়ে উঠলো: 'বাবা!'

বেলাভূমিতে দুই লম্বাচওড়া পুরুষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শীর্ণ কিন্তু দীর্ঘদেহী তৃতীয় একজন পুরুষ। আর মেরির গলা শুনেই সেই মানুষটি যেন সামনের দিকে তাকিয়ে হাওয়া আঁকড়ে ধরতে চেয়ে লুটিয়ে প'ড়ে গেলেন বালির ওপর!

কাপ্তেন গ্রাণ্ট!

শুধু যে দুঃখেই বুক ফাটে তা নয়, আনন্দেও কখনও-কখনও বুক ফেটে যায়। কিন্তু একটু শুশ্রূষার পরেই কাপ্তেন গ্রাণ্ট আবার সাড় ফিরে পেয়েছেন। তারপরই তাঁকে আর তাঁর দুই সাথীকে নিয়ে *ডানকানে* ফিরে এলো নৌকো। আর নৌকোয় আসতে-আসতেই দু-চারকথায় ছাড়া-ছাড়া ভাবে কাপ্তেন গ্রাণ্ট শুনেছেন *ডানকানের* ইতিহাস। দুই ভাই-বোনই একসঙ্গে কথা কইতে যাচ্ছিলো, তারপর দুজনেই হঠাৎ-হঠাৎ একসঙ্গে থেমে যাচ্ছিলো, তারপর ফের আবার কাহনের খেই ধরেছিলো দুজনেই একসঙ্গে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

*ডানকানে* এসেই কাপ্তেন গ্রাণ্ট প্রথমে প্রত্যেককে আলাদা-আলাদা ক'রে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানালেন, কিন্তু বার-বার ধন্যবাদ দিয়েও যেন অনুভূতির শান্তি নেই। এটা স্কটল্যাণ্ডেরই জাহাজ, তাঁরই দেশের জাহাজ। একবার নতজানু হ'য়ে ব'সে ঝুঁকে এমনকী *ডানকানেরই* ডেককে চুম্বন করলেন কাপ্তেন গ্রাণ্ট—এই জাহাজ তো তাঁরই স্বদেশের সম্প্রসারিত ভূমি —সাতসাগর তেরোনদী পেরিয়ে এই মারিয়া তেরেসা দ্বীপের কাছেই যেন এসে পড়েছে।

আর একবারও চোখ ফেরাতে পারেননি ছেলেমেয়ের ওপর থেকে। মেরি শুধু বয়েসেই বাড়েনি, রূপ ফেটে পড়ছে তার সুগঠিত দেহবল্লরী থেকে। আর রবার্ট ? তার চেহারাটা কিশোরেরই, কিন্তু দেখে মনে হয় যেন কত বড়োটি হ'য়ে গেছে। মাত্র দুটো বছরেই এত বদল হয় লোকের ?

তারপর যখন সকলের সঙ্গে এক-এক ক'রে পারিচিত হবার সময় জন ম্যাঙ্গলস —একটা ঝকঝকে নতুন জাহাজের কাপ্তেন— কেমন যেন লাজুক-লাজুক ভঙ্গিতে গুটিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন আর মুখ টিপে-টিপে হাসছিলেন লেডি হেলেনা, তখন কাপ্তেন গ্রাণ্টের বুঝতে দেরি হয়নি এই তরুণ কাপ্তেনের সঙ্গে তাঁর মেয়ের সম্পর্কটা কী দাঁড়িয়েছে। আর তক্ষুনি মেয়েকে ডেকে সকলের সামনেই তিনি জন আর মেরির হাত মিলিয়ে দিলেন —আর শুভকামনায় যেন ফেটে পড়লো আস্ত জাহাজটাই। আজ শুধু পুনর্মিলনেরই দিন নয়, নূতন জীবন শুরু করারও দিন।

এই উৎসবের আবহাওয়ার ভেতর মনখারাপের শুধু একটাই বিষয়। আয়ারটনকে এই দ্বীপেই নির্বাসন দিতে হবে। তার আগেই অবশ্য কাপ্তেন গ্রাণ্ট আবারও একবার নেমেছেন দ্বীপটায়, যে-দ্বীপটা দু-বছর তাঁদের আশ্রয় দিয়েছে। ঘুরে-ঘুরে সবাইকে দেখিয়েছেন আস্তে দ্বীপটাই।

ছোট্ট দ্বীপ মারিয়া তেরেসা। দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইল, প্রস্থে মোটে দু-মাইল। জাক পাঞ্চয়াল সত্যিই ধরেছিলেন—আসলে দ্বীপটা একটা মস্ত অগ্নিগিরির চূড়া কিন্তু আগ্নেয়গিরি এখন আর জাগ্রত নয়। কবেই যে সে ম'রে গিয়েছে তা কেউ জানে না। পলি জমেছে বোজানো জ্বালামুখে। গাছপালা গজিয়েছে, হয়তো কোনোদিন সমুদ্রপাখিরা ঠোঁটে ক'রে এনেছিলো কোনো উদ্ভিদের বীজ। একবার একদল তিমিশিকারি এখানে থেমেছিলো, তার ছেড়ে দিয়ে গেছে শুওর আর ছাগল—এতদিনে তারা শুধু বংশবৃদ্ধিই করেনি, এমনকী ছাগলগুলোও বন্য হ'য়ে গিয়েছে, শুওরগুলোর তো কথাই নেই। ছোট্ট একটা ঝর্না আছে, কী মিষ্টি তার জল ! আর বারোমাস জল থাকে সেখানে, শুধু বর্ষার জলের জন্যে হা-পিত্যেশ ক'রে থাকতে হয় না। দ্বীপের এ-দিকটাতেই ঝড় এসে আছাড় মেরে ভেঙে ফেলেছিলো *ব্রিটানিয়াকে*। শুধু এঁরা তিনজন ছাড়া সেই করাল তুফানের হাত থেকে আর-কেউ রেহাই পায়নি। দুই সাথীকে নিয়ে সেখানেই ঘর বাঁধেন কাপ্তেন গ্রাণ্ট, আরো-একটা '*রবিনসনেড*'ই বুঝি, শুধু তাঁর দুজন সঙ্গী ছিলো প্রথম থেকেই—আর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো ফ্রাইডেও একদিন এখানে এসে হাজির হয়নি। ভাঙাচোরা *ব্রিটানিয়ার* ধ্বংসাবশেষ থেকেই কাঠকুটো এনে কুঠি তৈরি করেন তাঁরা। ভারি কেম্বিসকাপড়ের পালে আলকাৎরা মাখিয়ে গোড়ায় ছাত বানান। পরে অবশ্য অন্য কাঠকুটো এনে সেটাকে শক্ত করা হয়। ভাঙা জাহাজে কিছু বীজও পেয়েছিলেন—তাই থেকে ছোট্ট আবাদও তৈরি হয়। দুটি বুনো ছাগলকে ধ'রে এনে পোষ মানিয়ে নেন। ব্রেডফ্রুট গাছ জোগায় —না, রুটি ঠিক নয়, তবে তারই মতো কিছু-একটা। আর এইভাবেই কেটে গিয়েছে আড়াই বছর। এই দ্বীপ কোনো জাহাজ যাবার পথে পড়ে না। সবচেয়ে কাছে আছে নিউ-জিল্যাণ্ড, সেও তো দেড়হাজার মাইল দূরে। তবু তাঁরা পালা ক'রে পাহাড়ের চুড়োয় উঠে দেখতেন দূরে কোথাও কোনো জাহাজ দেখা যায় কি না। আড়াই বছরে মাত্র তিনটে জাহাজ দেখেছেন— কোনোটাই থামেনি—অনেক দূর দিয়ে চ'লে গিয়েছে।

কিন্তু গতকাল যখন দেখতে পেলেন চোঙ দিয়ে ভলকে-ভলকে ধোঁয়া ছেড়ে একটা জাহাজ এই দ্বীপের দিকেই আসছে, তখন সবাই উল্লাসে ফেটে পড়েছিলেন। কিন্তু তার মধ্যেই ঘনিয়ে এলো অন্ধকার। জাহাজ থেকে লোক যাতে টের পায় দ্বীপে কেউ থাকে, সেইজন্যে পাহাড়ের চুড়োয় তাঁরা আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কাপ্তেন গ্রাণ্ট তার পরেও কোনো ঝুঁকি নিতে চাননি। জাহাজ মাত্র মাইলখানেক দূরে এসে গেছে, অথচ তাঁদের জ্বালানো আগুন দেখেও কোনো সাড়া দিচ্ছে না, তখন জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন, সাঁৎরেই জাহাজে চ'লে যাবেন ব'লে। কিন্তু জাহাজ অব্দি যেতে পারেননি —মাঝপথেই যখন গেছেন, তখন দ্যাখেন জাহাজটা মুখ ঘুরিয়েছে। এতক্ষণ সাঁতার দিয়ে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন, দম ফুরিয়ে যাচ্ছিলো, তবু শেষমুহূর্তে 'বাঁচাও ! বাঁচাও !' ব'লে আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। তাঁর দুই সঙ্গী কোনোমতে জল থেকে তাঁকে উদ্ধার ক'রে আনে। ঠিক করেছিলেন, পরদিন ভোরেই তীরে জলের কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে পতাকা নেড়ে জাহাজের দৃষ্টিআকর্ষণ করার চেষ্টা করবেন।

এতক্ষণ ধ'রে সব ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে-দেখতেই কাপ্তেন গ্রাণ্ট পুরো কাহনটা শোনাচ্ছিলেন। কিন্তু শুনতে-শুনতে সারাক্ষণই উশখুশ করেছেন পাঞয়ল। একটা প্রশ্ন অনেকক্ষণ ধ'রেই তাঁর মাথার মধ্যে কামড়াচ্ছিলো, এবার কাপ্তেন গ্রাণ্ট থামতেই আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না, ফস ক'রে জিগেস ক'রে বসলেন: 'আচ্ছা, চিরকুটগুলোয় কী লিখেছিলেন মনে আছে ? সেই যে-লেখাটা বোতলে পুরে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন ?'

'নিশ্চয়ই মনে আছে। প্রত্যেকটা কথাই মনে আছে। তিন ভাষাতেই একই কথা লিখেছিলুম। শুনুন, আপনাকে আগে ফরাশি বয়ানটাই শোনাই,' ব'লে স্পষ্ট ক'রে প্রত্যেকটা কথা শুনিয়ে দিলেন কাপ্তেন গ্রাণ্ট:



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্মিত পাঞ্চয়লের মুখ দিয়ে একটা উৎকট আওয়াজ বেরিয়ে এলো। কাপ্তেন গ্রাণ্ট একবারও না-থেমে বাকিটুকুও ব'লে দিলেন:

Le 27 Juni 1862, le trois-mats Britannia, de Glasgow s'est purdue a quinze cents lieuse de la patagonie, dans 9 hemisphere austral. portes a herre, deux matelots et le capitane Grant ont atteint t'ile Taber

Le Continuel Pe ment en Proie a une Cruelle indi-gence, its ont jete le document Per 153° longitude et 37°11' latitude. Venez a leur Secours ou its Sont perdus.

*Tabor* কথাটা শুনেই বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন পাঞ্চয়ল, এখন প্রায় ঝগড়া করার ভঙ্গিতেই বললেন—যেমন তিনি ব'লে থাকেন কোনো পণ্ডিতজনের আলোচনাসভায় —'কিন্তু সে-কী! আপনি টেবর আইল্যাণ্ড বলছেন কাকে? এটা তো মারিয়া তেরেসা দ্বীপ!'

'দুটোই ঠিক, মঁসিয় পাঞ্চয়ল।' কাপ্তেন গ্রাণ্ট স্মিতমুখে বললেন, 'ইংরেজি আর আলেমান ভাষায় যাকে মারিয়া তেরেসা বলে, ফরাশিতে তারই নাম টেবর।'

ঠিক তক্ষুনি বিষম একটা থাবা পড়লো মঁসিয় পাঞ্চয়লের কাঁধে। থাবাটা মেজর ম্যাকন্যাবসের। ঠোঁট বেঁকিয়ে ব'লেই ফেললেন: 'ধুত্তোরি ভূগোলের! কিন্তু শত ধিক ভূগোলের পণ্ডিতদের!'

পাঞ্চয়ল সে-কথা কানেই নেননি। তখন তিনি নিজেই ধুলোয় মিশিয়ে যেতে, পারলে বাঁচেন। এমনকী কাঁধের ঐ চাপড়টা পর্যন্ত তিনি টের পাননি। শত ধিক কী বলছেন মেজর, সহস্র ধিক, লক্ষ ধিক! এত-বড়ো ভূগোলবিশারদ হ'য়েও তিনি কি না জানতেন না যে একটা ছোট্ট দ্বীপের দু-দুটো ভিন্ন নাম! ছি-ছি-ছি, এত তিনি জাঁক দেখাতেন নিজের জ্ঞানগরিমা নিয়ে। অথচ এই তুচ্ছ কথাটাই কি না তিনি জানতেন না।! 'না-না,' পারলে বুঝি মাথার চুলগুলোই ছিঁড়ে ফেলতেন তিনি, 'ভৌগোলিক সমিতির সচিব হবার কোনো যোগ্যতাই আমার নেই! এক্ষুনি ইস্তফা দেবো—এক্ষুনি পদত্যাগপত্র দাখিল করবো—'

লেডি হেলেনা একটু সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন: 'এ আর এমন কী ভুল! অত



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনখারাপ করার কী হ'লো ?'

'মনখারাপ করবো না ?' আবারও মাথার চুল ছিঁড়েছেন পাঞ্জয়ল, 'আমি একটা গাধা ! একটা আহাম্মক ! একটা আকাট মূর্খ !'

কিন্তু ততক্ষণে চিরকুটির যে-সব শব্দের ভুল অর্থ করা হয়েছিলো, হরফ জলে ভিজে মুছে গিয়ে যে-ব্যাসকূট তৈরি করেছিলো, এখন সে-সবও স্পষ্ট হ'য়ে গেছে। যেমন Contin মানে Continent নয়, Continual : Indi হবে না India বা Indegenese— হবে Indigence !

আর এই নিয়ে কত-কী বলাবলি করতে-করতেই ফের *ডানকানে* ফিরে এলেন সবাই।

বিকেলবেলায় ডেকের ওপর আয়ারটনকে নিয়ে-আসা হ'লো কাপ্তেন গ্রাণ্টের সামনে। গ্রাণ্ট শুধু ছোট্ট ক'রে বললেন: 'আয়ারটন, আমি আবার ফিরে এসেছি।'

আয়ারটনের মুখে কিন্তু এতটুকু ভাবান্তর হ'লো না। শুধু বললে: 'এসেছেন ? বেশ ভালো হ'লো। সুখী হলাম।'

'আমি কিন্তু মস্ত একটা ভুল করেছিলুম, আয়ারটন। তোমাকে আমি নামিয়ে দিয়েছিলুম লোকালয়ে, মানুষ যেখানে থাকে। কিন্তু তুমি তো অন্য মানুষের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকবার যোগ্য নও !'

'হয়তো।'

'এবার কিন্তু আর সেই ভুল হবে না। আমি অ্যাদ্দিন যে-নির্জন দ্বীপটায় ছিলুম, এখন থেকে আমার বদলে তুমিই সেখানে থাকবে। আমাদের দুজনেরই ভূমিকা উলটে যাবে। এখানে একা-একা তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। বিধাতা তোমায় দেখবেন।'

'তা-ই হবে,' আয়ারটনের স্বর একটুও কাঁপলো না।

গ্লেনারভন আবারও জিগেস করলেন: 'এখনও তুমি একা-একা এই দ্বীপে থাকতে চাচ্ছো ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহ'লে এই কথাগুলো শুনে রাখো। কাপ্তেন গ্রাণ্টের মতো তুমি কিন্তু মোটেই হারিয়ে যাবে না। আমরা সবাই জানবো, তুমি কোথায় আছো। তোমার কথা আমাদের মনে থাকবে। এও জানা থাকবে, কোথায় গেলে তোমায় পাওয়া যাবে। কাকতাল কিন্তু বার-বার হয় না ব'লেই সেটা কাকতাল। *ডানকান* দৈবাৎ এদিকটায় এসে পড়েছিলো ব'লেই কাপ্তেন গ্রাণ্ট বেঁচে গিয়েছেন। তোমার বেলায় আমরা আর ঐ দৈব যোগাযোগের ওপর নির্ভর করবো না। আমরা একদিন আবার ফিলে আসবো, তোমাকে মানুষের মাঝখানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।'

'তা-ই হবে।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর একটা কথাও বললো না আয়ারটন, নৌকোয় গিয়ে উঠলো। তার জন্যে নৌকোয় আগেই তুলে রাখা হয়েছিলো শুখা মাংস, কাপড়চোপড়, কিছু যন্ত্রপাতি, বন্দুক, গুলিবারুদ—আর সবচাইতে বড়ো-একটা হাতিয়ার—সে হ'লো *বাইবেল*।

সবাই ডেকের ওপর সার দিয়ে দাঁড়িয়েছেন। লেডি হেলেনা একটু বিচলিত বোধ করেছেন। মেরির চোখ দুটি জলে ভ'রে উঠেছে। অন্যরা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেছেন। লেডি হেলেনা একবার ব'লেই ফেললেন, 'এড, ওকে কি নির্বাসন না-দিলেই নয় ?' তাঁর মনে প'ড়ে গেছে তাঁর সঙ্গে কথা বলবার পরই আয়ারটন লর্ড গ্লেনারভনের সঙ্গে একটা রফানিষ্পত্তি করতে চেয়েছিলো—এই শাস্তিটা সে নিজেই বেছে নিয়েছে নিজের জন্যে।

গ্লেনারভন কিছু বলবার আগেই আয়ারটন শান্ত অবিচলিত স্বরে বললে: 'আমাকে আপনারা আমার পাপের সাজাই ভোগ করতে দিন। কোনো সহানুভূতি দেখিয়ে আমায় দুর্বল ক'রে দেবেন না।'

নৌকো তাকে নিয়ে দ্বীপে গিয়ে পৌঁছুতেই লাফিয়ে নেমে পড়লো আয়ারটন। নৌকো ফিরে এলো জাহাজে। ডেক থেকে দেখা গেলো, বালিয়াড়িতে একটা পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল নিষ্কম্প দাঁড়িয়ে আছে আয়ারটন—তাকিয়ে আছে *ডানকানেরই* দিকে।

ও-দিকে সূর্যাস্তের রঙে তখন রাঙা হ'য়ে উঠতে শুরু করেছে সাগরজল। জন ম্যাঙ্গলস প্রায় ফিশফিশ ক'রেই অনুমতি চাইলেন: 'জাহাজ ছাড়ি ?'

'ছাড়ো,' ব'লেই দ্রুতপদে ডেক ছেড়ে চ'লে গেলেন গ্লেনারভন।

আর রাত আটটা নাগাদ অন্ধকারের মধ্যে নিলিয়ে গেলো টেবর আইল্যাণ্ডের পাহাড়ের চুড়ো।

...

ফেরবার পথে অমন যে অবিচলিত নির্বিকার মেজর ম্যাকনাব্স তিনি পর্যন্ত পাঞ্চয়লের একটা ব্যাপার দেখে কৌতূহলে প্রায় ফেটেই পড়বেন যেন। সেই-যে তালকাউয়ানো ছেড়ে অ্যাটলাণ্টিক ধরেছেন তাঁরা, তখন থেকেই তাঁর কৌতূহলটা আরো-উগ্র হ'য়ে উঠতে শুরু করেছে।

বিষম গরমে সকলে যখন হাঁসফাঁস করছে, প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত, তখনও কি না মঁসিয় পাঞ্চয়ল শুধু-যে তাঁর লম্বা ওভারকোট প'রেই থাকেন, তা নয়, গলা পর্যন্ত বোতাম আটকে রাখেন, আর দরদর ক'রে ঘামেন, আর আইঢাই করেন। ব্যাপারটা কী ? ভুলোমন ? অন্যমনস্কতা ? দিনের পর দিন তিনি কি ভুলেই যাচ্ছেন যে এখন ওভারকোট গায়ে দেবার মরশুম নয়—অন্তত গরম নিশ্চয়ই কথাটা তাঁকে জানান দেয়। তবে ?

দশই মে বেলা এগারোটায় ডামবারটনে নোঙর ফেলেছে *ডানকান*। আর বেলা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটোয় *ম্যালকম কাসলে* এসে ঢুকেছেন অভিযাত্রীরা।

সারা তল্লাটটায় আনন্দের হুল্লোড় প'ড়ে গেলো। আসর সরগরম। রোজ বড়ো-বড়ো মজলিশ হয়। আর এমনি একটা মজলিশে মেজর ম্যাকন্যাবসের এক তুতোবোনের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে গেলো মঁসিয় পাঞয়লের। আর দেখবামাত্র মহিলাটি পাঞয়লের প্রেমে প'ড়ে গেলেন। মহিলাটির টাকার অভাব নেই, রূপও আছে, কিন্তু মাথায় একটু ছিট আছে—তাই অ্যাদ্দিন কাউকে ধারে-কাছে ঘেঁসতেই দেননি। অথচ এবারে পাঞয়লকে দেখেই ভদ্রমহিলা কুপোকাৎ। পাঞয়েলেরও যে তাঁকে পছন্দ হয়নি, তা নয়। কিন্তু কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি হচ্ছেন না।

শেষটায় বেজায় চ'টে গিয়ে মেজর ম্যাকন্যাবসই একদিন চেপে ধরলেন পাঞয়লকে। যখন চেপে ধরেছিলেন, তখনও জানতেন না যে এবারই *ওভারকোটরহস্যটার* একটা সমাধান হ'য়ে যাবে।

'ব্যাপারটা কী, মঁসিয় পাঞয়ল ? মিস অ্যারাবেলাকে যদি পছন্দ না-হয় তো সাফসুফ ব'লে দিলেই পারেন। অমন ঝুলিয়ে রেখেছেন কেন ?'

'পছন্দ হবে না কেন ? খুব হয়েছে। চাঁদেও তো কলঙ্ক থাকে—মিস অ্যারাবেলারই কোনো খুঁত নেই।'

'তা থাকবে না কেন। দোষে-গুণে মিশিয়েই তো মানুষ হয়। কিন্তু ওঁকে যদি মনে ধ'রেই থাকে, তবে বিয়েটা ক'রে ফেলছেন না কেন ?'

'না-না, সে হয় না। কিছুতেই বিয়ে হ'তে পারে না।'

কিন্তু মেজর ম্যাকন্যাবস নাছোড়। তাঁর গোঁ আছে। তিনি যেটা করবেন ব'লে ধরেন, সেটার একেবারে শেষ না-দেখে ছাড়েন না। শেষটায় তাঁর বিষম চাপ আর সহ্য হ'লো না পাঞয়লের। একদিন মেজরের কানে-কানে গুপ্ত রহস্যটা ফাঁস ক'রে দিলেন। শুনে মেজর তো হেসেই বাঁচেন না। 'আরে ! এই কথা ! শুধু যদি এটাই বাধা হয় তবে এ তো মোটেই ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। অ্যারাবেলা তো দেখছি আপনার প্রেমে আরো হাবুডুবু খাবে। এমন-কোনো বর তো সে আর-কোথাও খুঁজে পাবে না।'

মেজর ম্যাকন্যাবসের উদ্যোগই পনেরোদিন পরে মহাধুমধাম ক'রে মিস অ্যারাবেলার সঙ্গে মঁসিয় পাঞয়লের বিয়ে হ'যে গেলো। বিয়ের আসরেও দেখা গেলো একটা মস্ত ওভারকোট প'রে আছেন পাঞয়ল, তেমনি গলা অব্দি বোতাম আঁটা। এটাই কি ফ্রান্সের হালফ্যাশান নাকি ?

পাঞয়েলের গুপ্তরহস্য অবশ্যি কেউই কোনোদিন জনতে পারতেন না, যদি-না মেজর একদিন চুপি-চুপি কথাটা ব'লে দিতেন গ্লেনারভনকে, গ্লেনারভন ব'লে দিতেন হেলেনাকে, হেলেনা বলতেন মিসেস ম্যাঙ্গলস ওরফে মেরিকে, আর মেরি বলতো মিসেস অলবিনেটকে, আর তারপর এ থেকে সে, সে থেকে ও— এইভাবে গোপন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাটি আর গোপনই রইলো না আস্ত স্কটল্যাণ্ডে।

মাওরিদের ঘাঁটিতে যখন তিনদিন বন্দী হ'য়ে কাটিয়েছিলেন মঁসিয় পাঞ্চয়ল, তখন মাওরিরা জোর ক'রে তাদের কুলের চিহ্ন কিউয়ি পাখির উলকি দেগে দিয়েছে তাঁর বুকে : দু-পাশে ডানাছড়ানো মস্ত-একটা কিউয়ি ; আর পাঞ্চয়ল অ্যাদ্দিন ধ'রে বুকে লুকিয়ে রেখেছেন নিউ-জিলাণ্ডের ঐ পাখিকে !

---

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# দ্য বারজাক মিশন

*প্রথম খণ্ড*

## নাইজার নদীর বাঁকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক

# সেনট্রাল ব্যাঙ্কে ডাকাতি

খবরকাগজে যাকে বলেছিলো *সেনট্রাল ব্যাঙ্কে ডাকাতি* সেই দুঃসাহসী কাণ্ডটা পনেরো দিন ধ'রে সমস্ত খবরকাগজেরই প্রথম পাতা জুড়ে বসেছিলো—এখনও নিশ্চয়ই কেউ তার কথা ভুলে যায়নি। বেপরোয়া অপকীর্তি অনেক ঘটে, কিন্তু এই ডাকাতি যতটা হুলুস্থুল তুলেছিলো, স্মরণকালের মধ্যে এমন-কোনো ঘটনা আর ঘটেনি : স্পর্ধার সঙ্গে জড়ানো ছিলো রহস্য—এই-তো গেলো এক, কিন্তু এত টাকাও এর আগে কেউ লুঠ করেনি, আর সমস্তটাই ঘটেছিলো যেন ভয়ংকর-দক্ষতার সঙ্গে—এমন অনায়াসদক্ষতায় যে এর পেছনে যার বা যাদের মাথাটা কাজ করেছে তাদের সাধারণ-কোনো ডাকাতের সঙ্গেই তুলনা করা যায় না। বিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই ঘটেছিলো ডাকাতিটা—কিন্তু কী ঘটেছিলো, কেমনভাবে ঘটেছিলো, তার সংক্ষিপ্তসারটা-শুদ্ধু আজও আমাদের কৌতূহলকে দারুণ উসকে দিতে পারে।

ডাকাতিটা ঘটেছিলো সেনট্রাল ব্যাঙ্কের *ডি* কে শাখায়, স্টক এক্সচেঞ্জ বা দালাল স্ট্রিটের কাছে, থ্রেডনীডল স্ট্রিটের মোড়ে; তার ম্যানেজার ছিলো লুইস রবার্ট ব্লেজন, লর্ড ব্লেজনের ছেলে।

একটা মস্ত ঘরের মাঝে লম্বা-একটা ওককাঠের কাউন্টার গেছে—তার ওপাশে বসে ব্যাঙ্কের কেরানিরা, এপাশে দাঁড়ায় মক্কেলরা। ফুটপাথ থেকে ঢুকেই একটা ভেস্টিবিউল, রাস্তার ঠিক মোড়েই; সেখান থেকে কাচের পাল্লাবসানো দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে হয়। ভেতরে বামদিকে আছে কঠিন লোহার শিক দিয়ে ঘেরা স্ট্রংরুম, সেখান থেকে মূল আপিশটায় ঢোকবার জন্যে একটা দরজা আছে বটে তবে সেটাতেও অমনি লোহার শিক বসানো—প্রায় একটা দুর্ভেদ্য খাঁচারই মতো। ডানদিকের ওকের কাউন্টারটা ওপর-ঢাকনা তুলে ভেতরে আসা যায়, যদি কোনো মক্কেলের কখনও কোনো কাজে ভেতরে এসে কোনো কেরানির সঙ্গে আলাপ করার দরকার হয়। তারই পেছনে ম্যানেজারের ঘরে যাবার দরজা, সেখান থেকে যাওয়া-আসার আর-কোনো দরজাই নেই; তারপরেই গেছে একটা করিডর, একেবারে থ্রেডনীডল স্ট্রিট অব্দি; এই মস্ত বাড়িটার সবাই এই করিডর আর তার সঙ্গে লাগোয়া হলঘরটা ব্যবহার করে। এই হলওয়ে একদিকে গেছে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্দালিদের বাক্সটা ছাড়িয়ে, সোজা থ্রেডনীডল স্ট্রিটের রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, প্রধান সিঁড়ির পইঠা পেরিয়ে গেলে, কাচের দুনো-পাল্লাবসানো দরজা, যেটা আসলে আড়ালই ক'রে রেখেছে মাটির নিচের ঘরে যাবার দরজা, আর তারই মুখোমুখি বসানো ঝাড়ুদারদের আসা-যাওয়ার দরজা।

ঘটনাটা যখন শুরু হল, পাঁচটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি তখন, কাঁটায়-কাঁটায়; ব্যাঙ্কের পাঁচজন কর্মচারী তখন যে-যার কাজে ব্যস্ত; দুজনে মন দিয়ে খাতা লিখছে, অন্য তিনজনে কাউন্টারে ঝুঁকেদাঁড়ানো মক্কেলদের কাজ দেখছে; খাজাঞ্চি সব রশিদপত্তর মিলিয়ে টাকার হিশেব করছে : দিনটা যেহেতু মাইনের দিন তাই সবমিলিয়ে যোগফল দাঁড়িয়েছে একুনে ৭২, ০৭৯ পাউণ্ড ২ শিলিং ৪ পেন্স।

কুড়ি মিনিট বাদে বন্ধ হ'য়ে যাবে ব্যাঙ্ক, ঝমঝম ক'রে টেনে নামানো হবে তার ইস্পাতের দরজা; তার একটু বাদেই কর্মচারীরা দিনের কাজ সেরে নিয়ে বিদায় নেবে। বাইরে থেকে গাড়িঘোড়া চলার ভারি গুমগুমে আওয়াজ আর রাস্তার লোকজনের কোলাহল ক্ষীণভাবে কানে আসছে ভেতরে, আর আসন্ন নভেম্বর-সন্ধের আবছায়ায় দরজার কাচের পাল্লাগুলো ঝাপসা হ'য়ে আসছে।

ঠিক তখনই দরজাটা খুলে গিয়েছে, আর ভেতরে এসে ঢুকেছে একটা লোক। দ্রুত চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে ফিরে দাঁড়িয়ে তার ডানহাত তুলে কী-একটা ইশারা করলে, বুড়োআঙুল সমেত আরো-দুটো আঙুল তুলে দেখালে সে, অর্থাৎ বোঝালে—তিন। কেরানিদের দৃষ্টি যদি তার ওপর পড়তোও তবু তারা এই ইশারাটা দেখতে পেতো না, যেহেতু লোকটা তখনও আধখোলা দরজার আড়ালে ঢাকা ছিলো। আর যদি-বা দেখতেও পেতো, স্বপ্নেও তারা ভাবতে পারতো না যে ঐ তিন আঙুলের অর্থ হচ্ছে কাউন্টারে আছে মাত্র তিনজন লোক।

এই সংকেত—যদি তা সংকেতই হ'য়ে থাকে—দেবার পর, লোকটা দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকলো, দোলদরজার পাল্লার দুলুনি থামবার আগেই সে গিয়ে একজন মক্কেলের পেছনে দাঁড়ালে, হাতের কাজ শেষ ক'রে আগের মক্কেলকে বিদায় দিয়ে কেরানিটি যাতে তার কাজে হাত দেয়।

কেরানিদের একজন উঠে দাঁড়িয়ে তার কাছে এসে জিগেস করলে : 'আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারি কি, সার?'

'ধন্যবাদ, আমি বরং লাইনেই দাঁড়াই,' আগন্তুক হাত নেড়ে এমনভাবে বললে যাতে মনে হ'লো সামনে যে-কেরানিটি কাজ করছে তার সঙ্গেই সে কথা বলবে।

নিজের বিবেকের তাড়ানাকে সামলে নিয়ে অন্য কেরানিটি নিজে যে-কাজ করছিলো তাতেই ফিরে গেলো, লোকটাও তেমনি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো, কেউই আর তার দিকে অহেতুক কোনো মনোযোগ দিলে না।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথচ তার অদ্ভুত বেশভূষা হয়তো বিশেষভাবে তাকিয়ে দেখার মতোই ছিলো। ঢ্যাঙা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষ সে, শরীরের কাঠামো দেখে বোঝা যায় সে অসাধারণ শক্তির অধিকারী। তার রোদে পোড়া মুখটাকে অনেকটাই ঢেকে রেখেছে চমৎকার হালকা সোনালি দাড়ি। তার বেশভূষা দেখে তার সামাজিক শ্রেণী বোঝা প্রায় অসম্ভবই ছিলো, কারণ লম্বা-একটা রেশমি ওভারকোট তার পরনে, সেটা একেবারে পা পর্যন্ত নেমে এসেছে।

কেরানি আগের মক্কেলটির কাজ শেষ ক'রে দেবার পর, ওভারকোট-পরা লোকটা তার জায়গায় এসে দাঁড়ালে, আর খুলে বললে সে কী চায়।

আগের মক্কেলটি সবে ঘর ছেড়ে চ'লে গিয়েছে এমন সময় দরজা খুলে গেলো, ভেতরে এসে ঢুকলো দ্বিতীয়-একজন লোক, ওভারকোট-পরা লোকটার মতোই দেখতে —অদ্ভুত সাদৃশ্য দুজনের, যেন একজন আরেকজনের অবিকল-নকল; লম্বায় চওড়ায় আগের জনের মতোই দেখতে, গড়নটা হুবহু এক, তেমনি হালকা-সোনালি দাড়ি ঘিরে আছে তার ব্রনজ মুখ, তারও পরনে লম্বা ওভারকোট, ভেতরে কী প'রে আছে বোঝবার জো নেই।

নবাগত লোকটিও তার পূর্ববর্তী আগন্তুকের মতোই দুজন মক্কেলের একজনের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালে, কাউন্টারের সামনে, অন্য-একজন কেরানির জন্যে; তারপর তার সামনে দাঁড়ানো মক্কেল চ'লে যেতেই সে গিয়ে কেরানিকে খুলে বললে তার চাহিদা কী।

অমনি, আগের মতোই, দরজা আবার খুলে গেলো। তৃতীয়-একজন লোক এসে ভেতরে ঢুকলো, গিয়ে দাঁড়ালো তিনজন মক্কেলের শেষজনের পেছনে। তার গড়নটা মাঝারি, মাথায় একটু খাটো কিন্তু আরো-চওড়া, তার কালো মুখখানা কুচকুচে কালো দাড়িতে ঢাকা, আর তার পরনের পোশাকও ধূসর-একটা লম্বা ওভারকোটে ঢাকা—একই সঙ্গে আগের দুজনের সঙ্গে তার কোনো-কোনো ব্যাপারে মিলও ছিলো, আবার তফাৎও ছিলো।

শেষকালে, তিনজন মক্কেলের শেষজন তার কাজ সেরে কাউন্টার ছেড়ে দিতেই এবার দরজা খুলে ভেতরে এসে ঢুকলো দুজন লোক। ওদের একজনের গায়ে যেন হারকিউলিসের শক্তি, তাদের গায়ে অলেস্টার—অর্থাৎ লম্বা পশমি ওভারকোট, এখনও এমন ঠাণ্ডা পড়েনি যে লোকে অলেস্টার গায়ে ঘুরে বেড়াবে। অন্য তিনজনের মতো তাদের মুখও রোদে-পোড়া, ব্রনজ, তার মুখভর্তি দাড়িগোঁফ।

যেভাবে পর-পর তারা ঢুকেছে, সেটা একটু অদ্ভুতই : প্রথমে এসেছে দুজনের মধ্যে যে লম্বা, আর ভেতরে ঢোকবামাত্র এমনভাবে দাঁড়িয়েছে যেন দ্বিতীয়জনকে আড়াল ক'রে দাঁড়াতে চাচ্ছে—আর দ্বিতীয়জন এমন ভঙ্গি করছে যেন দরজার হাতলে তার অলেস্টার আটকে গেছে, আসলে কী-একটা রহস্যময় ব্যস্ততা দরজায়, এই থমকে-থাকাটা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু মুহূর্তের জন্যেই, তারপরেই পাল্লা দোল খেয়ে এসে পড়েছে সশব্দে, বন্ধ হ'য়ে গেছে। ততক্ষণে অবশ্য, যদিও তার ভেতরের হাতলটা দরজার পাল্লায় লাগানোই ছিলো, যাতে ভেতর থেকে লোক বাইরে যেতে পারে, কিন্তু বাইরের হাতলটা অদৃশ্য হ'য়ে গেছে —*যাতে বাইরে থেকে আর-কোনো লোক ভেতরে আসতে না-পারে*। আর, কেউ-যে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বা কড়া নেড়ে ভেতরে ঢুকবে তারও সম্ভাবনা ছিলো না, কারণ ততক্ষণে বাইরে এই নোটিসটা ঝোলানো হ'য়ে গেছে যে এই শাখার কাজ আজকের মতো শেষ হ'য়ে গেছে।

কেরানিরা কখনও এই সন্দেহ করেনি যে তারা এখন বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে। আর তা যদি তারা জানতোও, সে শুধু তাদের মুখে মৃদুহাসির একটা রেখাই ফুটিয়ে তুলতো। অস্বস্তি হবে কেন তাদের খামকা, শহরের একেবারে বুকের ওপর এই শাখা, এখন হচ্ছে দিনের ব্যস্ততম সময়, বাইরের কোলাহল একটু-একটু তো কানেই আসছে তাদের—মাত্র-তো কাচের একটা পাল্লা তাদের রাস্তা থেকে আলাদা ক'রে রেখেছে!

অন্য দুজন কেরানি বিনীত ভঙ্গিতে এই নবাগতদের কাছে এগিয়ে এলো, কারণ তারা জানতো যে ঘড়িতে পাঁচটা বাজতে চলেছে, ক-মিনিটের মধ্যেই এই বিরক্তিকর লেটলতিফদের কাজ শেষ ক'রে ফেললেই আজকের মতো ছুটি তাদের। লেটলতিফদের একজন তার কাজ খুলে বললে একজন কেরানিকে, অন্যজন কিন্তু সরাসরি প্রস্তাবটা উপেক্ষা ক'রে বললে সে একটা বিশেষ কাজে এক্ষুনি খোদ ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

'দেখি, উনি ওঁর ঘরে আছেন কি না।'

কেরানিটি ভেতরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই, প্রায়-পরক্ষণেই, বেরিয়ে এলো।

কাউন্টারের ঢাকনা খুলে দিয়ে সে বললে, 'আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে এদিক দিয়ে আসেন—'

অলেস্টার-পরা ঐ দীর্ঘাকৃতি লোকটা আপিশের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো, আর কেরানিটি চ'লে গেলো তার নিজের হাতের কাজ সারতে।

ব্রাঞ্চম্যানেজার আর এই আগন্তুকের মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছিলো?—দফতরের অন্যান্য কর্মচারীরা পরে বলেছিলো তারা এ-সম্বন্ধে কিছুই জানতো না। যে-তদন্ত হয়েছিলো পরে, তাতে শুধু কতগুলো অনুমানই করা গিয়েছিলো—কেননা আজও কেউ জানে না সেদিন ম্যানেজারে ঘরে বন্ধ দরজার আড়ালে সত্যি-সত্যি কী হয়েছিলো।

তবে একটা বিষয় অন্তত নিশ্চিত জানা গিয়েছিলো : দু-মিনিটও কাটেনি, দরজা আবার খুলে গিয়েছে আর অলেস্টার-পরা লোকটা আবার এসে দেখা দিয়েছে ঘরের চৌকাঠে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুবই নৈর্ব্যক্তিক নির্বিকার ভঙ্গিতে, ঠিক কাউকেই উদ্দেশ না-ক'রে, সে শান্ত গলায় বলেছে : 'ম্যানেজার খাজাঞ্চির সঙ্গে একটু কথা বলতে চান।'

'নিশ্চয়ই, সার,' কেরানিটি ঘুরে তারপর ডাক দিয়েছে : 'স্টোর!'

'বলুন, মিস্টার বার্কলে?'

'কত্তা আপনাকে একটু ডাকছেন।

'যাচ্ছি,' বলেছে খাজাঞ্চি।

নগদ টাকা নিয়ে যারা কাজকারবার করে, চিরকালই তারা খুব-হুঁশিয়ার হয়—যেন রক্তে দানা বেঁধে যায় সতর্কতা। কিছু না-ভেবেই সে খোলা স্ট্রংরুমটার সিন্দুকে ছুঁড়ে দিয়েছে একটা পেটফোলা ব্রীফকেস, আর তিনটে প্যাকেট, সবগুলোর গায়েই লেবেল সাঁটা, লেখা আছে আজ কত টাকা জমা পড়েছে। ভারি দরজাটা ভোঁতা ভারি-একটা আওয়াজ ক'রে আটকে গিয়েছে; তারপর, তার জানলাটা বন্ধ ক'রে সে তার গরাদ-আটকানো ঘরটা থেকে বেরিয়ে এসেছে, আর অভ্যস্ত হুঁশিয়ার-হাতে সেটা বন্ধ করতেও ভোলেনি, তারপর সোজা এগিয়ে গেছে ম্যানেজারের ঘরের দিকে। আগন্তুক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো, সে একপাশে স'রে দাঁড়িয়েছে, তারপর তার পেছন-পেছন ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে।

ভেতরে ঢুকেই স্টোর তাজ্জব হ'য়ে দ্যাখে যে-ম্যানেজার নাকি তাকে ডেকে পাঠিয়েছে, সে ভেতরে কোথাও নেই, ঘরটা ফাঁকা প'ড়ে আছে। কিন্তু রহস্যটার মীমাংসা করবার কোনো সুযোগই পায়নি বেচারা। পেছন থেকে আক্রান্ত, তার টুঁটিটা যেন লোহার সাঁড়াশির মতো শক্ত কার হাতের বাঁধনে আটকা প'ড়ে গেছে; সে যোঝবার চেষ্টা করেছিলো, 'বাঁচাও! বাঁচাও!' ব'লে চ্যাঁচাবারও চেষ্টা করেছিলো... কিন্তু আততায়ীর হাতদুটো আরো-আঁটো ব'সে গেছে তার টুঁটিতে, তারপর দম আটকে—সংজ্ঞাহীন—সে লুটিয়ে পড়েছে মেঝেয়।

এই হিংস্র হামলাটা পুরোটাই ঘটেছে নিঃশব্দে। বাইরের আপিশঘরে কেরানিরা যে-যার কাজ ক'রে চলেছে, তাদের চারজন সামনে দাঁড়ানো খদ্দেরদের সামলাচ্ছে, অন্যজন ঘাড় গুঁজে তার হিশেব নিয়েই ব্যস্ত।

অলেস্টার পরা লোকটা তার কপাল থেকে ঘাম মুছবার জন্যে থামলো একটু, তারপর তার শিকারের ওপর ঝুঁকে দাঁড়ালো। মুহূর্তের মধ্যে তার মুখে কাপড় গুঁজে আষ্টেপৃষ্ঠে তাকে বেঁধে ফেলা হলো।

বাঁধাছাঁদা শেষ ক'রে সে টেনে দরজাটা খুলে মূল আপিশটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। যা দেখতে পেলে তাতে সন্তুষ্ট হ'য়ে খুক ক'রে অস্ফুট কাশলো একটু, যেন চারজন খদ্দেরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছে সে, তারপর দরজাটা পুরোপুরি খুলে ফেলে চৌকাঠে এসে দাঁড়ালে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটাই বোধহয় ছিলো সংকেত, সন্দেহ নেই আগে থেকেই শলাপরামর্শ ক'রে ঠিক করা, কারণ তারপরেই দেখা গেলো আশ্চর্য-একটা দৃশ্য। অলেস্টার-পরা লোকটা যখন একলাফেই পেরিয়ে গিয়ে ঘাড়-গোঁজা হিশেবনবীশের ঘাড়ের ওপর পড়লো, এবং নির্দয়ভাবে গলা টিপে ধরলো তার, তার পাঁচজন সঙ্গীর দশাও তখন তেমনি-অসহায়। কাউন্টারের শেষদিককার মক্কেলটি কাউন্টারের ওপরঢাকনা তুলে ততক্ষণে লাফিয়ে পড়েছে ভেতরে; যে-কেরানিটি তার তদারক করছিলো তার ঘাড়টা পেঁচিয়ে ধ'রে তাকে সে মেঝেয় আছড়ে ফেলেছে। বাকি তিনজনের মধ্যে দুজন ঝুঁকে প'ড়ে ফাঁসের মতো ক'রে ততক্ষণে পেঁচিয়ে ধরেছে তাদের সামনেকার কেরানিদের গলা, আর সজোরে ওকের কাউন্টারে ঠুকে দিয়েছে তাদের মাথা। চতুর্থজন, সে-ই সবচেয়ে বেঁটেখাটো, কাউন্টারের ওপর থেকে তার সামনের কোরানিটির গলা নাগালে পাবে না ব'লে সটান লাফিয়ে টপকেছে কাউন্টারটা, ডিঙিয়ে গিয়েই চেপে ধরেছে তার গলা, এমন ঝড়ের মতো লাফিয়ে গিয়ে কাজটা করেছে ব'লেই হয়তো চাপটা বোধহয় দশগুণ বেশি হ'য়ে গিয়েছিলো। কেউই একটা চিৎকার অব্দি করতে পারেনি, পুরো অতিনাটকটা ঘটতে সময় লেগেছে মাত্রই তিরিশ সেকেণ্ড।

শিকারের সবাই যখন চেতনা হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছে, দস্যুরা প্রথমেই তাদের নিষ্ক্রিয় করার কাজে লেগে গেলো। পরিকল্পনাটা সব খুঁটিনাটি সমেতই ভেবে ঠিক করা হয়েছিলো, সামান্যতম খিঁচ ছিলো না কোথাও। তারা কেউ দোনোমনা করেনি কোনো-সময়। শিকারদের মুখে তারা তারপর কাপড় গুঁজে দিয়ে মুখ বেঁধে দিয়েছে, যাতে কেউ টু-শব্দটি করতে না-পারে, তারপর পিছমোড়া ক'রে বেঁধেছে তাদের হাত, পাগুলোও শক্ত ক'রে বেঁধেছে, তারপর মিহি একটা তাদের জাল দিয়ে পেঁচিয়ে দিয়েছে তাদের শরীর। সকলেরই কাজ শেষ হয়েছে যেন কাঁটায়-কাঁটায়, ঘড়ি ধ'রে, কারণ এদের নিষ্ক্রিয় ক'রে ফেলে সবাই সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়েছে একেবারে-একসঙ্গেই।

যে-লোকটা ম্যানেজারের খোঁজ করেছিলো, সে বললে, 'লোহার দরজাটা'—তার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছিলো সে-ই বুঝি পালের গোদা।

দস্যুদের তিনজন তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়েছে লোহার দরজাটার কাছে—আর টেনে নামিয়েছে সেটা, আর আস্তে-আস্তে বাইরের সব আওয়াজও মিইয়ে যেতে-যেতে মিলিয়ে গিয়েছে। কিন্তু দরজা তখনও পুরো নামেনি, এমন সময় আচমকা ঝনঝন ক'রে বেজে উঠেছে টেলিফোন।

দস্যুদের সর্দার চাপা গলায় ব'লে উঠেছে, 'থামো!'

দরজাটা তখনও পুরো নেমে আসেনি, সে দিয়ে তুলে ধরেছে রীসিভারটা। তারপর শুরু হ'লো নিচের কথাবার্তা, অনড় দাঁড়িয়ে বাকি-চারজন দস্যু শুধু তার একতরফের কথাই শুনতে পাচ্ছিলো।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যালো!'

'হ্যাঁ, শুনছি।'

'তুমি নাকি, ব্লেজন?'

'হ্যাঁ।'

'ভারি আশ্চর্য তো! আমি তোমার গলাটাই চিনতে পারিনি।'

'লাইনটা বোধহয় ঠিক নেই।'

'আমাদের এদিকটায় তো ঠিকই আছে।'

'তা হবে, তবে এদিকটায় কেমন যেন বিচ্ছিরি আওয়াজ করছে। আমিও তো তোমরা গলা চিনতেই পারছি না।'

'আমি মিস্টার লেওনার্ড।'

'ও-হ্যাঁ... হ্যাঁ, এবার চিনতে পারছি তোমার গলা।'

'বলতে পারো, ব্লেজন, ভ্যানটা গিয়ে পৌঁছেছে কি না?'

'এখনও তো আসেনি,' মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করেছিলো দস্যুটি।

'গিয়ে পৌঁছুলেই সেটা এস্ ব্রাঞ্চে পাঠিয়ে দিয়ো। ওরা এইমাত্তর ফোন ক'রে জানিয়েছে তারা হিশেবটিশেব ক'রে নগদ টাকা সব পাঠিয়ে দেবার পর একগাদা টাকা নাকি জমা পড়েছে।'

'বেশি টাকা-নাকি?'

'তা, বেশ-মোটা অঙ্কই। প্রায় কুড়িহাজার পাউণ্ড।'

দস্যুটি বিস্ময়ে একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে উঠলো।

'তা, তুমি খবরটা দিয়ে দেবো তো? আমি তোমার ওপর ভরসা করতে পারবো নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুমি আমার ওপর নির্ভর করতে পারো।'

'আচ্ছা, শুভরাত্রি, ব্লেজন।'

'শুভরাত্রি।'

দস্যুটি রীসিভারটা নামিয়ে রাখলে। একমুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবলে সে। তারপরেই মনস্থির ক'রে নিয়ে সে তার স্যাঙাৎদের তার কাছে ডাকলে, 'আমাদের চটপট করতে হবে, বুঝলে?' নিচুগলায় সে বললে তাদের, দ্রুতহাতে সে তখন তার গায়ের পোশাক খুলে ফেলেছে। 'শিগগির করো, কেউ-একজন আমায় ও-লোকটার পোশাক খুলে দাও তো।' তখনও অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে-থাকা স্টোরের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালে সে।

চক্ষের পলকে স্টোরের পোশাক গিয়ে আক্রমণকারীর গায়ে উঠলো—যদিও জামাগুলো তার গায়ে আঁটো আর খাটোই হচ্ছিলো। একটা পকেটে চাবির তাড়া খুঁজে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়ে সে প্রথমে খুললো খাজাঞ্চির আপিশ, তারপর স্ট্রংরুমের দরজা, তারপর সেখান থেকে নম্বর-আঁটা প্যাকেটগুলোই যে শুধু তুলে নিলে তা নয়, ব্রীফকেসটা এবং একগাদা বন্ধকি কাগজও তুলে নিতে ভুললো না।

সে তখনও শেষ করেনি, এমন সময় শব্দ ক'রে ফুটপাথের ধারে একটা গাড়ি এসে থামলো। প্রায়-তক্ষুনি একটা টোকা শোনা গেলো কাচের পাল্লাবসনো দরজায়, সেটা তখন ধাতুর পর্দা দিয়ে অর্দ্ধেক-ঢাকা।

'হুঁশিয়ার!' দস্যুসর্দার দ্রুতস্বরে বললে, কথাগুলো সে হাতের ভঙ্গি দিয়েও বোঝালে। 'কোটগুলো সব খুলে ফ্যালো, ওরা এসে তোমাদের পোশাক দেখুক, যে-যার নিজের জায়গায় চ'লে যাও আর প্রস্তুত হ'য়ে থেকো! যে-ই আসুক না কেন, তোমরা যাতে সবাইকেই কবলে পাও, সেজন্যে তৈরি থেকো! আর মনে রেখো, কোনো আওয়াজ যেন না-হয়!... তারপর দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ো, আর আমি ছাড়া অন্য-কারু জন্যেই যেন দরজা খুলো না, সাবধান!'

কথা বলতে-বলতে সে ব্রীফকেসটা আর কয়েক-বাণ্ডিল বন্ধকি কাগজ তুলে নিচ্ছিলো, এবার সে দরজায় গিয়ে দাঁড়ালে। ইশারা ক'রে তার তিন স্যাঙাৎকে বললে কেরানিদের জায়গায় চ'লে যেতে, আসল-কেরানিদের তারা কাউন্টারের তলায় জাল দিয়ে ঢেকে রেখেছিলো; আর চতুর্থজন গিয়ে দাঁড়ালে দরজায়। হঠাৎ সে দুম ক'রে খুলে দিলে দরজার পাল্লা, আর অমনি ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো রাস্তার কোলাহল।

সত্যি-সত্যিই প্রবেশপথের সামনেটায় একটা ডেলিভারিভ্যান এসে দাঁড়িয়েছে; অন্ধকারে তার আলোগুলো যেন ঝলসাচ্ছে। ড্রাইভার ব'সে আছে তার আসনে, আর ফুটপাতে-দাঁড়ানো কার সঙ্গে কথা বলছে। এই-ই হচ্ছে সেই লোক—সেনট্রাল ব্যাঙ্কের একজন খাজাঞ্চি—ক-মিনিট আগে এসে দরজায় টোকা দিয়েছিলো।

কোনোরকম তাড়া না-দেখিয়ে, রাস্তার জনস্রোতের পাশ কাটিয়ে, ফুটপাথ পেরিয়ে দুঃসাহসী দস্যুটি গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালে।

'গুডইভনিং,' সে বললে।

'ইভনিং,' সঙ্গে-সঙ্গে দুজনে একসাথে সাড়া দিলে।

ড্রাইভার তারপর নবাগতের দিকে তাকিয়ে, ঘাবড়ে গিয়ে, একটু অবাকভাবেই তাকিয়ে রইলো, 'হ্যালো... আরে, এ-যে দেখছি, অন্য-কেউ, স্টোর নয়!'

'আজ ও ছুটি নিয়েছে, আমি ওর বদলি কাজ করছি।' তারপর ফুটপাথে দাঁড়ানো লোকটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'কী, একটু হাত লাগাবে নাকি?'

'কীসে?'

'একটা ব্যাগ নিয়ে। আজ বিস্তর নগদ টাকা এসেছে—ব্যাগটা ভারি।'

'হ্যাঁ, তবে,' একটু দোনোমনা ক'রে খাজাঞ্চি বললে, 'আমার তো গাড়ি ছেড়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একপাও যাবার কথা নয়।'

'আরে ধুর! একমিনিটের তো মামলা! আর তাছাড়া, আমিই না-হয় তোমার বদলে এখানে দাঁড়াচ্ছি। কেরানিদের একজন তোমার সঙ্গে হাত লাগাবে—আমি বরং এইফাঁকে এই ব্রীফকেসটা আর বন্ধকি কাগজের বাণ্ডিলগুলো গাড়িতে তুলে দিই।'

আর-কোনো আপত্তি না-ক'রে খাজাঞ্চি গিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢুকলো, আর অমনি তার পেছন-পেছন দরজাটা বন্ধ হ'য়ে গেলো।

'এবার, দোস্ত,' যে-লোকটা স্টোরের বদলি ব'লে নিজেকে দাবি করেছিলো, সে ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বললে, 'খোলো দরজাটা।'

'ঠিক হ্যায়!' ড্রাইভার সায় দিলে।

ভ্যানটার পেছনে, বা দুপাশে, কোনো দরজা নেই—শুধু কোচম্যানের বাক্সের পেছনে দু-পাল্লা ধাতুর পর্দা-দেয়া ভারি দরজা—ডাকাতির সম্ভাবনা যাতে একেবারেই না-থাকে। গাড়ির ভেতরে যেতে হ'লে, ড্রাইভারের আসনটা তুলে ধরতে হয়। তবে সে যেহেতু মাত্র-কটা বাণ্ডিলই রাখবে ঐ পায়রার খোপগুলোয়, ড্রাইভার তাই ভাবেনি এতটা ঝামেলা পাকাবার কোনো দরকার আছে। সে শুধু ঢাকনাগুলো তুলে দিলে খোপের। বললে, 'দেখি ব্রীফকেসটা দেখি।'

ব্রীফকেসটা হাতে নিয়ে ড্রাইভার তার আসনের ওপাশে ঝুঁকে পড়লো, কোমর থেকে মাথা অবধি শরীরটা তাল ঢাকা প'ড়ে গেছে গাড়ির ভেতর, শুধু ঠ্যাং-দুটো শূন্যে ল্যাগব্যাগ করছে তার রাখার চেষ্টায়। আর ওভাবে থাকার দরুনই তার পক্ষে আদপেই দেখা সম্ভব ছিলো না কখন সেই স্টোরের বদলি লোকটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে আসনে ব'সে পড়েছে। ড্রাইভারের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে জাল-খাজাঞ্চি—যেন ভ্যানের ভেতর কী আছে সেটা দেখবারই নিছক-একটা কৌতূহল জন্মেছে তার—তার শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গও ভেতরে ঢুকিয়ে দিলে, আর পরক্ষণেই আচমকা তার কনুই প্রচণ্ড-একটা ধাক্কা দিলে অন্ধকারে, আচমকা পথচলতি লোকজনের কেউ যদি সেইমুহূর্তে গাড়িটার দিকে তাকাতো তো দেখতে পেতো কোচোয়ানের পা-দুটো যেন আশ্চর্য আড় ধ'রে কাঠ-কাঠ হ'য়ে গেছে, তারপরেই তা অসাড় হ'য়ে প'ড়ে গেছে কোচবাক্সের মেঝেয়। দস্যু অমনি তার কোমরের বেলট ধ'রে তাকে যাবতীয় বাণ্ডিল আর ব্রীফকেসের মাঝখানে চালান ক'রে দিলে।

পর-পর ঘটনাগুলো এমন নিখুঁতভাবে আশ্চর্য দুঃসাহসের সঙ্গে সমাধা হ'লো যে তাতে সময় লাগলো মাত্র কয়েকটা মুহূর্তই। পথচলতি লোকেরা যে-যার নিজের ধান্ধায় পাশ দিয়ে গেছে, ঘুণাক্ষরেও কেউ ভাবতেও পারেনি এমন-একটা বেপরোয়া কাজ এখানে, প্রায়-প্রকাশ্য, ঘ'টে গেছে।

লোকটা আবার গাড়ির সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো, যাতে রাস্তার বাতির আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে না-যায়, তারপর গাড়ির ভেতরটা সে তাকিয়ে দেখলো খুঁটিয়ে। মেঝের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, মেঝেয় প'ড়ে আছে ড্রাইভার, অলক্ষে বিদ্যুৎবেগে তার ঘাড়ে সে ঢুকিয়ে দিয়েছে একটা ছুরি, বেচারা টু শব্দটিও করবার সুযোগ পায়নি। দেহটা আর ছটফটও করছে না এখন, প'ড়ে আছে অনড়, নিশ্চল : যেন আচমকা তার ঘাড়ে বাজ ফেটে পড়েছিলো।

রক্ত গড়িয়ে রাস্তায় না প'ড়ে যায়! তারপর বেঞ্চিটা ডিঙিয়ে সোজা গাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লো; ড্রাইভারের গায়ের কোটটি খুলে সে ঐ মারাত্মক ক্ষতটা মুছে ঢেকে দিল। তারপর ঘাড় থেকে ছুরিটা তুলে নিয়ে সাবধানে সেটা আর নিজের রক্তরাঙা হাতটা মুছলো। যখন বুঝলো রক্ত মেঝেয় প'ড়ে কার্পেটের ওপর স্পঞ্জের গায়ে তরল জিনিশের মতো শুষে যাবে, তখন দরজাটা সে বন্ধ ক'রে দিলে।—সব সতর্কতা অবলম্বন ক'রে সে ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে ফুটপাথে, তারপর ফুটপাথ পেরিয়ে গিয়ে ব্যাঙ্কের দরজায় গিয়ে আগের ষড়মাফিক টোকা দিয়েছে। তক্ষুনি দরজাটা খুলে গেলো, এবং সে ভেতরে ঢুকে পড়তেই আবার তা বন্ধ হ'য়ে গেলো।

'ঐ-লোকটা?' ঢুকতে-ঢুকতেই সে জিগেস করলে।

কে-একজন কাউন্টারের দিকে আঙুল তুলে দেখালে। 'অন্যদের মতো চিৎপাত প'ড়ে আছে।'

'চমৎকার! এবার ওর পোশাকটা খুলে ফ্যালো। জলদি, চটপট!'

অন্যরা দ্রুতহাতে যেই কাজে লেগে গেছে, সে স্টোরের উর্দিটা খুলে এবার অন্য খাজাঞ্চির পোশাকটা প'ড়ে নিলে। 'তোমাদের মধ্যে দুজন এখানে থাকবে। বাকিরা আমার সঙ্গে চ'লে এসো, মালকড়ি হাতাতে।'

উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না-ক'রেই সে ফের দরজা খুলে তার দুই স্যাঙাৎকে নিয়ে চ'লে গেলো গাড়ির কাছে; সে গিয়ে উঠলো কোচবাক্সে, ড্রাইভারের আসনে, তারপর এক-এক ক'রে সে বাণ্ডিলগুলো নামিয়ে দিতে লাগলো তার সাগরেদদের। দরজা খোলা ব'লে একটু আলো এসে পড়েছে রাস্তায় ভ্যানটা থেকে, পথচারীরা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এই আলোর চৌহদ্দির মধ্যে দিয়ে চ'লে যাচ্ছে, কেউ একবার ফিরেও তাকাচ্ছে না, কোন ভ্যান থেকে কে কী নামাচ্ছে তাতে তাদের কোনো কৌতূহল বা মাথাব্যথা নেই, অবশ্য সন্দেহ করার কথা ঘুণাক্ষরেও কারু মাথায় আসেনি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভ্যানটা ফাঁকা হ'য়ে গেলো। দরজা বন্ধ ক'রে লুঠের মাল ঠিকঠাক সাজিয়ে রাখা হ'লো। একদিকে গেলো দলিল-দস্তাবেজ, অন্যদিকে বাকি মাল। দলিলপত্তরগুলো তাদের চাই না, সেগুলো এলোমেলো ছড়িয়ে রইলো মেঝেয়। ব্যাঙ্কনোটগুলো ভাগ করা হ'লো পাঁচ অংশে, একেকজনে একেকটা তাড়া তুলে নিলে।

'আর এই ব্যাগগুলো?' জিগেস করলে দস্যুদের একজন।

'পকেটে ঢুকিয়ে নাও,' সর্দার উত্তর দিলে, 'ভ্যানের মধ্যে আর যা প'ড়ে আছে,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিই সেগুলোর ব্যবস্থা করবো। হ্যাঁ, তবে আরেকটা কথা। প্রথমে সবকিছুর একটা ফয়সালা ক'রে নেয়া যাক। আমি চ'লে গেলে, তোমরা ফিরে এসে দরজার ঐ লোহার পর্দাটা ফেলে দিয়ো। তারপর করিডর দিয়ে যাবে সবাই। সবশেষে যে যাবে, সে যেন দরজায় ডবোল-তালা লাগিয়ে দিয়ে চাবিগুলো নর্দমায় ফেলে দেয়। হলঘরটা বাড়িটার শেষপ্রান্তে—তোমরা তো বেরুবার রাস্তাটা জানোই।' একটা আঙুল তুলে সে ম্যানেজারের আপিশটা দেখালে। 'ও-লোকটার কথা ভুলো না কিন্তু। জানো নিশ্চয়ই আমরা কী ফয়সালা করেছিলুম।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ,' একবাক্যে জানিয়েছে, দস্যুরা, 'সে-সব আমাদের হাতেই ছেড়ে দাও।'

যেতে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়ালে সর্দার। 'যা চ্চ'লে ! আমি তো কর্তার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। তার কাছে নিশ্চয়ই অন্যসব ব্রাঞ্চের একটা তালিকা আছে।'

একজন তাকে হলদে-হ'য়ে-যাওয়া একটা বিজ্ঞপ্তি দেখালে, সেটা কাচের গায়ে সাঁটা। চট ক'রে সে তার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। 'ও-হ্যাঁ, আর ওভারকোটগুলো।' *এস্* ব্রাঞ্চের ঠিকানাটা পেয়ে যাবার পর সে বললে, 'ও-সব কোথাও একটা কোণায় ফেলে দিয়ো। সেগুলো কেউ পেয়ে গেলেও কিছু এসে-যায় না। মোদ্দা কথাটা হ'লো, ওগুলো যেন আমাদের গায়ে কেউ দেখতে না-পায়। জানো-তো কোনখানে আমাদের ফের দেখা হবে। এসো, এবার হাতের কাজ সব চটপট সেরে ফেলা যাক।'

সোনারুপোর বাকি ব্যাগগুলো নিয়ে গিয়ে ঐ ভ্যানেই বোঝাই করা হ'লো।

'এইই সব তো ?' জিগেস করলে একজন।

অন্যজন ছুটে গিয়ে প্রায়-তক্ষুনি ফিরে এলো পোশাকআশাক নিয়ে, স্টোরের গা থেকে জামাকাপড় খুলে নেবার সময় এগুলো ছেড়ে রাখা হয়েছিলো। পোশাকগুলো সে ভ্যানের মধ্যে তুলে দিলে।

'তাহ'লে এবার সব উঠেছে তো?' আবার সে জিগেস করলে।

উত্তর এলো : 'হ্যাঁ। আর হাবার মতো দাঁড়িয়ে থেকো না।'

লোকটা ব্যাঙ্কের মধ্যে গিয়ে উধাও হ'য়ে গেলো। লোহার পর্দা এবার নেমে এলো চৌকাঠ অব্দি। তারপর চটজলদি-সেজে-বসা কোচোয়ান লাগাম তুলে নিয়ে ঘোড়াদের পিঠে চাবুক কষালে। ঘোড়াগুলো জোরকদমে ছুটলো, *এস্* ব্রাঞ্চের কাছে না-এসে তারা আর থামেনি। জাল-কোচোয়ানের বুকের পাটা আছে, সে সোজা গিয়ে হাজির হ'লো হিশেবখানায়।

'আমার জন্যে একটা চিঠি আছে ব'লে শুনেছি?'

খাজাঞ্চি মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলো কে কথা বলছে। অস্ফুট স্বরে ব'লে উঠলো, বিস্ময়চকিত, 'এ-কী! তুমি তো বোদ্‌রুক নও।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, তা তো নয়ই,' বিচ্ছিরি মুখ-বেঁকিয়ে হেসে উঠলো জাল-কোচোয়ান।

'কর্তাদের মতিগতি কিছু বুঝি না বাপু,' খাজাঞ্চি একটু বিরক্ত হ'য়েই বিড়বিড় করলে, 'জানা নেই, শোনা নেই—সবসময় কেবল নতুন লোক পাঠাচ্ছে!'

'এ শুধু এইজন্যে যে এদিকটায় আমার আসার কথা ছিলো না। আমি গিয়েছিলুম *বি ব্রাঞ্চে*—তখন আমায় ডেকে বলা হ'লো এখানে আসতে; হেডআপিশ থেকে নাকি টেলিফোন ক'রে তলব করা হয়েছে। ব্যাঙ্ক বন্ধ হ'য়ে যাবার পরে নাকি একটা মোটা অঙ্কের টাকা জমা পড়েছে এখানে।' তার চোখের পাতা একবারও কাঁপলো না, যখন সে বানিয়ে-বানিয়ে এই *সম্ভাব্য* উত্তরটা খাড়া করলে।

'হ্যাঁ,' খাজাঞ্চি সায় দিলে, যৎকিঞ্চিৎ সন্দেহের উদ্রেক হওয়া সত্ত্বেও, 'তবু ব্যাপারটা আমায় ভাবাচ্ছে। আমি তো তোমাকে, বাপু, চিনি না।'

অন্য লোকটা তাতে বেশ অবাক হবারই ভান করেছে। 'এতে তোমার কী?'

'চারপাশে কত চোর-বাঁটপাড় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাক-গে, ব্যাপারটার এক্ষুনি সুরাহা হ'য়ে যেতে পারে। তোমার কাছে পরিচয়পত্র কিছু আছে তো?'

দস্যুকে যদি কোনো প্রশ্ন ঘাবড়ে দিতে পারতো, তবে সে এটাই: তার কাছে কোনো *পরিচয়পত্র* থাকবে কী ক'রে? *পরিচয়পত্রটা* দেখতে কেমন, তা শুদ্ধু সে জানে না। দস্যুকে তাই ব'লে কিন্তু মোটেই বিচলিত দেখালো না। যে এই ধরনের কোনো গা-শিউরে-তোলা অ্যাডভেনচারে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার নিশ্চয়ই মনের ধাতটা খুব কঠিন হয়, বিশেষ ক'রে সর্বাবস্থাতেই মুখে একটা নির্লিপ্ত নির্বিকারভাব ফুটিয়ে তোলাটা বুঝি রপ্ত করতে হয় তাকে। আর নির্বিকার ঔদাসীন্যের ভাবটা প্রচুর পরিমাণেই ছিলো সেনট্রাল ব্যাঙ্কের এই জাল-খাজাঞ্চির। কাজেই আচমকা *পরিচয়পত্র* দাখিল করার তাগিদটা তাকে যদি ঘাবড়ে দিয়েও থাকে, তার মুখের একটা রেখাও কিন্তু কেঁপে যায়নি। খুব-সহজ সুরেই বললে, 'হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। *পরিচয়পত্র* দেখিয়ে দিলেই তো সব ঝামেলা চুকে যায়।' খুব-সহজ একটা যুক্তি তক্ষুনি তার মাথায় খেলে গিয়েছে। এই তথাকথিত *পরিচয়পত্র* নিশ্চয়ই ব্যাঙ্কের সব কর্মচারীকেই সবসময় কাছে রাখতে হয়। পকেট হাৎড়ে দেখলেই তো সে সেটা পেয়ে যাবে। 'দেখাচ্ছি,' ব'লে সে নিরুদ্বেগে জাঁকিয়ে বসলো বেঞ্চিতে, তারপর তার পকেটে হাত ঢোকালে।

পকেট থেকে বেরিয়ে এলো অনেককিছু: জরুরি দলিল, চিঠিপত্র, চিরকুট আর নোটিস এবং আরো-কত-কী। সবই বিচ্ছিরিভাবে ভাঁজ-করা, ভাঁজে-ভাঁজে ছিঁড়েও গেছে, কোথাও-বা লেখাও মুছে গিয়েছে। যেন কাগজপত্তর নিয়ে কারবার নেই, শুধু কায়িক শ্রমই পারে, যেমন—ঘোড়ার গাড়ি চালাতেই সে যেন ওস্তাদ, এমনি-একটা ভঙ্গি ক'রে অপটু হাতে একটার পর একটা কাগজের ভাঁজ খুলতে লাগলো।

পরক্ষণেই তার হাতে উঠে এলো একটা ছাপা-কাগজ, তার ফাঁকা জায়গাগুলো



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ লিখে ভরাট করেছে, এবং তার মোদ্দা বক্তব্যটা এইরকম : এতদ্দ্বারা বোদরুক নামক কোনো ব্যক্তিকে সেনট্রাল ব্যাঙ্কের প্রধান খাজাঞ্চির দায়িত্ব অর্পণ করা হচ্ছে। এই *পরিচয়পত্রটাই* সে খুঁজছিলো, কিন্তু তাতে আদপেই তার মুশকিলআসান হয়নি। *পরিচয়পত্রের* গায়ে যে নাম লেখা সেটাই সমূহ-বিপজ্জনক—কেননা এই খাজাঞ্চি খোদ বোদরুককে চেনে এবং বোদরুক আসেনি ব'লেই সে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হয়েছে। তাতেও কিন্তু এই বেপরোয়া দস্যুর মাথা খুব-ঠাণ্ডাই থাকলো, তক্ষুনি সে ভেবে বার ক'রে ফেলেছে একটা অমোঘ ফন্দি। খাজাঞ্চি একটু যেই অন্যদিকে তাকিয়েছে, সে *পরিচয়পত্রটা* দু-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছে; যে-অংশটায় বোদরুকের নাম লেখা সেটা সে আর-সব কাগজের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে, শুধু তলার অংশটাই খাজাঞ্চির দিকে বাড়িয়ে ধরলে, একটু যেন বিরক্ত আর হতাশ ভাবেই বললে : 'ধুর! কপালটাই খারাপ। *পরিচয়পত্রের* আদ্ধেকটাই শুধু আছে দেখছি, বাকিটা যে কোথায় ছিঁড়ে পড়েছে, কে জানে!'

'আদ্ধেকটা?' হাবার মতো কথাটা একবার আওড়ালে খাজাঞ্চি।

'হ্যাঁ। পুরোনো কাগজ, সবসময় আমার পকেটে থাকে, ভাঁজগুলো ঘসা লেগে-লেগে ছিঁড়ে গিয়েছে—তারপর হয়তো বাকি অংশটা আমার অন্য কোটের পকেটেই থেকে গেছে।'

খাজাঞ্চি অস্বস্তিভরে শুধু ঘোঁৎ ক'রে একটা আওয়াজ ছাড়লে নাক দিয়ে।

'যাক-গে, ঘাট হয়েছে আমার এসে,' উঠে প'ড়ে দরজার দিকে এগুতে-এগুতে দস্যু বললে, 'আমাকে বলা হয়েছে তোমার এখানে এসে এখান থেকে মালকড়ি নিয়ে যেতে—তা আমি এসে হাজিরা দিয়ে গেলুম। তুমি আমাকে দেবে না তো? তাহ'লে ও-সব তুমি গুঁজেই রাখো তোমার কাছে। খোদ হেডআপিশের সঙ্গে তুমিই সামলে নিয়ো ঝামেলাটা। আমি বাপু চললুম—এ-তো আর আমার বাপের শ্রাদ্ধ নয়।'

যে-বিরক্তিমেশানো ঔদাসীন্য সে দেখালে, সেটা হাজার তর্কাতর্কির চাইতেও অনেক-বেশি ফল দিলে : তার ওপর সে আবার একটা মোক্ষম চাল চেলেছে। 'আমি, বাপু, ঝামেলায় নেই—তুমিই হেডঅপিশের ঠ্যালাটা সামলিয়ো,' এর চেয়ে বড়ো হুমকি আর কী হ'তে পারতো?

'সবুর, সবুর, একমিনিট,' অমনি খাজাঞ্চি তাকে পেছন থেকে ডাক দিলে, 'দেখি তোমার *ঐ পরিচয়পত্রের* আদ্ধেকটাই।'

'এই-যে, দ্যাখো, দেখে নয়ন সার্থক করো।'

'হ্যাঁ, এই-তো দেখছি বড়োসায়েবের দস্তখৎ,' খাজাঞ্চি সইটা মিলিয়ে দেখে বললে। তারপর মনস্থির ক'রে জানালে, 'এই-যে নাও টাকার বাণ্ডিল,' একটা প্যাকেট বাড়িয়ে দিলে সে তার দিকে। 'যদি এই রসিদটায় একটা সই ক'রে দাও—'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোচোয়ান যেন বড্ড চ'টে গিয়েছে। এমন-একটা ভঙ্গি ক'রে যা-খুশি একটা নাম লিখে দিয়ে যেতে-যেতে বিরক্তির স্বরে বলেছে : 'চললুম, গুডনাইট!' বাইরে এসেই অবশ্য হনহন ক'রে পা চালিয়ে ভ্যানটায় এসে উঠে ব'সেই জোরে চাবুক কষিয়েছে ঘোড়াগুলোর পিঠে, আর পরক্ষণেই দূর-পথ আর অন্ধকার তাকে গিলে খেয়েছে।

আর এইভাবেই শেষ হয়েছে ডাকাতিটা, যেটা এমন-তুলকালাম শোরগোল তুলেছিলো সে-সময়। পাঠকদের মনে আছে নিশ্চয়ই, ডাকাতির ব্যাপারটা সেদিন সন্ধ্যার পরেই আবিষ্কার হ'য়ে যায়, দুষ্কৃতকারীরা যা ভেবেছিলো তার চাইতে অনেক-তাড়াতাড়িই। ব্রাঞ্চআপিশ তালাবন্ধ, কর্মচারীরা অসহায়ভাবে চিৎপাত হাত-পা বাঁধা প'ড়ে, ভ্যানগাড়ির কোচোয়ান খতম—অপরাধীরা ভেবেছিলো পরদিন সকালের আগে নিশ্চয়ই কিছুই ফাঁস হ'য়ে যাবে না। বরং, সকালবেলায়, কেয়ারটেকার যখন রোজকার মতো ঝাঁট দিয়ে সব সাফ ক'রে দিতে যাবে, তখন সে বিপদসংকেত বাজাবে, পাগলা ঘণ্টি, কিন্তু তার আগে অব্দি সবকিছু চাপা থাকবে ব'লেই বোধহয় তারা আশা করেছিলো। অথচ সত্যি-বলতে, ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই সে-রকম ঘটেনি।

সন্ধে সাড়ে-সাতটা নাগাদ, হাইড পার্কের পেছনে, একটা নির্জন গলিতে ভ্যানগাড়িটাকে প'ড়ে থাকতে দ্যাখে সেনট্রাল ব্যাঙ্কের হেডআপিশেরই একজন কর্মচারী —সে তখন শর্টকাট ধ'রে হনহন ক'রে বাড়ি ফিরছিলো। ব্যাঙ্কের একটা ভ্যানকে এমন বিজনবিভূঁইতে অন্ধকারে অমনভাবে পরিত্যক্ত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে ভারি অবাক হ'য়ে গিয়েছিলো। ঠেলতেই দ্যাখে দরজাটা আটকানো নেই, খুলে গেছে, পকেট থেকে দেশলাই বার ক'রে আলো জ্বেলে সে দেখতে পায় মেঝেয় কোচোয়ানের মৃতদেহ প'ড়ে আছে, হিমঠাণ্ডা। সে তক্ষুনি হাঁকডাক শুরু ক'রে দেয়।

তারপর সবদিকেই ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে টেলিফোনের পর টেলিফোন। আটটার আগেই একদল সেপাই এসে ফাঁকা ভ্যানগাড়িটাকে ঘিরে কর্ডন ক'রে দাঁড়ায়, আর *ডি. কে.* ব্রাঞ্চের সামনে জ'মে যায় কৌতূহলী জনতার ভিড়—সেখানেও একদল সেপাই ব্রাঞ্চটার সামনে কর্ডন ক'রে দাঁড়িয়েছে, আর শেষ-অব্দি এক কামারকে ডেকে এনে খুলতে হয়েছে দরজা।

তদন্ত শুরু হ'য়ে যায়, হন্তদন্ত, তক্ষুনি। সৌভাগ্যই বলতে হবে, আর-কেউ মারা যায়নি, তবে কারু-কারু চোটজখম বড্ড বেশিই হয়েছে, ও-রকম হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ঠাণ্ডাহিম ঘরে সারারাত মেঝেয় গড়াগড়ি খেলে তাদেরও কেউ-কেউ অক্কা পেতো। ঘণ্টাখানেক ধ'রে সেবাশুশ্রূষা ক'রে তাদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হয়েছে, আর ভাঙা-ভাঙা কথায় তারা যে-সব কথা জানিয়েছে সে-সব বড্ডই-অস্পষ্ট, প্রায়-অর্থহীন। পাঁচজন দাড়িগোঁফওলা লোক, অলেস্টারে সর্বাঙ্গ মোড়া, তাদের আক্রমণ ক'রে ঘায়েল ক'রে ফ্যালে—তার বেশি তারা আর-কিছুই জানে না।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা যে মিথ্যে বলছে, এমন সন্দেহ করার কোনো কারণ ছিলো না। তদন্তের একেবারে গোড়ার দিকেই পাঁচটা ভারি অলেস্টার পাওয়া গিয়েছে, যেন অপরাধীরা তাদের চিহ্ন রেখে যেতেই চেয়েছে। কিন্তু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ঝানু এবং বাঘা-বাঘা গোয়েন্দারা তন্নতন্ন ক'রে অলেস্টারগুলো খুঁজে দেখেও কোনো সূত্র পায়নি। নেহাৎই সাধারণ পশমে তৈরি, তাদের গায়ে কোনো লেবেল নেই—না দোকানের, না-বা দরজির; আর সেজন্যেই হয়তো এগুলো ফেলে রেখে গা ঢাকা দিয়েছে অপরাধীরা।

এ থেকে মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝবার জো ছিলো না। অথচ পুলিশের ঘাগু ইন্‌স্‌পেক্টর আর-যে কোন সূত্র ধ'রে এগুবেন, তা-ই ভেবে পাচ্ছিলেন না। নানারকমভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছেন তিনি সাক্ষীদের, তাদের কাহন হুবহু একই থেকেছে—কোনো গোঁজামিল বা কোনো দ্বিমত নেই, আর তাদের কাছ থেকে এর বেশি একটাও কথা বার করা যায়নি।

শেষ সাক্ষী ছিলো কেয়ারটেকার। তাকে অনেকগুলো আপিশের খবরদারি করতে হয়, ফলে কোনোটারই ওপর সে বিশেষ নজর দিতে পারে না। সেদিন সে এমনকিছুই লক্ষ করেনি, যা তার সন্দেহ জাগাতে পারতো। দস্যুরা যদি তার পাশ দিয়ে ছদ্মবেশে আনাগোনা ক'রেও থাকে—করেওছে হয়তো—তবু সে ভেবে নিতো এরা বুঝি ব্যাঙ্কেরই কর্মচারী। অনেক জোরজবরদস্তির পর, সে মাথা চুলকে বলেছে, ডাকাতির সময় বা তার একটু পরে, এ-বাড়িতে কাজ করে এমন চারজন লোক তার পাশ দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যায়। তদন্ত ক'রে দেখা যায়, এ চারজন সমস্ত সন্দেহেরই ঊর্ধ্বে, তারা এ-বাড়িরই অন্য আপিশে কাজ করে, তারা তখন দিনের কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরছিলো। কেয়ারটেকার আরো বলে যে সাড়ে-সাতটা নাগাদ এক কয়লাওলা এসেছিলো এখানে, পুলিশ আসার একটু আগেই; তার কাঁধে ছিলো মস্ত-এক বস্তা, আর কেয়ারটেকারের যে তার কথা মনে আছে, তার কারণ হ'লো তার তখন একটু অবাকই লেগেছিলো, কারণ এমন সময়ে সাধারণত কয়লা ডেলিভারি দিতে কেউ সচরাচর আসে না। কয়লাওলা পাঁচতলার একটা আপিশের কথা বলে, আর এতটাই চাপাচাপি ক'রে যে কেয়ারটেকার অগত্যা দরজা খুলে দিয়ে তাকে ওপরে যাবার সিঁড়িটা দেখিয়ে দেয়। কয়লাওলা ওপরে চ'লে গিয়েছিলো, ফিরে এসেছিলো পনেরো মিনিট বাদেই, বস্তাটা তখনও তার কাঁধে চাপানো; তারপর সে কৈফিয়ৎ দিয়ে বলে যে সে নাকি ঠিকানা ভুল করেছে। হাঁফাতে-হাঁফাতে, যেন অনেক পইঠা সিঁড়ি বেয়ে কেউ একটা ভারি বোঝা নিয়ে নাস্তানাবুদ হয়েছে এমন ভঙ্গিতে, সে আস্তে-আস্তে চ'লে যায়।

'তুমি কি খেয়াল করেছিলে, 'ইন্‌স্‌পেক্টর জানতে চেয়েছেন, 'কয়লাওলা কোন দোকান থেকে এসেছিলো?'

কেয়ারটেকার উত্তরে জানায় যে সে সেটা লক্ষ করেনি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচতলার ভাড়াটে অবশ্য সায় দিয়ে বলে যে, একটা লোক এসেছিলো বটে সাড়ে-সাতটা নাগাদ, এই ওজুহাত দেখিয়ে যে সে নাকি একবস্তা কয়লা ডেলিভারি দিতে এসেছে। তখন যে-ভৃত্যটি দরজা খুলেছিলো সে তাকে জানায় যে তার নিশ্চয়ই কোনো ভুল হয়েছে, তখন সে কিছুই না-ব'লে চ'লে যায়। দুটো বক্তব্যের মধ্যে একটাই গরমিল ছিলো : ভৃত্যটি খুব-জোর দিয়েই বলে যে কেয়ারটেকার যা বলে বলুক, লোকটা যখন ওপরে এসেছিলো, তখন তার সঙ্গে কোনো বস্তা-টস্তাই ছিলো না।

ইনস্‌পেক্টর সব শুনে অনুমান করেছেন : 'সে নিশ্চয়ই ওপরে উঠে যাবার সময় নিচেই কোথাও সেটা রেখে গিয়েছিলো।'

তৎসত্ত্বেও অনুমানটা সঠিক ছিলো ব'লে মনে হয় না, কেননা একটু পরেই খুঁজতে গিয়ে দেখা গিয়েছিলো মাটির তলায় ভাঁড়ার ঘরে যাবার সিঁড়ির কাছে একগাদা কয়লা স্তূপ হ'য়ে প'ড়ে আছে; কেয়ারটেকার জোর দিয়ে বারে-বারে বলেছে যে কয়েকঘণ্টা আগেও ও-কয়লা ওখানে ছিলো না। এ থেকে আন্দাজ করা যায় যে ঐ রহস্যময় কয়লাওলা নিশ্চয়ই তার বোঝাইবস্তাটা এখানেই উপুড় ক'রে খালি ক'রে গেছে—কিন্তু যাবার সময় সে তবে বস্তায় ক'রে কী নিয়ে যাচ্ছিলো? কারণ—কেয়ারটেকার এই তথ্যটাও জোর দিয়ে বলেছে—বস্তাটা কিন্তু আগের মতোই ভরাট ছিলো, মোটেই হালকা ব'লে মনে হয়নি ওজনে, বস্তার ভারে কয়লাওলা প্রায় নুয়েই পড়েছিলো যাবার সময়, হাঁফাচ্ছিলো আর ধুঁকছিলো।

'আপাতত এ নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে কোনো ফায়দা নেই,' এই দুরূহ প্রহেলিকাটির কোনো অর্থ খুঁজে না-পেয়ে ইনস্‌পেক্টর রায় দিয়েছেন, 'এটা না-হয় পরে ভেবে দেখা যাবে।' আপাতত তাঁকে বরং অন্য-একটা সূত্র নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে—অন্তত এই সূত্রটাকেই তাঁর বেশি জরুরি ঠেকেছে। তাঁর এই সিদ্ধান্ত থেকে তিনি একচুলও নড়তে চাননি।

ব্রাঞ্চের সব কর্মচারীকে খুঁজে-পাওয়া যায়নি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'লো এই তথ্য যে ম্যানেজারকে খুঁজে-পাওয়া যাচ্ছে না : মিস্টার লুইস রবার্ট ব্লেজন যেন কর্পূরের মতো হাওয়ায় উবে গিয়েছেন। অন্য কর্মচারীরা তাঁর কোনো হদিশই দিতে পারেনি। তারা শুধু জানে যে, পাঁচটার একটু আগে, একজন মক্কেল ম্যানেজারের ঘরে কী নিয়ে যেন আলাপ করতে ঢুকেছিলো, তারপরেই বেরিয়ে এসে সে স্টোরকে ডাকে, স্টোর ম্যানেজারের তলব শুনে ( অন্তত লোকটা বলেছিলো যে ম্যানেজার তাকে ডাকছেন ) সে-ঘরে গিয়ে ঢোকে, সে আর ঘর থেকে বেরোয়নি। তার কয়েক মিনিট বাদেই আসে হামলাটা। আর মিস্টার ব্লেজন : সেই থেকে এ-যাবৎ তাঁকে আর-কেউ চোখেই দ্যাখেনি।

এ থেকে শুধু একটা স্পষ্ট সিদ্ধান্তেই পৌঁছোনো যায়। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে বাইরে থেকে পাঁচজন দস্যু এসে অতর্কিতে ব্যাঙ্কের এই শাখায় চড়াও হয়েছিলো,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এও বোঝা যাচ্ছে যে ব্যাঙ্কের শাখাতেই তাদের দুষ্কর্মের একজন সহযোগী ছিলো, আর খোদ ম্যানেজার ছাড়া আর-কেউই সেই সহযোগী হ'তে পারে না—তাঁরই যোগসাজসে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা ঘটেছে।

সেইজন্যেই, আরো-বিস্তারিত কোনো তদন্তের ফলাফল জানবার অপেক্ষা না-ক'রেই, সেনট্রাল ব্যাঙ্কের *ডি. কে.* ব্রাঞ্চের ম্যানেজার লুইস রবার্ট ব্লেজনের নামে একটা গ্রেফতারি পরোয়ানা বেরিয়ে যায়; সন্দেহটা এই যে : হত্যা ও দস্যুতায় তাঁরও হাত আছে। সেইজন্যেই তাঁর স্যাঙাৎদের চেহারার কোনো স্পষ্ট বর্ণনা না-পাওয়া গেলেও, তাঁর চেহারার বর্ণনা দিয়ে একটা হুলিয়া বেরিয়ে যায়—এবং টেলিগ্রাম ক'রে দিকে-দিগন্তে সে-খবর ছড়িয়ে দেয়া হয়। তক্ষুনি।

অপরাধী যেহেতু এখনও ইংলণ্ড ছেড়ে চ'লে যাবার কোনো অবসর পায়নি, তাকে নিশ্চয়ই দেশের মধ্যেই কোনো শহরে বা বন্দরে পাকড়ে ফেলা যাবে—এবং এই ভাবী কৃতিত্বের কথা ভেবেই পুলিশ গোঁফে তা দিতে থাকে এবং মিথ্যে হয়রানির মধ্য না-গিয়ে ইন্‌স্‌পেক্টর ও তাঁর সহকর্মী গোয়েন্দারা বাড়ি ফিরে গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

তারপর, সেই রাত্তিরেই, দুটো নাগাদ, পাঁচজন হট্টাকট্টা লোক, কারু-কারু মুখ নিখুঁত কামানো, কারু-বা ব্রন্‌জ মুখে ইয়া-বড়ো তাগড়াই গোঁফ, লণ্ডন থেকে ট্রেনে ক'রে সাদামটন চ'লে যায়। ট্রেনের ব্রেকভ্যান থেকে কতগুলো পার্সেল আর একটা বিষমভারি মস্ত তোরঙ্গ নামিয়ে নিয়ে তারা একটা ভাড়াগাড়িতে ক'রে জাহাজঘাটায় চ'লে যায়; জাহাজঘাটায় দু-হাজার টনের একটা স্টীমার চোঙ দিয়ে ভলকে-ভলকে ধোঁয়া ওগরাতে-ওগরাতে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে অপেক্ষা করছিলো। চারটের সময়, গোটা সাদামটন যখন নাকডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, স্টীমারটি নোঙর তুলে ভরা জোয়ারে ভাসতে-ভাসতে বারদরিয়ায় চ'লে যায়। তাকে আটকাবার কোনো চেষ্টাই করা হয়নি। খামকা, অকারণেই, কোনো স্টীমারকে কেউ সন্দেহ করতে যাবেই বা কেন? স্টীমারটা তো এ-ক-দিন নানা ধরনের মাল বোঝাই করছিলো তার খোলে—সে দাহোমের বন্দর কোতোনুতে যাবে। স্টীমারটি, অতএব, তার মালপত্তর নিয়ে, তার পাঁচজন যাত্রী এবং তাদের পার্সেল ও ভারি তোরঙ্গটা নিয়ে, বেশ নিশ্চিন্তেই পাড়ি জমিয়ে দেয় সাগরে। যাত্রীদের একজন সবচেয়ে-তাগড়াই, সবচেয়ে-লম্বাচওড়া যে—তার কামরায় গিয়ে যখন ঢোকে, পুলিশ তখন তাদের ক্লান্তিকর তদন্ত সেরে *সু-উপার্জিত বিশ্রামের* তোড়জোড় করছে।

এও নিশ্চয়ই পাঠকদের আজও মনে আছে যে তদন্তটা পরের দিন ফের পুরোদমে শুরু হ'য়ে যায়, এবং বেশ-কিছুদিন ধ'রেই চলে, কিন্তু কখনোই কোনো নির্দিষ্ট সমাধানসূত্রে গিয়ে পৌঁছুতে পারেনি। পাঁচজন অপরাধীর পরিচয় যে-তিমিরে ছিলো সেই তিমিরেই থেকে যায়; লুইস রবার্ট ব্লেজনেরও আর-কোনো হদিশ মেলেনি। এই দুর্ভেদ্য



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহস্যজালের মধ্যে কোনো আলোকরেখাই দেখা যায়নি। কোন্-সে দোকান কয়লাওলাকে রাতের বেলা ওভাবে পাঠিয়েছিলে, সেটা অব্দি খুঁজে-পাওয়া যায়নি। শেষটায় একটা অমীমাংসিত রহস্য হিশেবেই সেটা নথিবন্দী হ'য়ে প'ড়ে থাকে।

এই ধাঁধাটার সমাধান অবশ্য, আজই, এই-প্রথম, এই উপাখ্যানের মধ্যে দেয়া হচ্ছে। পাঠককেই বিচার-বিবেচনা ক'রে বলতে হবে এর চেয়ে চমকপ্রদ, অপ্রত্যাশিত ও আশ্চর্য রহস্যের কথা তিনি কোনোদিন কল্পনাতেও ভাবতে পারতেন কি না।

## দুই

## একটি সরেজমিন তদন্তের উদ্দেশে

সেই সময়ে কোনাক্রি, যদিও ছিলো ফরাশি-গিনির রাজধানী আর খোদ লাটসায়েবের আবাসস্থল, সাধারণ একটা অজপাড়াগাঁর মতোই ছিলো। সাতাশে নভেম্বর সে-বছর এই কোনাক্রিতে একটা মেলা বসেছিলো। স্বয়ং লাটসায়েবের আমন্ত্রণে ঝেঁটিয়ে এসেছে গ্রামগঞ্জের লোক, সবাই দল বেঁধে চলেছে সমুদ্রতীরে, সেখানে তারা স্বাগত জানাবে কয়েকজন বিখ্যাত মানুষকে, তাঁরা সদ্য এসে নেমেছেন তাঁদের পোত থেকে।

বিখ্যাত ব'লে বিখ্যাত ! এঁরা সবাই—সবমিলিয়ে সাতজন—ফ্রান্স থেকে এসেছেন —লোকসভা নিয়োজিত এক অতিরিক্ত কমিশন, তাঁরা সন্ধান ক'রে দেখবেন ফরাশি সুদানের সেই অংশটাকে, স্থানীয় লোকেরা যাকে বলে নাইজার নদীর বাঁক। সত্যি-বলতে, এই কমিশন স্বেচ্ছায় এখানে আসেনি—সদস্যসভার সভাপতি এবং উপনিবেশ দফতরের মন্ত্রিমহোদয় যে এই সরেজমিন তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন, তাও খুব গায়ে প'ড়ে নয়। মন্ত্রিসভার সদস্যদের চাপে প'ড়েই তাঁরা বাধ্য হয়েছেন এই তদন্তের ব্যবস্থা করতে— না-হ'লে বাগ্মিতার ফুলঝুরিতে মন্ত্রিসভা দিনের পর দিন শুধু ঝলমলই ক'রে উঠতো, কাজের কাজ কিছু হ'তো না। বক্তৃতার সুযোগ পেলে কোন ফরাশিই বা সহজে বা স্বেচ্ছায় মুখে কুলুপ আঁটে ?

এই মিশনকে আফ্রিকার যে-অংশে সন্ধান চালাতে বলা হয়েছে, তা নিয়ে কয়েক মাস আগে প্রচণ্ড তর্কাতর্কির ফলে মন্ত্রিসভা একেবারে যেন দু-আধখানাই হ'য়ে যায়। দুই দুর্ধর্ষ নেতার দ্বন্দ্বযুদ্ধে—বাগ্মিতার অবিশ্যি—গোটা সংসদই এমনভাবে তেতে উঠেছিলো, শুধু-কথায়, *আপোষে*, তার কোনো রফা হ'তো ব'লে কারুই মনে হয়নি। একদলের নেতা বারজাক, আর অন্যদলে বোদ্রিয়ের। বারজাক মানুষটি বেশ গোলগাল,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নধরকান্তি, নাদুশনুদুশ, মুখে প'রে আছেন ঘন-কালো দাড়ি—কোনো পাখার মতো। প্রভঁসের লোক, শক্ত-শক্ত দাঁতভাঙা কথা বলেন, আর তাঁর খটোমটো বক্তৃতায় সহজ-সাবলীল কোনো ছন্দ না-থাকুক বেদম তোড় ছিলো—এমনিতে মানুষটি বেশ-হাসিখুশি, আর যাঁকে বলা যায়, কেতাবিভাষায়, *সংবেদনশীল*। অন্যজন উত্তরের মানুষ, আর বললে অত্যুক্তি হবে না যে তাঁর চেহারাতেই সেটা মালুম হ'তো। শুকনো চিমশেপানা মুখ, শরীরটা লিকলিকে কাঠখোট্টা, চিবুকের দু-পাশে ঝুলে পড়েছে একটা গোঁফ কিন্তু সেটা নামেই—কেননা বিরলশ্মশ্রুই বটে আদপে, অলবড্যে আর একগুঁয়ে, তিনি প্রকৃতির এক *স্বভাবমন্দদৃষ্টি* সৃষ্টি। এঁর প্রতিদ্বন্দ্বী যেকালে বপুদেশ আরো-প্রসারিত করতে পারলেই খুশি হতেন, ইনি যেন পারলে ভাঁজ হ'য়ে আরো-গুটিয়ে গিয়ে শুটকোমতো হ'য়ে যেতে চাইতেন, হৃদয়টাও তাঁর যেন কৃপণের সিন্দুকের মতো তালাবন্ধ। দীর্ঘদিনের দুই সাংসদ, তাঁরা দুজনেই উপনিবেশ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ—উপনিবেশ সম্বন্ধে কোনো প্রস্তাব উত্থাপিত হ'লেই তাঁদের কাছে মতামত চাওয়া হ'তো। অথচ বিস্তর কেতাব, পুঁথি, নথিপত্র, প্রতিবেদন গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন ক'রে দুজনে ঠিক বিপরীতধর্মী দুই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতেন। কেননা তথ্য হ'লো এটাই যে এঁরা ক্বচিৎ-কখনও একমত হতেন। বারজাক কোনো মন্তব্য করলেই হ'লো, *এক ফ্রাঙ্কে দশ ফ্রাঙ্ক দেবো*, বোদ্রিয়ের ঠিক তার উলটো কথা বলবার জন্যে নাছোড় বায়না ধ'রে বসবেন। আর দুজনের বক্তৃতায় যখন কাটাকুটি খেলা হ'তো, সংসদ বাধ্য হ'য়ে ভোট নেবার ব্যবস্থা করতো—আর সেই ভোটাভুটি হ'তো মন্ত্রীমহোদয়ের অভিরুচি অনুযায়ী।

এবার কিন্তু বারজাক, বা বোদ্রিয়ের কেউই সূচ্যগ্র ভূমি ছাড়তেই রাজি ছিলেন না, মনে হচ্ছিলো এই তুলকালাম তর্কাতর্কিটা বুঝি অনন্তকাল ধ'রেই চলবে। শুরু হয়েছিলো বারজাকের প্রস্তাবিত উপনিবেশ-বিধি প্রণয়ন নিয়ে : সেনেগল, সামারিয়া, আপার-গিনি আর নাইজারের পশ্চিমে যে ফরাশি-সুদান আছে, তাদের প্রত্যেকটির *একজন* ক'রে সাংসদ চাচ্ছিলেন বারজাক, শুধু তা-ই নয়, বর্ণবৈষম্যের বালাই না-রেখে কৃষ্ণাঙ্গ প্রতিনিধিদেরও ভোট দেবার অধিকার দিতে হবে—এটাই ছিলো বারজাকের প্রস্তাব। তক্ষুনি ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধে গেলো : বোদ্রিয়ের এই প্রস্তাবে তড়াক ক'রে লাফ দিয়ে উঠেছিলেন তাঁর আসন ছেড়ে, আর দুই প্রতিদ্বন্দ্বীই পরস্পরকে লক্ষ্য ক'রে যুক্তির কামান দাগতে শুরু করেছিলেন। বারজাক বিস্তর সরকারি-বেসরকারি তথ্য উল্লেখ ক'রে দাবি করেছিলেন *কালা আদমিরাও সভ্য লোক*, ক্রীতদাসপ্রথা রদ ক'রে ফায়দাই বা কী —যদি-না তাদের কোনো অধিকার দেয়া যায়, নিজেদের ভাগ্য তাঁরা নিজেরাই নির্ধারণ করুক, আর তাঁর ভাষণ তিনি সাঙ্গ করেছিলেন মন্ত্রের মতো তিনটি কথা ব'লে : *সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা*। তাঁর যুযুধান প্রতিপক্ষের বক্তব্য : *কালা আদমিরা সভ্য তো নয়ই, বর্বরের চূড়ান্ত*, আর শাদা আদমিদের দায় হচ্ছে সভ্যতার আলোকবর্তিকা জ্বেলে তাদের অন্ধকার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে আলোকছটায় নিয়ে-আসা, আর কেউ কি কোনোদিন কোনো অসুখে-ভোগা বাচ্চাকে জিগেস ক'রে : *বাছা, এই ওষুধটা তোমার মনে ধরবে কি?* এ-রকম একটা ভয়ালভয়ংকর পরীক্ষানিরীক্ষার সময় এটা নয়, বরং সেখানে আরো-বেশি ক'রে ফৌজ পাঠানো উচিত, যে-সব কালো আদমি একটু-একটু-ট্যাঁ-ফোঁ করছে তাদের পিটিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে দেয়া উচিত, অঙ্কুরেই বিনাশ ক'রে ফেলা ভালো বিদ্রোহের স্পর্ধা বা আগাছা। তিনিও বিস্তর সরকারি-বেসরকারি প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃতি দিলেন, বললেন যে যার গায়েই *বিশুদ্ধ ফরাশি রক্ত* আছে তারই উচিত আফ্রিকার ঐসব এলাকায় চিরকাল ফরাশি রাজত্ব কায়েম ক'রে রাখার চেষ্টা করা।

উপনিবেশ দফতরের মন্ত্রি তো মহা-ফাঁপরে পড়লেন। তাঁর মনে হলো দুই তরফের কথাতেই কিঞ্চিৎ সত্য আছে। নাইজারের বাঁকে যে-সব কালো আদমি থাকে, তারা *ফ্রান্সের সুশাসনে* বেশ অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে, অজ্ঞানের অন্ধকারে যে-*আফ্রিকা ছায়াছন্ন ছিলো* সেখানে শিক্ষার আলোক বেশ ভালোভাবেই ঢুকে পড়েছে—হ্যাঁ-হ্যাঁ, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাই—আর জনজীবনের নিরাপত্তাও কোনোপ্রকারে বিঘ্নিত হবার কোনো লক্ষণই সেখানে দেখা যাচ্ছে না। তবে কিছু-কিছু কালা আদমি আস্কারা পেয়ে-পেয়ে একেবারে মাথায় উঠেছে—তাদের একটু কড়কে দেয়াই ভালো। প্রায়ই খবর আসছে গণ্ডগোলের, অতর্কিত উপদ্রব আর হামলার; কোনো কারণ নেই, গাঁকে গাঁ উজাড় হয়ে যাচ্ছে—লোকজন সব ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আর, এখনও গুজব ব'লেই মনে হয়, তবে একটু কি আর সত্য নেই, যে আফ্রিকার মাটিতে কোনো-একটা অজ্ঞাত স্বাধীন শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। পিঁপড়ের পাখার মতোই কালা আদমিদের এ-সব শখসাধ গজাচ্ছে বুঝি-বা।

প্রতিদ্বন্দ্বী দুজন কিন্তু মন্ত্রীমহোদয়ের ভাষণে নিজের-নিজের বক্তব্যের সমর্থনে বিস্তর যুক্তি-তথ্য খুঁজে পেলেন। শেষটায় তর্কাতর্কি এমন-এঁড়ে আর অসহ্য হ'য়ে উঠলো যে, একজন সাংসদ অসহিষ্ণু হ'য়ে ব'লেই বসলেন : 'এতই যদি মতবিরোধ, তবে অন্য লোকের কথায় কান দেয়া কেন—গিয়ে নিজের চোখে দেখে এলেই হয়। সরেজমিন তদন্ত ক'রে।'

মন্ত্রীমহোদয় উবাচ : ও-অঞ্চলটায় এতবার লোকজন গিয়ে সে নিয়ে এত কথা লিখেছে যে সেখানে *নতুন ক'রে কিছু আবিষ্কার করার* নেই। তবে সংসদ চাইলে তিনি সংসদের মতেই সায় দেবেন। সাংসদরা যদি মনে করেন যে কোনো সরেজমিন তদন্তের বিশেষ দরকার আছে, তাহ'লে, *বেশ*, তিনি সানন্দেই নিজেকে সেই তদন্তের সঙ্গে জড়িয়ে নেবেন—আর এই অভিযানের নেতৃত্ব কে দেবেন, বেশ-তো, সাংসদরাই তা ঠিক ক'রে দিন না।

এ-প্রস্তাবটার সাফল্য একেবারে চোখধাঁধানো। সভা আপাতত মুলতুবি রইলো,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্ত্রীমহোদয় মিশনের সভ্য বাছাই ক'রে দেবেন, যদ্দিন-না এই মিশন তার *সুচিন্তিত প্রতিবেদন* জমা দেয় ততদিন সংসদ এ-বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না।

কিন্তু বললেই হ'লো, অমুকের ওপর মিশনের নেতৃত্ব দেয়া হ'লো? অত-সোজা নাকি ব্যাপারটা? ভোটামুটি ক'রে দেখা গেলো বারজাক আর বোদ্রিয়ের দুজনেই সমান-সমান ভোট পেয়েছেন। অথচ ব্যাপারটার তো একটা-কিছু নিষ্পত্তি করতেই হয়। ফরাশি সংসদে রসিক লোকের কোনো খামতি নেই। তাঁদের একজন ফোঁড়ন কাটলেন : 'তাতে আর-কী? দুজনকেই যুগ্মভাবে মিশনের নেতা ক'রে দেয়া হোক!' আর অমনি প্রস্তাবটা সাগ্রহে সবাই লুফে নিলেন : দুজনকেই যদি মিশনের সঙ্গে আফ্রিকায় চালান ক'রে দেয়া যায়, তাহ'লে চমৎকার হয়—অন্তত কয়েক মাস আর সংসদভবনে কেউই *ছায়াচ্ছন্ন আফ্রিকার* নামটাও করবে না। দুজনকেই তক্ষুনি মিশনের যুগ্ম-নেতা ব'লে ঘোষণা ক'রে দেয়া হ'লো। তবে চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকবে যাঁর বয়েস বেশি, তাঁর ওপর। আর হিশেব ক'রে দেখা গেলো, বারজাকই জিতেছেন, তিনি বোদ্রিয়েরের চাইতে তিনদিনের বড়ো, বোদ্রিয়ের তো মহাখাপ্পা, কিন্তু কী আর করেন, সবকিছুতেই বাগড়া দেবার জন্যে তিনি থেকে গেলেন সহ-নেতা।

এই দুজন বাদে সরকার থেকে নিয়োগ করা হয়েছে আরো-কয়েকজনকে, এঁদের মতো এতটা রংদার লোক নন হয়তো, তবে এঁদের চেয়ে হয়তো বেশিই যোগ্য এবং করিৎকর্মা। তাঁদের একজন হলেন ডাক্তার শাতোনে, নামজাদা চিকিৎসক, আর এলেমও আছে বিস্তর, তাঁর প্রফুল্ল আনন মাটি থেকে পাঁচফিট আটইঞ্চি ওপরে বিরাজমান, এবং তাঁর মাথাটি ঘেরা তুষারধবল কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া চুলে, ঝাঁটার মতো একজোড়া গোঁফও আছে তাঁর—সেও তাঁর কেশগুচ্ছেরই মতো তুষারধবল। চমৎকার মানুষ এই ডাক্তার শাতোনে, বুদ্ধিমান, তরলমতি নন কিন্তু হালকা মেজাজের, সারাক্ষণই হাসছেন—এবং বাষ্প ছাড়লে যেমন আওয়াজ হয়, সেইরকমই কোনো-একটা আওয়াজ হয় তাঁর হাসির। আর তাঁরই মতো চোখে পড়বার মতো মানুষ হলেন মঁসিয় ইসিদোর তসাঁ, ভৌগোলিক সমিতির বার্তাপ্রেরক, কিঞ্চিৎ শুষ্কস্বভাব রগচটা কর্তৃত্বপ্রিয় মানুষ, ভূগোলবিদ্যায় তিনি যে মনপ্রাণই শুধু সমর্পণ ক'রে বসে আছেন তা নয়, প্রায় খ্যাপার মতোই তাঁর কাছে আরাধ্য এই বিদ্যা। আর মিশনের অন্য সদস্যরা? মাদাম পঁসাঁ, কিরিউ, আর এইরিউ বিভিন্ন মন্ত্রীর তফতরে কাজ করেন, এমনিতে চট ক'রে কারু নজরে পড়বার মতো পাত্রী নন তাঁরা—তাঁদের ব্যক্তিত্বও কখনও উগ্রস্বভাব নয়, তাঁরা মানুষ হিশেবে অন্য-পাঁচজনের মতোই। এই সরকারি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে অষ্টম একজন অভিযাত্রীও আছেন, তাঁর নাম আমেদে ফ্লরেঁস, আর তাঁর কাজ হ'লো প্রাণপণে যে-খবরকাগজে তিনি কাজ করেন তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলা, অর্থাৎ তিনি একজন চটপট, ক্ষিপ্র, প্রাঞ্জল সংবাদদাতা—আর তাঁর কাগজ হচ্ছে সেই বিখ্যাত দৈনিক *ল্যাক্সপান্সিয়ঁ ফ্রাঁসেঈ*।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই মহোদয়গণের শুভাগমন—বলাই বাহুল্য—বচনভাষণের কারদানি দেখাবার সুবর্ণসুযোগ। যে-ই সরকারে বা শাসনব্যবস্থায় কেউকেটা লোক, সে কি আর কারু সঙ্গে দেখা হ'লে নিছকই হাতে-হাতমিলিয়ে *সুপ্রভাত* ব'লে তুষ্ট থাকে, তার বরং মনে হয় ইতিহাসের পৃষ্ঠপোষণ করার জন্যে তাঁর অন্তত ছোটোখাটো একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেলা উচিত। এদিকে শ্রোতারা, যৎকিঞ্চিৎ আমোদ পেয়েই, একই কথা আগেও বার-বার শোনা সত্ত্বেও, বাগ্মীদের চারপাশে বৃত্তাকারে ঘিরে থেকে একটা বলয়ই রচনা ক'রে বসে।

কেতামাফিক, খোদ লাটসায়েব, মঁসিয় বালদোন, তাঁর উচ্চপদস্থ সাগরেদদের নিয়ে, গম্ভীরগলায় মিশনের প্রতিটি সদস্যকে *স্বাগতম্* জানালেন, নিজের সহকারীদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয়ও করিয়ে দিলেন : স্বর্গ থেকে এসে যদি এঁরা উদয় না-হ'য়ে থাকেন, তবু তো *প্রায়-স্বর্গ* থেকেই এসেছেন, সাতসাগর বাড়ি দিয়ে, শ্বেতাঙ্গভূমি থেকে এখানে —এই *ছায়াচ্ছন্ন* আফ্রিকায়। তবে তাঁকে কটাক্ষ করা ঠিক উচিত হবে না—তাঁর ভাষণটি ছিলো হ্রস্ব ও সুচিন্তিত। এ-রকম সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত ভাষণের জন্যে হাততালি পাওয়াই উচিত।

বারজাক, তাঁর উত্তরে মিশনের তরফ থেকে নিচের কথাগুলো বললেন :

'মঁসিয় ল্য গবর্নিউর, মেসিউর,' গলা ঝেড়ে শুরু করলেন, তিনি : 'এক্ষুনি আমরা যে-স্বাগতভাষণ শুনলুম, তাতে আমি ও আমার সহযোগীরা একেবারে অভিভূত হ'য়ে গেছি। আপনাদের এই সহৃদয় আপ্যায়নকে আমরা শুভলক্ষণ ব'লেই মনে করছি। —বিশেষত আমরা যেহেতু এমন-একটা অভিযানে বেরিয়ে পড়তে চলেছি, যার কঠিন বাধাবিপত্তিকে কোনোভাবেই অত্যুক্তিভূষিত করা যাবে না—তখন সকলের শুভেচ্ছাই আমাদের যথার্থ পাথেয়। আমরা জানি যে সদাশয় সরকারের তৎপরতায় এ-সব অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, প্রায় ফ্রান্সেরই দূরভূমি এ-সব, আগের মতো রাস্তায় এখন আর তেমন হয়তো বিপদ-আপদ নেই, তবু শুভেচ্ছা সবসময়েই কাঙ্ক্ষণীয়।

'সেইজন্যেই আজ, এই চমৎকার নগরী কোনাক্রির দেহলিতে দাঁড়িয়ে, আমার স্বদেশের কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মচারীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে, আমাদের মনে হচ্ছে আমরা যেন ফ্রান্স ছেড়েই বেরুইনি—এখনও ফরাশিদেশেই আছি। সেইজন্যেই, যখন আমরা এ-দেশের দূর-দুর্গম অভ্যন্তরে গিয়ে ঢুকবো, তখনও মনে হবে আমরা ফ্রান্স ছেড়ে দূরে যাইনি, কেননা এ-সব দেশের শ্রমনিষ্ঠ মানুষজন এখন বৃহৎ-কোনো সম্প্রসারিত-ফ্রান্সেরই বাসিন্দা হ'য়ে উঠেছে। আমাদের উপস্থিতি থেকেই প্রতীয়মান হবে সদাশয় সরকার এঁদের ওপর কতটা নজর রেখেছেন ! *পিতৃভূমির প্রতি*, ফ্রান্সের প্রতি, তাদের আনুগত্য আরো-বর্ধিত হোক, আরো-গৌরবান্বিত হোক প্রজাতন্ত্র, এই কামনাই মিশনের পক্ষ থেকে করছি আমি।'

মঁসিয় ল্য গবর্নিউর বালদোন এর পরেই স্বতঃস্ফূর্ত করতালির জন্যে ইশারা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন, আর বারজাক দু-পা পেছিয়ে যেতেই তাঁর জায়গায় এসে দাঁড়ালেন বোদ্রিয়ের। উপনিবেশ দফতরের মন্ত্রীর দফতরে অন্তহীন কচকচির ফলে এটাই স্থির হয়েছে বোদ্রিয়ের আদৌ বারজাকের *সহকারী নন, সহযোগী* নেতা। শব্দের কী—অহো!—রহস্যময় ক্ষমতা! তার মানে দাঁড়িয়েছে অবশ্য এটাই যে বারজাক যদি কোনো সরকারি অনুষ্ঠানে অংশ নেন, পরক্ষণেই তাতে অংশ নেবেন বোদ্রিয়েরও। এইভাবেই সমাধান হয়েছে চুলবুলে জটিলতার। বারজাক যদি এগিয়ে আসেন, তবে বোদ্রিয়েরও কি আর খুব-একটা পেছনে থাকবেন ?

'মঁসিয় ল্য গবর্নিউর, মেসিউর,' বোদ্রিয়ের সুকৌশলে হাততালিটাকে মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে শুরু করলেন : 'আমার প্রখ্যাত সহযোগী এবং বান্ধবের সুমধুর সুভাষিতের সঙ্গে আমি নিজেকেও সম্পূর্ণরূপে জড়িয়ে নিচ্ছি। তিনি যেমন বলেছেন, আমাদের প্রত্যেককেই এই অভিযানের আপদবিপদ সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে আর স্পষ্ট ক'রে সেই আশঙ্কাটাও ব্যক্ত করতে হবে। বাধা-বিপত্তি যা আসবে, আমরা নিজেরাই তা অতিক্রম করার চেষ্টা করবো। আর আপদ-বিপদ ? আমরা তাকে ডরাবোই না, কেননা বিপদ আর আমাদের মাঝখানে উঁচনো থাকবে ফ্রান্সেরই শানিতফলা সঙিন।

'সেইজন্যেই আমাকে এই শুভমুহূর্তে, আফ্রিকার মাটিতে পা দেবার এই শুভলগ্নে, সেই সঙ্গীসাথীদেরই অভিবাদন জানাতে দিন, যাঁদের অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত বিপদকে ঠেকিয়ে রাখবে। সেই সঙ্গীসাথীরা সংখ্যায় বেশি না-হ'লেও তাঁরা তো আসলে ফ্রান্সেরই বিপুল সামরিক শক্তির প্রতীক—আর ফ্রান্সের সেই সামরিক শক্তিকেই আমরা এখানে সেলাম ঠুকছি। ফ্রান্সের জনগণেরই হৃদয়স্পর্শ ক'রে আছে যে-সামরিক বাহিনী তারই সাহায্যে আমাদের অভিযান সর্বার্থসাধক ও সাফল্যমণ্ডিত হবে—এই দৃঢ়-আস্থা আমি এখানে ঘোষণা করছি !'

আবারও করতালির ধুম প'ড়ে গেলো—আগের মতোই *স্বতোৎসারিত* ও *সাগ্রহ*। তারপর জমায়েৎ বিপুল দর্পে চললো রাজভবনের দিকে—মিশনের সদস্যরা সেখানে তিনদিন শুধু বিশ্রাম ক'রে বা আড্ডা দিয়েই কাটাবেন না, সেখান ব'সে-বসেই তাঁরা স্থির করবেন পরবর্তী কার্যক্রম।

কার্যক্রমটি যেমন-তেমন বা *নগণ্য-কিছু* নয়—সুবিশাল। বারজাকের প্রস্তাবিত বিধিপ্রণয়নের সঙ্গে জড়িত অঞ্চলটি ১,০০০,০০০ বর্গমাইলকেও ছাড়িয়ে যায়। অত-বড়ো জায়গাটার *সর্বত্র* ঘুরে-ঘুরে তদন্ত করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না—এ তো ফ্রান্সের তিনগুণ বাড়া !—শুধু এর মধ্য দিয়ে এমন-একটা রাস্তা খুঁজে বার করতে হবে যাতে মনে হয় সারা আফ্রিকাই বুঝি *স্বচক্ষে দেখা* হয়ে গেছে। সত্যি-বলতে, সে-রাস্তাটা মিশনের কারু-কারু পক্ষে ১,৫০০ মাইল দীর্ঘ, আর কারু-কারু কাছে ২,৫০০ মাইলেরও বেশি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেননা এমন বিপুল একটা অঞ্চলে অভিযান চালাতে গিয়ে, মিশন একসময়ে দু-ভাগে ভাগ হ'য়ে দুটো আলাদা পথে পাড়ি জমাবে। কোনাক্রি ছেড়ে মিশন প্রথমে যাবে কানকান, সেখান থেকে কেনেদুগুর সবচেয়ে-বড়ো শহর সিকাসোতে গিয়ে পৌঁছুবে। এখানেই, সমুদ্রতট থেকে অন্যূন সাড়ে-সাতশো মাইল দূরে এসে মিশনটি ভাগ হ'য়ে যাবে। একদল যাবে, বোদ্রিয়েরে নেতৃত্বে, দক্ষিণে এবং শেষটায় গিয়ে পৌঁছুবে আইভরি কোস্টে। অন্যটা চলবে পুবমুখো, স্বয়ং বারজাকের নেতৃত্বে, গিয়ে পৌঁছুবে সায়ীতে, নাইজারে; তারপর নদীর সমান্তরাল পথ ধ'রে এগিয়ে সে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছুবে দাহোমের উপকূলে। যেহেতু অভাবিত বিলম্ব হ'তে পারে, কোথাও-কোথাও ঘুরপথেও যেতে হ'তে পারে, তাই বোদ্রিয়ের হয়তো আগস্টের মাঝামাঝির আগে গ্রাঁ-বাসাম পৌঁছুতে পারবেন না, আর বারজাকের পক্ষেও হয়তো অক্টোবরের আগে কোতোনু পৌঁছুনো সম্ভব হবে না।

অর্থাৎ এটা একটা দীর্ঘ যাত্রারই প্রশ্ন, তবে মঁসিয় ইসিদোর তসাঁ এটা ভেবে মোটেই কোনো পরিতোষ পেলেন না যে এই দীর্ঘ ভ্রমণপথটায় তিনি এমন-কোনো চমকপ্রদ ভৌগোলিক *আবিষ্কার* ক'রে ফেলতে পারবেন, ইওরোপের লোক যা আগে জানতো না। সত্যি-বলতে, কেন-যে ভৌগোলিক সমিতির একজন বার্তাসচিবকে এই অভিযানের সঙ্গে ল্যাংবোটের মতো জুড়ে দেয়া হয়েছে সেটা বোঝা একটু মুশকিলই ছিলো, কেননা নাইজার নদীর বাঁক আবিষ্কার-করা আর আমেরিকা আবিষ্কার-করা প্রায় একই কথা। তবে মঁসিয় তসাঁ নামের কাঙাল নন। ভূ-গোলকটার সর্বত্রই লোক গিয়ে আগে হাজির হয়েছে, আগে মানে তাঁর আগে, ফলে *নাল্লে সুখমস্তি* তাঁর অন্তত বলা সাজে না। তাঁকে বরং উচ্চাশা পরিত্যাগ করতেই সুপরামর্শ দিয়েছিলো ভৌগোলিক সমিতির বন্ধুবান্ধবেরা। নাইজারের বাঁক অনেকদিন হ'লো মোটেই আর অনধিগম্য অথবা রহস্যময় অঞ্চল নেই। পশ্চিম সুদানকে কেউই আর এখন *বন্য* বলে না। ইওরোপ গিয়ে রাজ্য বিছিয়েছে সেখানে, শাসনযন্ত্র একটু বাড়াবাড়ি-রকমই কাজ করে সেখানে—*সদাশয় ফরাশি সরকারের* আনুকূল্যে বিস্তর জনপদ গজিয়ে উঠেছে এখানে। তবু, এই *বারজাক মিশন* যে-সব অঞ্চল দিয়ে যাবে, তাদের সর্বত্র অবশ্য *শান্তিপ্রতিষ্ঠার কাজ* তেমন এগোয়নি। তবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা জমকালো, সঙ্গে সেপাই-শান্ত্রী থাকবে, অর্থাৎ বোদ্রিয়ের সামরিক বাহিনীর লোকজন, ফলে অভিযানের উদ্দেশ্য সফলই হবে—ঘটনাবিহীন যদি নাও হয়, অপঘাতবিহীন হবে ব'লেই আশা করা যায়। আসলে এ-তো শান্তিপ্রিয় কতগুলো জনপদের মধ্য দিয়ে পদযুগলকে আশ্রয় ক'রে গিয়ে বেড়িয়ে-আসা, বারজাক তাঁর *সংবেদনশীল ভাষণে* যে-শান্তিপ্রিয় মানুষদের হাতে একটু-আধটু রাজনৈতিক ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বলেছিলেন। স্থির হয়েছে যে, মিশন রওনা হবে পয়লা ডিসেম্বর।

তার আগের রাত্তিরে সরকারি একটা নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছে, স্বয়ং



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাটসায়েবের টেবিলে শেষবারের মতো মিশনের সদস্যরা মিলিত হবেন। পানভোজনের শেষে, নতুন ক'রে পানীয়র ব্যবস্থা করতেই নিশ্চয়ই, *টোস্ট* পান করা হবে—কামনা করা হবে পরস্পরের কীর্তি ও সাফল্য, এটাই তো রীতি যে তার পরেই ঝমঝম ক'রে বেজে উঠবে জাতীয়সংগীত—প্রজাতন্ত্রের জয়গাথা।

সেদিন, জ্বলন্ত-এক সূর্যের তলায় সারাদিন এলোমেলো ঘুরে বেরিয়ে বড্ড ক্লান্ত হ'য়েই বারজাক তাঁর ঘরে ফিরেছেন, আর ফিরে পাখার হাওয়া খেতে-খেতে আরামের একটা *আঃহ্* ছেড়েছেন, অপেক্ষা ক'রে আছেন কখন সেই শুভলগ্ন আসে যখন তিনি তাঁর গায়ের ভারি কালো কোটটা খুলে নিতে পারবেন, যতক্ষণ কাজ ততক্ষণ গায়ে কোট—এইই হচ্ছে সরকারি রীতি তা গরম যতই তপ্ত কটাহের মতোই হোক, এমন সময় আর্দালি—তাকে *ঔপনিবেশিক দফতরের* কাজ থেকে সরিয়ে এনে তাঁর সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে—এসে বললে যে তাঁর সঙ্গে দুই অভ্যাগত দেখা করতে চান।

'কারা তারা?' জিগেস করলেন বারজাক।

'এক সায়েব আর তাঁর সঙ্গিনী।'

'ঔপনিবেশিক?'

'মনে হয় না। অন্তত চেহারা-ছিরি দেখে,' আর্দালি উত্তর দিলে, 'সায়েব ঢ্যাঙা মতন, তবে নুড়ির ওপর ঘাস গজায়নি তেমন।'

'*নুড়ি*?'

'টেকো যে! শনের ফেঁসোর মতো জুলফি, চোখদুটো যেন সিঁড়ির পইঠার মতো।'

'তোমার কল্পনাশক্তি দেখছি বড্ড সৃজনশীল!' বললেন বারজাক, 'আর তার সঙ্গিনীটি?'

'সঙ্গিনীটি?'

'হ্যাঁ। দেখতে কেমন? *তরুণী*?'

'তা, বলা যায়।'

'সুন্দরী?'

'হ্যাঁ, তায় ফ্যাশনদুরস্ত—জেল্লা দিচ্ছে।'

বারজাক অন্যমনস্কের মতো গোঁফ চুমরে বললেন, 'নিয়ে এসো ওদের।'

এই নির্দেশটা দেবার সময়, বারজাক প্রায় *অসচেতন ভাবেই*, আয়নাটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছিলেন, যাতে প্রস্ফুটিত হয়েছিলো তাঁর নধর বপু। যদিও তিনি আদপেই খেয়াল করেননি, ঘড়িতে কিন্তু তখন ঢংঢং ক'রে ছ-টা বাজছিলো, সেই কুখ্যাত সময়—অবশ্য দ্রাঘিমার জন্যে অন্য জায়গার সঙ্গে তার তারতম্য কিছু থাকতেই পারে —যখন সেনট্রাল ব্যাঙ্কে ডাকাত পড়েছিলো।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভ্যাগতরা—একজন পুরুষ, বছর-চল্লিশ বয়েস, সঙ্গিনীর বয়েস কুড়ি থেকে পঁচিশ, কচিমেয়েই—বারজাকের ঘরে এসে পৌঁছুলেন, বারজাক ততক্ষণ মনে-মনে নিজেকে সরকারি নৈশভোজের ক্লান্তিকর ক্রমের জন্য তৈরি ক'রে নিচ্ছিলেন। পুরুষটি সত্যি ভারি ঢ্যাঙা। যেন অন্তহীন দুই ঠ্যাঙের ওপর বসিয়ে দেয়া হয়েছে শুটকোমতো একটা শরীর, ঘাড়গর্দান দীর্ঘ, মাথাটা দীর্ঘ, কৃশ। তার চোখ দুটি যদি সিঁড়ির পইঠার কথা মনে করিয়ে নাও-দেয়—আর্দালি তাদের যেমনতর তাজ্জবভাবে তুলনা করেছিলো —কেউ বলতে পারবে না যে মণিদুটো কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে না, নাকটা মুখের তুলনায় বড়োই, ওষ্ঠাধর পুরু, আর কোনো ক্ষুর নিশ্চয়ই নিষ্ঠুরভাবে গোঁফজোড়া চেঁছে দিয়েছে। ওদিকে জুলফিদুটো, অস্ট্রিয়ার লোকদের যা জমকালোভাবেই থাকে, আর মাথায় নামেমাত্র কোঁকড়ানো বিরল চুল সযত্নে টাকের ওপর বেছানো, ঠিক শনের ফেঁসোর মতো নয়, আর্দালি যথার্থকথাটা প্রয়োগ করতে পারেনি। পুরুষটি আর্দ্রকবৎ ঝাঁঝালো, চুলের রঙও আদার মতোই। তবে, যতই কিম্ভূত দেখতে হোক না কেন, তার এই বেঢপ চেহারাতেও কেমন-একটা টান আছে। মুখে একটা অকপট সরলভাব, চোখে মিশুকে দৃষ্টি, খানিকটা গায়ে-পড়া বন্ধুতারই ভাব।

আর তার পেছন-পেছন আগমন হয়েছে *মহিলাটির*। না, তাকে সুন্দরী ব'লে বর্ণনা ক'রে আর্দালি মোটেই রং চড়ায়নি, কোনো অত্যুক্তিই করেনি। দীঘল, হালকা ফুরফুরে, মনোরম সুগঠন, লাল টুকটুকে সুঠাম মুখ, সুশ্রী নাসা, আয়ত দুটি চোখ—প্রায়-জুড়ে-যাওয়া বাঁকানো দুই সুশ্রী ভুরুর তলায়, মাথা ভর্তি রাত্রির মতো নিবিড়কালো গহীন চুল —ইনি শুধু-যে পরমা সুন্দরী তা-ই নয়, সেজেছেনও চমৎকার।

বারজাক চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বসতে বলতেই, পুরুষটি কথা বলতে শুরু ক'রে দিয়েছেন। 'আপনি আমাদের ক্ষমা করবেন, মঁসিয় ল্য দেপুতে, যে এভাবে এসে গায়ে প'ড়ে আপনার সাহায্য চেয়ে বিরক্ত করছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে যে আলাপ করিয়ে দেবে, এমন-কাউকেই আমরা চিনি না—ফলে আমরা যদি নিজেরাই নিজেদের পরিচয় দিই, তাহ'লে মাফ ক'রে দেবেন। আমার নাম—অনুগ্রহ ক'রে জানাতে দিন নামটা একটু বেয়াড়ারকম, উদ্ভটই—আমার নাম অজেনর দ্য সাঁৎ-বেরাঁ, ভূস্বামী, চিরকুমার, আর র‍্যন্ নগরীর বাসিন্দা।' নাটুকেভাবে এই পর্যন্ত ব'লে অজেনর দ্য সাঁৎ-বেরাঁ একটু থেমে আরো-নাটুকেভাবে ঝুঁকে হাত নেড়ে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন : 'মিস্ জেন মোরনাস —আমার মাসি।'

'আপনার *মাসি ?*' কি-রকম ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন বারজাক।

'হ্যাঁ। মিস মোরনাস সত্যিই আমার মাসি—যে-কেউই যে-কারু মাসি হ'তে পারে তো।' অজেনর দ্য সাঁৎ-বেরাঁ বারজাককে যখন এইভাবে আশ্বস্ত করছেন তখন তরুণীর মধুর অধরে ক্ষীণ-একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মঁসিয় দ্য সাঁৎ-বেরাঁ,' একটু ইংরেজির ঝোঁকে ফরাশি বলেছে তরুণী, 'সবসময়েই আমার ভাগ্নে ব'লে পরিচয় দিতে ভালোবাসেন—কখনো আমার আত্মীয়তাসম্বন্ধের কথা জাহির করতে ভোলেন না...'

'তাতে নিজের বয়েস অনেক কম লাগে,' ভাগিনেয়টি জুড়ে দিয়েছেন।

'তবে,' জেন মোরনাসের কথা তখনও ফুরোয়নি, 'একবার সবাইকে চমকে দিয়ে তিনি তাঁর বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার পর, তিনি সম্বন্ধটা উলটে দিতে রাজি হ'য়ে যান এবং পুনর্বার রূপান্তরিত হ'য়ে যান আমার অজেনর মামায়—ইনি আমার মাতুলই বটেন, অন্তত জন্মাবধি আমি এইই জানি।'

'এবং সেটা অবশ্য আমার বয়েসের সঙ্গে খাপই খায়,' যুগপৎ *মামাভাগ্নে* ব্যাখ্যা করেছেন। তবে আসল কথাটা পাড়ি। নিজেদের পরিচয় দেবার পর আপনি নিশ্চয় আমাদের অনুমতি দেবেন আমাদের এই অনাহুত আগমনের উদ্দেশ্য কী—খুলে বলতে। মিস্ মোরনাস আর আমি—আমরা দুজনে অভিযাত্রী। আমার *মাসি-ভাগ্নি* এক ভয়ডরহীনা পর্যটক, আর আমি তার বাধ্য *মামা-ভাগ্নের* মতো আমাকে সারা পৃথিবীটায় টেনে-হিঁচড়ে বেড়াতে অনুমতি দিই তাকে। আমরা এই কোনাক্রিতে এসেই পা গুটিয়ে ব'সে থাকতে চাই না, আমরা অভ্যন্তরেও যেতে চাই, নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চাই। আমরা যাবো ব'লে প্রস্তুতিও নিয়েছিলুম, ঠিক যখন বেরিয়ে পড়বো তখন শুনতে পেলুম, যে আপনার নেতৃত্বে একটি অভিযাত্রী মিশনও ঠিক ঐ পথ ধ'রেই যাবে। আমি মিস্ মোরনাসকে তখন বলেছি অজানা-অচেনা বিদেশবিভুঁয়ে সঙ্গে আরো-লোক থাকলে ক্ষতি কী—আপনারা অনুমতি দিলে আমরা আপনাদের সঙ্গেই যেতে পারি। তাই আজ আপনার কাছে অনুমতি চাইতে এসেছি : অনুগ্রহ ক'রে আমাদেরও সঙ্গে যেতে দিন।'

'এমনিতে তো আপত্তির কোনোই কারণ দেখছি না,' বললেন বারজাক, 'তবে বুঝতেই তো পারছেন, আমার সহযোগীদের সঙ্গে একবার কথা ব'লে নেয়া উচিত।'

'হ্যাঁ, তা তো ঠিকই,' সায় দিয়েছেন সাঁৎ-বেরাঁ।

'তারা হয়তো ভয় পেয়ে বসবে যে সঙ্গে কোনো মহিলা থাকলে রাস্তাঘাটে অহেতুক দেরি হ'য়ে যাবে। তাতে আমরা যে-ক্রম স্থির করেছি, সেই অনুযায়ী হয়তো কাজ করতে পারবো না। তা যদি হয়...'

'তা নিয়ে কারুই চিন্তার কোনো কারণ নেই,' অজেনর মামা বাধা দিয়ে বললেন : 'মিস মোরনাস প্রায় পুরুষমানুষই—অন্তত পথে বেরুবার বেলায়। তিনি চাইবেন আপনারা তাঁকে লাজুক বা ললিতলবঙ্গলতা না-ভেবে আপনাদেরই একজন ব'লে ধ'রে নেবেন।'

জেন বললে, 'আর আমাদের যানবাহন সাজসরঞ্জাম নিয়েও আপনাদের আদৌ উত্ত্যক্ত হ'তে হবে না। আমাদের নিজেদের ঘোড়াও আছে, তল্পিবাহকও আছে। এমনকী



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুজন বাম্বারাও পেয়েছি আমরা, আগে সেনেগলে পথপ্রদর্শকের কাজ করতো, তারাই আমাদের গাইড আর দোভাষীর কাজ করবে। আপনাদের সঙ্গে আমাদের যেতে অনুমতি দিলে আমরা কোনো বাড়তি ঝামেলা করবো না...'

'হ্যাঁ, সে-ক্ষেত্রে অবিশ্যি,' আমতা-আমতা ক'রেই সায় দিলেন বারজাক, 'আমি সহযোগীদের সঙ্গে কথা ব'লে নেবো। কারু যদি কোনো আপত্তি না-থাকে, তাহ'লে তো কোনো আপত্তি নেই, আপনারা আমাদের সঙ্গেই যাবেন। তবে আমাদের সিদ্ধান্তের কথাটা আপনাদের জানাবো কখন?'

'কালকে, আপনারা যখন রওনা হবেন। সত্যি-বলতে এমনিতেই আমরা ঠিক ঐ সময়েই রওনা হ'য়ে পড়তুম।'

এই কথাই স্থির হ'লো। অভ্যাগতরা বিদায় নিয়ে গেলেন।

লাটসায়েবের নৈশভোজে অসংকোচেই কথাটা পেড়েছিলেন বারজাক, তাঁর সহযোগীদের কাছে। কারুই তাতে আপত্তির কিছু আছে ব'লে মনে হয়নি, শুধু বোদ্রিয়ের সন্দেহ প্রকাশ ক'রে একটু তা-না-না-না করেছিলেন। এমন সুন্দরী তরুণীর সঙ্গসুধা ছেড়ে দিতেও মন চাচ্ছিলো না—বারজাক নিশ্চয়ই গায়ে প'ড়ে আদিখ্যেতা করেছেন —তবে কোথায় যেন তাঁর একটু খটকা লাগছিলো, আড়ালে কিছু-একটা আছে যেন। এ-রকম একটা অভিযানে এত কষ্ট স'য়ে কোনো সুন্দরী তরুণী যাবে কেন? শুধু দেশ বেড়াবার জন্যে? উঁহু, এ-কৈফিয়ৎটা ঠিক গ্রাহ্য করা যায় না—তরুণীটি নিশ্চয়ই তার আসল-মৎলব ফাঁস করেনি। আর তাতেই কি মনে হয় না এর পেছনে একটা গূঢ় অভিসন্ধি আছে—হয়তো কোনো-একটা ফাঁদেই পা দেবেন তাঁরা, রাজি হ'লে। মন্ত্রিসভার সঙ্গে সংসদের সম্বন্ধ নিয়ে যা-সব গুজব রটছে, তার সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ নেই তো?

মুচকি হেসে, অন্যরা তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন।

'মঁসিয় দ্য সাঁৎ-বের্যাঁ অথবা মিস মোরনাস,' মঁসিয় বাল্‌দোন বলেছেন, 'কারু সঙ্গেই আমার কোনো পরিচয় নেই। তবে তাঁরা পক্ষকাল ধ'রে কোনাক্রিতে আছেন —পথে-ঘাটে তাঁদের সঙ্গে আমার দেখাও হয়েছে।'

'তাঁদের অন্তত একজনকে চোখে না-প'ড়ে যায় না,' বারজাক বেশ-জোর দিয়েই বলেছেন।

'হ্যাঁ, তরুণীটি পরমাসুন্দরীই বটে,' সায় দিয়েছেন মঁসিয় বাল্‌দোন, 'শুনেছি এঁরা সেনেগলের সাঁৎ সুইস থেকে এসেছেন, স্টীমারে ক'রে। শুনে কারু-কারু তাজ্জব মনে হ'তে পারে, তবে এঁরা নাকি দেশবিদেশ বেড়িয়েই আনন্দ পান—ঠিক যে-কথাটা তাঁরা বলেছেন মঁসিয় বারজাককে। তাঁরা সঙ্গে গেলে আমাদের কী অসুবিধে হ'তে পারে, সেইটেই আমার মাথায় ঢুকছে না।'

আর-কোনো আপত্তি ওঠেনি, অতএব তাঁদের সঙ্গে যেতে দেয়া হবে ব'লেই ঠিক



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে।

আর এইভাবে বারজাক মিশন তার অভিযানে জুটিয়েছে নতুন দুই রংরুট। সবশুদ্ধু তাহ'লে দশজন সদস্য মিশনের, যদি আমরা *ল্যাক্সপানসিয়ন ফ্রাঁসেঈর* বিশেষ সংবাদদাতা আমেদে ফ্লরেঁসকে হিশেবে ধরি—আমরা অবশ্য তল্পিবাহকদের বা সেপাইশান্ত্রীদের হিশেবে ধরছি না। পরের দিন সকালবেলায়, নিশ্চয়ই দৈবাৎই বলতে হবে, বারজাক যখন বিশালবর্তুল বপু নিয়ে হন্তদন্ত হ'য়ে মিস মোরনাসকে ঘোড়ায় উঠে বসাবার জন্যে ছুটেছেন, তখন উপনিবেশের পদাতিক বাহিনীর কাপ্তেন এবং এই অভিযানের অধিনায়ক পিয়ের মার্সেনে ক্ষিপ্রভাবে গিয়ে অভ্যস্ত ভঙ্গিমায় মিস মোরনাসকে সাহায্য করেছে।

'*আমিস সেদাৎ ইনসিনিয়ে*,' ধ্রুপদী লাতিন বচন তখন আউড়েছিলেন বারজাক, তবে যে-কেউ বুঝতে পারতো কাপ্তেন পিয়ের মার্সেনের আগ বাড়িয়ে হাত লাগাবার আদিখ্যেতাটা এই অভিযানের সরকার-অনুমোদিত নেতাটির আদপেই পছন্দ হয়নি।

## তিন

## গ্লেনর-এর লর্ড ব্লেজন

কত বছর যে কেটে গিয়েছে, লর্ড ব্লেজন একবারের জন্যেও বাড়ির বাইরে পা দেননি। ইংলণ্ডের একেবারে বুকের মাঝখানে উটোক্সেটার নামে ছোট্ট শহরের কাছে তাঁর গ্লেনর কাসল, সেখানেই তিনি থাকেন; আজ কত বছর হ'লো তার দরজা একবারও কোনো অভ্যাগতের জন্যে খোলেনি; অনেক বছর হ'য়ে গেছে তাঁর নিজের ঘরের জানলাগুলো শেষবার শক্ত ক'রে আটকানো হয়েছে। তাঁর নির্জনবাস চূড়ান্তই বলা যায়, একেবারে চরমে পৌঁছেছে তাঁর একাকিত্ব—সেই-সেদিন তাঁর বংশের মুখে চুনকালি পড়েছে, তাঁর নামে ঢি-ঢি প'ড়ে গিয়েছে, তাঁর জীবনটাই প্রায় ধ্বংস ক'রে দিয়েছে কেলেঙ্কারিটা, ঠিক সেদিন-থেকেই-এরকম।

ষাট বছরেরও আগে, লর্ড ব্লেজন, রয়্যাল নেভাল অ্যাকাডেমি থেকে সদ্য পাশ ক'রে বেরিয়ে সদর দরজা দিয়েই সগর্বে ঢুকেছিলেন বয়োপ্রাপ্তদের জীবনে; পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে তিনি উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন অগাধ ধনসম্পদ, নিষ্কলঙ্ক বংশগৌরব আর সারা ইংলণ্ড-জোড়া খ্যাতি। সত্যি-বলতে, ইংলণ্ডের ইতিহাসের সঙ্গেই ব্লেজন বংশের কালপঞ্জি জড়ানো ছিলো—ইংলণ্ডের জন্যে অঝোরধারে রক্ত ঝরিয়েছেন তাঁর পূর্বপরুষ। *স্বদেশ* কথাটা জাতীয়তাবাদের গৌরবের সঙ্গে তখনও জড়িয়ে যায়নি,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এই পরিবারের প্রতিটি পুরুষের হৃদয়পটে এই *স্বাদেশিকতা* গভীর ছাপ ফেলে গিয়েছে; নর্ম্যান বিজয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই এসেছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ, শুধু তরবারি নিয়েই বেঁচেছিলেন, এই অসিকে তাঁরা ব্যবহার করেছিলেন দেশের সেবায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী গেছে, একবারের জন্যেও এই বংশের গৌরবগাথায় কোনো আঁচড়ই পড়েনি, কোনো দাগই লাগেনি কলঙ্কের।

এডওয়ার্ড অ্যালান ব্রেজন সেই বিখ্যাত পরিবারেরই সুযোগ্য উত্তরপুরুষ। পূর্বপুরুষদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন তিনি, দেশসেবা ছাড়া আর-কিছু যে করণীয় আছে তা কখনও ভাবেননি, বংশের মর্যাদায় কোনোরকম দাগ লাগুক এমন-কোনো কাজও কখনও করেননি।

পূর্বগানুকৃতি, বংশধারা অথবা অন্য যে-কোনো নামই দেয়া হোক না কেন তার, যে-প্রক্রিয়া বলে পুত্র তার পিতারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তা কিন্তু এই স্বদেশবোধ তাঁর মধ্যে সংক্রমিত করেনি, বরং যে-বিদ্যাভ্যাস তিনি করেছিলেন সেটাই তাঁর মধ্যে এই বোধ দীপিত ক'রে দিয়েছে। ইংলণ্ডের ইতিহাস তাঁর পূর্বপুরুষের গৌরবগাথায় ভরা, আর তা-ই তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিলো : তাঁদের মতো তো বটেই, পারলে তাঁদের চাইতেও ভালোভাবে দেশসেবা ক'রে তিনি কৃতার্থ হ'তে চেয়েছিলেন।

বাইশ বছর বয়েসে বিয়ে করেছিলেন ইংলণ্ডের প্রথম-পরিবারগুলোর অন্তর্ভূত একটি তরুণীকে, আর বিয়ের একবছর পরেই একটি কন্যা জন্মেছিলো তাঁদের। একটু নিরাশই হয়েছিলেন লর্ড ব্রেজন, অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলেন কবে তাঁর দ্বিতীয় সন্তান জন্মায়!

সেই অপেক্ষা বিস্তৃত হয়েছে কুড়ি বছরব্যাপী। শুধু এত-বছর বাদেই লেডি ব্রেজন —কন্যার জন্মের সময় তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিলো—তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন সেই পুত্রসন্তান, যার জন্যে এতদিন ধ'রে সাগ্রহে তিনি কামনা ক'রে এসেছেন। ছেলের নাম দেয়া হয় জর্জ; ঠিক প্রায় সেই সময়েই তাঁর কন্যা—তাঁর বিয়ে হয় মঁসিয় দ্য সাঁৎ-বের্ঁ্যা নামে একজন ফরাশির সঙ্গে—পৃথিবীতে নিয়ে আসেন তাঁর পুত্রসন্তান, যার নাম অজেনর। এই সেই অজেনর, যে চল্লিশ বছর বাদে, হঠাৎ এমন বিস্ময়করভাবে আবির্ভূত হয়েছিলো ফ্রান্সের সাংসদ মঁসিয় বারজাকের কাছে।

পাঁচ বছর বাদে, আরো-একটি ছেলে হ'লো লর্ড ব্রেজনের : লুইস রবার্ট, যে-পঁয়ত্রিশ বছর বাদে—দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে?—অমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিলো সেনট্রাল ব্যাঙ্কের ডাকাতিতে।

বংশের ধারা অব্যাহত রাখার জন্যে এই দ্বিতীয় পুত্রসন্তানের জন্ম অপরিসীম সৌভাগ্যের সঙ্গে-সঙ্গে প্রচণ্ড মারাত্মক একটি আঘাত হেনেছিলো। শিশুর জন্ম দিতে গিয়ে জননীর মৃত্যু হ'লো; লর্ড ব্রেজনের এতদিনের সুখদুঃখের সাথী প্রিয়তমা পত্নীর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকস্মিক বিয়োগ, অমন-নিষ্ঠুর দুর্বিপাকে, লর্ড ব্রেজন যেন, বেটাল, মুখ থুবড়ে প্রড়েছিলেন। বুক ভেঙে গিয়েছিলো তাঁর, দুঃখে জর্জর বোধ করেছিলেন, কাজে আর মন লাগেনি, নৌবাহিনীর পদটায় তিনি ইস্তফা দেন—অথচ আর-কিছুদিন নৌবাহিনীতে থাকলে তিনি সম্ভবত নৌসেনাপতির পদে ভূষিত হতেন।

পত্নীর মৃত্যুর পর অনেকদিন কেমন যেন গুটিয়ে গিয়েছিলেন তিনি নিজের মধ্যে। তারপর সময় যখন শোকের তীব্রতা একটু হ্রাস ক'রে দিয়েছে, ন-বছর নিঃসঙ্গ কাটাবার পর, তিনি আবার তাঁর ভেঙে-পড়া গৃহস্থালিতে নতুন ক'রে জোড়াতালি দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরই এক পরম বন্ধুর বিধবা পত্নী মার্গারিট ফেরনেকে বিয়ে করেছিলেন তিনি, আর তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী সঙ্গে যৌতুক এনেছিলো শুধু ষোলো বছরের একটি ছেলে, তার নাম উইলিয়াম।

নিয়তি কিন্তু ঠিক ক'রে রেখেছিলো যে লর্ড গ্লেনর একা-একাই বৃদ্ধ ও জরাকবলিত হ'য়ে পড়বেন, জীবনের শেষদিনগুলো তাঁকে নিঃসঙ্গই কাটাতে হবে। কয়েক বছর বাদে, চতুর্থ একটি সন্তান জন্মালো তাঁর, মেয়ে এবার, তার নাম জেন, এবং জীবনে দ্বিতীয়বার তিনি বিপত্নীক হলেন।

লর্ড গ্লেনরের বয়েস তখন ষাট, এই বয়েসে আবার নতুন ক'রে জীবন গড়ার কোনো আশাই তাঁর ছিলো না। প্রেমপ্রীতিভালোবাসার ব্যাপারে দু-বার এমন প্রচণ্ড ঘা খেয়ে, তিনি পিতা হিশাবে তাঁর কর্তব্যপালনেই পুরোপুরি সমর্পণ ক'রে দিলেন নিজেকে। যদিও তাঁর প্রথমা কন্যা—এখন মাদাম দ্য সাঁৎ-বেরাঁ—অনেকদিনই পরের ঘরনি, তাঁর কিছু দেখাশুনো করার নেই; কিন্তু এখন চার-চারজন সন্তান আছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়োটির বয়েস সদ্য কুড়ি ছুঁয়েছে। তিনি কোনোদিনই উইলিয়ামের সঙ্গে তাঁর নিজের ঔরসজাত সন্তানদের পৃথক ক'রে দ্যাখেননি। কিন্তু নিয়তি তো তাঁর নাগাল ছাড়েনি। এবার লর্ড গ্লেনরকে এমন-একটা শোকেতাপে জর্জরিত হ'তে হবে যার তুলনায় মনে হবে আগের দুঃখগুলো যেন কিছুই-না।

ভবিষ্যৎ তাঁর জন্যে প্রথম যে-আঘাতটা তুলে রেখেছিলো তা কিন্তু সরাসরি এসেছিলো উইলিয়াম ফেরনের কাছ থেকে, তাঁর পরলোকগতা পত্নীর পুত্রসন্তান, যাকে তিনি নিজের ছেলের মতোই মানুষ করতে চাচ্ছিলেন। ধূর্ত, ধান্দাবাজ, খানিকটা ভণ্ডও বটে, উইলিয়াম কিন্তু তাঁর স্নেহে ঠিকমতো সাড়া দিতে পারেনি, আর কি-রকম সারাক্ষণ একাচোরা হ'য়েই কাটিয়েছে এই পরিবারে। উদাসীন, মনমরা, আর কেমনতর যেন রূঢ়ভাষী—যতই তাকে কাছে ডাকা যাক না কেন, ততই সে দূরে স'রে গেছে; যতই তাকে প্রীতি দেখানো যাক, ততই সে ঘৃণা পোষণ করেছে গোটা ব্রেজন পরিবারের প্রতিই।

অসূয়া, মাৎসর্য, ঈর্ষা, হিংস্র-বিদ্বেষ—সারাক্ষণ তার বুকটা কুরে-কুরে খেয়েছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেদিন সে তার মায়ের সঙ্গে এই বিশাল গ্লেনর কাস্‌লে এসে ঢুকেছে, সেদিন থেকেই সকলের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ অনুভব ক'রে এসেছে সে। তার অন্য দুই ভাইয়ের সঙ্গে নিজের পার্থক্যটা নিয়ে ভেবে-ভেবে তার মাথাটাই বুঝি গেছে—জর্জ আর লুইসের প্রতি দুঃসহ একটা ঘৃণাই বোধ করেছে সে অবিরাম : এরা বড়োলোক হবে, এরাই লর্ড ব্লেজনের উত্তরাধিকারী; আর সে—মার্গারিট ফেরনের ছেলে—সম্পত্তির কিছুই পাবে না। এবং তার পরেই যখন তার সৎ-বোন জেন-এর জন্ম হ'লো তাঁর ঘৃণা ও বিদ্বেষ গিয়ে পৌঁছুলো চরমে। কারণ সেও—জেনও—এই অগাধ ধনসম্পদের একটা অংশ পাবে, অথচ সে-ই রবে একমাত্র বঞ্চিত। শুধু দান হিশেবে সামান্য দু-চার পেনি হয়তো পাবে, ব্বাস, আর-কিছু না! তারপর যে-ই তার মায়ের মৃত্যু হ'লো, যতটুকু বোধবুদ্ধি তার অবশিষ্ট ছিলো, তাও গেলো : তার অসুস্থ হৃদয়টায় হয়তো তার মা-ই কোনোরকমে ঢুকতে পারতেন। কিছুই তাকে শান্ত করতে পারে না আর, জর্জ আর লুইসের ভাই-বেরাদরিও না, লর্ড ব্লেজনের অপত্য-স্নেহও না। দিনের পর দিন সে গুটিয়ে গেছে নিজের আরো-ভেতরে। এমন-এক জীবনযাপন করতে শুরু করেছে যার গুপ্তরহস্য কেবল একের পর এক কেলেঙ্কারিতেই একটু যা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। শোনা গেছে, সে অসৎসংসর্গে পড়েছে, বদলোকের পাল্লায়।

তার সব বাড়াবাড়ির খবরই গুজবের আকারে পল্লবিত হ'য়ে একদিন লর্ড ব্লেজনের কানে গিয়ে পৌঁছুলো : মিথ্যেই তিনি সদুপদেশ ও ভর্ৎসনা দিয়ে তাকে শোধরাবার চেষ্টা করলেন। তাঁর স্ত্রীর স্মৃতিতে অ্যাদ্দিন তিনি তার সব ধার-দেনাই শোধ ক'রে আসছিলেন, কিন্তু এবার তার পরিমাণ এতই ফেঁপে গেলো যে তিনি ঠিক করলেন একে আর একটি ফার্দিংও দেবেন না। শুধু-একটা মাসোহারা দেবেন তাকে, তাতে তার মতো যুবকদের হেসেখেলেই চ'লে যাবার কথা। কিন্তু তারপরেও উইলিয়াম ফেরনে তার জীবনযাপনের ভঙ্গিমা এতটুকুও পালটালো না। এত টাকা সে পায় কোত্থেকে এটাই ছিলো পরম রহস্য, কিন্তু একদিন-যখন লর্ড গ্লেনরের সামনে ব্যাঙ্ক থেকে মোটা-অঙ্কের একটা হুণ্ডি পাঠালো, যাতে চমৎকার কৌশলে কেউ তাঁর সই হুবহু জাল করেছে, তখন সমস্ত রহস্যটাই ফাঁস হ'য়ে গেলো।

বিনাবাক্যব্যয়ে লর্ড ব্লেজন সে-টাকাটাও শোধ ক'রে দিলেন। কিন্তু কোনো জালিয়াৎকে সহ্য করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হ'লো, ফেরেব্বাজ ব'লে গালাগাল দিয়ে নিজের চোখের সামনে থেকে তাকে তিনি বার ক'রে দিলেন; বললেন তিনি তাঁর মুখটিও দেখতে চান না—তবে তাকে তিনি এই মাসোহারাটা দিয়েই যাবেন। উইলিয়াম ফেরনে যথারীতি, ধান্দাবাজের মতো, মাথা নিচু ক'রে সব তিরস্কার-ভর্ৎসনা শুনলো, তারপর কথাটি না-ব'লে, তার নতুন মাসোহারার প্রথম কিস্তিটা স্পর্শ না-ক'রেই, সে গ্লেনর কাস্‌ল ছেড়ে চ'লে গেলো—তারপর থেকে তার আর কোনো পাত্তাই পাওয়া যায়নি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে যে তার কী হয়েছিলো, লর্ড ব্রেজন তার কিছুই জানতে পারেননি কোনোদিন। তার কাছ থেকে কোনো সাড়াই আর পাওয়া যায়নি, তারপর আস্তে-আস্তে সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে এই বেদনাদায়ক স্মৃতিও মিলিয়ে গেলো।

উইলিয়াম তাঁকে যতটা জ্বালিয়েছে, জর্জ আর লুইস কিন্তু সে-রকম কিছুই করেনি, বরং তাদের আচারব্যবহার তাঁকে সন্তোষই দিয়েছে চিরকাল। জর্জ গিয়ে বংশের ধারা অক্ষুণ্ন রেখেই নাম লিখিয়েছে রয়্যাল মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে, সেখান থেকে সসম্মানে উত্তীর্ণ হ'য়ে সমরবাহিনীতে কাজ নিয়ে উপনিবেশে চ'লে গিয়েছে অ্যাডভেনচারের খোঁজে। লর্ড ব্রেজনের দুঃখ এটাই যে তাঁর ছোটোছেলেটির কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহে কোনোই আসক্তি নেই, যদিও নিজের নির্বাচিত বিষয়ে সে যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে —তার অটুট কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততার প্রতি যে-কেউই নির্ভর করতে পারতো।

উইলিয়াম আচমকা অন্তর্হিত হ'য়ে যাবার পর থেকে দুই ভাইয়ের জীবন স্বাভাবিকভাবেই কেটেছে। লুইসের প্রখর বুদ্ধি খেলে ব্যাবসায়; সেনট্রাল ব্যাঙ্কে চাকরি নিয়ে কর্মদক্ষতা দেখিয়ে সে অচিরেই ধাপে-ধাপে উঠে গেছে ওপরে—লোকে এটাই আশা করেছে যে একদিন সে এই ব্যাঙ্কেরই ডিরেক্টার হ'য়ে বসবে। জর্জ এই উপনিবেশ থেকে ঐ উপনিবেশে বদলি হয়েছে, আর মসীর বদলে দক্ষতার ছাপ রেখেছে অসিতে, আর ধাপে-ধাপে তারও উন্নতি হয়েছে ক্রমশ।

লর্ড ব্রেজন এ-সব দেখেশুনে ভাবতেই পারতেন বিরূপ নিয়তি বুঝি অবশেষে তাঁর ওপর থেকে তার কুদৃষ্টি সরিয়েছে, মনশ্চক্ষুতে তিনি বৃদ্ধ বয়েসের সুখসৌভাগ্যের ছবিই দেখছিলেন। আর তারপরেই এসেছে সবচেয়ে-মারাত্মক আঘাত, এর আগে যত ঘা খেয়েছেন তাদের চেয়ে অনেক-ভয়ানক—প্রায় যেন করাল এই ঘা, তাঁকে একেবারে পেড়ে ফেললো। শুধু যে নিদারুণ মর্মযন্ত্রণাই জুটেছে তা নয়, বংশের মুখে অনপনেয় চুনকালি পড়েছে। আজও, এতদিন পরেও, সেই ভয়ংকর অপনাট্যের দৃশ্য ভাসে চোখে, যাতে প্রধান ভূমিকা ছিলো তাঁরই জ্যেষ্ঠপুত্রের। কে জানতো যে গ্লেনর কাস্‌লের গৌরব দেশদ্রোহিতার কালিমায় এমনভাবে কলঙ্কিত হ'য়ে উঠবে।

জর্জ ব্রেজন সমরবাহিনীর সুপারিশে, একটা কম্পানির দায়িত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলো : এই কম্পানির কাজ ছিলো আফ্রিকায় জরুরি সমস্ত সন্ধানী অভিযান চালানো। দু-বছর ধ'রে তার কর্মদক্ষতায় কম্পানির নানাভাবেই উন্নতি হয়েছিলো, কেননা সে-ই ছিলো মোটামুটি সংঘবদ্ধ একটি সমিতির প্রধান। সে যখন আশান্তিতে, তখন হঠাৎ খবর এলো সে নাকি একটা মস্ত ডিগবাজি খেয়ে নিজের দেশের বিরুদ্ধেই প্রকাশ্যে বিদ্রোহে নেমেছে।

খবরটা এলো যেন বজ্রাঘাতের মতো নিদারুণ—শুধু-যে তার বিদ্রোহেরই খবর তা-ই নয়, তার অনিবার্য শাস্তিরও খবর। খবরে প্রকাশ পেলো, কাপ্তেন ব্রেজন যে শুধু



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাই করেছে তা নয়—তার দলবল নিয়ে সে একটা দুর্ধর্ষ দস্যুদল গ'ড়ে তুলেছে, তাদের লুঠতরাজের কাহিনী, নৃশংসতার কাহিনী, তাদের অন্যায় অবিচার ও অত্যাচারের কাহিনী ফলাও ক'রে বেরুলো সব কাগজে—আর এলো কী-রকম কঠোরভাবে ক-দিনের মধ্যেই এই বিদ্রোহকে দমন করা হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে কোনো রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মতো কিস্তিতে-কিস্তিতে বেরিয়েছিলো জর্জ ব্লেজনের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী। দিনের পর দিন তারা ছাপিয়েছে দস্যুদল পর-পর কী-সব অপকর্ম করছে, কেমনভাবে তাদের পেছনে ফেউয়ের মতো লেগে থেকেছে সামরিক বাহিনী, আর কী-ক'রেই বা পিছু হঠতে-হঠতে দস্যুর দল একেবারে কোণঠাশা হ'য়ে পড়েছে। শেষটায় নাকি কাপ্তেন ব্লেজন তার কয়েকজন কুকর্মের সাথী নিয়ে ঢুকে পড়েছে ফরাশি সাম্রাজ্যের মধ্যে, শেষটায় কুবোর কাছে, ওম্বরি পাহাড়ের তলায় তাদের নাগাল পেয়েছে পল্টন, আর কীভাবেই-বা প্রথমঝাঁক গুলির ঘায়ে সে মারা গেছে। পল্টনের যে-অফিসার তার মৃত্যুর জন্যে দায়ী, পরে সেও মারা গেছে জ্বরে; মৃত্যুর আগে যে-সাজা সে দিয়ে গেছে জর্জ ব্লেজনকে, তা ছিলো অমোঘ, ক্ষিপ্র, আর মরণান্তিক। পরে অবশ্য অন্য-সব রগরগে ঘটনার মাঝখানে এই নিদারুণ কাহিনীটি চাপা প'ড়ে যায়, লোকে ভুলেও যায় তার কথা, কিন্তু শুধু-একজন ভোলেননি—তিনি লর্ড ব্লেজন।

ছেলেকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন, কিন্তু তাঁর কাছে প্রাণাধিক-প্রিয় ছিলো গ্লেনর কাস্‌লের গৌরব—দু-দিক থেকেই নিদারুণ ঘা খেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু, প্রকাশ্যে, তাঁর বিবর্ণ মুখচ্ছবি দেখেও বোঝা যেতো না তার অন্তরের অন্তস্তলে কী ভয়ংকর টানাপোড়েন চলেছে। কোনো প্রশ্ন তিনি জিগেস করেননি, কথাটি পর্যন্ত বলেননি তিনি এই অসহ্য বিষয় নিয়ে, শুধু বিষম-এক নির্জনতা আর অবর্ণনীয় স্তব্ধতায় নিজেকে মুড়ে নিয়েছেন। সেদিন থেকে আর-কেউ তাঁকে দ্যাখেনি তাঁর দৈনিক পদভ্রমণে; সেদিন থেকে তাঁর বাড়িতে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ও পুরোনো বন্ধুদেরও আনাগোনা নিষেধ ক'রে দিয়েছেন তিনি, সারাক্ষণ থেকেছেন প্রায় অনড়ই যেন, স্তব্ধ, নিশ্চল, নিঃসঙ্গ।

*নিঃসঙ্গ?* না, পুরোপুরি সঙ্গীসাথীহীন হয়তো নয়। শুধু-তিনজন পালা ক'রে তাঁর সঙ্গে থাকতো; জীবন্ত প্রস্তরমূর্তির মতো যে-ভয়াবহ অস্তিত্ব তিনি নিজের জন্যে বেছে নিয়েছেন, তারও মধ্যে এই তিনজনে তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করার মতো গুণ খুঁজে পেতো। নিজের মধ্যে এমনভাবে গুটিয়ে যেতেও অসীম সাহস লাগে; প্রচণ্ড মনের জোর লাগে নিজের জীবদ্দশাতেই অমনভাবে প্রেতের মতো হ'য়ে যেতে; আর এই-তিনজনে তাঁর এই মনের জোর, তাঁর দাপট, তাঁর এই সাহসকেই শ্রদ্ধাভক্তি করতো।

প্রথম জন হ'লো তাঁর দ্বিতীয় ছেলে লুইস রবার্ট ব্লেজন, এমন সপ্তাহ যেতো না যে-সপ্তাহে সে অন্তত একটা গোটা দিন বাবার কাছাকাছি গ্লেনর কাস্‌লে কাটায়নি।

আর ছিলো তাঁর নাতি—অজেনর দ্য সাঁৎ-বের্ঁ্যা, বাড়ির এই দমবন্ধ আবহাওয়াকে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে তার দিলখোলা হাসি আর হুল্লোড় দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইতো। যখন এই অবিশ্বাস্য দেশদ্রোহিতার দায়ে জর্জ ব্রেজনের নামে চারপাশে ছি-ছি প'ড়ে গিয়েছিলো, যখন তার আর্দালি পর-পর অনেকগুলো চিঠিতে তার অপকীর্তির বিবরণ দিয়ে ধিক্কার জানাতো, তখনও অজেনরের মনে হয়েছে কোথায় যেন একটা রহস্য আছে, একটা প্রহেলিকা, একটা সমাধানহীন ধাঁধাই বুঝি, জর্জ ব্রেজন এমন করতেই পারে না : তখনও সে সবসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, নিজে এসে তার মাতামহের পাশে দাঁড়িয়েছে. কোনো কাজে লাগতে পারলে যেন ব'র্তে যায়, তার আনুগত্যে কোথাও কোনো চিড় ধরেনি। অন্যদের সঙ্গে অবশ্য তার তফাৎও ছিলো—অন্তত তিনটে বিষয়ে সে সাধারণ কোনো লোকের চাইতে আলাদা : তার ছিলো এক অবিশ্বাস্য ভুলোমন; সমস্ত সীমা পেরিয়ে-যাওয়া নেশা—ছিপ ফেলে মাছ ধরবার জন্যে সে যেন সবকিছুই করতে পারে; আর সর্বোপরি, নারীসঙ্গ সম্বন্ধে তার ছিলো তীব্র অনীহা—অনীহা নয়, বিতৃষ্ণাই বুঝি। তার বাবা-মার কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিশেবে বিস্তর টাকা পেয়েছে, তা-ই সে স্বাধীনভাবেই জীবনযাপন করতে পারে—কারু গোলামিও করতে হয় না, অন্য-কারু কাছে হাতও পাততে হয় না। ফলে জর্জ ব্রেজনের খবরটা শোনবামাত্র ফ্রান্স ছেড়ে সে চ'লে এসেছে এখানে, গ্লেনর কাস্‌লের কাছে একটা ভিলাতেই দিন কাটায় সে সেই থেকে।

এই ভিলার বাগানের পাশ দিয়ে গেছে স্বচ্ছতোয়া এক ছোটোনদী—আর তাতেই সারাক্ষণ সে ছিপ ফেলে ব'সে থাকে। কী ক'রে যে কেউ অমনভাবে ফাৎনার দিকে অনিমেষ লোচনে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে থাকতে পারে, তা দেবতারাও বোধহয় জানেন না, মানুষ তো কোন ছার! অথচ তার এই নেশার কোনোই মাথামুণ্ডু নেই। কেননা ফাৎনার দিকে ওভাবে অপলকে তাকিয়ে ব'সে থাকবার সময় তার মন কিন্তু প'ড়ে থাকে অন্যসব বিচিত্র বিষয়ে। যদি কোনো মাছ বঁড়শিতে গেঁথেও যেতো, কোনো বারবেল, বা রোচ বা পাইক, তবে সে হয়তো তার কাছে ক্ষমাটমা চেয়ে তাকে আবার নদীতে ছেড়ে দিতো—কেননা ককখনো সে এমনকী খেয়াল ক'রেও দ্যাখেনি তার এত সাধের টোপ কোনো কাজে লেগেছে কি না!

অদ্ভুত নেশা— এই মাছধরার রহস্যময় বাতিক। তবে তাও না-হয় ব্যাখ্যা করা যায় বড়োলোকের দুলালের খামখেয়াল হিশেবে, কিন্তু কী ক'রে কেউ ব্যাখ্যা করবে এমন তীব্র নারীবিদ্বেষ কেন তার। যে-ই পাঁচ মিনিট শুনতে চাইবে তাদের কাছেই সে হাত-পা নেড়ে ব্যাখ্যানা দেবে কেন সে মেয়েদের এত অপছন্দ করে। পৃথিবীর যত দোষ, যত ঝামেলা, যত গণ্ডগোল—সবকিছুর মূলে নাকি মেয়েরাই। 'মোহিনী প্রতারক, বিশ্বাসঘাতিনী, অনৃতভাষিণী এবং উড়নচণ্ডী, টাকাকড়ি সব নয়ছয় ক'রে উড়িয়ে দেয়—' এইভাবেই সে বর্ণনা করে মেয়েদের, সেই সঙ্গে আরো-যে কত থাকে অভিধা, লক্ষণা, ব্যঙ্গার্থ! কেউ যখন তাকে একবার বিয়ে করতে বলেছিলো, সে ব'লে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠেছিলো : 'কে বিয়ে করবে? *আমি*? আমি গিয়ে সম্পর্ক পাতাবো ও-রকম কোনো বিশ্বাসহন্ত্রী দস্যুনেত্রীর সঙ্গে!' তারপরেও যদি কেউ নাছোড়ভাবে তাকে চাপ দেয়, তবে সে বলবে : 'মেয়েদের ভালোবাসায় বাপু আমার কোনো বিশ্বাস নেই—আমার কবরে যদি কখনও কাউকে দুঃখেশোকে পাগলিনী হ'য়ে ম'রে যেতে দেখি, তবেই আমার এই মত পালটাবো।' কিন্তু এ-রকমটা ঘটা যেহেতু আদৌ সম্ভবপর নয়, তাতে মনে হয় সে হয়তো চিরকুমারই থেকে যাবে।

সুন্দরীদের প্রতি তার এই অহেতুক বিতৃষ্ণার অবশ্য একটা ব্যতিক্রম ছিলো—ব্যতিক্রমটি জেন ব্রেজন, গ্লেনরের লর্ডের শেষ সন্তান, আর সে-হিশেবে অজেনরের মাসি—তবে এই মাসি তার চাইতে পনেরো বছরের ছোটো, যাকে সে শৈশব থেকে চেনে, যাকে সে হাতে ধ'রে-ধ'রে হাঁটতে শিখিয়েছে, আর যে-মুহূর্তে তার বাবা জগৎসংসার পরিত্যাগ ক'রে নিজের অকথ্য দুঃখের ভেতর গুটিয়ে গেছেন, সেই মুহূর্তেই সে এই বালিকার স্বনিযুক্ত অভিভাবকের পদে নিজেকে বসিয়ে দিয়েছে। প্রায় পিতৃস্নেহই সে অনুভব করে এই বালিকার প্রতি—আর সেই গভীর স্নেহের প্রতিদানও সে পায় জেনের কাছ থেকে, জেন তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, বোধহয় এই খ্যাপাটে ভাগ্নেটির জন্যে ভেতরে কোথাও একটা মমতার বোধও লুকিয়ে আছে তার। এমনিতে সবাই জানে যে অজেনর হ'লো জেনের শিক্ষক—কিন্তু এমন গুরু যিনি প্রাণপণে চেষ্টা ক'রে চলেছেন তাঁর শিষ্যাটিরই চেলা হ'য়ে যেতে। প্রায় কখনোই পরস্পরের কাছছাড়া হয় না তারা। ঘুরতেও বেরোয় একসঙ্গে, ঘুরে বেড়ায় বনেবাদাড়ে, পদব্রজে অথবা অশ্বপৃষ্ঠে, নৌকোয় ক'রে অথবা কোচগাড়িতে, শিকারে যায়—তাড়া ক'রে যায় বুনো হাঁস বা বনমোরগ, আর শেষটায় একদিন বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয়টি ব'লে বসে তার বয়োকনিষ্ঠা মাতৃস্বসা সম্বন্ধে যে তাকে সে কেবল ডানপিটে ক'রেই তুলবে না, একেবারে *সেরা পুরুষই* বানিয়ে ছাড়বে—তার *পৌরুষ* দেখে নাকি একদিন সকলেরই তাক লেগে যাবে!

জেন ব্রেজনই হ'লো সেই তৃতীয়জন, লর্ড গ্লেনরের জন্যে যার শ্রদ্ধা ও মমতার কোনো অন্ত নেই, প্রায় যেন মায়ের মতোই সে তার বৃদ্ধ বাপের এই শোচনীয় দশায় দেখাশুনো করে। তাঁর মুখে একটু হাসি ফোটাবার জন্যে সে হয়তো নিজের জীবনটাই বিসর্জন দিয়ে দিতে পারতো; যে-ক'রেই হোক বাবার এই তিক্তদীর্ণ হৃদয়ে এতটুকু সুখ এনে দেবার জন্যে হেন কাজ নেই যা সে করতে পারবে না। সারাক্ষণ কেবল এই এক চিন্তা তার সব কাজকর্ম আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। সে গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছিলো তাঁর বাবা তাঁর নিজের ছেলের এই দুর্ভাগা পরিণামের জন্যে ভেতরে-ভেতরে কাঁদছেন না, কেননা তার কলঙ্কিত জীবনে এই শোচনীয় শাস্তিই তার প্রাপ্য ছিলো—যার মানইজ্জৎ সব গেছে তার আর বেঁচে থেকে লাভ কী। অথচ তবু তিনি কাঁদছেন—হয়তো ব্রেজন বংশের মুখে অনপনেয় কালি লেগেছে ব'লে। সে নিজে কিন্তু কখনও কাঁদেনি, আড়ালেও



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, নিজের কাছেও না। তার মানে এই নয় যে যাকে সে গভীর ভালোবাসতো, সেই দাদার অভাবটা সে অনুভব করতে পারে না—বাড়ির মানসম্ভ্রম যে সব গেছে, সেটাও তাকে কুরে-কুরে খায়। কিন্তু শোকের চাইতেও যেটা জোরালোভাবে তার মনের মধ্যে হানা দেয় সেটা এক প্রতিবাদের সুর। কী? লুইস আর তার বাবা কি না এত-সহজেই *শোনবামাত্র জর্জের কলঙ্ককাহিনী* বিশ্বাস ক'রে ব'সে আছেন? একবারও জানতে চেষ্টা করলেন না, এই কেলেঙ্কারিটা সত্যি কি না! কোনো অনুসন্ধান, কোনো তদন্তই করলেন না! সাতসাগর পার থেকে কতগুলো নালিশ এলো, আর *প্রমাণ বিনাই*, কিছুই খতিয়ে না-দেখে, সব মেনে নিলেন! সরকারি প্রতিবেদনের মূল্যই বা কী? এ-সব প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে, তথাকথিত সাক্ষ্যপ্রমাণের বিরুদ্ধে, জর্জের গোটা জীবনটাই তো দাঁড়িয়ে আছে! সে হবে কি না দেশদ্রোহী,— তার এমন চমৎকার দাদা, বীর, অকুতোভয়, দুর্জয় সাহসী; এত ভালো, এত সৎ, এত নিষ্কলঙ্ক, যার সারা জীবনটাই তো দেশাভিমান আর আনুগত্যের প্রোজ্জ্বল সাক্ষী—এ-যে অচিন্তনীয়! সারা জগৎ তাকে ছেড়ে যায় যাক, সে অন্তত তার স্মৃতিকে সম্মান করবে, দাদার ওপর বিশ্বাস তার কখনও হারাবে না। সেইজন্যেই শোকের চাইতেও তীব্র তার অভিমানের বোধ, তার রাগ। আর সময় বরং দিনে-দিনে তার সে-বিশ্বাস আরো জোরালো ক'রেই তুলেছে। দাদার নির্দোষিতায় তার আস্থা আরো বেড়েছে —অথচ, হায়-রে, যা তার এই নির্দোষিতা প্রতিষ্ঠিত করবে, তার প্রমাণ কই। অবশেষে সেই-মুহূর্ত এসেছে, ঘটনাটা ঘ'টে যাবার কয়েক বছর পর, যখন সে মরীয়া হ'য়ে বেপরোয়াভাবে সেই চরম স্তব্ধতাকে ভেঙেছে—মৌন ও অলিখিত কোনো সম্মতির দরুন কুবোর সেই শোচনীয় পরিণামের পর থেকে গ্লেনর কাসলের কেউই যে-স্তব্ধতাকে ভাঙতে সাহস পায়নি!

'মামা?' ভাগ্নে হ'লেও বয়েসে বড়ো ব'লে অজেনর সাঁৎ-বের্যাকে সে মামা ব'লেই ডাকে। আর অজেনরও একইভাবে সম্পর্কটাকে উলটে দিয়ে মাসিকে ডাকে ভাগ্নী ব'লে। তবে সবসময় তা হয় না অবশ্য... যদি এই তথাকথিত মাতুল কখনও এই ছদ্ম-ভাগিনেয়ীকে নালিশ করার কোনো কারণ জোগায়, অথবা অজেনর যদি কখনও তার কোনো ইচ্ছাপূরণে অসম্মতি জানায়—এমনকী তার কোনো খামখেয়ালে বাধা দেবার চেষ্টা করে, জেন তক্ষুনি তার সত্যিকার সম্পর্কটা নিয়ে হৈ-চৈ বাধিয়ে দেবে, তার *বোন-পোর* উচিত *বড়োদের* যথার্থ সম্মান করা, *মাসির* কথার বিরুদ্ধে না-যাওয়া? অবস্থা বুঝে, কুঁকড়ে গিয়ে, কাঁচুমাচু *বোন-পো* তার পরমা-শ্রদ্ধেয়া *মাসিমনির* কাছে গলা নামিয়ে আনে, হার মেনে নেয়, পারলে হাতে-পায়ে ধরে। সম্পর্কের এমনতর আকস্মিক ভিগবাজি মাঝে-মাঝেই চমকপ্রদ সমস্ত সংলাপের সূচনা ক'রে দেয়। যেমন, সেদিন জেন যখন ডেকেছে, 'মামা?', অজেনর বর্শেলের বিড়ম্বনা বিষয়ে একটি কেতাবে মুখ গুঁজেই অন্যমনস্কভাবে বলেছে, 'কী?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি জর্জ বিষয়ে কথা বলতে চাই।'

অজেনর এমনই চমকে গেছে যে অমনি কেতাবটা নামিয়ে রেখেছে। 'জর্জ বিষয়ে? একটু বিচলিত ও বিমূঢ়ভাবেই জিগেস করেছে, 'কোন্ জর্জ? কে জর্জ?'

ঠাণ্ডাভাবে জেন জানিয়েছে, 'আমার দাদা জর্জ।'

অজেনর কেমন মিইয়ে গেছে, ফ্যাকাশে। 'কিন্তু তুই তো জানিসই,' কাঁপাগলায় সে বলেছে, 'এ-বাড়িতে ঐ নাম মুখে-আনাও বারণ।'

জেন কেবল মাথা নেড়ে আপত্তিটাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে। 'তাতে কিছুই এসে-যায় না,' শান্ত গলায় সে বলেছে, 'জর্জ বিষয়ে আমাকে বলো, মামা।'

'কী জানতে চাস?'

'তার সম্বন্ধে সবকিছু—*সবকিছু*!'

'সে আমি কখনও বলতে পারবো না।'

জেন ভুরু কুঁচকেছে। '*বোন-পো*?' তার গলায় ঝড়ের পূর্বাভাস।

আর-কিছুই দরকার হয়নি।

'ঠিক আছে! ঠিক আছে!' তড়বড় ক'রে বলেছে অজেনর, আর তারপর সেই কাহন ফেঁদেছে, সেই বিষাদসিন্ধু। সব খুঁটিনাটি সমেতই বলেছে সে সেই শোচনীয় কাহিনী। জেন শুধু গালে হাত দিয়ে ব'সে চুপচাপ শুনেই গেছে, আর-কোনো প্রশ্নই করেনি। ব্যাপারটা চুকে গেছে ভেবে অজেনর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়েছে।

কিন্তু অজেনর ভুল ভেবে ছিলো। কয়েকদিন পর আবার এসে হানা দিয়েছে জেন।

'মামা?' আবার সে জিগেস করেছে একদিন।

'কী?'

'আচ্ছা, ধরো, জর্জ যদি দোষী না-হয়?'

অজেনর বুঝতে পারেনি নিজের কানটাকে তার বিশ্বাস করা উচিত কি না।

'দোষী না-হয়?' সে বলেছে, 'বলতে দুঃখ হচ্ছে, বাছা, এ-বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। হতভাগার অপরাধ এবং শাস্তি অর্থাৎ মৃত্যু—এ-সব হ'লো ঐতিহাসিক তথ্য—এ-বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকতেই পারে না।

'পারে না মানে?'

অজেনর *আবার* আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে বলেছে সব। উল্লেখ করেছে, খবরকাগজে কী-সব প্রতিবেদন বেরিয়েছে, সরকারি-সব প্রতিবেদন যার বিরুদ্ধে কোথাও কোনো প্রতিবাদ ওঠেনি। আর শেষটায় সে প্রমাণ হিশেবে দাখিল করেছে অভিযোক্তার অনুপস্থিতি—সে যে বেঁচে নেই এটা তারই তো অকাট্য প্রমাণ।

'হ্যাঁ, মৃত্যুর প্রমাণ হ'তে পারে বটে,' জেন পাকা আইনজীবীর মতো আপত্তি তুলেছে, 'কিন্তু তা তো আর তার দেশদ্রোহিতার প্রমাণ হ'তে পারে না!'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'একটা তো আরেকটারই ফল,' জেনের জেদ তাকে অবাক ক'রে দিয়েছে।

এই একগুঁয়েমি যে কতটা বদ্ধমূল, তা সে আন্দাজও করতে পারেনি। সে-দিন থেকে প্রায়ই জেন এসে ঐ অবাঞ্ছিত ও অরুচিকর প্রসঙ্গটা তুলেছে—জেরায়-জেরায় একেবারে জেরবার ক'রে দিয়েছে অজেনরকে। তা থেকে বেচারা অন্তত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, আজও জেনের মতে তার দাদা সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

এ-ব্যাপারটায়, অবশ্য, অজেনর নিজের মতটা আদপেই পালটায়নি। জেনের সেরা সব বিরুদ্ধযুক্তির সামনে শুধু কষ্ট-কষ্ট মুখ ক'রে তার মাথাটাই নেড়েছে—যেন এমনতর অপ্রয়োজনীয় তর্কে সে মোটেই আর অংশ নিতে চায় না । জেন বুঝতে পেরেছে যে তার এই *বোন-পোর* বিশ্বাসকে কিছুতেই আর নাড়ানো যাবে না। শেষটায় একদিন জেন তার ধৈর্য হারিয়ে প্রায় দাপিয়েছে যেন। আবার সে শুরু করেছে : 'মামা ?'

'কী ?' উত্তরও এসেছে যথারীতি।

'আমি ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবে দেখেছি, মামা, আর শেষটায় এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি যে, জর্জ সম্পূর্ণ নিরপরাধ।'

'কিন্তু, বাছা—' অজেনর শুধু শুরু করতে গিয়েছে, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে জেন তীব্রসুরে ব'লে উঠেছে, 'এর মধ্যে আর-কোনো *কিন্তু* নেই। জর্জ নিরপরাধ।'

'তবু—'

জেন উঠে দাঁড়িয়েছে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত। 'শোনো, *বোন-পো*, তোমাকে স্পষ্ট ক'রে বলি : *আমার দাদা জর্জ সম্পূর্ণ নিরপরাধ।*'

অজেনর তখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। বাধ্য ছেলের মতো বলেছে, 'তাহ'লে তাই হবে, *মাসি।*'

সেই থেকে জর্জের *নির্দোষিতা* স্বীকৃততথ্য হিশেবেই গণ্য হয়েছে, অজেনর দ্য সাঁৎ-বেরাঁ তা নিয়ে আর-কোনোই তর্ক তোলেনি। তাছাড়া, জেনের এই অনড় দৃঢ়বিশ্বাস তার মধ্যেও খানিকটা প্রভাব ফেলতে শুরু করেছিলো। অন্তত তার সম্বন্ধে অভিযোগগুলো সত্য কি না, সে-সম্বন্ধে বেশ খটকাই জাগতে শুরু করেছিলো তার।

পরের বছরগুলোয়, জেনের চিন্তা এমনদিকে বিকশিত হ'তে শুরু করেছিলো যাতে একফোঁটাও যুক্তিতর্কের বালাই ছিলো না। তর্ক ক'রে কি আর বিশ্বাস নাড়ানো যায় ? যুক্তিগর্ভ না-হ'তে পারে, তার বিশ্বাস হয়তো পুরোটাই আবেগের বশবর্তী, কিন্তু তবু তো তা বিশ্বাস। আর তাতে সহমত কাউকে পাওয়া তো সত্যি যেন হাতে-চাঁদ-পাওয়া। কিন্তু তাতেই বা কী এসে-যায় ? ঢাকঢোল পিটিয়েই না-হয় বলা গেলো যে *আমার দাদা নিরপরাধ*, কিন্তু যতক্ষণ-না তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করা যাচ্ছে ততক্ষণ এ-কথাটার কোনোই মানে নেই। শেষকালে, অনেক মাথা ঘামিয়ে, জেনের মনে হ'লো সে বুঝি এটা প্রমাণ করবার একটা উপায় খুঁজে পেয়েছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহ'লে এটা আমরা ধ'রে নিয়েছি,' একদিন সে অজেনরকে বলেছে, 'যে জর্জ সম্পূর্ণ নিরপরাধ?'

'হ্যাঁ, বাছা,' অজেনর মুখে যদিও কথাটা বলেছে, তবু সে ও-বিশ্বাসে পুরোপুরি নিশ্চিত হ'তে পারেনি।

'জর্জের প্রখর বুদ্ধি ছিলো, অত্যন্ত চালাক ছিলো সে,' দাদা সম্বন্ধে আরো ভেঙে বলেছে জেন, 'তার পক্ষে এমন হাঁদার মতো কিছু করা সম্ভবই ছিলো না। তাছাড়া নিজের সম্বন্ধে তার এতটাই অহংকার ছিলো যে তার পক্ষে এভাবে কাদায় গড়াগড়ি যাওয়া সম্ভব নয়। দেশকে সে এতটাই ভালোবাসতো যে খামকা হঠাৎ সে দেশদ্রোহিতা করতে যাবেই বা কেন?'

'সেটাও বোঝা যায়।'

'আমরা তো ওর সঙ্গে থেকেছি, দাদা কী ভাবতো না-ভাবতো সব আমি জানি, মানইজ্জৎ সম্বন্ধে ভারি সচেতন ছিলো সে, বাবাকে ছাড়া আর-কাউকেই সে অমন শ্রদ্ধাভক্তি করতো না, আর দেশের গৌরবের অংশীদার হওয়া ছাড়া আর-কোনো উচ্চাশাই তার ছিলো না। তারপরেও কি বিশ্বাস করা যায় যে সে আচমকা একদিন মানসম্মান সব জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে—দেশ আর বংশের মুখে চুনকালি মাখাবে? বলো, মামা, বলো—তুমি কি বিশ্বাস করো যে জর্জ কখনও দেশদ্রোহী হ'তে পারে?'

'*আমি*! আমি কিছুই ভাবতে চাই না, *মাসি*,' অজেনর সাফাই গেয়েছে, ভেবেছে *মাসি* ব'লে ডেকেই বুঝি জেনকে ঠাণ্ডা করা যাবে।

'অথচ তবু কি না তুমি জুলজুল ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে হাত-পা এলিয়ে গা ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছো? তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে অমন জঘন্য-কোনো ভাবনা জর্জের দুঃস্বপ্নেও হানা দিতে পারতো না! আর তা যদি বিশ্বাস করো, তবে বলো, মুখ ফুটে একবার বলো, আমার কর্ণযুগল সার্থক করি!'

'বলি তো, *মাসি*, আমি-তো ঐ কথাই বলি!'

'হুঁ, এবার অন্তত কিছু-একটা মুখ ফুটে বলেছো! তবে, যারা এই *অলীক কাব্যকাহিনী* বানিয়েছে, তারা হচ্ছে সত্যিকার হতভাগা—বদমায়েশের হদ্দ!'

'খলনায়ক সব! ফেরেব্বাজ!'

'তাদের সব ক-টাকে পাকড়ে হাজতে পোরা উচিত!'

'একশোবার! আর নয়তো ফাঁসিতেই লটকে দেয়া উচিত। একেবারেই সব ল্যাঠা চুকে যাবে।'

'সেইসঙ্গে খবরকাগজের ঐসব *নিজস্ব সংবাদদাতাদেরও* দাবড়ে দেয়া উচিত! তাদেরই মিথ্যা গালগল্প এমন বেইজ্জতি করেছে আমাদের!'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ, সব সংবাদদাতাকেই লটকে দেয়া উচিত ফাঁসিতে ! তাদের ফায়ারিংস্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে গুলি ক'রে মারা উচিত !'

'এ-বিষয়ে তোমার আর-কোনো সংশয় নেই তো ?'

'মোটেই না ! একফোঁটাও না !'

'বেশ, আমি শুধু জেনে নিতে চাচ্ছিলুম তোমার কোনো খটকা আছে কি না !'

'আমি তো স্বপ্নেও ককখনো...'

'বেশ ! তা যদি না-হ'তো তবে আমি তোমাকে দূর-দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতুম, আর-কখনও তোমার ঐ শ্রীমুখটা আমার সামনে দেখাতে দিতুম না !'

'ঈশ্বর আমায় রক্ষে করুন !' বেচারা অজেনর এই হুমকিতে বেজায় ঘাবড়ে গিয়ে কাঁচুমাচু হ'য়ে ব'লে উঠেছে।

জেন একটু থেমে আড়চোখে তাকিয়ে নিরীক্ষণ করেছে তার শিকারকে। পুরো প্ল্যানটাই সে আগাগোড়া ছ'কে রেখেছে, কারণ তার এই চোটপাটের মধ্যে যতটা-না সত্যিকার দাবড়ানি ছিলো, তার চাইতেও বেশি ছিলো হিশেব। সে এবার অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরেই বলেছে, 'এই-যে আমরা দুজনা জর্জের নির্দোষিতায় বিশ্বাস ক'রে মুখ কালো ক'রে নিরুপায় ব'সে আছি, এটা মোটেই ঠিক না। কোনো-না-কোনো উপায়ে সেটা আমাদের এবার প্রমাণ করতেই হবে! দেখো, আমরা ঠিক কিছু-একটা করতে পারবো এ-বিষয়ে !'

অজেনরের মুখ আলো হ'য়ে উঠেছে। যাক, তুফানটা তবে কেটেই গেছে এবারকার মতো!

'কিছু যদি করতেই না-পারি, তবু ছাতে উঠে গলা ফাটিয়ে হাজার চ্যাঁচালেও কেউ বিশ্বাস করবে না যে জর্জ নির্দোষ।'

'সে-তো ঠিকই।'

'কতগুলো গুজব,—কে জানে কোন চুলোয় পাকানো হয়েছে তাদের !—বাবা কি না সেগুলোকেই বিশ্বাস ক'রে দ'গ্ধে-দ'গ্ধে মরতে বসেছেন—জলজ্যান্ত আমাদেরই চোখের সামনে। এমনকী যারা এই গুজব রটাচ্ছে একবারও তাদের তিনি মোকাবিলা করতেও চাননি ! একবারও বলেননি : "তোরা সব মিথ্যাবাদী ! কাপুরুষ ! জর্জ কখনও এমন কাজ করতেই পারে না!" কী ক'রে তাহ'লে এখন ভাববো যে অজানা অচেনা উটকো কোনো লোক এসে আমার দাদার নির্দোষিতা স্পষ্ট ক'রে প্রমাণ ক'রে দেবে —*বাবাই যখন কিছু না-ক'রে হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছেন*!'

'সে তো অবশ্যই—তা মোটেই সম্ভব নয়,' অজেনর সায় দিয়েছে, 'তবে সেটাই তো হয়েছে মুশকিল... প্রমাণ... *অকাট্য প্রমাণ*... সেগুলো আমরা এখন পাবো কোন চুলোয়?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এ-বাড়িতে ব'সে যে পাবো না, তাতে অন্তত কোনো সন্দেহ নেই,' জেন একটু থেমে, তারপরেই জুড়ে দিয়েছে, 'অন্য-কোথাও গিয়েই পাবো, সম্ভবত !'

'অন্য-কোথাও গিয়ে? কোথায় গিয়ে ?'

'যেখানে ব্যাপারটা ঘটেছিলো ব'লে শোনা যায়। অকুস্থলে ! কুবোয় !'

'*কুবোয়* !'

'হ্যাঁ, কুবোয়। প্রথমে সেখানে গিয়ে খুঁজে বার করতে হবে জর্জের কবর—কেননা তাদের মতে সেখানেই নাকি মারা গিয়েছে সে, আর তা যদি হয়, কবর খুঁড়ে দেখলেই বোঝা যাবে কেমন ক'রে সে মারা গেছে! তারপর হন্যে হ'য়ে খুঁজে বার করতে হবে অন্যদের, যারা প্রাণ নিয়ে সটকেছে—সেই-যারা তার বিদ্রোহের দলে ছিলো ব'লে বলাবলি করে লোকে। তারা তো সংখ্যায় তেমন নগণ্য ছিলো না—আর সকলেই কর্পূরের মতো উবে যেতে পারে না। তারাই হচ্ছে সাক্ষী : তাদের প্রশ্ন করতে হবে, জেরা করতে হবে, অন্ধকার থেকে আলোয় টেনে বার ক'রে আনতে হবে সত্যকে—জানতে হবে সত্যি কী হয়েছিলো।' বলতে-বলতে জেনের মুখচোখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে, কেঁপে উঠেছে তার গলার স্বর।

'তুই ঠিকই বলেছিস, জেন,' অজেনর ঠিক বুঝতেও পারেনি কোন ফাঁদে সে পা দিতে চলেছে।

অমনি জেনের মুখে তার একরোখা জেদের ভাবটা ফুটে উঠেছে। 'বেশ। আমি যদি ঠিক কথা ব'লে থাকি, তবে এক্ষুনি কারু সেখানে যাওয়া উচিত।'

অজেনর আঁৎকে উঠেছে। 'কোথায় ?'

'কোথায় আবার... *কুবোয়* !'

'কুবোয় ! তা কোন হতভাগ্যকে তুই সেখানে পাঠাতে চাস, শুনি !'

জেন তখন অজেনরের গলা জড়িয়ে ধরেছে। '*তোমাকে*, মামা।'

'*আমাকে* !'

অজেনর গলা থেকে হাত দুটি ছাড়িয়ে নিয়েছে। এই-একবার সে সত্যি-সত্যি চ'টে উঠেছে। 'তোর মাথাটাই গেছে !'

'না, যায়নি। আমার মাথা খারাপ হয়নি।' জেন ফের তাকে দু-হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে। 'আর, শুনি, কেন তুমি কুবোয় যেতে চাচ্ছো না ? তোমার কি দেশ-বিদেশ বেড়াতে ভালো লাগে না ?'

'মোটেই লাগে না। আমার বরং অসহ্য লাগে-কোথাও যেতে হ'লে ! সময়মতো স্টেশনে যাও, টিকিট কাটো, ট্রেন ধরো—এ-সব আমার আসে না।'

'মাছ ধরতেও তোমার নিশ্চয়ই জঘন্য লাগে ?'

'*মাছ ধরতে* ? তুই যে কী বলতে চাচ্ছিস, তা-ই আমার মাথায় ঢুকছে না।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহ'লে টাটকা জলজ্যান্ত লাফাতে-থাকা মাছগুলোকে তুমি কী বলবে—ঐ নাইজার নদীর জলে যাদের তুমি তোমার বঁড়শিতে গাঁথবে? সে নিশ্চয়ই একখানা কাণ্ডই হবে —নাইজারের জলে মাছ ধরা—আর কতরকম মাছ, আর কত বড়ো-বড়ো! আর তুমি কি না সে-সব মাছ ধরবার জন্যে কোনোই চেষ্টা করবে না!'

'সে-কথা আমি বলিনি... তবে...'

'আর মাছ ধরতে-ধরতেই দু-চার জায়গায় শুলুকসন্ধান করা যেতে পারে—একে-ওকে-তাকে জিগেস করা যেতে পারে, স্থানীয় লোকদের সঙ্গেও তুমি আলাপ ক'রে জানতে পারো...

'কথা যে বলবো, কোন্ ভাষায়? আমার তো জানা ছিলো না ওরা সবাই ইংরেজিতে দারুণ সড়গড়!'

জেনকে মোটেই রসিকতাটায় সহাস্য দেখায়নি। 'সেইজন্যেই বাম্বারাতেই তাদের সঙ্গে কথা বলা অনেক-বেশি ভালো হবে।'

'বাম্বারা? আমি কি ছাই বাম্বারা-ফাম্বারা জানি নাকি?'

'কেন? শিখে নেবে।'

'আমার *এই বয়সে*?'

'কেন? আমি তো শিখেছি। আর আমি তো তোমার মাসি হই।'

'তুই? তুই জানিস নাকি বাম্বারা?'

'নিশ্চয়ই। শোনোই না তবে : "*দিফি লোখো আ বে না*"।'

'তা এই হ-য-ব-র-ল-র মানে কী?'

'তার মানে, "*আমার তেষ্টা পেয়েছে*"। আর "*ই দু, নোনো ই মিতা*"।'

'আরে ব্বাস... *নোনো... মিতা*!'

'তার মানে : "*এসো, আমি তোমাকে দুধ দিচ্ছি*"। আর "*কুকো বে না। কুলু উয়াবারা উতে আ মান দুমুনি*"। তোমাকে মাথা চুলকোতে হবে না। তর্জমা : "*আমার খুব খিদে পেয়েছে*। কাল সকাল থেকে আমি কিছু খাইনি"।'

'আর আমাকে এ-সব কথা শিখতে হবে?'

'হ্যাঁ, শুধু এই ক-টা কথাই নয়, আরো-বেশি। আর সময় নষ্ট কোরো না, আমাদের চটপট রওনা হ'য়ে পড়তে হবে।'

'তার মানে? রওনা হ'য়ে পড়তে হবে—মানে? আমি বাপু যাচ্ছি না—একপাও নড়ছি না, ব'লে রাখলুম। কী-একখানা আব্দার! না, আমি বাপু আফ্রিকায় গিয়ে ওখানকার লোকজনের সঙ্গে মাখামাখি করতে পারবো না!'

জেন বুঝি হাল ছেড়ে দিয়েছে, তাকে আর-কিছু বোঝাতে চেষ্টা করেনি। 'অগত্যা আমাকে একাই যেতে হবে।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'*তুই একাই যাবি।*' অজেনর আকাশ থেকে পড়েছে। 'তুই একা সশরীরে সেখানে গিয়ে হাজির হবি?'

'হ্যাঁ। কুবোয় তো যেতে হবেই।'

'সমুদ্রের তীর থেকে হাজার মাইল ভেতরে?'

'হাজার নয়, মামা, এগারোশো মাইল।'

'বলা নেই, কওয়া নেই, অমনি হুট ক'রে গিয়ে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বি? তাও একা-একাই?'

'বলা নেই কওয়া নেই মানে? এই-তো তোমাকে বললুম। তা তুমি যদি সঙ্গে যেতে না-চাও তো আমাকে একা-একাই যেতে হবে বৈকি!'

'তোর মাথাখারাপ হ'য়ে গেছে! এ যে একেবারে বাতুলের প্রলাপ! বিকার!' ব'লে, ছুটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে অজেনর, দড়াম ক'রে বন্ধ ক'রে গেছে দরজা!

কিন্তু পরের দিন জেনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখেছে, জেন তার সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ ক'রে দিয়েছে। আড়ি। তার মুখ থেকে টুঁ শব্দও খসানো যায়নি। এই আড়িই চলেছে দিন-কতক। অজেনর এমন মরণখেলার খেলোয়াড় হ'তে রাজি নয়, কিন্তু শেষটায় ক-দিন বাদে নিজে থেকে শান্তির ঝাণ্ডা ওড়াতে হয়েছে তাকে। ক-দিন মানে মাত্র চারদিন বাদেই!

তারপর থেকে তার তরুণী মাসি তাকে যা বলেছে তাতেই সে সায় দিয়েছে, তারই মতের শরিক হয়েছে। আফ্রিকায় এই অভিযান—গোড়ায় যেটাকে তার কারু অতিআতপ্ত মস্তিষ্কের বিকার ব'লেই মনে হয়েছিলো, তাকে তারপরে মনে হয়েছে নেহাৎই-বিপজ্জনক, তারপরে 'বাঃ, যাওয়াই বা যাবে না কেন,' এবং শেষকালে মনে হয়েছে—'এ আর এমন কথা কী? বেড়াতে তো লোকে যায়ই।' সেইজন্যেই চব্বিশ গুণ চার ঘণ্টা কাটিয়ে সে মাফি মেঙেছে কাঁচুমাচু হ'য়ে, নিজের ভুল স্বীকার করেছে একশোবার, আর জানিয়েছে —যাত্রার জন্যে সে একপায়েই খাড়া।

জেন অবশ্য সদাশয়াই, গোড়ার ঐ ওজর-আপত্তির কথা সে ভুলে গিয়েছে, তার দুইগালে দুই চুমু খেয়ে বলেছে : 'প্রথমে কিন্তু ভাষাটা তোমায় শিখে নিতে হবে, মামা,।'

তারপর থেকে লোকে বোধহয় শয়নে-স্বপনে সবসময়েই অজেনরকে দেখেছে একটা বাম্বারা ব্যাকরণের বইতে মুখ গুঁজে প'ড়ে থাকতে।

রওনা হবার আগে অবশ্য জেনকে এটা জেনে নিতে হবে যে তার এই অভিযানে তার বাবারও সম্মতি আছে। ভেবেছিলো, সহজে অনুমতি মিলবে না—কিন্তু চট ক'রেই পাওয়া গিয়েছে বাবার মত—জেন কথাটা পাড়বামাত্র একবার উদ্ভাসিত মুখে তাকিয়েছেন তিনি ছোটোমেয়ের দিকে, ইঙ্গিতে সায় দিয়েছেন, তারপরেই ডুবে গিয়েছেন আবার তাঁর অন্তহীন হতাশায়। তিনি কি *সত্যি* শুনেছেন তাঁর ছোটোমেয়ে কী বলেছে? তাঁর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো আজকাল আবার কোনোকিছুতেই কোনো চেৎভেদ নেই।

তারপরেই যাত্রার জন্যে তৈরি হ'তে উঠে-প'ড়ে লেগে গিয়েছে মাসি-বোনপো। তখনও যেহেতু জানতো না যে বারজাক মিশন তাদের সহায়তা দেবে, তারা ভেবেছিলো শুধু তাদের দুজনকেই বুঝি নিজেদের বলভরসাকে সম্বল ক'রে দু-হাজার মাইল পথ ছুটে বেড়াতে হবে আফ্রিকায়। গত কয়েক বছর ধ'রে সকলের অগোচরে ভূগোল নিয়ে পড়াশুনো করেছে জেন; বিশেষত যে-সব দেশের মধ্য দিয়ে তাদের যেতে হবে, সে-সব দেশের ভৌগোলিক জ্ঞান অতিসযত্নে আহরণ করেছে সে। আর তাইতেই সে জেনেছে তাকে যদি সশস্ত্র হ'য়ে অভিযান চালাতে হয়, কয়েকশো স্বেচ্ছাসেবীকে যদি নিতে হয় সঙ্গে, তবে তাদের সবাইকে হাতিয়ার জোগাতে, খাওয়াতে-পরাতে, মাইনে দিতে বিস্তর খরচ প'ড়ে যাবে। তাছাড়া অত সশস্ত্র লোক নিয়ে যদি তাকে যেতে হয়, তবে বেশির ভাগ গ্রামগঞ্জই তার সদুদ্দেশ্য নিয়ে মাথা ঘামাবে না—আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়, এই মত অনুযায়ী তাদের ওপর এসে চড়াও হবে। তাহ'লে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে গেলে তাকে সারাপথ লড়াই ক'রে-ক'রেই এগুতে হবে—আর তাতে কোনো ফায়দা হবে ব'লেও মনে হয় না। সেইজন্যেই জেন ঠিক করেছিলো, সে শান্তিপূর্ণভাবেই যাবে—প্রকাশ্যে কোনো অস্ত্রশস্ত্রের আস্ফালন করবে না, সঙ্গে নেবে কিছু বিশ্বাসী অনুগত অনুচর—আর যুদ্ধ-টুদ্ধের হ্যাঙামায় না-গিয়ে বিভিন্ন গ্রামের মোড়ল বা গ্রামপ্রধানের জন্যে ছোটোখাটো উপঢৌকন নিয়েই যাবে।

শুষ্ক তপ্ত দিনগুলোর জন্যে চাই হালকা সুতির পোশাক, শুধু বর্ষার জন্যে সঙ্গে রাখতে হবে পশমের তৈরি জামাকাপড়, আর বেশি মোট সঙ্গে না-নিয়ে হালকা কতগুলো বাক্সপ্যাঁটরাই নিতে হবে সঙ্গে—যতটুকু না-হ'লেই নয়, তার বেশি একটা-কিছুও না। কেননা এছাড়া তো গ্রামপ্রধানদের জন্যে উপঢৌকনও নিতে হবে সঙ্গে—প্রায় একটা আস্ত হাটবাজার। নিজেদের জন্যে আরো চাই ছোটোখাটো একটা ওষুধের দোকান, অস্ত্রশস্ত্র, দুরবিন, কাঁটাকম্পাস, ছাউনি ফেলার তাঁবু খাটাবার সরঞ্জাম, অভিধান, অন্য-কতগুলো ভূগোল ও রাজনীতির বই, সর্বাধুনিক সব মানচিত্র, রান্নার বাসনকোশন, প্রসাধনসামগ্রী, চা, রসদপত্তর, অর্থাৎ দীর্ঘদিন আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে কাটাতে গেলে যা-যা চাই, সব—অবান্তর ফালতু জিনিশ একটাও না। তাছাড়া গেলো দস্তায় তৈরি ঝকঝকে একটা তোরঙ্গ, তাতে আছে ছিপ আর বঁড়শি—টোনসুতো, অন্তত আধডজন বর্শেলের যাতে মাছ ধরতে গিয়ে কোনো বিড়ম্বনাই না-হয়, তার ব্যবস্থা। এটাই অজেনরের একান্ত সাধের মাল।

মাসি-বোনপো—নাকি মামা-ভাগ্নে—তারপর যাবে লিভারপুল, সেখান থেকে আফ্রিকার উপকূলে যাবার জাহাজে চাপবে। প্রথমে যাবে ব্রিটিশ উপনিবেশ গামবিয়ায়, আর সেন্ট লুইসে নামবার আগে তারা জানতেই পারেনি যে বারজাক মিশনও ঠিক ও-



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথ দিয়েই আফ্রিকার অভ্যন্তরে যাবে। শুনেই অবশ্য তারা ঠিক করেছিলো সাঁৎ-বের‍্যাঁর দেশের লোকের সহযাত্রী হওয়া বোধহয় ভালো হবে তাদের পক্ষে।

সেপ্টেম্বরের শেষদিকেই তারা সব মালপত্তর পাঠিয়ে দিয়েছিলো লিভারপুলে, আর দোসরা অক্টোবর শেষবার সবাই একসঙ্গে খেতে বসেছিলো গ্লেনর কাসলে, কেননা লর্ড ব্লেজন তো আর তাঁর একাচোরা খোপটা ছেড়ে একপাও নড়বেন না। নিজের কাঁধে যে গুরুদায়িত্ব নিজেই চাপিয়ে দিয়েছে জেন ব্লেজন, সেটার মাহাত্ম্য যা-ই হোক না কেন, এই-শেষবার একসঙ্গে সবাই মিলে খেতে ব'সে তার মনে হয়েছে, যে-বিপদের মধ্যে সে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে, তাতে হয়তো আর-কোনোদিনই সে এই বিশাল কাস্‌লটিকে চোখেই দেখতে পাবে না। কিংবা যখন সে ফিরে আসবে, তখন হয়তো তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবার জন্যে তার ভগ্নদেহ নিরাশমন বাবা আর বেঁচেই থাকবেন না। অথচ সে-যে এই দুর্জয় অভিযানে বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছে, ঝাঁপ খেতে চাচ্ছে অজ্ঞাত সব বিপদের মাঝখানে, সে-তো তার এই বাবার জন্যেই—যাতে তাঁর বিমর্ষ চিত্তে একটু শান্তিসন্তোষ এনে দিতে পারে সে, যাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে ব্লেজন বংশের সুনাম, যাতে এই কলঙ্কচিহ্ন সে মুছে দিতে পারে চিরকালের জন্যে।

যাত্রার সময় যেই ঘনিয়ে এলো, জেন তার বাবাকে বিদায় জানাতে গেলো, সঙ্গে নিয়ে গেলো অজেনরকে। তিনি সেই একই ভঙ্গিতে ব'সে ছিলেন বড়ো জানলাটার সামনে, উদাসভাবে তাকিয়েছিলেন কোন দূরে, দিগন্তের দিকে। যেন কারু জন্যে অধীর হ'য়ে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি, ঠায় ব'সে, চুপচাপ। কার জন্যে? সে কি জর্জ, তার ছেলে, বংশের কুলাঙ্গার, দেশদ্রোহী? তাকেই কি খুঁজে বেড়াচ্ছে তাঁর চোখ, অনিমেষে?

মেয়ের গলা শুনে একটু ফিরিয়েছেন তিনি তাঁর ঘাড়, আর তাঁর ম্রিয়মাণ চোখ-দুটো হঠাৎ আলো হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু শুধু সামান্য-একটা ঝিলিক সে, আর-কিছু নয়, তারপরেই আধোনিমীলিত হয়েছে তাঁর নয়ন, তাঁর মুখে আবার ফিরে এসেছে সেই একই নির্বিকার উদাসভাব।

চোখের জল সামলাবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে জেন রুদ্ধস্বরে বলেছে, 'বাবা, তবে আসি?'

লর্ড গ্লেনর মুখে কোনো সাড়া দেননি। তাঁর মস্ত আরামকেদারা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ছোটোমেয়ের হাত চেপে ধরেছেন শুধু, তারপরেই একবার তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়েছেন, আলতো ক'রে চুমু খেয়েছেন মেয়ের কপালে।

কান্নায় ফেটে পড়বার শঙ্কায় জেন তাঁর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে ছুটে, সজল চোখে, বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। বৃদ্ধ তখন চেপে ধরেছেন তাঁর নাতির হাত, আবেগের বশে সেটা ঝাঁকিয়েছেন শুধু, আর হাত তুলে নীরবে ইশারা ক'রে দেখিয়েছেন দরজাটা, যেটা দিয়ে এইমাত্র ছুটে বেরিয়ে গেছে জেন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনি আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন,' তাঁকে আশ্বাস দিয়েছে অজেনর।

তারপর লর্ড গ্লেনর আবার ফিরে গিয়েছেন জানলায়, তাঁর আরামকেদারায়, আবার তাঁর চোখ দূরে কাকে যেন খুঁজে ফিরেছে। সাঁৎ-বেরাঁ নিজেকে কোনোরকমে সামলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

কাস্‌লের অঙ্গনে একটা কোচগাড়ি অপেক্ষা করছিলো তাদের জন্যে—দু-মাইল দূরে উটোক্সেটার স্টেশনে তাদের পৌঁছে দেবে সে।

'এবার তাহ'লে অজানার উজানে?' তারা যে গ্লেনর কাস্‌ল থেকে বেরিয়ে পড়েছে সেটাই বোধহয় খেয়াল করেনি অজেনর, সে তখনও মাতামহের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের দৃশ্যে খানিকটা মোহ্যমান।

জেন শুধু নীরবে তার কাঁধদুটো ঝাঁকিয়েছে।

কিন্তু তারা পাঁচশো গজও বোধহয় যায়নি! অজেনর আর্তনাদ ক'রে উঠেছে: 'আমার ছিপ! আমার বঁড়শি!' তার গলা কান্নায় ভেঙেই গিয়েছে যেন।

সেই অতিবিখ্যাত ছিপগুলোর জন্যে তারপর আবার তাদের ফিরে আসতে হয়েছে কাস্‌লে, অজেনরের সুবিদিত ভুলোমনই তার জন্যে দায়ী, ছিপগুলো খুঁজে বার করতে গিয়ে নষ্ট হয়েছে পনেরো মিনিটেরও বেশি। তারপর যখন তারা স্টেশনে এসে পৌঁছেছে, এক্সপ্রেস ট্রেনটা তখন ছাড়ো-ছাড়ো, চোঙ দিয়ে ভলকে-ভলকে ধোঁয়া উঠছে, তীব্র-সুরে বাঁশি বেজেছে একবার, আর পড়িমরি ক'রে তারা কোনোমতে উঠে পড়তে পেরেছে ট্রেনে, আর অজেনর জাঁক দেখিয়ে বেশ গর্বের সুরেই বলেছে: 'জীবনে এই দ্বিতীয়বার আমাকে কোনো ট্রেন মিস করতে হ'লো না।'

দরদর-ক'রে-ঝ'রে-পড়া চোখের জলের মাঝখানেও হেসে ফেলেছে জেন।

আর এইভাবেই শুরু হয়েছে অজ্ঞাতের উদ্দেশে অভিযান। সে যখন থাকবে না, তখন যে কী হবে, তা যদি জেন আগেভাগেই জানতো, তবে কি জেন এ-রকম ভাবে অনিশ্চিতের সন্ধানে ঝাঁপিয়ে পড়তো? সে কি জানতো আবার কোন প্রচণ্ড আঘাত অপেক্ষা ক'রে আছে তার বাবার জন্যে, যাঁর মুখে একটু হাসি ফোটাতে সে এমন ক'রে বেরিয়ে পড়েছে?

না, তার পক্ষে সেই শোচনীয় দুর্ঘটনার কথা স্বপ্নেও ভাবা সম্ভব ছিলো না। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ঐ দুর্ধর্ষ ডাকাতির কথা আগে থেকে সে জানবে কী ক'রে? সে তো আর ত্রিকালজ্ঞ-কেউ নয়। সে বরং ভেবেছে তার অবর্তমানে লুইসই বাবার দেখাশুনো করবে।

অত্যুৎসাহী এক ভৃত্য ওল্ড ব্রড স্ট্রিটের সেই দুর্ধর্ষ ডাকাতির পরদিনই লুইসের নিরুদ্দেশ হবার খবর শুনিয়েছে লর্ড ব্রেজনকে, আর এই ধাক্কাটা তাঁকে একেবারে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েছে। বীরের বংশে এ-সব কোন কুলাঙ্গার জন্মেছে পর-পর? একজন দেশদ্রোহী, অন্যজন দস্যু! হতভাগ্য বৃদ্ধ বুকচাপা একটা আর্তনাদ ক'রে লুটিয়ে পড়েছেন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেঝেয়। ভৃত্যেরা ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাঁকে। তুলে নিয়ে গিয়ে শুইয়েছে বিছানায়। তাদের অবিরাম সেবা-যত্নে একসময় বৃদ্ধের মুদিত চোখের পাতা খুলেছে। আর ঐ ফ্যালফেলে হতাশদৃষ্টিই বুঝিয়েছে এখনও তাঁর দেহে প্রাণের একটু সাড়া আছে। পক্ষাঘাতে অসাড় শরীরে তিনি যদি বেঁচেও থাকেন, চিরকাল তাঁকে কাটাতে হবে নিশ্চল, নির্বাক। নিয়তির নির্মম পরিহাসের শেষ কিন্তু তখনও আসেনি। হতচৈতন্য, মৌনবাক, অসাড়দেহ, লর্ড ব্লেজন তখনও চিন্তা করবার ক্ষমতা হারাননি!

আর, দ্রাঘিমার ব্যবধান সত্ত্বেও, ঠিক যখন লর্ড ব্লেজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছেন, ঠিক তখন, সেই মুহূর্তেই কাপ্তেন মার্সেনের হাত ধ'রে জেন ব্লেজন উঠেছে ঘোড়ার ওপর, তারপর লাগাম টেনে ঘোড়া ছুটিয়েছে সেতুটার ওপর দিয়ে, যে-সেতুটা কোনাক্রিকে জুড়ে রেখেছে গোটা ছায়াচ্ছন্ন মহাদেশটার সঙ্গে, আর এতদিনে সত্যি-সত্যি রৌদ্রতপ্ত রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের তলায় *অন্ধকার* (!) মহাদেশে শুরু হয়েছে তার অভিযান!

## চার

## *ল্যক্রপান্‌সিয়ন ফ্রাঁসেঈ* থেকে একটি নিবন্ধ

*ল্যক্রপান্‌সিয়ন ফ্রাঁসেঈ*-র পাঠকরা পয়লা জানুয়ারি দিব্বি চেখেছিলেন নিচের নিবন্ধটা। বেশ বড়ো-বড়ো হরফে শোভা পেয়েছে তার শিরোনাম, আর নিবন্ধটি নিঃসৃত হয়েছে কোনো-এক কল্পনাবিলাসী উদ্ভট লেখনী থেকেই—যা দূরের, তাকে নিয়ে কল্পনা কত খেলাই যে খেলতে পারে!— *ল্যক্রপান্‌সিয়ন ফ্রাঁসেঈ*-র নিজস্ব সংবাদদাতা, মঁসিয় আমেদে ফ্লরেঁস-এর অনুরক্ত পাঠকেরা নিশ্চয়ই সাগ্রহেই ক্ষমা ক'রে দেবেন তাঁদের চিরচেনা লিখনভঙ্গিমাকে :

### বারজাক মিশন

*[ নিজস্ব সংবাদদাতার কলম থেকে ]*

*জঙ্গলের মধ্যে, পয়লা-ডিসেম্বর*। আগেই জানিয়েছিলুম যে বারজাক মিশন আজ সকাল ছ-টার সময় রওনা হ'য়ে পড়বে। কাঁটায়-কাঁটায় ছটার সময় আমরা সবাই তৈরিই ছিলুম, যে-দুজন স্বেচ্ছাসেবী আমাদের আটজন সদস্যের সঙ্গে এসে সদ্য যোগ দিয়েছে তারা শুদ্ধু, বাকিদের তো আমরা চিনিই, আমলাবাজ এবং ফোঁপরদালাল। কাউকেই তা নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করতেও দেখি না! স্বেচ্ছাসেবীদের একজন মুণ্ডু-ঘুরিয়ে-দেয়া রূপসী, এক ফরাশিনি কিন্তু ইংলণ্ডে আদবকায়দা লেখাপড়া রপ্ত করেছেন, আর তার ফলে তাঁর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরাশিতে অ্যাদ্দিনে ক্ষীণ-একটু বিদেশী ঝোঁক লেগেছে। মাদমোয়াজেল জেন মোরনাস, তাঁর নাম। অন্য স্বেচ্ছাসেবীটি তাঁরই মাতুল, যদি-না তিনি তাঁর বোন-পো হন—কেননা আপাতত এঁদের আত্মীয়তাসম্বন্ধের জট-পাকানো ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনোই দরকার দেখি না, এবং তাঁর নাম—অজেনর দ্য সাঁৎ-বেব্যাঁ। একটু ছিটই আছে তাঁর মাথায়, চূড়ান্ত খামখেয়ালি, এর মধ্যেই কোনাক্রিতে সবাই তাঁকে একডাকে চিনে গিয়েছে, আশা করি তিনি আমাদের যৎকিঞ্চিৎ আমোদ জোগাবেন।

মাদমোয়াজেল মোরনাস আর মঁসিয় দ্য সাঁৎ-বেব্যাঁ প্রমোদভ্রমণে বেরিয়েছেন। এবং আমারই প্রমাদ হবে, যদি এটা কবুল না-করি যে তাতে হয়তো আমাদেরও কিঞ্চিৎ প্রমোদ হবে। তাঁরা সঙ্গে এনেছেন কৃষ্ণাঙ্গ দুই অনুচর, আগে সেনেগলে দোভাষীর কাজ করতো, তবে তারা দোভাষী নয়, পথ দেখিয়েই নিয়ে যাবে, কেননা আমাদের এই দুই বিশ্বপর্যটক শুধু-যে যথেষ্ট বাম্বারাই জানেন তা নয়, এখানকার কোনো-কোনো উপভাষাতেও বেশ সড়গড়। মাদমোয়াজেল মোরনাস *ইনিতিয়ে* (সুপ্রভাত) ব'লে মধুর ভাবে যখন সম্ভাষণ করেন... কিন্তু এ নিয়ে অধিক বাক্যব্যয় করার কোনোই দরকার নেই। মঁসিয় বারজাক তো দেখা হ'লেই এখন *ইনিতিয়ে* ব'লে শুরু করেন, তবে তাঁর মুখে সম্ভাষণটা সে-রকম মধুর শোনায় না।

তো, আজ সকালে, পয়লা ডিসেম্বর, ভোর সাড়ে-পাঁচটা নাগাদ, এই-যে, আমরা এসে জড়ো হয়েছি কোনাক্রির বড়োচকটায়, রাজভবনের সামনে।

আগেই জানিয়েছি, মঁসিয় বারজাক এক নির্বিরোধী, একান্তভাবেই বেসরকারি চালে, অভিযান চালাতে চাচ্ছিলেন। সংসদে যেমন আশাবাদী ব'লে তাঁর নাম, এখানেও সেই সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে চাচ্ছেন; তাঁর ধারণা একগুচ্ছ জলপাই-পল্লব নিয়ে তিনি জনতার সামনে আবির্ভূত হ'লেই, সবাই একেবারে বিগলিত হ'য়ে যাবে; নাইজার নদীর তীর ধ'রে কোনাক্রি থেকে কোতোনু যাওয়ার এই ব্যাপারটা তাঁর কাছে পরিপাকশক্তি বজায় রাখার মতো হ'টন যেন। এটা অবশ্য মাদমোয়াজেল মোরনাসেরও ধারণা, তাঁর মনে হয় বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আস্ফালন করতে-করতে গেলে স্থানীয় অধিবাসীরা বিষম ক্ষুব্ধ হ'য়ে যেতে পারে—এবং সেটা আদপেই অভিপ্রেত নয়।

তবে বারজাক-মোরনাস সংঘটি বোদ্রিয়ের সংঘের দেয়ালে এসে মাথা ঠুকেছে। মিশনের এই সহযোগী-কর্তাটি—তাঁর মুখে কেউ কোনোদিন বোধহয় অস্ফুট-কোনো হাসির রেখাও দ্যাখেনি—যতদূর-সম্ভব কালো ক'রেই এঁকেছেন, কী-কী বিপদ-আপদ পথে আমাদের জন্যে ওঁৎ পেতে আছে। ফরাশি সংসদের দুই মাতব্বরের নেতৃত্বে আরব্ধ এই মিশনের স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা সম্বন্ধে তিনি অতিসচেতন, তাঁর ধারণা আস্ত-একটা ফৌজ সঙ্গে নিয়ে গেলে আমাদের মানসম্মান বাড়বে বৈ কমবে না। আর বিস্ময়ের পরে বিস্ময়, খোদ বড়োলাটসায়েব মঁসিয় বাল্‌দোন তাঁর মতেই সায় দিয়েছেন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ নিয়ে কোনো তর্ক তুলছি না : হয়তো সত্যিই ফরাশি অনুপ্রবেশের ফলে এই কালোদের দেশে অন্তর্কলহ খানিকটা কব্জায় আনা গেছে! উপনিবেশ দফতরের মন্ত্রী যা বলেন বড়োলাট বাল্‌দোনও তা তোতাপাখির মতো আওড়ান। মঁসিয় বাল্‌দোন সেদিন বলেছেন, কতগুলো রহস্যময় তথ্য তাঁর গোচরে এসেছে—রহস্যময় এইজন্যে তার কোনো সঠিক যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা তাঁর মালুম নেই—যাতে ভয় হয় কোথাও-কোথাও হয়তো বিদ্রোহের বীজ বোনা হচ্ছে। গত দশ বছর ধ'রে—এবং সম্প্রতি না কি প্রকোপটা বেড়েছে—নাইজারের তীরে স্যা থেকে দজেন অব্দি বিস্তীর্ণ অঞ্চলটায় গ্রামকে গ্রাম উজাড় ক'রে লোকজন সব আকস্মিকভাবে পালিয়ে যাচ্ছে—গ্রামগুলো প'ড়ে থাকছে ভুতুড়ে—পরিত্যক্ত আর ফাঁকা, আর লোকজন যে কোথাও উধাও হ'য়ে যাচ্ছে, তা সাধারণ মানুষ দূরের কথা, গোয়েন্দা দফতরও জানে না। তারই পাশাপাশি গ্রামের পর গ্রাম তছনছ ক'রে লুঠতরাজ চলেছে, জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে ঘরবাড়িখামার, আর কারা যে সে-সব করছে, তাও নাকি কেউই জানে না। গুজবগুলোর উৎপত্তি বা প্রভাব যা-ই হোক না কেন, ছায়ার মধ্যে বেয়াড়ারকম কিছু-একটা যে ঘোঁট পাকাতে শুরু করেছে তাতে নাকি *কারুই* কোনো সন্দেহ নেই।

অতএব প্রাথমিক সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েই বারজাক মিশন বাধ্য হয়েছে সঙ্গে সশস্ত্র একদল সেপাইশান্ত্রী নিয়ে অভিযানে বেরুতে। মঁসিয় বোদ্রিয়েরের পাকাহাড়ে সুবাতাস লেগেছে এতে, আর মঁসিয় বারজাককে অগত্যা মেনে নিতে হয়েছে কাপ্তেন মার্সেনে এবং তাঁর দুশো ঘোড়শোয়ারের *রক্ষাকবচ*।

ছটার সময়, সবকিছু তৈরি। সারিটার গোড়ায় আছে একজন কালো, সে নাকি আগেই কতবার কোনাক্রি থেকে সিকাসো যাতায়াত করেছে, অঞ্চলটা তার কাছে নিজের হাতের চেটোর মতোই জানা ব'লে সে-ই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ব'লে ঠিক হয়েছে। তার বয়েস তিরিশ, স্বাস্থ্যবান, আগে ছিলো *দুগুকুসাদিগুই* অর্থাৎ রাজ্যপালের কৃষ্ণাঙ্গ কর্মচারীদের একজন। লংক্লথের আঁটো ব্রীচেস তার পরনে, আর ঔপনিবেশিক পদাতিক বাহিনীর ছেঁড়া একটা উর্দি তার পরনে, এতই পুরোনো যে ডোরাগুলো নোংরা হ'য়ে রং পালটেছে। খালি-পা হ'লে কী হবে, তার মাথা ঢেকে রেখেছে কাপড়ের টুপি, এককালে শাদার ওপর তাতে তিনরঙের ঝিলিক ছিলো। তার প্রতাপের সাক্ষী তার হাতের মোটা একটা গদা, তাই দিয়েই সে নাকি তল্লিবাহকদের সবকিছু বুঝিয়ে দিতে পারবে।

ঠিক তার পরেই আছেন মাদমোয়াজেল মোর্‌নাস—দু-পাশে দুই সাথী—মঁসিয় বারজাক আর কাপ্তেন মার্সেনে। হুম! এবং আবারও হুম! এঁরা তাহ'লে এই সুন্দরী তরুণীর টান সম্বন্ধে নিতান্তই উদাসীন নন! বাজি ধ'রে বলতে পারি অভিযান চলবার সময় বেশকিছু যুযুধান প্রতিদ্বন্দ্বিতা জ'মে উঠবে। সেই প্রতিযোগিতার ফলাফল কী হয়, সেটা পাঠকদের ভবিষ্যতে জানাতে পারবো ব'লেই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই প্রথম দলটার পেছনেই আছেন মঁসিয় বোদ্রিয়ের, বেশ-ছিমছাম সাজপোশাক করেছেন—আগে কি বলিনি যে আমরা সবাই যাচ্ছি ঘোড়ায় চ'ড়ে—কিন্তু তাঁর ভ্রূকুটিই বুঝিয়ে দিচ্ছে তাঁর সাংসদ সহযোগীর দুর্বলতাটা তাঁর অত্যন্ত অরুচিকর ঠেকছে। আমি আড়চোখে একবার তাঁর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়েছি, মিশনের এই সহযোগী কর্তার ওপর। কী শুটকোমতো দেখতে, চিমশে-একটা কাঠিই যেন ! আর হিমজমাট ! আর কেমন যেন করুণও !... সত্যি, শয়তানের কী লীলা, ইনি তো জানেনই না হাসি কাকে বলে !

মাননীয় সাংসদের তিনকদম পেছনেই আছেন অন্যরা। ডাক্তার শাতোনে আর ভূগোলবিশারদ উচ্চকণ্ঠে মানববিদ্যা আলোচনা করতে লেগে গিয়েছেন—এর মধ্যেই।

এর পরেই আছে *কনভয়*—এটাই নাকি পারিভাষিক নাম। পঞ্চাশটি গাধাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে পঁচিশজন রাখাল, তাদের মধ্যে দশজনই মাদমোয়াজেল মোরনাসের বেতনভুক। আর দু-পাশে পাহারা দিয়ে কদম-কদম চলেছে কাপ্তেন মার্সেনের ঘোড়সোয়ারবাহিনী। আর আপনাদের এই-অধম ? আমি একবার সামনে একবার পেছনে গিয়ে নজর রাখছি আমাদের *প্রগতির* ওপর। ৎশুমুকি আর তোঙ্গানে—মাদমোয়াজেল মোরনাসের দুই পরিচারক—চলেছে সব পেছনে।

কাঁটায়-কাঁটায় ছটাতেই এসেছে যাত্রার সংকেত। সারিটা সঙ্গে-সঙ্গে নড়তে শুরু করেছে। ঠিক সেইমুহূর্তে রাজভবনের গম্বুজে উঠে গিয়েছে পৎপৎ তেরঙ্গা। মাফ করবেন। একটু স্থানীয় রং চড়াই। লাটসায়েব তাঁর প্রাসাদের অলিন্দ থেকেই আমাদের বিদায়অভিনন্দন জানিয়েছেন। উপনিবেশের বাদ্য বেজে উঠেছে—জমকালো—তূরীভেরী আর ঢাকঢোল। আমরা উত্তরে মাথার টুপি তুলে অভিনন্দন ঠুকেছি। বেশ-একটু ভাবগম্ভীরই ঠেকেছে মুহূর্তটাকে : দোহাই, এ শুনে যেন আবার হাসবেন না। কিন্তু এমন-একটা ভাবগম্ভীর পরিবেশ একটা ঠুনকো খামখেয়ালে হাস্যোদ্রেক করবে কেন ?

সাঁৎ-বের্ঁ্যা ? সাঁৎ-বের্ঁ্যা কোথায় ? সব্বাই দেখছি তার কথা বেমালুম ভুলেই গেছে ! আমরা তাঁকে ঢুঁড়ে বেরিয়েছি, নাম ধ'রে চেঁচিয়ে ডেকেছি। প্রতিধ্বনিরা অব্দি তাঁর নাম ধ'রে চিল্লিয়েছে। সব খামকা। সাঁৎ-বের্ঁ্যার কোনো সাড়াই নেই। আমরা ভাবতে শুরু করেছি অপঘাত কিছু হয়নি তো ? কোনো অভাবিত দুর্ঘটনা ? কিন্তু মাদমোয়াজেল মোরনাস—তাঁকে আদৌ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিলো না—আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। না, উদ্বিগ্ন তিনি নন মোটেই, বরং খেপে লাল ! রেগে টং ! যাকে বলে ক্ষিপ্ত ! দাঁতে-দাঁত চেপে তিনি বলেছেন, 'আমি যাবো আর আসবো—তিনমিনিটের মধ্যেই সাঁৎ-বের্ঁ্যাকে বগলদাবা ক'রে চ'লে আসবো।' ব'লে, ঘোড়ার পেটে তিনি নাল ঠুকেছেন।

প্রথমে, অবশ্য, আমার দিকে ফিরে তিনি বলবার ফুরসৎ পেয়েছেন : 'মঁসিয় ফ্লঁরেঁস...' একটু অনুনয়ের ভঙ্গিতে, যার মর্মার্থ অনুধাবন করতে আমার খুব-একটা দেরি হয়নি। সেইজন্যেই আমিও ঘোড়ার পেটে নালের খোঁচা মেরে তাঁর সঙ্গ ধরেছি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েক কদম যেতে-না-যেতেই বেলাভূমি, বারদরিয়ার মুখোমুখি—আপনারা নিশ্চয়ই জানেন কোনাক্রি একটা দ্বীপের ওপরকার শহর—আর সেখানে—এ-কী দেখি—চোখ রগড়ে ?

মঁসিয় দ্য সাঁৎ-বেরাঁ। আজ্ঞে হ্যাঁ, মহোদয়া এবং মহোদয়গণ ! সাক্ষাৎ সাঁৎ-বেরাঁ, সশরীরে। আপনার আমার মতোই জলজ্যান্ত!

এই তীরে ইনি কী করছেন ? একটু থেমে আমরা মালুম করার চেষ্টা করি।

মঁসিয় দ্য সাঁৎ-বেরাঁ দিব্বি গ্যাঁট হ'য়ে আয়েস ক'রে ছড়িয়ে বসেছেন বালিতে, একটা সরকারি মিশনের সঙ্গে যে তাঁকে যেতে হবে, সে-কথাটা তাঁর মাথাতেই নেই। তিনি দিব্বি খোশগল্প জুড়ে দিয়েছেন এক কালাআদমির সঙ্গে, সে তাঁকে নানারকম বঁড়শি দেখাচ্ছে—সম্ভবত এমনতর বঁড়শি ইওরোপে পাওয়া যায় না, আর হাত-পা নেড়ে তাদের সমূহ গুণপনা ব্যাখ্যানা ক'রে বোঝাচ্ছে। তারপর দুজনে উঠে প'ড়ে অলস গতিতে এগিয়ে গেছেন তীরের ওপর আদ্ধেক-ওঠানো একটা ক্যানুর দিকে, কালোটি গিয়ে তারপর তাতে উঠে গিয়েছে... এ-কী ! এ-যে দেখছি মঁসিয় দ্য সাঁৎ-বেরাঁও ক্যানুটায় ওঠবার উপক্রম করছেন !

অবশ্য সুযোগটা পাননি।

*'বোন-পো !'* কড়া সুরে হেঁকে উঠেছেন মাদমোয়াজেল মোরনাস।

(হ্যাঁ, ইনি আসলে তাঁর বোন-পোই।)

সেই একটা কথাই যথেষ্ট হ'লো। মঁসিয় দ্য সাঁৎ-বেরাঁ একপাক ঘুরেই দেখতে পেয়েছেন তাঁর মাসিকে—ইনি তাঁর মাসিই তো বটেন। দেখবামাত্রই সম্ভবত স্মৃতিতে সব চাগাড় দিয়ে উঠেছে, কারণ অমনি তিনি হতাশার একটা আর্তনাদ ক'রে উঠেছেন। হাতদুটি তুলেছেন শূন্যে, তাঁর কালো ইয়ারবন্ধুটির উদ্দেশে ছুঁড়ে দিয়েছেন একমুঠো খুচরো আর পরিবর্তে হাতে তুলে নিয়েছেন গোটা-কয়েক বঁড়শি, হুড়মুড় ক'রে সে-সব ঢুকিয়েছেন পকেটে এবং পড়িমড়ি ক'রে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে এসেছেন আমাদের দিকে। এমন মজার ভাবভঙ্গি তাঁর যে দেখে আমরা হেসেই বাঁচি না। আর সেই খিলখিল হাসির ফাঁকেই মাদমোয়াজেল দেখিয়ে ফেলেছেন চোখধাঁধানো শুভ্র দন্তপঙক্তি। আবারও বলি, চোখধাঁধানোই !

আমরা আবার ঘোড়ার মুখ ফিরিয়েছি, মঁসিয় দ্য সাঁৎ-বেরাঁও কদম-কদম তাল রেখে আমাদের সঙ্গে ছুটে এসেছেন। শেষটায় মাদমোয়াজেল মোরনাসের বোধকরি একটু দয়াই হয়েছে, ঘোড়ার চলন মন্থর করেছেন তিনি, আর মোলায়েম ক'রে বলেছেন : 'অমন ক'রে ছুটো না, মামা! শেষটায় মাথা গরম হ'য়ে যাবে।'

(ইনি তবে এঁর মামা !... এ-কী, আমার মাথায় সব যে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে !)

আমরা ফিরে আসি কনভয়ের কাছে, যেখানে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের হাসি আমাদের অভ্যর্থনা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানায়। কিন্তু এ-সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মঁসিয় দ্য সাঁৎ-বেরাঁ অন্তত মাথা ঘামান না। এত লোকজন দেখে তিনি বরং বিস্মিতই হয়েছেন। সরল ভঙ্গিতে জিগেস ক'রে বসেছেন : 'আমি বুঝি খুব-দেরি করিয়ে দিয়েছি ?'

তাঁর এই নিরীহ প্রশ্ন শুনে পুরো সারিটাই হো-হো ক'রে হেসে ফেলেছে। এবং মঁসিয় দ্য সাঁৎ-বেরাঁ এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। ভদ্রলোককে আমার ভারি মনে ধ'রে গেছে।

তবে এখনও কিন্তু আমরা রওনা হ'তে পারিনি।

যেই মঁসিয় দ্য সাঁৎ-বেরাঁ ঝুঁকে পড়েছেন, ওস্তাদ ঘোড়সোয়ারের মতো, দেখতে যে জিন-লাগাম ঠিকমতো পরানো হয়েছে কিনা, তাঁর ছিপের বাক্সটা, সেটা তিনি প'রে ছিলেন ঠিক বান্দোলিয়ের-এর মতো, বরাৎ-খারাপ, গিয়ে ধাক্কা মেরেছে পাশের একটি গাধার গায়ে। গর্ধবটা নিশ্চয়ই রগচটা, সে উত্তরে বেচারি সাঁৎ-বেরাঁকে তাগ ক'রে দুম ক'রে এক লাথি কষিয়ে দিয়েছে, অমনি চিৎপটাং, পপাতধরণীতলে এবং ধুলোয় গড়াগড়ি।

আমরা হা-হা ক'রে ছুটে গিয়েছি তাঁকে সাহায্য করতে, বেচারি কিন্তু নিজেই ততক্ষণে ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে উঠে পড়েছেন।

'মোসোর কপাল ভালো !' তোঙ্গানে তাঁকে বলেছে, 'যদি বোলতা হল ফোটায় কিংবা ঘোড়ার বাচ্চা লাথি কষায়, তাহ'লে যাত্রা শুভ হয় ! খুব-ভালো হ'লো !'

তার কথার কোনো জবাব না-দিয়ে, একটু হতোদ্যম এবং অনেকটাই ধূলিধূসর, মঁসিয় দ্য সাঁৎ-বেরাঁ লাফিয়ে উঠেছেন তাঁর জিনের ওপর, এবং অবশেষে কনভয় রওনা হবার সুযোগ পেয়েছে। ততক্ষণে সূর্যদেব উঠে পড়েছেন, এবং তাঁর প্রথম রশ্মিগুলো সহর্ষে আলো ফেলেছে আমাদের পথের ওপর।

যে-পথটা দিয়ে আমরা যাবো, কোনাক্রিকে মূল ডাঙার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে যে-সেতু সেটাকে পেরিয়ে, সেটা বেশ-ভালো রাস্তাই। পাঁচ-ছ ফিট চওড়া, গাড়িঘোড়া যেতে পারে সহজেই, আমরা সে-পথ ধ'রে যাবো তিম্বো, প্রায় আড়াইশো মাইল দূরে । অর্থাৎ, অন্তত তিম্বো অব্দি, আশা করতেই পারি, পথে খুব-একটা অসুবিধে হবে না। আবহাওয়াও ভালো। ছায়ায়, পঞ্চাশ ডিগ্রি ফারেনহাইটও হবে কি না সন্দেহ—আর বর্ষাকাল শেষ হ'য়ে গেছে ব'লে আচমকা যে মুষলধারে বাদল ঝরবে, সে-ভয়ও নেই।

দশটার সময় আমরা একটা নদীর ওপর একটি সেতু পেরিয়েছি—মঁসিয় তসাঁর মতে, সেটা হয় নাকি মানেয়া নয়তো মোরেবাইয়ার শাখানদী—হয় এটার, নয় ওটার। এখনও অব্দি এটা যে কার শাখানদী সে নিয়ে আমরা দ্বিধায় দুলছি। তবে নদী-পেরুনোটা আফ্রিকায় এমন আর কী। কোনো নদী পেরুতে হয় না, এমন দিন এখানে যায় না। ফলে আগেভাগেই জানিয়ে রাখি, আমার লেখাগুলো ভূগোলবিদ্যার পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূত



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে না—যদি-না অসাধারণ-কিছু হয়, তাহ'লে এ-সম্বন্ধে কিছুই আমি বলবো না।

কোনাক্রির কাছ দিয়ে রাস্তাটা দু-পাশের মাঠের মধ্য দিয়ে প্রায় সরলরেখার মতো নাকবরাবর এগিয়ে গেছে। মাঝে-মাঝে কিছু গাছপালা, আর নয়তো ভুট্টা কিংবা জোয়ারের খেত ! গাছের মধ্যে আছে শিমূলগাছ, কলাগাছ, এইসব। পথে পড়েছে এঁদো সব ছোটো-ছোটো গাঁ, মঁসিয় তসাঁ অবশ্য তাদের একেকটা নাম বলেছেন, তবে জনান্তিকে ব'লে রাখি, আমার কেন যেন সন্দেহ হয়, সে-সব তাঁর মনগড়া। তবে কে জানে, পুরোপুরি বানানো নাম নাও হ'তে পারে।

দশটার সময় রোদে তেতে ঘেমে-নেয়ে উঠেছি আমরা। আর কাপ্তেন মার্সেনে আমাদের থামতে বলেছেন। আমরা কোনাক্রি থেকে প্রায় দশমাইল দূরে চ'লে এসেছি, প্রগতি, অতএব, সন্তোষজনক। এখানে দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়ে আমরা একটু জিরিয়ে নেবো। তারপর বিকেলের নাশ্‌তা সেরে নিয়ে পাঁচটা নাগাদ ফের রওনা হবো—রাত নটায় আজ ছাউনি ফেলা হবে।

রোজ নাকি এই ক্রমই অনুসরণ করা হবে, অতএব তারও কোনো পুনরাবৃত্তি আমি করবো না। খামকা এ-সব তুচ্ছ এবং একঘেয়ে খুঁটিনাটি দিয়ে লেখাটাকে নিরেস ক'রে তোলবার দরকারটাই বা কী।

বিশ্রামের জায়গাটা কিন্তু চমৎকারই বেছেছেন কাপ্তেন মার্সেনে। একটা ছোটো বনের ছায়ায় আমরা জমিয়ে বসেছি, গাছপালাগুলো প্রচণ্ড রোদ্দুরের হাত থেকে আমাদের বাঁচাবে। সেপাইশান্ত্রীরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেছে পাহারায়—আর আমরা, অর্থাৎ মিশনের সদস্যরা, মাদমোয়াজেল মোর্‌নাস, কাপ্তেন সাহেব, মঁসিয় দ্য সাঁৎ-বের্‌ঁা, এবং আপনাদের এই-অধম—আমরা বেশ মনোরম-একটা ফাঁকা জায়গায় গাছপালার আড়ালে আসর জমিয়েছি।

আমাদের সুন্দরী সঙ্গিনীর জন্যে একটা তাকিয়া বাড়িয়ে দিতে গিয়ে দেখি কাপ্তেন মার্সেনে এবং মঁসিয় বারজাক আমাকে কোনো সুযোগ না-দিয়েই দুজনে গিয়ে দুটো জলচৌকি নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন। কী-যে লজ্জার ব্যাপার—মাদমোয়াজেল মোর্‌নাস তো ভেবেই পান না কারটাকে বেছে নেবেন। এরই মধ্যে কাপ্তেনসাহেব এবং অভিযানের নেতা পরস্পরের দিকে একটু ট্যারা চোখে তাকাতে শুরু করেছেন। মাদমোয়াজেল মোর্‌নাস কারু মনেই কোনো আঘাত না-দিয়ে ধপ ক'রে ব'সে পড়েছেন মাটিতেই —আমার বাড়িয়ে-দেয়া তাকিয়ায়। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী তখন এককাট্টা হ'য়ে আমার দিকেই জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন।

মঁসিয় বোদ্রিয়ের বসেছেন একপাশে, ঘাসের ওপর, যাদের *'নিরপেক্ষ'* বলা যেতে পারে তাদের মাঝখানে, মধ্যমণির মতো। তাঁরা বিভিন্ন সচিবালয়ের সুযোগ্য প্রতিনিধি —মাদাম এইরিউ, কিরিউ এবং পঁসাঁ। এই শোষোক্ত-জন একটু-বেশি বিবেকবান—আমরা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রওনা হবার পর থেকে অনবরত তিনি তাঁর ধারণাগুলো খাতায় টুকে গেছেন। আমি অবশ্য, সত্যিই জানি না কী তাঁর টীকাটিপ্পনী। একটু যদি ভারিক্কি ও হোমরাচোমরা ভঙ্গি না-হ'তো তো তাঁকে দেখে বোধকরি আমার মঁসিয় প্রুদোঁর চরিত্রের কথাই মনে প'ড়ে যেতো। কী জমকালো ভুরুযুগল! এ-রকম চওড়া কপাল যাঁর সে হয় দুর্দান্ত-বুদ্ধিমান হবে আর নয়তো অসহ্য-ভোঁতা হবে। মাঝামাঝি কিছু থাকতেই পারে না। মঁসিয় পঁসাঁকে যে কোন দলে ফেলবো, তা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি।

ডাক্তার শাতোনে আর মঁসিয় তসাঁ—এমনই অবিচ্ছেদ্য থেকেছেন যে মনে হয়েছে '*কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে*'—*থুড়ি বৃক্ষতলে*। তাঁরা মাটিতে বিছিয়েছেন নানা ভৌগোলিক মানচিত্র। আশা করি ভূগোলের জাবর কাটতে-কাটতে তাকেই তাঁরা একমাত্র খাদ্য ব'লে ভেবে নেবেন না।

মোরিলিরে এদিকে আমাদের জন্যে একটা টেবিল আর বেঞ্চি এনে হাজির করেছে। আমি ব'সে প'ড়ে মঁসিয় দ্য সাঁৎ-বের্যাঁর জন্যে পাশের আসনটা খালি রাখি। কিন্তু মাতুল বা বোন-পো—যা-ই হোন না কেন—সাঁৎ-বের্যাঁ কোথায়? যখনই খোঁজ করা যায় তখনই দেখা যায় তিনি কোথাও নেই।

মোরিলিরে শিবিরের রসুই পাকাবার আয়োজন করে। ৎশুমুকি আর তোঙ্গানের সাহায্যে, সে-ই রান্না করবে আমাদের খাবার; আমরা ঠিক করেছি, নেহাৎ দরকার না-হ'লে ইওরোপ-থেকে-আনা খাবার আমরা খরচ করবো না। যেদিন টাটকা খাবার জুটবে না, সেদিন সেগুলোর সদ্ব্যবহার করা যাবে। মোরিলিরে মাথাখাটিয়ে কোনাক্রিতে কিছু মাংস কিনে নিয়েছিলো। সে সেই মাংস দেখিয়ে আমাদের জানিয়ে গেছে : 'এই সাদে (ভেড়ার মাংস) দিয়ে চমৎকার স্টু পাকাবো আমি—কচি মাংসের মতো ঠেকবে।

তা, শিবিরের প্রথম ভোজটা অবিশ্যি ঠিক কাফে আংলেইর মতো হয়নি, তবু মানতেই হয় দারুণ-উপাদেয় হয়েছিলো। নিজেরাই ভেবে দেখুন : ভেড়ার রাং, জোয়ারের দানা গুঁড়ো ক'রে মাখানো গায়ে, সঙ্গে কারিতে মাখনের ডেলা গালিয়ে সেটা মাংসের ভেতরে চুঁইয়ে ঢোকানো, কিছু শব্জি, ভুট্টার রুটি, ডুমুর, কলা আর নারকেল। যার ইচ্ছে তার সঙ্গে খেতে পারে ঝর্নার টলটলে শুদ্ধজল, অথবা তাড়ি—যদি তাতে কারু অভিরুচি জ'ন্মে যায়।

মোরিলিরে আর তার দুই সহকারী যখন খানা পাকাতে ব্যস্ত, ডাক্তার শাতোনে হঠাৎ উঠে এসে স্থানীয় খাদ্যরুচি সম্বন্ধে আমাদের বিস্তর জ্ঞান দিয়েছেন বিশেষজ্ঞের মতো, যেমন কারিতে মাখন—যাকে আবার *সে* মাখনও বলে, যে-গাছ থেকে গজায় তার নাকি দু-দুটো নাম, তাই তা থেকে প্রস্তুত *স্নেহপদার্থেরও* দু-দুটো নাম। কেমন ক'রে এই মাখন বানায় তার একটা বিশদ বিবরণই দিয়েছেন তিনি, আর শুনে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁর পানে তাকিয়ে মাদমোয়াজেল মোরনাস বলেছেন : 'আপনি কত জানেন!'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, মাদমোয়াজেল, কতটুকু আর জানি। তবে বইয়ের পোকা কি না, অনেক বই পড়েছি, বিশেষত ভ্রমণবৃত্তান্ত।'

জ্ঞানতাপস ডাক্তার শাতোনে যখন তাঁর বৈজ্ঞানিক কাহন শোনাতে ব্যস্ত, এমন সময় জঙ্গল-থেকে-ভেসে-আসা আর্তনাদ শুনে আমার চটকা ভেঙে গিয়েছে। কার গলার আর্তনাদ সেটা চিনতে আমাদের মুহূর্তও লাগেনি। বাজি ধ'রে বলতে পারি, পাঠক-পাঠিকাদের আমি যদি জিগেস করি, 'কার গলা, বলুন-তো?', অমনি তাঁরা সমস্বরে নিশ্চয়ই ব'লে বসবেন, 'কার আবার? নিশ্চয়ই মঁসিয় দ্য সাঁৎ-বেরাঁর।' না, পাঠকপাঠিকাগণ, আপনাদের অনুমানে কোনোই ভুল হয়নি। সত্যিই, মঁসিয় দ্য সাঁৎ-বেরাঁই 'বাঁচাও! বাঁচাও!' ব'লে আর্তচীৎকার জুড়ে দিয়েছিলেন।

আমি তক্ষুনি ছুটে গিয়েছি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে, পেছন-পেছন ছুটে এসেছেন কাপ্তেন মার্সেনে আর মঁসিয় বারজাক। আমরা গিয়ে আবিষ্কার করি, কাদাজলের মধ্যে কোমর অব্দি ডুবে গিয়েছেন সাঁৎ-বেরাঁ। তাঁকে শুকনো ডাঙায় টেনে তুলে এনে যখন আমরা জিগেস করেছি, 'কেমন ক'রে ঐ কাদাজলে, অর্থাৎ এ-দেশে যাকে *মারিগৎ* বলে, তার মধ্যে গিয়ে পড়েছেন, বলুন তো?' অমনি তিনি কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে বলেছেন, 'আমার পা হড়কে গিয়েছিলো।' গা-হাত-পা ছুঁড়ে কাদা ছিটিয়ে আমার সর্বাঙ্গ কাদায় ভরিয়ে দিয়ে তিনি বিশদ করেছেন : 'মাছ ধরতে গিয়ে হঠাৎ পা হড়কে প'ড়ে যাই।'

'ছিপ ফেলে মাছ ধরছিলেন?'

'না-না, মঁসিয় ফ্লরেঁস, হাত দিয়ে খপ ক'রে পাকড়ে ধরতে গিয়েছিলুম।' ব'লে তিনি তাঁর হেলমেটটা দেখিয়েছেন আমাদের, গায়ের কোটটা খুলে সেটাকে পেঁচিয়েছেন তিনি। বলেছেন : 'সবুর। জ্যাকেটটা সাবধানে খুলতে হবে, নইলে হতচ্ছাড়ারা পালিয়ে যাবে।'

'হতচ্ছাড়া? মানে?

'ব্যাঙগুলো।'

আমরা যখন আরাম ক'রে ব'সে আড্ডা দিচ্ছি, তখন কি না তিনি ব্যাঙ ধরতে গিয়েছেন! কী উৎসাহ!

'অভিনন্দন নেবেন,' মঁসিয় বারজাকের অনুমোদন এসেছে তৎক্ষণাৎ, 'চমৎকার খেতে হয় ব্যাঙ... কিন্তু শুনুন তাদের ডাক—ঐ যাদের আপনি পাকড়েছেন। বোঝাই যাচ্ছে, তারা কারু পেটে যেতে চাচ্ছে না!'

অতঃপর আমরা শিবিরে ফিরে এসেছি। সাঁৎ-বেরাঁ গিয়ে তার পোশাক পালটেছেন এবং মোরিলিরে রান্না করেছে তাঁর '*শিকার*'। তারপর টেবিল সাজানো হয়েছে; আমরা সোৎসাহে আক্রমণ করেছি খাদ্যগুলো—বারোমাইল ঘোড়া ছুটিয়ে আসার চাইতে ক্ষুধার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্রেককারী আর কীই-বা হ'তে পারে?

খাবার টেবিলে প্রধানা ছিলেন, বলাই বাহুল্য, মাদমোয়াজেল মোরনাস। সত্যি ভারি উপাদেয় তিনি। (জানি, আগেই কথাটা বলেছি, তবে এ-কথাটা কখনও ব'লে ফুরুতে পারবো না।) সরলা তরুণী, একটু ডানপিটে গোছের, তাঁর মধুর হাসি মুহূর্তে সব জড়তা ঘুচিয়ে দেয়।

'আমার মামা...' (তাহ'লে সত্যি তিনি এঁর মামা? তা-ই কি?') 'আমার মামা,' মৃদু হেসে তিনি বুঝিয়েছেন আমাদের, 'আমাকে ছেলেদের মতো ক'রেই মানুষ করেছেন —আমাকে তিনি পুরুষই বানিয়ে তুলেছেন। দোহাই, আমি-যে মেয়ে, সে-কথাটা ভুলে যাবেন, নিজেদের একজন ব'লেই ভাববেন আমাকে।'

তবু কিন্তু, কথাটা বলতে-বলতেই, কাপ্তেন মার্সেনের দিকে কটাক্ষ ক'রে মধুর হাসতে তাঁর বাধো-বাধো ঠেকেনি—অর্থাৎ, যেন এমনতর যুবাপুরুষদের মধ্যে কটাক্ষ, চোখের হাসি, অধরের স্ফুরণ কিছুই এখনও বাদ যায়নি।

কফি দিয়ে গলা ভিজিয়ে নেবার পর, আমরা শান্ত হ'য়ে এলিয়ে পড়েছি তালগাছগুলোর তলায় ঘাসের জাজিমের ওপর—দিব্বি এক সিয়েস্তার আয়োজন। আগেই তো বলেছি, পাঁচটার সময় ফের আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে, কিন্তু কনভয় সাজাতে গিয়ে দেখা গেলো, মিথ্যেই আমরা এক ইটের দেয়ালে মাথা ঠুকে মরছি। সময় হবার জানান দিয়ে মিথ্যেই ডেকে-ডেকে গলা ভেঙেছে মোরিলিরে—কিন্তু কেউ নড়েনি জায়গা ছেড়ে—একবাক্যে বলেছে তারা এখনও চাঁদ দ্যাখেনি, আর চাঁদ দ্যাখেনি ব'লেই *তারা* এখন যায় কী ক'রে? আমরা একটু হতভম্ব হ'য়ে পড়েছি *দেখে দিব্যদৃষ্টিধারী* মঁসিয় তসাঁ হেঁয়ালিটার সমাধান ক'রে দিয়েছেন: 'ব্যাপারটা কী, জানি। সব ভ্রমণবিদই তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্তে এ-কথাটার উল্লেখ করেছেন। শুক্লপক্ষের গোড়ার দিকে—অমাবস্যা গেছে মাত্র দু-দিন আগে—এখানকার লোকে বলে "চাঁদ না-দেখে বেরুলে নাকি দারুণ-অমঙ্গল হয়। কেউই যখন চাঁদ দ্যাখেনি, রাস্তাঘাট তখন শুভ হবে না আমাদের।" '

'*ইয়ু! ইয়ু!* (হ্যাঁ-হ্যাঁ) !' এলো সমস্বর সমর্থন, যখন মোরিলিরে এই তর্জমা ক'রে শুনিয়েছে তল্পিবাহকদের।

'*কারো! কারো!*' (চাঁদ! চাঁদ!)'

বোঝাই গেছে, পৃথিবীর উপগ্রহটি দয়া ক'রে যদি দেখা না-দেন, এরা তবে এক পাও নড়বে না। কিন্তু চাঁদই বা অসময়ে উঠে আসবে কী ক'রে? এখনও তো বেলা প'ড়ে যায়নি—দিন আছে। দয়া ক'রে যদি ছটার একটু-আগে চাঁদ তার রূপটি না-দেখাতো, তবে আমাদের ওখানেই প'ড়ে থাকতে হ'তো। কিন্তু মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঁকি দিতেই সবাই সেলাম ঠুকে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠেছে: 'আল্লাহ্ মা তুলা কেন্দে। কারো কুতাইয়ে!' (ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করেছেন! আমরা নতুন চাঁদ দেখতে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়েছি !)' আর অমনি কনভয় হনহন ক'রে চলতে শুরু ক'রে দিয়েছে।

কিন্তু এই-ফাঁকে দু-দুটি ঘণ্টা নষ্ট হয়েছে আমাদের—ফলে রাতের পথচলার মেয়াদও দু-ঘণ্টা ক'মে যাবে।

নটা নাগাদ, আমরা জঙ্গলের মধ্যেই থেমে পড়েছি। তাঁবু খাটানো হয়েছে। জায়গাটা অবশ্য পুরোপুরি জনবর্জিত নয়। ডানদিকে পায়ে-চলার পথ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে স্থানীয় কারু কুঁড়েবাড়ি—কোনো অজ্ঞাত রহস্যময় কারণে এখন-পরিত্যক্ত; বামদিকেও মুখোমুখি আরেকটা কুঁড়েঘর, তবে তাতে সম্ভবত লোক আছে।

কাপ্তেন মার্সেনে পরিত্যক্ত বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আন্দাজ ক'রে নিয়েছেন সেটা বাসযোগ্যই হবে, মাদমোয়াজেল মোরনাসকে এসে বলেছেন, তাঁর পক্ষে ঐ বাড়িটায় রাত কাটানোই ভালো হবে। মাদমোয়াজেল মোরনাস অমনি লুফে নিয়েছেন প্রস্তাবটা এবং হাতে-চাঁদ-পাওয়ার মতো ভাব ক'রে তক্ষুনি উধাও হ'য়ে গিয়েছেন ঐ অপ্রত্যাশিত সরাইখানাটায়।

দশ মিনিটও যায়নি, অমনি আমরা শুনতে পেয়েছি কুঁড়েবাড়িটার মধ্য থেকে সকাতর *'বাঁচাও ! বাঁচাও !'* ধ্বনি আসছে। আমরা ছুটে রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে দেখি মাদমোয়াজেল মোরনাস কুঁড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে বিবমিষার ভঙ্গিতে মেঝের দিকে আঙুল তুলে কী যেন দেখাচ্ছেন।

'এগুলো কী ?' তাঁর কাতর জিজ্ঞাসা।

*এগুলো* আসলে অগুনতি শাদা-শাদা শূককীট। ঘুণপোকাগুলো মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে এমন বিপুল সংখ্যায় কিলবিল ক'রে বেড়াচ্ছে যে মনে হচ্ছে গোটা জমিটাই বুঝি ফুলে-ফুলে উঠছে।

'একবার শুধু কল্পনা ক'রে দেখুন,' মাদমোয়াজেল মোরনাস আমাদের অনুরোধ করেছেন, 'আমার হাতে-মুখে *এগুলোর* হিম ছোঁয়া পেয়ে আমি কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিলুম ! দেখি, সবখানেই *এগুলো* কিলবিল ক'রে বেড়াচ্ছে, এমনকী আমার পকেটেও ! যখন গা ঝাঁকিয়েছি, *এগুলো* জামাকাপড় থেকেও টুপটুপ ক'রে খ'সে পড়েছে। উঃফ ! কী বীভৎস জীব !'

মঁসিয় দ্য সাঁৎ-বেরাঁ এতক্ষণ বাদে এসে হাজির। এসেই কিন্তু সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পেয়েছেন তিনি; *এগুলোকে* নিরীক্ষণ ক'রে তাঁর মুখচোখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে, ব'লে উঠেছেন, 'বাঃ, চমৎকার !... *এগুলো* ভারি শান্তশিষ্ট—কিছু করে না !'

হ'তেও পারে-বা ! কারণ তিনি এদের সম্বন্ধে সব খবর রাখেন, এই মঁসিয় দ্য সাঁৎ-বেরাঁ। এর মধ্যেই তিনি ঝুঁকে প'ড়ে এদের কুড়োতে লেগে গিয়েছেন।

'এগুলো কুড়িয়ে নিয়ে জমাবার কোনো দরকারই নেই,' তোঙ্গানে তাঁকে বলেছে। 'আমরা যেদিক দিয়ে যাবো অজস্র দেখা যাবে এদের। ভারি-মন্দ এগুলো, সবখানেই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গজাচ্ছে—কিছুতেই এদের আর খতম ক'রে দেয়া যায় না!'

শুনে মহা-আহ্লাদ হয়েছে আমাদের! *চমৎকার* কাটবে তাহ'লে রাতগুলো—এদের সঙ্গে সহবাস ক'রে! কিন্তু এখানকার স্থানীয় লোকেরা—তারা কী করে এই অন্তহীন কিলবিল-করা পোকাগুলো নিয়ে?

সন্দেহ নেই, আমি বোধহয় সশব্দেই ভাবছিলুম। 'খায় এদের, মোসু।' তোঙ্গানে ব্যাখ্যা করেছে, 'ভারি-ভালো খেতে—দারুণ-স্বাদ।'

মাদমোয়াজেল মোরনাসের অবশ্য এ-সব জীবে রুচি নেই, যদিও ব্যাঙ খেতে তাঁর ব্যাজার মুখ দেখা যায়নি। তিনি তৎক্ষণাৎ এই অভাবিত সরাইখানার আতিথ্য ত্যাগ ক'রে তাঁবুর মধ্যেই রাত কাটাবেন ব'লে স্থির ক'রে নিয়েছেন। এমন সময় মোরিলিরে এসে তাঁকে জানিয়েছে এক নিগ্রো তরুণী—তাঁকে খামারেরই একটা কুঁড়েঘরে থাকতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কুঁড়েঘরটা তকতকে ঝকঝকে, নিকোনো, সাফসুতরো—এবং কিমাশ্চর্য! —এমনকী একটা সাহেবি কেতার খাট পর্যন্ত সেখানে আছে।

'আপনি বখশিশ দেবেন, টাকা।' মোরিলিরে জানিয়েছে, 'তাহ'লেই নিগ্রো মেয়েটি খুশি হ'য়ে থাকতে দেবে।'

মাদমোয়াজেল মোরনাস সাগ্রহে এই '*ভাড়াটে*' আতিথ্য গ্রহণে রাজি হ'য়ে গেছেন, এবং আমরা তাঁকে প্রায়-শোভাযাত্রা ক'রেই তাঁর নতুন বাসভবনে পৌঁছে দিতে গিয়েছি। নিগ্রো যুবতীটি আমাদেরই জন্যে একটা গাছের কাছে দাঁড়িয়েছিলো। তরুণী নয়, বালিকাই; বয়েস বোধহয় পনেরো হবে; মাঝারি গড়ন; বেশ রূপবতীই—ঠিক একটা কালো মার্বেল পাথরে কোঁদা মূর্তির মতো দেখাচ্ছিলো তাকে। আমরা যখন গিয়ে পৌঁছেছি, সেই মর্মরমূর্তি তখন গাছটা থেকে কী যেন পেড়ে নিচ্ছিলো।

'শুয়োপোকা সংগ্রহ করছে,' নিগ্রো-রন্ধনবিদ্যাবিশারদ ডাক্তার শাতোনে আমাদের খুলে বলেছেন, 'এদের শুঁয়োগুলো সাফ ক'রে রোদে শুকোতে হবে—আর তারপর —মোটেই চমকে যাবেন না—এগুলো দিয়ে সে চাটনি বানাবে। এদের বলে *সেতোস্বো*। এই-জাতের শুঁয়োপোকাই শুধু খায়, আর শুনেছি, ভারি নাকি মুখরোচক।'

'তা ঠিক!' মোরিলেরে জিভ দিয়ে সড়াৎ ক'রে একটা আওয়াজ করেছে। 'ভারি-সোয়াদ।'

আমাদের দেখতে পেয়ে নিগ্রো মেয়েটি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসেছে। 'আমি,' মাদমোয়াজেল মোরনাসকে সে প্রায়-নিখুঁত ফরাশিতে বলেছে, 'আমি একটা ফরাশি স্কুলে পড়েছি—কিছুদিন এক শ্বেতাঙ্গিনীর পরিচারিকা ছিলুম—এক জাঁদরেল অফিসারের স্ত্রী। গাঁয়ে ফিরে যেতেই ভারি-একটা যুদ্ধ লেগে যায়, আমাকে বন্দী ক'রে নেয়। শ্বেতাঙ্গিনীরা যেমন ক'রে বিছানা পাতা পছন্দ করেন, আমি তা জানি। আমার অসুবিধে হবে না।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে-বলতে, মাদমোয়াজেল মোরনাসের হাত ধ'রে সে কুঁড়েটার দিকে নিয়ে গেছে।

আমরা ফিরে আসি: এবার আমাদের বান্ধবী অন্তত খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্যেই কাটাতে পারবেন। কিন্তু আমাদের তখনও ঘুমের সময় আসেনি—না তাঁর, না-বা আমাদের। আধঘণ্টাও কাটেনি, মাদমোয়াজেল মোরনাস ফের সাহায্য চেয়ে হাঁকাহাঁকি শুরু ক'রে দিয়েছেন।

ফের-একবার পড়িমরি ক'রে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যেতে হয়েছে আমাদের, আর মশালের আলোয় অপ্রত্যাশিত একটা দৃশ্য দেখে বুঝি আঁৎকেই যেতে হয়েছে।

কচি নিগ্রো মেয়েটি উপুড় হ'য়ে প'ড়ে আছে কুঁড়েটার দেহলির কাছে। জেব্রাদের মতো তার পিঠে লাল ডোরা কাটা, আর বেচারি এমন হাউ-হাউ ক'রে কাঁদছে যে পাষাণেরও বুঝি বুক ফেটে যেতো! তার সামনেই নিজের শরীরটা দিয়ে তাকে আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মাদমোয়াজেল মোরনাস—খেপে গেলে তাঁকে দারুণ দেখায়!—আর বিশাল-এক নিগ্রোকে ঠেকিয়ে রেখেছেন সামনে, সে তখনও একটা রক্তমাখা ছড়ি হাতে নিয়ে তিড়িংবিড়িং ক'রে লাফাচ্ছে। তক্ষুনি আমরা তার কাছে কৈফিয়ৎ চেয়েছি।

কিন্তু মাদমোয়াজেল মোরনাসই সব খুলে বলেছেন।: 'শুধু ভাবুন একবার—আমি সবে গিয়ে একটু শুয়েছি! মলিক—এই ছোট্ট মেয়েটির নাম *মলিক*—আমাকে পাখার হাওয়া করছে, সবে একটু তন্দ্রামতো লেগেছে, এমনসময় এই বিশাল জানোয়ারটা এসে হাজির, এ-ই নাকি এই খামারটার মালিক—অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়ি ফিরে এসেছে। আমাকে দেখেই সে রেগে-আগুন, হিড়হিড় ক'রে হিঁচড়ে টেনে বার ক'রে নিয়ে গেছে মলিককে, আর বেদম পেটাতে শুরু ক'রে দিয়েছে নির্দয়ভাবে—তার বাড়িতে শাদা লোককে নিয়ে-আসার নাকি এটাই উচিত শাস্তি।'

মঁসিয় বোদ্রিয়েরও রসিকতা জানেন! তাজ্জব! তিনি বলে উঠেছেন : 'কী আদবকায়দা—আহা, ম'রে যাই!'

অন্তত এটা যদি রসিকতা হয়, তবে খুবই লাগসই হয়েছে বলতে হবে। কিন্তু তারপরেই নিজের বঙ্কিম কটাক্ষটা নিজেরই মাথায় চ'ড়ে গেছে তাঁর, জনসভার ধরনে ভাষণ দিতে লেগে গিয়েছেন তিনি : 'তবে দেখুন, মহোদয়গণ, এই সব বন্য বর্বর জানোয়ারগুলোকে কি না নাগরিক অধিকার দিতে চাচ্ছেন আপনারা—ভোটের অধিকার দিতে চাচ্ছেন!'

নিশ্চয়ই তিনি ভেবেছেন, তিনি সংসদের সভামণ্ডপে দাঁড়িয়ে আছেন।

মঁসিয় বারজাক এমন জ্ব'লে উঠেছেন মনে হয়েছে বুঝি একটা বোলতা এসে তাঁর গায়ে হুল বিঁধিয়েছে। সামলাতে না-পেরে শুষ্কস্বরে ব'লে উঠেছেন : 'যেন সুসভ্য ফরাশিরা তাদের বউকে ধ'রে আর পেটায় না!'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনিও খুব-একটা ভুল বলেননি, আমাদের এই অপর সাংসদ, মঁসিয় বারজাক।

তাহ'লে যুযুধান দুই সাংসদের বাচিক মল্লযুদ্ধ দেখতে পাবো আমরা—অভিযানের প্রথম রাতেই? না। মঁসিয় বোদ্রিয়ের এর কোনো জবাব দেবার প্রয়োজন আছে ব'লেও মনে করেননি। মঁসিয় বারজাক সেই ছড়ি-হাতে-দাঁড়ানো গরজাতে-থাকা খামার-মালিকের দিকে ফিরে বলেছেন : 'এ আর তোমার কাছে থাকবে না। একে আমরা আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো।'

কিন্তু নিগ্রোটি তা মানবে কেন? এই নিগ্রো মেয়েটি তার সাধের ক্রীতদাসী : সে তাকে দস্তুরমতো দাম দিয়ে কিনেছে। ফরাশি সাম্রাজ্যে যে ক্রীতদাসপ্রথা রদ ক'রে দেয়া হয়েছে, এখন একে সেইকথাই বোঝাতে হবে নাকি? মঁসিয় বারজাক তার ধারকাছ দিয়েই যাননি। তিনি *আরো-ভালো* একটা উপায় বাৎলেছেন : 'আমি একে তোমার কাছ থেকে কিনে নেবো। কত দাম?'

শাবাশ, মঁসিয় বারজাক, বাহবা কি বাহবা! সাধে কি লোকে তাঁর বুদ্ধির এত তারিফ করে? এদিকে দাঁও মারবার সুযোগ পেয়ে নিগ্রোটি তার হম্বিতম্বি একটু থামিয়েছে। দাম হিশেবে সে চেয়েছে : একটা গাধা, একটা বন্দুক, আর পঞ্চাশ ফ্রাংক।

'পঞ্চাশ ফ্রাংক, না আর-কিছু! লাঠির ঘা পঞ্চাশটা—এই তোমার প্রাপ্য!' কাপ্তেন বলেছেন : 'তাহ'লেই তুমি সজুত হবে।'

সত্যি, বিপুলা এ দরকষাকষির পৃথিবীর কতটুকুই বা আমরা জানি! শেষটায় রফা হয়েছে; একটা পুরোনো গাদাবন্দুক, কয়েক গজ কাপড়, আর পঁচিশ ফ্রাংক। এ যেন প্রায় কন্যাদান—কোনো মুনাফা না-রেখেই!

দরকষাকষি যখন চলছে, মাদমোয়াজেল মোর্নাস মলিককে তুলে ধ'রে দাঁড় করিয়ে দিয়ে কারিতে মাখনের মলম বুলিয়ে ঘাগুলোয় পট্টি বেঁধে দিয়েছেন। বেচাকেনা সাঙ্গ হ'তেই মেয়েটিকে আমাদের শিবিরে নিয়ে এসে শাদা একটা জামা পরতে দিয়েছেন, আর হাতে একমুঠো টাকা দিয়ে বলেছেন : 'ব্বাস! আর তুমি ক্রীতদাসী নও! আমি তোমায় মুক্ত ক'রে দিলুম!'

মলিক কিন্তু খুশি হবার বদলে আবার কান্নায় ভেঙে পড়েছে। বলেছে, তিনকুলে তার কেউ নেই, সে একেবারে একা, 'এই দয়াবতী শ্বেতাঙ্গিনীর স্নেহপাশ ছেড়ে সে কোথাও যেতে চায় না'। বরং তাঁর পরিচারিকার কাজ করবে সে, খাশ পরিচারিকা—তাঁরই সেবায় বাকিটা জীবন কাটিয়ে দেবে!

'থাকুকই না-হয় মেয়েটি,' সাঁৎ-বের্ঁা নাক গলিয়েছেন দুজনের মাঝখানে। 'কাজেও লাগবে তোর। ফাই-ফরমাশ খাটবে। তাছাড়া যতই পুরুষ সাজুক, কোনো মেয়ের কি টুকিটাকি ফাইফরমাশের অন্ত আছে?'

মাদমোয়াজেল মোর্নাস রাজি হ'তেই মলিকের কৃতজ্ঞতার প্রকাশ দ্যাখে কে! সে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাঁৎ-বেব্যাঁর কথায় ওষুধ ধরেছে দেখে, তাঁর গলা জড়িয়ে ধ'রে, চুমু-টুমু খেয়ে সে-এক কাণ্ড ! পরের দিন সাঁৎ-বেব্যাঁ নিজের মুখে আমায় বলেছেন, জীবনে কখনও তিনি এমন অস্বস্তিতে পড়েননি।

মাদমোয়াজেল মোর্‌নাস অবশ্য সে-রাতে আর স্থানীয় আতিথ্য নেবার চেষ্টা করেননি। তাঁরও জন্যে একটা তাঁবু খাটিয়েছি আমরা—আর বাকি রাতটা বেশ-নিরুপদ্রবেই ঘুমিয়ে কেটে গেছে আমাদের।

এই হ'লো গিয়ে আমাদের অভিযানের প্রথম দিনের বিবরণ।

বাকি দিনগুলোও সম্ভবত এ-রকমই কাটবে। অতএব আমি আর বিশদভাবে তাদের বর্ণনা দেবো না। অন্যকিছু যদি বলা না-হয়, তবে ভার্জিলের এই কথাগুলোই লাগসই বোধ হবে : *আব্ উনা ডিস্‌কে ওম্‌মেস,* যেমন একখানা, তেমনি বাকি সবগুলোই।

**আমেদে ফ্লরেঁস**

## পাঁচ

# আমেদে ফ্লরেঁসের দ্বিতীয় নিবন্ধ

আমেদে ফ্লরেঁসের দ্বিতীয় নিবন্ধ *ল্যাক্সপানসিয়ঁ ফ্রাঁসেঈ*-এর ১৮ জানুয়ারি সংখ্যায় বেরিয়ে ছিলো।

**বারজাক মিশন**

*[ নিজস্ব সংবাদদাতার প্রতিবেদন ]*

*দাউহেরিকো,* ১৬ই *ডিসেম্বর*। আমাদের অভিযানের প্রথম দিনেই, জঙ্গলের মাঝখানে, রাত্রিবেলায় লণ্ঠনের টিমটিমে আলোয় ব'সে প্রথম প্রতিবেদন পাঠাবার পর, আমাদের পথচলার দিনগুলো বেশ আনন্দেই কেটেছে, অতএব তার কোনো বৃত্তান্তই নেই।

দোসরা ডিসেম্বর আমরা শিবির তুলেছিলুম ভোর পাঁচটায়, আর আমাদের সারি —এখন তো আরো-একজন অতিরিক্ত সদস্যা তার—কদম-কদম বেরিয়ে পড়েছিলো। একটা গাধার পিঠ থেকে বোঝা নামিয়ে অন্যদের পিঠে তা ভাগাভাগি ক'রে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো, যাতে মলিক তার ওপর চড়তে পারে। একেবারেই ছেলেমানুষ এই মলিক, না-না, ছেলেমানুষ নয়, কচিমেয়ে, সে এর মধ্যেই রাতের মারপিটের কথা ভুলে গিয়েছে। সব-তাতেই তার খিলখিল ক'রে উচ্ছল হাসি, যেন একটা ঝর্নার মতো অবিরল উপচে পড়ছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর থেকে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট পথেই চলেছি, ছক-অনুযায়ীই; এখনও অব্দি রাস্তা বেশ-ভালো, সহজগম্য; লোকের গায়ের রং আর দারিদ্র্যপীড়িত শীর্ণ লাঞ্ছিত গ্রামগুলোর মধ্য দিয়ে না-গেলে আমরা ভাবতে পারতুম আমরা হয়তো কোনোদিনই ফ্রান্স ত্যাগ করিনি।

আমরা যে-অঞ্চলটার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি সেটা সমতল—কোথাও হয়তো সামান্য নেমে যায় জমি, কোথাও অর্ধমনস্ক পাহাড় ওঠে উত্তরদিগন্তে—কিন্তু এ ছাড়া ধূ-ধু করে সব—যত-দূর চোখ যায় স্থগিতবৃদ্ধি বেঁটেখাটো উদ্ভিদে ভরা জমি, ঝোপঝাড় অথবা ঘাসে ভরা, দু-তিন গজের বেশি লম্বা হবে না, এখানকার লোকে বলে *বুশ*, ঝোপ। এখানে-সেখানে গজিয়েছে গাছপালা, শীর্ণ—সংখ্যায় কমই খুব, গরমের দিনে সাভানায় দাবানল জ্ব'লে ওঠে, আর আগুন গাছপালা খেতে খুবই ভালোবাসে—সেইজন্যেই বড়ো-গাছ বুঝি গজাতেই পারেনি কোথাও। মাঝে-মাঝে অবশ্য চাষের জমি পড়ে পথে, খামার, *লুগান* বলে এদের স্থানীয় ভাষায়, সেগুলো দেখা দিলেই বোঝা যায় তারপরেই অন্তত কয়েকটা লম্বা-লম্বা গাছ চোখে পড়বে। আর তখনই আমরা এসে পৌঁছুই কোনো গ্রামে। আর গ্রামগুলোর নামও ভারি উদ্ভট শোনায় আমাদের কানে : ফঙ্গুম্বি, মানফুরু, কাফু, উসু—ইত্যাদি। আমি হাল ছেড়ে দিই। যেমন সবাই নাম দেয় ফ্রান্সে, তেমনি-কোনো নাম কি এরা দিতে পারে না—তাহ'লে বরং আমরা অভ্যস্ত নামধাম শুনে আহ্লাদ পেতে পারতুম!

বোধকরি না-বললেও চলবে মিশনের নেতা সবচেয়ে দুঃস্থ দারিদ্র্যলাঞ্ছিত গ্রামগুলোয় গিয়ে গাঁওবালাদের মধ্যে শোরগোল তুলে দেন—তাঁর প্রফুল্ল আনন আর উপঢৌকনগুলো বেশ-সাড়াই তোলে। কিন্তু তাঁর আড়ালে বোদ্রিয়ের গিয়ে চেষ্টা করেন উলটোরকম সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করতে। এবং যা-যা সিদ্ধান্ত করেন তা যে পরস্পরের একেবারে-উলটো হয় তা বোধহয় বলার দরকার নেই—দুজনেই ফিরে আসেন সমান-হৃষ্ট, মুখে একই পরিতোষের ভাব। ফলে সকলেই খুব-খুশি। এর চেয়ে নিখুঁত অবস্থা আর কীই-বা হ'তে পারে।

আর আমরা? আমরা কখনও পেরিয়ে যাই নদী, অন্যসময় বা নদীর তীর ধ'রেই চলি। নদীদের নামগুলোও আমার জিভে জড়িয়ে যায়। এক উপত্যকা থেকে অন্য উপত্যকায় চ'লে যাই, তফাৎ কিছুই চোখে পড়ে না, কোনো তুলকালাম রোমাঞ্চকর আগ্রহ এর মধ্যে খুঁজে পাবে কে?

যখনই খাতা খুলে সংক্ষেপে দু-একটা খুঁটিনাটি লিখে রাখার চেষ্টা করি, দেখতে পাই সমকালীন ইতিহাসের কানে-কানে যে ফিশফিশ ক'রে কোনো গোপন কথা বলবো, সে-রকম কিছুই নেই। শেষটায় ছয়ই ডিসেম্বর মঁসিয় সাঁৎ-বের‍্যাঁ—ক্রমেই প্রায় জিগরি দোস্তই হ'য়ে উঠছেন আমার—বললেন আমাকে প্রফুল্ল করার জন্যে তাঁর একটা ফন্দি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেঁজে নেয়া উচিত। আর আমোদ যদি জোটে, তাহ'লে আশা করি পাঠকেরাও তার ভাগ পেয়ে যাবেন।

সেদিন সন্ধেবেলায় আমরা একটা গাঁয়ের কাছেই ছাউনি ফেলেছিলুম—অন্যগুলোর মতো অমন নামকাওয়াস্তে দুঃস্থ গ্রাম নয়, নাম উলিয়া। যথাসময়ে আমি আমার তাঁবুতে ঢুকেছি, সারাদিনের ধকলের পর আমার একটু বৈধ অধিকার জন্মেছে ঘুমের ওপর। গিয়ে দেখি সাঁৎ-বেব্যাঁ, গায়ের জামা খোলা, একটা গেঞ্জি আর প্যান্ট পরনে, বাকি-সব বসন এদিক-ওদিক, এলোমেলো, ধুলোয় লোটাচ্ছে। বিছানা পাতা। প্রথমে দেখে মনে হ'তেই পারে তাঁর মনোবাসনা বুঝি আমারই তাঁবুতে ঘুম লাগাবার। ঢোকবার মুখটায় থমকে দাঁড়াই আমি, আমার এই অপ্রত্যাশিত অতিথি কী করেন, তা-ই দেখবার জন্যে।

আমাকে দেখে সাঁৎ-বেব্যাঁ যে খুব-একটা অবাক হন, তেমন মনে হয় না। তা সে-কথা যদি ওঠেই তবে জনান্তিকে ব'লে রাখি, তাঁকে আমি কখনোই চমকাতে বা অবাক হ'তে দেখিনি। ভারি ব্যস্তসমস্ত, একটু যেন অস্বস্তিও আছে, কেবলই উশখুশ করছেন, সবকিছু হাৎড়ে দেখছেন, একবার তো আমার কিট-ব্যাগেও হাত ঢুকিয়েছেন, সেটা খুলে তারপর ভেতরের সবকিছু ছত্রখান ক'রে ছিটিয়ে ফেলেছেন মাটিতে। কিন্তু যা খুঁজছিলেন তা বোধহয় পাননি—আর তাতে যেন একটু উত্ত্যক্তও বোধ করেছেন। আমার দিকে ফেরেন তিনি, আমাকে দেখে বিন্দুমাত্র বিস্মিত বা বিচলিত না-হ'য়ে। বেশ দৃঢ়সুরে ব'লে ওঠেন : 'অন্যমনস্ক লোকজন আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না। ভারি হাড়জ্বালানে লোক হয় এরা।'

আমি একটুও সংকোচ না-ক'রেই বলি : 'সত্যি হাড়জ্বালানেই। কিন্তু আপনার আবার হঠাৎ কী হ'লো, সাঁৎ-বেব্যাঁ?'

'আচ্ছা, একবার ভাবুন তো,' তিনি বলেন, 'আমার পাজামা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। নিশ্চয়ই হতচ্ছাড়া ৎশুমুকিটা সেটা এর আগের বারে যেখানে থেমেছিলুম, সেখানেই ফেলে রেখে এসেছে।'

আমি ইঙ্গিত করি : 'যদি অবশ্য আপনার নিজের কিট-ব্যাগটায় পাজামাটা না-থাকে—

'আমার, কিট-ব্যাগে... ?'

'এ কিট-ব্যাগটা অবশ্য আমার, মঁসিয় দ্য সাঁৎ-বেব্যাঁ, ঠিক যেমন এই তাঁবু এবং ঐ চিত্তাকর্ষক বিছানাটাও আমার!'

সাঁৎ-বেব্যাঁ তাঁর বিস্ফারিতলোচনে বিস্ময় ফোটান—সম্ভবত জীবনে এই প্রথমবার। হঠাৎ বুঝতে পেরে যান তাঁর ভুলটা, হুড়মুড় ক'রে মাটি থেকে ছাড়া-জামাকাপড় তুলে নিয়ে তাঁবু থেকে ছুটে বেরিয়ে যান যেন মনে হয় তাঁকে বুঝি একদল হিংস্র জন্তু তাড়া করেছে। আমি গিয়ে ধপ ক'রে গা এলিয়ে দিই বিছানায়, কুণ্ডলি পাকিয়ে যাই আরামে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যি, সাঁৎ-বের্ঁার কোনো তুলনা হয় না ! ভুলোমন লোক নাকি উনি একেবারেই সইতে পারেন না !

পরদিন, সাতই ডিসেম্বর, আমাদের সকালবেলার কুচকাওয়াজের পর আমরা সবে টেবিল সাজিয়ে বসেছি, দেখি কতগুলো নিগ্রো একটু-দূর থেকে আমাদের হাঁ হা ক'রে দেখছে। কাপ্তেন মার্সেনে দুজন সেপাইকে বলেন ওদের টিট ক'রে দিয়ে আসতে; তারা চটপট কেটে পড়ে, কিন্তু খানিক বাদেই ফের এসে উদয় হয়।

'হঠিয়ে দাও স্থানীয় লোক, অমনি আবার, স্বস্থানেই, দল বেঁধে সব হাজির,' ডাক্তার শাতোনে ভেবেছেন বর্তমান অবস্থায় একটু অদলবদল ক'রে পুরোনো প্রবচনই লাগসই হবে। বিষয়ের সঙ্গে কোনো সংগতি থাকুক চাই না-থাকুক, তড়বড় ক'রে পুথির বুলি শোনাতে তাঁর বোধহয় দারুণ-ভালো লাগে । যার যা রুচি।

এবার পাঠানো হয়েছে মোরিলিরেকে, সরেজমিন তদন্ত ক'রে আসতে। সে ফিরে এসে শোনায়, এই কালোরা আসলে বেনে আর ভূতের ওঝা, গুনতিতে দশজন হবে তারা, তাদের কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নেই, তারা শুধু তাদের বেসাতি বেচতে চায় আমাদের কাছে—অনুমতি দিলে একটু আমোদও জোগাবে।

'রুপোর বাসন সব বাক্সে পোরো!' মঁসিয় বারজাক ভাবেন যে খুব বুঝি রসিকতা হ'লো। 'তারপর সব কটাকে *খাবার ঘরে* আসতে বলো !'

তো, কালোরা এলো দল বেঁধে, বিদঘুটে সব রং চং মেখে সেজেছে এরা। তাদের মধ্যে কারিগর আছে, ছত্রিশ রকম পণ্য বানাতে পারে—থালা, বাটি, গয়নাগাটি, বেতের ঝুড়ি, কাঠ দিয়ে বা লোহা দিয়ে বানানো মূর্তি বা অন্য শিল্পদ্রব্য; অস্ত্রশস্ত্রও ফিরি ক'রে বেড়ায় এরা, কাপড়ের থান, আর *কোলা বাদাম*—যা কিনে আমরা প্রচুর পরিমাণে ভাঁড়ারজাত ক'রে রাখি। এই *কোলা নাটের* মাহাত্ম্য বুঝি আমরা, ডাক্তার শাতোনে একে বলেন মিতব্যয়ীর খাদ্যভাণ্ডার, একটু নুনের বদলে এত *কোলা নাট* পেয়ে তিনি বেজায়-খুশি, আমরা যে-অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছি, নুন সেখানে দুর্লভ—বলা যায়, অমূল্য। উপকূল থেকে যত-ভেতরে ঢুকবো ততই মূল্যবান হ'য়ে উঠবে নুন, তাই আমরা বড়ো-বড়ো নুনের চাঙড় নিয়ে এসেছি। কেনাকাটার পর আমরা ডেকে পাঠিয়েছি ডাইনিপুরুৎদের —আর বলেছি ওদের চমৎকার গানগুলোর মধ্যে যেটা সবচেয়ে-চমৎকার সেটাই গেয়ে শোনাতে।

নিগ্রোভূমির এই চারণরা সেখানে ছিলো সংখ্যায় মাত্র দুজন। একজনের হাতে একটা গিটার! কী অদ্ভুত যে গিটার !... একটা কালাবাশ অর্থাৎ লাউয়ের খোল, শুকনো, লম্বালম্বি তার ওপর গেছে বাঁশের সরু কঞ্চি, তিনখানা, প্রত্যেকটার সঙ্গে লাগানো বনবেড়ালের নাড়ি শুকিয়ে বানানো তার। অন্য ওঝাটির হাতে এক বাঁশি, একটা নলখাগড়ার নলের দু-পাশে দুটো ছোট্ট লাউয়ের খোল !... ব্বাস, শুরু হ'য়ে গেলো জলসা। দ্বিতীয় ওঝার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরনে শুধু-একটা নেংটি, সে নাচ জুড়ে দেয়, অন্য ওঝার গায়ে একটা জামা আছে, সে ব'সে-ব'সে ঝমঝম ক'রে তার গিটার বাজায়, আর সঙ্গে-সঙ্গে কণ্ঠ্যবর্ণে ভরপুর নানা অদ্ভুত আওয়াজ করে, ভেতরে কোথাও-একটা ছন্দও আছে তার—আর সম্ভবত এই সংগীতে গুণকীর্তন করা হয়েছে চাঁদ, সূর্য আর হাজার তারার—এবং বোধহয় মাদমোয়াজেল মোরনাসেরও।

একজনের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি, অন্যজনের অদ্ভুত কণ্ঠ্যনাদ আমাদের সঙ্গে যে তল্পিবাহকেরা ছিলো তাদেরও মধ্যে চুলবুল তুলে দিলে; তারা পাতের খাওয়া ছেড়ে, দল বেঁধে গিয়ে এমন-একটা ব্যালেনাচের আসর জমিয়ে দিলে, খুব কম ক'রে বললেও যাকে বলা যায় অসাধারণ।

আর তাদের দৃষ্টান্ত দেখে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে, আমরাও বাসনকোশন তুলে নিয়ে কাঁটা-আর চামচে দিয়ে ঝন-ঝন ক'রে বাজাতে শুরু ক'রে দিই, মঁসিয় দ্য সাঁৎ-বের্ঁ্যা উৎসাহের আধিক্যে একটা চিনেমাটির রেকাবিই ভেঙে ফ্যালেন, আর দু-আধখানা ঝনঝন ক'রে করতালের মতো বাজাতে-বাজাতে একটা বিদঘুটে ফান্দাঙ্গো জুড়ে দেন, যার সঙ্গী হয়েছিলো এই-অধমও।

এবং মঁসিয় বারজাঁক—কথাটা ফাঁস ক'রে দেবার দুঃসাহস আমার হবে কি ?—নিজে সব সংযম হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে, একটা তোয়ালেকে মাথায় পাগড়ির মতো জড়িয়ে নেন, আর এমনকী মঁসিয় বোদ্রিয়ের, উত্তরপ্রদেশের সেই মাননীয় সাংসদ মুখে একটা ঘোমটা প'রে নেন—এবং দুই সাংসদের জুটিতে এমন-একটা আতিশয্যের নাচ শুরু হ'য়ে যায় যার তুলনা কোথায় মিলবে, কে জানে।

কিন্তু সব চমৎকার জিনিশই একসময় শেষ হ'য়ে যায়। পাঁচ মিনিটের হল্লাগোল্লার পর হা-ক্লান্ত হ'য়ে আমরা থেমে পড়ি আর মাদমোয়াজেল মোরনাস হাসতে-হাসতে পেটে খিল ধরিয়ে ফ্যালেন, শেষটায় তাঁর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে।

এই বিশেষ দিনটির সন্ধেবেলাতেই যে নিম্নস্বাক্ষরকারী, আমেদে ফ্লঁরেস, একটু অপরিণামদর্শী হঠকারী যুবক হ'য়ে যায়, সেটা কবুল ক'রে নিই এখানে—আমার মাঝে-মাঝেই মনে হয়, বোধহয় সাংবাদিক হবারই ফল, পেটের কথা মুখে চেপে রাখতে পারি না, পরের কথা আড়ি পেতে না-শুনে পারি না।

তো, সেদিন সন্ধ্যায়, দৈববশেই নিশ্চয়ই,আমার তাঁবুটা মাদমোয়াজেল মোরনাসেরই তাঁবুর পাশে খাটানো হয়েছিলো। সবে শুয়ে পড়বার আয়োজন করছি এমন সময় পাশের তাঁবুতে কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেলুম। কানে হাত চাপা দেবার বদলে আমি বরং কান পেতে কথাগুলো শুনে নিয়েছি। একে পাপ বলতে হয়, বলুন।

মাদমোয়াজেল মোরনাস তাঁর পরিচারক তোঙ্গানের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তোঙ্গানে কেমন জবড়জং বিদঘুটে ইংরেজিতে জবাব দিচ্ছিলো—যা আমি পাঠকদের সুবিধের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যেই শাদাসিধে ভাষায় তর্জমা ক'রে দেবো। কথা শুনে মনে হ'লো আলোচনাটা বেশ-কিছুক্ষণ ধ'রেই চলেছে। তোঙ্গানেকে নিশ্চয়ই তার জীবনকাহিনী শোনাতে বলেছেন মাদমোয়াজেল মোরনাস— কান পেতে শুনি, তিনি জিগেস করছেন : 'তোমার মতো একজন আশান্তি কী ক'রে...?'

তার মানে! তোঙ্গানে তবে বাম্বারা নয়?! আমি তো স্বপ্নেও তা ধরতে পারতুম না।

'সেনেগলে গিয়ে দোভাষী আর গাইড হ'লো? তোমাকে চাকরিতে বহাল করবার সময় একবার আমাকে বলেছিলে বটে, তবে সব কথাই আমি বেমালুম ভুলে গিয়েছি!'

বিভ্রম হবে হয়তো আমার, আবার নাও হ'তে পারে, কেননা আমার মনে হ'লো তিনি সত্যি কথা বলছেন না। তোঙ্গানে উত্তর দেয় : 'কাপ্তেন ব্লেজন..'

ব্লেজন? নামটা যেন চেনা-চেনা। কিন্তু কোথায়, কী উপলক্ষে শুনেছি? শুনতে-শুনতেই আমি স্মৃতির ভেতরটা হাৎড়াই।

'সেই অভিযানে আমিও অংশ নিচ্ছিলাম,' তোঙ্গানে ব'লে চলে, 'এমন সময় ইংরেজরা এসে আচমকা চড়াও হয়, আর আমাদের তাগ ক'রে গুলি ছুঁড়তে শুরু ক'রে দেয়।'

'তুমি কি জানো কেন ওরা গুলি ছুঁড়েছিলো?'

'কারণ কাপ্তেন ব্লেজন বিদ্রোহ করেছিলেন। তিনি সবখানেই লুঠতরাজ চালাচ্ছিলেন, খুনোখুনিতেও পেছ-পা হননি।'

'সেটা কি সত্যি কথা?'

'খুব-সত্যি। তাঁরা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে ছারখার ক'রে দিচ্ছিলেন। নারীপুরুষ ছেলেবুড়ো কাউকেই রেহাই দিচ্ছিলেন না...'

'আর এ-সব নৃশংস কাজ করবার হুকুম দিয়েছিলেন কাপ্তেন ব্লেজন?'

'না,' উত্তর দেয় তোঙ্গানে। 'আমরা কখনও তাঁকে চোখেও দেখিনি। অন্য শাদা-আদমিটি এসে পৌঁছুবার পর থেকে তিনি একবারও আর তাঁবু থেকেই বার হননি। ঐ শাদা-আদমিই কাপ্তেনের নাম ক'রে তাঁর বকলমে হুকুম দিচ্ছিলো।'

'সে কি অনেকদিন তাঁর সঙ্গে ছিলো, এই অন্য শাদা-আদমি?'

'হ্যাঁ, বহুৎদিন হবে—অন্তত পাঁচ-ছ মাস।'

'তার সঙ্গে মোলাকাৎ হয়েছিলো কোথায়?'

'ঝোপে। জঙ্গলে।'

'আর কাপ্তেন ব্লেজন তক্ষুনি তাঁকে আদর ক'রে ডেকে নেন?'

'তারপর একবারও এঁর-ওঁর কাছছাড়া হননি তাঁরা। যতদিন-না কাপ্তেন ব্লেজন তাঁবু থেকে বেরুনোই বন্ধ ক'রে দিলেন।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আর তার পর থেকেই বুঝি সব নিষ্ঠুর লুঠতরাজ শুরু হ'য়ে যায়?'

তোঙ্গানে বোধহয় দোনোমনা করে একটু। 'আমি ঠিক জানি না।'

'কিন্তু ঐ শাদা-আদমি? তোমার মনে আছে? তার নাম?'

ঠিক সেইমুহূর্তে বাইরে একটা আওয়াজ হওয়ায় তোঙ্গানের গলার স্বর চাপা প'ড়ে যায়। সে-যে কী উত্তর দিয়েছিলো, আমার জানা নেই। তাছাড়া পরের কথায় আমার নাক গলাবারই বা দরকার কী? আর যা-ই হোক, এ-বৃত্তান্ত সাম্প্রতিক নয় মোটেই। কাজেই আমার তাতে তেমন-কোনো আগ্রহই ছিলো না।

'তা ইংরেজরা তোমাদের দিকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করার পর কী হ'লো?'

'আমাকে ডাকারে যখন কাজে নিয়েছিলেন, তখনই সে-কথা আপনায় আমি বলেছিলাম।' তোঙ্গানে উত্তর দেয়, 'আমি আর অন্য-কয়েকজন—আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমরা প্রাণপণে ছুটে জঙ্গলে পালিয়ে যাই। আবার যখন ফিরে যাই, দেখি যেখানে যুদ্ধ হচ্ছিলো, সেখানে কেউ নেই—শুধু মৃতেরা প'ড়ে আছে। আমি কয়েকজনকে কবর দিই, আমারই বন্ধুবান্ধব ছিলো তারা। আর *মাসাকে*ও কবর দিই —কাপ্তেন ব্লেজনকেও।'

একটা অস্ফুট চাপা আর্তনাদই যেন কানে আসে আমার।

'তারপর,' তোঙ্গানে সবিস্তারে বলে, 'আমি এ-গাঁ সে-গাঁ ঘুরতে-ঘুরতে শেষটায় নাইজার নদীর তীরে পৌঁছে যাই। শেষটায় টিমবাক্টু চ'লে আসি, সেখানে তখন সবে ফরাশিরা ঢুকতে শুরু করেছে। পুরো পাঁচবছর লেগেছিলো আমার—সারাটা পথ পেরুতে। টিমবাক্টুতে গিয়ে আমি দোভাষীদের দলে যোগ দিই—তারপর একদিন সেনেগল চ'লে আসি। পরে কী হ'লো, আপনি তো জানেন। আপনার সঙ্গে তো সেখানেই দেখা হ'লো।'

একমুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে মাদমোয়াজেল মোরনাস শুধোন : 'কাপ্তেন ব্লেজন তাহ'লে মারা গেছেন?'

'হ্যাঁ, মিসিবাবা!'

'আর তুমিই নিজের হাতে তাঁকে কবর দিয়েছো।'

'হ্যাঁ, মিসি।'

'তাহ'লে তুমি জানো তাঁর গোরটা কোথায়?'

তোঙ্গানে হেসে ফ্যালে। 'হ্যাঁ, জানি। আমি চোখ বন্ধ ক'রেও সেখানে যেতে পারবো।'

তারপর একটুক্ষণ কোনো কথা নেই। তারপর শুনি : 'শুভরাত্রি, তোঙ্গানে।'

'শুভরাত্রি, মিসি,' ব'লে, নিগ্রোটি তারপর তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে চ'লে যায়।

মাদমোয়াজেল মোরনাস নিশ্চয়ই শুয়ে পড়েন তারপর। আমিও আর সময় নষ্ট



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না-ক'রে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। কিন্তু লণ্ঠনটা নেবাতে-না-নেবাতেই আমার স্মৃতি ফিরে আসে।

ব্লেজন ? কী হয়েছে আমার ? নামটা শুনে আমি চিনতে পারিনি কেন ? মাথাটা কোথায় গেছে ? কী-একটা দুর্দান্ত খবর পাবার সুযোগই না হারিয়েছি আমি !

আমি তখন *দিদেরোতে* ছিলুম। আর যদি আমার ব্যক্তিগত স্মৃতিবিলাস ক্ষমা ক'রে দেন—আমি কাগজের মালিককে ব'লেও ছিলুম একেবারে সরাসরি অকুস্থলে গিয়ে আমি বিদ্রোহী কাপ্তেনের সাক্ষাৎকার নিতে চাই। মাসের পর মাস সম্পাদক খরচের কথা তুলে কেবলই টালবাহানা করেছেন। শেষটায় অনেক তা-না-না-না ক'রে যখন রাজি হয়েছেন, তখন বড্ড-দেরি হ'য়ে গেছে। বোর্দো থেকে ঠিক যখন জাহাজে উঠবো, আমি শুনতে পাই যে কাপ্তেন ব্লেজন খুন হ'য়ে গেছেন।

এখন এ-সবই তো পুরোনো কাশুন্দি, সাত-বাসি বৃত্তান্ত। আপনারা হয়তো জিগেস করতে পারেন, তাহ'লে হঠাৎ আমি এই অপ্রত্যাশিত কথোপকথনটা শোনাতে চাচ্ছি কেন ?... সত্যি-বলতে, আমিও নিজেও জানি না, কেন চাই।

আটই ডিসেম্বর, আবারও আমি আমার নোটবইতে সাঁৎ-বেরঁ্যার নাম দেখতে পাই। না, সত্যি, ইনি অনবসাদ—এই সাঁৎ-বেরঁ্যা।

আমরা আমাদের প্রাতঃকালীন কিস্তির মাত্র দু-ঘণ্টা সাঙ্গ করেছি, হঠাৎ দেখি সাঁৎ-বেরঁ্যা ফেটে পড়েছেন ভাষাবিহীন নিনাদে এবং তাঁর অশ্বপৃষ্ঠে প্রায় লাফাতেই শুরু ক'রে দিয়েছেন। আমরা ব্যাপার-কিছু না-জেনেই, হাসির রোগ ধরার মতোই, হাসতে শুরু ক'রে দিয়েছি—কিন্তু এ-কী, সাঁৎ-বেরঁ্যা, তিনি তো হাসছেন না, বরং বেদনাহত ভঙ্গিতে পা রেখেছেন মাটিতে, আর শরীরের সেই অংশে হাত বুলোচ্ছেন যে-অংশ কাজে খাটিয়ে আমরা সাধারণত উপবেশন করি—দুর্বোধ্য-সমস্ত অঙ্গবিক্ষেপ করতে শুরু ক'রে দিয়েছেন দেখে আমরা হুড়মুড় ক'রে তাঁর কাছে গিয়ে জিগেস করেছি : 'আবার কী ঝামেলা বাধলো ?'

'বঁড়শিগুলো... !' প্রায় কাঁদো-কাঁদো ভঙ্গি বেচারার।

বঁড়শি ? কিন্তু তা থেকে আমরা বুঝবো কী, ছাই ? শুধু পরে, ক্ষয়ক্ষতি কিঞ্চিৎ সারাইয়ের পরই, আমরা বুঝতে পেরেছি, তিনি কী বলতে চাচ্ছিলেন।

নিশ্চয়ই কেউ ভুলে যাননি যে, আমরা যখন কোনাক্রি ছাড়বার তোড়জোড় করছি। সাঁৎ-বেরঁ্যা তাঁর মাসির হস্বিতম্বি শুনে—মাসি, না কি ভাগ্নি ?—তড়িঘড়ি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে ছুটে এসেছিলেন, চটপট একগাদা বঁড়শি ঢুকিয়েছিলেন পকেটে। স্বভাবতই এ নিয়ে, দ্বিতীয়বার আর-কিছু তিনি ভুলেও ভাবেননি। এবার ঐ তথাকথিত বঁড়শিগুলোই তাদের বেমালুম ভুলে যাবার জন্যে প্রতিশোধ নিয়েছে। একটু বেকায়দায় নড়তে গিয়ে বঁড়শিগুলো—অন্তত তিনটে—জম্পেশ ক'রে ঢুকে পড়েছে ঘোড়সোয়ারের নধর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশ্চাদ্দেশে।

ডাক্তার শাতোনের মধ্যস্থতাতেই অবশেষে সাঁৎ-বেরাঁ ছাড়ান পেয়েছেন। ছুরি দিয়ে তিন-তিনবার খুঁচিয়েই তাদের বার করা গেছে, কিন্তু ডাক্তার সেইসঙ্গে এক অবিশ্রাম ধারাবিবরণী দেবার হাত থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারেননি। আর তিনি হো-হো ক'রে হেসে ওঠেন, যেন এ খুবই মজার ব্যাপার।

'যে-কেউ এই বঁড়শিগুলোয় বিঁধবেই, বঁড়শিগুলো তিন-তিনটে *কামড়* দিয়েছে!' যে-জায়গাটায় শল্য ফুঁড়েছেন সেটা নিরীক্ষণ করতে-করতেই তিনি বলেছেন।

উত্তরে সাঁৎ-বেরাঁ শুধু ব'লেছেন, 'উঃফ্-রে!'

ব্যবচ্ছেদ শেষ হবার পর রুগির অকুস্থলে ব্যানডেজ বেঁধে দেয়া হয়েছে, এবং তারপর রুগি আবার উঠেছেন ঘোড়ার পিঠে, তারপর দু-দিন ধ'রে ঘোড়ার পিঠে কী-যে তেড়াবেঁকা নাজেহাল বসতে হয়েছে তাঁকে।

বারোই ডিসেম্বর আমরা এসে পৌঁছেছি বোরোনিয়া। এও অন্য-সব ছোটো গাঁয়ের মতোই হ'তো, যদি-না এর গ্রামপ্রধান হতেন বিশেষ-অমায়িক এক মজাদার লোক। গ্রামপ্রধান একেবারেই তরুণ, সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ, বড়োজোর সতেরো-আঠারো বছর বয়েস, বিস্তর রংদার অঙ্গভঙ্গি করেন, আর কৌতূহলী-কেউ অতিরিক্ত কাছে ঘনিয়ে এলেই শপাং ক'রে কষান চাবুক। আমাদের দেখেই তিনি ছুটে আসেন, একটি হাত বুকে, অন্য হাত দূরে-প্রসারিত, বন্ধুতার হাজার জবান মুখে, আর এই বন্ধুতার প্রতিদানে আমরা তাঁকে উপঢৌকন দিই লবণ, বারুদ আর দুটো ক্ষুর। এই দুর্লভ ঐশ্বর্য দেখবামাত্র তিনি ঊর্ধ্ববাহু হ'য়ে নৃত্য জুড়ে দেন।

কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিশেবে তিনি হুকুম দিয়ে দেন গ্রামের বাইরে আমাদের জন্যে কতগুলো খড়ের বাংলো তৈরি ক'রে দিতে, যাতে আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত না-হয়। আমার বাংলোটার দখল নিতে গিয়ে দেখি, গাঁয়ের লোকে দুরমুশ পেটা ক'রে মাটি সমান ক'রে দিয়ে শুকনো ষাঁড়ের চামড়া দিয়ে তা ঢেকে দিচ্ছে। আমি জিগেস করি এই ফরাশ পাতার বিলাসব্যসন কেন। তারা উত্তরে জানায়, শাদা শূককীটেরা যাতে মাটি ফুঁড়ে বেরুতে না-পারে, সেইজন্যেই এই ব্যবস্থা। আমি তাদের এত-খাতিরদারি দেখে *সুক্রিয়া* জানাই এবং কয়েকটা কানাকড়ি বখশিশ দিই তাদের। তারা খুশিতে ফেটে পড়ে—

কী ক'রে যে তাদের ধন্য-ভাব প্রকাশ করবে তা ভেবেই পায় না!

তেরোই ডিসেম্বর, সকালবেলাতেই, কোনো ঘটনা-অঘটনা ছাড়াই আমরা তিম্বো এসে পৌঁছুই। এই জনপদ, এ-যাবৎ যত গ্রামের মধ্য দিয়ে গেছি, তাদের মধ্যে সবার সেরা; পুরো গাঁটাই *তাতা* অর্থাৎ মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা, তার ওপাশে কাঠের একটা পাটাতন ফেলা, একটি চক্রাকার পথের মতো সেটা *তাতাকে* ঘিরে আছে। তিম্বোর *তাতা* –আসলে তিন-তিনটে গ্রামকে ঘিরে আছে—একটা গ্রাম থেকে আরেকটা গ্রামের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝখানে চষা জমি, খেতখামার, আর নয়তো গাছপালার সার—জমিতে গৃহপালিত পশুরা চ'রে বেড়ায়। প্রতিটি গ্রামেই রোজ বাজার বসে। তবে সবচেয়ে-বড়োটায় সপ্তাহে একবার ক'রে হাট বসে।

প্রতিটি চারটে কুঁড়েবাড়ির মধ্যে একটায় কোনো লোক থাকে না। সেটা ভরা থাকে জঞ্জালে আবর্জনায়। রাস্তাঘাটও আবর্জনায় ভর্তি। সম্ভবত ঝাড়ুদারদের বড্ড-অভাব এখানে। শুধু যে নোংরাই তা নয়, ভারি দুঃস্থ, অভাবগ্রস্ত এই গ্রামগঞ্জ। ছোটোছেলেমেয়েরা কাঠির মতো, টিংটিঙে, অস্থিসার, আবর্জনা হাৎড়ায় উচ্ছিষ্টের জন্যে।

তিম্বো যেহেতু অন্য-সব গ্রামগঞ্জের চাইতে বৃহদায়তন এবং গুরুত্বপূর্ণ, আমরা তাই সেখানে দুটো দিন কাটিয়ে দিই—তেরোই আর চোদ্দই ডিসেম্বর। খুব-যে ক্লান্ত ছিলুম তা নয়, তবে তল্পিবাহকরা এবং গাধারা বোধহয় অবসন্ন হ'য়ে পড়েছিলো।

সেই আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা কেউ-কেউ, *তাতার* ঘেরের মধ্যেই একটু-আধটু ঘুরতে বেরিয়েছি—তবে যা দেখেছি তার বিবরণ যে-কোনো ভ্রমণবৃত্তান্তেই পেয়ে যাবেন। আমি তো আর ভৌগোলিক নই, অতএব ভূগোলের বই লেখা আমার ধাতে নেই।

চোদ্দ তারিখে আমরা বেশ ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। আমাদের পথপ্রদর্শক মোরিলিরে অন্তর্ধান করেছে। সারাদিন তাকে হন্যে হ'য়ে খোঁজা হয়েছে, কিন্তু কোথাও তার কোনো পাত্তা মেলেনি। মোরিলিরে যেন কর্পূরের মতো হাওয়ায় উবে গিয়েছে।

কিন্তু আশ্বস্ত হ'তে পারেন আপনারা। পনেরো তারিখে যখন ছাউনি তুলে বেরুবো, দেখি সে যথাস্থানে এসে হাজির। মঁসিয় বারজাক তাকে অন্তর্হিত হ'য়ে যাবার কথা জিগেস করলে, সে বলেছে, কই, সে তো একবারও ছাউনি ছেড়ে বেরোয়নি, বরং প'ড়ে-প'ড়ে সারাদিন ঘুমিয়েছে। আমরা যেহেতু শিবিরের ভেতরটা ছাড়া অন্য-সবখানেই তাকে খুঁজে বেড়িয়েছি, তাই ঠিক বুঝতে পারিনি সে সত্যিকথা বলছে কি না। হয়তো বলতে চায় না, নাবিকদের মতো হয়তো বন্দরে নেমেছিলো, অর্থাৎ এখানকার কোনো তরুণীর বাড়ি গিয়েছিলো। যাক-গে, সে ওর নিজের ব্যাপার—আমাদের কী!

তিম্বো ছেড়ে পনেরোই ডিসেম্বর ভোরবেলায় আমরা, তাই, যথাসময়েই বেরুতে পেরেছি। এবং সারাদিন পথ চলেছি আমরা—আমাদের নিজস্ব ক্রম অনুযায়ীই। শুধু এটা বলা উচিত হয়তো, ঘোড়ার খুরের খটখট আর শোনা যায়নি, তিম্বো ছাড়াতেই আমরা এসে পড়ছি কাঁচারাস্তায়—অর্থাৎ এতক্ষণে সত্যিকার অভিযাত্রীদলের মতোই আমরা অজানার মধ্যে ঢুকতে চলেছি।

আরো-একটা বদল : চারপাশের দৃশ্যও ক্রমশ বৈচিত্র্যপূর্ণ হ'য়ে উঠছে—আর ও-রকম একঘেয়ে ভাবটা নেই, চড়াই-উৎরাই বেয়েই চলতে হচ্ছে আমাদের। তিম্বো ছাড়িয়ে আসতেই বেশ-উঁচু একটি টিলায় উঠতে হয়েছে আমাদের, তারপর ওপাশে গিয়ে ঢাল বেয়ে নামতে হয়েছে। টিলাটার পরেই বিস্তীর্ণ উপত্যকা, তারপর আরেকটা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিলা—সেটা একেবারে দাউএরিকো গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছেছে—তার পাশেই রাত কাটাবার জন্যে আমরা তাঁবু খাটিয়েছি।

দু-দিনের বিশ্রামে সবাই বেশ চাঙ্গা বোধ করছিলো ব'লেই আমরা অন্যদিনের চাইতে দ্রুত চলতে পেরেছি, যখন এই গ্রামটায় এসে পৌঁছেছি তখন সন্ধে মাত্র ছ-টা।

খুবই সমাদর পেয়েছি এখানে। খোদ মোড়ল এসে আমাদের স্বাগত জানিয়ে নানারকম উপহার দিয়েছে। মঁসিয় বারজাক তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

'আমি যখন এ-লা-শ্যাপেল গিয়েছিলুম, তখনও কেউ আমায় এমন ক'রে অভ্যর্থনা করেনি,' বেশ হৃষ্ট—এবং তুষ্ট—স্বরে বলেছেন মঁসিয় বারজাক। 'এমনই যে হবে, তা আমি জানতুম। ভব্যতা-শিষ্টাচার—দেশকালের বালাই রাখে না। একবার শুধু কথা বললেই বোঝা যায় অচেনা লোকরাও কত ভব্য, শিষ্ট।'

ঠিকই বলেছেন বটে, তবে মঁসিয় বোদ্রিয়ের নাছোড় অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে শুধু তাঁর মাথা নেড়েছেন।

নাড়লে কী হবে, মোড়ল কিন্তু যথেষ্ট আপ্যায়ন করেছে আমাদের, অমায়িকভাবে। গাঁয়ের সেরা বাংলোগুলো আমাদের জন্যে ছেড়ে দিতে চেয়েছে, তার নিজের বাড়ির দুয়ার সে অবারিতভাবে খুলে দিয়েছে আমাদের সুন্দরী সঙ্গিনীকে। এই সাদর অভ্যর্থনা সত্যি আমাদের অন্তর স্পর্শ ক'রে গেছে, মনে হয়েছে আমাদের বাকি পথটাও হয়তো এমনি সুমধুর হবে—যতক্ষণ-না মলিক, মাদ্‌মোয়াজেল মোরনাসের কাছে এসে, দ্রুতস্বরে চাপা-গলায় বলেছে :

'আপনি যাবেন না, মিসি! গেলেই মরবেন!'

স্তম্ভিত হ'য়ে তার দিকে তাকিয়েছেন মাদ্‌মোয়াজেল মোরনাস। আমি যে কান পেতে শুনছিলুম, সে-তো সাংবাদিকের অধিকারেই, কিন্তু কাপ্তেন মার্সেনে কেন উৎকর্ণ হ'য়ে কথাগুলো শুনছিলেন—এ-রকম আড়িপাতা তো তাঁর কাজ নয়। গোড়ায় তাঁকেও একটু অবাক দেখিয়েছে, তারপরেই তিনি মনস্থির ক'রে ফেলেছেন।

তক্ষুনি মোড়লের বাড়াবাড়ি আপ্যায়নের অবসান ঘটিয়ে, তাকে বিদেয় ক'রে দিয়ে, এখানেই ছাউনি ফেলতে হুকুম দিয়েছেন। তাঁর ব্যবস্থাপনার সপ্রতিভতা দেখে আমার মনে হয়েছে, আমাদের সুরক্ষার ব্যবস্থাটা সর্বাঙ্গীন। তবে তার হুঁশিয়ারি দেখে খটকা লেগেছে বৈকি ! কাপ্তেন এ-দেশেই কাজ করেন, মলিক যে বিপদের বার্তা ব'য়ে এনেছে সেটাকে তিনি কি আমল দিয়েছেন ? তিনিও কি বিশ্বাস করেন, বিপদ হ'তে পারে ? ... তাহ'লে...

তাছাড়া এটারও ফয়সালা ক'রে ফেলা উচিত। কে ঠিক : মঁসিয় বারজাক, না মঁসিয় বোদ্রিয়ের? হয়তো কালকেই প্রশ্নটার উত্তর পাওয়া যাবে। তবে আপাতত আমি হকচকিয়ে গেছি।

আমেদে ফ্লেরেস



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

## ছয়

# আমেদে ফ্লরেঁসের তৃতীয় নিবন্ধ

*ল্যক্সপান্‌সিয়ঁ ফ্রাঁসেঈর* নিজস্ব সংবাদদাতা মঁসিয় আমেদে ফ্লঁরেসের তৃতীয় প্রতিবেদনটি বেরিয়েছিলো পাঁচই ফ্রেব্রুয়ারির সংখ্যায়। তখন কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি, হঠাৎ-শুধু দেখা যায় তাদের সুযোগ্য সংবাদদাতার কাছ থেকে তার পর থেকে আর-কোনো খবরই আসছে না।

### বারজাক মিশন

*[ নিজস্ব সংবাদদাতার প্রতিবেদন ]*

*কানকান, ২৪শে ডিসেম্বর*। আমরা গতকাল সকালে এখানে এসে পৌঁছেছি, এবং আগামীকাল বড়োদিনের ভোরবেলাতেই আমরা আবার বেরিয়ে পড়ছি।...

*বড়োদিন*! আমার মন উড়ে চ'লে যাচ্ছে উৎসবের ঝলমলে—এখান থেকে এত-দূরে! (কোনাক্রি থেকে চারশো মাইল দূরে চ'লে এসেছি আমরা।) কোনোদিন ভাবিনি যে এমনও স্বপ্ন একদিন দেখতে পাবো, যখন তুষারছাওয়া সমতলের কথা ভেবে আমার মনটা এমন হূ-হু ক'রে উঠবে। আর অনেক বছর পর, এই-প্রথম সাধ জাগছে গিয়ে বসি লিভিংরুমে, ফায়ারপ্লেসের কাছে, শুধু এটাই নিজেকে বোঝাতে যে আমারও একটা বাড়ি আছে।

কিন্তু এ-সব সাধআহ্লাদের কথার মধ্যে আমরা আর পাক খাবো না। বারজাক মিশনের সঙ্গে কী ক'রে এখানে এসে পৌঁছেছি, সেই বৃত্তান্তটাই বরং এখন লিপিবদ্ধ করা যাক। আগেকার লেখাটায় নিশ্চয়ই বলেছি যে যখন দাউএরিকোর গ্রামপ্রধান এসে তার আতিথ্য নিতে আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো, তখন মলিক এসে রুদ্ধশ্বাসে তার ভাঙা-ভাঙা কথায় মাদ্‌মোয়াজেল মোরনাসকে বলেছিলো : 'ওখানে যাবেন না কিন্তু! তাহ'লে আপনার প্রাণ যাবে!'

এই কথাটার মানে কাপ্তেনই সঠিক বুঝতে পেরেছিলেন, এই কথাটাই গ্রামের বাইরে আমাদের ছাউনি ফেলতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো তাঁকে, ঠিক যেখানটায় এসে আমাদের ঘোড়াগুলো থেমেছিলো। কাপ্তেন মার্সেনে, মলিকের সঙ্গে কী-সব আলোচনা করার পর, গাঁয়ের লোকদের কেটে পড়তে হুকুম দিয়েছিলেন। তারা তাদের শুভেচ্ছার কথা জানাতে-জানাতে একটু আপত্তিই করেছিলো, কিন্তু কাপ্তেন মার্সেনে তাদের ওজর-আপত্তিতে কোনো কান দেননি, তাদের তো চ'লে যেতে ব'লেইছেন, উপরন্তু হুমকি দিয়েছেন, *খবরদার*!, ছাউনির পাঁচশো গজের মধ্যে যেন কেউ এসে আর পা না-দেয়।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঁসিয় বোদ্রিয়ের যেহেতু বিচক্ষণতার বুকের বন্ধু, তিনিই সহর্ষে জোরালো ভাষায় কাপ্তেন মার্সেনের প্রস্তাবের সমর্থন করেছিলেন, যদিও এর-যে কারণ কী, তা তিনি আদপেই জানতেন না। মঁসিয় বারজাক অবিশ্যি এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাঁর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করতে ভোলেননি। গাঁয়ের লোকেরা সদলবলে চ'লে যেতেই তিনি এসে বলেছেন ; বেশএকটু রুষ্টরূঢ় সুরেই : 'এই মিশনের দায়িত্ব কার ওপর, কাপ্তেন ?'

'আপনারই ওপর, মঁসিয় ল্য দেপুতে,' ঠাণ্ডাগলায় ভদ্রভাবে জানিয়েছেন কাপ্তেন।

'তাহ'লে কেন, আমার মত জিগেস না-ক'রেই, গাঁয়ের লোকের আতিথ্য উপেক্ষা ক'রে, এখানে তাঁবু খাটাতে বলেছেন আপনি ? আর ঐ লোকগুলোকেই বা তাড়িয়ে দিয়েছেন কেন ? ওদের তো আমাদের প্রতি যথেষ্ট-সহৃদয় ব্যবহার ছিলো।'

প্রায়-নাটুকে ভঙ্গিতে কাপ্তেন, একমুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে, শান্তস্বরে, বলেছেন : 'মঁসিয় ল্য দেপুতে, যদি মিশনের নেতা হিশেবে আপনারই ওপর ভার থাকে কোথায় কোন পথে কতটা সময় কাটিয়ে যাবেন, তা ঠিক ক'রে নেবার, তবে মনে রাখবেন আমারও ওপর একটা দায়িত্ব আছে, যেটা আমার পালন করা কর্তব্য—এবং সে-দায়িত্ব হ'লো আপনাদেরই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। এটা সত্যি-যে আমার আপনাকে হুঁশিয়ার ক'রে দেয়া উচিত ছিলো, আর একটা কৈফিয়ৎও দেয়া উচিত ছিলো কেন আমি এমন ব্যবস্থা করছি। তবে আমার মনে হয়েছে আগে জরুরি কাজগুলোই আমার সেরে নেয়া উচিত। তাতে যদি মনে হয় আমি কোনো বিচ্যুতি ঘটিয়ে থাকি, তবে সেটা আপনি অনুগ্রহ ক'রে উপেক্ষা করলেই বাধিত হবো...'

এ অব্দি, সবই ভালো। কাপ্তেন মার্সেনে আগে থেকে বলেননি ব'লে মাফ চাচ্ছেন, মঁসিয় বারজাকের তাতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যবশত—সম্ভবত অন্য-কোনোরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যেই—কাপ্তেন একটু যেন সংকুচিত; যদিও নিজের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ হারাননি কখনও, তবু একটা বেফাঁস কথা তিনি ব'লে ফেলেছেন, যাতে বারুদের স্তূপে যেন আগুনের ফুলকি পড়লো।

'কর্তব্যকর্মে অবহেলা ঘটাইইনি আমি, শুধু-একটু বিচ্যুতি..'

'অবহেলা ঘটাননি ? *শুধু বিচ্যুতি*...' মঁসিয় বারজাক রেগে লাল, মুখে যেন কথাই সরছে না। তিনি মিদির মানুষ, এই মঁসিয় বারজাক। সেখানকার লোকদের শিরায়-শিরায় নাকি রক্তের বদলে পারদ থাকে। আমি বুঝতে পারি, দুর্দান্ত-একটা আহাম্মুকি হ'য়ে যাবে এক্ষুনি ! রাগে কাঁপতে-কাঁপতে তিনি বলেছেন : 'তাহ'লে এখন কি অন্তত অনুগ্রহ ক'রে খুলে বলবেন আপনার অভিপ্রায় কী ? নিশ্চয়ই কোনো প্রকাণ্ড ব্যাপার আছে যেজন্যে আপনি এ-কাণ্ড করেছেন!'

এই-তো মুশকিল! এবার যে কাপ্তেনের মাথাগরম ক'রে ফেলার পালা। তিনি শুষ্কস্বরে শুধু বলেছেন : 'এইমাত্র শুনেছি আমাদের বিরুদ্ধে এরা একটা ঘোঁট



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকাচ্ছে?'

'ঘোঁট?' মঁসিয় বারজাক বিদ্রূপের ভঙ্গিতে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছেন। 'এই গাঁইয়াগুলো? তিন্নো থেকে মাত্র কুড়িমাইল দূরে।... সত্যি! লোকে পারেও বটে চিলের পেছনে কানের খোঁজে ছুটতে!... তা এই *ঘোঁটের* কথাটা কে এসে বলেছেন, শুনি!'

কাপ্তেন ছোট্ট ক'রে শুধু বলেছেন : 'মলিক।'

মঁসিয় বারজাক অট্টহাস্য জুড়ে দিয়েছেন। হাসির সে-কী-দমক! '*মলিক*? সেই একরত্তি ক্রীতদাসী, যাকে একমুঠো সু দিয়ে আমি কিনেছিলুম!'

এটা একটু বাড়াবাড়িই হয়েছে তাঁর। প্রথমত, মলিক কারু কেনাগোলাম নয়—কেননা ফরাশি সাম্রাজ্যে ক্রীতদাস থাকতেই পারে না। একজন সাংসদের সেটা জানা উচিত। আর তারপর, মলিক বেশ-একটু দামি মানুষই বটে, পঁচিশ ফ্রাংক তার দাম, তার ওপর ফাউ দিতে হয়েছে একটা গাদাবন্দুক আর থান কাপড়।

তৎসত্ত্বেও, তিনি কিন্তু ব'লেই চলেছেন : 'কুললে গোটা কয় সু দিয়ে তাকে কিনেছি! হ্যাঁ, মানতেই হয়, খুব-জোরদার উৎসই বটে খবরের, দারুণ-নির্ভরযোগ্য! হ্যাঁ, এবার আমি মানি, আপনার ভয়ে ভির্মি খেয়ে যাওয়াই উচিত হয়েছে!'

কাপ্তেন আঘাতটা বেশ অনুভবই করেছেন। '*ভয়ে ভির্মি খেয়ে যাবার*' কথায় তাঁর মুখটা কেমন যেন কুঁকড়েই গিয়েছে। শ্লেষ হজম করেছেন তখন, অনেক কষ্টে দমন করেছেন নিজেকে, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছিলো রাগে যেন টগবগ ক'রে ফুটছেন।

'আপনার আতঙ্ক আপনারই থাক—আমাকে তার ভাগ না-দিলেই বাধিত হবো,' মঁসিয় বারজাক ক্রমশই যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে শুরু করেছেন, 'আমি বাহাদুরি দেখাবো ব'লেই ঠিক করেছি। তাই আমি গাঁয়েই যাচ্ছি ঘুমুতে, আর সেই দস্যুর ডেরা আমি একাই বাহাদুরি দেখিয়ে জয় ক'রে আসবো।'

আহাম্মুকির নিদর্শনগুলো বিলক্ষণ স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই কাপ্তেন ব'লে উঠেছেন, 'মলিক ভুল করেছে কি না জানি না, তবে যেহেতু আমরা নিঃসংশয় নই সত্যি কেউ ঘোঁট পাকিয়েছে কি না, আমাকে সবদিক বিবেচনা ক'রে *সাবধানের মার নেই* প্রবচনটাকেই মানতে হয়েছে। আবারও মনে করিয়ে দিতে চাই : আপনাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার ওপর। এ-বিষয়ে আমাকে সরকার থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে—এবং আমি এই নির্দেশ তাচ্ছিল্য করবো না—আপনার সমস্ত শ্লেষ ও বিদ্রূপ সত্ত্বেও।'

'মানে?'

'আপনি যদি সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশ অমান্য করতে চান, নিষেধ উপেক্ষা ক'রে শিবির ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চান, তবে আপনার তাঁবুর বাইরে আমাকে সশস্ত্র পাহারা বসাতে হবে। আমাকে ছাউনি বসাবার ব্যবস্থাটার তদারক করতে হবে,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঁসিয় ল্য দেপুতে, এখানে দাঁড়িয়ে খোশগল্প করবার আমার সময় নেই। দয়া ক'রে আপনাকে শুভরাত্রি জানাবার অনুমতি দিন।' ব'লে কাপ্তেন তাঁর *কেপি*-তে হাতটা ছুঁইয়ে পলটনি কায়দায় আস্ত ঘুরে গিয়ে লম্বা-লম্বা পা ফেলে সেখান থেকে চ'লে গিয়েছেন; এবং মিদি থেকে নির্বাচিত সাংসদের তখন ঠিক খাবি খাবার দশা।

আমি অবশ্য খুব-একটা ভুল করিনি আসল ব্যাপারটা আন্দাজ করতে।

মঁসিয় বারজাকের রাগটা যে এমন দাবানলের মতো দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠেছে, তার কারণ এই ঠোকাঠুকিটা ঘটেছে মাদ্‌মোয়াজেল মোরনাসের ডাগর আঁখির সামনেই। তিনি একটা ভালোরকম ঝগড়া বাধাতে কাপ্তেনের পেছন নিতে যাবেন, এমন সময় তাঁকে মধুর সুভাষিত শুনে থমকে যেতে হ'লো :

'আমাদের আপনার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করবেন না, মঁসিয় বারজাক। আপনাকে আগে না-জানিয়ে কাপ্তেন সত্যি অন্যায় করেছেন, তবে তার জন্যে তিনি তো ক্ষমাই চেয়েছেন, আপনিই বরং তাঁর আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলেছেন। আপনার আপত্তি সত্ত্বেও, আপনার সুরক্ষার ব্যবস্থা ক'রে তিনি তো তাঁর দায়িত্বই শুধু পালন করছেন—আপনি রেগে গিয়ে নালিশ করতে পারেন, তাতে তাঁর উন্নতির আশাও উবে যেতে পারে—এত-সমস্ত জেনেও কর্তব্যে তিনি অবহেলা করেননি। আপনি যদি সজ্জন হন তো আপনার তাঁকে গিয়ে ধন্যবাদ দেয়া উচিত।'

'এ বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে।'

'দোহাই, শান্ত হোন। আমার কথাটা দয়া ক'রে শুনুন। আমি এইমাত্র মলিকের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রের জাল বেছানো হচ্ছে সে-কথাটা মলিকই এসে কাপ্তেনকে জানিয়েছিলো। আপনি কি কখনও *দুং-কোনো*-র কথা শুনেছেন?'

মঁসিয় বারজাক উত্তরে মাথা নেড়েছেন। তখন আর তিনি ফুঁসছেন না বটে, কিন্তু বিশ্রী-একটা মুখভঙ্গি ক'রে আছেন।

'আমি *দুং-কোনো* সম্বন্ধে জানি,' অমনি ডাক্তার শাতোনের পাণ্ডিত্যের ঝুলি খুলে গিয়েছে। 'এ এক মারাত্মক বিষ। বলিকে সে আটদিনের আগে মারে না—কিন্তু ঐ আটদিন কাটে মৃত্যুর চেয়ে ভয়ংকর! জানেন, কী ক'রে এই বিষ বানায়? ভারি-অদ্ভুত জিনিশ এটা—'

মঁসিয় বারজাকের কানে কোনো কথা যাচ্ছে ব'লে মনে হচ্ছিলো না। নিভন্ত আগ্নেয়গিরি থেকে তখনও বুঝি ধোঁয়া বেরুচ্ছিলো।

তাঁর হ'য়ে মাদ্‌মোয়াজেল মোরনাসই জবাব দিলেন, 'না, ডাক্তার, জানি না।'

'দেখি, বুঝিয়ে বলতে পারি কি না,' একটু বুঝি দ্বিধার সুরেই ডক্তার শাতোনে বলেছেন, 'যদিও ব্যাপারটা একটু কেমন যেন অশোভনই... যাক-গে, ব'লেই ফেলি! তাহ'লে শুনুন—*দুং-কোনো* বানাতে হ'লে তারা একটা মৃতদেহের গুহ্যদেশ দিয়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনারের শিষ ঢুকিয়ে দেয়। তিন হপ্তা পরে বার ক'রে এনে সেটাকে রোদ্দুরে শুকিয়ে নেয়, আর তারপর সেটাকে গুঁড়ো-গুঁড়ো ক'রে ফ্যালে। তারপর সেই গুঁড়ো তারা মিশিয়ে দেয় দুধে, কিংবা কোনো সুরুয়ায় কিংবা কোনো মদে—অর্থাৎ যে-কোনো পানীয়তেই। কোনো স্বাদ নেই ব'লে যে খায় সে টেরও পায় না কী খাচ্ছে। আট-দশদিন বাদে শুরু হয় ফুলে-ওঠা : বিশেষ ক'রে তলপেট অবিশ্বাস্যভাবে ফুলে উঠে ফেটে পড়তে চায়। আর তার আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে আসে মৃত্যু—কোনো ওষুধ নেই, প্রতিষেধক নেই—কিছুই আর তখন ভুক্তভোগীকে বাঁচাতে পারবে না—'

'আর এই ঘোঁটটাই পাকাচ্ছে গাঁয়ের লোকে,' ব'লে উঠেছেন মাদ্‌মোয়াজেল মোরনাস। 'এখানে এসে পৌঁছুবার পর, মলিক শুনতে পায় দাউএরিকোর মোড়ল আশপাশের অন্যান্য গ্রামের মোড়লদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করছে। দোলো সারোন—এই গাঁয়ের যুবরাজের নাম না কি দোলো সারোন—ঠিক হয়েছে সে অমায়িক ভঙ্গি ক'রে সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা জানাবে, আমাদের কাউকে-কাউকে তার নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাবে—বাকিদের আপ্যায়ন করবে তার অন্যান্য স্যাঙাৎরা। তারা আমাদের ভুরিভোজ করাবে, কোনো স্থানীয় পানীয় খেতে দেবে সঙ্গে, আর আমরা তো আর প্রত্যাখ্যান করতে পারবো না—তাতে দস্তুরে বাধে। এদিকে, সেপাইশান্ত্রীদেরও তারা ঐ পানীয় খাওয়াবে—কাল তারপর আমরা যথাসময়ে বেরিয়ে পড়বো, আর ক-দিন বাদেই টের পেতে শুরু করবো ঐ ভয়ংকর বিষের প্রকোপ!'

'এদিকে এদিককার সমস্ত লোক শুধু সেই-সময়টারই তক্কে-তক্কে থাকবে, আর একবার আমাদের কনভয়ের মধ্যে বিশৃঙ্খলা পাকিয়ে গেলেই, তারা আমাদের সব মালপত্তর লুঠপাট ক'রে নেবে—আর ঘোড়া আর গাধাগুলো সব নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা ক'রে নেবে। মলিক এই ষড়যন্ত্রের কথাটা জানতে পেরেই কাপ্তেন মার্সেনেকে এসে হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছে। তারপর কী হয়েছে, সে তো আপনারা সব্বাই জানেন।'

খবরটা শুনে আমাদের যে তখন কী অবস্থা হয়েছে, তা আর বলার মতো নয়। মঁসিয় বারজাক তো স্তম্ভিত, হতচকিত। কেবল দিগ্বিজয়ী রাজার মতো মঁসিয় বোদ্রিয়ের ব'লে উঠেছেন : 'কেমন? কী বলেছিলুম আমি? শুনুন, দেখুন, বাহবা দিন আরো আপনার এই *সভ্য* মানুষদের! হুঁ সভ্য, না হাতি! নরকের কীট একেকটা—বদমায়েশের হদ্দ!'

'এ-যে আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না,' প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠেছেন মঁসিয় বারজাক, 'আমার মাথার মধ্যেটা কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে! এই হ'লো দোলো সারোন—আর এই তার অমায়িক ব্যবহার, বিগলিত বচন! ওহ্! শেষ-হাসিটা কিন্তু আমিই হাসবো। কালকেই আমি গোটা গাঁটায় আগুন ধরিয়ে দেবো, আর এই হতভাগা দোলো



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারোনকে—'

'ও-কথা ভুলেও ভাববেন না, মঁসিয় বারজাক,' মাদমোয়াজেল মোরনাস যেন আর্তনাদই ক'রে উঠেছেন। 'মনে রাখবেন আমাদের শয়ে-শয়ে মাইল পাড়ি দিতে হবে। সুবিবেচনা চাই, বিচক্ষণতা..'

মঁসিয় বোদ্রিয়ের তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেছেন : 'এর পরেও আপনারা অতটা রাস্তা পাড়ি দিতে চান? আমাদের কাছে যে-প্রশ্নটা করা হয়েছিলো তা এই : "নাইজার নদীর তীরে এই যে পালে-পালে লোক আছে, তারা কি এতই শিষ্টসভ্য যে তাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দেয়া চলে?" আমার তো মনে হয়, আমরা তার উত্তরটা হাতে-নাতে পেয়ে গিয়েছি। গত ক-দিনে আমাদের যা অভিজ্ঞতা হয়েছে, বিশেষত আজ যে মোক্ষম অভিজ্ঞতাটা হ'লো, আমার তো মনে হয় সেটাই যথেষ্ট!'

এ-রকমভাবে কোণঠাশা হ'য়ে মঁসিয় বারজাক যেন দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়েই ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছেন। কী-একটা বলবার জন্যে মুখ খুলতে যেতেই, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে মাদমোয়াজেল মোরনাস ব'লে উঠেছেন : 'মঁসিয় বোদ্রিয়ের ভারি-তাজ্জব কথা বলছেন —যেন একটা সোয়ালো দেখেই বোঝা যায় এ-কোন্ মরশুম। সেই-যে এক ইংরেজ একবার ক্যালে বন্দরে একজন লালচুলের ফরাশিকে নামতে দেখে বলেছিলো, সব ফরাশিরই লালচুল হয়, সে যেমন একজনকে দেখেই গোটা জাতটা তুলে কথা বলেছিলো, এ যেন সেইরকম। যেন ইওরোপে কখনও খুনজখম রাহাজানি হয় না—যেন ইওরোপের লোক ভাজামাছটাও উলটে খেতে জানে না!'

মঁসিয় বারজাক প্রচণ্ড জোরে মাথা দুলিয়ে এ-কথায় সায় দিয়েছেন। তাঁর জিভটা যেন একটা বক্তৃতা দেবার জন্যেই চুলবুল করছিলো। 'ঠিক বলেছেন! একেবারে খাঁটি কথা! কিন্তু, মহোদয়গণ, আরেকটা কথাও আমাদের বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে। এটা কি আদৌ ভাবা যায় যে প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিরা, এক বৈপ্লবিক সংস্কারের চৌকাঠে গিয়ে না-পৌঁছেই...'

বেড়ে বলেন কিন্তু মঁসিয় বারজাক, চমৎকার!

'না-পৌঁছেই, গোড়াতেই, বাচ্চাদের মতো ভয় পেয়ে গিয়ে হুড়মুড় ক'রে পালাবে? না, মহোদয়গণ, না। ফরাশি ঝাণ্ডা কাঁধে ক'রে ব'য়ে যাবার সম্মান যাদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে তারা ডরপোক নয়, তাদের বিস্তর-কাণ্ডজ্ঞান আছে, দুর্জয় সাহস আছে, বলীয়ান পণ আছে—তারা কিছুতেই পিছু হঠবে না। বরং তারা ভালো ক'রেই জানে এমন কাজে কী সাংঘাতিক ঝুঁকি আছে, আর সব বিপদের কথা জানে ব'লেই, চোখের পাতা না-ফেলেই, সরাসরি তার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াবে তারা—সুপ্রস্তুত। সভ্যতার এই অগ্রদূতেরা...'

বাহবা! কী-একখানা বক্তৃতা, আর কী-একখানা সময়ে তা অনর্গল নিঃসৃত হচ্ছে!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সভ্যতার এই অগ্রদূতেরা আহাম্মক নয়—তারা বিলক্ষণ সব বিবেচনা ক'রে দেখতে পারে, তারা একটামাত্র জিনিশ দেখেই সমস্তকিছু সম্বন্ধেই কোনো মন্তব্য ক'রে বসে না, তারা তো আর ঝাড়ুদার নয় যে ঝেঁটিয়ে যাবে সব, এত-বড়ো একটা মহাদেশ সম্বন্ধে একটা ঘটনা থেকেই স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবে! তার ওপর যে-সম্ভাবনাটার কথা আমরা শুনেছি, আমরা এখনও তা সত্যি কি না, যাচাই ক'রে দেখিনি। আমার পূর্ববর্তী বক্তা চমৎকার বলেছেন...'

পূর্ববর্তী *বক্তা* তো মাদমোয়াজেল মোরনাস। তিনি সুমধুর হাসলেন এ-কথা শুনে, এই *পূর্ববর্তী বক্তা*; আর এই কথার তোড় বন্ধ ক'রে দেবার জন্যে গুণমুগ্ধ ভঙ্গি ক'রে হাততালি দিয়ে তাঁকে থামিয়ে দিলেন, আমরাও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে চটাপট হাততালি দিয়েছি—শুধু মঁসিয় বোদ্রিয়ের বাদে। কিন্তু তাঁর কথা না-বললেও চলে।

'তাহ'লে এই কথাই রইলো,' হাততালির মধ্যেই মাদমোয়াজেল মোরনাস ব'লে উঠেছেন : 'এই সিদ্ধান্তই তবে পাকা। অভিযান চলবেই, মাঝপথে পিঠটান দেবে না। শুধু এটাই বলতে চাই যে শুভবুদ্ধি বলে, অহেতুক রক্তপাতে আমরা যেন জড়িয়ে না-পড়ি—তাহ'লে হয়তো তার বদলা নেবার জন্যে আরো-অনেকে খেপে উঠবে। আমরা যদি কোনো জ্ঞানগম্যি ধরি, তাহ'লে আমাদের প্রথম লক্ষ্য হবে শান্তিপূর্ণভাবে যাবার চেষ্টা করা—কোনো গণ্ডগোল বা ঝামেলা না-পাকানোই উচিত হবে। অন্তত এটাই হ'লো কাপ্তেন মার্সেনের মত।'

'বেশ, কাপ্তেন মার্সেনের মত যদি তা-ই হয়,' মঁসিয় বারজাক সায় দিয়েছেন বটে, কিন্তু একটু যেন দ্বিধা থেকে গেছে কোথাও, পুরোটা যেন তাঁর মনঃপূত হয়নি।

'অনুগ্রহ ক'রে বিদ্রূপ করবেন না, মঁসিয় বারজাক,' মাদমোয়াজেল মোরনাস বলেছেন, 'আপনার বরং উচিত কাপ্তেনকে খুঁজে বার ক'রে তাঁর হাতে হাত মেলানো, তাঁকে সাহায্য করা। আপনিই তাঁকে ধমক দিয়েছেন, মঁসিয় বারজাক, আপনারই উচিত সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া। মনে রাখবেন, আমরা হয়তো আমাদের জীবনের জন্যে তাঁরই কাছে ঋণী হ'য়ে আছি।'

মঁসিয় বারজাক মাথাগরম ক'রে ফ্যালেন বটে একটুতেই, তবে মানুষটা আসলে তিনি ভালোই। এ-রকম একটা নতিস্বীকার করতে হবে ভেবে তিনি একটু দোনোমনাই করেছেন প্রথমে, তারপর কাপ্তেন মার্সেনের খোঁজে চ'লে গিয়েছেন। কাপ্তেন মার্সেনে ততক্ষণে শিবিরের চারপাশে কড়াপাহারা বসাবার সব-ব্যবস্থা পাকা ক'রে ফেলেছেন।

'একটা কথা বলবো, কাপ্তেন?'

'হুকুম করুন, মঁসিয় ল্য দেপুতে,' একটু আড়ষ্টভাবে সামরিক কেতায় বলেছেন কাপ্তেন মার্সেনে।

'কাপ্তেন,' মঁসিয় বারজাক বলেছেন, 'আমরা দুজনেই কিন্তু একটু আগে ভুল



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলুম, তবে আমি হয়তো একটু-বেশিই মাথাগরম ক'রে ফেলেছি। সেজন্যে আমি ক্ষমা চাচ্ছি। আসুন, হাতে হাত মেলান।',

বলতেই হয়, তাঁর বলবার ধরনে না-ছিলো কোনো বানানো ভাব, না-বা অহেতুক বিনয়। কাপ্তেন মার্সেনে একটু লজ্জিতই হ'য়ে পড়েন। 'আরে-আরে, এ-কী কথা! আমি তো এর মধ্যেই পুরো ঘটনাটা ভুলেই গিয়েছি।'

তাঁরা দুজনে সাগ্রহে হাতে হাত মেলান, আর আমার মনে হয় আর-কোনো অভাবিত উৎপাত না-হ'লে এঁদের এই বন্ধুতায় আর-কখনও কোনো চিড় ধরবে না।

বারজাক-মার্সেনে দ্বন্দ্বযুদ্ধের এমন অমায়িক পরিণাম দেখে আমরা সবাই যে যার *সুরক্ষিত* আশ্রয়ের খোঁজে চ'লে গিয়েছি। আমার তাঁবুটায় ঢুকতে যাবো, দেখি—যেমন তাঁর ধরন—মঁসিয় দ্য সাঁৎ-বেরাঁ তাঁবুতে নেই। পই-পই ক'রে বারণ ক'রে দেয়া সত্ত্বেও কি ইনি আবার শিবিরের বাইরে চ'লে গেলেন?

আমার সঙ্গীদের কিছু না-ব'লেই আমি তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছি। হঠাৎ তাঁদের পরিচারক তোঙ্গানের সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখেই সে ব'লে উঠেছে : 'মাসা অজেনরের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন? আস্তে-আস্তে পা ফেলে আসুন—কোনো শব্দ যেন না-হয়। ঐ দেখুন, লুকিয়ে আছেন! মাসা ভারি মজার মানুষ!'

পাহারার সারের বাইরে খুদে-একটা সোঁতার কিনারে আমাকে নিয়ে গেছে তোঙ্গানে, সেখানে, দেখি, একটা বেওবাব গাছের আড়ালে, লুকিয়ে আছেন মঁসিয় দ্য সাঁৎ-বেরাঁ। তাঁকে খুবই ব্যস্ত দেখাচ্ছে, হাতে কী-একটা জীব ধ'রে আছেন, দূর থেকে তা আমি স্পষ্ট দেখতে পাইনি।

'*এনতোরি* পাকড়েছেন,' তোঙ্গানে বলেছে আমায়। *এনতোরি* মানে ব্যাঙ, অর্থাৎ ভেক, অর্থাৎ দাদুরী।

সাঁৎ-বেরাঁ ব্যাঙটার মুখ খুলে তার মুখের মধ্যে একটা দু-দিকে-ধার লোহার শিক ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। শিকটার মাঝখানে একটা টোনসুতো বাঁধা, তিনি সুতোটার অন্যদিকটা হাতে ধ'রে আছেন। আজব কাণ্ডটা হ'লো এই কর্মটি করার সময় সাঁৎ-বেরাঁর ঘন-ঘন মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস পড়ছিলো, যেন নিদারুণ মনোকষ্টে তাঁর বুকটা ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু তার যে কী-কারণ হ'তে পারে, তা আমি ভেবেই পাইনি। তবে হেঁয়ালিটার চাবিটা সম্ভবত আবিষ্কার ক'রে ফেলতে পেরেছি। মনোকষ্টের কারণ আর-কিছু নয়, এই-যে বেচারা দাদুরীটিকে তিনি বর্বরভাবে যন্ত্রণা দিচ্ছেন সেটাই। যখন মাছধরার নেশা তাঁর কাণ্ডজ্ঞান ভুলিয়ে দেয়, তখনও তাঁর কোমল হৃদয় ব্যথিত হ'য়ে বিদ্রোহ ক'রে ওঠে। ব্যাঙটাকে তীরে, ঘাসের ওপর, রেখে তিনি গুঁড়ি মেরে বসেন একটা গাছের আড়ালে—হাতে একটা মোটা লাঠি—তারপর অপেক্ষা ক'রে থাকেন। আমরাও তা-ই করি।

তবে খুব-বেশিক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হয়নি আমাদের। তক্ষুনি কিম্ভূত-কিমাকার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা জীবের আবির্ভাব হয়, মস্ত-একটা গিরগিটির মতো দেখতে।

'দেখছেন তো?' ফিশফিশ ক'রে বলে তোঙ্গানে। 'ভারি ভালোজাতের *গুয়েউলে তাপে*।'

'*বড়োমুখ*?' ডাক্তার আমাকে কালকেই বলেছেন সে হ'লো এক বিশেষজাতের ইগুয়ানা।

*বড়োমুখ* ব্যাঙটাকে গিলে ফ্যালে, তারপর ফের জলে নেমে যাবার চেষ্টা করে। দড়িটায় বাঁধা প'ড়ে গেছে টের পেয়ে সে ছটফট করে, আর অমনি—সে যত আছড়ায় —লোহার ধারালো শিকটা তার গায়ে গেঁথে যায়। এবার বাছাধন আটকা প'ড়ে গেছে! সাঁৎ-বেরাঁ জীবটাকে নিজের দিকে টেনে আনেন আর লাঠিটা ওঠান।

আরে, ব্যাপার কী? লাঠিটা আস্তে শিথিলভাবে প'ড়ে যায়, আর সাঁৎ-বেরাঁ গুঙিয়ে ওঠেন... একবার, দু-বার, তিনবার—লাঠিটা ওঠে মারাত্মক-ভঙ্গিতে, কিন্তু একবার, দু-বার, তিনবার—তিনবারই সেটা শিথিলভাবে আলগোছে পড়ে, আর সঙ্গে পড়ে বুকভাঙা দীর্ঘনিশ্বাস।

তোঙ্গানে এবার ধৈর্য হারিয়ে ফ্যালে। সে লাফিয়ে বেরোয় তার লুকোবার আস্তানা থেকে, আর সে-ই গিয়ে লাঠিটার এক প্রচণ্ড ঘায়ে তার প্রভুর দোলাচলের অবসান ঘটিয়ে দেয়—খতম ক'রে দেয় *বড়োমুখকেও*; তার যে এমন নাম কেন, তা-ই বোঝা দায়।

সাঁৎ-বেরাঁ আরেকটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন, তবে সেটা পরিতুষ্ট ভঙ্গিতে। তোঙ্গানে এর মধ্যেই ইগুয়ানাটিকে তুলে ফেলেছে মাটি থেকে। 'কাল,' সে জানিয়ে দেয় আমাদর, 'কাল আমরা *গুয়েউলে-তাপে* খাবো। খেতে ভারি ভালো।'

এবং, সত্যিই, 'খুবই-ভালো' ছিলো।

ষোলোই ডিসেম্বর আমরা ভোর-ভোর রওনা হ'য়ে পড়েছি। গ্রামটার পাশ দিয়েই এগিয়েছি আমরা, দেখেছি অত-ভোরে দু-চারজন ছাড়া গাঁয়ের কেউই ঘুম থেকে ওঠেনি। সেই ধাড়ি বদমায়েশ, পালের গোদা, দোলা সারোন টেরিয়ে-টেরিয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখেছে আমরা সবাই সার বেঁধে পাশ দিয়ে চ'লে যাচ্ছি আর বিদঘুটে-সব ভয়াবহ অঙ্গভঙ্গি করেছে তখন।

নটার একটু আগে পায়ে-চলার-পথ গিয়ে শেষ হয়েছে একটা নদীতে, যথারীতি পালে-পালে জলহস্তী আর বিকট-সব কুমির ভেসে বেড়াচ্ছে জলে। নদী পেরুবার সময় আমাদের সবাইকেই হুঁশিয়ার থাকতে হয়েছে। আমি খেয়াল ক'রে দেখি আগে কখনও আমরা এতটা সাবধানে এভাবে নদী পেরুইনি। হয় আমরা সাঁকো পেয়েছি, আর নয়তো জল এত-কম থেকেছে ঘোড়ার ক্ষুরও ভালো ক'রে সেই জলে ডোবেনি। এবার ব্যাপারটা একেবারেই অন্যরকম : এবার সামনে আছে দস্তুরমতো একটা নদী—সত্যিকার নদী।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে যতটা ভেবেছি, ততটা জল ছিলো না; ঘোড়াগুলোর পাশ ছাড়িয়ে জল ওঠেনি, আর আমরা বিশেষ-কোনো মুশকিল বিনাই নদীটা পেরিয়ে যেতে পেরেছি।

কিন্তু গাধাগুলোর বেলায় অতটা সহজ হয়নি। পিঠে বোঝা চাপানো, জবুথবু, গাধাগুলো নদীর পারে এসেই সব ক-টা একসঙ্গে থেমে পড়েছে। সহিসরা তাদের মিথ্যেই তাড়া দিয়েছে, খুঁচিয়েছে, ওসকাতে চেয়েছে, কিন্তু তাদের কোনো তারতম্য নেই—তারা নট নড়নচড়ন ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছে, লাঠি দিয়ে খুঁচিয়েও কোনো লাভ হয়নি।

'ওহ্, এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি!' সহিসদের একজন মন্তব্য করেছে, 'এরা সদ্ধর্মে দীক্ষিত হ'তে চাইছে!'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, গায়ে জল ছিটিয়ে দীক্ষা দিয়ে দাও!'

প্রত্যেকেই তারপর আঁজলা ক'রে জল এনে জানোয়ারগুলোর মাথায় ঢেলে দিয়েছে, সাথে-সাথে কী-সব দুর্বোধ্য বুলি আউড়েছে।

'স্মরণাতীত কাল থেকেই এ-অঞ্চলে এই রীতি চ'লে আসছে,' মঁসিয় তসাঁ আমাদের বুঝিয়ে বলেছেন। 'প্রথম যেখানে হাঁটুজলের বেশি পেরুতে হয়, নিয়ম হ'লো আগে গাধাগুলোকে জল ছিটিয়ে দীক্ষা দিয়ে নিতে হবে—*বাপ্তিস্ম* আর-কি! দেখবেন, বাপ্তিস্ম শেষ হ'য়ে গেলেই এরা আর-কোনো গোল না-ক'রে চলতে শুরু করবে!'

এবং একটুক্ষণ পরেই, সত্যি কিন্তু, গাধাগুলো তা-ই করেছে।

তখন ছায়ার মধ্যে গরম হবে ৮৬° ডিগ্রি ফারেনহাইট। গাধাগুলো নিশ্চয়ই ভেবেছে ঠাণ্ডাজল গায়ে পড়লে ভালোই লাগবে, হয়তো জলে লাফঝাঁপ দিয়ে রীতিমতো স্নান সমাপন করতেই চেয়েছিলো—পুরোপুরি *অবগাহন* যাকে বলে। দু-তিনবার হেঁড়েগলায় ডাক ছেড়ে, তারা জলে গিয়ে নেমেছে, বেশ ক'রে গড়াগড়ি খেয়েছে আর খুশির চোটে এতই নর্তনকুর্দন করেছে যে তাদের পিঠের বোঝাগুলোর বাঁধন আলগা হ'য়ে জলে ভেসে যেতে শুরু করেছে।

টেনেই তুলতে হয়েছে তাদের, জল থেকে। সহিসরা কুঁড়ের বাদশাদের মতো ঢিলেঢালাভাবে মন্থর ভঙ্গিতে কাজ করছিলো। যদি-না কাপ্তেন মার্সেনের সেপাইশান্ত্রী কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তো আমাদের আদ্ধেক লটবহর হয়তো ভেসেই যেতো—আমাদের রসদপত্র, আমাদের উপহারসামগ্রী, আমাদের ব্যাবসার উপকরণ,—সব—আর সেটা হ'তো এক অপূরণীয় ক্ষতি।

মঁসিয় বারজাকের নাক থেকে তখন আগুন বেরুচ্ছে, অধীর হ'য়ে মেজাজ খারাপ ক'রে তিনি বাছা-বাছা ভাষায় প্রভঁসাল গালাগাল ছুঁড়ে দিতে লাগলেন অলস ঐ সব সহিসদের দিকে।

মোরিলিরে তাঁর কাছে গিয়ে বলেছে : '*মনি তিগুই* [কম্যাণ্ডারসাহেব],' মধুর স্বর তার, 'অমন চ্যাঁচাবেন না।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চ্যাচাবো না !... যখন গাধাগুলো লক্ষ-লক্ষ ফ্রাংকের মালপত্তর ডুবিয়ে ফেলতে চাচ্ছে !'

'তাতে ফল হয় না,' পথপ্রদর্শকটি বাৎলেছে, 'আপনাকে মাথাঠাণ্ডা রাখতে হবে। জন্তুগুলো প'ড়ে গেলে, এখানকার লোকে নিজেদের মধ্যে কোন্দল করে—কিন্তু আপনি ওদের মতো চ্যাচাবেন না। ওরা বড্ড-বাজেকথা বলে বটে, কিন্তু মন্দ লোক নয়। পরে, সকলেরই উপকার হবে।'

আমি যা লিখে চলেছি এখানে, তা যথাযথ হ'লেও, আপনাদের হয়তো তেমন মনোরঞ্জন করবে না। তা যদি হয়, তো আমি নাচার। বারজাক মিশনের সঙ্গে বেরুবো ব'লে যখন ভেবেছি, তখন মাথায় ছিলো দুর্দান্ত -একটা রোমাঞ্চকর ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখবো, রগরগে আর রুদ্ধশ্বাস—এমন দুর্বার অভিযানের কাহিনী শোনাবো যে আপনাদের তাক লেগে যাবে ব'লেই ভেবেছি। আদিম অরণ্যের মধ্যে রহস্যময় সব ছায়ার আনাগোনা, প্রকৃতির সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, বন্য জন্তুদের সঙ্গে মরণপণ যোঝাযুঝি, অগুনতি দস্যুদলের সঙ্গে ভয়ংকর সংঘাত—এইসমস্ত বিষয়ই ছিলো আমার মাথায়। এতদিনে কিন্তু আমার সব ঘোর কেটে গেছে—বিভ্রমের যাও বাকি আছে, তাও ঝেড়ে ফেলতে হবে আমায়। গভীর দুর্ভেদ্য বনানী মানে তো কিছু গাছপালা আর বেঁটেখাটো-সব ঝোপঝাড়। প্রকৃতি ঠাকরুন আমাদের নিয়ে মাথাই ঘামাননি, খামকা প্রচণ্ড-সব বাধা দিতে আসবেন কেন ? আর জীবজন্তু ?—হ্যাঁ, জলহস্তী দেখেছি বটে, ভয়ানক-দেখতে কুমিরও—আর সংখ্যাতেও তারা নেহাৎ কম হবে না। তার সঙ্গে কিছু হরিণ, আর মাঝে-মাঝে চোখে-পড়া হাতির কথাও না-হয় ব'লে দেয়া যায়। আর দস্যুরা মোটেই এসে চড়াও হয়নি, স্থানীয় লোকেরা মোটের-ওপর সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহারই করেছে—শুধু ধেড়ে বদমায়েশ দোলো সারোনের ব্যাপারটাই যা অন্যরকম। সাত্যি-বলতে, ভারি-একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন ভাবে আফ্রিকার অভ্যন্তরে এগিয়ে চলেছে বারজাক মিশন।

এর মধ্যে দাউএরিকোর স্মৃতিই যা-একটু-কেবল গোলমেলে। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের প্রথমে চড়তে হয়েছে একটা টিলায়, তারপর আমরা নেমে এসেছি বাগারেইয়ায়—তিনকিসো উপত্যকায়। খুব-একটা উত্তেজক-কিছু দেখতে পাইনি ব'লেই বুঝি একসময় চোখে পড়েছে যে পেছনে না-থেকে ৎশুমুকি এখন সামনে এগিয়ে এসে মোরিলিরের পাশে-পাশে চলেছে। তাহ'লে কি তোঙ্গানের সঙ্গে কোনো ঝগড়া বাঁধিয়ে বসেছে নাকি ৎশুমুকি ? সে আর মোরিলিরে—দুজনেই মুখে খই ফোটাচ্ছে, যেন কতকালের প্রাণের দোসর। তা যা-হয় হোক ! ঝগড়াঝাঁটির বদলে গলাগালি ভাব হওয়াই অনেক ভালো !

আর তোঙ্গানে ? তাকে তো দেখে মনে হচ্ছে না তার সাথী তাকে ছেড়ে চ'লে-যাওয়ায় তেমন-একটা বিচলিত হয়েছে। কনভয়ের পেছনে সে বরং মলিকের সঙ্গেই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন জমিয়ে ফেলেছে, আর বেশ প্রাণখুলেই চুটিয়ে কথাবার্তা বলছে দুজনে। এও তো ভালোই—যদি দুজনের মধ্যে ভাবভালোবাসা হ'য়ে যায়।

বাগারেইয়া ছাড়িয়ে আবার আমরা ঝোপের মধ্যে এসে পড়েছি—ক্রমেই রুখুশুখু অনুর্বর জমিতে ঝোপগুলো আর নিবিড় থাকছে না—আর প্রতিদিনই তো আমরা বর্ষার মরশুম ছেড়ে দূরে চ'লে যাচ্ছি, তারপর আবার এসে পৌঁছেছি সমতলভূমিতে, আজ কানকান গিয়ে না-পৌঁছুনো অব্দি আর আমাদের সমভূমি ছেড়ে যেতে হয়নি।

বাইশে, আমরা কুরুসায় দিজোলিবা পেরিয়ে এসেছি—আমাকে আশ্বস্ত ক'রে মঁসিয় তসাঁ জানিয়েছেন এইই হ'লো নাইজার; তবে কানকানেও দেখেছি বড়ো-একটা নদী, প্রথমটার দিকেই ছুটে চলেছে, উত্তরে তিরিশ মাইল এগিয়ে গিয়ে দুটো নদী মিলে গিয়ে একই জল হ'য়ে যাবে। এই-যে নদী, যাকে এরা মিলো ব'লে ডাকে, এরই বা তবে নাইজার নদীরই অংশ হ'তে বাধা কোথায়? মঁসিয় তসাঁ, একটু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতেই আমার দিকে তাকিয়ে বলেছেন, উঁহু, এটা নাইজার নয়; তবে কেন নয়, সেটা তিনি আর খুলে বলেননি। এ-নদী, সে-নদী হোক বা না-হোক, তাতে আমার কী?

আর অ্যাডভেনচার? জানতে চাচ্ছেন বুঝি, সে কোথায়? ন-দিন কেটে গেছে, অথচ কিচ্ছুটি ঘটেনি?

না, ঘটেনি—যা ঘটেছে তা নেহাৎই-তুচ্ছ ব্যাপার!

মিথ্যেই আমি আতশকাচের ঠুলি চোখে লাগিয়ে আমার নোটবইয়ের পাতায় চোখ বুলোই। শেষটায় মাত্র দুটি তথ্য খুঁজে পাই, যা হয়তো উল্লেখ করার যোগ্য। প্রথমটা নেহাৎই-তুচ্ছ ব্যাপার। আর দ্বিতীয়টা? হ্যাঁ, ঐ দ্বিতীয়টা নিয়ে যে আমি কী ভাববো, কিছুতেই ভেবে-ভেবে তারই কূলকিনারা পাচ্ছি না।

সংক্ষেপে তাহ'লে ব'লেই ফেলি প্রথমটা।

দাউএরিকো ছাড়ার তিনদিন পরে, আমরা অনায়াসেই *লুগানগুলোর* মধ্য দিয়ে চলেছি, বেশ-ভালো চষাজমি এইসব *লুগানের*, ফলনও হয়েছে, আর দেখে বোঝা গেছে আমরা একটা গাঁয়ের কাছে এসে পড়েছি—যখন তিনজন স্থানীয় লোক—কালা আদমিই—আমাদের দেখে ভয়ে আঁৎকে উঠে পাঁই-পাঁই ক'রে ছুট লাগিয়েছে। আর যেতে-যেতে আর্তস্বরে খালি চেঁচিয়েছে '*মারফা! মারফা!*'

বাম্বারা ভাষায় *মারফা* মানে বন্দুক। কিন্তু তাদের এই আর্তচীৎকারের কোনো মাথামুণ্ডুই আমরা বুঝতে পারিনি : কালা আদমিরা যাতে মিথ্যে ভয় না-পায়, সেইজন্যে কাপ্তেন মার্সেনে আগেই তো বাৎলেছেন, তাঁর সেপাইশান্ত্রীরা সবাই যেন তাদের অস্ত্রশস্ত্র চামড়ার খাপে পুরে ফ্যালে—খাপগুলো এমন দেখতে বোঝা যায় না ভেতরে বন্দুক আছে, না অন্যকিছু আছে। কাজেই কোনো রাইফেলই তো কারু চোখে পড়ার কথা নয়। তাহ'লে নিগ্রোরা হঠাৎ অমন ক'রে ভয় পেয়ে পালালো কেন? যখন আমরা এই ধাঁধাটা নিয়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথা ঘামাচ্ছি আর কোনো থই পাচ্ছি না, এমন সময় আমরা শুনতে পেয়েছি ধাতব ঝনঝনানি, আর তারপরেই সাঁৎ-বেরঁ্যার মুখ থেকে বিচ্ছিরি গালাগাল।

'কী বদমায়েশ!' খেপে একেবারে বোম সাঁৎ-বেরঁ্যা। 'আমার ছিপ আর বঁড়শির বাক্সটায় নচ্ছারগুলো ঢিল ছুঁড়ছে। দেখুন একবার তাকিয়ে—সবগুলোই কেমন টোল খেয়ে গেছে! দাঁড়া, নচ্ছার, দাঁড়া—এক্ষুনি মজা দেখাচ্ছি তোদের!'

হামলাবাজদের পেছনে তাড়া-ক'রে-যাওয়া থেকে অনেক হ্যাঙামা ক'রেই আমরা নিবৃত্ত করেছি তাঁকে—শেষটায় মাদমোয়াজেল মোরনাস আসরে না-নামলে তাঁকে আর আটকানো যেতো না। তাঁর ঝকঝকে নিকেলের বাক্সটাকে রোদ্দুরে ঝিলিক দিয়ে উঠতে দেখে নিগ্রোরা ভেবেছে সেটা বুঝি কোনো রাইফেলের নল। সেইজন্যেই তাদের এমন ভয় আর অদ্ভুত আচরণ।

আবার যদি এ-রকম ভুল বোঝে লোকে, আর আমাদের কোনো বিচ্ছিরি প্যাঁচের মধ্যে প'ড়ে যেতে হয়, এই কথা ভেবেই মঁসিয় বারজাক, মিনতি ক'রেই প্রায়, সাঁৎ-বেরঁ্যাকে বলেছেন তাঁর এই অত্যুজ্জ্বল বাক্সটাকে গাধার পিঠে অন্যান্য মালপত্তরের মাঝখানে রাখতে। কিন্তু এই একগুঁয়ে মৎস্যশিকারীকে যুক্তি দিয়ে বোঝাবে কে? তিনি চেঁচিয়ে-মেচিয়ে জানিয়েছেন, তাঁর ছিপগুলো তাঁর সঙ্গছাড়া করতে জগতের কোনো শক্তিরই কোনো সাধ্য নেই। শেষটায় যাতে তাঁকে রাজি করানো গেছে, সেটা মন্দের ভালো একটা আপোষরফা : তাঁর ঝকঝকে দস্তার বাক্সটা তিনি কাপড় দিয়ে মুড়ে রাখতে রাজি হয়েছেন, যাতে আর রোদ্দুর প'ড়ে ওটা কারু চোখ ধাঁধিয়ে না-দেয় তার ঝিলিক-দেয়া প্রতিফলনে। সত্যি তাজ্জব মানুষ এই সাঁৎ-বেরঁ্যা, এখন তিনি আমার বেশ-ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

অন্য ঘটনাটা ঘটেছে কানকানে, আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছেছি প্রত্যাশিত সময়ের বারো ঘণ্টা পরে, তেইশে ডিসেম্বরের সকালবেলায়। দেরির কারণ? মোরিলিরেকে আবার কোথাও খুঁজে-পাওয়া যাচ্ছিলো না। বাইশে, আমরা যখন দ্বিতীয় দফায় রাস্তায় নামবো, *হা কপাল!*, কোথায় মোরিলিরে! আমরা তাকে সর্বত্র খুঁজেছি, চারপাশে, তাবৎ খোঁজাখুঁজি কেবল মিথ্যে হয়রানিই হয়েছে, তার কোনো পাত্তাই নেই, অতএব বাধ্য হ'য়ে আমাদের তার জন্যে সবুর করতে হয়েছে।

পরদিন, ভোর ফোটবার আগেই, ফের সে যথারীতি আপন স্থানে, যাত্রার জন্যে তৈরি, যেন কিছুই হয়নি। এবার সে তার অনুপস্থিতিটা আর অস্বীকার করতে পারেনি। সে কাঁচুমাচু মুখ ক'রে জানিয়েছে তাকে নাকি আগের ছাউনিটায় ফিরে যেতে হয়েছিলো, ভুল ক'রে কাপ্তেন মার্সেনের মানচিত্রগুলো সে সেখানে ফেলে এসেছিলো ব'লে। কাপ্তেন তাকে আচ্ছা-ক'রে ধমক লাগিয়েছেন, আর এত-সব তিরস্কার-ভর্ৎসনার পর মনে হয়েছে ব্যাপারটার এখানেই ইতি হ'য়ে গেছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি হয়তো এ-ব্যাপারটা উল্লেখই করতুম না, যদি-না সাঁৎ-বেরাঁ তাঁর তাজ্জব কায়দায় ব্যাপারটাকে আরো-গুরুতর ব'লে দেখাতে না-চাইতেন। সে-রাত্তিরে চোখে ঘুম আসছিলো না ব'লে তিনি নাকি উঠে পড়েছিলেন—আর ঠিক তখনই আমাদের গাইড শিবিরে ফিরে এসেছিলো। তারপর, খুব রহস্যময়ভাবে, চোখ-দুটো আরো-ঠিকরে বের ক'রে বিস্ফারিত ভঙ্গি ক'রে, মোরিলিরে নাকি পশ্চিম থেকেও ফেরেনি, এবং কাপ্তেন মার্সেনের তাঁবুতেও যায়নি—বরং এসেছে পুব থেকে, কানকানের দিক থেকে, আমরা যেদিকটায় চলেছি; অতএব কিছুই সে ভুলে ফেলে রেখে আসেনি, এবং সে-সব সে খুঁজতেও যায়নি, বরং ডাহা মিথ্যেকথা বলেছে।

কথাটা অন্য-কেউ বললে হয়তো এটা নিয়ে ভাবতো সবাই। কিন্তু, ওঃ, সাঁৎ-বেরাঁ বলেছেন! তবে আর কী। যা ভুলোমন তার—উত্তর-দক্ষিণ পুব-পশ্চিম কাকে বলে সে-সম্বন্ধে তাঁর কি কোনো খেয়াল আছে?

হ্যাঁ, যা বলছিলুম। বলেছি যে অন্য ঘটনাটা ঘটেছিলো কানকানে। আমরা যখন হাঁটতে বেরিয়েছি—মাদমোয়াজেল মোরনাস, মঁসিয় বারজাক, সাঁৎ-বেরাঁ আর আমি এবং ৎশুমুকি আর মোরিলিরে আমাদের সব দেখাতে-দেখাতে চলেছে...

দেখুন কাণ্ড! আমারও বোধহয় সাঁৎ-বেরাঁর রোগে ধরেছে। স্পষ্ট ক'রে কিছুই গুছিয়ে বলতে পারছি না, পারম্পর্যটাই রক্ষা করা হয়নি, অতএব আমাকে একটু পেছিয়েই যেতে হবে।

তবে জেনে রাখুন, গত ক-দিন ধ'রেই, মোরিলিরে প্রায় আমাদের কানের পোকা বের ক'রে ছেড়েছিলো, সারাক্ষণ কেবল গুণকীর্তন করেছে কোনো ওঝার—না, ঠিক ওঝা নয়, একজন *কেনিয়েলালার* (ভাবী-কথক, জ্যোতিষী), সে নাকি কানকানে থাকে। তার মতে এই *কেনিয়েলালার* নাকি চমকপ্রদ *দিব্যদৃষ্টি* আছে, আর বারে-বারেই আমাদের হাতে-পায়ে ধরেছে একবার তাঁর কাছে গিয়ে আমরা যেন ভবিষ্যৎ জেনে আসি। বলাই-বাহুল্য, আমরা সবাই তাকে একবাক্যে হাঁকিয়ে দিয়েছি। আমরা এই অ্যাদ্দুরে, আফ্রিকার অভ্যন্তরে, কোনো গণৎকারের সন্ধানে আসিনি—তা তাঁর *দিব্যদৃষ্টি* যত-দূরেই দেখতে পাক না কেন।

কিন্তু, আমরা যখন কানকানে ঘুরতে বেরিয়েছি, আর ৎশুমুকি আর মোরিলিরে সব দেখাতে-দেখাতে চলেছে, হঠাৎ তারা একটা কুঁড়েঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে—যেন তাদের পাগুলো কেউ ওখানেই পুঁতে দিয়েছে। কুঁড়েঘরটা অন্য-সব কুঁড়েঘরের চাইতে আলাদা নয় একটুও। দৈবাৎ নাকি—এই দৈব বোধহয় তাদের পায়ে-পায়েই চলে—আমরা নাকি সেই আশ্চর্য *কেনিয়ালালার* বাড়ির সামনে এসে হাজির হয়েছি। আবারও তারা আমাদের পরামর্শ দিয়েছে তাঁকে এবার দর্শন ক'রে আসতে। এবং আবারও আমরা সে-প্রস্তাবে রাজি হইনি। কিন্তু তারা কোনো মানা শুনলে তো!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার তারা এই গুণিন—না গণৎকার—তা সেই যেই হোক না কেন, তার গুণকীর্তন শুরু ক'রে দিয়েছে।

আমরা *কেনিয়ালালার* কাছে যাই বা না-যাই তবে মোরিলিরেরই বা কী—কিংবা তার জিগরি-দোস্ত ৎশুমুকিরই বা কী? এই দেশের কায়দাকানুনও কি এতটাই উন্নতি ক'রে বসেছে যে *কেনিয়ালালার* কাছে আমাদের নিয়ে গেলে *দালালি* পাবে?

আমরা যতই গররাজি হই, তাদের উৎসাহ কিন্তু মোটেই কমে না। শেষটায় এমন ঝোলাঝুলি করতে লাগলো যে '*অগত্যা*' ব'লে আমরা রাজি হ'য়ে গেছি, তাতে যদি অশান্তিটা একটু কমে। আমরা গেলে হয়তো *কেনিয়ালালার* খাতির বেড়ে যাবে, এরা দুজনেও কিঞ্চিৎ দালালি পাবে—আর এ-তো নেহাৎই কয়েকটা কানাকড়ির মামলা।

আমরা একটা কুঁড়েঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ি, যাচ্ছেতাই নোংরা, ঠিক যেন একটা আঁস্তাকুড়, শুধু একটা ঘুলঘুলি দিয়ে ক্ষীণ-একটু আলো এসে ঢুকছে ভেতরে। খোদ *কেনিয়ালালা* দাঁড়িয়ে আছে ঘরের ঠিক মাঝখানে। পাঁচ মিনিট ধ'রে নিজের উরু থাবড়ে সে আউড়েছে *ইনতি-তিলি* অর্থাৎ 'শুভমধ্যাহ্ন,' কারণ তখন ঠিক দুপুরবেলাই বটে, তারপর একটা চাটাইয়ের ওপর ব'সে প'ড়ে আমাদেরও অমনি ব'সে পড়তে বলেছে।

সে শুরু করে নিজের সামনে খুব-মিহি একরাশি বালি জড়ো ক'রে ঢিবি বানিয়ে, তারপরে একটা ঝাঁটা দিয়ে সেটা সে দু-দিকে ছড়িয়ে দেয় পাখার মতো। তারপর আমাদের কাছে সে একডজন *কোলা নাট* চায়, ছটা লাল আর ছটা শাদা, তারপর সে ক্ষিপ্রহাতে সেগুলো ঘোরায় বালির ওপর, আর কী-যেন দুর্বোধ্য-সব হ-য-ব-র-ল আওড়ায়; তারপর বালির ওপর সে বেছায় তাদের নানারকম আকৃতিকে, কখনও গোল, কখনও চৌকো, কখনও রুহিতনের মতো, কখনও আবার আয়তাকার, তারপরেই ত্রিভুজ অথবা বর্গক্ষেত্র ইত্যাদি, আর বারে-বারে নানারকম মুদ্রা ক'রে সে তাদের ওপর তার হাত দিয়ে, যেন তাদের সে আশিস জানাচ্ছে। অবশেষে সে সেগুলো সাবধানে গুছিয়ে জড়ো ক'রে নেয়, আর তার নোংরা হাতটা পাতে আমাদের সামনে—আমরা তাকে নজরানা দিই, আমাদের জিজ্ঞাসার ফি।

এবং, সত্যি, এখন তাকে কেবল আমাদের জিজ্ঞাসা করাই বাকি শুধু। তার ওপর যেন দৈবশক্তি এসে ভর করেছে। সে বকবক শুরু ক'রে দেয়।

ঘুরে-ফিরে আমরা তাকে কতগুলো প্রশ্ন করি, আর সে চুপচাপ ব'সে-ব'সে মন দিয়ে তা শোনে। সব প্রশ্নের জবাবই সে একসঙ্গে দেবে, সে আমাদের জানায়। আমরা যখন কথা বলা শেষ করবো, তখনই তার কথা বলার পালা শুরু হবে। সে বেশদ্রুতস্বরেই সোজাসুজি কথা বলে, যেন সে নিশ্চিত জানে সে কী বলছে। খুব-একটা উৎফুল্ল হবার মতো কিছু বলেনি, এই আমাদের বুজুর্গ বাজিকর—দুর্দান্ত-ভেলকিবাজ! তার ওপর আমাদের যদি বিন্দুমাত্র আস্থা থাকতো,—যেটা আমাদের আদৌ ছিলো না—তবে সে-



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘর থেকে আমরা ভয়তরাস নিয়েই ফিরে আসতুম, উদ্বেগে আমাদের মুখচোখ শুকিয়ে যেতো।

সে শুরু করে গোড়ায় আমাকে পেড়ে ফেলেই। আমি জিগেস করেছিলুম জগতে আমি যা সবচেয়ে-মূল্যবান ব'লে মনে করি—অর্থাৎ আপনাদের যে-সব নিবন্ধ লিখে পাঠাচ্ছি—সেগুলোর গতি কী হবে। 'শিগগিরই,' বিদঘুটে একটা ভঙ্গি ক'রে এই বুজুর্গ আমায় তার ভাষায় বলে, আর আমি সেগুলো তর্জমা ক'রে দিচ্ছি : 'শিগগিরই আর-কেউই তোমার কোনো হদিশ পাবে না—কোনো খবর না।'

তাহ'লে এই অশেষ-দুর্গতিভোগ আছে আমার কপালে ! তবে এই ভেলকিবাজ তো বলেছে 'শিগগিরই,' অর্থাৎ এ-চিঠিটা নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে।

*কেনিয়ালালা* তারপর পড়ে সাঁৎ-বেরাঁকে নিয়ে।

'আপনি এমন-একটা চোটজখম পাবেন,' সে ভবিষ্যদ্বানী করে, 'তাতে আপনার বসতে কষ্ট হবে।'

আমি বঁড়শিগুলোর কথা ভাবি। এই জাদুগর একটু দেরি ক'রে ফেলেছে ভবিষ্যৎ বলতে গিয়ে—বুড়ো ধাপ্পাবাজ। তার মনটা অতীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যার ছায়ায় মোরিলিরে আর ৎশুমুকি নিশ্চয়ই আগেই একটু আলো ফেলে গেছে।

এরপর মাদমোয়াজেল মোরনাসের পালা।

'আপনি হৃদয়ে আঘাত পাবেন,' *কেনিয়ালালা* ঘোষণা করে।

*ও-হো !*, খুব-আহাম্মক নয় তাহ'লে এই ধড়িবাজ লোকটা। লক্ষ ক'রে, দেখুন, সব কেমন ঝাপসা রেখেছে। স্পষ্ট ক'রে বলেনি, আঘাতটা শারীরিক না মানসিক হবে। আমার তো মনে হয় মাদমোয়াজেল যা আঘাত পাবেন তা মনেই। এবং আমরা সন্দেহ একটু দৃঢ় হয় যে—আমাদের গাইডরা নিশ্চয়ই এখানে এসে খুব ক'রে কেচ্ছা গেয়ে গেছে। ভবিষ্যদ্বাণীটাকে আমি যে-অর্থে নিয়েছি, মাদমোয়াজেল মোরনাসও নিশ্চয়ই সেই অর্থেই নিয়েছেন, কেননা দেখতে পাই তিনি একেবারে আরক্ত হ'য়ে উঠেছেন—যাকে বলে লজ্জারুণরাঙা। বাজি ধ'রে বলতে পারি, তিনি তখন কাপ্তেন মার্সেনের কথাই ভাবছিলেন।

কিন্তু আমাদের জাদুগর বুজুর্গ যে চুপ মেরে গেছে ! মঁসিয় বারজাকের দিকে কেমন একটা ক্রূর খলদৃষ্টিতে তাকায় সে। স্পষ্ট বুঝতে পারি, এখন আমরা সবচেয়ে ভয়ানক ভবিষ্যদ্বাণীটা শুনতে পাবো। সে ভবিষ্যদ্বাণী করে : 'সিকাসোর ওপাশে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি একজন শাদামানুষ। এ তো দেখছি আপনাদের বরাতে হয় গোলামি, নয়তো মৃত্যু লেখা রয়েছে !'

বাঃ, ভারি আমোদ জোগাতে পারে তো, এই আমাদের ধেড়ে-ঠাকুর্দা !

'শাদামানুষ ?' মাদমোয়াজেল মোরনাস আউড়েছেন কথাটা। 'কালা-আদমির কথা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলছো তুমি ?'

'আমি বলেছি, "শাদামানুষ"—শ্বেতাঙ্গ,' অমনি দিব্যদৃষ্টিধারী *কেনিয়ালালার* ঘোষণা আসে, 'সিকাসোর পরে আর যাবেন না, খবরদার। গেলেই—*হয় গোলামি, নয় মৃত্যু* !'

বাহুল্য হবে বলা যে আমরা হুঁশিয়ারিটাকে হালকাভাবেই নিই, লঘুচালে। সে-কোন কথকগায়ক যে আমাদের ফরাশি পাঠক বিশ্বাস করবে, যে ব'লে বসে যে একজন শ্বেতাঙ্গ এতই শক্তিমান যে আমাদের মতো এত-বড়ো এক বাহিনীটিকে ঘায়েল ক'রে দেবে?

সেদিন সন্ধেবেলায়, এই গল্পটা নিয়ে আমরা হাসাহাসি করি—কেননা, সত্যি বলতে, এটা তো একটা গল্পই, ভারি-মজার গল্প। একটু ভীরু-মতো হ'লে কী হবে, এমনকী মঁসিয় বোদ্রিয়েরও সব শুনে-টুনে আমাদের হাসিরাশিতে যোগ দিয়ে বসেন—হাসেন না ঠিক, তবে তাঁর আননে ভয়তরাসও দেখা যায় না। তারপরে পুরো গল্পটাকেই আমরা মন থেকে উড়িয়ে দিই।

কিন্তু আজ সন্ধেয় আবার ব্যাপারটা আমার মনে প'ড়ে যাচ্ছে—যখন শুতে গিয়েছি তাঁবুতে। বেশ-একটু মাথাই ঘামিয়েছি ব্যাপারটা নিয়ে, আর তারপর এমন-একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি যে... যেটা... কিন্তু আপনারা নিজেরাই বিচার ক'রে দেখুন ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবার মতো কি না।

প্রথমে সমস্যাটাকে গুছিয়ে নেয়া যাক।

তথ্য আছে সবশুদ্ধু আড়াইখানা।

ঐ আধখানা তথ্য হ'লো তিম্বোতে মোরিলিরের আকস্মিক অন্তর্ধান, আর তারপর আবার কানকান আসার ঠিক-আগটায়—তার উধাও হ'য়ে-যাওয়া।

অন্য-দুটো তথ্য হ'লো *দুং-কোনো* বিষ দিয়ে আমাদের খতম ক'রে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা—এবং এই বুজুর্গ ভেলকিবাজের ভয়দেখানো ভবিষ্যদ্বাণী।

এবার এই আড়াইখানা তথ্যকে একটু ঝাঁকিয়ে দেখা যাক।

*প্রথম তথ্য* : এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে নগণ্য একটা গাঁয়ের মোড়ল দুশোজন সশস্ত্র সেপাই সমেত একটা আস্ত অভিযানবাহিনীকে ঘায়েল ক'রে দেবার উন্মাদ ষড়যন্ত্র করবে —বিশেষত যে-অঞ্চলটায় আমাদের সামরিক ব্যারাক আছে—তিম্বো থেকে পঁচিশ মাইল দূরে—যেখানে এমনকী একটা গড় পর্যন্ত বানিয়ে রেখেছে ফরাশি সেনাবাহিনী ? না, এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য। উঁহু, কিছুতেই এমন-কোনো ষড়যন্ত্রের কথা ভাবা যায় না।

*দ্বিতীয় তথ্য* : এও কি বিশ্বাসযোগ্য যে ঐ ধান্দাবাজ *কেনিয়ালালার* ভবিষ্যৎ প'ড়ে নেবার মতো অলৌকিক কোনো শক্তি আছে—কোনো অতিপ্রাকৃত দৈবায়ত্ত ক্ষমতা ? না, তার যে এমন-কোনো ক্ষমতা নেই, সেটা সুনিশ্চিত।

কিন্তু *দুং-কোনোর* ব্যাপারটাও মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়—কেউ, মাথাখারাপ হ'য়ে না-গেলে, এমন-কোনো ষড়যন্ত্র পাকাবেই না। তার মানে, এটা একটা সাজানো ব্যাপার,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

*ধাপ্পা*, এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে আমরা যেন সেটা বিশ্বাস ক'রে দারুণ ভড়কে যাই।

তেমনি, এই *কেনিয়ালালাও* আগে যা-খুশি তা-ই ব'লে গেছে, অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছে, কোনো-কিছুই এতটা সুনিশ্চিতভাবে বলেনি যতটা দৃঢ়তা নিয়ে আস্থার সঙ্গে ঘোষণা করেছে : সিকাসো পেরুলেই, *দাসত্ব অথবা মৃত্যু*!

সিদ্ধান্তটা তাহ'লে ক'রে ফেলতেই হয় : কেউ-একজন আমাদের ভয় দেখাতে চাচ্ছে।

কে বা কারা? কেন? আপনারাই ভেবে বলুন।

কে? সে-সম্বন্ধে আমার অন্তত ন্যূনতম ধারণাও নেই।

কেন? উদ্দেশ্যটা তো পরিষ্কার : আমরা যাতে অভিযানটা মুলতুবি রেখে ভয়ে-ভয়ে ফিরে যাই। কারু পক্ষে আমরা নিশ্চয়ই নিজেদের অজান্তেই বিষম-বিপজ্জনক হ'য়ে উঠেছি। কেউ একজন চায় না যে সিকাসো পেরিয়ে আমরা আরো-ভেতরে চ'লে যাই।

আর মোরিলিরে সংক্রান্ত ঐ আধখানা তথ্য? হয় সেটা নেহাৎই কাকতাল, তার পেছনে কোনো গূঢ় অভিসন্ধি নেই, সাঁৎ-বেরাঁর যা ভুলোমন, তিনি যে কী দেখতে কী দেখেছেন, কে জানে। আর নয়তো, মোরিলিরে নিজেই তাদেরই দলের লোক, যারা আমাদের অমন ক'রে ভয় দেখাতে চাচ্ছে। *কেনিয়ালালার* কাছে আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে তার অমন ব্যগ্রতা দেখে অবশ্য সেই সন্দেহটাই হয়। এমনও হ'তে পারে যে আমাদের ভয় দেখাবার জন্যেই তাকে কেউ ভাড়া করেছে। অন্তত এই-একটা ব্যাপার আমাদের তদন্ত ক'রে দেখতে হবে।

আমার তো এমনই মনে হয়। একমাত্র ভবিষ্যৎই জানে, এ আমার রজ্জুতে সর্পভ্রম কি না। দেখা যাক : ভবিষ্যৎ কী বলে।

**আমেদে ফ্লরেঁস**

*পুনশ্চ : ঝোপের মধ্যে, কান্‌কান থেকে একদিনের পথ দূরে, ২৬শে ডিসেম্বর।*

আগের দিনের চিঠির সঙ্গে এই *পুনশ্চটাও* জুড়ে দেয়া উচিত। ৎশুমুকি কথা দিয়েছে সে এটা আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে।

কাল রাতে যা ঘটেছে, সেটা অত্যন্ত-অস্বাভাবিক ব্যাপার। যেমন ঘটেছে, তেমনই বলবো আমি। ব্যাখ্যা করার কোনো চেষ্টাই করবো না।

আমরা কান্‌কান ছেড়েছি কাল সকালে, দুই দফায় লম্বাপথ পাড়ি দিয়েছি আমরা, সবশুদ্ধু কুড়িমাইল হবে, তারপর তাঁবু ফেলেছি একটা খোলামাঠে। এদিকটায় লোকজন তেমন থাকে না। শেষ যে-গ্রামটা আমরা পেরিয়ে এসেছি, দিয়াঙ্গনা, সেটা আমাদের বারোমাইল পেছনে প'ড়ে আছে—আর পরের গ্রামটা এখান থেকে তিরিশমাইল দূরে,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিকাসো।

যেমন রোজ হয়, তেমনিভাবেই শিবিরের লোকজন ঘুমুতে গেছে।

নিশুত রাত্রে আমরা হঠাৎ একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুনে ধড়মড় ক'রে জেগে উঠেছি। কীসের আওয়াজ, আমরা কেউই বুঝতে পারিনি। একটা গুমগুমে গর্জন, অনেকটা যেন বাষ্পেচলা এনজিনের আওয়াজ; কিংবা হয়তো আরো-লাগসই হয়, যদি বলা যায় যে আওয়াজটা শুনে মনে হচ্ছিলো একসঙ্গে যেন হাজারটা পতঙ্গ গুঞ্জন ক'রে উঠেছে, না, ঐ ছোটোখাটো পতঙ্গ নয়—অতিকায়-সব পতঙ্গের আওয়াজ, একেকটা পতঙ্গ যেন হাতির মতো, আর মত্ত মাতঙ্গের মতোই যেন পতঙ্গগুলো বৃংহন ছাড়ছে।

শাস্ত্রীদের জিগেস ক'রে জানা গেলো, এই বিদঘুটে গর্জনটা পশ্চিমদিক থেকেই শুরু হয়েছে আচমকা। প্রথমে ক্ষীণ ছিলো শব্দটা, ক্রমশ জোরালো হ'য়ে উঠেছে। আমরা যখন হুড়মুড় ক'রে তাঁবু থেকে বেরিয়েছি তখন আওয়াজটা যেন চরমে পৌঁছেছে: আজব ব্যাপার হ'লো মনে হচ্ছিলো আওয়াজটা যেন ওপর থেকে আসছে, হাওয়ায় ভেসে আসছে—আকাশ থেকে। যে-ই এই আওয়াজ করুক না কেন, সে আছে ঠিক আমাদের মাথার ওপরে। কিন্তু কী হ'তে পারে সে?

মিথ্যেই আমরা চোখ রগড়ে আকাশের দিকে তাকিয়েছি। কিছুই ঠাহর হয়নি। অন্ধকারে কিছুই দেখবার জো ছিলো না। ঘন-মেঘ ঢেকে রেখেছে চাঁদ, রাত্তিরটা যেন ঘুটঘুটে-কালো, একটা তারাও দেখা যাচ্ছে না মেঘের জন্যে।

যখন আমরা চোখ বিস্ফারিত ক'রে অন্ধকার ফুঁড়ে তাকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছি, আওয়াজটা মাথার ওপর থেকে পুবদিকে চ'লে গেছে, তারপর আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেছে, একটা থমথমে স্তব্ধতা নেমে এসেছে তারপর... কিন্তু আওয়াজটা পুরোপুরি মিলিয়ে যাবার আগেই, আবার শুনতে পাই আওয়াজটা ফের পশ্চিমদিক থেকে এগিয়ে আসছে। আগের বারের মতো এবারও আওয়াজটা ক্রমেই বেড়ে গিয়েছে, তারপর চরমে পৌঁছেছে—প্রায় ভোঁ-ভোঁ করেছে কানে, তারপর ফের পুবদিকে মিলিয়ে গেছে।

আস্ত শিবিরটাই আতঙ্কে থরথর করেছে। কালো লোক যত ছিলো, সবাই মাটিতে মুখ গুঁজে সাষ্টাঙ্গে উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়েছে। শ্বেতাঙ্গরা সবাই কাপ্তেন মার্সেনেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থেকেছে আকাশে, তাদের মধ্যে তোঙ্গানে আর ৎশুমুকিও ছিলো, সম্ভবত শাদাদের সঙ্গে মিশে-মিশে তারাও শাদাদেরই মতো হ'য়ে উঠেছে। মোরিলিরেকে কিন্তু কোথাও দেখতে পাইনি আমি। হয়তো সেও ওখানে অন্য কালোদের মতো মাটিতে মুখ গুঁজে উপুড় হ'য়ে শুয়ে রয়েছে।

পাঁচ-পাঁচবার সেই ভয়াবহ গর্জন রাতের আকাশ কাঁপিয়েছে, শুরু হয়েছে ক্ষীণ, পৌঁছেছে সপ্তমে, তারপর মিলিয়ে গেছে। তারপর আবার থমথমে স্তব্ধতায় ভ'রে গিয়েছে নিশুত রাত্রি—আর-কোনো আওয়াজ বিনাই একসময়ে ভোরও হ'য়ে গেছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকালবেলায় আরেকটা ঝামেলা, কিছুতেই সার বাঁধানো যায়নি। স্থানীয় লোকেরা ভয়েই জবুথবু, তারা আর-একপাও নড়বে না। কাপ্তেন মার্সেনে শেষকালে অনেক তুইয়ে-বুইয়ে তাদের রাজি করিয়েছেন লাইন ধ'রে দাঁড়াতে : তিনি তাদের আঙুল তুলে দেখিয়েছেন জ্বলজ্বলে সূর্যটাকে, নির্মেঘ আকাশে পুবদিকে সে উঠেছে। এখন তো আকাশে-বাতাসে অদ্ভুত-কিছু আজব-কিছু ভয়াবহ-কিছু ঘটছে না।

শেষকালে আমরা বেরিয়ে পড়েছি, তিনঘণ্টা দেরি ক'রে।

রাত্তিরের ঐ অদ্ভুত আওয়াজটাই, স্বভাবতই, আমাদের সব কথাবার্তার বিষয় হয়েছে, কিন্তু কেউই প্রহেলিকাটা ভেদ করতে পারেনি। আস্তে-আস্তে অবশ্য অন্য-সব বিষয়েও আমাদের আলোচনা মোড় ঘুরেছে। তারপর আমাদের ছাউনি থেকে বেরিয়ে দেড়মাইল এগিয়ে যাবার পর, কাপ্তেন মার্সেনে—তিনিই সকলের আগে-আগে যাচ্ছিলেন—হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন—পশ্চিমদিকে, মাটির ওপর, চারইঞ্চি গভীর ক'রে জমির ওপর গোল-গোল দাগ, আস্তে-আস্তে দাগগুলো পুবদিকে চ'লে গেছে, তারপর মিলিয়ে গেছে হঠাৎ। এ-রকম দশ সার দাগ—দুটো-দুটো ক'রে পাঁচটা ভাগে বিভক্ত।

কাল রাতের রহস্যময় ঘটনার সঙ্গে এই অদ্ভুত দাগগুলোর কি কোনো সম্বন্ধ আছে। প্রথমেই মনে হয় : না। কেননা আওয়াজটা উঠেছিলো আকাশে, এ-দাগগুলো আছে মাটিতে।

অথচ এদের গন্তব্য মনে হয় একটাই—যাবার ধরনও এক—পশ্চিম থেকে পুবে। আর সংখ্যাও তো একই : পাঁচটা দলে ভাগ হওয়া চার ইঞ্চি গভীর দাগ, পাঁচ-পাঁচবার আকাশে গর্জন করেছে ঐ বিদঘুটে, কিম্ভূত, অদ্ভুত আওয়াজ।

*তাহ'লে ?*

মানে কি এর ?

আমি, অন্তত, জানি না।

**আমেদে ফ্লরেঁস**



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত

# সিকাসোয়

বারোই জানুয়ারি বারজাক মিশন এসে সিকাসো পৌঁছুলো, উপকূল থেকে কম ক'রেও সাতশো মাইল দূরে।

*ল্যক্রপানসিয়ঁ ফ্রাঁসেঈ* যদিও আমেদে ফ্লরেঁসের কাছ থেকে আর-কোনো নিবন্ধ পায়নি, সেই বিখ্যাত সাংবাদিকটি কিন্তু রোজকার ঘটনা সব খুঁটিনাটি সমেত এখনও তাঁর নোটবইতে লিখে চলেছেন; তাঁর সেই নোটবই থেকেই পরের বৃত্তান্তটা নেয়া হয়েছে।

তাঁর নোটবই প'ড়ে জানা যায়, কান্‌কান থেকে সিকাসো অব্দি প্রায়-একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন ভাবেই এগিয়েছে বারজাক মিশন, এমন-কোনো ঘটনাই ঘটেনি যেটা অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত ছিলো। কতগুলো রসিকতাও ছিলো তাতে, সাঁৎ-বের্ঁ্যাকে চাঁদমারি ক'রে, তাঁর সেই নামজাদা ভুলোমনেব কাজকারবার নিয়ে। এছাড়া যেমন হয় পথে-ঘাটে, কতগুলো ঘটনা ঘ'টে যায়, কিন্তু কৌতূহল উসকে দেবার মতো উপকরণ তাতে কিছুই থাকে না। ৎশুমুকিকে দেখা গেছে তার পুরোনো দোস্ত তোঙ্গানেকে এড়িয়ে চলতে, বরং তার খাতির ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে অভিযানের প্রথম গাইড মোরিলিরের সঙ্গে—তবে এদের দোস্তি-দুশমনিতে কারুই কোনো আগ্রহ ছিলো না।

*কেনিয়ালালার* ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণীগুলো যে শিগগিরই একদিন ফ'লে যাবে, এমন-কোনো লক্ষণই দেখা যায়নি কোথাও। আমেদে ফ্লরেঁস নিয়মিত তার নিবন্ধগুলো লিখেই চলেছেন, কিছুতেই তাঁর সাংবাদিকের রুটিনে ফাঁক পড়ে না, আর নিয়মিত সেগুলো ৎশুমুকির হাতে তুলেও দিচ্ছেন—আর সে একগাল হেসে ব'লেও যাচ্ছে যে সেগুলো সে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে; আর কোনোকারণে সেগুলো যদি যথাস্থানে না-পৌঁছে থাকে, সাংবাদিকের তা জানবার কোনোই উপায় ছিলো না। সাঁৎ-বের্ঁ্যা এখনও অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হ'তে পারে। জেন মোরনাসের হৃদয়েও কোনো মস্ত আঘাত পড়েনি—অন্তত প্রকাশ্যে দেখা যায় এমন-কোনো মর্মভেদী-কিছু ঘটেছে ব'লে মনে করার কোনো কারণ নেই। তবে আলংকারিক অর্থে হৃদয়ের আঘাতটা ফ'লে-যাবার একটা সম্ভাবনা রয়েছে বটে—অন্তত ফ্লরেঁস সেই-মর্মে একটা-দুটো মন্তব্য ক'রে রেখেছেন। আর ঐ চতুর্থ ভবিষ্যদ্বাণী—যেটা সবচেয়ে-গুরুতর এবং সাংঘাতিক, সেটা ফলবার কোনো, আবারও জোর দিয়ে বলা যায় *কোনোই*, লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। মিশন ধ্বংস হ'য়ে যায়নি এখনও —মিশনের কেউই ক্রীতদাস হিশেবে এখনও হাটে-বাজারে বিক্রি হয়নি। কাপ্তেন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্সেনের তত্ত্বাবধানে শান্তিপূর্ণভাবেই অভিযাত্রীরা এগিয়ে যাচ্ছে তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে : দুশো খোলাতলোয়ার বজায় রেখেছে শান্তি, গাধাঘোড়াগুলোর ওপর দিয়ে ধকল গেলেও তাদের কারু মুখ থুবড়ে প'ড়ে টেঁশে-যাবার কোনোই সম্ভাবনা নেই, আর সেই-যে নদীতে কিছু-কিছু মালপত্তর ভেসে গিয়েছিলো, তারপর তাঁদের লটবহর থেকে আর-কিছুই খোয়া যায়নি।

তাছাড়া, আমেদে ফ্লরেঁস তাঁর তৃতীয় নিবন্ধের শেষে যে অস্বস্তিকর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, সেটাকে সমর্থন ক'রে নতুন-কিছুই ঘটেনি। অভিযানের সারের ওপর অতর্কিতে এসে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে কেউ কোনো হামলা চালায়নি, আর নতুন-কোনো *কেনিয়ালালার*ও মুখোমুখি পড়তে হয়নি যে অভাবিত-সব ভাবী দুর্ঘটনার কথা ব'লে তাদের ঘাবড়ে দেবে। কাজেই মনে হয়, সাংবাদিকের অনুমান যদি ঠিকই হ'য়ে থাকে, কেউ-কেউ যদি এই মিশনকে ঘাবড়ে দিয়ে ফেরৎ পাঠাবার কোনো উদ্ভট মৎলবও এঁটে থাকে, সব দেখেশুনে এখন মনে হচ্ছে সে তার ঐ বদমৎলবটা বুঝি ত্যাগ করেছে।

সত্যি-বলতে, ফ্লরেঁস নিজেও এই চক্রান্তটা সম্বন্ধে পুরোপুরি মনস্থির ক'রে উঠতে পারেননি। যে-আড়াইখানা তথ্যের ওপর ভর ক'রে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, সেগুলো ক্রমে-ক্রমে নিতান্তই-অস্পষ্ট মনে হয়েছে—পরে মন থেকে মিলিয়ে গেছে। যদিও অভিযান গিয়ে সিকাসো পৌঁছোয়নি—ভবিষ্যৎবাণী তো বলেছিলো তার পর থেকেই শুরু হবে উৎপাত—তবু প্রতিদিনই ফ্লরেঁস আরো-বেশি আশ্বস্ত বোধ করেছেন : দিনের আলোয় সবসময়েই মনে হয়েছে কথাটা নিতান্তই-উদ্ভট আর আজগুবি : নিরীহ কালো লোকেরা হঠাৎ এমন-একটা সশস্ত্র বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাতে যাবেই বা কেন ?

ফ্লরেঁস অবশ্য যদি খেয়াল করতেন কিছুদিন পরেই অভিযান দু-ভাগ হ'য়ে দুটো দল দুটো ভিন্ন পথে পাড়ি জমাবে, তাহ'লে হয়তো তাঁর অস্বস্তিটা তিনি এমনভাবে উড়িয়ে দিতেন না।

কারণ সিকাসো থেকেই বারজাক মিশন দু-ভাগ হ'য়ে যাবে। একদল যাবে, খোদ বারজাকের নেতৃত্বে, নাইজার নদীর তীর ধ'রে, আর দাহোমে ঘুরে ফের ফিরে যাবে কোনাক্রিতে, অন্যদলটা বোদ্রিয়েরের নেতৃত্বে যাবে দক্ষিণদিকে—গ্রাঁ-বাসাম-এ। দুটো দলেরই সুরক্ষার জন্যে সশস্ত্র পাহারা দরকার হবে—ফলে যে সেপাইশান্ত্রীরা সঙ্গে আসছে তারাও দুটো ভাগ হ'য়ে যাবে—একেক দলে থাকবে মোটে একশোজন সৈন্য।

সিকাসো আসলে পর-পর পাশাপাশি কতগুলো গ্রামকে ঘিরেই গ'ড়ে উঠেছে—গ্রামগুলোর মধ্যে আছে চাষের জমি, যথারীতি *তাতা* দিয়ে ঘেরা; তারই মধ্যে ফরাশি সরকার গ'ড়ে তুলেছেন একটা গড়, আর সৈন্যসামন্তের থাকার জন্যে ছাউনি আর ব্যারাক।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঔপনিবেশিক পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে-সঙ্গেই আছে সেনেগলি সেনাবাহিনী—অফিসাররা সবাই ফরাশি, এন-সি-ওও [ নন-কমিশানড অফিসাররাও ] তাই। এই তরুণ অফিসারদের আনন্দ উপচে পড়েছে, এই বারজাক মিশন এসে হাজির হ'তেই : কতদিন তারা দেশের লোকের মুখ দ্যাখেনি, প'ড়ে আছে এই বিদেশ-বিভুঁইতে। আনন্দটা উল্লাস হ'য়ে ফেটে পড়লো, যখন তারা আবিষ্কার করলে যে এই সেপাইশান্ত্রীদের দায়িত্বে আছেন খোদ কাপ্তেন মার্সেনে, তাদেরই পুরোনো বন্ধু। আর উল্লাস প্রায় মহোল্লাসে পরিণত হ'য়ে গেলো যখন তারা দেখতে পেলে অভিযানের সঙ্গে আছে এক শ্বেতাঙ্গ তরুণী —এবং নিছক তরুণীই নয়, বুকের রক্ত চলকে দেবার মতো অপরূপ রূপসীও।

একটা পোশাকি স্বাগতম্ জানানো হ'লো নবাগতদের। হাওয়ায় উড়লো *তেরঙ্গা*, তূরী-ভেরী বাজালো *লা মার্সাঈ*, ঢাক-ঢোল তুলে দিলে চনমনে নাচের ছন্দ, আর তোরণ সাজানো হ'লো ফুলে-পাতায়—আর চারপাশে ঘিরে রইলো আশপাশের গাঁ থেকে মেলা-দেখতে-আসা স্থানীয় লোকজন। কিছুই বাদ যায়নি, এমনকী সাংসদ বারজাকের শ্রীকণ্ঠ-নিঃসৃত আলংকারিক বচনে ভরপুর এক ভাষণও না।

সেদিনই সন্ধেবেলায় তরুণ অফিসাররা ফুর্তির হাট বসালে এক মজলিশের ব্যবস্থা ক'রে। তার মধ্যমণি মক্ষিরানি জেন মোরনাস—আর তার সাফল্য এমনকী স্বয়ং ভীনাসও বোধকরি স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না। সব্বাই তাঁকে ঘিরে থাকতে চায়, সকলেই চায় তাঁর কৃপাকটাক্ষ, তাদের এই নির্বাসনে এই সুন্দরীর একঝলক মৃদুহাসির জন্যে তারা হয়তো নিজেদের মধ্যে ডুয়েল লড়তেও রাজি ছিলো। তবে জেন মোরনাসের বিচক্ষণ মাথাটি কিন্তু এই দারুণ-জনপ্রিয়তায় আদপেই ঘুরে যায়নি। যত স্তবস্তুতি কানে গেছে তাদের মধ্যে কাপ্তেন মার্সেনের স্তবস্তুতিই হয়তো সহজেই গিয়ে পশেছে তার মরমে। আর সে-যে পক্ষপাত দেখাচ্ছে একটু, এটা তার খেয়ালই হয়নি—এত-সহজ, এত-সরল, এত-স্বতঃস্ফূর্ত ছিলো তার কৃপাকটাক্ষ। ব্যাপার দেখে কাপ্তেন মার্সেনের পুরোনো বন্ধুরা পরে একটু দূরেই স'রে গেলো, ব্যক্তিগতভাবে নিজেরা কৃতার্থ বোধ করেনি বটে, তবে তাদেরই এক বন্ধুর তো কপাল খুলে গেছে, এটাই যেন ছিলো তাদের মনের ভাব। তারা বরং গোপনে অভিনন্দন জানিয়েছে কাপ্তেন মার্সেনেকে—আর মার্সেনে বৃথাই চেষ্টা করেছেন তাদের বোঝাতে যে, 'না-না, এর মধ্যে হৃদয়ঘটিত কোনো ব্যাপার নেই'। মার্সেনে বরং তাদের দৃষ্টি থেকেই স'রে যেতে পারলে বাঁচতেন, বারে-বারে মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে বোঝালেন যে এখনও হৃদয়ের কোনো গাঁটছড়া বাঁধবার মতো অবস্থা হয়নি, এমনকী এক-আধবার যেন বলবারও চেষ্টা করলেন, 'তোমরা যে কী বলতে চাচ্ছো, তা-ই আমি বুঝতে পারছি না'। অথচ-কিন্তু না-বোঝবার মতো অসাড়-গর্বেট তিনি নন মোটেই, এই আমাদের কাপ্তেন মার্সেনে, উল্লাসে বরং তাঁর গলা ফাটিয়ে গান গেয়ে ওঠবার ইচ্ছে করছিলো। তাহ'লে তাঁর দিবাস্বপ্নগুলো ফ'লে গিয়েছে! জেন মোরনাসের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনের ভাব এতই স্পষ্ট ফুটে উঠেছে যে সকলেই তা বুঝতে পেরেছে—তিনি *মিথ্যে ব্যাখ্যা* ক'রে নিজেকে স্তোক দেননি! অর্থাৎ, এই সিকাসোয় এসেই এই তরুণ-তরুণী নিজেরাও উপলব্ধি করেছে পরস্পরের প্রতি তাদের মনের ভাব কী।

পরের দিন বসলো এক আলোচনা সভা। কেমন ক'রে দু-ভাগ করা হবে মিশনকে? বোদ্রিয়েরের সঙ্গে যাবেন মাদাম এইরিউ আর কিরিউ, তাঁদের ওপর ফ্রান্সের নির্দেশ ছিলো সেইরকমই, আর মঁসিয় তসাঁও তাঁদের সঙ্গ নেবেন, সেটা তাঁর নিজেরই অভিরুচি। বারজাকের দলে যাবেন মঁসিয় পঁসাঁ আর ডাক্তার শাতোনে। আমেদে ফ্লরেঁসও সেই দলেই যাবেন ব'লে ঠিক করেছেন। কেননা এ-পথটাই লম্বা বেশি, প্রতিবেদনের মালমশলাও এ-পথেই বেশি-জোটবার সম্ভাবনা।

কাপ্তেন মার্সেনের নির্দেশে তাঁর সেপাইশান্ত্রী থেকে একশোজনকে বেছে-বেছে বোদ্রিয়েরের দলটার সঙ্গে দিয়ে দেয়া হ'লো, তাদের নেতৃত্ব দেবে গড়েরই একজন লিউটেনান্ট। বাকি অর্ধেক লোকলস্কর নিয়ে মার্সেনে নিজেই থাকবেন বারজাকদের সঙ্গে। এ-সমস্ত ঠিকঠাক হচ্ছে, আর ভেতরে-ভেতরে তিনি জ্ব'লে-পুড়ে মরছেন : জেন মোরনাস কোন দলের সঙ্গে যাবেন? প্রসঙ্গটা উত্থাপন করার পর যখন উত্তর মিললো যে জেন মোরনাসও বারজাকের দলের সঙ্গে যাবেন, তখন কী-যে একটি স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো তাঁর বুক চিরে। কিন্তু স্বস্তিটা খুব-একটা স্থায়ী হ'লো না, যখন শুনতে পেলেন যে জেন মোরনাস ও সাঁৎ-বের্ঁ্যা মিদির মাননীয় সাংসদের সঙ্গে মাত্র কয়েকদিনই যাবেন, কেননা কিছুটা যাবার পরেই তাঁরা ভিন্নরাস্তা ধরবেন, কেননা তাঁদের গন্তব্য আরো-উত্তরে, গভীর জঙ্গলে।

সমবেত সমস্ত অফিসারদের মুখ থেকেই একসঙ্গে একটা আপত্তি উঠলো : ও-রকম ভাবে উত্তরের পথে এগুবার মস্ত ঝুঁকি আছে, দলছাড়া হ'য়ে নিজেরা ও-পথে গেলে কখন যে কী বিপদ-আপদ ঘ'টে যাবে তা কেউ জানে না—আর এ-বিষয়ে অফিসারদের কারু মধ্যেই কোনো মতভেদ নেই। কোনো লোকলস্কর সেপাইশান্ত্রী বিনাই ঐ একেবারে-অচেনা-অজানা দুর্গম-পথে কেউ যায়? ওখানে তো এখনও ফরাশি শাসন কায়েমই হয়নি। এ-রকম কোনো অভিযান—তারা দৃঢ়স্বরে জানালে—*সম্পূর্ণ-অসম্ভব*, মিথ্যেই প্রাণ হাতে ক'রে যেতে হবে ওখানে, সমস্ত গ্রামপ্রধানরাই তাঁর রাস্তায় উপদ্রব করবে, বাধাবিপত্তি যে কত তার কোনো ইয়ত্তাই নেই।

এত-সব বোলচালে কোনো ফলই হ'লো না। জেন মোরনাস অনড়, অটল, অবিচল, —কেউ, এমনকী খোদ কাপ্তেন মার্সেনে শুদ্ধু, কেউই তাঁর ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি।

'আপনারা খামকা আপনাদের সময় নষ্ট করছেন,' হেসে বলেছেন জেন মোরনাস, 'তাতে ফল হবে শুধু এই যে আমার মামা মিথ্যেমিথ্যি ঘাবড়ে যাবেন—ঐ তাকিয়ে দেখুন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেমনভাবে ছানাবড়া চোখগুলো কপালে তুলে তিনি তাকিয়ে আছেন।'

'আমি! ভয় পেয়েছি! কে বলে?' অজেনর অমনি প্রতিবাদ তুলেছেন—তর্কাতর্কিতে এর পর তাঁরও প্রবেশ ঘ'টে গেছে।

'হ্যাঁ, তুমি,' জেন মোরনাস নাছোড়। 'তুমি তো ভয়েই আধমরা হ'য়ে গিয়েছো! জিগেস করো এঁদের—সবাই তা-ই বলবেন। তুমি কি এ-সব দুঃসংবাদের পাখিদের কিচির-মিচিরকে পাত্তা দেবে না কি?'

'আমি!' বেচারা সাঁৎ-বেরাঁ আকাশ থেকে পড়েছেন।

'কীসের অত ভয় তোমার, বলো তো?' স্ফুরিত অধরে চমৎকার হেসে জিগেস করেছেন জেন মোরনাস। 'ভাগ্গে, আমি তো তোমার সঙ্গেই থাকবো।'

'কিন্তু কে বলে যে আমি ভয় পেয়েছি!' সকলের দৃষ্টির সামনে অস্বস্তিতে ছটফট ক'রে জিগেস করেছেন সাঁৎ-বেরাঁ।

প্রসঙ্গটাকে ধামাচাপা দিয়ে, জেন মোরনাস তারপর অন্যদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেছেন, 'না। আমি ইওরোপ ছেড়েছিলুম ওম্বোরি পেরিয়ে গিয়ে ঠিক নাইজার নদীর বাঁকে গিয়ে পৌঁছুবো ব'লে, গাও-য়ের কাছে ঠিক যেখানে নাইজার তার অদ্ভুত বাঁকটা ফিরেছে। এবং আমি ওম্বোরি পেরুবোই, গাওতে নাইজার নদীর বাঁকের কাছেও গিয়ে পৌঁছুবো।'

'আর তুয়ারেগ বা আউয়েলিমিদেনের কথাটাও ভাবুন—ও-অঞ্চলে, নাইজার নদীর দু-তীরে, কাদের প্রতাপ, জানেন?'

'তুয়ারেগের আমি থোড়াই পরোয়া করি,' জেন মোরনাস জানিয়েছেন, 'ওরা আমায় ঠেকাতে পারবে না—হাজার বাধা দিলেও আমি আমার লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছুবো।'

'কিন্তু গাও কেন? অন্য-কোথাও তো হ'তে পারতো? আপনাকে যে ওখানেই যেতে হবে, এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে? আপনি তো বেড়াতেই বেরিয়েছেন—এই সফর তো আনন্দ উপভোগ করবার জন্যেই?'

'যেতে চাই আর-কি,' জেন মোরনাসের নাছোড় সংকল্প।

হ্যাঁ, তা বটে, অফিসাররা সবাই একমত। খুবই সাধু সংকল্প, আদ্যোপান্ত ফরাশি; খেয়ালকে অমনভাবে আর কেই-বা অমন সমীহ করে কোথাও?

কম্যাণ্ডাণ্ট বের্গেজ বলেছেন, 'তা ঠিক—এর চাইতে চমৎকার উদ্দেশ্য আর কী হ'তে পারে? কোনো মহিলা যখন কিছু চান, তখন তিনি কিছুই চান, আর এটাই শেষ কথা। সেখানে তর্ক তোলে কোন নচ্ছার? অন্তত আমি নই।'

দলটা—অতএব—ভাগাভাগি হ'য়ে গেলো। লটবহর কিছু বেশি পড়লো বারজাকের দলে, সহিস এবং তল্পিবাহকও তাঁর দলেই কিছু বেশি, কেননা তাঁদের পথটা অন্যদের চাইতে দীর্ঘ। আর মোরিলিরেই তাঁদের গাইড হবে—এই লম্বাপথটার বেশির ভাগ জায়গাই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার চেনা।

কিন্তু ব্যবস্থাটা পাকা করতে গিয়েই প্রথম গণ্ডগোলের সূত্রপাতটা হ'লো। তাকে কথাটা খুলে বলবামাত্র মোরিলিরে সোজাসুজি না ক'রে দিলে—তার *না*-র আর নড়চড় হবে না—মোটেই তাকে টলানো যাবে না তার গোঁ থেকে—কোনো যুক্তিতর্কে কান দেবার পাত্রই সে নয়। সে সোজাসুজি ব'লে দিলে, এই সিকাসো অব্দি আসবার জন্যেই তাকে নিয়োগ করা হয়েছিলো। তারপরে সারা জগতের ধনদৌলত উপঢৌকন দিলেও সে এখান থেকে আর একপাও যাবে না। যুক্তিতর্কে যখন কোনো কাজ হ'লো না, তখন তাকে শাসানো হ'লো, হুমকি দেয়া হ'লো, কিন্তু ঐ তর্জনগর্জনই সার : সে বরং বোদ্রিয়েরদের সঙ্গে দক্ষিণমুখো যাবে—কিন্তু বারজাকের সঙ্গে পুবমুখো—উঁহু, নৈব নৈব চ।

শেষটায় তার জেদের কাছেই নতিস্বীকার করতে হ'লো অভিযাত্রীদের, কিন্তু গণ্ডগোলটা তাতেই কিন্তু মিটে গেলো না। সহিস আর তল্পিবাহকদের বেলায় ঝামেলাটা আরো-চরমে উঠলো। শুধু জেন মোরনাস আর সাঁৎ-বের‍্যাঁ যাদের বাহাল করেছিলেন, তারা ছাড়া আর-সবাই একবাক্যে প্রস্তাবটায় বেঁকে বসলো। সিকাসো পেরিয়ে তারা আর -কোথাও যাবে না। সাধাসাধি, ইনামের লোভ, কঠোর সাজার হুমকি—কিছুতেই কোনো ফল হ'লো না। বারজাক মিশন যেন মিথ্যেই একটা পাথরের দেয়ালের গায়ে মাথা ঠুকছে ! এদের বুঝিয়ে-শুঝিয়ে আর-কিছুতেই রাজি করানো যাবে না।

তখন খোঁজ-খোঁজ প'ড়ে গেলো, কোথায় মিলবে নতুন গাইড, নতুন সহিস, নতুন কুলিমজুর। সাহিস বা তল্পিবাহক পেতে কোনো অসুবিধেই হ'লো না, কিন্তু নতুন-কোনো স্থানীয় লোক—যে এদিককার পথঘাট চেনে এবং তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, এমন লোককে খুঁজে পেতে কয়েকটা দিন লেগে গেলো।

আর তৎক্ষণাৎ মোরিলিরের একটা হার্দ্য পরিবর্তন লক্ষ করা গেলো। এতদিন সে নির্বিকার ঔদাসীন্যের সঙ্গে এ-কান দিয়ে কিছু শুনেছে এবং ও-কান দিয়ে বার ক'রে দিয়েছে, এমনকী তার গোঁয়ার্তুমির মধ্যে একটা বিজাতীয় বিতৃষ্ণাই লক্ষ করা গেছে এতদিন; কিন্তু যেই নতুন-একজন পথপ্রদর্শক জুটে গেলো, অমনি তার মধ্যে মস্ত-একটা বদল লক্ষ করা গেলো। সে নিজেই গিয়ে বারজাকের কাছে দরবার করলে, নিজের গোঁয়ার্তুমির জন্যে কান-টান মুলে মাফ চাইলে, বললে সে নানারকম গুজব শুনে বেজায় ভয় পেয়ে গিয়েছিলো ব'লেই অমন নারাজ হয়েছিলো, তবে সে এখন দাহোমে অব্দি মিশনের সঙ্গে যেতে একপায়ে রাজি, আসলে সে ভুলেই গিয়েছিলো যে তাকে দাহোমে অব্দি যাবার জন্যেই বাহাল করা হয়েছিলো। আর তারই সঙ্গে-সঙ্গে পুরোনো সহিস আর কুলিদের মধ্য থেকেও সব -প্রতিরোধ উধাও, তারা একবাক্যে বললে তাদের গাইড তাদের যেখানে নিয়ে যাবে, তারা সেখানেই যেতে রাজি—তবে রাজি হবার শর্ত একটাই : মোরিলিরেকেই তাদের গাইড করতে হবে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই আকস্মিক ঐক্যমত্য দেখে এটাই বোঝা গেলো যে এই অপ্রত্যাশিত হরতালটার জন্যে মোরিলিরেই দায়ী ছিলো, সে-ই এদের পালের গোদা; গোড়ায় একঝলক তাই ভাবা হয়েছিলো তার প্রস্তাবে আর রাজি হওয়া ঠিক হবে না। তবে অভিজ্ঞ কোনো গাইডের সহায়তা সবসময়েই কাজে লাগে, তার ওপর সে তো মূলত এদিকটাতেই জন্মেছে, শেষে তার ঐ অবাধ্য আচরণটাকে আপাতত ভুলে-যাওয়াই ঠিক হবে ব'লে সাব্যস্ত হ'লো। ঠিক হ'লো, নতুন যে-গাইডকে নিয়োগ করা হয়েছে সে যাবে মঁসিয় বোদ্রিয়েরের দলটার সঙ্গে, আগেকার সহিস ও কুলিদেরও একটা দল যাবে সেইসঙ্গে—আর নতুনদের মধ্যে জনাকয়েক। মঁসিয় বারজাক সঙ্গে নেবেন মোরিলিরেকে, আর আগেকার সহিস ও তল্পিবাহকদের বড়োদলটাকে।

এত-সব তর্কাতর্কি, দ্বিধা, এত-সব অদলবদল—এতে বেশ-কিছুটা সময়ের অপচয় হ'লো। তাঁরা সদলবলে বারোই জানুয়ারি এসে সিকাসোয় পৌঁছেছিলেন, কিন্তু একুশে জানুয়ারির আগে বোদ্রিয়ের আর বারজাকের পক্ষে তাঁদের ভিন্ন-ভিন্ন পথে যাওয়া আদপেই সম্ভব হয়নি।

সেদিন, ঐ একুশে জানুয়ারি ভোরবেলায়, আবার সৈন্যদের একটা জমকালো কুচকাওয়াজ হ'লো, আবার হাওয়ায় পৎপৎ ক'রে উড়লো *তেরঙ্গা,* আবার বেজে উঠলো তূরী-ভেরী, আর বারজাক মিশন—তার পেছনে বোদ্রিয়ের মিশন—সৈন্যদের দুই সারের মাঝখান দিয়ে সারি বেঁধে রওনা হ'লো। গড় থেকে সৈন্যদল সঙ্গে গেলো তাদের, শহরের শেষ মাথা অব্দি—সেখান থেকেই তারা বিদায় নেবে।

*তাতার* ওপারে বিদায়সম্ভাষণের বহর আর বাহার চললো, কোলাকুলি ক'রে গড়ের অফিসাররা শুভেচ্ছা জানালে মিশনকে, আর কিঞ্চিৎ আবেগতাড়িত হ'য়েই বারজাক আর বোদ্রিয়ের, সব মতভেদ-সত্ত্বেও, পরস্পরের করমর্দন করলেন। অবশেষে সেনাবাহিনী ফিরে গেলো ব্যারাকে, দুটো কনভয়ই রওনা হ'য়ে পড়লো—দুটো দল এবার দু-দিকে যাবে। বোদ্রিয়ের তাঁর দলবল নিয়ে যাবেন দক্ষিণমুখো, বারজাকরা রওনা হ'য়ে পড়েছেন পুবদিকে যাবেন ব'লে।

এই দুই কনভয়, দুই সার লোক, সংখ্যায় প্রায়-সমান, অথচ এদের দুটির কপালে দু-রকম দশা জুটবে। বোদ্রিয়েরের দলটাকে আদপেই কোনো বিপদে পড়তে হবে না, কোনো মুশকিলও তাদের হবে না। বোদ্রিয়ের বরং তাঁর অভীষ্ট মিশন শেষ ক'রে সংসদে গিয়ে তাঁর নিজের প্রতিবেদন পেশ করবেন—যথাসময়েই। বারজাক ও তাঁর দলবল গিয়ে পড়বে এমন রগরগে, রুদ্ধশ্বাস, ও রোমাঞ্চকর অ্যাডভেনচারের মাঝখানে, এমনভাবে ঝাঁপ খাবে অদ্ভুত-কিম্ভূত যত বিপদ-আপদের মাঝখানে যে আগে থেকে ঘুণাক্ষরেও তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। কল্পনার অমন তুলকালাম দৌড়ই বোধহয় এর আগে আর দেখা যায়নি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজেই বোদ্রিয়েরের দলবলের পথে তুচ্ছ ও নগণ্য যে-সব ঘটনা ঘটবে, সেগুলোকে উপেক্ষা ক'রেই এই আখ্যায়িকা অতঃপর শুধু তাদেরই পেছন-পেছন যাবে, যারা গেছে পুবমুখো, যাদের পথপ্রদর্শক অভিজ্ঞ গাইড মোরিলিরে, যারা গিয়ে ঢুকবে আফ্রিকার *অন্ধকারতম নিবিড় অরণ্যে*।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আট

## মোরিলিরে

*[ আমেদে ফ্লরেঁসের নোটবই থেকে ]*

*২২শে জানুয়ারি*। দু-দিন হ'লো আমরা সিকাসো ছেড়ে এসেছি, আর এরই মধ্যে আমার মনে হ'তে শুরু করেছে কোথাও যেন একটা-কিছু গণ্ডগোল পাকিয়েছে। শুধু-একটা ভাবনার বীজই এটা, অস্বস্তিটা এখনও ঠিক দানা পাকিয়ে ওঠেনি, কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আমাদের সঙ্গেকার সহিস ও কুলিদের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে, তারা যেন একটু মনমরাই হ'য়ে আছে, সহিসদের মধ্যে এগুবার যেন কোনো তাড়াই নেই, কুলিরাও চট ক'রেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছে, কেমন-একটা ঝিমিয়ে-পড়া ম্রিয়মাণ ভাব। হ'তে পারে সবটাই আমার কল্পনা, আর আমি হয়তো অচেতনভাবে কান্‌কানের সেই *কেনিয়ালালার* ভবিষ্যদ্বাণীতে নিজের অজান্তেই প্রভাবিত হ'য়ে পড়েছি। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম এই ভয়ানক ভবিষ্যদ্বাণীটা, কিন্তু এখন আমাদের সঙ্গে সেপাইশান্ত্রীর সংখ্যা একেবারে আদ্ধেক হ'য়ে গেছে ব'লেই বোধহয় সে-কথা আমার বারে-বারে মনে প'ড়ে যাচ্ছে।

খুব কি একটা শঙ্কা হচ্ছে? উদ্বেগ? না, তাও নয়! যদি অস্বস্তি একটু খিঁচ ধরিয়ে থাকে ভেতরে-ভেতরে, সে শুধু ঐ নচ্ছার *কেনিয়ালালার* দিব্যদৃষ্টির বালাইটাই। আচ্ছা, সত্যি-সত্যি কী চাই আমি? অ্যাডভেনচার, অ্যাডভেনচার, এবং আরো-দুর্ধর্ষ, দুর্দান্ত, রুদ্ধশ্বাস অ্যাডভেনচার, যা থেকে ভালো লেখা তৈরি করা যাবে, কারণ সেটাই আমার কাজ, জীবিকা। তবে অ্যাডভেনচার—সত্যিকার অ্যাডভেনচার—তার জন্যে সেই কবে থেকেই যে আমি হা ক'রে ব'সে আছি।

*২৩শে জানুয়ারি*। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আমরা যেন একদল কচ্ছপের কনভয় হ'য়ে পড়েছি। এটা ঠিক যে এখানকার জমির ধাতটা যে-রকম তাতে হুড়মুড় ক'রে এগুনো যায় না; একবার ওঠো ওপরে, তারপরেই আবার নিচে নেমে আসো। কিন্তু তবু আমাদের কুলি-সহিসদের অনিচ্ছাটা বড্ডই প্রকট হ'য়ে পড়েছে।

*৩১শে জানুয়ারি*। বেড়ে হয়েছে! বাহবা কি বাহবা! আমরা নিজেদের সব রেকর্ড ভেঙে ফেলেছি! আমরা ছ-ছটা দিন লাগিয়ে দিয়েছি কুললে তিরিশমাইল পথ পেরুতে —সবশুদ্ধু ষাটমাইল এগিয়েছি দশদিনে!—আর তার পর এখানে একটা খুদে গাঁয়ে এসে পৌঁছেছি, নাম কোকোরো! প্রায় যেন একটা শামুকের গর্ত!

তিনদিন আগে আমরা এনগাগা গ্রামটা ছাড়িয়ে রওনা হয়েছি—এ-রকম নাম



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোত্থেকে যে পায় এরা?—আবার উঠতে হয়েছে একটা খাড়াপাহাড়ে, তারপর আবার খাড়াঢাল বেয়ে নেমে আসতে হয়েছে উপত্যকায়—এই উপত্যকা ধ'রেই আমাদের চলতে হবে। উত্তরে, দক্ষিণে, পশ্চিমে—সবদিকেই খাড়াপাহাড়, যেন কোনো গোপন রহস্যের অটল পাহারায় অতন্দ্র জেগে আছে। কিন্তু পুবদিকে গেছে সমতলভূমি।

পোড়াকপাল আর কাকে বলে! কোকোরোতেও আমাদের বেশ-খানিকটা দেরি হ'য়ে গেলো। না, আমাদের কেউ কয়েদ ক'রে রাখেনি। বরং গাঁয়ের মোড়ল, জনৈক পিন্তিয়ে-বা, আমাদের খুব খাতিরযত্নই করেছে, প্রায় যেন কতকালের সুহৃদ।

কোকোরো থেকেই শুরু হয়েছে বোবোদের দেশ।

দৃশ্য : কোকোরো। কাল : গতকাল, ৩০শে জানুয়ারি। রাত্রি। যেই গ্রামটার কাছে গিয়ে পৌঁছেছি, আমাদের ঘিরে ধরেছে নিগ্রোদের একটা হট্টগোল-তোলা দল—মশালের আলোয় অন্তত আটশোজনকে গুনতে পেরেছি আমরা—আর তাদের দেখে এমনটা মনে হয়নি যে হারানো বন্ধুদের ফিরে পেয়ে তারা উল্লাসে ফেটে পড়ছে। এই-প্রথম কেউ এভাবে আপ্যায়ন করেছে আমাদের। কাজেই আঁৎকে, আমরা থেমেই পড়েছি—থেমে নয়, একটু পেছিয়েই এসেছি।

পেছিয়ে এসেছি, তবে কোনো বিভীষিকার ভয়ে নয়। এ-সব লস্কর যত পারে তাদের অস্ত্রশস্ত্র আস্ফালন করুক, আমরা জানি বন্দুকের একদফা গুলিতেই এদের সব ট্যাঁ-ফোঁ ঘুচে যাবে। কাপ্তেন মার্সেনে দৃঢ়গলায় কী যেন নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর সেপাইশান্ত্রী তাদের রাইফেলগুলো চেপে ধরে, তবে খাপগুলো থেকে খুলে আনে না। সত্যি-বলতে, কাপ্তেন একটু গড়িমসিই করছেন, একটু যেন ইতস্তত, প্রতিবেশীদের ওপর গুলিচালানো ভারি-সাংঘাতিক ব্যাপার, এমনকী সে-প্রতিবেশী যদি বোবোরাও হয়, তবু। অ্যাদ্দিন আমাদের গোলাবারুদ স্তব্ধই থেকেছে, টুঁ শব্দটি করেনি কোথাও—আমরা চাইনি যে রাইফেলগুলোই আমাদের হ'য়ে সব কথা ব'লে দিক।

এই যখন ন যজৌ ন তথৌ দশা, তখন সাঁৎ-বের্ত্রার ঘোড়া, এত-আওয়াজ শুনে ঘাবড়ে গিয়ে, চার ঠ্যাং তুলে কেমন-একটা লাফ দেয়। জিন থেকে ছিটকে বেরিয়ে, সাঁৎ-বের্ত্রা চমৎকার-একটা ডিগবাজি খেয়ে সোজা গিয়ে সামনের নিগ্রোদের মধ্যে চিৎপাত প'ড়ে যান, তারা তো খ্যাপার মতো গ'র্জে আমাদের গোবেচারা বন্ধুটির ওপর এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ে...

এমনসময় মাদমোয়াজেল মোর্নাস তাঁর ঘোড়ার পিঠে খোঁচা দিয়ে উসকে দিয়েছেন তাঁর ঘোড়াকে, সোজা চ'লে গেছেন নিগ্রোদের মধ্যে। তাতে তক্ষুনি নিগ্রোরা সাঁৎ-বের্ত্রার ওপর থেকে নজর সরায়। তারা এই সাহসিনীর দিকে এগিয়ে যায়, অন্তত কুড়িটা *আসাগে* তাঁকে তাগ ক'রে উঁচোনো।

'*মান্তো!*' হামলাবাজদের দিকে তাকিয়ে মাদমোয়াজেল মোর্নাস চেঁচিয়ে ওঠেন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'*এনতে আ বে সুবা!*' (চুপ করো! আমি এক ডাইনি, কুহকিনী!)

এই ব'লে জিনের পাশের থলে থেকে একটা ইলেকট্রিক টর্চ বার ক'রে নিয়ে তিনি জ্বালান আর নেভান, নেভান আর জ্বালান—শুধু এটাই চাক্ষুষ দেখিয়ে দিতে যে তিনি সত্যিই কোনো কুহকিনী, এবং আগুন আর বিজলি তাঁরই পেটোয়া অনুচর যেন!

দেখেই, হুলুস্থুলু-শোরগোল যেন মন্ত্রবলে থেমে যায়, তাঁকে ঘিরে চারপাশে গোল হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ে শ্রদ্ধায়-অভিভূত জনতা। আর তারই মাঝখানে এগিয়ে আসে পিন্তিয়ে-বা, যার কথা আমি আগেই বলেছি। বলা তো বাহুল্যই যে এমন অবস্থায় সে একটা ছোটোখাটো বক্তৃতাই দেবে। জগতের সব সরকারেরই এই-একটা দুর্বলতা। কিন্তু মাদমোয়াজেল মোরনাস তাঁকে তৎক্ষণাৎ চুপ করিয়ে দেন : '*মাস্তো!*' প্রথমে এগিয়ে যান সাঁৎ-বেরাঁকে তাদের কবল থেকে ছিনিয়ে আনতে—সে বেচারি অমনভাবে প'ড়ে গিয়ে সেই-যে চিৎপাত শুয়ে আছেন, তারপর থেকে নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু—হয়তো-বা চোটই লেগেছে কোথাও।

সেটা অবশ্য তক্ষুনি পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন ডাক্তার শাতোনে, সকলের ভ্যাবাচাকা দশার মাঝখানে নির্বিকার ভঙ্গিতে তিনি এগিয়ে গেছেন সেখানে, যেন ফ্রান্সেরই কোনো পাড়ায় রোজকার মতো রুগি দেখতে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, চোটই লেগেছে সাঁৎ-বেরাঁর। সারা গায়ে রক্ত। এমন বেকায়দায় একটা চোখা পাথরের ওপর পড়েছেন যে সেটা তাঁর তলপেটের তলায় অনেকটা ফুঁড়ে গিয়েছে।

তক্ষুনি আমি সচমকে আবিষ্কার করেছি যে এটা *কেনিয়ালালার* অন্তত একটা ভবিষ্যদ্বাণীকে ফলিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, সাঁৎ-বেরাঁর কপালে যা ছিলো, তা ফ'লে গেছে। সঙ্গে-সঙ্গে আমার সারা গায়ে শিহরন খেলে গিয়েছে। তাহ'লে আমার লেখাগুলোর যে কী দশা হয়েছে, তা খোদ *কেনিয়ালালাই* জানে!

ডাক্তার শাতোনে অবশ্য ক্ষতটা পরিষ্কার ক'রে সেখানটায় শেলাই ক'রে দিয়েছেন —আর চারপাশের কৌতূহলী ভিড় ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে দেখেছে এই আশ্চর্য শল্যচিকিৎসা।

এই শেলাইফোঁড়ের কাজ যখন চলেছে, তখন মাদমোয়াজেল মোরনাস কৃপা ক'রে পিন্তিয়ে-বাকে তার কথা বলবার অনুমতি দিয়েছেন। সে এগিয়ে এসে জানতে চেয়েছে, —বাম্বারায়, না কি অন্যকোনো ভাষায়?—কেন *তুবাব* (অর্থাৎ সাঁৎ-বেরাঁ) বন্দুক বাগিয়ে ধ'রে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। মাদমোয়াজেল মোরনাস তক্ষুনি তা অস্বীকার করেছেন। পিন্তিয়ে-বা নাছোড়ভাবে আঙুল তুলে দেখিয়েছেন, সাঁৎ-বেরাঁর কাঁধে ঐ যে খাপটা, বান্দোলিয়েরদের ধরনে ঝুলছে, ওটা তবে কী? মাদমোয়াজেল মোরনাস তাকে ফের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। বৃথা চেষ্টা। শেষে তাকে ভালো ক'রে মাথায় গজাল ঠুকে বোঝাবার জন্যেই টর্চের আলোয় খাপটা খোলা হয়েছে, আর অমনি বেরিয়ে পড়েছে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাঁৎ-বেরঁ্যার সেই বিখ্যাত ছিপগুলো।

দেখেই, পিন্তিয়ে-বার চোখ কপালে উঠে গেছে। তারপরেই ঈর্ষায় তার চোখদুটো জুলজুল ক'রে উঠেছে। আদুরের দুলালের মতো তার বায়না—ঐ ঝকমকে জিনিশটা তার চাই—হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই চাই তার। সাঁৎ-বেরঁ্যা, স্বভাবতই, অত-ব্যথার মধ্যেও, সঙ্গে-সঙ্গেই নাকচ ক'রে দিয়েছেন আব্দারটা। মাদ্‌মোয়াজেল মোরনাস নবপ্রতিষ্ঠিত শান্তিটাকে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে নিজে গিয়ে বারে-বারে অনুরোধ করেছেন সাঁৎ-বেরঁ্যাকে, কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাত করলে তো?

শেষকালে একেবারে খেপেই গিয়েছেন মাদ্‌মোয়াজেল মোরনাস। '*বোন-পো!*' তাঁর হাতের টর্চটা থেকে আলো প'ড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে তাঁর *বোন-পোর* (সত্যি কি বোনপো?)।

স্যাঁৎ-বেরঁ্যা অমনি বাধ্য ছেলেটির মতো পিন্তিয়ে-বাকে তাঁর সাধের বাক্সটা দিয়ে দিয়েছেন। আর পিন্তিয়ে-বার মনে হয়েছে এটা এই কুহকিনীর হাতের জাদুর বিজলি দণ্ডটারই প্রভাব—একেবারে হাতে-নাতেই প্রমাণ পাওয়া গেছে এর ক্ষমতা কী অসীম! হাতে এই দুর্লভ ধনটা পেয়ে সে তো খুশিতে ডগমগ—প্রায় খেপেই গিয়েছে যেন। নাচ জুড়ে দিয়েছে প্রচণ্ড, আর তার ইঙ্গিতে তার দলবলের হাতের অস্ত্রশস্ত্র নিমেষে উধাও হ'য়ে গেছে। তারপর সে নিজেই এগিয়ে এসেছে আমাদের দিকে।

বিগলিতবচনে সে আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে যথা-ইচ্ছা আমরা ঘুরে বেড়াতে পারি তার গাঁয়ে, আর ঘোষণা করেছে পরদিন আমাদের সম্মানে গাঁয়ে একটা মস্ত নাচের আসর বসবে। *বোবোদের* এইরকম সৌহার্দ্য দেখে কাপ্তেন মার্সেনের মনে হয়নি এদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করার মধ্যে কোনো অসুবিধে আছে। পরদিন, তাহ'লে, দুপুর গড়িয়ে যাবার পরই আমাদের নতুন সুহৃদদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আমরা গাঁয়ে যাবো, আর আমাদের সেপাইশান্ত্রী এবং কুলিসহিসরা *তাতা*-র বাইরেই এখানেই ছাউনি খাটিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।

কী বলবো, পাঠকপাঠিকাগণ!, কী দুর্ধর্ষই না নাচ হ'লো! ভিন্ন রুচির্হিলোকাঃ—অন্তত আমাকে কেউ জিগেস করলে তাকে বলবো যে আমি বাপু সাঁজেলিসই পছন্দ করি।

প্রথমেই আমরা চ'লে গিয়েছি সোজা রাজকুটিরে: গাঁয়ের ঠিক মাঝখানে কতগুলো কুঁড়েঘর নিয়েই এই রাজার বাড়ি। এ-সব কুঁড়েঘরের বাইরেটা লেপাপোঁছা মাটির দেয়ালে তৈরি, কিন্তু ভেতরটাই দেখবার মতো! ভেতরের অঙ্গনটা কাদামাটির একটা জমি ছাড়া আর-কিছু নয়, সেখানে থাকে গোরুভেড়া। তাকে ঘিরেই সব থাকার ঘর, নুয়ে-পড়া, সংকীর্ণ, ঘিঞ্জি, আর মণিকোঠার মতোই, কেননা তাদের মধ্যে যেতে গেলে সিঁড়ির পইঠা দিয়ে নিচে নেমে যেতে হয়। আর রাজপ্রাসাদের দশাই যদি এমন নিদারুণ হয় তবে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা থেকে খানিকটা আন্দাজ ক'রে নেয়া যায় বৈ-কি সাধারণ লোকে কেমন ক'রে থাকে। একরত্তি-সব কুঁড়েবাড়ি, ঘিঞ্জি, ভেতরে কখনও আলো-হাওয়া ঢোকে কি না সন্দেহ।

এই রাজবাড়িতেই আমাদের পোশাকি আপ্যায়নের আয়োজন হয়েছে। আপ্যায়নের এক-অর্থ এটাই যে আমাদের তরফ থেকে পিন্তিয়ে-বা কে দেয়া হয়েছে উপঢৌকন —অর্থাৎ তুচ্ছ-সব জিনিশ, থানকাপড় থেকে তালাচাবি, পুরোনো গাদাপিস্তল থেকে ছুঁচসুতো। এই উপহার পেয়ে তার নিশ্চয়ই চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিলো, কেননা তক্ষুনি সে নাচ শুরু ক'রে দেবার ইঙ্গিত করেছে।

প্রথমে এসেছে গানের দল, কেউ-কেউ এসে *বোদোতো* বাজাতে-বাজাতে অর্থাৎ বুনোহরিণের শিঙের তৈরি শিঙা, অন্যরা বাজিয়েছে *বুরোন*, হাতির দাঁতে তৈরি অন্যরকম শিঙা, অন্যরা বাজিয়েছে *তাবালা* অর্থাৎ ঢাক। দুজন লোক দু-দিক থেকে ধ'রে থাকে *তাবালাকে*, তৃতীয়-একজন গায়ের জোরে একটা লাঠি দিয়ে তাকে পেটায়—লাঠিটাকে বলে *তাবালা-কালামা*। সম্ভবত *কালামা* কথাটার মানে হচ্ছে কলম, যার আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় *যে-কলম দিয়ে কেউ ঢাকের ওপর কিছু লেখে*।

এই নানা বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনেই *বোবো*-রা এসে জড়ো হয় হাটের মাঝখানে, আর মজলিশ শুরু হ'য়ে যায়।

*পাঞ্চ আর জুডিরই* কোনো সুদানি সংস্করণ হবে, বা তারই কাছাকাছি-কিছু, এমনি-এক *পাঞ্চ* এসে হাজির হয়, যার নাম *মোকো মিসাই ফু*, আর উদ্ভট মুখভঙ্গি ক'রে সারা শরীরের নানান কসরৎ দেখিয়ে বিদঘুটে-সব অঙ্গভঙ্গি ক'রে নাচ জুড়ে দেয়। তার পরনে লাল-একটা আলখাল্লা, মাথায় টুপি—তাতে গোরুর ল্যাজের ঝুঁটি, আর ঐ টুপি থেকে ঝোলে কাপড়—পর্দার মতো মুখটা ঢেকে রাখে। বান্দোলিয়েরদের কায়দায় তার পিঠে থাকে একটা ঝোলা, সেখানে লোহার টুকরো ঝমঝম করে পরস্পরের গায়ে ঠোকাঠুকি খেয়ে, আর কব্জিতে আর গোড়ালিতে ঘুঙুরের মতো ঘুন্টি বাঁধা, হাত-পা নেড়ে নাচলেই সেগুলো ঝুমঝুম ক'রে বাজে। তার ঐ টুপি লাগানো গোরুর ল্যাজের চুল বুলিয়ে সে দর্শকদের মুখে শুড়শুড়িও দেয় মাঝে-মাঝে। পিন্তিয়ে-বা এবং তার সভাসদদের বিস্তর আমোদ জুগিয়ে সে যখন তার কসরৎ—নাচ বলবো? না, কসরৎই ভালো—শেষ করলে, তখন পিন্তিয়ে-বার ইঙ্গিতে তার পারিষদরা এমন অট্টরোল ক'রে উঠলো যে মনে হ'লো জঙ্গলে কোথাও হিংস্রজন্তুর গর্জন উঠেছে—কিন্তু সেটাই সম্ভবত সমবেত সকলের হর্ষধ্বনি ও শাবাশি!

সব আওয়াজ একটু থেমে যেতেই, পিন্তিয়ে-বা একটা ছাতা আনতে পাঠায়—এই আতপত্রের গায়ে নানান কড়ি আর কবচতাবিজ বসানো—তার যে হঠাৎ খুব-দরকার পড়েছে তা নয়, তবে রাজার মাথায় রাজছত্র না-থাকলে তার ক্ষমতা প্রকাশ পাবে কী ক'রে?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং অতঃপর শুরু হয় আসল নাচ। নারীপুরুষ ছেলেমেয়ে একটা বৃত্ত রচনা ক'রে দাঁড়ায়, ডাইনি-পুরুৎরা দমাদ্দম ঢাকঢোল পেটায়, দুই নর্তকী ছুটে আসে মাঝখানে—দু-দিক থেকে। তিনবার চক্রাকারে পাক খেয়েই তারা ছুটে যায় এ ওর দিকে, মুখোমুখি নয়, পিঠোপিঠি, আর দুজনের পিঠ দুজনকে ছুঁলেই নিতম্ব দিয়ে পরস্পরকে ঘা মারে। এই দুজনকে অনুসরণ ক'রেই আসে আরো-দুজন, আর অবশেষে দর্শকরা, সবাই চেঁচিয়ে-মেচিয়ে একাকার এখন, যোগদান করে কোনো চতুরঙ্গি নাচের কায়দায়। এমন-ক্ষিপ্র, দুরন্ত ঘূর্ণি সে-নাচের যে তার কোনো তুলনাই ইওরোপের কোনো নাচে পাওয়া যাবে না।

নাচ অবশেষে শেষ হয় এক শোভাযাত্রায়। *বোবো*-রা এক-এক ক'রে সার বেঁধে পিন্তিয়ে-বা-র সামনে দিয়ে চ'লে যায়, *তাবালার* কানে-তালা-ধরানো আওয়াজের তালে-তালে তারা সবাই মিলে সমস্বরে একটা গান গাইছে, সেই সঙ্গে মাঝে-মাঝেই পোঁ ধরছে তূরীভেরী, বাঁশের বাঁশি আর ঐ দু-ধরনের শিঙাগুলো—*বোদোতো* আর *বুরোন*।

তারপরেই আসে সান্ধ্যভোজের পালা, এবং রক্তারক্তি কাণ্ড।

গোটা-বারো ভেড়া নিয়ে আসে তারা, কুঁড়েঘরের মধ্যেই তাদের কোতল করা হয়েছে। দড়ি দিয়ে এ-গাছ থেকে ও-গাছে বেঁধে, তাতে সেগুলো ঝুলিয়ে দেয়া হয়। একটা চৌকো বর্গক্ষেত্রই তৈরি হ'য়ে যায় দড়ি থেকে ঝোলানো ভেড়াগুলোয়। আর সেই চৌকো জায়গায় মেয়েরা জড়ো করে শুকনো কাঠকুটো। ছুরি দিয়ে পুরুষরা মাংসের খণ্ড কাটে, ফালা-ফালা ক'রে, আর সেই ফালিগুলো মেয়েরা সুতো থেকে ঝুলিয়ে দেয়, আর এদিকে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় কাঠকুটোয়। যখন তাদের মনে হয় ঠিকমতো ঝলসানো হ'য়ে গেছে, পিন্তিয়ে-বা একটা সংকেত করে, আর সবাই ছুটে এসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে ঝলসানো মাংসের ওপর, আর ভোজ শুরু হ'য়ে যায়।

আমরা একটু পরেই ফিরে যাই আমাদের শিবিরে। গাঁয়ের মধ্যে ভোজ চলে অনেক রাত অব্দি।

*২রা ফেব্রুয়ারি*। আমরা এখনও কোকোরোতেই আছি, সাঁৎ-বের্ন্যার জখমটা আমাদের দেরি করিয়ে দিচ্ছে—কেননা মামাভাগ্নে (তা-ই বলবো তাঁকে এবার থেকে) কিছুতেই আর ঘোড়ায় বসতে পারছেন না।

*৩রা ফেব্রুয়ারি*। এখনও কোকোরোতেই। অর্থাৎ, কী আনন্দ!

*৪ঠা ফেব্রুয়ারি, সকাল ছটা*। অবশেষে আমরা রওনা হ'য়ে পড়েছি।

*ঐ দিনই, সন্ধেবেলা*। রওনা হয়েছিলুম নামেই। আমরা এখনও কোকোরোতেই আছি।

আজ সকালে, দিন যখন ফুটি-ফুটি, আমরা আমাদের বন্ধু *বোবোদের* বিদায় জানিয়েছি। (বন্ধু মেলে সবখানেই, শুধু তাদের খুঁজে বার করতে হয়।) সারা গাঁ এসে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়িয়েছে শিবিরের কাছে। পিন্তিয়ে-বা ছিলো তাদের প্রথমে, আর শুভেচ্ছা বর্ষেছে অজস্র। '*নি'য়াল্লা* (ঈশ্বর) যেন আপনাদের শরীরস্বাস্থ্য ভালো রাখেন।' '*নি'য়াল্লা* যেন আপনাদের রাস্তা নির্বিঘ্ন করেন।' 'নি'য়াল্লা যেন আপনাদের ভালো ঘোড়া দেন!' আর এই শেষ-শুভেচ্ছাবাণী শুনে সাঁৎ-বেরাঁ বিকটভাবে মুখবিকৃতি করেছেন—তাঁর জখমটা এখনও তাঁকে বেশ জ্বালাচ্ছে।

আমরা শুভেচ্ছার মধ্য থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছি নিজেদের, এবং সারিটা রওনা হ'য়ে পড়েছে।

রওনা হ'য়ে পড়েছে, কিন্তু চলেনি। কোকোরোর আগে যা হয়েছে এ তার চেয়েও শোচনীয় দশা। অনিচ্ছাটা জাজ্বল্যমানভাবে প্রকট। প্রতিমুহূর্তেই কেউ-না-কেউ থেমে পড়ছে, হয় কোনো কুলি, নয়তো কোনো সহিস, আর আমাদের তার জন্যে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। একটা গাধার পিঠ থেকে বোঁচকাগুলো খুলে প'ড়ে গিয়েছে, আবার সেটা তুলে ভালো ক'রে বেঁধেছেঁদে দিতে হয়েছে। বেলা দশটার সময়, আমরা যখন থেমেছি, আমরা বোধকরি চারমাইলও যেতে পারিনি।

কাপ্তেন মার্সেনের ধৈর্য দেখে মোহিত হ'য়ে যেতে হয়। ঠাণ্ডামাথা একবারও, একতিলের জন্যেও, তিনি গরম করেননি। কিছুই তাঁকে টলাতে পারে না, কিছুই তাঁকে ক্লান্ত ক'রে দিতে পারে না। এত-সব *বেশ-প্রকাশ্য* বাধার মধ্যেই তিনি একধরনের শান্তশীতল শক্তির বলেই যেন যুঝে চলেছেন।

কিন্তু যখন আমরা সন্ধেবেলায় আবার বেরিয়ে পড়তে গেছি, তখন সব কেমন উলটেপালটে গেছে। মোরিলিরে ব'লে বসেছে সে নাকি পথভুল ক'রে বসেছে। মাদমোয়াজেল মোরনাস যে-দুজন গাইডকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, আমরা তাদের কাছে জিগেস করেছি, সত্যি আমরা পথ হারিয়েছি কি না। ৎশুমুকি মোরিলিরের মতেই সায় দিয়েছে, কিন্তু তোঙ্গানে বলেছে আমরা ঠিকপথেই চলেছি। বেড়ে অবস্থা। এখন কাকে ছেড়ে আমরা কাকে বিশ্বাস করি?

অনেকক্ষণ ইতস্তত ক'রে আমরা দলে-ভারিদেরই মতটা মেনে নিই, এবং ফের যে-পথ দিয়ে এসেছি, সেই পথেই ফিরে যাই। তখন কিন্তু তাক লেগে গেছে—কত-দ্রুত আমরা যেতে পারি, তার নমুনা দেখে। কালোরা কেউ একফোঁটা শ্রান্তি বোধ করছে না, গাধাদের পিঠেও বোঝাগুলো আঁটো ক'রে বাঁধা রয়েছে। সকালবেলায় যে-পথটা আমরা চারঘণ্টায় পেরিয়েছি, সেটাই এবার আমরা অতিক্রম ক'রে এসেছি মাত্র এক-ঘণ্টায়—আর রাত নামবার আগেই আমরা আবার ফিরে গিয়েছি, যেখান থেকে আমরা শিবির তুলেছিলুম, সেখানেই। আবারও কোকোরোরই কাছে আমরা।

৬ই *ফেব্রুয়ারি*। কাল, ৫ই ফেব্রুয়ারি, আবার আমরা বিশেষ-মুশকিলে না-প'ড়েই রওনা হ'য়ে পড়েছিলুম। যেটা ছিলো আশ্চর্য, সেটা এই : কাল যেটাকে আমরা ভুল-



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথ ব'লে ফিরে এসেছিলুম, সেই পথেই আবার আমরা রওনা হয়েছি। মোরিলিরে এখন কিরে কেটে বলেছে, ঈশ্বরের দোহাই, সত্যি, ভালো ক'রে ভেবেচিন্তে দেখে তার নাকি মনে হয়েছে আসলে আগের দিন সন্ধেবেলাতেই সে ভুল করেছিলো। এবারও ৎশুমুকি তারই কথা দোয়ারকি ধ'রে মাথা হেলায়। আমার ক্রমশই বদ্ধমূল হচ্ছে সন্দেহটা : এই দুই নচ্ছার আসলে পদে-পদে আমাদের পথে বাধার সৃষ্টি করতে চাচ্ছে।

কাল বিশেষ-কিছুই ঘটেনি, শুধু এদের মন্দবুদ্ধির সঙ্গে আমাদের কেবলই পরিচয়টা ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে; কিন্তু আজ, দুটো ভারি-গোলমেলে ব্যাপার ঘ'টে গিয়েছে।

সকালবেলায় যাত্রার সময় একটা গাধা হঠাৎ টাল সামলাতে না-পেরে দুম ক'রে প'ড়ে যায়। তুলতে গিয়ে দেখা গেছে সে ম'রে গিয়েছে। হ্যাঁ, তার মৃত্যুটা স্বাভাবিকও হ'তে পারে, সেটা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমার ঘোরতর সন্দেহ হয় যে এর পেছনে, *দুং-কোনো* অথবা ঐ জাতীয় কোনো ভয়াবহ গরলের কারসাজি আছে। কেউ একটাও কথা বলেনি। আমরা শুধু মরা জন্তুটার পিঠের বোঝা অন্য গাধাগুলোর পিঠে ভাগাভাগি ক'রে দিয়ে এগিয়ে গিয়েছি।

যখন বিকেলবেলায় আবার চলতে শুরু করেছি, তখনই দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটেছে। হঠাৎ খেয়াল ক'রে দেখি কুলিদের একজনকে কোথাও খুঁজে-পাওয়া যাচ্ছে না। তার আবার কী হ'লো? এ-যে দেখি এক দুর্বোধ প্রহেলিকা! মার্সেনে তাঁর গোঁফের ডগা চিবিয়েছেন শুধু, দেখে বুঝতে পারছি বিষম ভাবনায় পড়েছেন কাপ্তেন। নিগ্রোরা সবাই যদি আমাদের ছেড়ে মাঝরাস্তায় পালিয়ে যায়, তাহ'লেই আমরা গেছি! একজন পালালেই অন্যদের মধ্যে পালাবার হিড়িক প'ড়ে যায়: এর মতো ছোঁয়াচে রোগ আরকিছু নেই। আরো লক্ষ ক'রে দেখি সেপাইশান্ত্রীরা যেন আরো-একটু বেশি সজাগ, একটু-বেশি সতর্ক হ'য়ে উঠেছে। আমাদের এখন এমনভাবে এগুতে হবে যেন প্যারেড ক'রে যাচ্ছি। দু-পাশের ঘোড়সোয়াররা একটুও এদিক-ওদিক হ'তে দেবে না—সারি ভাঙতে দেবে না কিছুতেই। এই কড়া পলটনি শৃঙ্খলা আমার মোটেই পছন্দ হয়নি, তবু এক্ষেত্রে আমি তাতেই সায় দিয়ে গেছি।

যখন আমরা রাত্তিরের মতো থেমেছি, তখন দেখি আমাদের জন্যে আরেকটা চমক অপেক্ষা ক'রে আছে। বেশ ক-জন কুলি বেহেড মাতাল হ'য়ে আছে। কিন্তু মদ এরা পেলে কোত্থেকে? কে তাদের এই চোলাই এনে দিয়েছে?

কাপ্তেন শিবিরটার ওপর হুঁশিয়ার একটা কড়াপাহার বসাবার বন্দোবস্ত ক'রে মঁসিয় বারজাকের খোঁজে এসে দ্যাখেন আমিও মঁসিয় বারজাকের সঙ্গে আছি। কাপ্তেন যা বলেছেন তার সারমর্ম এই : সিকাসো ছাড়ার পর থেকেই অবস্থা ক্রমশ সঙিন হ'য়ে উঠছে। ডাক্তার শাতোনে, মঁসিয় পঁসাঁ, মাদমোয়াজেল মোরনাস এবং সবশেষে সাঁৎ-বের্ঁা, একে-একে এসে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন, যাতে সবাই মিলে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রণকৌশল স্থির করতে পারি—কারণ হাল যে দাঁড়িয়েছে তাতে এটাকে এখন একটা যুদ্ধ ব'লেই মনে হচ্ছে।

কয়েকটি কথাতেই কাপ্তেন আমাদের তথ্যগুলো সাজিয়ে দিয়েছেন, আর সমস্ত গণ্ডগোলের দায়ই চাপিয়েছেন মোরিলিরের ঘাড়ে, সে-ই যত নষ্টের গোড়া, পাজির পাঝাড়া। তাঁর ইচ্ছে : এই ধড়িবাজ গাইডটিকে ডেকে নিয়ে এসে কড়াধমক দিয়ে সবকিছু জিগেস করা, দরকার হ'লে এমনকী বলপ্রয়োগও করা যেতে পারে—তাতে যদি আচ্ছা ক'রে তাকে কড়কে দেয়া যায়! প্রত্যেক নিগ্রোর পাশে-পাশে একজন ক'রে সশস্ত্র সেপাই থাকবে, যে তাকে ঠিকমতো চলতে বাধ্য করবে, দরকার হ'লে কঠোরসাজা দেবে।

মঁসিয় বারজাক মতটায় ঠিক সায় দিতে পারছিলেন না, সাঁৎ-বের‍্যাঁও তথৈবচ। মোরিলিরেকে ডেকে জেরা করতে গেলে, জোরজবরদস্তি করতে গেলে, তাকেই সাবধান ক'রে দেয়া হবে, বুঝিয়ে দেয়া হবে যে তার সব চাল আর চালাকি আমরা ধ'রে ফেলেছি। তার বিরুদ্ধে নিছক-সন্দেহ ছাড়া কোনো প্রমাণই আমাদের হাতে নেই—তাছাড়া কেনই-বা সে অমন ক'রে হঠাৎ আমাদের সঙ্গে বেইমানি করতে যাবে? মোরিলিরে ঘাড় নেড়ে সমস্ত অস্বীকার করবে, আর অমনি আমাদেরও তার কথা মেনে নিতে হবে।

আর ঐ কুলিদের? সহিসদের? তাদের আমরা বাধ্য করবো কী ক'রে? তারা যদি সবাই মাটিতে শুয়ে পড়ে, বলে আর-এক পাও যাবে না, তবে আমরা তাদের কী করতে পারি? তাদের গুলি ক'রে মেরে ফেললে কি আমাদের মাল বওয়ার দরকারটার কোনো সুরাহা হবে?

আমরা সবদিক দেখেশুনে স্থির ক'রে নিই আপাতত চুপ ক'রে থাকাই বরং ভালো। আরো কড়াপাহারা না-হয় করা গেলো, ধৈর্য ধ'রে না-হয় দেখাই গেলো কোথাকার জল কোথায় গড়ায়; তবে মোরিলিরেকে ককখনো চোখের আড়াল হ'তে দেয়া চলবে না—তাকে সবসময়েই চোখে-চোখে রাখতে হবে। বইটি আমারবই.কম এর জন্য নির্মিত।

এ-তো খুবই বাহারে ব্যবস্থা, কিন্তু তবু আমার মাথায় একটা ভাবনা খেলে গেলো। একগুঁয়ের মতো এই অভিযানটা চালিয়ে যাবারই বা সার্থকতা কী? মিশনের উদ্দেশ্য ছিলো নাইজার নদীর বাঁকে নিগ্রোদের মনোভাব কী, তা সরেজমিন তদন্ত ক'রে দেখা। তা, আমরা তো অ্যাদ্দিনে তাদের হাড়ে-হাড়েই চিনে গিয়েছি, মনের ভাব কী, তা বুঝতে তো আর-কোনো অসুবিধেই নেই। উপকূল থেকে কানকান অব্দি, এমনকী তিওল বা সিকাসো অব্দিও, যত জাতি-উপজাতি আছে, তাদের নিজস্ব অনেক রীতিনীতি এমন আছে যেটা আমাদের চাইতে সম্পূর্ণ পৃথক, তবু তাদের হাতে যদি কোনো রাজনৈতিক অধিকার দেবার প্রস্তাব আসে, তবে আমি সেটা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করবো—কিন্তু সিকাসো পেরিয়ে? তার পরের অঞ্চলে? এদের হাতে ভোটের অধিকার তুলে দেবার কোনো মানেই আমি খুঁজে পাই না। আর তা যদি হয়, তবে অভিযান চালিয়ে যাবার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে এই জেদ কেন? নিছকই একটা গোঁয়ার্তুমি বৈ আর-কিছু নয়। যতই আমরা উপকূল থেকে দূরে স'রে যাবো, জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে ঢুকবো, ততই কি আবিষ্কার করবো না যে ইওরোপীয় গণতন্ত্রের কোনো ধারণাই এদের মধ্যে নেই? এই কথাগুলো আমার কাছে অতীব-স্পষ্ট : এটাই অবাক কাণ্ড যে অভিযানের আর-কারু কাছে এর সত্যতা এখনও স্বীকৃত হয়নি! হয়তো তাঁদেরও এ-সব কথাই মনে হয়েছে, তবে অন্য-কতগুলো কারণ নিশ্চয় আছে, সেজন্যে তাঁরা এভাবে চোখ মুদে আছেন।

*প্রিমো* : কাপ্তেন মার্সেনে। তাঁর কাছে তো এ নিয়ে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর কাজ তো তর্ক করা নয়, আদেশ পালন করা। আর হুকুম যদি না-ও থাকতো, তবু তিনি কাজটায় ইস্তফা দিতেন কি না সন্দেহ। মাদ্‌মোয়াজেল মোর্‌নাস যতক্ষণ তাঁর প্রমোদভ্রমণ চালিয়ে যাবেন, তিনিও ততক্ষণই সঙ্গে-সঙ্গে থাকবেন। যতই দিন গেছে এ-ব্যাপারটা আর বুঝতে কারুই বাকি থাকেনি যে এঁরা দুজন পরস্পরের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন। ভাবগতিক দেখে মঁসিয় বারজাক এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নিজেকেই গুটিয়ে নিয়েছেন। অতএব সেদিক থেকে কাপ্তেন মার্সেনের আর-কোনো ভাবনাই নেই। তো, মার্সেনে না-হয় থাকুন-গে মাদ্‌মোয়াজেল মোর্‌নাসের সঙ্গে-সঙ্গেই। কিন্তু অন্যরা?

*সেকুন্দো* : মঁসিয় পঁসাঁ। তিনিও অধীনস্থ কর্মচারী, অতএব তাঁরও কাজ যা-ফরমাশ আসবে তা-ই পালন করা। নিজে মনে-মনে কী ভাবছেন, সেটা অবশ্য কখনও জানা যায়নি। সকাল থেকে রাত অব্দি সবসময়েই তিনি সবকিছু টুকে-টুকে রাখছেন, কিন্তু মানুষটা তিনি এতই চুপচাপ দারুণভাবে না-খোঁচালে কিছু বলবেন ব'লে মনে হয় না। বাজি ধ'রে বলতে পারি এ-যাবৎ পুরো অভিযানে তিনি গুনে-গুনে দশটা কথাও বলেননি। কথা বলা তাঁর কাছে যেন আদিপাপেরই মতন। অতএব তাঁর কথাও না-হয় শিকেয় তোলা থাক।

*তের্‌তিয়ো* : সাঁৎ-বের্‌ঁ্যা। এঁর ব্যাপারটাই আলাদা। সাঁৎ-বের্‌ঁ্যা শুধু তাঁর মাসি-ভাগ্নির চোখ দিয়েই সবকিছু দ্যাখেন। গোটা জীবনটাই তিনি তাঁকে উৎসর্গ ক'রে দিয়ে ব'সে আছেন। আর মানুষটা এমনই ভুলোমন যে তিনি হয়তো ভুলেই ব'সে আছেন যে তিনি এখন আফ্রিকায় আছেন। তো তৃতীয়জনের পাশ কাটিয়েও না-হয় এগিয়ে-যাওয়া যাক।

*কুয়ার্তো* : মাদমোয়াজেল মোর্‌নাস। আমরা তো জানি তিনি কেন এই প্রমোদভ্রমণে বেরিয়েছেন। তিনি নিজের মুখেই আমাদের ব'লে দিয়েছেন : তাঁর ইচ্ছে হয়েছে, তা-ই। সেই সাধ হওয়াটাই শেষ কথা। তবে ভেতরে আরো-কোনো নিগূঢ় কারণ আছে কি না কে জানে!

*কিন্‌তো* : আমি। এই পাঁচনম্বরই শুধু এমন-একজন যার ব্যাপারটায় পুরোপুরি কাণ্ডজ্ঞানের ছাপ আছে। আমার অস্তিত্বের মূল কথাটা কী? খবরকাগজে লেখা। কাজেই যত-মুশকিল, তত-লেখা। যত-ঝক্কি যত-ঝামেলা, লেখারও বাহার তত। কাজেই আমি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখছি না—সেটা বলাই বাহুল্য। না, কোনো খোয়াবই আমি দেখছি না।

অতএব, হাতে রইলেন মঁসিয় বারজাক। তাঁর তো মাথাটা কারু কাছে বিকিয়ে নেই, তিনি কারু খানও না পরেন না, কারু অধীনে চাকরি করেন না, কারু প্রেমে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন না। তিনি ভালো ক'রেই জানেন যে এখন আমরা *ছায়াচ্ছন্ন* আফ্রিকাতেই আছি। মানুষটা এমনিতে গুরুগম্ভীর—কোনো ঝোঁকের মাথায় বা খামখেয়ালের বশে কিছু করবেন ব'লে মনে হয় না—আর তাঁকে কোনো খবরকাগজেও নিয়মিত লেখা পাঠাতে হয় না। *তাহ'লে ?...*

এই হিংটিংছট প্রশ্নটা আমার মাথার মধ্যে এমনভাবে কামড়াচ্ছে যে আমি তাঁর কাছে সরাসরি জিগেস ক'রে ফেলবো ব'লেই ভেবেছি।

মঁসিয় বারজাক একবার আমার আপাদমস্তক ভালো ক'রে খুঁটিয়ে দ্যাখেন, তারপর মাথাটা নাড়েন, হ্যাঁ-এর ভঙ্গিতে, তারপর এমন-একটা ভঙ্গি করেন, যার কোনোই অর্থ হয় না। অথচ তাঁকে অনেক কচলে শুধু ঐ ভঙ্গিমাটাই আদায় করতে পেরেছি আমি —ঐ কাঁধঝাঁকানিটা। দেখেই বোঝা যায় সাংবাদিকদের কাছে সাক্ষাৎকার দিতে তিনি অভ্যস্ত।

৭ই *ফেব্রুয়ারি*। ঘটনা অনবরত ঘ'টেই চলেছে। রাতও অনেক ঝামেলা পাকিয়েছে। ফলাফল : আমরা সময়মতো বেরুতে পারিনি এবং আজকে আমরা শুধু একবেলাই যাবো—সন্ধের সময়।

কালপঞ্জি অনুযায়ীই বরং ঘটনাগুলো সাজিয়ে নেয়া যাক। তা থেকে এই উপসংহারে পৌঁছুনো যেতে পারে যে বিশৃঙ্খলাও কখনও-কখনও কাজে লেগে যেতে পারে।

কাল আমরা ঠিক করেছিলুম যে মোরিলিরেকে কিচ্ছুই বলা হবে না, শুধু তার ওপর নজর রেখে যাওয়া হবে। সেইজন্যেই, তাকে চোখে-চোখে রাখবার জন্যে আমরা পালা ক'রেই নজর রাখবার ব্যবস্থা করেছি—অন্যদের কাউকে জানতেও দিইনি যে ভেতরে-ভেতরে আমরা এই-ব্যবস্থাই করেছি। মাদ্‌মোয়াজেল মোরনাসকে নিয়ে আমরা সবশুদ্ধু ছ-জন আছি, আর তিনি যেহেতু সবসময়েই নিজেকে *পুরুষের সমান* ব'লেই ভাবেন, এই-নজর রাখার কাজটা খুব-একটা কঠিন হবে না।

ক্রম একটা ঠিক ক'রে নিয়েছি আমরা, রাতটাকে—নটা থেকে ভোর পাঁচটা অব্দি—ভাগ ক'রে নিয়েছি মোটামুটি সমান-সমান ছটা ভাগে, তারপর লটারি ক'রে ঠিক করা হয়েছে কখন কার নজর রাখার পালা। টুপি থেকে আমাদের নামগুলো বেরিয়েছে এই ক্রম ধ'রে : মাদ্‌মোয়াজেল মোরনাস, মঁসিয় বারজাক, কাপ্তেন মার্সেনে, আমি—ফ্লরেঁস, সাঁৎ-বের্ন্যা ও মঁসিয় পঁসা। এইভাবেই ভাগ্য পুরোক্রমটা স্থির ক'রে দিয়েছে।

রাত একটায় আমার পালা এসেছে, আমি গিয়ে কাপ্তেন মার্সেনেকে ছুটি দিয়েছি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কানে-কানে তিনি জানিয়েছেন, এখনও-অব্দি সবকিছু ঠিকঠাক আছে, আঙুল তুলে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন মোরিলিরেকে, একটা শাদা চাদর মুড়ি দিয়ে সে ঘুমিয়ে আছে—আমাদের কাছেই। পূর্ণিমাচাঁদ আমাকে দেখতে দিয়েছে তার মুখটা, শাদা চাদরটা কালো রং-এর পাশে একটা প্রতিতুলনার ভাব সৃষ্টি করেছে।

আমার পাহারার সময় অস্বাভাবিক কোনোকিছুই ঘটেনি, শুধু দেড়টা নাগাদ আমার মনে হয়েছে আমি যেন সেই হাজারটা বোলতার গুনগুন শুনতে পেয়েছি হঠাৎ, যে-আওয়াজটা কানকানে আমাদের অমন হকচকিয়ে দিয়েছিলো। এই আওয়াজটা সম্ভবত পুবদিক থেকে আসছে, তবে এত-সুদূর, এত-ক্ষীণ, এত-মৃদু, যে শেষপর্যন্ত আমিই মনস্থির করতে পারিনি আওয়াজটা সত্যি-সত্যিই শুনতে পেয়েছি কি না।

পৌনে-দুটোর সময় সাঁৎ-বের্ত্রা হাতে দায়িত্বটা বুঝিয়ে দিয়ে আমি তাঁবুতে গিয়ে ঢুকেছি কিন্তু ঘুম আর আসে না। সবকিছু কেমন অস্বস্তিকর—এ-অবস্থায় একবার ঘুম চ'টে গেলে সহজে আর আসেই না। আধঘণ্টা ধ'রে ধস্তাধস্তি ক'রে আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি। বিছানা থেকে নেমে প'ড়ে ঠিক করেছি বাকিরাতটা বাইরের খোলা হাওয়ায় কাটিয়ে দেবো।

সেই মুহূর্তেই আবার আমি শুনতে পেয়েছি—এত-ক্ষীণ, এত-মৃদু যে মনে হচ্ছিলো আবার বুঝি এক শ্রবণবিভ্রম—সেই গুমগুমে গুঞ্জন। কিন্তু এবার আমি ব্যাপারটার একটা কিনারা করতে চাই। আমি ছুটে বেরিয়ে এসে উৎকর্ণ হ'য়ে শোনবার চেষ্টা করেছি।

কিছুই-না, কিংবা যা ছিলো, তা খুবই ক্ষীণ। যেন নিশ্বাস পড়েছে কারু, তারপর মিলিয়ে গেছে। মিলিয়ে গেছে পুবদিকেই। না, এই অনিশ্চয়ের মধ্যেই সারাটা সময় আমাকে কাটাতে হবে দেখছি।

তখন ঠিক করেছি, যাই, গিয়ে দেখি সাঁৎ-বের্ত্রা কী করছেন।

বিস্ময় !— ( কিন্তু সত্যিই কি বিস্ময়ের চমক ছিলো আদৌ ? ) সাঁৎ-বের্ত্রা তাঁর নজরদারির জায়গাটায় নেই। বাজি ধ'রে বলতে পারি এই দুর্মরভাবে-আশাহীন বাউণ্ডুলে মানুষটা নিজের দায়িত্বের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে আর-কিছু নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। যদি-না এই-ফাঁকে মোরিলিরে কোথাও সটকে প'ড়ে থাকে ! আমি নিশ্চিত হ'য়ে যাবার জন্যে কাছে এগিয়ে যাই। উঁহু, মোরিলিরে তো সটকে পড়েনি, অমনিভবেই সে শুয়ে-শুয়ে দিব্বি ঘুম লাগাচ্ছে, মাটিতে শুয়ে আছে সটান। শাদা চাদরের ফাঁকে তার কালো মুখটা—ঐ-তো, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।

আশ্বস্ত হ'য়ে, আমি সাঁৎ-বের্ত্রার, খোঁজে বেরিয়ে পড়েছি—এঁকে এবার দায়িত্ব সম্বন্ধে একটু সমঝে দিতে হবে। খানিকটা আঁচ করতে পারছিলুম, কোথায় গেলে তাঁর দেখা মিলবে। কারণ আগেই আমি দেখেছি আমাদের শিবিরের কাছেই তরতর ক'রে একটা নদী ব'য়ে চলেছে। সোজা চ'লে গিয়েছি তখন নদীর পাড়ে...আর—হুঁ-হুঁ—যা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেবেছি, তা-ই, ঐ-তো ছায়ার মতো কে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে। তীর থেকে এই খ্যাপা মৎস্যশিকারি জলের মধ্যে অতদূরে চ'লে গিয়েছেন কী ক'রে? ইনি কি আবার জলের ওপর দিয়েও হেঁটে যেতে পারেন নাকি?

সকালবেলায় সাঁৎ-বেরাঁ্যা অবশ্য খুলেই বলেছেন রহস্যটা : একটা নামকাওয়াস্তে ভেলা তৈরি ক'রে নিয়েছিলেন তিনি, শুধু কোনোমতে যাতে তাঁকে ব'য়ে নিয়ে যেতে পারে—তিনটুকরো তক্তা পর-পর বেঁধে নিয়ে। তারপর বৈঠার বদলে ব্যবহার করেছেন একটা মস্ত ডাল, সেটা তাঁর লগিই হয়েছে আসলে, তারপর চ'লে গিয়েছেন মাঝনদী বরাবর। সেখানে মস্ত একটা পাথরকে ব্যবহার করেছেন নোঙর হিশেবে, গাছের লতা দিয়ে শক্ত ক'রে সেটা বেঁধে নিয়েছেন। গোটা ব্যাপারটায় তাঁর সময় লেগেছে মোটে আধঘণ্টা। প্রতিভা আছে বটে সাঁৎ-বেরাঁ্যার, মাছ ধরার ব্যাপার এলেই তাঁর উদ্ভাবনী-শক্তি দিব্বি খেল দেখায়। তবে সেইমুহূর্তে সেটা আমার বিবেচ্য ছিলো না। আমি পাড়ে গিয়ে নিচুগলায় তাঁকে ডাক দিয়েছি : 'সাঁৎ-বেরাঁ্যা... ?'

জলের ওপর থেকে ছায়া উত্তর দিয়েছে : 'এই-যে।'

'ওখানে আপনি করছেনটা কী, সাঁৎ-বেরাঁ্যা?'

অস্ফুট-একটা হাসি শুনতে পেয়েছি আমি। 'মাছ ধরছি, সাংবাদিকসাহেব।'

'মাছ ধরছেন?'

'হ্যাঁ। রাতের বেলা খ্যাপলা জাল ফেলে মাছ ধরছি।' ব'লে আবার তিনি হেসেছেন।

'আর, মোরিলিরে?' আমার দশা তখন অকহতব্য।

অন্ধকার থেকে এমন বিচ্ছিরি একটা শপথবাক্য বেরিয়ে এসেছে আমার কলম সেটা লিখতে পারবে না, তারপরেই ছায়া দ্রুত নড়তে শুরু করেছে, আর সাঁৎ-বেরাঁ্যা হাঁটুজলের মধ্যে দিয়ে চোরের মতো মুখ ক'রে তীরে ফিরে এসেছেন। এখন তিনি ভয়ে একেবারে আমশি হ'য়ে গেছেন। 'মোরিলিরে?' তাঁর গলা দিয়ে যেন কোনো স্বরই বেরুতে চায়নি।

'হ্যাঁ, মোরিলিরে! নচ্ছারটাকে নিয়ে কী করেছেন বলুন-তো আহাম্মুকের মতো?'

আবার-একটা বিচ্ছিরি গালাগাল দিয়ে সাঁৎ-বেরাঁ্যা ছুটেছেন তাঁর পাহারার জায়গায়। সেখান থেকে এমনিতেই তাঁর নড়বার কথা ছিলো না।

ভাগ্যিশ, তখনও ঘুমিয়ে ছিলো মোরিলিরে। হলফ ক'রে বলতে পারি, কাপ্তেন মার্সেনেকে ছুটি দেবার পর থেকে একবারও তাকে আমি পাশ ফিরতে পর্যন্ত দেখিনি। সাঁৎ-বেরাঁ্যা সে-কথায় সায় দিয়েছেন। আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছেন : 'আপনি আমাকে যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন!'

সেইমুহূর্তেই আমরা শুনতে পেয়েছি বেশ-জোরালো একটা আওয়াজ, যে-নদীর পাড় ছেড়ে আমরা এসেছি, শব্দটা সেদিক থেকেই আসছে। শুনে মনে হচ্ছে, কেউ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন জলে ডুবে যাচ্ছে।

অমনি আমরা ছুট লাগিয়েছি, সাঁৎ-বেরাঁ আর আমি, আর দূর থেকে দেখতেও পেয়েছি, ও-পাশে, স্যাঁৎ-বেরাঁর উদ্ভাবনীশক্তির নমুনা ঐ ভেলাটার পাশে, কী-একটা কালোমতো যেন জলের ওপর আছড়াচ্ছে!

'এ-যে এক কালাআদমি,' ব'লে উঠেছেন সাঁৎ-বেরাঁ।

লাফিয়ে গিয়ে উঠেছেন তিনি নিজের ভেলায়, খ্যাপলা জালটার মধ্য থেকে ছাড়িয়ে এনেছেন লোকটাকে, তারপর হিড়হিড় ক'রে তাঁকে ধরে টানতে-টানতে নিয়ে এসেছেন তীরে, আর আসতে-আসতেই আমার কাছে ব্যাখ্যা করেছেন : 'হতচ্ছাড়াটা আমার জালটায় আটকা প'ড়ে গিয়েছিলো—আমি সেটা ভুলে জলেই ফেলে এসেছিলুম।' (এ আর এমন অস্বাভাবিক কী, স্যাঁৎ-বেরাঁ?) 'কিন্তু এই হতচ্ছাড়া ওখানটায় কী করছিলো?'

*হতচ্ছাড়াটার* ওপর আমরা ঝুঁকে প'ড়েই চমকে উঠেছি। *'মোরিলিরে!'*

হ্যাঁ, মোরিলিরেই! মোরিলিরে, উদোম-ন্যাংটো, জলে-ভিজে-একশা, আর জলে আটকে নাকানিচুবানি খেয়ে প্রায়-আধমরা! সন্দেহ নেই যে, আমাদের গাইড শিবির ছেড়ে কেটে পড়েছিলো, সাঁৎরে পেরিয়েছে নদীটা এবং গাঁয়ের রাস্তায় একটু হাওয়া খেয়ে এসেছে, তারপর ফেরবার সময় স্যাঁৎ-বেরাঁর ভুলোমনের কল্যাণে ঐ জালের মধ্যে আটকে প'ড়ে আছাড়িপিছাড়ি খেয়েছে! আমাদের এই ভুলোমনটি না-থাকলে এই বেইমানটার বদমায়েশি কারু নজরেই আসতো না!

তারপরেই আমার মাথায় উটকো ভাবনাটা খেলে গেছে। অ্যাঁ, ঐ অন্য মোরিলিরেটাই বা কে? জ্যোৎস্নার মধ্যে প'ড়ে-প'ড়ে অমন ঘুম লাগাচ্ছে!

ঘুমকাতুরেকে লক্ষ্য ক'রে আমি ছুটে গিয়েছি তখন। তাকে ধ'রে ক'ষে ঝাঁকুনি লাগিয়েছি।...হুম! এটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিলো! চাদরটার তলায় শুধু মোরিলিয়ের জামাকাপড়ই প'ড়ে আছে। মুখটার জায়গায় কাঠের তৈরি একটা মুখের ভাস্কর্য! তার ওপরেই পাগড়ি পরিয়ে রেখেছে মোরিলিরে।

এবার বাছাধন একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়েছেন—ইংরেজরা যাকে বলে—একেবারে *রক্তলোহিত হস্তে*।

স্যাঁৎ-বেরাঁর কাছে গিয়ে তারপর মনে হয়েছে, তাঁর কয়েদি বুঝি আস্তে-আস্তে একটু-একটু ক'রে ধাতস্থ হ'য়ে উঠছে।

আমি বলেছি, '*বুঝি*', কেননা আচমকা সে লাফিয়ে উঠেছে তড়াক ক'রে, ছুটে চ'লে গিয়েছে নদীর পাড়ে, আবারও-একটা সাঁতার কাটার মৎলব।

মোরিলিরে অবশ্য তাড়াহুড়োয় তার বন্দীকর্তা স্যাঁৎ-বেরাঁর কথা ভাবেইনি, স্যাঁৎ-বেরাঁর বজ্রমুষ্টি পড়েছে তার কব্জিতে, আর মোরিলিরে মিথ্যেই ছটফট করেছে পালাবার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে। সাঁৎ-বেরাঁর গায়ে যেন হাজারটা হারকিউলিস ভর করেছে, কেননা এমনভাবে তার কব্জিটা তিনি চেপে ধ'রেছিলেন যে, যন্ত্রণায় মোরিলিরে একটা আর্তনাদ ক'রে উঠেছে। মোরিলিরে পালাবার রাস্তা না-পেয়ে তখন ধপ ক'রে পায়ে প'ড়ে গেছে—ক্ষমা চাইতে শুরু করেছে ইনিয়ে-বিনিয়ে। আর তার মুঠি আলগা হ'য়ে তার হাত থেকে কী যেন প'ড়ে গিয়েছে মাটিতে।

আমি ঝুঁকে প'ড়ে জিনিশটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়েছি। বোধহয় তেমন আর সতর্কও থাকিনি, কারণ মোরিলিরে এক মরীয়া হ্যাঁচকা টানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েই আমার হাত থেকে জিনিশটা ছিনিয়ে নিয়েই খপ ক'রে মুখে পুরে দিয়েছে।

দম আটকে গিয়ে, আধখানা ছেড়ে দিয়েছে সে, কিন্তু হতভাগা মাত্র-আধখানাই গিলতে পারেনি, তার শক্ত দাঁতে দু-আধখানা ক'রে দিয়েছে জিনিশটা, আর আদ্ধেকটা গিলে ফেলেছে।

আমি জিনিশটার দিকে তাকিয়ে দেখেছি সেটা একটা কাগজের টুকরো, আর তাতে কী-সব যেন লেখা।

'হতভাগাটাকে শক্ত ক'রে পাকড়ে ধ'রে থাকুন,' স্যাঁৎ-বেরাঁকে আমি হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছি।

স্যাঁৎ-বেরাঁ ঘাড় নেড়ে আমায় আশ্বস্ত করেছেন, আর অমনি আমি ছুটে এসেছি কাপ্তেন মার্সেনের খোঁজে। তাঁর প্রথম কাজটাই হয়েছে মোরিলিরেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে শান্ত্রীদের পাহারায় একটা তাঁবুতে আটকে-রাখা—তাঁবুটার চারপাশে চারজন বিশ্বস্ত সেপাই দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন তিনি। তারপর আমরা গিয়ে তাঁকে জিগেস করেছি, কাগজটায় কী লেখা আছে।

লণ্ঠনের আলোয়, আমরা আবিষ্কার করেছি যে কাগজটায় কতগুলো আরবি হরফে কী যেন লেখা। কাপ্তেন নিজে ভালো আরবি জানেন, কাগজটা যদি ময়লা না-হ'তো আর মোরিলিরে সেটা যদি ছিঁড়ে না-ফেলতো, তাহ'লে সহজেই কাপ্তেন মার্সেনে সেটা পড়তে পারতেন। তাছাড়া হাতের লেখাটাও একটু জড়ানো, আর বয়ানটাও পুরোপুরি নেই। এ-অবস্থায় এটা নেহাৎই-একটা হেঁয়ালি মাত্র; দিনের আলোয় ভালো ক'রে এটাকে দেখতে হবে।

কিন্তু ভোর হ'তেই আমরা অনেক ভেবে দেখে বুঝতে পেরেছি, অত-ঝামেলায় যাবার আমাদের দরকারই নেই—তাছাড়া ধাঁধাটার সমাধান আমরা হয়তো করতেই পারবো না। বরং মোরিলিরে এখন যখন বুঝতে পেরেছে যে আমাদের ধাপ্পা দিয়ে তার আর-কোনো লাভ হবে না, সে হয়তো আমাদের দয়াভিক্ষা ক'রে সবকিছু কবুল করবে, তার সব ধড়িবাজির উদ্দেশ্যটাও বলবে—এবং নিশ্চয়ই এই-কাগজটার পুরোবয়ান কী ছিলো, তাও ব'লে দেবে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-তাঁবুটাকে কয়েদখানা বানানো হয়েছিলো, আমরা সবাই সেটার দিকে এগিয়ে গিয়েছি—একসাথে।

তাঁবুর পর্দা সরিয়ে স্তম্ভিতভাবে আমরা দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে পড়েছি : যে-দড়িটা দিয়ে আমাদের কয়েদিকে পেছমোড়া ক'রে, আচ্ছা ক'রে, বাঁধা হয়েছিলো, সেই দড়িটা মাটিতে প'ড়ে আছে। তাঁবুটা ফাঁকা। পরিত্যক্ত। তার ভেতর কেউ নেই!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়

## 'উচ্চতর আদেশবলে...'

*[ আমেদে ফ্লরেঁসের নোটবই থেকে ]*

*সেই একই দিন*। আমাকে মাঝপথেই লেখা থামিয়ে চ'লে যেতে হয়েছিলো, মোরিলিরের মুখ থেকে যে-কাগজের টুকরোটা খ'সে পড়েছিলো তার তর্জমাটা দেখাবার জন্যে কাপ্তেন মার্সেনে আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তবে আবার বরং ঘটনাক্রম অনুযায়ীই সবকিছু লিখে ফেলি।

আমরা তো স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে আছি, তাঁবুর দরজায়, দেখছি তাঁবুটা ফাঁকা, মোরিলিরের কোনো চিহ্নই নেই কোথাও। শুধু দড়িটা প'ড়ে আছে, যেটা ছিলো তার বাঁধন। ভীষণ-অসহিষ্ণু হ'য়ে কাপ্তেন মার্সেনে তাঁর সেপাইদের জিগেস করেছেন। কিন্তু সে-বেচারারাও আমাদের মতোই চমকে গিয়েছিলো। তারা হলফ ক'রে বললে তারা একসেকেণ্ডের জন্যেও তাদের পাহারা ছেড়ে নড়েনি। এমনকী সন্দেহজনক কোনো শব্দও তাদের কানে আসেনি! আমরা তো একেবারেই হতভম্ব!

আমরা সবাই তাঁবুর ভেতরে গিয়ে এই-প্রথম খেয়াল ক'রে দেখেছি তাঁবুর কানাতের ওপরে একটা গর্ত কাটা : আর তার ওপারেই একটা গাছের মোটাডাল। সেটাই সব ব্যাখ্যা ক'রে দিয়েছে। বাঁধনটা নিশ্চয়ই আলগা ছিলো, ঠিকমতো গেরো দেয়া হয়নি, মোরিলিরে যে-ক'রেই হোক বাঁধনটা আলগা ক'রে, তাঁবুর খুঁটি ধ'রে বেয়ে উঠেছে ওপরে এবং তারপর পালিয়ে গেছে—বলা যায়—শূন্যপথেই।

আমরা কি ধাওয়া ক'রে যাবো তার পেছন-পেছন? কী ফল হবে তাতে? সম্ভবত পুরো-একটা ঘণ্টা সে হাতে পেয়েছে পালিয়ে যাবার জন্যে। তাছাড়া এই ঝোপে-জঙ্গলেই বা তাকে খুঁজে পাবো কী ক'রে? তার জন্যে শিকারি কুকুর চাই, ব্লাডহাউণ্ড।

এ-বিষয়টায় একমত হ'য়েই আমরা অনিবার্যকেই মেনে নিয়েছি। কাপ্তেন তাঁবুটা খুলে নেবার ব্যবস্থা করেছেন—এ কি আবার কোনো কয়েদখানা নাকি?—আর সেপাই চারজনকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন, তার আগে পই-পই ক'রে সাবধান ক'রে দিয়েছেন, এর একটা কথাও যদি প্রকাশ পায় তবে তাদের সকলকেই ভীষণ সাজা পেতে হবে। তারপর তিনি নিজের তাঁবুতে ফিরে গিয়ে সেই আধচিলতে কাগজের ওপরেই হুমড়ি খেড়ে পড়েছেন। এদিকে আসলে কী হয়েছে, স্যাঁৎ-বের্যাঁই তা খুলে বলবেন তাঁর সঙ্গীদের—যদি-অবশ্য এর মধ্যেই গোটা ব্যাপারটা তিনি বেমালুম ভুলে গিয়ে না-থাকেন।

একঘণ্টা পরে কাপ্তেন মার্সেনে আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন, যেমন আমি আগেই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছি। আমি তাঁকে দেখতে পেয়েছি মঁসিয় বারজাকের তাঁবুতে, বাকি-সব ইওরোপীয়রাও সেখানে জড়ো হয়েছেন। তাদের সকলের মুখেই একটা হতভম্ব ভ্যাবাচাকা ভাব। মোরিলিরের এই বেইমানির পেছনে কী কারণ থাকতে পারে? এ কি তার নিজেরই মাথার বদবুদ্ধি, না কি অন্য-কোনো তৃতীয় ব্যক্তি তাকে তাতিয়েছে ? আমি অবশ্য আগেই এই *তৃতীয় ব্যক্তির* ব্যাপারটাই সন্দেহ ক'রে এসেছি। হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো রহস্যটা খোলশা হ'য়ে যাবে।

'আরবি লেখা,' মার্সেনে ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়েছেন, 'যায় ডানদিক থেকে বামে। কিন্তু কাগজের টুকরোটা স্বচ্ছ, তেলতেলে, এটাকে উলটো ক'রে আলোর সামনে ধরলেই আমরা আমাদের মতো ক'রে পড়তে পারবো। এই হচ্ছে তার ফলাফল।'

তিনি একচিলতে কাগজ তুলে দিয়েছেন আমাদের হাতে, বিশ্রীভাবে ছিঁড়েছে মাঝখান থেকে—অসমানভাবে, ঠিক মূল চিরকুটটারই মতো। তার ওপর আমি পড়তে পেরেছি নিচের বয়ানটাকে :

*মান্‌সা আ মান গনিগ্‌নে তুবাবু*
*মেমু নিম্বে মান্দো কাফা*
*বাতাকে মানায়েতা সোফা*
*আ ওকাতো। বাতু*
*ই আ কা ফোলো। মান্‌সা আ বে*

এই ব্যাসকূটের মর্মোদ্ধার করার ভার যদি আমার ওপর থাকতো ! ভেবেই যেন আমার মাথার ভেতরটা একটা চক্কর দিয়ে উঠেছে।

কাগজটা আমরা হাত থেকে হাতে চালান ক'রে দিয়েছি। মাদ্‌মোয়াজেল মোরনাস আর স্যাঁৎ-বের‍্যাঁ সম্ভবত খানিকটা আঁচ করতে পেরেছেন কী লেখা আছে, আর আমি তাঁদের জ্ঞানের বহর দেখে একেবারে তাজ্জব হ'য়ে গেছি। আর মঁসিয় বারজাক আর মঁসিয় পঁসাঁ—তাদের জ্ঞানবুদ্ধির দৌড় আমারই মতো।

'প্রথম দুটো পঙক্তির শেষকথাগুলো অসমাপ্ত,' কাপ্তেন মার্সেনে ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়েছেন। 'প্রথম পঙক্তির কথাটা হওয়া উচিত *তুবাবুলেঙ্গো*, যার মানে হ'লো *ইওরোপীয়রা*, আক্ষরিকভাবে *লাল ইওরোপীয়রা*, আর দ্বিতীয় পঙক্তিতে ওটা হবে *কাফামা*, তার মানে *এখনও*।'

'অসমাপ্ত কথাগুলো সম্পূর্ণ ক'রে নেবার পর ছেঁড়া-ছেঁড়াভাবে তর্জমাটা এইরকম দাঁড়ায় : "*প্রভু (অথবা রাজা) এই ইওরোপীয়দের চান না...অথচ যেহেতু তারা এখনও চ'লে আসছে...চিঠিটা সৈন্যবাহিনীকে ডেকে আনবে...তিনি হুকুম দেবেন..[ আদেশ ]পালন*



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

*কোরো...তোমরা শুরু করেছো। প্রভু (অথবা রাজা)...'*

আমরা ভ্রূকুটি ক'রে নির্বোধের মতো তাকিয়েছি। এই তর্জমাতেও তেমন-কিছু বোঝবার জো নেই।

'প্রথম অংশটা সহজেই বোঝা যায়,' কাপ্তেন মার্সেনে বুঝিয়ে বলেছেন। 'কোথাও একজন *প্রভু* আছেন—কিংবা কোনো *রাজাই* হয়তো হবে—তিনি চান না যে আমরা অমুকতুশুক-কিছু করি। কোনো কারণে আমাদের তাঁর ঝামেলার কারণ ব'লে মনে হয়েছে। হারানো আদ্ধেকটায় নিশ্চয়ই কোনো ষড়যন্ত্রের কথা ছিলো—সেটা যে কী তা এ থেকে আমাদের জানার উপায় নেই। পরের দুটো লাইনের মানে বোঝা দায়। "চিঠিটা সৈন্যবাহিনীকে ডেকে আনবে"। এ থেকে কিছুই বোঝা যায় না। চতুর্থ লাইনে মোরিলিরেকে কিছু-একটা করতে হুকুম দেয়া হয়েছে। আর যিনি হুকুম দেবেন, এই *তিনিটা* কিনি তা আমরা জানি না। আর শেষ-কথাগুলোর কোনো মানে আমি অন্তত খুঁজে পাইনি।'

একটু নিরাশ হ'য়েই আমরা পরস্পরের দিকে চাওয়াচাউয়ি করেছি। এতে যেন আমরা হাতে স্বর্গ পেয়ে গেছি!

মঁসিয় বারজাক সংক্ষেপে ব্যাপারটাকে সাজিয়েছেন : 'অ্যাদ্দিন ধ'রে যা ঘটেছে, বিশেষ ক'রে আজ যা ঘটেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কতগুলো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি। *প্রিমো* : কোনো তৃতীয় ব্যক্তির সুবিধের জন্যে আমাদের গাইড আমাদের সঙ্গে বেইমানি করেছে; কোনো অজ্ঞাত কারণে এই তৃতীয় ব্যক্তি আমাদের অভিযান বন্ধ ক'রে দিতে চায়। *সেকুন্দো* : এই অজ্ঞাত ব্যক্তিটির নিশ্চয়ই প্রচণ্ড প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে, কারণ একেবারে কোনাক্রিতেই সে এই গাইডকে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পেরেছে। *তেরতিয়ো* : এই প্রভাব প্রতিপত্তি বা ক্ষমতা তাই ব'লে এমন দারুণ-কিছু নয় যে সে আমাদের আটকে দিতে পেরেছে—সে শুধু ছেলেমানুষি কতগুলো উপায়েই ঝামেলা পাকাবার চেষ্টা ক'রে এসেছে!'

এবার আমি একটা আপত্তি তুলেছি। 'মাফ করবেন! এই রহস্যময় অজ্ঞাত ব্যক্তিটি কিন্তু কতগুলো বেশ সাংঘাতিক বিপত্তিই তুলতে চেয়েছে।'

আমি সবাইকে তখন খুলে বলেছি *দুং-কোনো* গরল সম্বন্ধে আমি কী ভেবেছি, আর *কেনিয়ালালার* ভবিষ্যদ্বাণী বা হুমকির কথাও আমি বলতে ছাড়িনি। কারণ এখন তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ঐ ভবিষ্যদ্বাণী আসলে একটা হুমকিই ছিলো।

'মঁসিয় ফ্লরেঁস যে সারগর্ভ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন,' মঁসিয় বারজাক বলেছেন, 'তা বরং আমার বিশ্বাসটাকেই আরো-দৃঢ় করে। আমি তাই বলি, আমাদের এই দুশমন—সে যে-ই হোক না কেন—তাকে খুব-একটা ভয় পাবার কিছু নেই। না-হ'লে আমাদের বিরুদ্ধে সে এমন-সব চাল চালতো তা যে আরো-গুরুতর হ'তো তা-ই নয়, মারাত্মকও



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ'য়ে যেতে পারতো।'

মঁসিয় বারজাক ঠিকই বলেছেন। প্রজ্ঞার দেবীই, স্বয়ং সোফিয়া, গ্রীকদের ঐ সোফিয়াই তাঁর মুখ দিয়ে কথা কয়েছেন। মঁসিয় বারজাক আরো জুড়ে দিয়েছেন : 'আমার মত হ'লো এ-ব্যাপারটাকে অবহেলা ক'রে উড়িয়ে দেয়া চলবে না ঠিকই, তবে তাই ব'লে এটাকে ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে মারাত্মক-কিছু ক'রে তোলারও দরকার নেই। অর্থাৎ আমাদের বিচক্ষণভাবে এগুতে হবে, বিচারবিবেচনা ক'রে দেখতে হবে—তবে বেশি উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কোনো কারণ নেই।'

আমরা যে সবাই তাঁর কথাতেই সায় দিয়েছি, তাতে আমি অন্তত অবাক হইনি, কারণ আমি আগেই তো সকলের গূঢ় গোপন উদ্দেশ্যগুলো বিশ্লেষণ ক'রে জেনে গিয়েছি। যেটা আমাকে তাজ্জব করেছে, সেটা মঁসিয় বারজাকের এই গোঁ, এই একগুঁয়েমি, এই নাছোড় জেদ। এই সুযোগটা দু-হাতে লুফে নিয়ে তিনি ফিরে গেলেই পারেন—বারজাক মিশনের অভিযান থেকে যে কোনো লাভ হবে না, তা তো বুঝতে কারু আর বাকি নেই।

যা-ই হোক না কেন, আমাদের এখন নতুন গাইড চাই। মাদ্‌মোয়াজেল মোর্‌নাস তাঁর নিজের গাইডদেরই মিশনের কাজে লাগাতে অনুরোধ করেছেন : এরা এই দেশটার আগাপাশতলা চেনে, অন্তত এদের চেনা উচিত, সেইজন্যেই তিনি নিজেই এদের কাজে বাহাল করেছেন। ব্যাপারটার ফয়সালা ক'রে নেবার জন্যে, তখন, আমরা ৎশুমুকি আর তোঙ্গানেকে তলব করেছি।

ৎশুমুকির ভাবভঙ্গি আমার আদপেই ভালো লাগে না। মুখে সে বলেছে বটে যে আমরা তার ওপর ভরসা রাখতে পারি, কিন্তু ভাবগতিক দেখে মনে হয়েছে সে ভারি-অস্বস্তিতে আছে, একটু যেন সংকোচও আছে তার, আর কথা বলবার সময় একবারও আমি তার চোখে চোখ রাখতে পারিনি—সবসময়েই সে তার চোখ সরিয়ে নিয়েছে অথবা মুখ নামিয়ে নিয়েছে। আমার বিশ্বাস লোকটা যেন আগাগোড়া মিথ্যার মোড়ক দিয়ে মোড়া—সবটাই তার প্রতারক প্রচ্ছদ। আমার মতে, সে মোরিলিরের চাইতে কোনোদিক দিয়েই সুবিধের নয়।

তোঙ্গানে, উলটোদিকে, কিন্তু ভারি সরলসিধে মানুষ। সে সরাসরি ব'লে দিয়েছে এদিককার পথঘাট সে ভালোই চেনে, আমরা যেখানেই যেতে চাই, সেখানেই সে আমাদের নিয়ে যাবে। আরো বলেছে, কুলি আর সহিসরা যাতে বিগড়ে না-যায় সে-চেষ্টা সে করবে, তাদের সে সব বুঝিয়ে ব'লে কাজ করতে রাজি করাবে। তার ভাবগতিক সকলেরই মনে ধরেছে : সোজাসুজি পষ্টাপষ্টি সব ব'লে দেয় সে, চোখে চোখ রেখে কথা বলে।

আমি অন্তত ঠিক ক'রে ফেলেছি, বিশ্বাস যদি কাউকে করতেই হয় সে তোঙ্গানেকে;



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ৎশুমুকিকে—নৈব নৈব চ।

তারপরেই এই দুই নতুন গাইড চ'লে গেছে স্থানীয় লোকদের তুইয়ে-বুইয়ে রাজি করাতে, মিষ্টিকথায় ভুলিয়ে বশ করতে। সরকারি কাহনটাই তারা জানিয়েছে তাদের : মোরিলিরেকে নাকি কুমিরে খেয়ে ফেলেছে, এখন থেকে তারা দুজনেই তার জায়গায় সবকিছুর খবরদারি করবে। কেউ কিছুই বলে না। দুপুরবেলার বিশ্রাম সেরে, আমরা বেরিয়ে পড়েছি।

*৯ই ফেব্রুয়ারি।* মোরিলিরে সঙ্গে নেই তো কী, অবস্থা যেমন ছিলো তেমনই আছে। ৎশুমুকি আর তোঙ্গানেকে সামনে রেখেও আমরা ভূতপূর্ব গাইডের চেয়ে খুব-একটা দ্রুত চলতে পারিনি।

গাইড দুজন সারাক্ষণ নিজের মধ্যে কথাকাটাকাটি করেছে—কোন্ পথে যাবে। একবারও তাদের একমত হ'তে দেখিনি। সারাক্ষণ খিটিমিটি, ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে। আমি সবসময়েই তোঙ্গানের দেখানো পথে চলতে একপায়ে খাড়া আছি—আর অভিজ্ঞতা তো প্রমাণই ক'রে দিয়েছে যে আমি ভুল করিনি। বেশির ভাগ লোকে যদি ভেবে নেয় যে ৎশুমুকিই ঠিক বলেছে, অমনি প্রথম যে-গাঁটা চোখে পড়ে সেখানে এসেই টের পায় যে কোথাও একটা মস্ত গোল বেঁধে গিয়েছে। তারপর আমাদের বেঁকেচুরে যেতে হয়, কখনও এমনকী এমন পথে যেখান দিয়ে লটবহর নিয়ে যাওয়াই যায় না, ফলে আবার আমাদের ফিরে যেতে হয় পুরোনো পথটাতেই—যেখান থেকে ক-ঘণ্টা আগে রওনা হয়েছিলুম। অন্যসময়ে, এই দুজন আফ্রিকির আলোচনা অন্তহীনভাবে সারাদিন ধ'রে চলে—আর আমাদের অকম্মার মতো ব'সে থাকতে হয়। এই অবস্থায় খুব-তাড়াতাড়ি চলবার কোনো কথাই ওঠে না। কাজেই আড়াইদিনে কুললে কুড়িমাইল পথও পেরিয়েছি কিনা সন্দেহ হয়। অবস্থাটা অকহতব্য।

আমরা এখনও সেই উপত্যকা ধ'রেই চলেছি, যেখান দিয়ে প্রথম আমরা কোকোরোতে এসে পৌঁছেছিলুম। উপত্যকা ক্রমশ ছড়িয়েই যায়, প্রসারিত হয়, আর আমাদের ডানদিকে, দক্ষিণে, আর-কোনো টিলা বা পাহাড়ই চোখে পড়ে না।

এ-রাস্তাটাই সবচেয়ে সহজ—অত নদীও পেরুতে হয় না, টিলাও ডিঙোতে হয় না। এটাই বাঁচোয়া যে বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো কঠিন পথে আমাদের চলতে হচ্ছে না।

*১১ই ফেব্রুয়ারি।* আজ সকালে, খুব-ভোরে, আমরা চাষের জমির মাঝখানে এসে পড়েছি। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে কাছেই কোনো গ্রাম আছে। এ-সব খেতখামার হয়তো ভালোই ফসল ফলাতো, যদি-না চাষীদের অবিশ্রাম পোকামাকড়ের সঙ্গে একটা অন্তহীন লড়াই চালিয়ে যেতে হ'তো।

আর এদের মধ্যে সবচেয়ে-ভয়ংকর হচ্ছে বল্মীক—উইপোকা। কখনও-কখনও



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রমাণসাইজের মানুষসমান বল্মীকস্তূপ চোখে পড়ে, আর শীতের শুরুতে তারা এই উইয়ের ঢিবি ছেড়ে পাখাওঠা পিঁপড়ের মতোই উড়ে বেড়ায়—তারপর হামলা করে গ্রামগুলোতে, কিন্তু লোকে সব দুর্ভোগের মধ্যেও মজা খুঁজে পেয়ে হতাশা সামলায়। এদের উড়তে দেখলেই শুরু হ'য়ে যায় আমোদপ্রমোদ, মেলা-পরব, আর ভোজের পর ভোজ। আগুনের কুণ্ড জ্বালানো হয় চারপাশে, আর উইপোকাগুলোর পাখা ঝলসে যায়। বাচ্চারা আর মেয়েরা সে-সব কুড়িয়ে নিয়ে *সে* মাখনে ভাজে। তারপর, শুধু ভুরিভোজ করলেই হয় না কি ? কথাতেই তো বলে পানভোজন, অতএব ঢকঢক ক'রে হাঁড়ি-হাঁড়ি মদ গেলে সবাই, আর এত-মদ উড়িয়ে সন্ধেবেলায় দেখা যায় গোটা গাঁটাই মাতাল হ'য়ে পড়েছে।

আটটা নাগাদ গ্রামটা চোখে পড়ে। তার নাম বামা। যেই তার কাছে গিয়ে পৌঁছেছি, অমনি চোখে পড়েছে, দু-র শোভাযাত্রা চলেছে *লুগানের* মধ্য দিয়ে—ভূতপ্রেতপিশাচ তাড়াতে আর বর্ষার জন্যে প্রার্থনা জানাতে। এই দু-র সাজ হ'লো ফোলানো বুকের জামাগায়ে—তাতে শন আর তালপাতা গোঁজা। মাথাগুলো শনের টুপি দিয়ে পুরোপুরি ঢাকা, চোখের জায়গায় দুটো কোটর, মাথার ওপর লাল-একটা কাঠের চূড়া বসানো অথবা কোনো শিকারি পাখির চঞ্চু। নেচে-নেচে আসে তারা, পেছন-পেছন আসে নেই-কাজের সব ভবঘুরে আর বাচ্চার দল—আর তাদের তারা অবিশ্রাম মন্ত্রপড়া ছড়ি দিয়ে পেটায়। যখনই কোনো কুঁড়েবাড়ির পাশ দিয়ে যায়, তারা ঢক ক'রে গেলে *দোলো* (যব গাঁজিয়ে বানানো পানীয় অথবা তাড়ি)। এ-কথার অর্থই হ'লো একঘণ্টা টহল দেবার পর দু-রা সব বেহেড মাতাল হ'য়ে যায়।

আধঘণ্টা পরে আমরা এসে বামায় পা রেখেছি। ভণ্ডামি ক'রে কাঁচুমাচু মুখে অমনি ৎশুমুকি এসে কাপ্তেন মার্সেনেকে বলেছে, কুলি-সহিসরা সবাই ভারি-ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, আর তারা এক পাও নড়তে চাচ্ছে না, তারা সারা দিন এই বামাতেই কটিয়ে দিতে চায়। কাপ্তেন শুনে ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছেন, আর ৎশুমুকির পেছন থেকে তোঙ্গানে তাঁকে ইশারা ক'রে সতর্ক ক'রে দিতে চাইলেও, একটু অবাক গলাতেই জানিয়েছেন, এই অনুরোধের কোনোই দরকার ছিলো না, কারণ আগেই তিনি ঠিক করেছেন যে এখানে তিনি লম্বা সময়ের জন্যে থামবেন। ৎশুমুকি একটু সংকুচিত হ'য়েই কেটে পড়েছে, আর তোঙ্গানে তার হাতদুটো তুলে তার বেজায় বিতৃষ্ণাটা প্রবল ভাবেই প্রকাশ করেছে মলিকের কাছে।

এই অপ্রত্যাশিত ছুটির সুযোগ নিয়ে আমরা গ্রামটা দেখতে বেরিয়ে পড়েছি। গ্রাম সম্বন্ধে বেশ কৌতূহলই হচ্ছিলো : এ-যাবৎ যতগ্রাম আমরা দেখেছি, এ-গ্রামটা যেন তাদের সবার থেকেই আলাদা, অন্যরকম।

ঢোকবার আগে আমাদের গিয়ে আগে উঠতে হয়েছে একটা কুঁড়েবাড়ির ছাতে,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর তারা ছাত থেকে ছাতে নিয়ে গেছে আমাদের, যতক্ষণ-না আমরা গিয়ে পৌঁছেছি মোড়লের কাছে।

এই গ্রামপ্রধান বেশ-বুড়োই, মস্ত-এক পাকানো গোঁফ আছে তার, দেখে মনে হচ্ছিলো আগে হয়তো কোনো সেপাইদের দলে ছিলো। লম্বা-একটা তামার পাইপ ফুঁকছে সে, আর সেটা যেই নিভে যাচ্ছে অমনি এক বাচ্চা-চাকর এসে সেটা আবার জ্বেলে দিয়ে যাচ্ছে।

গ্রামপ্রধান আমাদের দেখেই সাদরে অভ্যর্থনা করেছে, আপ্যায়নের ভঙ্গিতে একটু *দোলো*ও দিয়েছে আমাদের। ভদ্রতায় আমরাই বা কম যাবো কেন? আমরাও আমাদের শুভেচ্ছার চিহ্ন হিশেবে কিছু উপহার দিয়েছি, আর তার বুড়ো চোখদুটো তাতে খুশিতে জুলজুল ক'রে উঠেছে। এ-সব ভদ্রতা-বিনিময়ের পর আমরা রীতিমতো পর্যটকদের ধরনে ঘুরে দেখতে বেরিয়েছি এই বামা গ্রাম।

চকের মধ্যে এক নাপিত খোলা হাওয়ায় ব'সে তার ব্যাবসা জমিয়ে বসেছে। তার আশপাশেই জমিয়ে বসেছে কয়েকটি ছোটোছেলে, তারা হাত-পায়ের নখ কেটে দেয়, পুরোনো একজোড়া কাঁচি আছে তাদের। একেকজনের মক্কেলের কাছ থেকে চার-চার কড়ি মেলে, এটাই তাদের কাজের দস্তুরি, কিন্তু মক্কেলদের কাটা নখগুলো মক্কেলদের ফিরিয়ে দিতে হয় তাদের—আর তারা গিয়ে গর্ত খুঁড়ে সেগুলো তক্ষুনি মাটি দিয়ে বুজিয়ে দেয়। কেন-যে এই অদ্ভুত রীতি এদের, তার কোনো মাথামুণ্ডু আমরা কেউই বুঝতে পারিনি।

কিছুটা দূরে এক '*হাকিম*' রুগি দেখছে, তাদের নিজেদের চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী। আমরা দূর থেকে দাঁড়িয়ে তার চিকিৎসার একটা নমুনা দেখেছি। এক পঙ্গু, শুকিয়ে হাড্ডিসার, চিমশে, চোখদুটো কোটরে-বসা, জ্বরে থরথর ক'রে কাঁপছে। চারপাশে দর্শকদের ভিড়। তারই মাঝখানে হাকিমসায়েব তাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছেন, তারপর তার মুখে মাখিয়ে দিয়েছেন ছাই, মুখটা শাদা হ'য়ে গেছে—এই দেশে *শাদা* হ'লো *ভেলকি, ভোজবাজি*—তারপর পাশে রেখেছে কাঠের তৈরি ছোট্ট-একটা মূর্তি, বুঝি কোনো সদয় দেবতারই মূর্তি হবে। তারপর, হুংকার দিয়ে, রুগির চারপাশ ঘিরে সে একটা উদ্দাম নৃত্য জুড়ে দিয়েছে—সে-কী হাঁকডাক আর সে-কী লম্ফঝম্প! তারপর রোগের মূল উৎস কোথায়, খুঁজে পেয়ে, সেটা আলতোভাবে ডলতে শুরু ক'রে দিয়েছে; আর তারপরেই, আচমকা, হাতসাফাই ক'রে ওখান থেকে বার ক'রে নিয়ে এসেছে একটা হাড়, সঙ্গে সে-কী উল্লসিত হুংকার! রুগি তক্ষুনি ধড়মড় ক'রে উঠে পড়েছে, চেঁচিয়ে বলেছে সে একেবারে সেরে গেছে—চাঙ্গা বোধ ক'রে চ'লে গেছে। আবারও তাহ'লে প্রমাণ হ'য়ে গেছে, আসলে বিশ্বাসই লোকের সব রোগ-তাপ সারিয়ে দেয়।

কিন্তু আমাদের এই রুগি বোধহয় পুরোটা সারেনি তখন। কারণ সন্ধের সময় সে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেই ধুঁকতে-ধুঁকতে এসে হাজির হয়েছে আমাদের শিবিরে। আমাদেরই কুলি বা সহিসদের কাছে সে শুনেছে যে আমাদের সঙ্গে নাকি এক *তুবাব* হাকিম আছেন—তা এই *শাদা* ডাইনি-পুরুৎ যদি তাকে সারিয়ে দেন, কেননা কালো ওঝাটি তাকে পুরোপুরি সারাতে পারেনি ! একটু পরীক্ষা ক'রে নিয়ে ডাক্তার শাতোনে তাকে একঢোঁক কুইনিন খাইয়ে দিয়েছেন। রুগি তো ধন্যবাদ দেয়া থামাতেই চায়নি, তবে চ'লে যাবার সময় এমনভাবে ঘন-ঘন মাথা নেড়েছে যে বোঝাই গেছে এই ওষুধ তার আদপেই মনে ধরেনি —ওষুধের সঙ্গে যদি তাল রেখে নৃত্যগীত হুহুংকার লম্ফঝম্ফ নাই থাকলো, তবে সে আবার ওষুধ কী !

১২ই *ফেব্রুয়ারি*। আজও, কালকের মতোই সেই *একই বাহানা*। বরং আরো-খারাপ, সারাদিনে আমরা কেবল একদফাই চলেছি এবং আগামী কালও এ-অবস্থার কোনো হেরফের হবে না।

সকালে কিন্তু বেরিয়েছিলুম ভালোভাবেই।

ঠিক যখন আমাদের সারি চলার ছন্দটা খুঁজে পেয়েছে, ছুটতে-ছুটতে কালকের সেই রুগি এসে হাজির। সে নাকি এতই ভালো বোধ করছে যে *হাকিমসায়েবকে* সে আরেকবার কৃতজ্ঞতা জানাতে চায়। ডাক্তার তাকে কুইনিনের কতগুলো পুলিন্দা দিয়ে দিয়েছেন, সেইসঙ্গে ব'লে দিতে ভোলেননি কীভাবে সেগুলো ব্যবহার করতে হবে।

চলার পথে কোনো গোলমালই হয়নি। চলার ছন্দে একটা জ্যান্ত চাল এসেছে, কোথাও কোনো ঝামেলা নেই, লোকলস্করেরও কোনো নালিশ নেই। এমন ভালো দশা আমাদের পোড়াকপালে সইলে হয়।

যখন বিশ্রামের জন্যে থেমেছি, অমনি ৎশুমুকি এসে কাপ্তেন মার্সেনের কাছে কালকের মতোই বায়নাক্কা জুড়ে দিয়েছে : সবাই নাকি বেজায় কাহিল বোধ করছে। কাপ্তেন জানিয়েছেন ৎশুমুকি ঠিকই বলেছে, আজ রাতে আর আমরা বেরুবো না—কালও সারাদিন বেরুবো না, তারপর এত লম্বা-একটা ছুটির পর, পরশুদিন, একটানা বারোমাইল পথ না-গিয়ে আমরা আর থামবো না।

কাপ্তেন বেশ জোরগলাতেই, প্রায় চেঁচিয়েই, বলেছেন কথাগুলো, যাতে কেউ তাঁকে আর ভুল বুঝতে না-পারে। কুলি এবং সহিসরা বুঝতে পারে ভবিষ্যতে অবস্থাটা অন্যরকম হবে। কাপ্তেনের জোরগলায় বলা কথাগুলি তাদের মনে দাগ কেটেছে। তারা এ-ওর মুখের দিকে আড়চোখে তাকাতে-তাকাতে তক্ষুনি সে-জায়গা ছেড়ে কেটে পড়েছে।

*সেই একই তারিখ, রাত এগারোটা*। এই কাহনটা বড্ড-বেশি একঘেয়ে হ'য়ে উঠছে। অসহ্য।

আজ সন্ধেয়, ছটা নাগাদ, তখনও ফুটফুটে দিনের আলো আছে, হঠাৎ আমাদের কানে এসেছে সেই গুমগুম আওয়াজ, কানকানে আমরা যে-আওয়াজ শুনেছিলুম—আর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোরিলিরের কীর্তিকলাপ যে-রাতে ফাঁস হ'য়ে গিয়েছিলো, সে-রাতে সম্ভবত আমি একাই শুধু শুনেছিলুম।

আজও, অন্যবারের মতো, এই অদ্ভুত আওয়াজটা এসেছে পুবদিক থেকে। প্রথমে ভারি-ক্ষীণ, তবে অত-মৃদু নয় যে আমরা চিনতে বা শুনতে ভুল করবো। তাছাড়া, আমিই তো একা শুনিনি আওয়াজটা। গোটা শিবিরই আকাশের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়েছে—আর আফ্রিকিদের মধ্যে বেশ একটা ভয়ের রেশ জেগে উঠেছে।

দিনের আলো ফটফট করছে, অথচ কিছুই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যেদিকেই তাকাই না কেন, আকাশ পরিষ্কার। এটা ঠিক যে পুবদিকে একটা উঁচুপাহাড়ের চুড়ো আমাদের দৃষ্টি খানিকটা আড়াল করেছে—ফলে সেদিকে যদি আওয়াজটার উৎস ঢাকা প'ড়ে গিয়ে থাকে ! আমি দ্রুতবেগে পাহাড়টা বেয়ে উঠতে থাকি। যখন আমি যথাসম্ভব দ্রুতবেগে পাহাড়টার চুড়োয় ওঠবার চেষ্টা করছি, আওয়াজটা ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে—তারপরেই হঠাৎ থেমে গিয়েছে। আমি যখন চুড়োয় গিয়ে পৌঁছেছি, তখন চারদিক শুনশান, স্তব্ধ—কিছুই আর সেই স্তব্ধতা ভাঙছে না।

কিন্তু কানে কিছু শুনতে না-পেলেও, কিছুই কি নজরে পড়বে না ? আমার সামনে দিগন্ত অব্দি ধূ-ধূ প'ড়ে আছে উপত্যকা, মাঝে-মাঝে শুধু ঘনঝোপ, আর লম্বা-লম্বা ঘাসের বন। পুরো উপত্যকাটাই ফাঁকা প'ড়ে আছে। মিথ্যেই আমি কষ্ট দিয়েছি চোখকে, মিথ্যেই তাকিয়ে দেখেছি দিগন্তরেখা। কিছুই আমার চোখে পড়েনি।

সেখানেই আমি অতন্দ্র শান্ত্রীর মতো দাঁড়িয়ে থেকেছি, যতক্ষণ-না রাত্রি নেমেছে। আস্তে-আস্তে ঘনছায়া ছড়িয়ে গেছে উপত্যকায়, চাঁদ এখন শুক্লপক্ষের শেষদিকে পৌঁছেছে, অতএব আজ সে উঠবে দেরিতে, একটুক্ষণের জন্যে। এখানে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই। আমি নিচে নামতে শুরু ক'রে দিই।

কিন্তু আদ্ধেকটা পথও নামিনি, অমনি আবার ঐ আওয়াজ শুরু হ'য়ে যায়। সত্যি —এ-যে দেখছি পাগল ক'রে ছাড়বে ! যেমন আচমকা থেমে গিয়েছিলো, তেমনি আচমকা আবার শুরু হ'য়ে গেছে আওয়াজটা, তারপর আস্তে-আস্তে আওয়াজের তীব্রতা ক'মে গিয়েছে। যেন সে পুবদিকে ফিরে যাচ্ছে আবার। কয়েক মিনিট পরেই আবার ফিরে এসেছে স্তব্ধতা।

আমি চিন্তিতভাবে নিচে নেমে এসে আমার তাঁবুতে গিয়ে কয়েকটা ছোট্ট তথ্য লিখে রাখি আমার নোটবইতে।

১৩ই *ফেব্রুয়ারি*। বিশ্রামের দিন। যে যাঁর ইচ্ছে-মতো দিন কাটিয়েছেন।

মঁসিয় বারজাক সারাক্ষণ পায়চারি করেছেন। তাঁকে দেখে মনে হয়েছে হতভম্ব, এবং উদ্বিগ্নও।

মঁসিয় পঁসাঁ, একটা মস্ত গাছের তলায় ব'সে, তাঁর নোটবইতে কী-সব টুকেছেন,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভবত সে-সব তাঁর দফতরের ব্যাপার। তাঁর পেনসিলের গতিবিধি দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন কীসের হিশেব কষেছেন—*কীসের হিশেব?* আমি তাঁকে জিগেস করতে পারি বটে, তবে তিনি কি আমার কৌতূহল মেটাবেন? আমার মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয়, মঁসিয় পঁসাঁ বোবা কি না।

সাঁৎ-বের‍্যাঁ?...হুম, সাঁৎ-বের‍্যাঁ কোথায় যেতে পারেন? সম্ভবত আফ্রিকার যাবতীয় মৎস্যকুলের মোকাবিলা করছেন।

কাপ্তেন মার্সেনে মাদমোয়াজেল মোরনাসের সঙ্গে খোশগল্প জমিয়েছেন। তাঁদের এ-সময় গিয়ে বিরক্ত করা ঠিক হবে না।

শিবিরের অন্যপ্রান্তে তোঙ্গানে মলিকের সঙ্গে কোথায় যেন চলেছে। তাদেরও সময় কাটাতে কোনোই অসুবিধে হয় না।

কুলি আর সহিসরা এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শুয়ে নাক ডাকিয়েছে—আর পাহারার ক-জনা ছাড়া অন্য সেপাইরাও তা-ই করেছে।

আমি? সারাটা দিন কাটিয়েছি কলম চালিয়ে, শাদা কাগজের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে। আমার নোটবইয়ের টুকিটাকিগুলো মিলিয়ে দেখে একটা নিবন্ধ শেষ ক'রে ফেলেছি। শেষ ক'রে তলায় দস্তখৎ বসিয়েছি। ৎশুমুকিকে ডেকে পাঠিয়েছি তারপর—এটাকে ডাকে ফেলবার ব্যবস্থা করতে হবে। ৎশুমুকির কোনো পাত্তাই নেই। একজন সেপাইকে তখন পাঠিয়েছি তাকে তলব দিতে। আধঘণ্টা পরে সে ঘুরে এসে বলেছে ৎশুমুকিকে সে কোথাও খুঁজে পায়নি। আমিও তারপর তার খোঁজ করেছি, উঁহু, তার কোনো পাত্তাই নেই। ৎশুমুকি কোথায় উধাও হ'য়ে গিয়েছে, অতএব লেখাটা ডাকে দেবার আশা আপাতত ত্যাগ করতে হবে।

*১৪ই ফেব্রুয়ারি*। আজ একটা দারুণ জমকালো ব্যাপার ঘটেছে। জমকালো, এবং তুলকালাম। আটটা নাগাদ, কারণ সকালের অনেকটা সময়ই গেছে ৎশুমুকির পাত্তা পেতে, আমরা তাকে ছাড়াই যখন চ'লে যাবার উদ্যোগ করছি, তখন পশ্চিমদিকে, অর্থাৎ বামার দিক থেকে, যেখান থেকে দু-দিন আগে আমরা এসেছি, আমরা দূর থেকে দেখতে পেয়েছি মস্ত-এক ফৌজ আসছে, সশস্ত্র বাহিনী।

আমার আগেই কাপ্তেন মার্সেনে তাদের দেখতে পেয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। চক্ষের পলকে আমাদের সেপাইরা দুশমনের মহড়া নেবার জন্যে তৈরি হ'য়ে গিয়েছে।

এইসব সতর্কতার অবশ্য কোনোই কারণ ছিলো না। ফরাশি উর্দিগুলো চিনতে আমাদের বেশি দেরি হয়নি। ফরাশি উর্দি বটে, তবে এ-দেশের দরকার মতো তার খানিকটা সংস্কার ক'রে নেয়া হয়েছে। যখন সেই অজ্ঞাত সেনাবাহিনী কাছে এসেছে, আমরা দেখতে পেয়েছি যত-বড়ো দল ব'লে ভেবেছিলুম, মোটেই তত-বড়ো দল নয়।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরোদস্তুর সেনার উর্দি পরা কুড়িজন আফ্রিকি সৈন্য, সবাই ঘোড়ার ওপর, সেনাবাহিনীর রাইফেল সমেত সশস্ত্র, আর তিনজন শ্বেতাঙ্গ—তারাও ঘোড়ার পিঠে—একজনের পরনে আবার ঔপনিবেশিক পদাতিক বাহিনীর লিউটেনান্টের উর্দি।

নবাগতদের কাছে আমাদের একজন সার্জেন্টকে পাঠানো হ'লো, তারাও আগেই তাদের একজনকে আমাদের দিকে পাঠিয়েছে। দুই দূত পরস্পরের সঙ্গে কী-সব কথা বলেছে মাঝপথে, তারপর সেই ঘোড়সোয়ারবাহিনী আবার আমাদের শিবিরের দিকে কদম-কদম এগিয়ে এসেছে।

রাইফেল কাঁধে পুরো দলটাই আমাদের শিবিরে ঢুকে পড়েছে, আর তারপর তাদের নেতা অর্থাৎ লিউটেনান্ট কাপ্তেন মার্সেনের দিকে এগিয়ে এসেছে।

'কাপ্তেন মার্সেনে?'

'হ্যাঁ, লিউটেনান্ট—'

'লিউটেনান্ট ল্যকুর, ৭২নং ঔপনিবেশিক পদাতিক বাহিনী—এখন একদল সুদানি স্বেচ্ছাসেবীর দল নিয়ে এখানে এসেছি। আমি আসছি বামাকো থেকে, কাপ্তেন—আর সিকাসোর ও-পাশে মাত্র কয়েকদিনের জন্যে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তারপর থেকেই আমি আপনাদের পেছন-পেছন আসছি—'

'কেন?'

'আপনার নামে একটা সরকারি চিঠি আছে, তাতেই সব জানতে পাবেন।'

কাপ্তেন মার্সেনে চিঠিটা নিয়ে খুলে পড়তে শুরু ক'রে দিতেই তাঁর মুখে একসঙ্গে বিস্ময় আর হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

'বেশ। লিউটেনান্ট, আমি গিয়ে মঁসিয় বারজাক আর তাঁর সহযাত্রীদের সব জানাচ্ছি। তারপর থেকে আমি আপনারই অধীনে—যা বলবেন—'

কাপ্তেন মার্সেনে চিঠিটা নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছেন।

'আপনাকে একটা তাজ্জব খবর শোনাবার আছে, মঁসিয় ল্য দেপুতে। আমাকে আপনাদের ছেড়ে চ'লে যেতে হবে।'

'আমাদের ছেড়ে চ'লে যাবেন?'

বিস্ময়ের এই অনতিস্ফুট আওয়াজটা এসেছে মাদমোয়াজেল মোরনাসের কাছ থেকে। হঠাৎ কে যেন সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে তাঁর মুখ থেকে, কোনোরকমে অধর দংশন ক'রে নিজেকে তিনি সংযত রেখেছেন। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা সম্বন্ধে আমার যদি আগের কোনো ধারণা না-থাকতো, তবে হয়তো ভাবতুম তিনি হয়তো কেঁদেই ফেলবেন।

'এর মানে কী, কাপ্তেন?'

'মানে, মঁসিয় ল্য দেপুতে, হ'লো আমাকে সরকারিভাবে এত্তেলা পাঠানো হয়েছে, এক্ষুনি টিমবাকটু গিয়ে হাজিরা দিতে হবে।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সে-যে অচিন্তনীয়!' মঁসিয় বারজাককে কেউ যেন প্রচণ্ড-একটা ঘুষি কষিয়েছে।

'কিন্তু, তাহ'লেও, সত্য,' বলেছেন কাপ্তেন, 'এই নিন। চিঠিটা প'ড়ে দেখুন।'

মঁসিয় বারজাকের হাতে তিনি চিঠিটা তুলে দিয়েছেন তারপরে। লিউটেনা'ন্ট ল্যকুরের নিয়ে-আসা এই তলবপত্র পড়তে-পড়তে চোখ কপালে উঠে গেছে মঁসিয় বারজাকের, বারে-বারে মুখে রাগের আর নিন্দার ভঙ্গি ফুটে উঠেছে। পড়া শেষ ক'রেই আমাদের দিকে চিঠিটা বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি, যাতে আমরা নিজেরাই এর খামখেয়ালি ভঙ্গিটা সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি।

*রেপুবলিক ফ্রাঁসেঈ*

*গুভর্নমঁ জেনেরাল দ্যু সেনেগল*

*সেরক্ল্ দ্য বামোকো*

*ল্য কর্নেল :*

*কাপ্তেন পিয়ের মার্সেনে এবং তাঁর বাহিনীকে এক্ষুনি ডবোল-মার্চ ক'রে সেণ্ড-সিকোরো আসতে তলব করা হোক, যাতে নাইজার দিয়ে টিমবাকটু চ'লে আসতে পারেন : সেখানে অতঃপর তাঁকে সেই অঞ্চলের কম্যাণ্ড-কর্নেলের অধীনে কার্যভার গ্রহণ করতে হবে। কাপ্তেন মার্সেনের সঙ্গে যত ঘোড়া আছে তাদের সেণ্ড-সিকোরোর আস্তাবলে জমা দিয়ে আসতে হবে।*

*৭২ ঔপনিবেশিক পদাতিক বাহিনীর লিউটেনা'ন্ট ল্যকুর, ২০জন সুদানি স্বেচ্ছাসেবকের একটি দল নিয়ে, এক্ষুনি এই এত্তেলাপত্র সিকোসোতে কাপ্তেন মার্সেনের কাছে পৌঁছে দেবেন; কাপ্তেন মার্সেনের অবর্তমানে লিউটেনা'ন্ট ল্যকুরই নাইজার নদীর বাঁকের অতিসাংসদ অভিযাত্রীবাহিনীর নেতা [ প্রথম শাখা ] মঁসিয় ল্য দেপুতে বারজাকের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে তাঁকে তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবেন।*

*বামোকোর সেরক্ল-র কম্যাণ্ডিং কর্নেল*

*সাঁৎ-ওবান*

আমি যখন পাঠকদের জন্যে জোরোহাতে চিঠিটার একটা নকল করছি, মঁসিয় বারজাক তখন ফোঁস ক'রে উঠেছেন : 'অকথ্য! অকহতব্য! মাত্র কুড়িজনের একটা পাহারা !... ঠিক যখনই আমরা বিষম-মুশকিলের মধ্যে এসে পড়েছি !... কিন্তু এই চিঠিই এর শেষ কথা হবে না!... পারী ফিরে গিয়েই আমি সংসদে জানাবো কী মধুর ভাবে একজন সাংসদের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে এখানে!'

'কিন্তু এদিকে তো হুকুমটা আমাদের মেনে নিতেই হবে।' কাপ্তেন মার্সেনে তাঁর গলার স্বর থেকে ক্ষোভটাকে দূর করবার কোনো চেষ্টাই করেননি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঁসিয় বারজাক কাপ্তেন মার্সেনেকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আমারও তো সাংবাদিকের কান, বড়ো-বড়ো, খাড়া-খাড়া আমি বেশ-ভালোই শুনতে পেয়েছি।

'কাপ্তেন, এই হুকুমটা তো জালও হ'তে পারে!'

'জাল!' যেন আঁৎকেই উঠেছেন কাপ্তেন। 'উঁহু, সে-কথা মোটেই ভাববেন না কিন্তু, মঁসিয় ল্য দেপুতে। দুর্ভাগ্যবশত চিঠিটা যে খাঁটি তাতে কোনো সন্দেহই নেই। চিঠিটায় সমস্ত সরকারি সীলমোহর আছে। তাছাড়া আমি কর্নেল সাঁৎ-ওবানের অধীনে কাজ করেছি—আমি তাঁর সইটা চিনি।'

মেজাজখারাপ হ'লে লোকে অনেক আবোলতাবোল কাজ ক'রে ফেলতে পারে—তবে এক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে মঁসিয় বারজাক বড্ড-বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছেন। ভাগ্যিশ লিউটেনাণ্ট ল্যকুর তাঁর কথা শুনতে পাননি। শুনে, তিনি অত্যন্ত গ'লে যেতেন না।

মঁসিয় বারজাক আর-কিছু না-ব'লে গুম হ'য়ে থেকেছেন।

'মঁসিয় ল্য দেপুতে, অনুগ্রহ ক'রে অনুমতি দিন লিউটেনাণ্ট ল্যকুরের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। তারপর আমাকে বিদায় নিতে হবে।'

পরিচয়ের পালা শেষ হ'লে, মঁসিয় বারজাক সরাসরি জিগেস ক'রে বসেছেন : 'আচ্ছা, লিউটেনাণ্ট, বলতে পারেন, হঠাৎ এমন-কোনো হুকুম পাঠানো হয়েছে কেন? এ-রকম একটা এত্তেলা?'

'নিশ্চয়ই পারি, মঁসিয় ল্য দেপুতে,' লিউটেনাণ্ট অমনি জবাব দিয়েছেন। 'তুয়ারেগ আউএলিমেদেনরা খেপে উঠেছে, আমাদের আক্রমণ করবার মৎলব এঁটেছে। সেইজন্যেই টিমবাক্টুর দুর্গদফতরে আরো-সৈন্য চাই। হাতের কাছে যাকেই পাচ্ছেন, তাকেই ডেকে নিয়ে গিয়ে কর্নেল দল ভারি করছেন।'

'কিন্তু আমাদের কী হবে?' অভিযাত্রীদলের নেতা জিগেস করেছেন। 'আমাদের সুরক্ষার জন্যে মাত্র কুড়িজন লোক কি যথেষ্ট হবে?'

লিউটেনাণ্ট ল্যকুর শুধু স্মিত হেসেছেন। 'তাতে কোনো ঝামেলাই হবে না। এ-অঞ্চলটা সম্পূর্ণ শান্তশিষ্ট।'

'সেটা অবশ্য নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না,' মঁসিয় বারজাক আপত্তি করেছেন। 'উপনিবেশ দফতরের মন্ত্রী স্বয়ং সংসদকে জানিয়েছেন এবং কোনাক্রির রাজ্যপালও তা সমর্থন করেছেন—যে নাইজার নদীর আশপাশের অঞ্চলে নাকি অশান্তি লেগেই আছে!'

'আগে হয়তো তা বলা যেতো,' লিউটেনাণ্ট ল্যকুরের মুখে তখনও স্মিতহাসি। 'তবে এখন আর তার কোনো প্রশ্নই নেই। ও-সব অশান্তি এখন প্রাচীন ইতিহাস।'

'কিন্তু আমরা নিজেরা যা দেখেছি..' এই ব'লে মঁসিয় বারজাক আমাদের অভিজ্ঞতাটা কেমন, তা আদ্যোপান্ত খুলে বলেছেন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে কিন্তু লিউটেনান্টকে একটুও ঘাবড়ে যেতে দেখা যায়নি। 'কিন্তু এটা আপনার বোঝা উচিত যে এই অজানা-অচেনা প্রতিদ্বন্দ্বীটি—যিনি আপনাদের অমনভাবে সারাক্ষণ নাজেহাল ক'রে চলেছেন—নিশ্চয়ই খুবই নগণ্য লোক। আপনি বলতে চাচ্ছেন, তিনি আপনাদের রাস্তায় কেবলই বাধাবিপত্তি তৈরি ক'রে চলেছেন—কিন্তু একবারও সরাসরি সামনে এসে কোনো বাধা দেননি।... আপনি নিশ্চয়ই খুব ভেবেচিন্তে কথাটা বলেননি, মঁসিয় ল্য দেপুতে।'

মঁসিয় বারজাক যে কী বলবেন, ভেবেই পাননি।

কাপ্তেন মার্সেনে এগিয়ে এসে বলেছেন, 'তাহ'লে অনুমতি করুন, মঁসিয় ল্য দেপুতে, আমরা এবার বিদায় নিই।'

'অ্যাঁ? এক্ষুনি? এত-শিগগির?'

'উপায় কী বলুন?' নাচার হ'য়ে বলেছেন কাপ্তেন মার্সেনে। 'আমাকে সরকারিভাবে তলব করা হয়েছে। আমাকে আর কালবিলম্ব না-ক'রে সেগু-সেকোরো এবং টিমবাক্টু গিয়ে হাজিরা দিতে হবে।'

'তাহ'লে তা-ই করুন, কাপ্তেন,' রাগ চেপে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মঁসিয় বারজাক, 'মনে রাখবেন আপনার সঙ্গে আমাদের সকলের শুভকামনা রয়েছে। একসঙ্গে এই ক-দিন আমরা যেভাবে কাটিয়েছি, তা আমরা কেউই ভুলবো না। আপনি যে সারাক্ষণ কী ক'রে অটুট কর্তব্যনিষ্ঠায় আপনার দায়িত্ব পালন ক'রে গিয়েছেন, তা আমরা সকলেই জানি।'

কাপ্তেন খুব নাড়া খেয়ে গিয়ে বলেছেন : 'ধন্যবাদ, মঁসিয় ল্য দেপুতে।'

তারপর তিনি এক-এক ক'রে আমাদের সকলের কাছ থেকেই বিদায় নিয়েছেন —আর, বলা বাহুল্য হবে যে, সবশেষে বিদায় নিয়েছেন মাদ্মোয়াজেল মোর্নাসের কাছে। আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখেছি ব্যাপারটা।

'অ্যভুয়া, মাদ্মোয়াজেল!'

'অ্যভুয়া, কাপ্তেন!'

আর-কোনো কথাই নয়। কিন্তু যারা কোনো গোপন সূত্রে বাঁধা প'ড়ে গেছে তাদের কাছে এই ছোট্টকথাগুলোও গভীর-তাৎপর্যে ভরা। তার সঙ্গে মেশানো আছে শুভেচ্ছা, প্রেমপ্রীতি আর প্রতিশ্রুতি। *পুনর্দর্শনায় চ।*

কাপ্তেনের মুখে আবার শান্ত দৃঢ়তা। মাদ্মোয়াজেল মোর্নাসের বাড়ানো হাতটায় ঝুঁকে প'ড়ে আলতো ক'রে চুমো খেয়েছেন তিনি, তারপরেই হনহন ক'রে এগিয়ে গেছেন, লাফিয়ে উঠেছেন তাঁর ঘোড়ার পিঠে, তাঁর বাহিনীর পুরোভাগে নিয়ে গেছেন তাঁর ঘোড়া।

আমাদের দিকে ফিরে শেষবার একটা সেলাম ঠুকে, কাপ্তেন মার্সেনে আকাশে তুলে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরেছেন তাঁর উন্মুক্ত অসি—অমনি একশোজন ঘোড়সোয়ার কদম-কদম এগুতে শুরু করেছে—তারপর ক-মিনিটের মধ্যেই বাঁক ঘুরে তারা দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেছে।

তারপর এই আমরা, লিউটেনান্ট ল্যকুরের সঙ্গে, এছাড়া আছে তাঁর দুই খাশ সহকারী আর কুড়িজন স্বেচ্ছাসেবী। একঘণ্টা আগেও এদের অস্তিত্বের কথাটাই আমরা জানতুম না। ঘটনাটা এমন তুলকালামবেগে চমকপ্রদভাবে ঘটেছে যে আমরা যেন স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছি। আমি অবস্থাটা বোঝবার জন্যে শুধু তাকিয়েছি আমাদের নতুন বডিগার্ডদের দিকে, আর অমনি একটা তাজ্জব জিনিশ ঘ'টে গিয়েছে। প্রথম-নজরেই আমার সর্বাঙ্গে যেন একটা শিহরন খেলে গিয়েছে। হঠাৎ মনে হয়েছে এ-লোকগুলো এমন, এদের সঙ্গে কোনো বনের পাশে নিরিবিলিতে দেখা হওয়াটা মোটেই সমীচীন নয়। কেন যেন আমার সারা গাটাই ছমছম ক'রে উঠেছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশ

## নতুন রক্ষিদল

[ *আমেদে ফ্লরেঁসের নোটবই থেকে* ]

*সেই একই দিন, সন্ধেয়।* না, কোনো বনের কাছে তাদের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হ'তে আমার সাধ যাবে না, অথচ এই-তো আমি—বরং আমি তাদের সঙ্গেই আছি, ঝোপের একেবারে মাঝখানে, যেটা আরো-সাংঘাতিক। তো অবস্থা ক্রমেই মধুরতর হ'য়ে উঠছে, অ্যাঁ? জানো-যে তুমি বিপদে পড়তে চলেছো, অথচ জানো না কী বিপদ; অবিশ্রাম কেবল এই চিন্তায় মাথা-ঘামানো : তোমার বোধবুদ্ধির কাছে থেকে সে-কাকে লুকিয়ে-রাখা হচ্ছে; চক্ষু-কর্ণ সবসময়েই সজাগ, যাতে যে-মোক্ষম ঘাটা খাবার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছো, সেটাকে এড়িয়ে যেতে পারো—অথচ জানো না সেই মারটা ঠিক-কখন আসবে—আর এর চাইতে *রগরগে, রুদ্ধশ্বাস, উত্তেজক* আর কী-ই বা হ'তে পারে। জীবনে যখন এ-রকম মুহূর্ত আসে, তখনই লোকে যা বাঁচার বেঁচে নেয়—তীব্রভাবে, প্রখরভাবে; আর পারীর কফিখানার অলিন্দে ব'সে কফির পেয়ালায় চুমুক দেবার বদলে এই *উপভোগই* হানা দেয় তোমাকে, সারাক্ষণ।

তবে চলুক, যা চলেছে! আর আমি এদিকে আমার পুরোনো চালেই কথার তুফান ছুটিয়ে দিচ্ছি। ভাবছি যে আমাদের নতুন রক্ষিদল আসলে একদল দস্যু, যখন তারা হয়তো নেহাৎই সাধারণ সেপাই-শান্ত্রী। আমার কল্পনা কি আমাকে নিয়ে একটা ভয়ানক খেলায় মেতে ওঠেনি? আর ঐ এত্তেলা, ঐ তলবপত্র—কর্নেল সাঁৎ-ওবানের কাছ-থেকে-আসা একটা *সরকারি* চিঠি—কী ছাই মানে করবো তার, তাহ'লে? যা-ই ভাবতে চাই না কেন, ঐ চিঠিটা আমায় গভীর গাড্ডায় ফেলে দেয়। অথচ এই নতুন রক্ষিদল সম্বন্ধে আমার এই বিদঘুটে অনুভূতিটাকে আমি কিছুতেই তাড়াতে পারছি না কেন?

*প্রথমত* : ঐ লিউটেনান্ট, তাঁর দুজন খাশ সহকারী, এই সেপাই-শান্ত্রী—এরা কি সত্যি সমরবাহিনীর লোক? আফ্রিকিদের দিকে তাকিয়ে সত্যি-মিথ্যে বোঝবার জো নেই। আর লিউটেনান্ট? মনে হয়, সমরবাহিনীরই তো। কিন্তু তাঁর দুজন সার্জেন্ট? তাদের তো আদপেই পল্টনের লোক ব'লে মনে হয় না! কী ক্রূর, নিষ্ঠুর, নৃশংস তাদের মুখচোখ! ফরাশি সেনাবাহিনীতে এমন লোক আছে নাকি?

প্রথমে যেটাকে একটা তুচ্ছ অনুপুঙ্খ ব'লে মনে হয়েছিলো, সেটাই আমার চিন্তার স্রোত খুলে দিয়েছে; এটা কি একটু অদ্ভুতই নয় যে এই লোকগুলো—সার্জেন্ট দুজন আর আফ্রিকি ঘোড়সোয়াররা—এদের সকলেরই তো ধূলিধূসর হবারই কথা, যদি তারা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গত পনেরো দিন ধ'রে আমাদের ধাওয়া ক'রে এসে থাকে; কিন্তু তাদের নেতাটিকে দেখাচ্ছে ঝকঝকে তকতকে, যেন এইমাত্র ধোবিখানা থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

কারণ, সত্যি তাঁকে কড়া ইস্ত্রি করাই দেখাচ্ছে, মাঞ্জা দেয়া—প্রায় যেন আজগুবি একটা পর্যায়েই উঠে গিয়েছে এই পরিচ্ছন্নতা। ধবধবে-কাচা উর্দি, ঝকঝকে-পালিশ বুট-জোড়া, মোমমাখানো গোঁফজোড়া—অতীব *সুদৃশ্য* এই লিউটেনান্ট। আর তাঁর ভাবগতিক? দেখে মনে হয় লিউটেনান্ট ল্যকুর বুঝি এক্ষুনি সমরবাহিনী পরিদর্শনে বেরুবেন। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অব্দি পুরোদস্তুর যেন সমরবাহিনীর লোক। কিচ্ছু খুঁত নেই কোথাও, একটা বোতাম নয়, একটা সুতো নয়, পাৎলুনের ভাঁজটা অব্দি এমন যে আনকোরা কিনে আনা হয়েছে যেন। আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে সচরাচর এমন চমৎকার বেশভূষা তারিফ করবার সুযোগ সহজে কারু-একটা বোধহয় জোটে না। উর্দিটা একডাকে সব্বাইকে ব'লে দিচ্ছে এর ভেতরে এর আগে আর-কেউ শরীর গলায়নি, এটা একেবারে নতুন, আর যে-লোকটা সেটা প'রে আছে তাকে যেন লিউটেনান্ট ব'লে দেখায়, এই ভাবটা বোঝাবার জন্যে সে এতই উৎসুক হ'য়ে আছে যে সব সম্ভাবনারই পরপারে সে চ'লে গিয়েছে। তাঁর অধীনস্থ লোকরা যখন এমন ধুলোয় মাখামাখি হ'য়ে আছে, তখন এত ঝকঝকে তকতকে দেখাচ্ছে কেন তাঁকে? লিউটেনান্ট ল্যকুর তো তাঁদেরই মতো, *একসাথেই*, আমাদের পেছনে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছেন?

গোরা সার্জেন্ট দুজন ভীষণ নোংরা হ'য়ে আছে; কিন্তু তাদের যদি তাদের অফিসারের মতো বাড়াবাড়িরকম পরিচ্ছন্নতা না-থেকে থাকে, তবে তারা বোধহয় বড্ড-বেশি নোংরা *সেজেই* গোল বাধিয়ে বসেছে। তাদের উর্দিগুলোকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন ফকিরের আলখাল্লা—ছেঁড়াখোঁড়া, তাপ্পিমারা, রংচটা। তাদের ট্রাউসারগুলো ঢলঢলে, আর বড্ড-বেশি তাপ্পিলাগানো, আর তারা যে কোন রেজিমেন্টের লোক, তার কোনো ইঙ্গিতই নেই কোথাও—না নম্বর, না কোনো প্রতীক। বিশ্বাস করা কঠিন ফরাশি সেনাবাহিনীর লোককে এমন অবস্থায় কোনোখানে পৌঁছুতে দেয়া হবে। আরো-বেশি কঠিন এই অনুভূতিটা : এই-যে পুরোনো উর্দিটুর্দি লোকগুলো প'রে আছে, এরা যেন এ-সব পরতে মোটেই অভ্যস্ত নয়। কেন আমার এমন মনে হচ্ছে তা হয়তো স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে বলতে পারবো না, তবু মনে হচ্ছে এমন অনভ্যস্ত পোশাক প'রে তারা যেন বেশ-একটু অস্বস্তিতেই আছে।

আমার তো অন্তত এইরকমই মনে হচ্ছিলো। তাদের দেখে ঠিক নির্ভরযোগ্য মনে হয়নি, আর তাই হয়তো আমি এ-সব তুচ্ছ খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। হয়তো তাদের এমনতর হালচালের পেছনে অত্যন্ত-সরল কোনো ব্যাখ্যা আছে। বলবো না যে আমার অনুভূতিগুলোতেই সত্যতা আছে। আমার এই সন্দেহের কারণগুলো লিখতে গিয়ে, লিখে নিজের কাছেই পরিষ্কার করতে গিয়ে, নিজেই কবুল করছি যে সন্দেহের ভিত্তিগুলো



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারি-দুর্বল, ভারি-পলকা। কিন্তু সন্দেহ বা অবিশ্বাস তো প্রথমত এবং প্রধানত অনুভূতিরই ব্যাপার—তাকে ঠিক, *যুক্তিসংগত কথায়*, ব'লে বোঝানো যায় না।

যদি রীতিশৃঙ্খলার কথা ওঠে তো কিছুই বলবার নেই। বরং আমার মনে হয়েছে এই শৃঙ্খলার মধ্যেও বড্ড-কড়াকড়ি আছে। নিয়ম ক'রেই একজন পাহারার শান্ত্রীকে আরেকজন গিয়ে ছুটি দেয়। ক্রমগুলো সব নিখুঁতমসৃণ ছিমছাম। তবে বড্ড-বেশি ছিমছাম।

রক্ষিদল চট ক'রে তিনটে ভাগে ভাগ হ'য়ে গেছে, কনভয়ের কারু সঙ্গেই তাদের ঠিক বনিবনা হচ্ছে ব'লে মনে হচ্ছে না। প্রথম দলে আছে কুড়িজন সুদানি সেপাই। পাহারার সময় বাদে তারা সবাই একসঙ্গে থাকে দল বেঁধে—আফ্রিকিদের মধ্যে এমনতর অভ্যাস একটু অস্বাভাবিকই ঠেকে—কারণ তারা কেউ কখনও একটাও কথা বলে না। নীরবে তারা তাদের খানা পাকায়, বাকি সময় ঘুম যায়, তাদের কাছ থেকে টুঁ শব্দটা কানে আসে না। তাদের গোরা সার্জেন্টের সামান্য কটাক্ষে তারা তটস্থ হ'য়ে ওঠে হুকুম তামিল করতে—এই সার্জেন্টদের তারা যেন ভয়ই পায়। দেখে মনে হয় এই কুড়িজন আফ্রিকি যেন বিষম অস্বস্তিতে আছে—বেশ *ভয়ে-ভয়ে* আছে।

দ্বিতীয় দলটায় ঐ দুজন গোরা সার্জেন্ট। এরা কথা বলে বটে, তবে নিজেদের মধ্যে, আর সবসময়েই চাপাস্বরে। আমার এই বড়ো-বড়ো সাংবাদিকের কানদুটি অব্দি তাদের কাছ থেকে এমন-একটা কথাও শুনতে পায়নি যেটা একটু জরুরি ব'লে মনে হ'তে পারে।

তৃতীয় দলটায় সবেধন লিউটেনান্ট ল্যকুরই আছেন—একাই একশো। মানুষটি এমনিতে ছোটোখাটো, ফিকে-নীল চোখ, ইস্পাতের মতো চোখ—খুব সহৃদয় ঠেকে না তাঁকে। কথা বলা মোটেই পছন্দ করেন না। তার ওপর কেমনতর যেন অসামাজিক। সারা বিকেলবেলাটায় মাত্র দু-বারই তাঁকে তাঁর তাঁবু থেকে বেরুতে দেখেছি, তাও বেরিয়েছেন নিজের সাঙ্গোপাঙ্গর ওপর চোখ বুলিয়ে নিতে।

এবং এই কর্মসূচির কোনো বদলই হয় না। তাঁকে দেখবামাত্র সেপাইরা সবাই লাফিয়ে খাড়া হ'য়ে ওঠে, সার বেঁধে দাঁড়ায়। লিউটেনান্ট, লোহার শিকের মতো আড়-ধরা, তাদের ওপর চোখ বোলান, তাঁর হিমজমাট দৃষ্টি নিরীক্ষণ করে আফ্রিকিদের আপাদমস্তক; তারপর তিনি ফের গিয়ে ঢুকে পড়েন তাঁর তাঁবুতে, কারু সঙ্গে একটা কথাও বলেন না। উঁহু, অন্যরকম অবস্থাতেও ইনি যে খুব-দিলখুশ সঙ্গী হতেন, তা আমার আদৌ মনে হয় না।

সারাদিনের মধ্যে আর-একবারও মাদমোয়াজেল মোরনাসকে আমি চোখে দেখিনি। ৎশুমুকিকেও খুঁজে পাইনি কোথাও। অস্যার্থ: আমার লেখাটা এখনও আমার পকেটেই আছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫ই *ফেব্রুয়ারি*। সকালবেলায় যখন শিবিরের ঘুম ভাঙাবার জন্যে শিঙা বেজেছে, আমি তখন যাত্রার কোনো প্রস্তুতিই দেখতে পাইনি। তোঙ্গানেকে জিগেস ক'রে জেনেছি সারাদিনে নাকি আমরা একপাও নড়বো না। গতকালকার বিশ্রামের পর আজকের এই বিরতিটা একটু অদ্ভুতই ঠেকেছে।

দৈবাৎ একসময় লিউটেনাণ্ট ল্যকুরের সঙ্গে আমার দেখা হ'য়ে গেছে, সারাক্ষণ ঋজু, সটান এবং নিখুঁতভাবে সাজগোজ-করা। আমি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে জিগেস করেছি এই বাড়তি-বিশ্রামের কারণ কী।

তিনি নিস্পৃহ সুরে জানিয়েছেন : 'মঁসিয় বারজাকের হুকুম।'

তিনটি শুধু কথা, তারপর সামরিক কায়দায় সেলাম ঠুকে, জুতোর গোড়ালিও ঠুকে, তিনি ফিরে গেছেন। *আলাপচারী ল্যকুর* নামে কোনো কেতাব কেউ কোনোদিন লিখবে ব'লে মনে হয় না।

অভিযানের নেতা হঠাৎ কেন এমনভাবে প্রহর গুনছেন? রক্ষিদের সংখ্যা পাঁচভাগের চারভাগ ক'মে গেছে ব'লেই কি অভিযান মুলতুবি রেখে দিতে চান তিনি? এটা একটু ধাঁধাতেই ফেলে দিয়েছে আমাকে। খানিকটা অস্বস্তিও জাগিয়েছে। কারণ অভিযান মাঝপথে বন্ধ হ'য়ে গেলে আমারও লেখা-টেখা খতম : ঠিক যখন অভিযানটা রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর হ'য়ে উঠছে তখনই কি না এই কাণ্ড!

ঠিক দশটার সময় মঁসিয় বারজাকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তাঁবুর মধ্য থেকে বেরিয়েছেন, হাত-দুটো পেছনে, চোখ মাটিতে নামানো, মেজাজটা তেমন সুবিধের ঠেকেনি। এটা হয়তো তাঁর অভিসন্ধি জেনে নেবার শুভ-মুহূর্ত নয়। তবু আমি একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছি।

না, মঁসিয় বারজাক মোটেই চ'টে যাননি। থেমে প'ড়ে, বরং চুপচাপ স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে একটু তাকিয়ে থেকেছেন। শেষে বলেছেন : 'এই একই প্রশ্ন আগেও জিগেস করেছেন, মঁসিয় ফ্লরেঁস, এবং তারপর মাত্র কয়েকটা দিনই কেটেছে। সেবার আপনার কথার কোনো উত্তর দিইনি। আজ অন্তত এই উত্তর দেবো যে আমি নিজেই জানি না কেন এখানে থেমে আছি।'

'তাহ'লে আপনি এখনও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছোননি, মঁসিয় ল্য দেপুতে?'

'না। ভেবেছি বটে, একটু দোনোমনাও করেছি, ভালোমন্দ খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছি...'

আবার চুপচাপ। তারপরেই আচমকা ব'লে উঠেছেন : 'বাস্তবিকই, আমরা দুজনে একসঙ্গে কেন এটা নিয়ে আলোচনা করছি না? আপনি সুবিবেচক মানুষ, কাণ্ডজ্ঞানও আছে।' (ধন্যবাদ, মঁসিয় বারজাক।) 'আমি আপনার মতটা জানতে চাই।'

আমি নুয়ে প'ড়ে অভিবাদন ক'রে বলেছি, 'অধম আপনার সেবাতেই নিয়োজিত,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঁসিয় ল্য দেপুতে।'

'প্রথমেই ভেবে দেখা যাক ঝুঁকি না-নিয়ে এই অভিযানটা চালানো ঠিক হবে কিনা।'

'বরং এটাই জিগেস করা যেতে পারে, তার আর-কোনো দরকার আছে কি না।'

'না-না, দরকার তো আছেই। এর মূল্য অনেকখানি।'

আমি একটু ঘাবড়েই গেছি। মঁসিয় বারজাক কিন্তু কথা থামাননি। 'প্রশ্ন হ'লো, অভিযানটা সম্ভব কি না? সমীচীন—কিন্তু সমস্যাটা এই—সম্ভব কি না। গতকাল অব্দি এ নিয়ে কোনো প্রশ্নই ওঠেনি, কেননা সত্যিকার কোনো বড়ো-ঝামেলায় আমরা অ্যাদ্দিন পড়িনি। সেটা কি আপনারও মত নয়?'

'তা ঠিক। কোনো বড়োরকমের কোনো গণ্ডগোল হয়নি।'

'সবচেয়ে-গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা ঘটেছে কাল : আমাদের রক্ষিদলের এই অদৃষ্টপূর্ব বদল—শুধু তা-ই নয়, একলাফে সংখ্যাটা একশো থেকে কুড়িতে নেমে এসেছে। এই নাইজার নদীর তীর ধ'রে যাবার সময় মাত্র কুড়িজন লোক আমাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবে তো? আমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না তো তাতে? আমার প্রশ্ন এখন এটাই।'

'ঐভাবে প্রশ্নটা সাজালে উত্তর অবিশ্যি একটাই হয় : না, তাতে আমাদের নিরাপত্তার কোনো হানি হবে না। রাস্তায় শুধু-যদি দু-একটা আফ্রিকি দল আমাদের ওপর হামলা করে, তাহ'লে এই কুড়িজন লোকই যথেষ্ট। অন্যান্য অভিযানকারীরা এর চেয়েও কম রক্ষী নিয়ে আফ্রিকায় ঘুরে বেড়িয়েছেন, কারু-কারু সঙ্গে তো কোনো রক্ষীও ছিলো না—তবে—'

'আমি জানি আপনি কী বলতে চাচ্ছেন,' মঁসিয় বারজাক আমায় থামিয়ে দিয়েছেন। 'আপনি সেই রহস্যময় অজ্ঞাত লোকটার কথা তুলবেন তো—আমরা যে আফ্রিকায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, সেটা তার মনঃপূত নয়। এ-সম্বন্ধে আমার মতামত আমি কখনও চেপে রাখিনি, আর অন্যরাও আমার মতের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। তারপর থেকে নতুন-কোনো উৎপাতই আর হয়নি। কাজেই সে নিয়ে আর আলোচনা ক'রে কী লাভ?'

'মাফ করবেন, মঁসিয় ল্য দেপুতে, তবে আমার মনে হয় তারপর একটা মস্ত-বড়ো উপদ্রবেরই সূত্রপাত হয়েছে।'

'বাঃ!' মঁসিয় বারজাক চমকে উঠেছেন। 'নতুন-কোনো উপদ্রব? আর, আমার কাছে সেটা চেপে যাওয়া হয়েছে?'

এভাবে কোনঠাশা হ'য়ে একটু সংকোচেই পড়তে হয়েছে আমাকে। আমি নোটবইতে যে-সব কথা লিখেছি, যা তখন আমার গুরুতর ব'লেই মনে হয়েছে, আর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা থেকে যে অনুমানটা করেছিলুম, তাকেও তখন যুক্তিযুক্ত ব'লেই মনে হয়েছে। কিন্তু এখন মুখের কথায় প্রকাশ করতে গিয়ে দেখি, আমার নিজেরই তা বিশ্বাস হচ্ছে না —মনে হচ্ছে তুচ্ছ, নগণ্য-সব খুঁটিনাটি। কিন্তু ঝুলি থেকে খরগোশ যখন একবার বেরিয়ে প'ড়ে ছুট লাগিয়েছে তখন তাকে তাড়া ক'রে যেতে হবে বৈ-কি!

এবং আমি তাড়া ক'রেই গিয়েছি। আমাদের রক্ষিদল এবং তার লিউটেনাণ্ট সম্বন্ধে আমি যা-যা ভেবেছি, সব আমি খুলে বলেছি মঁসিয় বারজাককে। বলেছি যে, রক্ষিদেরও আমার সত্যিকার-সৈন্য ব'লে মনে হয়নি, আর তাদের লিউটেনাণ্টকেও মনে হয়েছে নাটমঞ্চের অভিনেতা। হয়তো সেই অজ্ঞাত শত্রুটিরই ভাড়াটে লোক এরা।

শুনে হো-হো ক'রে হেসে উঠেছেন মঁসিয় বারজাক। 'ওঃ, কী-একখানা রহস্য উপন্যাস ফেঁদেছেন! মঁসিয় ফ্লরেঁস, আপনার কল্পনাশক্তি তো দুর্বার! আপনি নাটক-নভেল লিখলেই পারেন। তবে সত্যিকার জীবনে অমন ক'রে কল্পনার অনুপ্রবেশ দয়া ক'রে আর ঘটাবেন না।'

'অবশ্য...' আমি একটু বিরক্তই হয়েছি এই হাসাহাসিতে।

'*অবশ্য-টবশ্য* কিছু নেই। তথ্যগুলো দেখছেন না কেন? ফরমানটা সরকারি, লিখিত, স্বাক্ষরিত এবং সীলমোহর সংবলিত...'

'জালও তো হ'তে পারে।'

'না, কারণ কাপ্তেন মার্সেনের মনে হয়েছে এটা একটা খাঁটি হুকুমনামা, তিনি কোনো দ্বিধা না-ক'রেই হুকুমটা তামিল করেছেন।'

'সেটা কেউ হয়তো আসল লোকের কাছ থেকে চুরি ক'রে নিয়েছে..'

'এ-তো আরেকখানা রহস্য উপন্যাস! সত্যিকার রক্ষিদলের বদলে তার এই বিকল্প ঠিক-কোনখানে পাওয়া যাবে, বলতে পারেন? নতুন রক্ষিদলের সব্বাইকে কচুকাটা ক'রে খতম ক'রে দেবার মতো লোকবল এবং অস্ত্রবল তো তাদের চাই—সব্বাইকে খতম ক'রে দিতে হ'তে হবে তাদের, *সব্বাইকে*, বুঝেছেন?—তারপর একটা নকল রক্ষিদল বিকল্প হিশেবে খাড়া করতে হবে—হুবহু একরকম নতুন-একদল বদলি এনে দাঁড় করাতে হবে। তাও আগেভাগে ফন্দি এঁটে, যখন কারুই ধারণা নেই নতুন রক্ষিদলে কারা থাকবে, সেটা কেমন হবে, এমনকী সাঁৎ-ওবান কোনোদিন যে এ-রকম কোনো হুকুম দেবেন তাও যখন কেউ জানে না।

'আর লিউটেনাণ্ট ল্যকুরের দলবলের গায়ে যখন আঁচড়টুকুও পড়েনি, তখন ধ'রে নিতে হবে অজ্ঞাত শত্রুর লোকবল ছিলো প্রচণ্ড! কেননা এটা নিশ্চয়ই আশা করেন না যে আসল রক্ষিদল বিনাযুদ্ধেই হার মেনে ব'সে থাকবে! আর আপনি কি ভাবেন এমন-একটা প্রচণ্ড দস্যুদলের কথা কেউ কোথাও ঘুণাক্ষরেও জানবে না? আর এ-রকম যুদ্ধেরও অন্তত কানাঘুষো আমরা শুনতে পাবো না—যখন টেলিগ্রামের চাইতেও



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রুতবেগে ঢাকের আওয়াজে জঙ্গলের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অব্দি সব খবর পৌঁছে যায়? তবেই দেখুন কল্পনার রাশ একবার আলগা ক'রে দিলেই সে কেমন তুলকালাম ছুট লাগায়!'

মঁসিয় বারজাক ঠিকই বলেছেন। তলবপত্রটা চোরাই হ'তেই পারে না।

'আর এই-যে আপনি লিউটেনাণ্ট আর তার দলবল সম্বন্ধে এত-বড়ো তাজ্জব-একটা জিনিশ কল্পনা ক'রে ব'সে আছেন, তার ভিত্তিগুলোই বা কী? এই আফ্রিকি সেপাইরা অন্য আফ্রিকি সেপাইদের চাইতে আলাদা কিসে?'

আমি তাদের একবার চোখ বুলিয়ে আবারও সায় দিতে বাধ্য হয়েছি, মঁসিয় বারজাক ঠিকই বলেছেন। কাল সন্ধেয় আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব কি আমি শিকেয় তুলে রেখে দিয়েছিলুম? নিশ্চয়ই নিজেকে আমি যা-তা ভুল বুঝিয়েছি। এই আফ্রিকি সেপাইরা অন্যসব আফ্রিকি সেপাইদের মতোই তো! সত্যিই, হুবহু একরকম।

'আচ্ছা, না-হয় গোরা সার্জেণ্টদের কথাই ধরুন।' মঁসিয় বারজাকের আপত্তি তখনও শেষ হয়নি। 'ওদের সম্বন্ধে হঠাৎ কী-এমন বিশেষ বৈশিষ্ট্য আপনি লক্ষ করেছেন? সত্যি-যে তারা ভারি নোংরা, কিন্তু কাপ্তেন মার্সেনের কোনো-কোনো সার্জেণ্টের চাইতে বেশি-নোংরা নয়। বিদেশ-বিভুঁয়ে, সারাক্ষণ যেখানে বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে হয়, সেখানে উর্দিটুর্দি সবসময় কড়া ইস্ত্রিকরা ধবধবে-কাচা হবে, এটা ভাবাই ভুল।'

আমি কোনোরকমে তো-তো ক'রে একটা কথা পাড়বার চেষ্টা করেছি। 'কিন্তু লিউটেনাণ্ট ল্যকুর...'

'এ তো ভারি-আজব নালিশ। বোঝাই যাচ্ছে নিজের সাজগোজ সম্বন্ধে তিনি খুব সচেতন। সে তো আর কোনো অপরাধ নয়।'

না, তা নয়। তবু একটা শেষ চেষ্টা করেছি আমি: 'তবে যে-উর্দি দেখে মনে হয় সদ্য-সদ্য দরজির দোকান থেকে বেরিয়েছে, সেটা একটু আজব ব্যাপার।'

'তার কারণ তাঁর অন্য উর্দিটা তাঁর কিটব্যাগে আছে। সেটা নিশ্চয়ই অমনি ধুলোয় মাখামাখি হ'য়ে আছে। মঁসিয় ল্যকুর ভেবেছেন আমাদের সামনে আসার আগে ফরশা জামাকাপড় প'রে আসবেন—যাতে তাঁকে দেখে আমাদের বিরাগ না জ'ন্মে যায়। তাছাড়া লিউটেনাণ্ট ল্যকুরের সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা হয়েছে, কাল বিকেলবেলাতেই। মানুষটা চমৎকার, যদিও এই সাজগোজের ব্যাপারটায় একটু-বেশিই খুঁতখুঁতে—সেটা আমিও মানি। ভদ্র, শিক্ষিত, মার্জিত, এবং অন্যদের সম্মান করতে জানেন। হ্যাঁ, আদবকায়দায় শুধু নয়, ওপরওলাদের শ্রদ্ধাসম্মান করতেও জানেন। ভারি উপাদেয় ব্যবহার আর ওপরওলার কথা মন দিয়ে শোনেন।'

হ্যাঁ, এবার মঁসিয় বারজাকের থলে থেকে তাঁর খরগোশটা বেরিয়ে পড়েছে। এটাই আসল কথা। সংসদের সদস্যকে হয়তো সাতবার সেলাম ঠুকেছেন ল্যকুর।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তা এই লিউটেনান্ট কি,' আমি তখন জিগেস করেছি, 'মনে করেন যে এ-অবস্থায় আমাদের যাত্রা অব্যাহত রাখায় কোনো অসুবিধে হবে?'

'মোটেই না।'

'অথচ আপনার তবু দ্বিধা ঘুচছে না, মঁসিয় ল্য দেপুতে!'

'আর আমি দ্বিধা করবো না।' আমার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়েই মনস্থির ক'রে নিয়েছেন মঁসিয় বারজাক। 'সব দ্বিধা আমি ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি। আমরা কালকেই *আবার* রওনা হ'য়ে পড়বো।'

'এমনকী এটা না-ভেবেই যে এই অভিযান কোনো কাজে লাগবে কিনা—যদি শেষ অব্দি যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবও হয়?'

আমার কথার সূক্ষ্ম টিটকিরিটা মঁসিয় বারজাক খেয়ালই করেননি। 'এই অভিযান শুধু কাজেরই নয়, এটা একান্তই *জরুরি*।'

'*জরুরি?*'

এতক্ষণে মঁসিয় বারজাকের মেজাজ বেশ খুশ হ'য়ে এসেছে। অন্তরঙ্গভাবে আমার হাতটা ধ'রে গোপন কথা ফাঁস ক'রে দেবার ভঙ্গিতে বলেছেন : 'আমাদের নিজেদের মধ্যে ব'লেই বলছি, দেখবেন আবার যাতে পাঁচকান না-হয়, এখন আমি মেনে নিতে রাজি আছি, সম্প্রতি যে-সব আফ্রিকিদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে, তাদের ভোটের অধিকার দেয়া ও যা, না-দেয়াও তাই—*ইওরোপিয় গণতন্ত্রের* কোনো ধারণাই এদের নেই। আপনি যদি চাপ দেন, তবে এও মানতে রাজি আছি যে উপকূল ছেড়ে যত-ভেতরে যাবো ততই এই ধারণা পালটাবার তেমন-একটা কারণও হয়তো হবে না। তবে আপনাকে এ-কথা এখানে দাঁড়িয়ে বলছি বটে, কিন্তু সংসদে দাঁড়িয়ে এ-কথা আমি কিছুতেই বলবো না। কিছুতেই না।

'ধরুন, আমরা যদি অভিযানের শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুই, তবে যা হবে তা এই : বোদ্রিয়ের আর আমি—আমরা দুজনে এমন-দুটো প্রতিবেদন পেশ করবো, যা পরস্পরের একেবারে বিপরীত হবে—তারপরে একটা কমিশন বসবে এগুলো নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে। তারপর আমরা যদি একটু আপোষরফা করি, তাহ'লে উপকূলের কাছাকাছি যে-সব উপজাতি থাকে তাদের ভোটের অধিকার দেয়া হবে, যার মানে দাঁড়াবে আমারই জয় হয়েছে—আর নয়তো কোনো রফা-টফা না-হ'লে ব্যাপারটা মুলতুবি থাকবে এবং ধামাচাপা প'ড়ে যাবে। একহপ্তা বাদে কেউই এ নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না, কেউই জানতে চাইবে না আমি যে-প্রতিবেদন পেশ করেছি তার কতটাই বা ঠিক, আর কতটাই-বা অলীক, মনগড়া। এ-দুটোর মধ্যে যা-ই হোক না কেন, বোদ্রিয়ের বা আমি—কেউই কোনোদিনও উপনিবেশ দফতরের ভার পাবো না। কিন্তু আমি যদি মাঝপথেই ফিরে যাই, শেষ অব্দি যদি আর না-যাই, তবে এ প্রায় প্রকাশ্যেই ঘোষণা ক'রে দেয়া হবে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে আমি ভুল করেছিলুম : আমার শত্রুরা গলা ফাটিয়ে বলবে যে আমি নিতান্তই একটা গণ্ডমূর্খ বৈ কিছু নয়—এবং তা যদি হয়, তবে আমি চিরকালের মতো রাজনৈতিক জগৎ থেকে হারিয়ে যাবো।'

মঁসিয় বারজাক একটু থেমে, দম নিয়ে, এই ব'লে শেষ করেছেন : 'এই সত্যটা কখনও ভুলে যাবেন না, মঁসিয় ফ্লরেঁস : রাজনীতিতে যে-কেউই ভুল করতে পারে, তাতে কিছুই এসে-যায় না, কিন্তু যেই এ-কথা সে একবার কবুল করেছে তবে তার ভবিষ্যৎটাই ঝরঝরে হ'য়ে গেছে।'

তাঁর এই প্রজ্ঞাবাক্য শুনে আমি পরম পরিতোষ লাভ করেছি। যাক, এবারে আমি সকলেরই অভিপ্রায় জানি—কে কেন, কোন্ উদ্দেশ্যে, এই অভিযানে বেরিয়েছে।

বিকেলবেলায় আমি তোঙ্গানেকে নিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে বেরিয়েছিলুম—এখন সে ৎশুমুকিরই ঘোড়ায় চড়ছে, কেননা তার নিজের ঘোড়ার চাইতে এটা অনেক ভালো জাতের। আমরা দুলকিচালে চারপাশ দেখতে-দেখতে এগুচ্ছি, এমন সময়—নিশ্চয়ই তার জিভ চুলবুল করছিলো—তোঙ্গানে হঠাৎ বলেছে : 'ৎশুমুকি যে কেটে পড়েছে, খুব-ভালো হয়েছে। সে একটা কালো শয়তান! পাজির পাঝাড়া! বেইমান!'

অ্যাঁ? ৎশুমুকিও তাহ'লে আমাদের ভেলকি দেখাতে চাচ্ছিলো না কি? শুনেই আমার আক্কেলগুড়ুম হ'য়ে গেছে। কিন্তু এবার পুরো ব্যাপারটাই ভালো ক'রে তাহ'লে যাচিয়ে নেয়া উচিত। আমি অবাক হবার ভান ক'রে বলেছি : 'ও! তুমি মোরিলিরের কথা বলছো?'

'মোরিলিরেটাও পাজির পাঝাড়া।' তোঙ্গানে সোৎসাহে ব'লে উঠেছে। 'তবে ৎশুমুকিটাও নচ্ছার—ঠিক মোরিলিরেরই মতো। আমাদের চলায় যাতে ফ্যাসাদ বাধায় সেইজন্যে পাজিগুলো বিস্তর *দোলো তুবাব* (শাদাদেরব্র্যাণ্ডি), আর অনেক সোনাদানা ছড়িয়েছে, কুলি আর সহিসদের মধ্যে।'

মোরিলিরে আর ৎশুমুকির হাতে সোনাদানা? এ-যে অবিশ্বাস্য। 'তুমি বলতে চাচ্ছো তারা যাতে যেতে না-চায় সেইজন্যে মোরিলিরেরা তাদের কড়ি দিয়েছে?'

'না, কড়ি নয়। সোনা। অনেক সোনা।' ব'লে সে আরো-একটা কথা বলেছে, তাতে আবারও আমার আক্কেলগুড়ুম হ'য়ে গেছে। 'অনেক সোনা—ইংরেজি সোনা!'

'তুমি তাহ'লে ইংরেজদের টাকা চেনো, তোঙ্গানে?'

'ইও,' তোঙ্গানে বলেছে। 'আমরা হলাম আশান্তি। আমি *পাউণ্ড-স্টার্লিং* চিনি।'

সোনা—*ইংরেজদের পাউণ্ড-স্টার্লিং*—আর তা কিনা ৎশুমুকি আর মোরিলিরের হাতে!... সত্যি, আমার চোখ কপালে উঠেছে। কিন্তু আমি এমন ভান করেছি যেন খবরটায় আমি কোনো গুরুত্বই দিচ্ছি না। 'তুমি বেশ লোক, তোঙ্গানে। আমি তোমার কথা সবাইকে বলবো। আর তুমি যখন *পাউণ্ড-স্টার্লিং* চেনো, তখন এই নাও ফরাশি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনা—এ টাকার ওপর ফরাশি প্রজাতন্ত্রের ছাপ মারা আছে।'

'ভালো প্রজাতন্ত্র ! ফরাশিদেশ !' আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে তোঙ্গানে ব'লে উঠেছে। আমি তাকে যে *ফ্রাংকটা* দিয়েছি সেটা সে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে খুশিতে ডগমগ হ'য়ে ফের লুফে নিয়েছে, তারপর নিজের পাশে লাগানো থলেটায় সেটা পুরতে গেছে—কিন্তু ভেতরে হাত ঢোকাবামাত্র তার মুখে-চোখে একটা বিস্ময়ের ছাপ খেলে গেছে—ভেতর থেকে সে একবাণ্ডিল কাগজ বার ক'রে এনেছে। দেখেই, আমি অস্ফুট একটা চীৎকার ক'রে তার হাত থেকে কাগজের তাড়াটা ছিনিয়ে নিয়েছি।

আরে ! এ-যে আমার সেই লেখাগুলো। যে-প্রতিবেদনগুলো আমি ৎশুমুকিকে দিয়েছিলুম ডাকে দিতে ! সব কি না—হায় !—এই পাজির পাঝাড়া ৎশুমুকির ঘোড়ার জিনের থলেতে ! *ল্যক্সপানসিয়ঁ ফ্রাঁসেঈতে* সবাই আমাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাববে ! আমার মানসম্মান ধুলোয় লোটাবে, চিরকালের মতো সাংবাদিক হিশেবে আমার মুখে চুনকালি প'ড়ে যাবে !

আমার মাথাটা বোঁ ক'রে ঘুরে গেলেও, আমরা আগের মতোই দুলকিচালে ঘোড়ার পিঠে ক'রে চলেছি। শিবির থেকে মাইল-তিনেক দূরে এসেই আমি হঠাৎ লাগাম টেনে থমকে গিয়েছি। এ-কী অদ্ভুত দৃশ্য চোখের সামনে?

প্রায় রাস্তার পাশেই, ছ-সাত গজ চওড়া আর প্রায় পঞ্চাশ গজ লম্বা, একটুকরো জমি, ঝোপের ঠিক মাঝখানেই সাফ করা। সে জায়গাটায় ঘাস চেপটে গিয়েছে, থেঁৎলে জমির সঙ্গে মিশে গিয়েছে, কোনো অতিকায় কাস্তে দিয়ে কেউ আবার সেগুলো যেন কেটেওছে জায়গায়-জায়গায়, তার ওপর—আর তাইতেই আমার ছানাবড়া চোখ আটকে গিয়েছে—অমনভাবে সাফ-করা জমির ওপর সমান্তরাল দুটো গভীর দাগ, যেমন আমরা দেখেছিলুম কান্‌কানের কাছে, প্রায় চারইঞ্চি-গভীর লম্বা দাগ। এবার দাগটা পুবদিকে যেন গভীরভাবে ডেবে বসেছে। এই গভীর-খাঁজ-ক'রে-বসা দাগগুলোর সঙ্গে কেমন ক'রে যেন আমার স্মৃতিতে সেদিন সন্ধেয় যে অদ্ভুত-গুমগুম গর্জনটা শুনেছিলুম, তা ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছে। কান্‌কানেও অমন অদ্ভুত গুমগুম কানে এসেছিলো, আর তারপরেই মাটির ওপর অমন চারইঞ্চি-গভীর সমান্তরাল দাগগুলো দেখেছিলুম আমরা।

কী সম্পর্ক আছে এগুলোর মধ্যে ? এই-যে গুমগুম গর্জন, জোড়া-জোড়া সমান্তর খাঁজ, আর কান্‌কানের সেই *কেনিয়ালালার* ? নিশ্চয়ই কোনো সম্বন্ধ আছে, নইলে আমার স্মৃতির মধ্যে তারা এমনভাবে জড়িয়ে যাবে কেন। এই দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মতো গভীর খাঁজগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি যখন ব্যাসকূটটা ভাঙবার চেষ্টা করেছি, অমনি আমার অবচেতন মন ঐ ভেলকিবাজ *কেনিয়ালালার* মূর্তিটা চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলেছে। এখন যেন অদ্ভুত-ক্রূর ও কুৎকুতে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ঐ *কেনিয়ালালা* বলছে : কেমন ? চারটে ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে, দুটো তো আগেই ফলেছিলো—এখন তৃতীয়টাও



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিলে গেলো তো? ফ্লরেঁস, তোমার প্রতিবেদন ফ্রান্সে গিয়ে পৌঁছুতেই পারেনি!

সেখানে, ঐ পরিত্যক্ত জঙ্গলের কাছে, ধূ-ধূ মাঠের মধ্যে, আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা ঠাণ্ডা শিহরন খেলে গেলো—কালই একবার শিউরে উঠেছিলুম—অতএব এই দ্বিতীয়বার একটা ঠাণ্ডা শিহরন আমার সর্বাঙ্গে খেলে গিয়েছে। আর এই প্রথমবার এই দুর্বোধ প্রহেলিকাজালের মধ্যে কেঁপে উঠে আমি আবিষ্কার করেছি আমি সত্যিই এবারে বিষম ভয় পেয়ে গিয়েছি।

তবে ভয়ের ভাবটাকেই পরক্ষণে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে উগ্র কৌতূহল। এমনিতেই আমি ভয় পেতে খুব-একটা অভ্যস্ত নই—আমার দুর্বলতা, ঔৎসুক্য। তাই ফিরে যেতে-যেতে আমি বারে-বারে ঐ প্রহেলিকাটার একটা মীমাংসা করবার চেষ্টা করেছি, আর উত্তর হাৎড়াতে গিয়ে আমার মাথাটা বোঁ ক'রে ঘুরে উঠেছে।

শিবিরে পৌঁছেই আমি লাফিয়ে নেমেছি ঘোড়া থেকে। তোঙ্গানে, বলা নেই কওয়া নেই, আচমকা ব'লে উঠেছে : '*তুলতি*গুই মোটেই ভালো লোক নয়। মুখপোড়া বাঁদরের মতো মুখ!'

আমি না-ভেবেই ব'লে উঠেছি (কিছুই যে ভাবিনি, এটাই আমার কৈফিয়ৎ হবে), 'তা-ই নিশ্চয়ই!'

১৭*ই ফেব্রুয়ারি*। আজ একটা লম্বা সফর। কাল ছিলো আরো-লম্বা। দু-দিনের মধ্যে তিরিশমাইল! ৎশুমুকি আর ফিরে আসেনি—রাস্কেল!—কেউ তাকে চোখেও দ্যাখেনি। তোঙ্গানেই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের, আর আমাদের কুলি আর সহিসরা চমৎকারভাবে সাড়া দিয়েছে—তাদের পায়ে যেন নতুন ফুর্তি, নতুন উৎসাহ এসে ভর করেছে।

এটা কবুল করা ভালো, গত দু-দিনে আমার সন্দেহ অনেকটাই উবে গিয়েছে। রক্ষিদল বিনাবাক্যব্যয়ে তাদের দায়িত্ব পালন ক'রে গেছে, তবে তেমন-একটা কঠিন-কোনো দায়িত্বও ছিলো না। দুটো সারে কুড়িজনে পাশে-পাশে গেছে কনভয়ের, কাপ্তেন মার্সেনের সেপাইরা যেমন যেতো। শুধু একটা জিনিশ লক্ষ করেছি : আগে কাপ্তেন মার্সেনের লোকজন কুলি-সহিসদের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি ক'রে সারাটা পথ জমিয়ে রাখতো, এরা যেন মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছে, কেউ একটা কথাও বলে না। একেই বলে আইনশৃঙ্খলার পরাকাষ্ঠা।

সার্জেন্ট দুজন যদি মাঝে-মাঝে অন্য সেপাইদের তদারক না-করে তো পেছনেই থাকে কনভয়ের। তারা নিজেদের সেপাই ছাড়া কারু সঙ্গে কোনো কথা বলে না। মাঝে-মাঝেই তারা কড়াসুরে তাদের সেপাইদের হুকুম দেয়, আর তারাও অমনি কোনো কথা না-ব'লে নীরবে তা তামিল করে। আমাদের রক্ষিদল সংখ্যায় নগণ্য হ'তে পারে, কিন্তু শৃঙ্খলায় সবাইকেই ছাপিয়ে যায়।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিউটেনান্ট ল্যকুর থাকেন কনভয়ের সামনে, মঁসিয় বারজাকের পাশে, ঠিক যেমন কাপ্তেন মার্সেনে থাকতেন। মাদমোয়াজেল মোরনাস—লক্ষ করলুম—কয়েক কদম পেছিয়ে পড়েছেন। ডাক্তার শাতোনে আর মঁসিয় পঁসাঁর পেছনে, সাঁৎ-বের‍্যাঁর সঙ্গেই তিনি থাকেন সবসময়। তাঁকে দেখে মনে হয় না লিউটেনান্টের সান্নিধ্য তাঁর খুব একটা ভালো লাগছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার গাটা ছমছম করে। হয়তো মঁসিয় বারজাকই ঠিক। সবটাই আমার কল্পনা। তবু মনে হয় কেন যেন সবকিছুই বেঢপ আর বেখাপ্পা। আমি যেন ঝোপে-ঝোপে নেকড়ে দেখতে শুরু ক'রে দিয়েছি, যেদিকেই তাকাই সেদিকেই যেন নেমকহারাম বেইমানদের দেখি। কেন দেখি, বলি, শুনুন।

আজকেই সকালে, নটা নাগাদ। আমরা একটা ছোট্ট গাঁয়ের মধ্য দিয়ে চলেছি, পুরো গাঁটাই কেমন খাপছাড়ারকম ফাঁকা, হঠাৎ এমন সময় একটা কুঁড়ের মধ্য থেকে কার যেন গোঙানির আওয়াজ কানে আসে।

মঁসিয় বারজাকের নির্দেশে কনভয় তক্ষুনি থেমে গিয়েছে, আর ডাক্তার শাতোনে—লিউটেনান্ট ল্যকুর আর দুজন সেপাইয়ের সঙ্গে—সেই কুঁড়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। বলাই বাহুল্য, সংবাদপত্রের প্রতিনিধিও গিয়েছে সঙ্গে।

আর কুঁড়েটায় ঢুকেই এক করুণ দৃশ্য চোখে পড়েছে আমাদের। সেখানে দুটো মৃতদেহ প'ড়ে আছে, আর একজন আহত লোক—সারাগায়ে জখম। বীভৎস দৃশ্য, ভয়াল—মৃতদেহ দুটো বয়স্ক নারীপুরুষের—সে-দুটো ভয়াবহভাবে ছিন্নভিন্ন! বেচারাদের এমনভাবে খুন করেছে কে? কে-ই বা এই লোকটাকে এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত ক'রে রেখে গেছে?

ডাক্তার শাতোনে তক্ষুনি আহত লোকটিকে নিয়ে পড়েছেন। কুঁড়ের ভেতরটা বেজায় অন্ধকার ব'লে সেপাই দুজনকে বলেছেন এই আহত লোকটিকে বাইরে ব'য়ে নিয়ে আসতে—বাইরে। লোকটা এক বুড়ো আফ্রিকি। কাঁধটার চোটই ভয়ংকর—পুরো অক্ষকান্থিটাই হাঁ হ'য়ে বেরিয়ে এসেছে। আমি শুধু ভেবেছি, সে-কোন সাংঘাতিক অস্ত্র এমন ভয়াবহ ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে।

ডাক্তার শাতোনে ক্ষতটা পরিষ্কার করেছেন আর সেখান থেকে অজস্র লোহাচুর বেরিয়ে এসেছে। তিনি মাংস টেনে জুড়ে দিয়ে শেলাই ক'রে দিয়েছেন। তারপর ভালো ক'রে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন—আর লিউটেনান্ট ল্যকুর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সব জিনিশপত্র জুগিয়ে গেছেন। আর সারাক্ষণ রুগি অসহ্য যন্ত্রণায় কাৎরে উঠেছে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ হ'য়ে যেতেই মনে হ'লো তার যন্ত্রণা বোধহয় একটু কমেছে। অথচ ডাক্তারের মুখচোখে তখনও উদ্বেগের চিহ্ন মোছেনি। তিনি দ্বিতীয়বার কুঁড়েটার মধ্যে গিয়ে মৃতদেহ দুটোকে আরেকবার দেখে এসেছেন এবং তাঁর মুখে উদ্বেগের চিহ্নটা আরো-উগ্র হ'য়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুটে উঠেছে। তোঙ্গানের সাহায্যে জখম লোকটাকে তারপর তিনি জেরা করেছেন। আর এই হতভাগ্য আফ্রিকির কাহন থেকে এটাই ফুটে বেরিয়েছে যে, ছ-দিন আগে—তাহ'লে সে নিশ্চয়ই ১১ই ফেব্রুয়ারি, আমাদের রক্ষিদল বদল হবার তিন দিন আগে—এই একরত্তি গ্রামটা দুই-দুজন গোরা লোকের নেতৃত্বে একদল আফ্রিকির হাতে একেবারে ছারখার হ'য়ে যায়। যে-নারীপুরুষের মৃতদেহ আমরা দেখেছি, তারা দুজন সময়মতো পালাতে পারেনি—গাঁয়ের বাকি-সবাই প্রাণ হাতে ক'রে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলো। এই আহত লোকটাও অন্যদের সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু ছোটবার সময় তার কাঁধে এসে একটা গুলি লাগে। তবু সে তখন লুকিয়ে পড়তে পেরেছিলো। পরে তার সঙ্গীরা তাকে কাঁধে ক'রে ব'য়ে এনেছে গাঁয়ে, কিন্তু যেই দেখেছে আরেকদল সেপাই আসছে, অমনি সবকিছু ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে চম্পট দিয়েছে। প্রথম দলটা যেদিক দিয়ে গিয়েছিলো, সেপাইদের দ্বিতীয় দলটা ঠিক সেদিক থেকেই আসছিলো।

খুব-একটা উপাদেয় কাহিনী। এমন-সব নরাধম যে এমনভাবে ঘুরে-ঘুরে লুঠতরাজ চালিয়ে যাচ্ছে, এটা মোটেই প্রাণের আরাম এবং আত্মার শান্তি বাড়িয়ে দিতে পারে না। ভাগ্যিশ এই নরাধমদের সঙ্গে পথে আমাদের মোলাকাৎ হয়নি।

এই বেচারা উচ্ছ্বসিতভাবে ডাক্তার শাতোনেকে তার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছিলো, এমন সময় হঠাৎ তার চোখে এক বিজাতীয় আতঙ্ক ফুটে উঠেছে এবং সে চুপ ক'রে গেছে —যেন আমাদের আশপাশে বা পেছনেই সে কোনো বিভীষিকা দেখতে পেয়েছে। আমরা তড়াক ক'রে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি আমাদের সার্জেন্ট দুজনের একজন—তাকে দেখেই যেন আহত লোকটা বিভীষিকা দেখে আঁৎকে উঠেছে।

সার্জেন্টকে মোটেই কিন্তু বিচলিত দেখা যায়নি। সে শুধু বিচলিত হয়েছে তখনই, যখন হিমজমাট কড়াচোখে লিউটেনান্ট ল্যকুর তার দিকে তাকিয়েছেন—সে-দৃষ্টিতে তিরস্কার বা ভর্ৎসনা আছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি আছে হুমকির ভাব। এই জ্বলন্ত চাউনিটার অর্থ আমি কিন্তু ঠিক ধরতে পারিনি। সার্জেন্ট শুধু তার মাথাটা ছুঁয়েছে একটা আঙুল দিয়ে, এমন ভঙ্গি করেছে যেন জখম লোকটা বিকারের ঘোরে বেদম ভুল বকতে শুরু ক'রে দিয়েছে।

আমরা আবার আমাদের রুগির দিকে তাকিয়েছি। কিন্তু কৃতজ্ঞতা যে-কুহক সৃষ্টি করেছিলো সেটা তখন আর সেখানে নেই। আতঙ্কে তার চোখদুটি বিস্ফারিত। আর আমরা তার কাছ থেকে একটা কথাও বার করতে পারিনি। তাকে আবার ব'য়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কুঁড়েটাতেই, আর এ-যাত্রায় সে বুঝি বেঁচেই গেলো এই ভরসা নিয়েই আমরা ফিরে গিয়েছি। কেননা ডাক্তার শাতোনের ধারণা ঘাটা শিগগিরই শুকিয়ে যাবে।

আমার সঙ্গীরা কী ভেবেছে জানি না, তবে ফিরে যেতে-যেতে আমি সারাক্ষণ এই নতুন ধাঁধাটাকে মনের মধ্যে উলটে-পালটে দেখেছি। ঐ আফ্রিকি হঠাৎ অমন-অস্বাভাবিক



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয় পেয়ে গেলো কেন? লিউটেনান্ট ল্যকুরকে দেখে সে তো ঘাবড়ে যায়নি, তাহ'লে তাঁর একজন গোরা সার্জেন্টকে দেখে সে অমন ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছে কেন?

সন্ধেবেলায়, বেশ-একটু রাত হ'য়ে যাবার পরই, আমরা কাদু নামে একটা ছোট্ট গাঁয়ের ধারে আমাদের তাঁবু ফেলেছি। কাদুতে পৌঁছেই আমাদের মনটা খারাপ হ'য়ে গেছে, কেননা এখানেই মাদমোয়াজেল মোরনাস আর সাঁৎ-বের্ঁা আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্য-একটা পথ ধরবেন। আমরা যাবো নাকরবাবর, সোজা সামনে, উয়াগাদুগু আর নাইজারের দিকে, তাঁরা যাবেন গাও—আর সেই একই নাইজারকে তাঁরা ধরবেন অন্যখানে।

বলাই বাহুল্য, আমরা তাঁদের অনেক সমঝেছি, এই বাতুল সফরের পরিকল্পনাটা বাতিল ক'রে দিতে। কিন্তু আমাদের যুক্তিতর্ক অনুরোধে কোনোই ফল হয়নি। কাপ্তেন মার্সেনের ভাবী-অর্ধাঙ্গিনী খুব যে একটা নরম ধাতের মানুষ হবেন, তা আমার মনে হয় না। তাঁর মাথায় যদি কোনো বাই চাপে, তবে শয়তানেরও সাধ্য নেই তাঁকে এককোঁটা টলাতে পারে।

শেষটায়, মরীয়া হ'য়ে, আমরা লিউটেনান্ট ল্যকুরকেই অনুরোধ করেছি, তিনি যদি একটু বুঝিয়ে বলেন—আলাদা পথটায় গিয়ে কী বিপদের মধ্যেই না তাঁদের পড়তে হবে! সন্দেহই ছিলো না তাঁর সব চেষ্টাও নিশ্চয়ই মাঠে মারা যেতো, কিন্তু তিনি মাদমোয়াজেল মোরনাসকে বোঝাবার কোনো চেষ্টাই করেননি, উলটে বরং মুচকিই হেসেছেন একটু, কিন্তু এই মুচকি হাসির কোনো কারণ আমি খুঁজে পাইনি।

তো, আমরা তো কাদুর কাছে এসে তাঁবু গেড়েছি। যেই আমি আমার তাঁবুতে ঢুকতে যাবো, হঠাৎ ডাক্তার শাতোনে আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন। 'একটা কথা আপনাকে আমি বলতে চাই, মঁসিয় ফ্লরেঁস, যে-বুলেট ঐ আফ্রিকিদের গায়ে গিয়ে লেগেছিলো সেগুলো ছিলো বিস্ফোরক—শরীরের মধ্যে গিয়ে ফেটে যায়।' তারপর, আমার উত্তরের কোনো অপেক্ষা না-ক'রেই তিনি চ'লে গিয়েছেন।

এ-যে দেখছি আরো-একটা রহস্য! বিস্ফোরক বুলেট? ভেতরে গিয়ে ফেটে পড়ে? কারা এমন বুলেট ব্যবহার করে? আর এ-দেশে এমন অস্ত্রশস্ত্রই বা এলো কোত্থেকে?

*১৮ই ফেব্রুয়ারি*। কোনো মন্তব্য বিনাই, সর্বশেষ সংবাদ! আমাদের রক্ষিদল কেটে পড়েছে। কেটে পড়েছে, মানে উধাও, অদৃশ্য, না-পাত্তা।

এ, অথচ, একেবারেই অবিশ্বাস্য, আবারও জানাচ্ছি : আমাদের রক্ষিদল আমাদের ফেলে রেখে চ'লে গেছে। তিন-চার ঘণ্টা আগে, ঘুম থেকে উঠে, তাদের কাউকেই আর আমরা দেখতে পাইনি। তারা যেন কর্পূরের মতোই উবে গিয়েছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলির মতো মিলিয়ে গেছে রাত্রির অন্ধকারে, আর তাদের সঙ্গে গেছে সব সহিস, সব কুলি,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের সঙ্গে যারা ছিলো, *সবাই*।

স্পষ্ট তো ? লিউটেনান্ট ল্যকুর, তাঁর দুই গোরা সার্জেন্ট, তাঁর কুড়িজন আফ্রিকি সেপাই আজ সকালে হজমের গোলমালের জন্যে হাঁটতে বেরোয়নি, ব্যায়াম করতেও বেরোয়নি। তারা লাঞ্চের সময় ফিরে আসবে না। তারা চ'লে গেছে—সদলবলে অ-ন্ত-র্হি-ত।

এইখানে, বিদেশ-বিভুঁয়ে, জঙ্গলের মধ্যে, আমরা পাঁচজন, আমরা আর তোঙ্গানেই শুধু আছি—সঙ্গে আছে আমাদের ঘোড়া, আমাদের যার-যার নিজস্ব অস্ত্রশস্ত্র, ছত্রিশটা গাধা, আর পাঁচদিনের উপযোগী রসদ।

বাঃ, আমি-না অ্যাডভেনচার চেয়েছিলুম...



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগারো

# কিংকর্তব্য

১৮ই ফেব্রুয়ারি কাদুতে বারজাকের মিশনের সদস্যরা ঘুম থেকে উঠেই ভড়কে গেলেন। তাঁদের রক্ষিদল আর যত কালো সহিস বা কুলি ছিলো সবাই উধাও! দেখে সকলেরই চক্ষুস্থির! এই দু-পল্লা দলত্যাগ এমনই অপ্রত্যাশিত ও চমকপ্রদ, বিশেষ ক'রে রক্ষিদলের পিঠটান, যে গোড়ায় ব্যাপারটা তাদের বিশ্বাসই হ'তে চায়নি। চোখ রগড়ে গোড়ায় তাঁরা ভেবেছেন সবাই একযোগে কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছেন না তো! কিন্তু তারপরেই এসেছে প্রমাণ, এরা গেছে আর-কখনও ফিরবে না ব'লেই।

আমেদে ফ্লরেঁস, তাঁর আক্কেলগুড়ুম ভাবটা কেটে যাবার পর, সকলের কাছে গিয়ে দুঃসংবাদটা ভেঙেছেন, আর অমনি সবাই এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন। প্রথমটায়, স্বভাবতই, কারু কোনো বাক্যস্ফূর্তি হয়নি—অস্ফুট বিস্ময়ধ্বনি করা ছাড়া চিন্তাভাবনা করার মতো দশাই কারু ছিলো না। এবার তাঁরা কী করবেন, ঐ নিয়ে কিছু বলতে গেলেই তাঁদের কণ্ঠ থেকে শুধু বিস্ময়ধ্বনিই বেরিয়েছে।

পাশের ঝোপটার মধ্য থেকে যখন একটা গোঙানির শব্দ কানে এসেছে, তখন তাঁরা বুঝতে পেরেছেন তাঁরা যে ভেবেছিলেন শুধু-তাঁরাই এখানে প'ড়ে আছেন, এই ধারণাটা আদপেই ঠিক নয়। অমনি তাঁরা ছুটে গিয়েছেন যেখান থেকে ঐ গোঙানিটা আসছিলো, গিয়ে দ্যাখেন তোঙ্গানে সেখানে প'ড়ে আছে হাত-পা বাঁধা, মুখে কাপড় বাঁধা, আর তার ওপর গায়ের একপাশে একটা ক্ষতচিহ্ন।

তার বাঁধন খুলে দিয়ে প্রাথমিক শুশ্রূষার পর, একটু যখন চাঙ্গা ক'রে তোলা গেছে, তখন তাকে একের পর এক প্রশ্ন করেছেন তাঁরা। কিছুটা তার নিজের ভাষায়, কিছুটা বাম্বারায়, একটা-দুটো ভাঙা ফরাশিতে, সে তাঁদের খুলে বলেছে এই দলত্যাগের দৃশ্যের সে যা-কিছু দেখেছে।

কতগুলো অদ্ভুত আওয়াজ শুনে শেষরাতেই তার ঘুম ভেঙে যায়। অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দ্যাখে কুড়িজন সেপাই ঘোড়া ছুটিয়ে চ'লে যাচ্ছে। এদিকে লিউটেনান্ট ল্যকুর তাঁর দুই সার্জেন্টকে নিয়ে সব কুলি আর সহিসকে তাড়া লাগিয়েছেন—তারা যে কী করছিলো তোঙ্গানে তা দেখতে পায়নি। এতক্ষণ অব্দি তার কোনো সন্দেহ হয়নি, শুধু কৌতূহলের বশে সে উঠে তাদের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলো—এমন শেষরাতে উঠে তারা করছেটা কী।

সে তাদের কাছেই যেতে পারেনি। মাঝপথেই দুটি ষণ্ডামতো লোক তার ওপর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝাঁপিয়ে পড়েছে, একজন এমনভাবে তার টুঁটি টিপে ধরেছে যে সে টুঁ শব্দটিও করতে পারেনি। তক্ষুনি তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলে তার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে মুখটা বেঁধে, হাত-পা বেঁধে, তাকে ওভাবে ফেলে রেখেছে। তবে তখন সে এটুকু দেখতে পেয়েছে আফ্রিকিরা সবাই—তল্পিবাহক এবং সহিস, সবাই—অগুনতি বাণ্ডিল তাদের কাঁধে চাপিয়ে নিচ্ছে। সব রসদপত্র, সব।

তোঙ্গানেকে ওভাবেই মাটিতে ফেলে রেখে ষণ্ডা দুটো চ'লে যাচ্ছিলো, এমন সময় লিউটেনাণ্ট ল্যকুর চাপাগলায় জিগেস করেছেন : 'ওদিককার সব ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে তো ?'

'হ্যাঁ,' উত্তর দিয়েছে গোরা সার্জেণ্টদের একজন।

একটু চুপ হ'য়ে গিয়েছে সবাই। তোঙ্গানের মনে হয়েছে কে যেন ঝুঁকে প'ড়ে তাকে লক্ষ ক'রে দেখছে। হাত দিয়ে কে যেন তার শরীরে পরীক্ষা ক'রে দেখছে।

'আহাম্মক একেকটা !' রূঢ় স্বরে বলেছেন লিউটেনাণ্ট। 'তোমরা কেটে পড়ছো, অথচ যাবার আগে একটা বদমায়েশকে ফেলে রেখে যাচ্ছো, যে হয়তো বড্ড-বেশি চোখে দেখে ফেলেছে। বুড়বাক কাঁহাকা ! রবার্ট, একটা সঙিনের খোঁচায় এটাকে সাবাড় ক'রে দাও তো !'

তক্ষুনি হুকুম তামিল করেছে গোরাদের একজন, কিন্তু শেষমুহূর্তে তোঙ্গানে তার শরীরটায় একটা মোচড় দিতে পেরেছিলো। বুকে বিঁধে যাবার বদলে সঙিনের ফলাটা তার পাশ দিয়ে হড়কে গেছে, তাতে জখমটা দেখতে যত-জমকালো হয়েছে, ততটা সাংঘাতিক হয়নি। অন্ধকারে লিউটেনাণ্ট আর তাঁর স্যাঙাৎরা ভালো ক'রে দেখতে পায়নি, বিশেষ ক'রে তোঙ্গানে তখন এমন-জোরে আর্তনাদ ক'রে উঠেছে যেন তার প্রাণপাখি খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তারপর দম বন্ধ ক'রে প'ড়ে থেকেছে নিঃসাড়। সঙিনের ফলায় রক্তের দাগ দেখেও আততায়ীরা ঠ'কে গিয়েছে।

'খতম তো ?' জিগেস করেছেন লিউটেনাণ্ট ল্যকুর।

'খতম !' রবার্ট নামে লোকটা বলেছে।

তারপর তিনজনে দ্রুতপায়ে সেখান থেকে চ'লে গিয়েছে, তোঙ্গানে আর-কিছুই শুনতে পায়নি। তারপরেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফ্যালে, মুখের মধ্যে গোঁজা কাপড়টা তার প্রায় দম আটকেই দিচ্ছিলো, আর ক্ষত থেকে রক্তও পড়েছিলো প্রচুর। তারপর আর-কিছুই সে জানে না।

এ থেকেই বোঝা গেছে এটা কোনো আকস্মিক অন্তর্ধান নয়, পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। আর এটা বুঝতে পেরেই হতবুদ্ধি হ'য়ে অভিযাত্রীরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাউয়ি করেছেন। শেষটায় স্তব্ধতা ভেঙেছেন আমেদে ফ্লরেঁস, 'গোছানো কাজ। জলদিই সেরেছে সব।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই মন্তব্যটাই বুঝি অধিজ্যতাটা ভেঙে দিয়েছে। কীভাবে এই বিষম পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায়, তক্ষুনি তার জন্যে একটা মন্ত্রণাসভা ব'সে গেছে। প্রথমে অস্ত্রশস্ত্রের একটা খতিয়ান নেয়া দরকার। সাতটা বন্দুক, তার মধ্যে ছটা ছিলো শিকারের জন্যে; দশটা রিভলবার, অজস্র গোলাবারুদ, সাতটা ঘোড়া, ছত্রিশটা গাধা, প্রায় একহাজার পাউণ্ড উপহার-উপঢৌকনের সামগ্রী, আর চার-পাঁচ দিনের উপযোগী রসদ। আপাতত আত্মরক্ষার জন্যে যথেষ্ট হাতিয়ার আছে, বাহনও আছে, আর রসদ নিয়ে ততটা মাথা না-ঘামালেও চলবে, কেননা গাঁয়ে-গঞ্জে খাবারদাবার মিলবে, আর এখন থেকে শিকারও করা যাবে—জঙ্গলের এদিকটায়। কাজেই যেখানেই গিয়ে পৌঁছোন না কেন, ঘরছাড়া দিকহারা, অভিযাত্রীদের দলটাকে অন্তত পার্থিব জিনিশপত্রের জন্যে খাবি খেতে হবে না।

প্রথমে গাধাগুলোর একটা ব্যবস্থা করা জরুরি: অভিজ্ঞ সহিস বা রাখাল ছাড়া এই গাধার দল রাস্তায় একটা মস্ত বাধাই হ'য়ে উঠবে। তারপর এক ছক ক'ষে নেয়া হ'লো। যদি তাঁরা অনেকটা পথ পেরিয়ে যাবার কথা ঠিক ক'রে নেন, পথে অন্তত পাঁচ-ছ জন কুলি ভাড়া ক'রে নিতে হবে, অন্তত উপঢৌকনগুলো ব'য়ে নিয়ে যাবার জন্যে—সেগুলোর বদলেই গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে তাঁরা তাঁদের জন্যে দরকারি রসদপত্র জোগাড় ক'রে নিতে পারবেন। না-হ'লে এই এতসব উপহারসামগ্রী যতই দুর্মূল্য হোক না কেন, সব পথেই ফেলে রেখে যেতে হবে। সঙ্গে ব'য়ে নিয়ে যেতে হ'লে কুলি চাই, না-হ'লে এ-সব পদে-পদে শুধু বাধারই সৃষ্টি করবে।

জেন মোরনাস 'আর সাঁৎ-বের্যাঁ—এই দুজনেই শুধু এখানকার লোকজনের কথাবার্তা বুঝতে পারবে : তারা তক্ষুনি কাদুর বাসিন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে ফেললে। গাঁয়ে লোকেরা তাদের সাদরেই অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো, আর যৎকিঞ্চিৎ উপহার অবিলম্বেই অর্জন করেছিলো গ্রামপ্রধানের অনুকম্পা—যতটা পারে, সে তাদের সাহায্য করলে।

তারই সাহায্যে গাধাগুলো বিক্রি ক'রে দেয়া হ'লো, একেকটার দাম পড়লো দশহাজার কড়ি (তিরিশ ফ্রাংকের মতো হবে), আর সবশুদ্ধু পাওয়া গেলো ৩৫০,০০০ কড়ি। এই কড়ির মারফৎই অন্তত আগামী কুড়িদিনের রসদের মামলাটা চুকলো, এই কড়িতেই পাঁচজন কুলিরও মাইনে দেয়া যাবে—গ্রামপ্রধানই এই পাঁচজন কুলির ব্যবস্থা ক'রে দিলে।

এইসব আদানপ্রদান বিলিব্যবস্থাতেই কয়েকটা দিন কেটে গেছে অভিযাত্রীদের, কিন্তু এ-সময়টা নষ্ট হ'য়েছে বলা যাবে না : তোঙ্গানের পক্ষে এর আগে পথের ধকল সহ্য করা সম্ভব হ'তো না। শেষটায় তার ক্ষত—তেমন গভীর-কোনো ক্ষত ছিলো না—ক্রমেই শুকিয়ে আসতে শুরু করলে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর তাই, ২৩শে সকালবেলায়, ছ-টা ক্যাম্পচেয়ারে গোল হ'য়ে ব'সে, মাঝখানটায় মানচিত্রগুলো বিছিয়ে রাখা হ'লো। তারপর তোঙ্গানে আর মলিককে শ্রোতা হিশেবে পাশে রেখে মঁসিয় বারজাকের সভাপতিত্বে শুরু হ'লো আলোচনা-সভা।

'সভা তাহ'লে শুরু হ'লো,' প্রায় যান্ত্রিকভাবেই বলেছেন তিনি, যেন সংসদের সব দস্তুর তাঁর অজান্তেই তাঁর মুখ ফসকে বেরিয়েছে। 'আমি অধিবেশন শুরু হয়েছে ব'লে ঘোষণা করছি। প্রথমে কে বলতে চান?'

একটু মুচকি হাসি খেলে গিয়েছে সকলের মুখে। আমেদে ফ্লরেঁস, তাঁর আবার শ্লেষপরিহাস খুব আসে, একবারও গলা না-ঝেড়েই বলেছেন, 'আমরা আপনার ভাষণের পরেই বলবো, মঁসিয় ল্য প্রেসিদেনৎ।'

'যা আপনাদের অভিরুচি,' তাকে *মঁসিয় ল্য প্রেসিদেনৎ* বলায় তিনি একটুও অবাক হননি। 'প্রথমে আমাদের বর্তমান অবস্থাটা পর্যালোচনা ক'রে নিতে হবে। এক. আমরা অপ্রস্তুত অবস্থায় অকস্মাৎ আবিষ্কার করেছি আমাদের রক্ষিদল আমাদের ফেলে রেখেই চ'লে গিয়েছে, তবে, দুই. আমাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র আছে বেশ, আর আছে সদাগরি পণ্য, এই বেসাতি প্রধানত উপহারের জন্যেই ছিলো, এবং তিন. আমরা এখন আছি সুদানে, উপকূল থেকে অনেকটাই দূরে।'

এই কথা শুনে মঁসিয় পঁসাঁ তাঁর মস্ত নোটবইটা বার ক'রে এনেছেন তাঁর পকেট থেকে, নাকের ডগায় একটা প্যাঁশনে চাপিয়ে—যে-পঁসাঁ ককখনো কিছু বলতেন না—বলেছেন : 'ঠিক আটশো আশি মাইল নশো আটত্রিশ গজ একফুট এবং পৌনে-পাঁচ ইঞ্চি দূরে—দূরত্বটা আমি মেপেছি আমার তাঁবুর মাঝখানের খুঁটিটা থেকে।'

'এতটা-যথাযথ হবার ঠিক দরকার ছিলো না, মঁসিয় পঁসাঁ,' বারজাক মন্তব্য করেছেন। 'এটা বললেই চলবে যে আমরা *প্রায়* নশো মাইল চ'লে এসেছি কোনাক্রি থেকে। আপনারা নিশ্চয়ই অনবগত নন, আমাদের অভিপ্রায় ছিলো আরো-এগিয়ে-যাওয়া, কিন্তু এই নূতন পরিস্থিতিকে সম্যকভাবে উপলব্ধি ক'রে আমাদের একটি পরিমার্জিত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হবে। আমার প্রস্তাব, আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য হওয়া উচিত যে-ক'রেই হোক —সত্বর না-হ'লেও—নিরাপদে নিকটবর্তী কোনো ফরাশি বসতিতে গিয়ে পৌঁছুনো। সেখানে অমরা সকলের পরামর্শ নেবো; পরবর্তী কার্যক্রম আমরা সেখানেই শান্তভাবে স্থির ক'রে নিতে পারবো।'

সর্বসম্মতিক্রমেই প্রস্তাবটা গৃহীত হ'লো।

'মানচিত্র অনুযায়ী,' বারজাকের ভাষণ তখনও থামেনি, 'আমাদের অবশ্য নাইজারের তীরে কোনো-একজায়গায় গিয়ে পৌঁছুনো উচিত। তাহ'লে কি উয়াগাদুগু আর এনদিয়াঙ্গো হ'য়ে আমরা সায়ীতে পৌঁছুবার চেষ্টা করবো না? টিমবাকটু দখল ক'রে নেবার পর থেকে ফরাশি সেনাবাহিনী ভাঁটির দিকে ক্রমশ চারপাশের এলাকা দখল করতে-



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে এগিয়েছে; কবুল করি, আমার মোটেই জানা নেই, তারা সায়ীও দখল করেছে কি না—তবে মনে হয় সেটাও তাদের এক্তিয়ারে এসে পড়েছে—মনে হয় কেন, এসেই গেছে সম্ভবত। তারপর আমরা যদি সেখানে নতুন-কোনো রক্ষিদল নিয়োগ করতে পারি, তাহ'লে আমরা পূর্বতন পরিকল্পনা অনুযায়ীই এগুতে পারবো।'

'কিন্তু তাতে যে কতগুলো অসুবিধের সৃষ্টি হবে, মঁসিয় ল্য প্রেসিদেন্‌ৎ,' নোটবইতে জ্বরাতুর হাতে অঙ্ক কষতে-কষতে ব'লে উঠেছেন মঁসিয় পঁসাঁ, 'আমাদের পাঁচশো মাইল পথ যেতে হবে। আমাদের প্রতিকদম গড়ে পঁচিশ ইঞ্চি পথ পেরোয়। পাঁচশো মাইল যে তাহ'লে হবে ১,০১১,১১১ কদম এবং তদুপরি আরেকটি ভগ্নাংশ।' তাঁর মুখ দিয়ে তুবড়ির মতো নানারকম সংখ্যা ছুটতে শুরু করেছে।

'ওঃ! ওঃ! ওঃ!' অমনি *পরিস্ফুট* আর্তনাদের প্রস্রবণ ছুটেছে আমেদে ফ্লরেঁসের মুখ থেকে, এত-সব সংখ্যা শুনে তাঁর প্রায় মাথাখারাপ হ'য়ে যাবারই দাখিল। নার্ভাস ব্রেকডাউনের চোটটা সামলাতে-সামলাতে তিনি বলেছেন, 'আচ্ছা, আপনি কি সোজাসুজি বলতে পারতেন না দিনে দশ মাইল ক'রে এগুলে সবশুদ্ধু আমাদের তিপ্পান্ন দিন লাগবে—আর যদি দিনে সাড়ে-বারো মাইল পথ মেরে দিতে পারি, তবে মাত্র চল্লিশ দিনেই পৌঁছে যাবো। ঐ লক্ষ-কোটি সংখ্যা দিয়ে আপনি আসলে কী প্রমাণ করতে চাচ্ছেন?'

'শুধু এই,' ঠাণ্ডাগলায় বলেছেন মঁসিয় পঁসাঁ, তাঁর সেই ভয়াবহ নোটবইটা সরিয়ে রাখতে-রাখতে। 'যে, দিজেনে দিয়েই নাইজারে গিয়ে পৌঁছুলে আমরা ভালো করবো। তাতে দূরত্বটা অর্ধেক হ'য়ে যাবে—পাঁচশোর বদলে সেটা তখন আড়াইশো মাইল হ'য়ে যাবে।'

'তার চেয়েও ভালো আরেকটা উপায় আছে,' মানচিত্রে আঙুল দেখিয়ে আমেদে ফ্লরেঁস বলেছেন, 'সেগু-সিকোরোতেই নাইজারে পৌঁছুনো যাবে, তাতে বামার ওপর দিয়ে যেতে হবে। তাতে মোটে একশো মাইল পথ পেরুতে হবে। তাছাড়া বসতিটাও সেখানে বেশ-বড়ো, আমরা যে সেখানে সাহায্য পাবোই, তাতে কোনো সন্দেহই নেই।'

'চমৎকার প্রস্তাব' ডাক্তার শাতোনে সায় দিয়েছেন, 'তবে আমার মনে হয় তার চেয়েও ভালো একটা পথ আছে। আমরা বরং ফিরে যাই—আমি উপকূলে ফিরে যেতে বলছি না, তবে অন্তত সিকাসো অব্দি ফিরে যেতে বলছি। মাত্র একশোকুড়ি মাইল পেরুতে হবে। সেখানে আমরা ফরাশি ছাউনিতে দেশের লোক পাবো, মনে আছে নিশ্চয়ই কী-রকম হুল্লোড় ক'রে তারা আমাদের স্বাগত জানিয়েছিলো। সেখানেই সকলের সঙ্গে আলোচনা ক'রে আমরা স্থির করতে পারবো আমরা বামাকো যাবো, না মঁসিয় আমেদে ফ্লরেঁস যেমন বলেছেন এবং আমিও যার সঙ্গে একমত, সেগু-সিকোরো



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবো।'

'ডাক্তারই ঠিক বলেছেন,' ফ্লরেঁস সায় দিয়েছেন, 'সেটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'মঁসিয় ফ্লরেঁস,' একমিনিট কী যেন ভেবে, নিজের বীরত্ব দেখিয়ে সঙ্গীদের তাক লাগিয়ে দেবার জন্যেই, বারজাক ফের ব'লে উঠেছেন, 'আপনি আর ডাক্তার হয়তো সমীচীন প্রস্তাবই করেছেন। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন, সিকাসোতে ফিরে-যাওয়ার মানে কি এই দাঁড়াবে না যে আমরা মিশনের পরিকল্পনাটা মাঝপথেই বাতিল ক'রে দিয়েছি। কিন্তু, মহোদয়গণ, এট খেয়াল করবেন, যে-ব্যক্তি আরব্ধ কর্তব্যকর্মকেই সর্বাগ্রে স্থাপন করেছে...'

'আমরা আপনার অনীহা বুঝতে পারি, মঁসিয় বারজাক,' কথার তোড়ের মাঝখানেই বাধা দিয়েছেন ফ্লরেঁস, বয়ানটা যে কোনদিকে চলেছে সেটা বুঝতে তাঁর দেরি হয়নি, 'কিন্তু প্রশ্নটা এখানে কর্তব্যের নয়, বিচক্ষণতার।'

'কর্তব্য, না বিচক্ষণতা—কীসের যে প্রশ্ন, সেটা অবশ্য ঠিক ক'রে নিতে হবে,' মঁসিয় বারজাককে থামাবে কে ? 'আবারও ভেবে দেখুন অবস্থাটা : এটা ঠিক যে আমাদের রক্ষিদল আমাদের ছেড়ে রেখে পালিয়েছে, কিন্তু আমরা তো নিজেদের একবার জিগেস ক'রে নেবো যে তাতে আমাদের কী বিপদআপদে পড়তে হ'তে পারে। আমাদের একমাত্র ঝামেলা এসেছে কোনো কল্পিত শত্রুর কাছ থেকে—দুশমন যে কেউ-একজন আছে, সেটা আমারও মনে হয় কিন্তু তার অস্তিত্বের কোনো সুনিশ্চিত প্রমাণ আমরা পাইনি —কেননা তার সম্বন্ধে যা-কিছু আমরা জানি সব কতগুলো উৎপাত-উপদ্রবের মধ্যে দিয়ে, আর এই উৎপাতগুলো সে-ই ঘটিয়েছে কি না, তা কি আমরা নিশ্চিত ক'রে জানি ? একেকটা ক'রে উৎপাতগুলো নিয়ে ভাবুন, দেখবেন সে-সব নিতান্তই তুচ্ছ। শুধু আমাদের বিরক্ত করা ছাড়া আর-কী কে করেছে ? মঁসিয় ফ্লরেঁসের মতে : গোড়ায় কে যেন আমাদের ভয় দেখাতে চেয়েছিলো; এবং আবারও এই অজ্ঞাত দুশমনটি আমাদের লোকজনদের মধ্যে কতগুলো ঘোঁট পাকিয়ে তুলতে চেয়েছিলো, আর *কোনোভাবে*, কোন পদ্ধতিতে তা আমি জানি না, যে নাকি আমাদের ওপর এক নকল রক্ষিদল চাপিয়ে দিয়েছিলো —এবং তারা যা করেছে, তার মোকাবিলা করবার জন্যেই আজকের এই সভা। কিন্তু অনুগ্রহ ক'রে মনে রাখবেন, সে বিস্তর সংযমের পরিচয় দিয়েছে, তার পদ্ধতিও বেশ-মোলায়েম। নকল-রক্ষিদল আমাদের ফেলে পিঠটান না-দিয়ে আমাদের সবাইকে হত্যা ক'রে যেতেও পারতো। আমাদের যদি তারা খুন করতে চাইতো, তবে তাদের ঠেকাতো কে ! কিন্তু তারা ও-রকম কিছুই করেনি। বরং আমাদের জন্যে সব রসদ, সব অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ, গাধাঘোড়া এবং বেসাতিপণ্য রেখে দিয়ে গেছে। তারা এ-সব কেড়েও নিতে পারতো। উত্ত্যক্ত করেছে ঠিকই, কিন্তু এখনও



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাংঘাতিক-কিছু করেনি।'

'কেন? তোঙ্গানে,' ডাক্তার শাতোনে মনে করিয়ে দিয়েছেন তোঙ্গানেকে তারা খুনই করতে চেয়েছিলো।

'তোঙ্গানে একজন নিগ্রো,' বারজাক উত্তর দিয়েছেন, 'আর অনেকেরই কাছে, *নিগ্রোদের প্রাণ কোনো প্রাণই নয়।*'

ফ্লরেঁস বাধা দিয়ে বলেছেন, 'মঁসিয় বারজাকের এ-কথাটা ঠিক যে আমাদের অজ্ঞাত শত্রুর আচারআচরণ বেশ-মোলায়েমই--এবং এখনও-অব্দি কেউ আমাদের প্রাণে মারেনি। আমি আবারও জোর দিয়ে বলছি, *এখনও-অব্দি*, কিন্তু আমরা যেদিকটায় যাচ্ছি, সেদিকে কারু যাওয়া যে এই অজ্ঞাত শত্রু পছন্দ করে না, এটা বেশ-স্পষ্ট—এ-যাবৎ সে যা করেছে তাতে যদি দ্যাখে কোনো কাজ হয়নি তবে সে-যে ভয়ংকর-কিছু ক'রে বসবে না, তা-ই বা কে জানে। তোঙ্গানেকে যে-রকমভাবে তারা খুন ক'রে ফেলতে চেয়েছিলো, তাতে বোঝা যায় যে দরকার হ'লে আঘাত হানতেও তারা ছাড়বে না, আর তখন যে আঘাত হানবে সেটা হবে মোক্ষম মার, আর তেরিয়া ও ক্ষিপ্র।'

'ঠিক,' ডাক্তার সায় দিয়েছেন।

ডাক্তার শাতোনের সমর্থনের পর কয়েক মিনিট সবাই চুপচাপ হ'য়েই ছিলেন, মঁসিয় বারজাককে দেখে বোঝা যাচ্ছিলো তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে সাত-পাঁচ ভেবে নিচ্ছেন। আমেদে ফ্লরেঁস কোনো অন্যায্য যুক্তি তোলেননি, আর মিদির মাননীয় সাংসদ নিশ্চয়ই পারীতে তাঁর শত্রুপক্ষ কে কী কটাক্ষ করবে তার দুর্ভাবনাতেই নিজের জীবনটা এখানে আফ্রিকার জঙ্গলে বিপন্ন করবেন না—আর অভিযানটা অসমাপ্ত রেখে মাঝপথেই যদি ফিরে-যাওয়া যায়, তখন তাঁর সমালোচকদের জব্দ করবার জন্যে কোনো জবরদস্ত বয়ানই কি তিনি খুঁজে পাবেন না?

'সবদিক বিবেচনা ক'রে,' যে-সব যুক্তি খাড়া ক'রে সংসদে তিনি তাঁর বিপক্ষ সদস্যদের মুখ বন্ধ ক'রে দেবেন, তারই দু-একটা এখানকার শ্রোতাদের ওপর পরখ ক'রে দেখতে চেয়েছেন তিনি, '*সবদিক বিবেচনা ক'রে*, আমি মঁসিয় আমোদে ফ্লরেঁসের প্রস্তাবটাকেই সমর্থন করছি—বিশেষত আমাদের মাননীয় সহকর্মী ডাক্তার শাতোনে যেভাবে সে-প্রস্তাবটা পরিমার্জিত ক'রে সভার সামনে উপস্থাপিত করেছেন, তাতে এ-প্রস্তাব সমর্থন না-করার কোনো যুক্তি আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আমি তাই সিকাসোতে ফিরে-যাবার পক্ষেই ভোট দিচ্ছি—আর পরে সেগু-সিকোরোই হবে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। তাহ'লে, মহোদয়গণ...'

এখানে আমেদে ফ্লরেঁসের কাছে পুরো বয়ানটাই একটু ভারি মনে হওয়ায় তিনি আর তাতে কর্ণপাত না-ক'রে অন্য-কী-একটা বিষয় ভাবতে শুরু ক'রে দিয়েছিলেন।

'তাহ'লে, মহোদয়গণ, কেউ যদি অহেতুকভাবে অভিযান মাঝপথে বন্ধ ক'রে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবার জন্যে অভিযোগ তোলে, আমি উত্তর দেবো, এর দায় সরকারেরই ওপর বর্তাবে, কারণ সরকারেরই উচিত ছিলো, আমাদের যথোচিত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। যখন রক্ষিদলকে অমনভাবে, কোনোকিছু না-ব'লে-ক'য়ে, দুম ক'রে বদ্‌লে দেয়া হয়েছে একদল দস্যুদলে, যখন এই দস্যুদল কোনোভাবেই আমাদের আগেকার রক্ষিদলের বিকল্প হবার যোগ্যতা রাখে না, তখন আমরা নাচার হ'য়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যদি এমন-কোনো বিকল্পের ব্যবস্থা করা না-হ'তো, কিংবা দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কারু হাতে আমাদের নিরাপত্তার দায় তুলে দেয়া হ'তো, তাহ'লেও না-হয় কথা ছিলো। এটা আমাদের বিবেচ্য নয় যে কেন এমন করা হয়েছে। তার জন্যে বরং আমি দাবি করবো একটা নিরপেক্ষ তদন্তকমিশন বসানো হোক। যে-তদন্তকমিশন সবদিক খতিয়ে দেখে আমাদের বলবে...'

'মাফ করবেন, মঁসিয়,' আমেদে ফ্লরেঁস বাধা দিয়ে বলেছেন, 'যদি আমাকে একটা কথা বলবার অনুমতি দেন...'

সাংবাদিকটিই প্রথমে সবচেয়ে বিচক্ষণ রাস্তাটি বাৎলেছিলেন, কেননা পৃথিবীর ঘাৎ-ঘোঁৎ তিনি ভালোই জানেন, অনেক ঠেকে-বুঝে শিখেছেন, কিন্তু যেই তিনি দেখেছেন তাঁর প্রস্তাবটাই গ্রহণ করা হবে, অমনি সে-সম্বন্ধে সমস্ত উৎসাহ তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। ক-মিনিট বাদেই তাঁর মনে হয়েছে, এ-নিয়ে চাপ না-দিলেই ভালো হ'তো, কারণ ঠিক যখন অভিযানটা চমৎকারভাবে রোমাঞ্চকর ও উত্তেজক হ'য়ে উঠছে, তখনই এমনভাবে ফিরে না-যেতে হ'লেই ভালো হ'তো, তাহ'লে হয়তো অনেক কিস্তি চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক রচনাই তাঁর লেখনী থেকে নিঃসৃত হ'তো। আর ঠিক তখনই তাঁর নজর পড়েছে তাঁর আরো দুজন সহযাত্রীর ওপর। অমনি তিনি বাধা দিয়ে ব'লে উঠেছেন, 'মঁসিয় ল্য প্রেসিদেন্‌ৎ যদি অনুমতি দেন... আমরা এত-বড়ো একটা সিদ্ধান্ত নিতে চলেছি, অথচ একবারও মাদমোয়াজেল মোরনাস বা মঁসিয় দ্য সাঁৎ-বের্যাঁর কোনো মতামত জিগেস করিনি। আমার মনে হয়, এই আলোচনাসভায় তাঁদেরও নিজস্ব কোনো বক্তব্য থাকতে পারে।'

সত্যি, যতক্ষণ ধ'রে এই সাংসদীয় অধিবেশনের নকলে সভাটি চলেছে, এঁরা দুজনে চুপচাপ ব'সে সবকিছু শুনছিলেন, আলোচনায় তাঁরা কোনোই অংশ নেননি।

'মঁসিয় ফ্লরেঁস হক কথাই বলেছেন,' বারজাক স্বীকার করেছেন। 'যদি দয়া ক'রে আপনি আপনার মতটা বলেন, মাদ্‌মোয়াজেল...'

'আমার মত জিগেস করার জন্যে ধন্যবাদ,' শান্তগলায় বলেছেন মাদ্‌মোয়াজেল মোরনাস। 'তবে যে-আলোচনার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই, তাতে যোগদান করা আমাদের পক্ষে উচিত হবে না।'

'আপনাদের *কোনো সম্বন্ধ নেই*? কেন নেই, মাদমোয়াজেল? আমার তো মনে হচ্ছে আমরা সবাই একঝাঁকেরই পাখি।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মোটেই তা নয়, মঁসিয়,' জেন মোরনাস উত্তর দিয়েছেন, 'যদি পরিস্থিতির চাপে প'ড়ে, এই দুর্বিপাকের মাঝখানে, আপনারা আপনাদের আগেকার সিদ্ধান্ত বাতিল করেন, সে আপনাদের ব্যাপার। আমি আমাদের সংকল্প থেকে চ্যুত হবো না। যখন আপনারা এ-রকম একটা বিপাকে পড়েছেন তখন আপনাদের ছেড়ে চ'লে-যাওয়াটা আমাদের ঠিক মনঃপূত হয়নি। না-হ'লে আমরা তো সারাক্ষণই ব'লে এসেছি আমরা আমাদের পরিকল্পনামাফিক আমাদের নিজেদের পথেই যাবো।'

'তাহ'লে আপনারা এখনও গাও অব্দি যেতে চাচ্ছেন?'

'এখন তো *আরো-বেশি ক'রেই* চাচ্ছি।'

'একা-একাই? কোনো রক্ষিদল ছাড়াই?'

'আমরা তো কখনও অন্যকিছু আশা করিনি।'

'কোনো কুলিও চাই না?'

'আমরা অন্য কুলি ভাড়া ক'রে নেবার চেষ্টা করবো। যদি কাউকেই না-পাই, *অগত্যা*, তাদের ছাড়াই যেতে হবে বৈ কি।'

'এই অজ্ঞাত-কারু দুশমনি সত্ত্বেও?'

'এই অজ্ঞাত-কারু শত্রুতা সত্ত্বেও। আমার মনে হয় আমরা কখনোই শত্রুর লক্ষ্য ছিলুম না—বরং বারজাক মিশনকেই সে বাধা দিতে চেয়েছে।'

'সে আপনি বলবেন কী ক'রে—বিশেষত আমরা যখন একই সঙ্গে, একই পথ ধ'রে, এতটা রাস্তা এসেছি? তবে আমাদের অজ্ঞাতে শত্রু নিশ্চয়ই এবার আপনাদের প্রাণটাই অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে—বিশেষত যদি আপনারা একা-একাই নাইজার নদীর বাঁকে যেতে চান।'

'তা যদি হয়, তবে তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু এ-যে উন্মাদের কাণ্ড হবে!' আত্মবিস্মৃত হ'য়ে মঁসিয় বারজাক ব'লে উঠেছেন, 'এ-রকম অবিবেচকের মতো আপনাদের আমরা যেতে দিতে পারি না, মাদমোয়াজেল। একটা খামখেয়ালের বশে আপনারা এত-বড়ো একটা ঝুঁকি নিতে যাবেন, আর আমরা তা হাত-পা গুটিয়ে ব'সে-ব'সে দেখবো, তা হয় না। তার জন্যে যদি জোর খাটাতে হয়, তবু...'

মাদমোয়াজেল মোরনাস একমুহূর্ত কী ভেবে বিষণ্ন গলায় বলেছেন: 'দুর্ভাগ্যবশত, এটা মোটেই কোনো খামখেয়ালের প্রশ্ন নয়।'

'তবে কীসের প্রশ্ন?' এবার একটু অবাকই হয়েছেন মঁসিয় বারজাক।

জেন মোরনাস একটু ইতস্তত করেছেন। তারপর গম্ভীরগলায় বলেছেন: 'কর্তব্যের প্রশ্ন।'

অন্যরা কী-রকম ভ্যাবাচাকা খেয়ে এই রূপসীর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকিয়ে থেকেছেন। এমন-কোন *কর্তব্য* তাঁকে টান দিয়েছে যে তাঁকে নাইজার নদীর বাঁকে যেতেই হবে? সাংবাদিকটি অবশ্য প্রথম থেকেই ভেবে এসেছেন, এঁদের এই সফরে বেরুবার মধ্যে নিছকই আষাঢ়ে-কোনো খেয়ালিপনা নেই। এখন তাঁর উৎফুল্লই লেগেছে নিজেকে—অ্যাদ্দিনে তিনি জানতে পারবেন *কেন* এঁরা নাছোড়ভাবে এতটা পথ এসেছেন।

জেন মোরনাস বিষাদগম্ভীর সুরে বলেছেন : 'আমাকে মাফ করবেন আপনারা। আমি আপনাদের প্রতারিত করেছিলুম।...'

আরো-তাজ্জব হ'য়ে বারজাক ব'লে উঠেছেন : '*প্রতারিত করেছিলেন?*'

'হ্যাঁ, আপনাদের অ্যাদ্দিন প্রতারিত ক'রেই এসেছি আমি। মঁসিয় দ্য সাঁৎ-বের্ঁ্যা তাঁর আসল পরিচয়ই দিয়েছেন আপনাদের—আপনাদেরই মতো ফরাশি তিনি। কিন্তু আমি মিথ্যে পরিচয় দিয়ে ফরাশি সেজে আপনাদের সঙ্গে এত-দূর এসেছি। আমি আসলে ইংরেজ, আমার নাম জেন ব্লেজন। আমি লর্ড ব্লেজনের মেয়ে আর কাপ্তেন ব্লেজন আমার দাদা। আর আমার সেই দুর্ভাগা দাদাটি কুবোতেই মারা যান ব'লে শোনা যায়। তাই আমায় কুবো অব্দি যেতেই হবে, কারণ সেখানেই আমি এতদিন ধ'রে যে-কাজটা করতে চেয়েছি, সেটা শেষ করতে পারবো।'

তারপর থেকে জেন ব্লেজন—এখন থেকে তাকে এই-নামেই ডাকা হবে—খুলে বলেছে কী শোচনীয় ও দুঃসহ কাণ্ড ঘটেছিলো কুবোয় : কী কুখ্যাত অভিযোগ উঠেছিলো জর্জ ব্লেজনের বিরুদ্ধে, তার মর্মান্তিক মৃত্যুর রহস্যময় পরিস্থিতি, আর তার বাবার আত্মধিক্কার ও হতাশা। এবারে সে খুলে বলেছে তার এই কর্তব্য কী : *পবিত্র দায়িত্ব* : তার দাদার হৃতমর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, বংশের ইজ্জতের ওপর যে কালির দাগ লেগেছে সেটা মুছে ফেলা, আর সেই বৃদ্ধের মনে আবার শান্তি ফিরিয়ে দেয়া, যিনি শোচনীয় নিঃসঙ্গতার মধ্যে উটোক্রেটার দুর্গে আস্তে-আস্তে মরণের কোলে ঢ'লে পড়ছেন।

তার অবরুদ্ধ আবেগ বাঁধভাঙা বন্যার মতো এতদিন বাদে খুলে এসেছে, আর তার তোড়েই যেন শ্রোতারা ভেসে গিয়েছেন। এই কচি-মেয়েটির তারিফ ক'রে যেন পার পাওয়া যাচ্ছিলো না। এই কাজগুলো করবে ব'লেই সে এতটা পথশ্রম সহ্য করেছে, এতটা বিপদ-আপদ মাথা পেতে নিয়েছে! এখনও যে কত বিপদ তার সামনে আছে, কে জানে! কত বিপদ, কত অবসাদ!

সে থামতেই আমেদে ফ্লরেঁস ব'লে উঠেছেন, একটু রূঢ় স্বরেই, 'মিস ব্লেজন, আপনার বিরুদ্ধে আমার একটা নালিশ আছে।'

'*নালিশ?... আমার বিরুদ্ধে?*' এ-রকম একটা অদ্ভুত সাড়া পেয়ে জেন একেবারে হকচকিয়ে গেছে।

'হ্যাঁ, নালিশ... এবং এই-অভিযোগ বেশ গুরুতরই! ফরাশিদের সম্বন্ধে কী-সব



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অদ্ভুত কথা ভেবেছেন আপনি, মিস ব্লেজন—আর তাদেরও মধ্যে আমেদে ফ্লরেঁস সম্বন্ধেই বা কী ভেবেছেন আপনি?'

একটু ভড়কে গিয়ে তো-তো ক'রে জেন বলেছে, 'আপনি কী বলতে চাচ্ছেন, মঁসিয় ফ্লরেঁস?'

'কী? আপনি কি ভেবেছেন আমেদে ফ্লরেঁস আপনাকে একা-একাই কুবো যেতে দেবে—*যদি তাকে আপনি সঙ্গে নিয়ে না-যান?*'

'ওহ্, মঁসিয় ফ্লরেঁস...' এতক্ষণে জেন বুঝতে পেরেছে তিনি কী বলতে চাচ্ছেন।

'চমৎকার! তোফা! বাহবা! শাবাশ!' যেন বিষম চ'টে গিয়েছেন, এমনি ভঙ্গি ক'রেই বলেছেন আমেদে ফ্লরেঁস। 'সত্যি! এত স্বার্থপর!'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না...'

'দয়া ক'রে আমাকে আগে শেষ করতে দিন। আপনি দেখছি বেমালুম ভুলেই গেছেন যে আমি একজন সাংবাদিক, আর আমার এক কিমাশ্চর্য বস্তু আছে, যার নাম সম্পাদক! আপনার কি কোনো ধারণা আছে ব্লেজন-রহস্য সম্বন্ধে কিছু জানবার পরেও অমন-চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর ব্যাপারটা নিয়ে যদি কিছু না-লিখি, তবে আমার সেই বিদঘুটে সম্পাদকসাহেব কী বলবেন? বলবেন, "ওহে খোকা ফ্লরেঁস, তুমি নিতান্তই একটি কচিখুকু ছাড়া আর-কিছু নও!" তারপর সোজা আমায় আঙুল তুলে দরজাটা দেখিয়ে দেবেন। উঁহু, মিস ব্লেজন, এমনভাবে আমার চাকরিটা থেকে আমি বরখাস্ত হ'তে চাই না। অতএব আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে যাবো—নাছোড়বান্দার মতো আপনার সঙ্গে এঁটে থাকবো!'

'ওহ্, মঁসিয় ফ্লরেঁস!' জেন একেবারে অভিভূত হ'য়ে গিয়েছে।

সাংবাদিক সোজাসুজি তার মুখের দিকে তাকিয়েছেন। 'আমি আপনার সঙ্গে যাবো, মিস ব্লেজন। আর আমাকে মানা করবার চেষ্টা ক'রে মিথ্যে সময় নষ্ট করবেন না—'

জেনের চোখ ফেটে প্রায় জল বেরিয়ে এসেছে। মঁসিয় ফ্লরেঁসের হাত ধ'রে সে ধরাগলায় বলেছে : 'আপনাকে আমি বারণ করবো না, মঁসিয় ফ্লরেঁস।'

'আর আমি, মিস ব্লেজন? আমাকেও আপনি সঙ্গে নেবেন তো?' হঠাৎ ডাক্তার শাতোনের গম্ভীর-গম্ভীর গলা শোনা গেছে।

'*আপনি*, ডাক্তার?'

'নিশ্চয়ই। কোনো ডাক্তারকে বাদ দিয়ে এ-রকম কোনো সফর হয় না কি? আপনাকে তো মনে হয় দুরাত্মারা কুচি-কুচি ক'রে কেটে ফেলবে—তখন সেগুলো শেলাই ক'রে জুড়ে দেবার জন্যে আমাকে সঙ্গে থাকতে হবে না?'

'ওহ্, ডাক্তার,' এবার জেন কেঁদেই ফেলেছে।

কিন্তু বারজাক যখন ক্রুদ্ধস্বরে ব'লে উঠেছেন, 'বাঃ! আর আমার বেলায় কী!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে দেখছি কেউ হিশেবেই ধরছে না—কারণ আমার মতটা নেবার কথা অব্দি কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি!' তখনই বা জেন কী ভেবেছে?

বারজাক সত্যি খেপেই গিয়েছেন। তিনিও, পুরো কাহিনীটা শোনবামাত্র, মিস ব্লেজনের সঙ্গে যাবার কথা ভেবেছিলেন। অর্থাৎ এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছেন তিনি। কারণ এই তরুণী যে-পথ ধ'রে যাবে সেটা প্রায় তাঁরও যাবার পথ। তাছাড়া যতই অবিমৃশ্যকারিতা হোক না কেন, জেনের অভিযানের পেছনকার মূল উদ্দেশ্যের গভীরতা তাঁর অন্তর স্পর্শ করেছিলো। তাছাড়া চার-চার জন *পুরুষ*, চারজন *ফরাশি পুরুষ*, তারা কি ককখনো জঙ্গলের মধ্যে এমন-একটি কচি-মেয়েকে একা ছেড়ে দিয়ে চ'লে যেতে পারে? ফ্লরেঁস আর শাতোঁনে ঠিক তাঁরই মুখের কথাটা কেড়ে নিয়েছেন—আর নাটকের অভিনয়ের সময় কেউ যদি অন্য-কারু মুখের কথা কেড়ে নেয়, তবে কি ঝামেলা বাধে না?

'আমি মঁসিয় ফ্লরেঁসের হ'য়ে কথা বলছি না,' তাঁর বিরক্তিটাকে একটু বাড়াবাড়িভাবেই প্রকাশ করেছেন তিনি, 'তিনি স্বাধীন মানুষ। কিন্তু, ডাক্তার, আপনি—আপনি তো এই বারজাক মিশনের সদস্য—যার নেতৃত্বের ভার, আমার ধারণা ছিলো, আমারই ওপর দেয়া হয়েছে। আপনিও কি আপনার নেতাকে অসহায় ফেলে মাঝরাস্তায় দল ছেড়ে চ'লে যাবেন? ঐ রক্ষিদলের মতো?'

'মানে... আমি...' ডাক্তার তোৎলাতে শুরু করেছেন। মারটা যে এদিক থেকে আসবে, সেটা তিনি ভাবতেই পারেননি।

'আর তা যদি আপনি ভেবে না-থাকেন, ডাক্তার, তাহ'লে আপনি কি ধ'রে নেননি যে আমিও কুবো যাচ্ছি? কিন্তু আমরা কীভাবে, কখন, কোন্ রাস্তা দিয়ে যাবো, সেটা ঠিক ক'রে দেবার ভার কি আপনার ওপর এসে বর্তেছে? আপনার দায় তো, যত-দূর জানতুম, এটাই খেয়াল রাখা আমি যাতে বহালতবিয়ৎ থাকি, সুস্থ...'

'মানে... আমি...'

'না, ডাক্তার, না। আমি তা কিছুতেই মানবো না।' বারজাকের গলার স্বর ক্রমশই চড়েছে। 'আর এটা মনে ক'রে রেখে দেবেন, নাইজার মিশনের দলপতি আপনার মৎলবটা মোটেই ভালো চোখে দেখছেন না। তবে, অন্যদিক থেকে, আমাদের একমাত্র যে-গাইড আছে এখন, সে যেহেতু মিস ব্লেজনেরই চাকরি করে, সে যেহেতু তাঁরই কথায় চলবে, এবং এটাও মনে রেখে যে মঁসিয় সাঁৎ-বের্ঁা ও মিস ব্লেজনের ভাষাতাত্ত্বিক কৃতিত্ব ছাড়া আফ্রিকিদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার কোনো উপায় আমাদের নেই, আমি চাই, অর্থাৎ, এটা বলতে চাই, এটাই আমার *অনুজ্ঞা*, যে...'

বারজাক, যাঁর গলাটা সপ্তমে চ'ড়ে গিয়েছিলো এতক্ষণে, হঠাৎ নাটুকেভাবে গলার স্বরটা নামিয়ে এনে বলেছেন : 'আমরা সবাই কুবো হ'য়ে নাইজার নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছুবো।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মঁসিয় বারজাক...' শুনতে ভুল করেছে কি না বুঝতে না-পেরে জেন তোৎলাতে শুরু করেছে।

'ঠিকই শুনেছেন, মিস ব্লেজন। আপনি চান বা না-চান, আমাদের সাহচর্য আপনাকে মেনে নিতেই হবে।'

'ওহ্, মঁসিয় বারজাক...' আবারও শুধু এই-পর্যন্তই তোৎলাতে পেরেছে জেন।

'এ-সফরটা মোটেই কঠিন হবে না,' ঘোষণা করেছেন ফ্লরেঁস, 'কারণ আমাদের কাছে পর্যাপ্ত খাবারদাবার আছে।'

'পাঁচদিনের মতো তো বটেই,' এমনভাবে বলেছেন ডাক্তার শাতোনে যে তিনি যেন আসলে বোঝাতে চেয়েছেন—*ছ-মাসের মতো তো বটেই*।

'উঁহু, মাত্র চারদিনের উপযোগীই আছে,' শুধরে দিয়েছেন বারজাক, 'কিন্তু পথে আমরা আরো কিনে নিতে পারবো।'

'তাছাড়া শিকারও জুটবে,' ডাক্তার মনে করিয়ে দিয়েছেন।

'বাঃ, আর মাছ নেই বুঝি জলে?' এতক্ষণে একটা কথা বলবার সুযোগ পেয়েছেন বেচারি সাঁৎ-বের্যাঁ।

'আর ফলমূল—কী খাওয়া যায় তা আমি ব'লে দিতে পারবো।'—এটা, ডাক্তার।

'আমি কন্দমূল চিনি,' তোঙ্গানের কণ্ঠস্বর।

'*হিপ, হিপ, হিপ, হুরে!*' অতএব হর্ষধ্বনি করেছেন আমেদে ফ্লরেঁস। 'এ তো দেখছি আসল কাপুয়া, কানানের দেশ, যথার্থ ভূস্বর্গ!'

'কালকেই তাহ'লে আমরা রওনা হ'য়ে পড়বো,' বারজাক অমনি সংক্ষেপে-ব'লে দিয়েছেন। 'একমুহূর্তও সময় নষ্ট না-ক'রে আমাদের তৈরি হ'য়ে নিতে হবে।'

এটা কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে মঁসিয় পঁসাঁ সেই-থেকে একবারও মুখ খোলেননি। কিন্তু যেই ঠিক হয়েছে যে সদলবলে এবার কুবো যাওয়া হবে, অমনি তিনি তাঁর নোটবইটা বার ক'রে এনেছেন, আর হিশেব করতে শুরু ক'রে দিয়েছেন ক-কদম ফেলে শেষঅব্দি কুবো গিয়ে পৌঁছুনো যাবে।

'এ তো ভালোকথাই,' বারজাকের সিদ্ধান্তের উত্তরে অবশেষে তিনি জানিয়েছেন, 'কুবোর রাস্তা, সেগু-সিকোরোর তুলনায়, আরো আড়াইশো মাইল লম্বা। আমাদের একেক কদমে—আমরা তো জানিই যে আমরা মাত্র পঁচিশ ইঞ্চি যেতে পারি, অতএব...'

কিন্তু কেউ তাঁর কথায় কান দিচ্ছিলো না। অন্যরা পরদিনের যাত্রার প্রস্তুতিতে এর মধ্যেই সব তোড়জোড় শুরু ক'রে দিয়েছে। মঁসিয় পঁসাঁ মিথ্যেই আফ্রিকার জঙ্গলে তাঁর এমন দুর্লভ গাণিতিক প্রতিভাটাকে অপচয় করছিলেন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারো

# অরণ্যসমাধি

গ্রামপ্রধান যে ছ-জন লোককে মোট বওয়ার জন্যে ঠিক ক'রে দিয়েছিলো, তাদের নিয়েই বৃহৎ বারজাক নিশনের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশটি ২৪শে ফেব্রুয়াহি কাদু থেকে বেরিয়ে পড়েছে। যে-বিশ্রী ঘটনাগুলো অভিযাত্রিদের আদি দলটাকে ছত্রভঙ্গ ক'রে দিয়েছিলো, তাদের স্মৃতি মন থেকে পুরোপুরি মুছে না-গেলেও, এ-দলটা বেশ প্রফুল্লই ছিলো—শুধু মঁসিয় পঁসাঁ বাদে। অন্যরা সবাই এমন-একটা দুঃসাহসী অভিযানে নেমে পড়েছেন ব'লে পরস্পরের পৃষ্ঠকণ্ডূয়ন ক'রে সারাক্ষণই বাহবা দিয়ে যাচ্ছিলেন।

তাছাড়া, সত্যি-বলতে, লোকশানই বা কতটুকু ? তোঙ্গানে আর মলিক এখন একটি ঘোড়ায় চেপেই চলেছে, বাদ বাকি সকলেরই যার-যার নিজের ঘোড়া আছে ; অস্ত্রশস্ত্রেরও অভাব নেই, রসদও পর্যাপ্ত, আর প্রচুর পরিমাণে আছে উপহারের বেসাতি। তাছাড়া, দেশের অবস্থাও বেশ শান্ত ; যে-অজ্ঞাত শত্রু এতদিন পদে-পদে তাদের বিপদে ফেলবার চেষ্টা ক'রে এসেছে, সে হয়তো লাঞ্ছনা-নির্যাতনের পালা চুকিয়েই দিয়েছে এখন—কেননা মিশনের সঙ্গে এখন এমন-কোনো সৈন্যবাহিনী নেই, যা দেখে কেউ তেতে উঠতে পারে। কোনো বিশেষমুশকিল ছাড়াই যে তাঁরা কুবো পৌঁছে যাবেন, এমনটা আশা করার যথেষ্ট সংগত কারণ আছে।

আর, এতে বরং শাপে বরই হয়েছে। মস্ত ঐ গাধার বহরটি সঙ্গে নেই ব'লে তাঁরা বরং তাড়াতাড়িই কুবো পৌঁছে যেতে পারবেন। তবে একটু-আধটু ত্যাগস্বীকার তো করতেই হয়েছে সকলকে। গ্রামপ্রধানের সহায়তার বিনিময়ে উপঢৌকনের সামগ্রী একটু বেশিই দিতে হয়েছে, তবে যা হাতে আছে তাও পর্যাপ্ত—গাও পর্যন্ত অনায়াসেই চ'লে যাবে ব'লে মনে হয়। তার চেয়ে বড়ো ত্যাগ একটা করতে হয়েছে বৈ-কি— একটা বাদে সবগুলো তাঁবুই লটবহর কমাবার জন্যে রেখে আসতে হয়েছে। জেন যদিও ঘন-ঘন মাথা নেড়ে ভীষণ প্রতিবাদ করেছে, তবু সেটা শুধু তারই জন্যে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তাঁরা। পুরুষরা সবাই হয় গাঁয়ে গিয়ে আশ্রয় নেবেন, নয়তো খোলাআকাশের তলাতেই ঘুমুবেন। বর্ষাবাদলের মরশুম নয়, আবহাওয়া শুষ্ক, পথটাও বেশি লম্বা নয়—এতে তাঁদের খুব-একটা অসুবিধে হবে না। এ তো কুললে তিনশো মাইল পেরিয়ে যাবার ওয়াস্তা, পনেরো থেকে কুড়ি দিনের সফর। কাজেই ১০ই থেকে ১৫ই মার্চের মধ্যেই তাঁরা কুবো পৌঁছে যেতে পারবেন।

আর যাত্রার সঙ্গে সংগতি রেখেই যেন কতগুলো সুলক্ষণ দেখা দিয়েছে। মোট-



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বইয়েরা পথের ধকলে শ্রান্ত নয়, তারা বেশ দ্রুতই তাল রেখেছে ঘোড়সোয়ারদের সঙ্গে, আর তাঁদের মাত্র পাঁচদিন লেগেছে কাদু থেকে সানাবো আসতে, নব্বুই মাইলের পথ, তাঁরা এসে পৌঁছেছেন ২৮শে। সফরের এই অংশটায় নতুন-কোনো ঘটনাই ঘটেনি। যেমন ভেবেছিলেন, তা-ই হয়েছে, রাতে আফ্রিকিদের কুঁড়েতেই আশ্রয় জুটেছে—ঘিঞ্জি বটে, তবে সবখানেই তো শুধু একরাত্তিরের মামলা। আর যেখানে, গাঁ থেকে দূরে ব'লে, খোলা জায়গাতে শুতে হয়েছে, সেখানেও কোনো ঝামেলা হয়নি। সবখানেই গ্রামগঞ্জের লোক সাদরে অভ্যর্থনা করেছে তাঁদের, খাবারদাবার জোটাতে খুব-একটা মুশকিল হয়নি। যখন তাঁরা পয়লা মার্চ সানাবো ছেড়েছেন, তখনও তাঁদের পুরোনো রসদে হাত পড়েনি। অন্তত এ-যাবৎ এমন-কোনো ঘটনাই ঘটেনি যাতে মনে হয় এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁরা কোনো ভুল করেছেন।

দোসরা মার্চ যখন আমেদে ফ্লরেঁস আর সাঁৎ-বের্ঁ্যা পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন, তখন সাংবাদিক একবার ব'লে উঠেছেন : 'এ ক-দিন বড্ডই *বেশি-ভালো* কেটেছে। একটু অস্বস্তিই লাগছে আমার।'

'উঁহু, ভালো কাটবে না-ই বা কেন ?' সাঁৎ-বের্ঁ্যার মন্তব্য। 'শুভকাজে অমঙ্গল হবে কেন ? আপনি আমাদের ছেড়ে চ'লে যেতে চাননি, তাই ঈশ্বর আপনাদের অনুগ্রহ করেছেন।'

'যে-রকম মসৃণভাবে সব চলেছে, তাতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ তেমন দরকার হবে ব'লে মনে হয় না,' ডাক্তার শাতোনে তাঁদের নাগাল ধ'রে ফেলেছিলেন—তিনি মন্তব্য করেছেন।

'কে জানে !' সাঁৎ-বের্ঁ্যার পুনর্বার মন্তব্য। 'আমরা তো আর এখনও কুবো পৌঁছুইনি !'

'ধুর !' আমেদে ফ্লরেঁস বলেছেন, 'কিস্‌সু হবে না। সব ঠিকঠাক চলবে। আমাদের পেছন থেকে হাওয়া বইছে এখন। হয়তো আরামকেদারায় শুয়ে-ব'সেই কুবো গিয়ে পৌঁছুবো আমরা, আর আমার বরাতে কোনো অ্যাডভেনচারের কাহিনী লিখবারই সুযোগ জুটবে না! যা-একখানা সম্পাদক আমার... কৌতূহলোদ্দীপক লেখা না-পেলে যে কী করবে... আরে ! আরে !' হঠাৎ সম্পাদকের মুণ্ডুপাত থামিয়ে ঘোড়াটার রাশ টেনে ধরেছেন আমেদে ফ্লরেঁস, ঘোড়াটা টাল সামলাতে না-পেরে একটা হোঁচট খেয়েছে।

'কী হ'লো আবার ?' জিগেস করেছেন বারজাক।

'আমার এই ঘোড়াটা। সারাদিন ধ'রে এ কেবলই হোঁচট খাচ্ছে। ভালো ক'রে পরীক্ষা...' ফ্লরেঁসের আর কথাটা শেষ করা হয়নি। ঘোড়াটা আচমকা থমকে দাঁড়িয়েছিলো, সে এখন থরথর ক'রে কাঁপছে, যেন তার হাঁটু আর ভার সইতে পারছে না। সাংবাদিক শুধু কোনোমতে লাফিয়ে নামতে পড়েছেন মাটিতে, তক্ষুনি ঘোড়াটা হাঁটু দুমড়ে মাটিতে বেটাল পড়েছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোড়াটার কাছে সবাই দৌড়ে এসে দেখেছেন, তার তখন অন্তিম দশা—কেমন হাঁপরের মতো নিশ্বাস ফেলছে, খাবি খাচ্ছে। জিনলাগাম খুলে, পাশের ঝরনা থেকে জল এনে তার নাকে জল ছিটিয়ে দিয়েছেন তাঁরা, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি, এক ঘণ্টার মধ্যেই ঘোড়াটা ম'রে গিয়েছে।

'আমার তখন জিভ কাটা উচিত ছিলো,' বিলাপ করেছেন পদাতিক ফ্লরেঁস, 'ভাগ্য নিয়ে বারফট্টাই করলেই তক্ষুনিই যে দুর্ভাগ্য এসে হাজির হয়—এ তো সব্বাই জানে!'

জেন ব্লেজন মৃদু হেসে জিগেস করেছে 'আপনার আবার এ-সব সংস্কারও আছে নাকি?'

'না, ঠিক তা নয়। তবে বড্ড ঘাবড়ে গিয়েছি—বড্ড-বিশ্রী হ'লো ব্যাপারটা।'

তোঙ্গানের ঘোড়াটাকে এবার সাংবাদিকের জিম্মায় দেয়া হয়েছে, আর জেন নিজের ঘোড়াতে তুলে নিয়েছে মলিককে। এই গোলেমালে আজকের সফরটা সংক্ষিপ্ত হ'য়ে গেছে। রাত নামলে তাঁরা রাস্তার পাশে কতগুলো গাছপালার তলায় দিনের পালা সাঙ্গ করেছেন। একটু ঢিবির মতো জায়গাটা, তাতে চারপাশে ভালো ক'রে নজর রাখা যাবে। রাত কাটাবার পক্ষে জায়গাটা ভালোই। নিশ্চয় আগেকার পথিকরাও এই একই সুবিধের জন্যে এই গাছতলাতেই বিশ্রাম করেছিলো—কেননা আশপাশেই তাদের ছাউনি ফেলার চিহ্ন দেখা গেছে। তাদের সব পদচিহ্ন দেখে মনে হয় সংখ্যায় তারা অনেক ছিলো, সঙ্গে অনেকগুলো ঘোড়া ও ছিলো আবার।

কারা হ'তে পারে? কালো, না গোরা? গোরাই হবে ব'লে মনে হয়, কারণ কালোরা ঘোড়া তেমন ব্যবহার করে না। এটা নিশ্চয় ক'রে বোঝা গেছে যখন আমেদে ফ্লরেঁস একটা ছোট্ট জিনিশ কুড়িয়ে পেয়েছেন মাটিতে—যেটা পূর্ববর্তী যাত্রীরা খেয়াল করেনি। একটা বোতাম! তুচ্ছ হ'লেও এটা সত্যি যে এমনতর বোতাম গোরারা ছাড়া সচরাচর কেউই ব্যবহার করে না এখানে।

থেঁৎলে-যাওয়া ঘাসের দশা—তারা আবার মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে—দেখে বোঝা গেছে পূর্ববর্তী সফরকারীরা অন্তত দশদিন আগে এখানে এসেছিলো। তাদের সঙ্গে যখন দেখা হয়নি, এবং তারা যখন উত্তর-পশ্চিমেই চলেছে, অনেকটাই এগিয়ে গেছে, তখন তাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনাটা নিতান্তই কম।

তেসরা মার্চ আর নতুন-কিছু ঘটেনি, কিন্তু চৌঠা মার্চ আবার একটা ঘোড়া আশ্চর্য-ভাবে মারা গেছে—আগের ঘোড়াটারই মতো হঠাৎ মুখথুবড়ে পড়েছে। সন্ধেবেলায় বারজাকের ঘোড়াও কয়েকবার টলোমলো ক'রে ধপ ক'রে প'ড়ে ম'রে গেছে। এখন ব্যাপারটাকে কী-রকম যেন ভয়ংকর লাগছে।

ঘোড়াটাকে ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে ডাক্তার শাতোনে আমেদে ফ্লরেঁসকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়েছেন, চাপাগলায় ফিশফিশ ক'রে বলেছেন, 'আপনাকে একটু



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আড়ালে পেতে চাচ্ছিলুম, মঁসিয় ফ্লরেঁস। খুবই গুরুতর-একটা বিষয়ে আপনাকে সাবধান ক'রে দিতে চাই।'

ফ্লরেঁস অবাক হ'য়ে জিগ্যেস করেছেন : 'কী ব্যাপার, বলুন তো?'

'এই দুটো ঘোড়াকে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে।'

'অসম্ভব!' আমেদে ফ্লরেঁস প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছেন, 'কে এদের বিষ দেবে? কাদুতে যে-কালোদের কাজে বাহাল করেছি? তাদের তো আমাদের পথে বাধা তৈরি ক'রে কোনো লাভ নেই। তার উলটোটাই বরং তারা চাইবে—'

'আমি কারু বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করছি না,' ডাক্তার তবু জোর দিয়েই বলেছেন, 'কিন্তু আমি আমার মত পালটাতে রাজি নই। প্রথম মৃত্যুটা দেখেই আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিলো—এখন আমি নিশ্চিত জানি। লক্ষণগুলো ভুল করার কোনো সুযোগই নেই—এমনকী কোনো হাতুড়ে ডাক্তারও সেগুলো অগ্রাহ্য করতে পারবে না।

'কিন্তু, তাহ'লে আমাদের কী করা উচিত, ডাক্তার?'

'কী-যে করা উচিত, তা আমিও জানি না। আমার কাজ ছিলো আপনাকে সাবধান ক'রে দেয়া। আর সেটা যদি আড়ালে ডেকে এনে ক'রে থাকি তার কারণ একটাই। মিস্ ব্রেজনের আগোচরে আপনি অন্যদের খবরটা জানিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। মিস্ ব্রেজনকে অহেতুক আতঙ্কিত ক'রে তুলে কোনো লাভ নেই।'

'সেটা ঠিক বলেছেন। কিন্তু তবু আমায় ঠিক ক'রে বলুন, ডাক্তার। এই দুই অপঘাত মৃত্যুর মধ্যে কারু অশুভ কালোহাত কি টেনে আনতেই হবে আমাদের? আমাদের ঘোড়াগুলো তাদের খাবারের সাথে কোনো বিষাক্ত উদ্ভিদও তো খেয়ে থাকতে পারে?'

'সেটা হ'তেও পারে। তবে এটা আমাদের বিচার ক'রে দেখতে হবে তাদের খাবারের সঙ্গে ঐ বিষাক্ত উদ্ভিদ *দৈবাৎ* কোনো কারণে মিশে গিয়েছে কি না, না কি তার পেছনে কোনো মানুষের হাত আছে। এ-বিষয়ে আপনিও যে-তিমিরে, আমিও সে-তিমিরে।'

বাকি পাঁচটা ঘোড়াকে এখন সারাক্ষণ কড়া নজরে রাখতে হবে, যাতে আবার এমনতর কোনো বিষময় কাণ্ড না-ঘটে। যখনই অভিযাত্রীরা কোথাও থেমেছেন, কেউ-না-কেউ চোখে-চোখে রেখেছে এদের, যাতে নজর এড়িয়ে কেউ তাদের কাছে যেতে না-পারে। এই সতর্কতার জন্যেই, অথবা হয়তো সত্যি অপঘাত দুর্ঘটনাই ছিলো, পরের দু-দিনে আর-কিছুই ঘটেনি—যাত্রীরা ক্রমেই আবার আশ্বস্ত হ'য়ে উঠেছেন।

এই সমূহ লোকশানই শুধু একমাত্র সন্দেহজনক বিষয় ছিলো। জমিটা সমতল, যাত্রীরা তাই অতিরিক্ত ক্লান্ত না-হ'য়েই চলতে পেরেছেন; মোটরবইয়েরা যত-জোরে ছুটেছে, সেটাই তাঁদের চলবার গতি আর ছন্দ নির্ধারণ ক'রে দিয়েছে। সহজেই তাঁরা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌঁছুতে পেরেছেন কোনো গাঁয়ে, আর তাদের দুঃসময়ের জন্যে তোলা রসদেও কোনো হাত পড়েনি।

কিন্তু ৫ই, এবং ৬ই সকালবেলা, যখন কেটে গেলো অথচ কোনো গ্রাম বা বসতিই চোখে পড়লো না, তখন ঐ জমানো রসদেই তাঁদের হাত দিতে হ'লো। এতে অবিশ্যি কেউই খুব-একটা উদ্বিগ্ন হননি, কারণ তোঙ্গানের দৃঢ়বিশ্বাস শিগগিরই তাঁরা এমন-একটা বড়ো জনপদে এসে পৌঁছুবেন, যেখানে পর্যাপ্ত খাবারদাবার মিলবে।

৬ই সন্ধে গড়িয়ে যাবার পর তাঁরা সেই শহরেই এসে পৌঁছেছেন, নাম ইয়াহো, কিন্তু তোঙ্গানের আশ্বাস ঠিক রক্ষিত হয়নি। যেই তাঁরা *তাতা*-র কাছে পৌঁছেছেন, তখনই শোনা গেছে শোরগোল, চীৎকার, এমনকী কতগুলো গাদাবন্দুকেরও আওয়াজ। কোনাক্রি ছাড়বার পর কোকোরোর সেই হুলুস্থুল ছাড়া, আর-কোথাও তাঁদের এমনতর স্বাগত সম্ভাষণ জোটেনি। তাঁরা রণহুংকারকে বদলে দিতে পেরেছিলেন অন্তত কিছুটা বন্ধুতায়। এখানে, এই ইয়াহোতে, সেই চেষ্টাটাও করা যায়নি।

মিথ্যেই বারজাক চেষ্টা করেছেন, কোনোমতে যদি বসতির লোকজনের সঙ্গে কোনো আলাপ-আলোচনায় বসা যায়; যে-চেষ্টাই করেছেন, সেই চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। মিথ্যেই ওড়ানো গেছে শ্বেতপতাকা। অন্তত এর প্রতীকী তাৎপর্য সারা জগৎই জানে। কিন্তু এই শাদানিশান উলটে প্রচণ্ড-শোরগোল তুলেছে *তাতা*-র ওপাশে, আর ঝাঁকে-ঝাঁকে গাদাবন্দুকের গুলি ছুটে এসেছে ঝাণ্ডাটাকে তাগ ক'রে।

তোঙ্গানে—এবং তারপর আরো-দুজন মোটবাহককে—পাঠানো হয়েছে দূত হিশেবে, লোকে তাদের কথা কানেই নিতে চায়নি, উলটে জবাব দিয়েছে গাদা-গাদা ঢিল ছুঁড়ে, ঠিকমতো যদি তাগ করতো তাহ'লে কাউকেই আর দেখতে হ'তো না। স্পষ্ট বোঝা গেছে, যে-কোনো কারণেই হোক, ইয়াহো-র লোকেরা অচেনা-কারু সঙ্গে কোনো কারবারেই যাবে না—তারা কোনো কথাই শুনতে রাজি নয়। শেষটায় তাঁদের হাল ছেড়ে দিতে হয়েছে। তবু, ইয়াহোর লোকেরা *তাতা*র আশপাশে পাহারা দিয়েছে, যাত্রীদের ওপর থেকে একবারও তাদের নজর সরায়নি।

তাদের এই মনোভাবের পেছনে কারণ যা-ই থাক, এর অর্থ দাঁড়িয়েছে যাত্রীরা তাদের কাছ থেকে কোনো খাবারই কিনতে পারেননি। ৭ই মার্চ তাই মাত্র দু-দিনের রসদ সঙ্গে ক'রেই তাঁদের বেরিয়ে পড়তে হয়েছে। এই অদ্ভুত সম্ভাষণ ছাড়া তাঁদের ঘাবড়ে দেবার মতো আর-কিছুই ঘটেনি। কাদু থেকে তাঁরা দুশো মাইল চ'লে এসেছেন, পুরো সফরের আদ্ধেকটা রাস্তা, আর এটা ভেবেছেন যে পথে এমন গ্রাম নিশ্চয়ই পড়বে যেটা তাঁদের এমন অবাঞ্ছিত মনে করবে না।

৭ই মার্চের ভ্রমণে অবশ্য এই প্রশ্নের সমাধান মেলবার কোনো অবস্থা হয়নি। যতটা দূরত্ব অতিক্রম করা গেছে, সেটা মনে রাখলে দিনটা ভালোই কেটেছে। কিন্তু এবার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য-একটা আপদ তাঁদের ভড়কে দিয়েছে। তৃতীয়-একটা ঘোড়া ধুঁকতে-ধুঁকতে থুবড়ে পড়েছে, এবং আগের দুটো ঘোড়ার মতোই মারা গেছে।

'আমাদের এত নজরদারি সত্ত্বেও কি,' আমেদে ফ্লরেঁস ডাক্তার শাতোনেকে ব্যাকুল সুরেই জিগেস করেছেন, 'কেউ আমাদের ঘোড়াগুলোকে বিষ দিয়েছে?'

'সেটা ঠিক সম্ভব ব'লে মনে হয় না,' ডাক্তার উত্তর দিয়েছেন। 'আমরা কাদু ছাড়ার আগেই বোধহয় বিষ দেয়া হয়েছিলো, হয়তো যেদিন রক্ষিদল আমাদের ছেড়ে পালায়, সেদিনই। সত্যি-যে ঘোড়াগুলো একসঙ্গে মরেনি, পালা ক'রে পর্যায়ক্রমেই মারা গেছে, কিন্তু সে হয়তো জীব হিশেবে যার-যার শরীরের প্রতিরোধশক্তি আর ধাত অনুযায়ী। আর হয়তো বিষের মাত্রাতেও তারতম্য ছিলো।'

'তাহ'লে চারজন ঘোড়সোয়ারের সঙ্গে আমরা এখন তিনজন পদাতিক চলেছি। এটা মোটেই আহামরি বিষয় নয়।'

৮ই মার্চ, বেশ-একটু অব্যবস্থিত চিত্তেই, তাঁরা পথে বেরিয়েছেন। ভবিষ্যৎ ক্রমেই তমসাচ্ছন্ন ঠেকছে। এখন আর এ-কথাটা এড়াবার জো নেই যে, যে-শত্রুকে তাঁরা ফাঁকি দিয়ে চ'লে আসবেন ব'লে ভেবেছিলেন, সে আগে-থেকেই হুঁশিয়ার হ'য়ে তাঁদের ঠেকাবার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে। এমন বিজাতীয় ঘৃণা শুধু-যে আঁৎকেই দেয় তা নয়, হতভম্বও ক'রে দেয় : প্রতিমুহূর্তেই তাঁদের মনে হয়েছে এই বুঝি আরেকটা ঘোড়া মুখথুবড়ে পড়লো। এদিকে, সঙ্গে রসদও ফুরিয়ে এসেছে, এখন আর মাত্র একদিনের খাবার সঙ্গে আছে। সূর্যাস্তের আগেই কোনো গাঁয়ে না-পৌঁছুতে পারলে এবার খিদের জ্বালায় হন্যে হ'তে হবে!

গ্রামটার জন্যে অবশ্য বেশিক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হয়নি। সবেমাত্র একঘণ্টার পথ পেরিয়েছেন, এমন সময় দিগন্তে চোখে পড়েছে ছোটো-ছোটো একঝাঁক কুঁড়েবাড়ি।

একঝলক থেমে গিয়েছেন যাত্রীরা, আন্দাজ করবার চেষ্টা করেছেন এই গাঁয়ে আবার নতুন ক'রে কী সম্ভাষণ জোটে। সামনে ধূ-ধূ করছে যে বিশাল ফাঁকা জমি, তা থেকে আগাম বুঝে-ওঠার সম্ভাবনাই নেই একটু বাদে কী অভ্যর্থনা জুটবে। দূর থেকে মনে হয়, গ্রামটা জনশূন্য, পরিত্যক্ত, মরা, ভুতুড়ে। সামনে শুধু বেঁটেখাটো ঘনঝোপ, আর পায়ে-চলার পথ; তার ওপর এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কালচে-সব দাগ, সে-দাগ যে কীসের, তা তাঁরা বুঝতে পারেননি।

পরে, সাহসে বুক বেঁধে, বারজাক এবং তাঁর সহযাত্রীরা, ফের চলতে শুরু করেছেন গ্রামের দিকে। মাত্র আধমাইল গেছেন, অমনি একটা উৎকট দুর্গন্ধে তাঁদের নাড়িভুঁড়ি উলটে এসেছে। কয়েক পা এগিয়েই তাঁরা দেখতে পেয়েছেন আরো-একটা জমাটবাঁধা কালচে দাগ, যেমন দাগ তাঁরা খানিক আগেই দেখেছেন। আর তার একটু বাদেই তাঁরা শিউরে পেছিয়ে এসেছেন। এত হতভাগ্য আফ্রিকির মরা-পচা লাশ প'ড়ে আছে তাঁদের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে। গ্রাম অব্দি যতদূর চোখ গেছে, সারাটা পথে এমনি অনেক মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে। অন্তত দশটা তো একটু-দূর থেকেই গোনা গেছে।

'দেখুন, দেখুন,' একটা মৃতদেহ পরীক্ষা করতে-করতে আমেদে ফ্লরেঁসকে বলেছেন ডাক্তার শাতোনে। 'গুলিটা যেখানে ঢুকেছে সেখানে একরত্তি একটা ফুটো, কিন্তু যেদিক দিয়ে বেরিয়েছে সেখানকার ক্ষতটা কত-বড়ো, একবার খেয়াল ক'রে দেখুন। কতগুলো একেবার হাড়ে গিয়ে লেগেছে, আর কেমনভাবে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে দিয়েছে, ভাবুন। এই লোকগুলো বিস্ফোরক গুলিতে মারা গেছে।'

'*আবার*!'

'আবার!'

'সেই-যে বুড়ো আফ্রিকিকে আপনি চিকিৎসা করেছিলেন—আমাদের নতুন রক্ষিদল আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার পরে-পরেই?'

'হ্যাঁ, তারই মতো।'

ফ্লরেঁস আর ডাক্তার তারপর চুপচাপ সঙ্গীদের কাছে ফিরে এসেছেন। এই দুর্বোধ প্রহেলিকার পুনরাবৃত্তি থেকে কী-যে অর্থ নিংড়ে নেবেন, তা-ই তাঁরা বুঝতে পারেননি।

গ্রামটার অবস্থা আরো-বীভৎস, যেন একটা অকথ্য বিভীষিকা। অগুনতি চিহ্ন দেখে বোঝা গেছে এখানে একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছিলো, অবশ্য গ্রামটা তাতে রেহাই পায়নি। হানাদারেরা শেষটায় পুরো গ্রামটাই জ্বালিয়ে দিয়েছে। ভাঙাচোরা আধপোড়া কুঁড়েবাড়ির সামনে ছড়িয়ে আছে আরো-মৃতদেহ!

'এরা অন্তত দশদিন আগেই মারা গেছে,' বলেছেন ডাক্তার শাতোনে, 'আর অন্যদের মতো, এরাও মারা গেছে বিস্ফোরক গুলিতে।'

'কিন্তু এমন কশাই কারা?' ধিক্কার দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছেন সাঁৎ-বেরাঁ।

'হয়তো তারাই,' আমেদে ফ্লরেঁস জানিয়েছেন, 'কয়েকদিন আগে আমরা যাদের চলার চিহ্ন দেখেছিলুম। তখন আমাদের মনে হয়েছিলো তারা আমাদের চাইতে দশদিনের পথ এগিয়ে আছে। ডাক্তার যে-সময়টা নির্ধারণ করেছেন, তার সঙ্গে তার সংগতি আছে।'

ঘৃণার সুরে বারজাক বলেছেন, 'তারাই যে, তাতে আর-কোনো সন্দেহই নেই।'

'আর তাদেরই কাছে,' আমেদে ফ্লরেঁস আরো যোগ করেছেন, 'ইয়াহোতে আমাদের ঐ অসহিষ্ণু অভ্যর্থনার জন্যে আমরা ঋণী—এরা নিশ্চয়ই ইয়াহোতেও গিয়ে তাণ্ডব চালাবার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু ইয়াহোর চারপাশে তো *তাতা* আছে, কাজেই এরা গ্রামটার ভেতরে ঢুকতে পারেনি। সেইজন্যেই বোঝা যায় আফ্রিকিরা কেন অমন ভয় পেয়ে আমাদের ধারে-কাছেই ঘেঁসতে দেয়নি।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ, যুক্তি তো তা-ই ব'লে,' ডাক্তার শাতোনে সায় দিয়েছেন।

'কিন্তু এই দুর্বৃত্তরা কারা?' জেন ব্লেজনের মুখটা শুকিয়ে গেছে। 'তারা যদি আশপাশে থাকে তাহ'লে আমাদেরও কি বিপদ হবে না?'

'এই দুর্বৃত্তরা যে কারা, তা আমি জানি না,' আমেদে ফ্লরেঁস বলেছেন, 'কিন্তু আমাদের সঙ্গে তাদের কোনো বোঝাপড়ার ব্যাপার আছে ব'লে আমার অন্তত মনে হয় না। সবকিছু দেখেশুনে মনে হচ্ছে তারা আমাদের থেকে দশ-বারো দিনের পথ এগিয়ে আছে, তাছাড়া তাদের সঙ্গে ঘোড়াও আছে। আমরা যে তাদের নাগাল ধ'রে ফেলবো, এমন সম্ভাবনা খুবই কম।'

ভস্মীভূত গ্রামটায় জীবিত-কাউকেই দেখা যায়নি। গাঁয়ের সব লোক যদি গুলির ঘায়ে নাও ম'রে থাকে, তারা সবাই নিশ্চয়ই প্রাণ হাতে ক'রে পালিয়েছে, তাছাড়া, গ্রামটাকে একেবারে ছারখার ক'রে গেছে লুঠেরারা। আগুন যা খেতে পায়নি, তাকেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে *চার হাওয়ায়*। আর এ-কাজটা যারা করেছে তারা ঠাণ্ডা মাথাতেই, ছক কেটে, করেছে।

সেই সন্ধেয় তাঁরা খোলা মাঠেই থেমেছেন। শুধু একবারের মতো খাবার আছে। সেটাই আদ্ধেক ক'রে খেয়েছেন তাঁরা, বাকিটা তুলে রাখা হয়েছে পরদিন সকালের জন্যে।

৯ই মার্চ তাঁরা দু-দুটো গ্রামের পাশ দিয়ে গেছেন। প্রথমটার ধারে-কাছেই যাওয়া যায়নি, কেননা ছোটো একটা *তাতা* দিয়ে সেটা ঘেরা ছিলো, আর সেখান থেকে হুবহু ইয়াহোরই মতো অভ্যর্থনা এসেছে। দ্বিতীয় গ্রামটা, যেহেতু তার চারপাশে কোনো দেয়াল ছিলো না, তেমনিভাবেই ধ্বংস ক'রে দেয়া হয়েছে—জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার। একটি জনপ্রাণীও কোথাও নেই।

'দেখে মনে হচ্ছে দুর্বৃত্তরা আমাদের সামনে যেন একটা মরুভূমি তৈরি ক'রে দিতে কৃতসংকল্প,' বলেছেন বারজাক।

তা-ই হবে নিশ্চয়ই। কেউ যদি ফন্দি এঁটে থাকে, যাত্রীদের অনাহারে মারবে, তাহ'লে এর চাইতে ভালো—*বা নৃশংস*—কোনো পদ্ধতি তারা বার করতে পারতো না।

আমেদে ফ্লরেঁস এত-সব বিমর্ষমুখের সামনে একটা বানানো-উল্লাসের ভঙ্গিতে ব'লে উঠেছেন, 'এদের সব বাধা সত্ত্বেও এই মরুভূমির মধ্য দিয়ে আমরা চ'লে যেতে পারবো, কুবো থেকে আর-তো মাত্র একশো মাইল দূরে আছি আমরা। আর যা-ই হোক, সমুদ্রের সঙ্গে তো আমাদের কুস্তি করতে হবে না। কশাইখানায় আর মুদির দোকানে যেহেতু হরতাল চলেছে, আমাদের শিকারিরা আমাদের মাংসের রাং খাওয়াবে—তোফা কাবাব!'

মঁসিয় পঁসাঁ কখনও বন্দুক ছোঁননি জীবনে। বাকিরা এই চমৎকার প্রস্তাবে লাফিয়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠেছেন। লম্বা-লম্বা ঘাস, দূরে কিছুতেই দেখতে দিচ্ছে না, তাছাড়া এখানে শিকার করার মতো জীবজন্তু বোধহয় তেমন নেই। দুটো বনমোরগ আর দুটো তিতির ছাড়া আর-কিছুই জোটেনি তাঁদের, আর চোদ্দ জন বয়স্ক লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে সে তো নেহাৎই যৎসামান্য।

সন্ধেবেলার সফরের পর আমেদে ফ্লরেঁস আর ডাক্তার শাতোনে আবারও সবিস্ময়ে লক্ষ করেছেন, *দ্বিতীয়বার*, তাঁরা যেখানে থেমেছেন, সেখানে আগেই আরো-একটা দল থেমেছিলো, ঘাসগুলো সব মাড়ানো, আর দেখে মনে হয় অতি-সম্প্রতিই তারা এসেছিলো এখানে। দুটো দলের মধ্যে যতটা ব্যবধান আছে ব'লে তাঁরা ভেবেছিলেন, ততটা বোধহয় আর নেই। তাঁরা যখন এ-ব্যাপারটা নিয়ে একটু বিচলিতভাবেই আলোচনা করছেন, এমন সময় হঠাৎ তোঙ্গানে—সে ঘোড়াগুলোর তদারক করছিলো—হঠাৎ তাঁদের ডাক দিলে। এইমাত্র আগেকারগুলোর মতো আরো-দুটো ঘোড়া মুখথুবড়ে পড়েছে ! আরো-দুটো ঘোড়া তখনও ছিলো, তবে তাদেরও পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছিলো, কেননা ১০ই মার্চ তারাও মুখথুবড়ে পড়লো, আর উঠলো না।

মোটবাহকেরা কি এই আকস্মিক মৃত্যুগুলোয় ঘাবড়ে গিয়েছে ? না কি পরদিনের শিকারে যখন বিশেষ-কিছুই জোটেনি, তারা হঠাৎ অনাহারে মরতে হবে ব'লে ভয় পেয়ে গিয়েছে ? কারণ যেটাই হোক না কেন, সেদিন রাত্তিরের অন্ধকারে তারাও কেটে পড়লো। ফলে ১১ই মার্চ সকালে ছ-জন গোরা, তোঙ্গানে আর মলিক আবিষ্কার করলে শুধু তারাই আছে জঙ্গলে—না আছে ঘোড়া, না আছে মোটবাহক, না কোনো খাবারদাবার।

এমনিতেই পথের ধকল তো ছিলোই, তার ওপর এমনভাবে নাকাল হওয়ার মানেই হ'লো এবার তার ওপর এসে জুটেছে নিদারুণ হতাশা। সবচেয়ে যেটা দুঃখের, সেটা হ'লো তখন, যখন জেন ব্লেজন তাঁদের এই দুরবস্থার জন্যে নিজেকেই দায়ী করলে। সে-ই তাদের এই বিষম বিপদের মধ্যে টেনে এনেছে। বারে-বারে নিজেকে গালাগাল দিলে সে, বারে-বারে তাঁদের কাছে মাফ চাইলে। কিন্তু আমেদে ফ্লরেঁস বুঝতে পারলেন এক্ষুনি যদি এই নিদারুণ হতাশাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ক'রে ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়া না-যায় তাহ'লে কপালে আরো-কত দুর্ভোগ আছে। তিনি বললেন, 'ও-রকম কথা বলছেন কেন, মিস ব্লেজন ? আমরা তো আর ম'রে যাইনি ! এ ক-দিন যদি ভালো শিকার না-জুটে থাকে তো কী হয়েছে ? কাল নিশ্চয়ই তোফা খানা জুটবে—ব্বাস !'

'এটাও ভুলবেন না,' ডাক্তার শাতোনে ততক্ষণে সাংবাদিকের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন, 'আমাদের ছেড়ে চ'লে গেছে বটে, তবে আফ্রিকিরা আমাদের ছ-ছটা জঠর-পূর্তির হাত থেকেও অব্যাহতি দিয়ে গেছে !'

'তাতে বরং ভালোই হয়েছে,' ফ্লরেঁসের সিদ্ধান্ত। 'তারা যদি না-যেতো তো আমিই তাদের বাড়ি ফিরে যেতে বলতুম। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে এইই বোধহয় ভালো



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ'লো।'

'ধন্যবাদ, মঁসিয় ফ্লরেঁস—আর আপনাদের সবাইকেও ধন্যবাদ,' জেন ব্রেজন বলেছে,গভীর নাড়া খেয়ে। 'আপনাদের দয়া আমি ককখনো ভুলবো না।'

'উঁহু, উঁহু, ও-সব আবেগ-টাবেগের কথা নয় আর,' ফ্লরেঁস তাকে বাধা দিয়েছেন। 'ছোটোহাজরি হিশেবে আবেগ মোটেই উপাদেয় নয়। আমার পরামর্শ যদি শোনেন তো এক্ষুনি আমাদের শিকারে বেরিয়ে-পড়া উচিত। তারপর না-হয় পেট ফেটে না-যাওয়া অব্দি গোগ্রাসে গেলা যাবে!'

মোটবাহকরা না-থাকায় মালপত্রও কমাতে হয়েছে তাঁদের, শেষ-তাঁবুটা ফেলে দিতে হয়েছে, ফেলে দিতে হয়েছে উপহারের সব বেসাতিও। কোনো পরিত্যক্ত গাঁয়ে আশ্রয় না-জুটলে জেন ব্রেজনকেও এখন থেকে অন্যদের মতো খোলামাঠেই ঘুমুতে হবে। উপহারগুলো ফেলে দিতে হওয়ায় তেমন দুঃখ হয়নি—এদিকটা তো সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। কাকেই বা উপহার দিতেন? আর, দুর্বিপাকটা যদি কেটেই যায়, তবেই বা ভাবনা কী? তাঁদের কাছে তো ফ্রাংক আছে, ফরাশি টাকা, সোনায় তৈরি!

১২ই মার্চ আরো-একটা গ্রাম পেরিয়ে গেছেন তাঁরা। গ্রাম নয়, গ্রাম ছিলো আগে, এখন-ভস্মীভূত। শুধু কয়েকজন আফ্রিকির মৃতদেহ প'ড়ে আছে এলোমেলো। আর তাদের দেখে ডাক্তার শাতোনে নির্ধারণ করেছেন, এরা সব সদ্যমৃতই, মাত্র দিন-দুই আগে মারা গেছে! তাহ'লে কি আততায়ীর দল কাছেই আছে? যে-কোনো মুহূর্তেই তাঁদের সঙ্গে এই ভয়ংকরের দলের দেখা হ'য়ে যাবে?

সম্ভাবনাটা বুকের রক্ত হিম ক'রে দেয়। তবু তাঁরা উত্তরমুখোই এগিয়ে চলেছেন। তাছাড়া আর কীই-বা করা যেতো? দক্ষিণে ফিরে-যাওয়া, যেখানে গ্রামের পর গ্রাম ছারখার হ'য়ে গেছে, আর যে-সব গ্রাম টিকে আছে তারাও বেপরোয়া-সব বৈরী—না, ফিরে-যাওয়া সম্ভব নয়। বরং, যেভাবেই হোক, একবার পৌঁছুতেই হবে নাইজারের তীরে—যদি কোনো সাহায্য জোটে তো সেখানেই জুটবে।

সারা পথটাই একইরকম। *তাতা* যদি থাকে, তবে গ্রাম বেঁচেছে, কিন্তু মারমুখী হ'য়ে আছে, বেদম-ক্ষিপ্ত। আর না-হ'লে ধ্বংসের তাণ্ডব ব'য়ে গেছে, মৃতের পর মৃত, সমস্ত-কিছু ছারখার। কোথাও খাবার কেনবার কথাই ওঠে না, শুধু দৈব যদি কিছু জোটায় তো তারই ওপর ভরসা ক'রে থাকতে হচ্ছে : এখানে একটা ইগুয়ানা, ওখানে কিছু কন্দমূল, কখনও-বা লক্ষ্যভেদ করেছে শিকারির গুলি, মাঝে-মাঝেই সাঁৎ-বের্যাঁর বঁড়শিতে ধরা পড়েছে কোনো বেচারি মাছ।

তবে সেটাও ক্বচিৎ। কারণ এখন তাঁরা যেখান দিয়ে চলেছেন, সেখানে জলধারা প্রায় নেইই। তেষ্টায় প্রচণ্ড কষ্ট পেতে হয়েছে পথে, রাস্তায় যত কুয়ো চোখে পড়েছে কারা যেন সে-সব মাটি আর পাথর দিয়ে বুজিয়ে রেখে গেছে। যে-অশুভ শক্তি তাঁদের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরুদ্ধে হন্যে হ'য়ে খেপে উঠেছে, সে কিছুই বোধহয় আর দৈবের হাতে রেখে দিতে চায়নি।

অথচ, তবু, ভেঙে পড়লেও, কেউই তাঁরা মচকাননি। হিংস্র রোদ্দুর তাঁদের পুড়িয়েছে, অবসাদে ক্লান্ত দেহ আর চলতে চায়নি—বিশেষত যখন কোনো শিকার জোটেনি খিদের প্রকোপে টলতে-টলতে এগুতে হয়েছে, পথচলার সময় ধকলের জন্যে হ্রাস ক'রে দিতে হয়েছে, তবু তাঁরা চলেছেন উত্তরে—দিনের পর দিন, পায়ের পর পা ফেলে, অবসাদ সত্ত্বেও, খিদে সত্ত্বেও, পিপাসা সত্ত্বেও।

আশ্চর্য বটে তোঙ্গানে আর মলিকের সহ্যশক্তি। তারা এ-সবকিছুর কোনো পরোয়াই করছে না। উপবাসে-অভ্যস্ত, দারিদ্র্যপীড়িত—এমন অভিজ্ঞতা হয়তো তাদের কাছে নতুন-কিছু নয়।

'আমি ? আমার বেশি খিদে পায় না,' একটা কন্দমূল মলিকের হাতে তুলে দিতে-দিতে বলেছে তোঙ্গানে।

মলিক সেটা হাত পেতে নিয়েছে, শুধু জেন ব্লেজনের দিকেই বাড়িয়ে ধরবার জন্যে। আর জেন সেটা তুলে রেখেছে কালকের জন্যে, যাতে পরদিন সকলকেই সেটা সমানভাগে বেঁটে দেয়া যায়।

আর এইভাবেই চলেছেন সকলে। কেউ একা নয়, প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্যে।

বারজাকের সবচেয়ে-বড়ো দুর্বলতাই হ'লো তিড়িংবিড়িং ক'রে তেলেবেগুনে জ্ব'লে-ওঠা; আর কিছু বললেই প্রথমেই তিনি গাল পেড়ে নেন ফরাশি সরকারকে, তার জন্যেই সকলকে *অকারণে* এমন দুর্ভোগ সইতে হচ্ছে। নিজেকে আর তিনি সংসদের সভাকক্ষে দেখতে পান না মনশ্চক্ষুতে, কিন্তু ঠিক ক'রে রেখেছেন যদি কোনোদিন একবার সংসদের ভেতরে পা দিতে পারেন, তবে আর কাউকে আস্ত রাখবেন না—সংসদীয় ওলিম্পুসের চুড়ো থেকে জুপিটারের মতো কতগুলো শানদার বজ্রই ছুঁড়ে মারবেন।

ডাক্তার শাতোনেও চুপ ক'রে থাকেন বেশির ভাগ সময়—কিন্তু শিকারে তেমন পারদর্শী না-হ'লেও তাঁর বিজ্ঞানীর চোখে খুঁজে বার করেন কোন উদ্ভিদ খাওয়া যায়। আর প্রায়ই কিন্তু খুঁজে বার করতে পারেন সে-সব। তবে হতাশায় যাতে একেবারে তলিয়ে না-পড়ে সবাই, সেজন্যে কথায়-কথায় হেসে ওঠেন।

মঁসিয় পঁসাঁ তো কথাটিও কন না, কারণ তিনি মুখই খোলেন না। তিনি শিকারে যান না; মাছ ধরতে পারেন না; কিন্তু তিনি কোনো ঘ্যানঘ্যানও করেন না। শুধু মাঝে-মাঝেই তাঁদের নোটবই খুলে কী-সব যেন টুকে রাখেন।

সাঁৎ-বেব্যাঁ আছেন আগের মতোই, তেমনি ভুলোমন, তেমনি হাসিখুশি। হয়তো তিনি ভুলেই গিয়েছেন কোথায় আছেন। এমনকী ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথাও ভুলে-যাওয়াটা তাঁর পক্ষে মোটেই আশ্চর্য নয়।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর, এখন দেখে মনে হয়, জেন ব্লেজন বোধহয় আর দর্শন আউড়ে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার কোনো চেষ্টাই করছে না। কিন্তু সে তো জানতোই এই সফরে বিষম দুর্ভোগ আছে, তাহ'লে হঠাৎ এমন বিমর্ষ হ'য়ে পড়েছে কেন? কিন্তু তাই ব'লে তার উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি। সমস্ত কষ্ট সত্ত্বেও সে এখনও জেদ ধ'রে আছে কুবো যাবে ব'লে। কিন্তু যতই সে কুবোর কাছে এসে পড়ছে, ততই তার বুক দুরুদুরু ক'রে উঠেছে শঙ্কায়, উদ্বেগে। কুবোয় গিয়ে কী দেখবে সে গোরস্থানে? কী জানতে পাবে সে দাদা সম্বন্ধে —অকুস্থলে গিয়ে সরেজমিন তদন্ত ক'রে? কিছু কি জানতে পাবে সে? হদিশ পাবে কি, কী ঘটেছিলো? না কি তাকে ফিরে আসতে হবে খালিহাতে? এই প্রশ্নগুলোই তাকে যেন কুরে-কুরে খাচ্ছে সবসময়।

তার বিষাদ আমেদে ফ্লরেঁসের ঝানু সাংবাদিক চোখে না-প'ড়ে পারেনি। তিনি চেষ্টা করেছেন সে যাতে এই বিষাদ কাটিয়ে ওঠে, কথায়-কথায় আজেবাজে রসিকতা অব্দি করেছেন, চেষ্টা করেছেন আবহাওয়াটা হালকা ক'রে দিতে।

অথচ ১২ই মার্চ তিনি ভয় পেয়ে গিয়েছেন বিষম। এমন-একটা ছারখার গ্রামের মধ্য দিয়ে গেছেন, যার সর্বনাশটা বোধহয় মাত্র-একদিন আগে ঘটেছে। আর তখন থেকে অনবরত তাঁর মনে হয়েছে কারা যেন সারাক্ষণ নজর রেখে চলেছে তাঁদের ওপর। যেন আড়ি পেতে সব শুনছে, সজাগ চোখে সব দেখছে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই গোয়েন্দারা ঝোপের আড়াল থেকে নজর রেখে চলেছে, পায়ে-পায়ে লক্ষ ক'রে চলেছে বারজাক মিশনের দুর্বিপাক, আর হয়তো তাঁদের ধুঁকতে দেখে আমোদই পাচ্ছে!

চোখ-কান সারাক্ষণ খুলে রেখেছেন তিনি, আর বারে-বারেই তাঁর সন্দেহের সমর্থনে প্রমাণ পেয়েছেন : দিনের বেলায় দেখা গেছে সদ্য কেউ শিবির তুলে চ'লে গেছে, দূর থেকে ক্ষীণ শোনা যাচ্ছে গুলিগোলার আওয়াজ, দূরে ঘোড়ার ক্ষুরের ক্রমবিলীয়মান শব্দ; রাত্তিরে চুপি-চুপি কথা, সরসর শব্দ ঘাসের মধ্যে, পাতা ন'ড়ে উঠেছে ঝোপে-ঝাড়ে—মোটেই হাওয়ার বা বুনো জন্তুর জন্যে নয়, আর ঐ-যে কে সাঁৎ ক'রে মিলিয়ে গেলো ছায়ায়। অন্যদের উদ্বেগ আর বাড়াতে চাননি আমেদে ফ্লরেঁস, শুধু তোঙ্গানেকেই খুলে বলেছেন তাঁর সন্দেহের কথা। আর হ্যাঁ, তোঙ্গানেও তাঁর এই সন্দেহের অংশিদার। তারও বিশ্বাস, ফেউ লেগেছে তাঁদের পেছনে। শেষটায় সাংবাদিকের মনে হয়েছে, না, সবাইকেই ব্যাপারটা খুলে-বলা উচিত, কেননা তাহ'লে সবাই আরো-সাবধান থাকতে পারবে।

আর এত-সব মুশকিলের মধ্যে দুর্মর আশাবাদীও আশা করতে পারতো না যে তাঁরা সময়মতো গিয়ে কুবো পৌঁছুবেন। ২৩শে মার্চ সন্ধেবেলায় কুবোর আগে শেষবারের মতো সফর থামাতে হয়েছে তাঁদের—কুবো এখনও-অন্তত পাঁচমাইল দূরে। তবে এর নাকি মাইলখানেকের মধ্যেই আছে সেই গোরস্থান যেখানে কাপ্তেন জর্জ ব্লেজনের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরশরীর কবর দেয়া হয়েছিলো—অন্তত তোঙ্গানে তাঁদের সে-কথাই জানিয়েছে।

পরদিন ভোরবেলাতেই, আবার তাঁরা রওনা হ'য়ে পড়বেন। এবার আর সড়কটা ধ'রে যাবেন না, মাঠের মধ্যে দিয়ে যাবেন, সেই-যেখানে কাপ্তেন ব্লেজনের বাহিনী ধ্বংস হ'য়ে গিয়েছিলো—তারপরেই যাবেন কুবোর দিকে। অবস্থা যদি ভিন্নতর হ'তো, অন্যরা হয়তো দিন-কতক বিশ্রাম নিতেন, আর জেন ব্লেজন চ'লে যেতো তার গোঁয়ার অন্বেষণে।

আর তখনই তাঁর সন্দেহের কথা খুলে বলেছেন আমেদে ফ্লরেঁস। সারাদিনের ধকলের পর সবাই যখন জিরোচ্ছে, আর মলিক তাঁদের জন্যে যৎসামান্য রান্না চাপিয়েছে, তখনই সাংবাদিক সবাইকে খুলে বলেছেন এ ক-দিন তিনি কী-কী লক্ষ করেছেন। শত্রুর নজর এড়িয়ে একটা পাও তাঁরা চলতে পারেননি—তার অদৃশ্য উপস্থিতি সবসময় পায়ে-পায়ে তাঁদের অনুসরণ ক'রে এসেছে।

'আমি আরো-একটা কথা জানাতে চাই,' আমেদে ফ্লরেঁস শেষকালে জুড়ে দিয়েছেন, 'আমাদের শত্রুরা আগেও আমাদের সংস্পর্শে এসেছে—প্রায় যেন পুরোনো সাথীই আমাদের। আর যতক্ষণ-না আমার কথাটা মিথ্যে ব'লে প্রমাণ হবে, ততক্ষণ এই ধারণাটা আমি আঁকড়ে ধ'রে থাকবো। এই দলটায় আছে কুড়িজন কালো আর তিনজন গোরা —আর তাদের একজন আমাদের ঐ তথাকথিত লিউটেনান্ট ল্যকুরেরই যমজ—সেই ফিটফাট মানুষটি, আমাদের রক্ষা করার জন্যেই নাকি সে আমাদেব কাছে এসেছিলো।'

'আপনার এই অনুমানের পেছনে যুক্তি...' জিগেস করেছেন বারজাক।

'এক. আমাদের সেই তথাকথিত রক্ষিদলই আগে-ভাগে আমাদের অভিপ্রায় জেনে, আমাদের আগে-আগে রাস্তায় বেরিয়ে সব ছারখার ক'রে দিয়েছে—যাতে অতীবমধুর আপ্যায়ন জোটে আমাদের কপালে। আর তারা যে খুব ভালোভাবেই আমাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেছে, চমৎকার-ওস্তাদির সঙ্গে, সেটা নিশ্চয়ই আপনি তারিফ না-ক'রে পারবেন না। আরেকটা একেবারে সম্পূর্ণ অচেনা বাহিনী—যারা আমাদের অভিপ্রায় জানে না—কিংবা আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই যারা ওয়াকিবহাল নয়—তারা যে এমন কাজ করেছে, সেটা বিশ্বাস করতে মন চায় না। আরো-একটা তথ্য আছে। মনে আছে সেই বুড়ো আফ্রিকিকে, ডাক্তার শাতোনে যার শুশ্রূষা করেছিলেন—সেই-যে প্রথম ছারখার-হওয়া গ্রামটায় আমরা গিয়েছিলুম ? সেই বুড়ো আফ্রিকি কাকে দেখে হঠাৎ অমন ক'রে আঁৎকে উঠেছিলো ? তারা নিশ্চয়ই দ্বিতীয় রক্ষিদল হিশেবে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার আগেই ঐ গাঁয়ে গিয়েছিলো, আর গোরা সার্জেন্টরা সেখানে তাদের তাণ্ডব চালিয়েছিলো।'

'হয়তো আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, মঁসিয় ফ্লরেঁস,' বারজাক সায় দিয়েছেন। 'তবে সেটা এমন-কিছু নতুন কথা নয়। কারু মনেই সন্দেহ নেই যে এই তাণ্ডবের মূল লক্ষ্য আমরাই। সেই তাণ্ডব লিউটেনান্ট ল্যকুরেরই অপকীর্তি, না অন্যকারু, কিংবা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দস্যুরা এখন আমাদের ঘিরে আছে না এখনও আমাদের সামনে সামনে চলেছে, এতে আমাদের অবস্থার কোনো হেরফের কোনো উনিশ-বিশ হয় না।'

'উঁহু,আমার তা মনে হয়নি। মনে হয়নি ব'লেই এখন আমি আপনাদের সব খুলে বলছি। নইলে আগে যেমন ভেবেছিলুম, মিথ্যে ভয় দেখিয়ে আরো-ঘাবড়ে দেবো না, সেই অনুযায়ী চুপ ক'রেই থাকতুম আমি। কিন্তু এখন, সব বাধা সত্ত্বেও, আমরা আমাদের লক্ষ্যের কাছে এসে পৌঁছেছি। কাল হয় আমরা কুবো পৌঁছুবো, অর্থাৎ নিরাপত্তার মাঝখানে, আর নয়তো আমরা আমাদের মত পালটে অন্য-কোনো নতুন পথে রওনা হবো—আর তাতে হয়তো এরা আমাদের আর ওভাবে নাকাল ও নাজেহাল করবেন না। এদের চরদের আমি একবার-অন্তত ফাঁকি দিতে চাই, যাতে এরা বুঝতে না-পারে আমরা আসলে কী করতে চাচ্ছি।'

'তাতে লাভ ?'

'সে-বিষয়ে আমি ঠিক নিশ্চিত নই। এ শুধু আমার একটা ভাবনা। তবে আমার মনে হয়, মিস ব্লেজনের খাতিরেই, আমরা যে কোন পথে যাবো, মিস ব্লেজনের সমস্ত অনুসন্ধান শেষ হওয়ার আগে তা যেন কেউ না-জানতে পারে।'

'মঁসিয় ফ্লরেঁসের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত,' এতক্ষণে জেন ব্লেজন বলেছে, 'কে জানে এবার শত্রুরা খোলাখুলি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করবে কি না ? হয়তো কালকেই তারা এসে আমাদের আক্রমণ করবে, যাতে তীরের কাছে এসে তরী ডোবে ! কিন্তু এতদূরে এসে আমার অনুসন্ধান শেষ না-ক'রে আমি মরতে চাই না। সেইজন্যেই আমার মনে হয়, মঁসিয় ফ্লরেঁস ঠিকই বলেছেন। এদের চরদের যে-ক'রেই হোক ফাঁকি দিতে হবে আমাদের। কিন্তু আমি শুধু এটাই বুঝতে পারছি না এদের ফাঁকি দেয়া যাবে কীভাবে!'

'খুবই সহজে।' ফ্লরেঁস ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়েছেন। 'এতদিন এরা আমাদের সরাসরি আক্রমণ করেনি; সেই ঝুঁকি নিতে চায়নি, কারণ যা-ই হোক না কেন। তারা শুধু উৎপাতই সৃষ্টি করেছে আমাদের পথে, পর-পর বাধাবিপত্তি তৈরি ক'রে গেছে, আর সারাক্ষণ আমাদের ওপর নজর রেখেছে। মিস ব্লেজন ঠিকই বলেছেন, আমাদের গোঁয়ার্তুমি একেবারে সহ্যের শেষসীমা পেরিয়ে না-গেলে তারা সরাসরি এসে আমাদের ওপর চড়াও হবে না। হয়তো তাদের নজরদারিতে একটু ঢিলেমি আসে, যখন তারা নিশ্চিত ভেবে নেয় যে রাতটা আমরা বিশ্রাম ক'রেই কাটাবো—আমাদের রোজকার কাজের ধরন দেখেই তারা আশ্বস্ত হ'য়ে যায়। তারা জানে যে রাতে তারা আমাদের যেখানে রেখে গিয়েছিলো, পরদিন সকালে সেখানে এসেই দেখতে পাবে।

'অন্যদিনের চাইতে আজকে হঠাৎ যে তারা আরো-বেশি সজাগ হ'য়ে থাকবে, এমনটা মনে করার কোনো কারণ নেই—যদি-না তারা এক্ষুনি আমাদের আক্রমণ করবার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে তোড়জোড় করে। আর তা যদি করে, তাহ'লে তো তাদের ফাঁকি দিয়ে পাশ কাটিয়ে অন্যপথে চ'লে-যাবার চেষ্টা করাটা আরো-জরুরি হ'য়ে উঠবে। আর তা যদি নাও হয়, এক্ষুনি এখান থেকে বেরিয়ে যাবার মতো সহজ সুযোগই বা আর-কখন আসবে? বিশেষত আজ যে-রকম ঘন হ'য়ে অন্ধকার নেমেছে, তাতে আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে একজন-একজন ক'রে আমরা যাবো, সন্তর্পণে, যতদূর-সম্ভব নিঃশব্দে, যত-কম আওয়াজ হয় ততই মঙ্গল, আর পরে দূরে গিয়ে কোথাও মিলবো। আর যা-ই হোক, আমরা তো আর অগুনতি লোকের চোখ এড়িয়ে যেতে চাচ্ছি না, আর আমরা যদি ফিটফাট ধোপদুরস্ত লিউটেনান্ট ল্যকুরের মুখোমুখি প'ড়ে যাই, তবে সে হবে নিতান্তই মন্দকপাল।'

জেন ব্লেজন তক্ষুনি এই ফন্দিটাকে সমর্থন করেছে, আর ঠিক হয়েছে একজন একজন ক'রে তাঁরা পুবদিকে যাবেন আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে চুপি-চুপি, রাত নামবার আগে সেই-যে তাঁরা পথে দেখেছিলেন একঝাড় বড়ো-বড়ো গাছপালা প্রায় একমাইল আগে পুবদিকে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে গিয়ে তাঁরা পরস্পরের জন্যে অপেক্ষা করবেন। গাছগুলো এখন আর আঁধারে দেখা যাবে না, ঐ-যে মেঘের ওপাশে একটা ছোট্ট তারা মিটমিট করছে, সেটাই তাদের নিশানা দেখিয়ে দেবে। প্রথমে যাবে তোঙ্গানে, তারপর জেন ব্লেজন, তারপর মলিক, অন্যরা পর-পর যাবেন এক-এক ক'রে, সবশেষে যাবেন আমেদে ফ্লরেঁস।

কোনো গণ্ডগোলই হয়নি তাঁদের, যাবার সময়। দু-ঘণ্টা বাদেই তাঁরা সবাই এসে ঐ ঝাঁকড়া গাছগুলোর তলায় জড়ো হয়েছেন, ঘুটঘুটে অন্ধকারকে এখানটায় যেন জমাটই বাঁধিয়ে দিয়েছে গাছগুলো। দ্রুতপদে গাছপালার ঝাঁকের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন তাঁরা, যাতে তাঁদের আর শত্রুর মাঝখানে থাকে অভেদ্য কোনো পর্দা। তারপরে আরো-হনহন ক'রে এগিয়েছেন তাঁরা। লক্ষ্যের এত-কাছে এখন তাঁরা, আর তাই যেন ক্লান্ত হাড়ে আবার নতুন ক'রে টগবগে উৎসাহের সঞ্চার করেছে, কারুই আর শ্রান্তিতে গা ভেঙে পড়ছে না।

আধঘণ্টা ধ'রে হনহন ক'রে হেঁটে এগিয়ে যাবার পর তোঙ্গানে থেমে পড়লো। তার ধারণা তাঁরা ঠিক সেই জায়গাতেই এসে পড়েছেন যেখানে বিদ্রোহী কাপ্তেনের বাহিনীকে একেবারে উৎখাত ক'রে দেয়া হয়েছিলো। যে-জায়গাটা জেন ব্লেজন খুঁজছে। সেটা কিন্তু অন্ধকারে সে ঠিক চিনে উঠতে পারেনি, দিনের জন্যেই অপেক্ষা করতে হবে তাদের।

কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করার সুযোগ পাওয়া গেলো। শুধু জেন ব্লেজনই ঘুমুতে পারেনি, পরদিনের প্রখর আলো যে কী উদ্‌ঘাটন ক'রে দেবে, তা তার জানা নেই। কত-যে প্রশ্ন ভিড় ক'রে আসছে মনে, আগের চাইতেও যেন অনেক-বেশি দুঃসহ তাদের চাপ।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার দুর্ভাগা দাদা কি সত্যি মারা গেছে? সে কি তার প্রমাণ পাবে হাতে-নাতে, সময় যাকে এখনও ধ্বংস ক'রে দিতে পারেনি? আর যদি-বা প্রমাণ পাওয়া যায় যে সে মারা গেছে, তাতেই কি এটা প্রমাণ হবে যে সে-ই ছিলো অপরাধী, না কি তা ব'লে দেবে যে সে ছিলো নির্দোষ—এমনও হ'তে পারে যে দোষী বা নির্দোষ কোনোটাই প্রমাণ হ'লো না! তখন? আর কাল কোন্‌খানে সে তার সরেজমিন তদন্ত শুরু করবে, কোনখান থেকে? সেই শোচনীয় পরিণামের শেষসাক্ষীরা হয়তো সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে, হয়তো উধাওই হ'য়ে গেছে—বেপাত্তা, হয়তো ম'রেই গিয়েছে তারা! না কি সে খুঁজে পাবে, অন্তত একজনকেও? আর যদি পায়ও, কোন্ সত্য সে শুনতে পাবে তাদের মুখ থেকে?

ছ-টার একটু আগেই সবাই তৈরি। দিন না-ফোটা অব্দি এখন শুধু অপেক্ষা, প্রচণ্ড কোন্ আবেগ যেন ঝুঁটি টেনে ধরেছে সবার, সকলেরই চোখ প'ড়ে আছে তোঙ্গানের দিকে—আর সে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে চারপাশে, চেনবার চেষ্টা করছে কোনো চিহ্ন—যে-চিহ্ন ব'লে দেবে কোথায় কাপ্তেন জর্জ ব্লেজনের সমাধি।

'ঐ-যে!' তিন-চারশো গজ দূরে একলা দাঁড়িয়েছিলো একটিমাত্র গাছ—তার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে ব'লে উঠেছে তোঙ্গানে।

একটু পরেই সকলেই সেই গাছের তলায়। তোঙ্গানে এখনও বলছে যে এখানেই কবর দেয়া হয়েছে কাপ্তেনকে, তার মনে কোনো সন্দেহ নেই, যদিও জমিটা দেখে কিছুতেই বোঝবার জো নেই এখানে কাউকে কোনোদিনও গোর দেয়া হয়েছিলো। তাঁরা জমিটা খুঁড়তে শুরু ক'রে দিয়েছেন জ্বরাতুর দ্রুতহাতে, ছুরি দিয়ে উপড়ে তুলছেন মাটি, মুঠো-মুঠো ক'রে সেগুলো তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলছেন পাশে। আর গর্তটা ক্রমেই বড়ো হ'য়ে উঠছে।

'সাবধান!' হঠাৎ ব'লে উঠেছেন সাংবাদিক, 'এই-যে কতগুলো হাড়...'

ভীষণ নাড়া খেয়ে গিয়ে, জেন ব্লেজন তখন হেলান দিয়েছেন ডাক্তারের গায়ে।

খুবই-সাবধানে তারপর তাঁরা উন্মোচিত করেছেন কবর : একটি দেহ, না-না দেহ নয়, কঙ্কাল, চমৎকারভাবে সুরক্ষিত, আস্ত-একটি কঙ্কাল। একদিন যেটা হাত ছিলো তার ওপর জড়িয়ে আছে কাপড়, সোনার জরির কাজ-করা, বুঝিয়ে দিচ্ছে কোন্-পদে আসীন ছিলো, বুকের খাঁচার হাড়গোড়ের পাশেই তাঁরা দেখতে পেয়েছেন এক মানিব্যাগ, সময় আর মাটি তাকে সম্পূর্ণ খেয়ে ফেলেছে যেন। তাঁরা খুলেছেন ব্যাগটা, সাবধানে; তার ভেতরে শুধু একটাই দলিল, জর্জ ব্লেজনকে লেখা একটা চিঠি, চিঠিটা লিখেছে তার বোন।

দরদর ক'রে জল বেরিয়ে এসেছে তরুণীর চোখ ফেটে। সেই বিবর্ণ রংচটা কাগজটাকে তুলে ধরেছে তার ঠোঁটে, আর তার আঙুলের ফাঁকে ঝুবঝুর ক'রে গুঁড়িয়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে সেই কাগজ। তারপর, প্রায় যেন মূর্ছিত হ'য়েই পড়বে, তবু সে হেঁটে গেছে কবরের কাছে।

'ডাক্তার,' কম্পিত রুদ্ধস্বরে সে বলেছে শাতোনেকে, 'আপনি কি দয়া ক'রে আমার দাদাবেচারির পার্থিব-অবশেষ একবার পরীক্ষা ক'রে দেখবেন না?'

'আপনি যা বলবেন, মিস ব্লেজন,' এতই তিনি ব্যথা পেয়েছেন যে ভুলেই গেছেন খিদেয় তাঁর পেটের ভেতরটা বিষম মোচড় দিয়ে উঠছে। কবরের মধ্যে নেমে পড়েছেন তিনি, প্রায় পুলিশসার্জেনের মতো সাবধানি আর যথাযথ তার ভঙ্গি, তারপর শুরু করেছেন তাঁর পরীক্ষা। যখন শেষ হয়েছে তাঁর দেখা, মুখটা তাঁর গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে, তাতে তীব্র আবেগের ছাপ।

'আমি, লরেঁ শাতোনে, পারী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ডি.,' সকলের স্তব্ধতার মাঝখানে গম্ভীরভাবে তিনি শুরু করেছেন, 'আমি এই-কতগুলো তথ্য দায়িত্ব নিয়ে বলছি : এক. যে-হাড়গোড় আমাকে পরীক্ষা ক'রে দেখতে বলা হয়েছে, মিস ব্লেজন যে-কঙ্কালকে তাঁর দাদার কঙ্কাল ব'লে জানিয়েছেন, তাতে কোনো আগ্নেয়াস্ত্রর গুলি লেগে ক্ষত হবার কোনো চিহ্নই নেই; দুই. এই কঙ্কাল যার, তাকে খুন করা হয়েছে; তিন. মৃত্যুর কারণ ছুরির ঘা, ওপর থেকে কেউ আঘাত করেছে ছুরি দিয়ে আর বাম কক্ষকাস্থি ভেদ ক'রে হৃৎপিণ্ডের ওপরের লতি অব্দি পৌঁছেছে ছুরির ফলা; চার. এই সেই ছুরি, এখনও হাড়ের মধ্যে গাঁথা ছিলো, আমি নিজের হাতে যেটা টেনে বার করেছি।'

'খুন করা হয়েছে!' প্রায়-ভেঙে-প'ড়ে, অস্ফুটস্বরে ব'লে উঠেছে জেন।

'*খুন করা হয়েছে*, আবারও আমি সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে জানাচ্ছি।'

'*আর পেছন থেকে?*'

'পেছন থেকে।'

'তাহ'লে *জর্জ নিরপরাধ*!' এবার জেন ব্লেজন কান্নায় ফেটে পড়েছে।

'আপনার দাদা নিরপরাধ কি না, সেটা বলবার যোগ্যতা আমার নেই,' খুব-নরম সুরে বলেছেন ডাক্তার শাতোনে, 'যে-তথ্যগুলো আমি জোর দিয়ে বলেছি, তার মতো জোর দিয়ে অবশ্য বলতে পারবো না—তবে মনে হয় সে-সম্ভাবনাটা খুবই জোরালো। আমি যা পরীক্ষা ক'রে বুঝতে পেরেছি তা এই : আপনার দাদা অস্ত্রহাতে লড়তে-লড়তে মারা যাননি—যেমনটা অ্যাদ্দিন ধ'রে ভাবা হয়েছে; তাঁকে পেছন থেকে ছুরি মারা হয়েছে, ছুরির ঘা নেমেছে ওপর থেকে নিচের দিকে, গুলিগোলা চলবার আগে, বা তখনই, কিংবা তার অনেক-পরে। ঠিক কখন, কে তাকে ছুরি মেরেছিলো, তা আমার জানা নেই। একটা কথাই শুধু বলতে পারি : কোনো সৈন্য তাঁকে ছুরি মারেনি, আর যে-অস্ত্রটা আপনার দাদার প্রাণ হরণ করেছে, সেটা সামরিক বাহিনীর কোনো অস্ত্র নয়, ষণ্ডাগুণ্ডার হাতের ছুরি।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, ডাক্তার,' জেন ক্রমেই নিজেকে সামলে তোলবার চেষ্টা করেছে, 'আমাদের অভিযানের প্রথম ফলটা, *আর যা-ই হোক*, গভীর আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছে। শুধু আর-একটা অনুরোধ, ডাক্তার : আপনি আজ যা দেখেছেন, তা কি আপনি আমায় লিখে দেবেন—আর এই এঁরা তাতে যদি দয়া ক'রে সাক্ষী হিশেবে স্বাক্ষর করেন!'

জেন ব্লেজনের ইচ্ছাটা তক্ষুনি পালন করা হয়েছে। স্বয়ং মঁসিয় পঁসাঁ তাঁর বিখ্যাত নোটবই থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে দিয়েছেন, আমেদে ফ্লরেঁস তাতে সব গুছিয়ে লিখেছেন—ডাক্তার যা-যা বলেছেন, সব তথ্য, ডাক্তার তারপর তাতে স্বাক্ষর করেছেন, আর সবাই সাক্ষী হিশেবে তাতে সই করেছেন—তারপর কবরের মধ্যে যে-ছুরিটা পাওয়া গেছে, সেটা সমেত এই কাগজ তুলে দেয়া হয়েছে জেন ব্লেজনের হাতে।

আর কাগজ এবং ছুরিটা ছুঁয়েই প্রচণ্ড আবেগে থরথর ক'রে কেঁপে উঠেছে জেন, ছুরি নয়, খঞ্জর। জং ধ'রে গিয়েছে ফলায়, হয়তো ঐ কালচে দাগগুলো রক্তেরই দাগ। তার আবলুশকাঠের হাতলটা ভিজে মাটিতে থেকে খ'য়ে এসেছে—কিন্তু তবু তাতে খুব-মনোযোগ দিয়ে পড়া যাচ্ছে, ঝাপসাভাবে, কতগুলো হরফ।

'এই দেখুন, এই-যে,' এই প্রায়-অদৃশ্য হরফগুলো দেখিয়ে ব'লে উঠেছে জেন, 'এই খঞ্জরের গায়ে যে খুনীর নাম লেখা!'

'দুর্ভাগ্য যে ঝাপসা হ'য়ে এসেছে, কিছুতেই পড়া যাচ্ছে না,' খঞ্জরটার হাতল চোখের কাছে এনে পরীক্ষা করতে-করতে বলেছেন আমেদে ফ্লরেঁস। 'না, না, একমিনিট সবুর করুন... একটু যেন পড়তে পারছি—এই একটা *i*, আর এটা *l*—'

'তাতে তো কিছুই বোঝবার জো নেই,' বলেছেন বারজাক।

'হয়তো আততায়ীর মুখোশ খুলে ফেলবার জন্যে এর চেয়ে বেশি-কিছু আর চাই না,' গম্ভীর, কঠোর সুরে ব'লে উঠেছে জেন।

তার অনুরোধে, তোঙ্গানে তারপর সাবধানে মাটি দিয়ে বুজিয়েছে জর্জ ব্লেজনের কবর, আর তারপর, আবার তার নিঃসঙ্গতার কাছে কবরটাকে ফিরিয়ে দিয়ে, সবাই এবার রওনা হয়েছেন কুবোর দিকে।

কিন্তু দু-তিন মাইল এগিয়েই থেমে পড়তে হয়েছে তাঁদের। জেন ব্লেজনের দেহে যেন আর একফোঁটাও শক্তি নেই, কেমন নির্জীব দেখাচ্ছিলো তাকে, তারপর হঠাৎ একসময় সে লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে।

'আবেগ!' ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়েছেন ডাক্তার শাতোনে।

'আর অনাহার!' আমেদে ফ্লরেঁস ঠিক মোক্ষম জায়গাটা ছুঁয়েছেন। 'কী, সাঁৎ-বের্ঁ্যা, আসুন, আপনি কি হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আপনার ভাগ্নিকে ম'রে যেতে দেখবেন না কি—হোন-না তিনি আপনার মাসিও। চলুন শিকারে যাই, আর খবরদার, আমাকেই যেন শিকার ভেবে গুলি ক'রে বসবেন না!'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলা ভারি-সহজ। শিকার সেখানে মিললে তো। দিনের অনেকটাই কেটে গেছে, কিন্তু দুই শিকারি তাঁদের বন্দুকের নলের সামনে কিছুই পাননি, কিন্তু তারপরেই হঠাৎ ভাগ্য তাঁদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছে, সত্যি-বলতে এমন কপাল তাঁদের আগে কখনোই হয়নি, দুটো বনমোরগ আর একটা তিতির পড়েছে, একটার পর একটা, তাঁদের গুলি লেগে। অনেকদিন বাদে আজ প্রথম একটা দারুণ উপাদেয় ভোজ লাগানো যাবে। তাই সবাই মিলে ঠিক ক'রে নিলেন আজ সন্ধেবেলায় আর কুবো যাওয়া নয়—এই-শেষবার খোলা আকাশের তলাতেই রাতটা তাঁরা কাটিয়ে দেবেন।

অবসাদে এলিয়ে পড়েছে গা, আর দুশমনদেরও দিব্বি ফাঁকি দেয়া গেছে—এই কথা ভেবে অন্যান্য রাতের মতো কেউ আর অতন্দ্র-পাহারার কথা ভাবেননি। কাজেই রাতের বেলায় যে অদ্ভুত ছায়ামূর্তিগুলো ভিড় ক'রে এসেছে, তা তাঁরা কেউই দেখতে পাননি। পশ্চিমে, ধূ-ধূ মাঠটার ওপাশে, কতগুলো মিটমিটে আলো এদিকে-সেদিকে ঘুরে বেড়িয়েছে অনেকক্ষণ।

আর পুব থেকে তুলনায় আরো-উজ্জ্বল আলো সাড়া দিয়েছে এই মিটমিটে আলোগুলোকে। সেই বিশাল ধূ-ধূ সমতলজমিতে টিলাপাহাড় নেই আশপাশে, তবু আলোগুলো জ্বলছে মাটি থেকে বেশ-ওপরেই। আস্তে-আস্তে পশ্চিমের মিটমিটে আলো আর পুবদিকের ফটফটে আলো পরস্পরের কাছে এগিয়ে এলো, পশ্চিমের আলো এগিয়েছে ধীরমন্থর, পুবের আলো ধেয়ে এসেছে দ্রুতসত্বর। আর সব আলো এসে মিলে গেলো সেখানটায়, যেখানে বারজাক মিশনের সদস্যরা সবাই ঘুমিয়ে-কাদা।

আচমকা ধড়মড় ক'রে উঠে পড়েছেন ঘুমন্তেরা—অদ্ভুত গুমগুমে আওয়াজটা আবার কাছেই যেন গর্জন ক'রে উঠেছে, সেই যে-আওয়াজ প্রথম শোনা গিয়েছিলো কানকানে। আওয়াজটা এবার তীব্র, মনে হয় যেন কানের পাশেই—এত-কাছে। তখনও ভালো ক'রে চোখ খোলেননি বোধহয়, চোখধাঁধানো আলো এসে পড়েছে চোখেমুখে, পর-পর দশটা সন্ধানী আলো, আচমকা জ্ব'লে উঠেছে স্থিরবিদ্যুতের মতো, পুবদিকে—সম্ভবত একশোগজও দূরে নয় তারা। চোখ রগড়ে, হাতের পিঠ দিয়ে চোখ আড়াল ক'রে যখন তাঁরা ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছেন, ছায়ার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে কতগুলো যেন ছায়ারই-গড়া-মূর্তি, এসে ঢুকে পড়েছে সন্ধানী আলোর শঙ্কুলতায়, আর ঝাঁপিয়ে পড়েছে আঁৎকে-ওঠা অর্ধেক-অন্ধ সদ্যোত্থিতদের ওপর। পরের মুহূর্তেই কারা যেন মাটির ওপর পেড়ে ফেলেছে তাঁদের।

আর অন্ধকারের মধ্য থেকে, কার যেন রূঢ়কঠিন কণ্ঠস্বর ফরাশিতে ব'লে উঠেছে : 'কী, সব ক-টাকেই পাকড়েছো তো ?'

তারপরেই, একটু থেমে : 'প্রথম যে নড়বে তারই মাথার খুলি গুলি মেরে উড়িয়ে দেয়া হবে। এসো সব্বাই, চলো, ফেরা যাক !!'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

*দ্বিতীয় খণ্ড*

# শাহারায় শহর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক

# ব্ল্যাকল্যাণ্ড

এই বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও, সবচেয়ে-যথাযথ এবং সাম্প্রতিক মানচিত্রগুলোয়, প্রায় ৩০০,০০০ বর্গমাইলের সেই বিশাল-ফাঁকা শাহারাকে দেখানো হয়েছে নিছকই একটি শূন্যজায়গা হিশেবে—খালি, ফাঁকা, ধূ-ধূ, কিছুই নেই। ফরাশি সংসদের সদস্য মঁসিয় বারজাকের নেতৃত্বে যখন নাইজারের তীরে যাবে ব'লে এক অভিযাত্রীদল বেরিয়েছিলো, তখনও কেউ শাহারাকে পেরুতে পারেনি—কেউ এমনকী তার মধ্যে ঢুকেও পড়েনি কোনোদিন। শাহারা ছিলো সম্পূর্ণ অচেনা।

সে-সময় এই অজ্ঞাত অঞ্চলটিকে নিয়ে কত-যে কিংবদন্তি, কত-যে উপকথা ছড়িয়েছিলো তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এখানকার স্থানীয় লোকে বলেছে, তারা নাকি মাঝে-মাঝেই দেখেছে অতিকায়-সব কালোপাখি হাওয়ায় পাখাদুটো ছড়িয়ে চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে উড়ে চ'লে যাচ্ছে এই রুক্ষ, শুষ্ক, বন্ধ্যা ভূমির দিকে। মাঝে-মাঝেই নাকি বিশাল-সব লোহিত শয়তান চেপে বসেছে এমন-সব ঘোড়ার ওপর যাদের নাক থেকে আগুনের হলকা বেরোয়, আর টগবগ টগবগ বেরিয়ে এসেছে এই রহস্যময় বিস্তার থেকে। এই ভুতুড়ে, বিদঘুটে, উদ্ভট ঘোড়সোয়ারেরা টগবগ ক'রে ঢুকেছে জনপদে, কচুকাটা ক'রে মেরেছে সামনে যাকে পেয়েছে তাকেই, তারপর আবার ফিরে গেছে ধূ-ধূ মরুভূমির দিকে, ঘোড়ার পেছনে উঠিয়ে নিয়ে গেছে নারীপুরুষশিশু—আর সেই আবালবৃদ্ধবনিতা আর-কোনোদিনও ফিরে আসেনি লোকালয়ে।

কারা এই নৃশংস নরাধম, যারা ধ্বংস ক'রে দেয় লোকালয়, লুঠপাট করে এমনকী কুঁড়েঘরেও, গরিব-বেচারাদের যৎসামান্য যা সম্বল থাকে, সামান্য যা পুঁজি তাও ছিনিয়ে নিয়ে যায়, আর পেছনে রেখে যায় ছারখার জমি, মরীয়া হতাশা, আর হাহাকার-হারানো মৃত্যু? কারা তারা? কেউ জানে না। কেউ জেনে নেবার কোনো চেষ্টাও করেনি কোনোদিন। কার বুকে অতখানি বেপরোয়া পাটা আছে যে দুশমনদের পেছন-পেছন তাড়া ক'রে গিয়ে ঢুকবে তপ্তবালির সেই বিস্তারে—যাদের সম্বন্ধে রটনা এটাই যে তারা সবাই অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী, নেহাৎই হেজিপেঁজি সাধারণ মানুষ নয়।

এইসব জনরব ছড়িয়েছিলো নাইজারের জল ধ'রে, এমনকী তার তীর থেকে একশো মাইল দূরেও।

যদি, ভয়ে-আধমরা এই আফ্রিকিদের চেয়ে ঢের-দুঃসাহসী কোনো ডাকাবুকো মানুষ মরুভূমির মধ্যে ঢুকে যাবার স্পর্ধা দেখাতো, যদি এই বীরনায়ক, ১৫০ মাইল পথ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরিয়ে চলে যেতো ১° ডিগ্রি ৪০' মিনিট পুবে আর ১৫° ডিগ্রি ৫০' মিনিট উত্তরে, তাহ'লে হয়তো সে তার স্পর্ধার পুরস্কার পেতো। সে এমন-একটা জিনিশ দেখতে পেতো তার আগে কেউই যা কোনোদিন দ্যাখেনি, না-কোনো দুঃসাহসী অভিযাত্রী না-কোনো সদাগরের উটের বহর : সে দেখতে পেতো : *একটা শহর*।

হ্যাঁ, একটা শহর, সত্যিকার-এক শহর, গল্পকথার কোনো শহর নয়, কোনো মানচিত্রেই যে-শহরের কোনো উল্লেখ নেই, কেউই যার অস্তিত্বের কথা ঘুণাক্ষরেও কোনোদিন কল্পনাও করেনি, যার মোট লোকসংখ্যা—একেবারে বালবাচ্চাদের হিশেবে না-ধ'রে, ৬,৮০৮-এর কম হবে না।

যদি এই বেপরোয়া পথিক গিয়ে কাউকে এই শহরের নাম জিগেস করতো, আর শহরবাসীদের কেউ যদি তাকে নামটা ব'লে দিতো, সে হয়তো ফরাশিতে ব'লে দিতো : '*ল্য নম দ্য সেং ভিইয়ে এস্ তের-নোয়া*' : তবে সে হয়তো ইতালিয় ভাষাতেও উত্তর দিতে পারতো, '*কোয়েস্তা সিত্তা এ তের্‌রা-নেরা*'; বাম্বারায়, '*নি দুগুবা এন্‌তোকো আ বে বান্‌কু ফিঙ*'; পোর্তুগিজে, '*ইস্তা সিউদাদ ই তের্‌রানেগ্রা*'; এস্পানিওলে, '*এস্তা সিউদাদ এস্ তিয়ের্‌রানেগ্রা*'; ইংরেজিতে, '*দ্য নেম অভ দ্য সিটি ইজ্ ব্ল্যাকল্যাণ্ড*'। অর্থাৎ ভাষা যা-ই হোক না কেন, উত্তরটা সবসময়েই বোঝাতো : '*এই শহরের নাম কালো দেশ*'—ব্ল্যাকল্যাণ্ড। এমনকী তথ্যটা হয়তো লাতিনেও পৌঁছে যেতো জিজ্ঞাসুর কানে : '*ইস্তা উর্‌বস্ তের্‌রা নিগ্রা এস্‌ৎ*।' কৌতূহলী পথিকের সঙ্গে হয়তো দৈবাৎই, তাহ'লে, দেখা হ'য়ে গেছে জোসিয়াস এবার্‌লির, প্রাক্তন অধ্যাপক, যিনি ব্ল্যাকল্যাণ্ডে তাঁর ভাষাতত্ত্বে অগাধ-পাণ্ডিত্যের কোনো চাহিদাই নেই দেখে এক দোকান খুলে বসেছেন, আর হ'য়ে উঠেছেন—তেমন বৈয়াকরণ মানে-টানে কিছু না-থাকলেও, '*জোসিয়াস এবার্‌লি, দাওয়াই নির্মাতা, রঞ্জকসামগ্রী*' বিক্রেতা।

এই নয়া বাবিল মিনারে সব ভাষাই বলা হ'য়ে থাকে, যার জনবল—বারজাক মিশন যখন কুবোর কাছে ভির্মি খেয়ে প'ড়ে কুপোকাৎ হ'য়ে গেছে—ছিলো ৫,৭৭৮ আফ্রিকি নারীপুরুষ বাদ দিলে, ১,০৩০ জন গোরা। যদিও এরা সবাই বিশ্বের নানাপ্রান্ত থেকে এসেছে, প্রায় সকলেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্যটা ছিলো কিন্তু এক : এরা হয় দ্বীপান্তর থেকে পালিয়েছে আর নয়তো জেলখানাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং পশ্চাদ্দেশ দেখিয়েছে—এরা হচ্ছে দিগ্বিদিকহারা ডানপিটের দল যারা ন্যায় ছাড়া আর-সব কাজেই একপায়ে খাড়া, সমাজখেদানো দেশবিদেশতাড়ানো ছন্নছাড়ার দল যারা যে-কোনো অধম কাজ করতেই রাজি। তবে এই জগাখিচুড়ি জনসমাবেশে গোরাদের মধ্যে ইংরেজদের সংখ্যাই ছিলো সবচাইতে-বেশি, কাজেই ইংরেজি ভাষারই খুব-রমরমা দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। এই ইংরেজিতেই পালের গোদা ছাপেন তাঁর যাবতীয় বিজ্ঞপ্তি ও ঘোষণা, আর আঞ্চলিক সরকার—যদি নামকাওয়াস্তে একটা আঞ্চলিক সরকার থেকে থাকে—ছাপায় তার সংহিতা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা অনুশাসন—অর্থাৎ ডিক্রি; আর এই শহরের খাশ, *সরকারি*, সংবাদপত্র হচ্ছে *দ্য ব্ল্যাকল্যাণ্ড থাণ্ডারবোল্ট*।

এই সংবাদপত্র যে চমকপ্রদ, এটা বললে বেশ কমিয়েই বলা হয়। তার বিভিন্ন সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত নিচের এই ক-টি টুকরো দেখলেই তা যে-কারু হাড়ে-হাড়ে মালুম হবে :

'আজ জন অ্যান্ড্রু নিগ্রো কোরোমোকোকে ফাঁসিতে লটকেছেন : হতচ্ছাড়া তাঁর মধ্যাহ্নভোজের পর তাঁর জন্যে গড়গড়া আনতে ভুলে গিয়েছিলো।'

'কাল সন্ধেয়, ছটার সময়, দশটা হেলিবিমান কুরকুসু আর বিদির উদ্দেশে উড়াল দেবে, সঙ্গে যাবে কাপ্তেন হিরাম হারবার্টের নেতৃত্বে দশজন *হর্ষচরিত*। তিন বছরের মধ্যে এই দুটো গ্রামের কোনোটাতেই যাওয়া হয়নি, ফলে এদের ওপর চরম হামলা চালানো হবে; একই রাত্তিরে ফিরেও আসবে তারা।'

...

'আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি যে জনৈক সাংসদ বারজাকের পরিচালনায় একটি ফরাশি মিশন শিগগিরই কোনাক্রি থেকে বেরিয়ে পড়বে। বলা হয়েছে এই মিশন সিকাসো আর উয়াগাদুগ্ হ'য়ে নাইজারের তীরে পৌঁছুবার পরিকল্পনা করেছে। আমরা যথারীতি সতর্কতামূলকব্যবস্থা নিয়েছি। কালো প্রহরীদের কুড়িজন আর *হর্ষচরিতদের* দুজন সারাক্ষণ এদের ওপর নজর রেখে চলবে। কোনো উপযুক্ত মুহূর্তে কর্নেল এডওয়ার্ড রুফাস এদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেবেন। রুফাস, আমরা সবাই জানি, ঔপনিবেশিক পদাতিক বাহিনী ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন, তিনি ল্যকুর নাম নিয়ে একজন ফরাশি লিউটেনান্টের ছদ্মবেশে গিয়ে হাজির হবেন এবং যথাকালে—ফরাশি সেনাবাহিনীর রীতিনীতি জানেন ব'লে—তার সুবিধে নেবেন; উদ্দেশ্য, যেমন ক'রেই হোক উক্ত বারজাকের মিশনটি বানচাল ক'রে দেয়া, যাতে কিছুতেই তিনি তাঁর দলবল নিয়ে নাইজারের তীরে পৌঁছুতে না-পারেন।'

...

'আজ, গার্ডেন ব্রিজের ওপর, এক আলোচনার ফলে কৌশুলি এল্‌হে উইলিস বাধ্য হয়েছেন *হর্ষচরিত* কনস্টানটিন বারনার্ডের মাথার খুলিতে কতগুলো গুলি ঢুকিয়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতে। *হর্ষচরিত* বারনার্ড তার ফলে রাঙানদীতে প'ড়ে যায়, আর তার মাথার খুলির অতিরিক্ত-ভারে—তাতে আবার সম্প্রতি কতগুলো শিসের গুলির ওজনও যোগ হয়েছে—নদীর জলে ডুবে যায়। মৃত ব্যক্তির স্থানে এখন কাকে বাহাল করা হবে, এই নিয়ে তক্ষুনি এক সভা বসেছিলো। ঠিক হয়েছে গিলম্যান এলির ওপরই এই দুর্লভ সম্মান বর্তাবে : ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড আর জার্মানির আদালতে সবশুদ্ধু সতেরোবার বিচারে তার দণ্ড হয়েছিলো, সবশুদ্ধু তার ২৯ বছর জেলখানায় আর ৩৫ বছর দ্বীপান্তরে কাটাবার কথা ছিলো। গিলম্যান এলি এখন থেকে হোমগার্ডের বদলে হর্ষচরিতদের দায়িত্ব পালন করবে। তার প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা রইলো।'

একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, এ-সব খবরে যাদেরই নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের কারু পদবি উল্লেখ করা হয়নি। ব্ল্যাকল্যাণ্ডে এটাই দস্তুর, যেখানে নতুন-কেউ এলে সে তক্ষুনি জীর্ণ বসনের মতো তার পারিবারিক পদবি ত্যাগ ক'রে বসে—সেগুলো জানেন শুধু *সর্বেসর্বা*, বড়োকর্তা, চীফ। শ্বেতাঙ্গ, অর্থাৎ গোরা অধিবাসীদের মধ্যে এই *সর্বেসর্বা* একটু আলাদা, নিঃসঙ্গই, লোকে তাকে সাধারণ লোকের মতোই চেনে জানে। কিন্তু তার নামটাও নিশ্চয়ই বানানো, পোশাকি ছদ্মনাম—যেটা যুগপৎ ভয়ংকর ও আতঙ্ক জাগানো : হ্যারি কিলার।

বারজাক মিশনের সব সদস্যকে পাকড়ে ফেলবার দশ বছর আগে কোত্থেকে একদিন যেন মাটি ফুঁড়েই এসে উদয় হয়েছিলো হ্যারি কিলার। সঙ্গে তারই মতো যকৃৎ আর বৃক্কওলা আরো-কয়েকজন সাগরেদ—মরুভূমির সেইখানটাতে এসেই তাদের আবির্ভাব হয়েছিলো, যেখানে পরে একদিন গ'ড়ে উঠেছিলো ব্ল্যাকল্যাণ্ড। কিন্তু সে যখন এসেছিলো, তখন সেখানে ছিলো ধূ-ধূ বালি, আর সেইখানেই তাঁবু ফেলে সে বলেছিলো, 'শহরটা গ'ড়ে উঠবে এখানেই।' আর বালির মধ্যেই গজিয়ে উঠেছিলো ব্ল্যাকল্যাণ্ড, যেন মায়াবলে।

আশ্চর্য জায়গা এই ব্ল্যাকল্যাণ্ড। তাফাসাসেৎ উয়েদ্-এর ডান তীরে, জমির সমতলে ছিলো একটা খাত—রুক্ষ, শুষ্ক, হা-হা বালির খাত, আর যেন হ্যারি কিলারের মরুমায়াতেই সেখানে উপচে উঠলো জল, তাকে তৈরি করা হ'লো পরিখার মতো, উপবৃত্তাকার, উত্তর-পুব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম অব্দি জলের সমান্তরাল মেপে-মেপে গেছে ১২০০ গজ, আর উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পুবে তেমনি নিখুঁত মাপজোক ক'রে গেছে ৬০০ গজ। তার উপরিতল তাই একশো একর, তিনটি অসমান ভাগে ভাগ-করা, তাকে ঘিরে আছে উপবৃত্তাকারেই অনধিগম্য জমাটমাটির দেয়াল, তিরিশ ফিটেরও বেশি-উঁচু, আর প্রায়



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ততটাই-পুরু নিচে—মাটির কাছে।

স্রোতের নাম এখন দেয়া হয়েছে রাঙানদী, নামকরণ হ্যারি কিলারেরই, তার প্রথম অংশটার পরিধি আড়াইশো গজ। নদীর পাড়ে দ্বিতীয় অংশটার সঙ্গে তাকে জুড়ে দিয়েছে একশোফিট চওড়া এক বুলভার—একেবারে সোজা তৃতীয় অংশটার কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। আর তাতে ক'রে তার উপরিভাগের আয়তন আরো-পঁয়ত্রিশ একর বেড়ে গিয়েছে।

প্রথম অংশটায় থাকে ব্ল্যাকল্যাণ্ডের মাতব্বরেরা, তারা যাকে তাদের অভিজাত সম্প্রদায় ব'লে গণ্য করে, অর্থাৎ শাঁসালো মাল, কিন্তু যেন বিরোধাভাস হিশেবেই তাদের নাম দিয়েছে *হর্ষচরিত*—মেরি ফেলোস। কয়েকজনকে অবশ্য নিয়তি উচ্চতর ধামেই নিয়ে গেছে, কিন্তু এই হর্ষচরিতদের ভ্রূণ ছিলো হ্যারি কিলারের আদি-সাগরেদদেরই মধ্যে। এই শাঁসালোদের ঘিরেই দেখতে-না-দেখতে এসে জড়ো হয়েছে দলে-দলে দস্যুডাকাত, কেউ পালিয়েছে হাজত থেকে কেউ-বা দ্বীপান্তর থেকে, যাদের কাছে হ্যারি কিলারের প্রতিশ্রুতি ছিলো, তাদের জঘন্য কাজকারবারের বাধাবন্ধহীন উদ্দাম স্বাধীনতা। অচিরেই হর্ষচরিতদের সংখ্যা হ'য়ে উঠেছে ৬৬৬, কিছুতেই কোনো ছুতোতেই যে-সংখ্যা আর নাকি বাড়ানো যাবে না।

তাদের ওপর অগুনতি কাজের ভার। প্রায় সেনাবাহিনীর মতোই কঠোর রীতি-শৃঙ্খলায় সুগঠিত, তাদের আছে একজন কর্নেল, পাঁচজন কাপ্তেন, দশজন লিউটেনাণ্ট আর পঞ্চাশজন সার্জেণ্ট, যথাক্রমে পাঁচশো, একশো, পঞ্চাশ এবং দশজন লোককে চালাবার ভার তাদের ওপর। তারাই ব্ল্যাকল্যাণ্ডের সেনাবাহিনী, যুদ্ধই তাদের জীবিকা —না, জীবিকা নয়, ব্যাবসা ও নেশা। কেননা এ-যুদ্ধে মানইজ্জতের কোনো বালাই নেই, এ-যুদ্ধ লুঠতরাজের যুদ্ধ, শুধু গ্রামের পর গ্রাম ছারখার ক'রে দেয়া উৎখাত ক'রে দেয়াই এদের কাজ—আর যদি গ্রামের লোকদের বন্দী ক'রে গোলাম বানাতে না-পারে তো তাদের মেরে-ফেলাই যে-যুদ্ধের প্রায়-একমাত্র অভিপ্রায়। এই হর্ষচরিতেরা শহরের কোতোয়ালিও চালায়; চালায় চড়চাপড় লাথিঘুষিতে—যদি-না রিভলবারই ব্যবহার ক'রে বসে : তারাই সামলায় গোলামদের, গোলামরা গায়েগতরে খাটে, চাষবাস দ্যাখে, যা-কিছু কায়িকশ্রমের কাজ সব এদেরই করবার কথা। কিন্তু হর্ষচরিতদের আসল কাজ *মহামান্য মাতব্বরপ্রধানের* দেহরক্ষীর কাজ করা এবং অন্ধের মতো তাঁর হুকুম তামিল করা।

শহরের তৃতীয় অংশটাই কেন্দ্র থেকে সবচেয়ে দূরে, উপবৃত্তাকার একটি চাপ, লম্বায় প্রায় ছশো গজ আর চওড়ায় পঞ্চাশ। এর দুটো প্রান্তই গিয়ে মিশেছে প্রথম অংশে আর রাঙানদীতে—রেডরিভারে, তারপর অনুসরণ ক'রে এসেছে শহরের পরিসীমা তার বাইরের সীমান্তরেখা আর দ্বিতীয় অংশের সীমারেখার মাঝখানে, যেখানে রাখা হয়



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলামদের, এরা ক্রীতদাসও নয়, কেননা এদের কিনে-আনা হয়নি, এদের জোর ক'রে ধ'রে-আনা হয়েছে, অর্থাৎ কেনাগোলামের চেয়েও অধম।

এই তৃতীয় অংশেই থাকে, সাধারণভাবে বেসরকারি সংস্থা হিশেবে, সেইসব গোরা—যারা প্রথম অংশে থাকবার অনুমতি পায়নি। পুরসভা, নাগরিক সংঘ—যা-ই নাম দেয়া যাক, এই গোরারা অপেক্ষা ক'রে থাকে কখন আসন ফাঁকা হবে হর্ষচরিতদের—আর তার জন্যে খুব-একটা অপেক্ষাও করতে হয় না, কারণ ব্ল্যাকল্যাণ্ডের নৃশংস রীতিনীতি প্রায়ই মৃত্যু ঘটায় এর-ওর—এরা এই অপেক্ষার সময় কাটায় নাগরিক সংঘে, যাকে বলা যেতে পারে শোধন-স্টেশন—মূল লক্ষ্য থাকে, যেহেতু, হর্ষচরিতদের বেহেস্ত।

ততদিন টিকে থাকতে হবে তো—কেননা শহরের যাবতীয় নাগরিক ক্রিয়াকলাপ এবং হর্ষচরিতদের মাসোহারা জুগিয়ে থাকেন খোদ সর্বেসর্বা—ফলে এরা নানারকম ব্যাবসায় মন দেয়। এই অংশ এই শহরের গঞ্জ, সদাগরি কেন্দ্র, আর এখান থেকেই হর্ষচরিতরা এসে তাদের যাবতীয় পণ্য খরিদ করে আর ভোগ্যপণ্যের জন্যে তাদের খাঁই যেন কিছুতেই আর মেটে না, এমনকী বিলাসের সেরা উপকরণটি অব্দি তাদের হাতের কাছে থাকা চাই। কিন্তু এ-সব পণ্য ব্যাবসাদারদের কিনে আনতে হয় খোদ সর্বেসর্বার কাছ থেকে—আর এই মহারথী তো এ-সব জুটিয়েছেন লুঠতরাজ ক'রে, আর ইওরোপের সর্বাধুনিক ভোগ্যপণ্য যে তিনি কেমন ক'রে কোন-চুলো থেকে জোগাড় করেন, তা শুধু তিনিই জানেন—আর হয়তো জানে তাঁর একেবারে জিগরি দোস্তেরা।

এই তৃতীয় অংশে আছে ২৪৬ জন গোরা—তাদের মধ্যে ৪৫ জন শ্বেতাঙ্গিনী—আর তারা এই গোরাপুরুষদের যথার্থ সহচরী, কেননা কুকর্মের জন্যে তাদের নামেও হুলিয়া আছে, তারাও কয়েদখানা বা দ্বীপান্তর থেকে পালিয়ে এসেছে।

প্রথম আর তৃতীয় অংশের মধ্যে আছে—যোজক হিশেবেই যেন—দ্বিতীয় অংশ। দ্বিতীয় অংশের জমি সাকুল্যে ৬৩ একর। এটা হ'লো গোলামখানা: এর ৫,৭৭৮ জন গোলামের মধ্যে ৪,১৯৬ পুরুষ আর ১,৫৮২ মেয়ে। সেখানেই, প্রায় ব্যতিক্রমবিহীনভাবে, গোলামগিরিতেই তাদের জীবন কাটে। সেখানেই আছে তাদের কুঁড়েবাড়ি--গরিবখানা—যার মধ্যে দুঃস্থ, নিঃস্ব, নিঃসহায় জীবন কাটিয়ে দেয় তারা।

রোজ ভোরে তার দেয়ালে খুলে যায় চারটে দরজা, আর হাতে মুগুর কিংবা বন্দুক নিয়ে গোরুভেড়া খেদাবার মতো ক'রে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে আসে হর্ষচরিতেরা। এই কালো আফ্রিকিদের মধ্যে যারা শহরটাকে বাসযোগ্য ক'রে তোলার কাজে ব্যস্ত থাকে না, তারা পালে-পালে গিয়ে হাজির হয় খেতে-খামারে, চাষের মাঠে। সন্ধেবেলায় এই হতভাগারা আবার তেমনি—তাড়িত—ফিরে আসে তাদের দুঃস্থ আস্তানায়, আর ফটকের ভারি-ভারি দরজাগুলো বিকট আওয়াজ ক'রে বন্ধ হ'য়ে যায়—পরদিন সকালের আগে সেগুলো আর খুলবে না। বাইরের জগতে যাবার আর-কোনো দরজাই নেই সেখানে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের একদিকে আছে হর্ষচরিতেরা—অন্যদিকে হবু-হর্ষচরিতেরা—অর্থাৎ নাগরিক সংঘ। এবং বর্বরতায়, রক্তপিপাসায় কেউ কারু চাইতে কম যায় না।

এই হতভাগাদের অনেকেই টেঁশে যায়, হয় জর্জর দারিদ্র্যে, অভাবে-অনটনে, অথবা তাদের পাহারার হাতে মার খেয়ে—পাহারারা সবাই খুনে, রক্তপিপাসু। নিতান্তই তুচ্ছ অরুচিকর তথ্য এটা। কেননা গোলামের সংখ্যা ক'মে গেলে উদয়াস্ত তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে খাটবে কে। তবে তুচ্ছ এইজন্যে যে আরেকবার হামলা চালালেই শূন্যস্থান পূর্ণ হ'য়ে যায়। আর যাদের ঘাড় ধ'রে নিয়ে গিয়ে মরণকে খাওয়ানো হয়েছে তাদের জায়গা দখল ক'রে বসে নতুন শহিদেরা।

ডানতীরের এই জেলা-উপজেলাগুলোই কিন্তু সমস্তটা ব্ল্যাকল্যাণ্ড গ'ড়ে দেয়নি। রাঙানদীর বামতীরে মাটি উঠে গেছে আচম্বিতে, সটান, খাড়া, প্রায় পঞ্চাশ গজ উঁচু একটা টিলা। বাহির-দেয়াল আরো-প্রসারিত হয়েছে এখানে। আলাদা ক'রে চিহ্নিত ক'রে গেছে এক বারোশো গজ আয়তনের সমায়তক্ষেত্র—নদীর পাড় ধ'রে, আর তীর থেকে তিনশো গজ দূরে স'রে গিয়ে। এই দ্বিতীয় শহর, প্রথমটার চেয়ে ছোটোই হবে, কারণ সেখানে আছে প্রায়-সত্তর একর জমি, নিজেকে দু-ভাগ করেছে আড়াআড়ি তির্যকভাবে বসানো একটা উঁচু দেয়াল দিয়ে।

এর একটা ভাগ পড়েছে টিলাটার উত্তর-পুবদিকের ঢালে, তাকে তৈরি করা হয়েছে দুর্গবীথিকার আদলে, সাধারণের জন্যে উন্মুক্ত-এক চক, উত্তর প্রান্তের সঙ্গে সে সংযোগ টিকিয়ে রেখেছে একটা সেতু দিয়ে, তার নাম গার্ডেন ব্রিজ—তার মারফৎই হর্ষচরিত এবং হবু-হর্ষচরিতগণ এখানে যাতায়াত করতে পারে। অন্য-অর্ধেকটা চুড়োয় বসানো, আর তাতেই আছে শহরের প্রাণকোষ।

উত্তরপ্রান্তে, চকটার পাশেই, উঠে গিয়েছে বিশাল এক চতুর্ভুজাকার নির্মাণ, দু-পাশে তার দেয়াল। এর উত্তর-পশ্চিম মুখটা রাঙানদীর দিকে তাকিয়ে আছে নব্বুই ফিট উঁচু থেকে। তাকে লোকে বলে রাজভবন, এটাই হ্যারি কিলার আর তার নবরত্নের বাসস্থান —এই নবরত্নেরা তার কৌশুলি। অদ্ভুত এই কৌশুলিরা, তাদের এই সর্বেসর্বার, এই মহামাতব্বরের, সকল কাজেরই কাজি—সব কাজেই তাদের সমান অংশ। সর্বেসর্বা প্রভুর দেখা সামান্য-মরমনুষ্য পায় না—তিনি শুধু, অনধিগম্য নন, অদৃশ্যও থাকেন সবসময় —তাঁর শ্রীমুখ থেকে কোনো বাক্য খসলে তার আর কোনো নড়চড় হয় না, হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না—তবে এই হাকিম নিজেই নড়েন না—আর তাঁর মুখ থেকে খসা ইচ্ছাগুলো মুহূর্তে পালন করার দায়িত্বই এই অদ্ভুত কৌশুলিদের ওপর। কৌশুলিসভার, নবরত্নের, যাবতীয় পরামর্শ তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল করাতেই শেষ।

অন্য-একটা সেতু, রাত্তিরে নিরেট লোহার গরাদ নেমে আসে তাকে সুরক্ষিত ক'রে; এই সেতুর নাম কাসল ব্রিজ, ডানতীরের সঙ্গে শাসনযন্ত্রের পীঠস্থানের যোগাযোগ ঘটায়



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে।

রাজভবনের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে দুটো ব্যারাক। একটা ব্যারাক নির্দিষ্ট হয়েছে বাছা-বাছা একডজন গোলামের জন্যে, তারা খাশ চাকর, এছাড়া আছে আরো-পঞ্চাশজন আফ্রিকি, তারাও বাছাই-করা, সবচেয়ে-হিংস্র ও বর্বর প্রবৃত্তি যাদের তাদের মধ্য থেকেই এদের বাছাই করা হয়েছে—তারাই হচ্ছে ব্ল্যাকগার্ড—কালোপাহারা। অন্য ব্যারাকটায় থাকে চল্লিশজন গোরা—ঠিক এই একই বর্বরতার বাহার দেখে তাদের বাছা হয়েছে; তাদেরই ওপর উড়নকলগুলোর উড়ালের গোপন দায় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে—ব্ল্যাকল্যাণ্ডে এই উড়নকলগুলোকে বলে হেলিবিমান।

কোনো-এক আশ্চর্য প্রতিভার অত্যাশ্চর্য উদ্ভাবন এই হেলিবিমানগুলো—এ-রকম শক্তিশালী কোনো উড়োজাহাজের কথা এর আগে কারু মাথাতেই আসেনি। গড়ে আড়াইশো মাইল গতিতে একটানা উড়ে যেতে পারে এরা তিনহাজার মাইল—পথে জ্বালানির জন্যে একবারও না-থেমেই। এই হেলিবিমানগুলোর কাছেই ব্ল্যাকল্যাণ্ডের হার্মাদেরা তাদের সর্বব্যাপিতার জন্যে ঋণী। কিন্তু শুধু সর্বত্রগামিতাই এর বৈশিষ্ট্য নয়, লুঠতরাজরাহাজানির পর চক্ষের পলকে অকুস্থল থেকে উধাও হ'য়ে যাবার আশ্চর্য সুবিধেটা দিয়েছে এই হেলিবিমান। এই হেলিবিমানগুলোর ওপরই, প্রধানত, হ্যারি কিলারের যাবতীয় স্বৈরাচারী ক্ষমতা নির্ভর ক'রে আছে।

সর্বব্যাপী আতঙ্ক ছড়িয়েই হ্যারি কিলার তার অজ্ঞাত সাম্রাজ্যটির শাসন চালায়—এই ব্ল্যাকল্যাণ্ড যার রাজধানী। বিভীষিকার মারফৎই সে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে—আর তাকে টিকিয়ে রেখেছে। কিন্তু তাই ব'লে এই স্বৈরাচারী ককখনো ভুলেও ভাবেনি যে বিদ্রোহের কোনো সম্ভাবনা নেই—শুধু ভয়ের ওপর নির্ভর ক'রে সবাইকে কাবু ক'রে রাখলে একদিন-না-একদিন লোকে যে খেপে যাবেই, কি কালো, কি গোরা, তা সে জানে। সেইজন্যেই এমন-উঁচুতে গ'ড়ে তুলেছে তার রাজভবন, যেখান থেকে কামান দেগে সে উড়িয়ে দিতে পারে শহরটাকে—দুর্গবীথিকা আর এই ব্যারাক শুদ্ধু। বিদ্রোহের ক্ষীণ ইঙ্গিতই সংকেত হবে নির্বিচার-হত্যার—যার হাত থেকে কেউ পার পাবে না। মরুভূমি তৈরি ক'রে রেখেছে অনতিক্রম্য বাধা, আর যেই একবার এই দস্যুর ডেরায় ঢুকবে, তাকেই এই হার্মাদদের মধ্য থেকে প্রাণে বেঁচে বেরিয়ে-আসার আশা ছেড়ে দিতে হবে।

অথচ এমনিতে নিখুঁত চলে ব্ল্যাকল্যাণ্ডের জীবন : চমৎকার-পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সারাক্ষণ যত্ন নেয়া হচ্ছে সবকিছুর, যে-পণ্য চাই তা-ই সেখানে মেলে—যদি অবশ্য তোমার কড়ি বা ক্ষমতা থাকে। হর্ষচরিত বা হবু-হর্ষচরিতদের এমন-কোনো বাড়ি নেই, যেখানে টেলিফোন নেই। প্রতিটি রাস্তা, প্রতিটি বাড়ি, এমনকী গুলামখানার দুঃস্থতম কুঁড়েতেও, শহরের প্রধান প্রণালী থেকে চব্বিশ ঘণ্টা জল আসে, আর বিদ্যুৎ পাওয়া যায় সারাক্ষণ।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাত্র দশবছর আগে খাঁ-খাঁ মরুভূমিতে গ'ড়ে উঠেছিলো এই শহর—তার মধ্যেই তার এই উন্নতি। কিন্তু শহরের চারপাশে বিস্ময়টা আরো-মাত্রাছাড়ানো। যদিও তার চারপাশে মরুভূমির হলুদ সায়র এখন ধূ-ধু করে, কিন্তু সে তার দেয়াল থেকে আরো-কয়েক মাইল চ'লে গেলে তবেই। শহরের কাছাকাছি যে-জমি এতই বিশাল যে তার শেষসীমা দিগন্তের ওপারে গিয়েই যেন পথ হারিয়েছে, সেই জমি মরুভূমির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে ব্ল্যাকল্যাণ্ড। কেননা সেখানে চাষ হয় সর্বাধুনিক দক্ষ-সব প্রকৌশল মারফৎ : এখানেই গজায়, ক্রমবর্ধমান সাফল্যের সঙ্গে, আফ্রিকা আর ইওরোপের সমস্ত শাকসব্জি ফলমূল।

হ্যারি কিলারের সৃষ্টি এটাই : যদি এই বাহাদুর ব্যবস্থাপনা শুধু দুষ্কর্মের পেছনেই ব্যয় করা না-হ'তো তো সারাজগৎ সমবেতকণ্ঠে তার সাধুবাদ দিতো, জয়ধ্বনি দিতো। কিন্তু কেমন ক'রে সে ঘটিয়েছে, মরুভূমির মধ্যে, এই আশ্চর্য রূপান্তর? কেমন ক'রে সে উর্বর ক'রে তুলেছে এই রুখু-শুখু বন্ধ্যা মরুভূমিকে? সারা উদ্ভিদজগৎ, সারা জীবজগৎ—নিম্নতম জীব থেকে মানুষ পর্যন্ত—জল বাদ দিয়ে কারু একমুহূর্তও চলে না—জলই জীবন, জলই চালায় পৃথিবীকে। হ্যারি কিলার এখানে জল পেলো কোত্থেকে, যেখানে বছরের পর বছর একবারও বৃষ্টি পড়ে না—কিংবা বৃষ্টি নামলেই যাকে শুষে নেয় তৃষাতুর তপ্ত বালি—হ্যারি কিলার সেখানে এত জল পেলো কোথায় যে এমনভাবে চমৎকার সেচের ব্যবস্থা করতে পেরেছে? সে কি ভেলকি জানে না কি, ভোজবাজি? না-হ'লে কেউ যা তার আগে পারেনি, সে হঠাৎ এই অলৌকিক রূপান্তর ঘটাতে পেরেছে কীভাবে?

না। কোনো ভেলকি বা ভোজবাজি নয়। হ্যারি কিলারের কোনো অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক শক্তিও নেই; যদি শুধু নিজের উদ্ভাবনী বুদ্ধির ওপর তাকে নির্ভর করতে হ'তো তাহ'লে কোনোদিনই সে এ-সব ভোজবাজি দেখাতে পারতো না। কিন্তু হ্যারি কিলার তো একা নয়। রাজভবন, যেখানে সে থাকে তারই বাছাই-বাছাই সব দুষ্কর্মের সাথীদের নিয়ে, ইয়ার্কি ক'রেই যাদের সে নাম দিয়েছে কৌশুলিসভা, উপদেষ্টাপরিষদ, যেখানে ব্যারাকে থাকে ব্ল্যাকগার্ড, আর হেলিবিমান রাখার ছাউনি আর চাতাল—এই সবকিছু মিলেই ব্ল্যাকল্যাণ্ডের শেষঅংশটার মাত্র একটা ছোট্ট টুকরোই যায়। মস্ত খোলা-জমির মাঝখানে আরো-সব বাড়ি উঠেছে—কিংবা বলা যায় প্রথম শহরটার ভেতরেই লুকিয়ে আছে আরো-একটা শহর; এদের বাড়িঘরগুলোর ধরন আলাদা, সামনে আছে উঠোন, পেছনে সাজানো বাগান—আর সবমিলিয়ে এরা প্রায় কুড়ি একর জমি নিয়ে নিয়েছে। রাজভবনের সামনে উঠে গেছে কারখানা।

কারখানা যেন এক স্বাধীন, স্বতন্ত্র, স্বশাসিত শহর, যার ওপর সর্বেসর্বা ছড়িয়েছে অঢেল সম্পদ, অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্য, যাকে সে রেয়াৎ করে, সমীহ করে, যাকে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—নিজেকেও সে বলেনি কোনোদিন—যাকে সে একটু ভয়ও করে। পুরো ব্ল্যাকল্যাণ্ডের *নীল ছকটা* যদি সে-ই ক'ষে থাকে, তবে সেই ছকটার সার্থক রূপায়ণ করেছে এই কারখানা—কারখানা শুধু তাকে হাতেকলমে বানিয়েই দেয়নি সব, তাকে সর্বাধুনিক সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ জুগিয়েছে, টেলিফোন বিজলি চব্বিশঘণ্টার জল ইত্যাদি—এমনকী এমন-সমস্ত আশ্চর্য উদ্ভাবন দিয়ে তাকে প্রায় মায়ানগরী বানিয়ে তুলেছে, ইওরোপ যে-সব উদ্ভাবনের কথা জানবে—আরো-অনেক পরে।

কারখানার দেহ-মন দুইই আছে। তার পরিচালকই তার আত্মা। আর তার শরীরটা তৈরি হয়েছে একশোজন প্রকৌশলবিদের সমবেত চেষ্টায়—যে-প্রকৌশলীরা এসেছে বিভিন্ন দেশ থেকে, তবে যাদের মধ্যে ফরাশি আর ইংরেজদের সংখ্যাই সর্বাধিক। তাদেরও বেছে-বেছে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে—নিজের-নিজের বিষয়ে এরা উৎকর্ষের শেষ-সীমায় এসেই পৌঁছেছে, আর তাদের এখানে আনা হয়েছে এক স্বর্ণসেতুর ওপর দিয়ে। প্রত্যেকেই পায় আকাশছোঁয়া মাসোহারা, তার বদলে তাদের মেনে নিতে হয় ব্ল্যাকল্যাণ্ডের অনড় নিয়মকানুন।

এই প্রকৌশলীদের সবাই হাতে-কলমে কাজ ক'রেই ওস্তাদ, তাদের মধ্যে কৃতবিদ্য যন্ত্রবিদের সংখ্যাই সবচেয়ে-বেশি। কয়েকজন আবার বিবাহিতও, তাই কারখানার আওতায় আছে সাতাশজন মেয়ে, কারু-কারু আবার বাচ্চাও আছে।

এরা কিন্তু সবাই খাঁটি আর সৎ আর পরিশ্রমী : শহরের অন্যান্য লোকদের পাশে কেমন যেন বেমানান, সবাই এরা কারখানাতেই থাকে, আর এই কারখানার চৌহদ্দি থেকে বেরুনো তাদের পক্ষে প্রায়-অসম্ভব, কড়া নিষেধ আছে তাদের ওপর। যদি তারা কখনও বেরুতেও চাইতো, তাদের পক্ষে পাহারার চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে-পড়া সম্ভব ছিলো না, কারণ দিনে-রাতে অষ্টপ্রহরই তাদের ওপর কড়ানজর রাখতো ব্ল্যাকগার্ড আর মেরিফেলোরা, কিন্তু তাদের চাকরি দেবার সময়েই বিশদ ক'রে তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে ব্যাপারটা, আর এই নিয়মটা ভাঙবার কোনো তাগিদই কোনোদিন অনুভব করেনি কেউ। যে-ইনাম মিলছে তাদের, যে-রকম অচিন্ত্যনীয় বেতন, তার বিনিময়ে যতদিন তারা ব্ল্যাকল্যাণ্ডে কাটাবে ততদিন সারা জগতের কাছ থেকেই গুটিয়ে থাকতে রাজি হয়েছে তারা। তারা যে শুধু কারখানা ছেড়ে বেরুতে পারবে না তা-ই নয়, তারা বাইরের সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগও রাখতে পারবে না—বাইরের কাউকে চিঠি লেখা যেমন বারণ, তেমনি মানা আছে বাইরের কারু চিঠি পাবারও।

যদিও অনেকেই এত-কড়াকড়ি দেখে একটু থমকে গিয়েছিলো, অনেকেই আবার বেতন বেড়ে যাবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে যা আপত্তি ছিলো সব খপ ক'রে গিলে ফেলেছে। এককালে এতই গরিব ছিলো যে দু-বেলার রুটি জোগাতে গিয়েই প্রাণান্ত হ'তো—এখন এইসব কড়া বাধানিষেধের মধ্যে থাকলে যদি সচ্ছলভাবে নিশ্চিন্তে জীবন কাটানো যায়,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে—সত্যি-বলতে—কী-ই বা হারালো তারা? অজানার মধ্যে ঝাঁপ খাবার সব ভয়কে জয় ক'রে নিয়েছে ঐশ্বর্যের প্রতিশ্রুতি; আর, সত্যি-তো, তারা নিজেদের চোখ ঠেরেছে, না-হয় বাইরের একটু ফুর্তিফার্তা থেকে নিজেদের কয়েকদিন বঞ্চিত ক'রেই রাখা গেলো —তাতে আর কোন-*বাইবেল* উলটে যাবে।

চুক্তিতে সই করবামাত্র, যেমন কথা, তেমনি কাজ। যে-জাহাজে টিকিট কাটা হয়েছে সেই জাহাজেই উঠে পড়েছে নতুন কর্মচারীরা, আর সেই জাহাজ তাদের নিয়ে গেছে বিসাগো দ্বীপগুলোর একটাতে, পর্তুগিজ গিনির উপকূলে যে-দ্বীপপুঞ্জ আছে তারই একটায়, যেখানে তাদের জাহাজ থেকে নেমে পড়তে হয়েছে। তারপর তাকে রাজি হ'তে হয়েছে তার চোখ বেঁধে দেয়ায়; আর তীরের একটা পরিত্যক্ত-ফাঁকা জায়গায় একটা বড়ো আশ্রয় বানানো হয়েছিলো হেলিবিমানগুলোর জন্যে, সেখান থেকে হেলিবিমান তাদের উড়িয়ে নিয়ে এসেছে ব্ল্যাকল্যাণ্ডে—ছ-ঘণ্টার মধ্যেই, চোদ্দোশো মাইল আকাশপথ পেরিয়ে। হেলিবিমান থেমেছে রাজভবন আর কারখানার মধ্যকার এসপ্ল্যানেডে, আর চোখ খুলে দেবার পর কর্মীরা নেমেছে মাটিতে, ঢুকে পড়েছে কারখানার চৌহদ্দিতে, যদ্দিন-না চুক্তি শেষ হচ্ছে তদ্দিন আর সেখান থেকে তাদের বেরুবার জো নেই। তবে একটা ফাঁক থেকে গেছে অবশ্য শর্তগুলোর মধ্যে। যদি তার ব্ল্যাকল্যাণ্ডে এভাবে কয়েদ হ'য়ে থাকতে কোনো সময় রুচিতে বাধে, তবে সে চিরকালের মতো এ-শহর ছেড়ে চ'লে যেতে পারে। তখন আরেকটা হেলিবিমান, চোখবাঁধা, তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে এসপ্ল্যানেড থেকে বিসাগো দ্বীপপুঞ্জে, যেখান থেকে সে ইওরোপ যাবার জন্যে স্টীমবোট পেয়ে যাবে।

অন্তত, এই আশ্বাসই দেয়া হয়েছে কর্মীদের—যারা এখান থেকে চ'লে যেতে চেয়েছে। কারখানায় তাদের সাথীরা যে-খবরটা পায়নি, তা অবশ্য এই : এরা কেউই কোনোদিনই তাদের গন্তব্যে আর পৌঁছুতে পারেনি, তাদের হাড়গোড় মরুভূমির কোথাও শ্বেতসারে পরিণত হচ্ছে, আর যে-বেতন তাদের দেয়া হয়েছিলো রাজভবন থেকে, সেই টাকাটা ফের জমা প'ড়ে গেছে রাজভবনের তহবিলেই। ফলে, শহরের খাজাঞ্চিখানা ককখনো শূন্য প'ড়ে থাকেনি—আর এইভাবেই ব্ল্যাকল্যাণ্ডের অস্তিত্বের কথাটা গোপন থেকেছে সকলের কাছে, আর হ্যারি কিলারের এই সাম্রাজ্যের কথা বাইরের পৃথিবীর কাছে সম্পূর্ণ অজানাই থেকে গেছে।

তবে প্রস্থানের ঘটনা ঘটেছে কদাচিৎ। শহরের লোকজনের জীবন কেমনভাবে কাটে তা তারা জানতে পারেনি—জানা সম্ভবই ছিলো না, কোনো সন্দেহই তারা পোষণ করেনি সে-সম্বন্ধে, তাই দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া কেউই কখনও কারখানা ছেড়ে চ'লে যেতে চায়নি। তাদের মধ্যেই থাকে ন-জন কালোগোলাম, নারী পুরুষ দুইই আছে ন-জনের মধ্যে, তাদেরই মতো এরাও বন্দী, যারা ঘরের কাজে কর্মীদের স্ত্রীদের সাহায্য



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। কর্মীরা, তাই, এই যক্ষপুরীতে তাদের স্বদেশের চাইতে ভালোই আছে—আর মনের মতো কাজ পেয়েছে ব'লে অনেক সময় বাড়তিই খাটে—রাত্তিরেও অনেকক্ষণ। কর্মীদের ভার একজনেরই ওপর, তাদের পরিচালক, ফরাশি বৈজ্ঞানিক একজন—মার্সেল কামারে, যাঁকে তারা প্রায় ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ব'লেই মনে করে।

কারখানার বাসিন্দাদের মধ্যে একমাত্র মার্সেল কামারেরই যখন-তখন যেখানে-খুশি যাবার অধিকার ছিলো—রাস্তায় তো বেরুতেই পারেন, ব্ল্যাকল্যাণ্ডের আশপাশের দেশেও যেতে পারেন, *যথেচ্ছ*। এই স্বাধীনতা কাজে খাটাতে তিনি বেশি সবুর করেননি, কসুরও করেননি, বরং চিন্তাচ্ছন্ন দার্শনিকের মতোই বিমনা ঘুরে বেড়িয়েছেন পথে-ঘাটে; তাই ব'লে এই অনুমান করা সংগত হবে না যে তাঁর অধীনে যারা কাজ করে, তাদের চাইতে ব্ল্যাকল্যাণ্ডের কাজকারবার সম্বন্ধে তিনি বেশি ওয়াকিবহাল—সত্যি-বলতে শহরের অদ্ভুত ব্যবস্থাপনার তিনি কিছুই জানতেন না, এমনকী শহরের নামটা শুদ্ধ না।

একদিন একজন কর্মী তাঁকে জিগেস করেছিলো, এ-জায়গাটার নাম কী। কামারে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন কিছুক্ষণ, তারপর কর্মীটিকে একেবারে তাজ্জব ক'রে দিয়ে বলেছেন, 'আরে, সত্যি-তো, আমি তো জায়গাটার নামই জানি না।'

এর আগে কোনোদিনও তাঁর মাথাতেই আসেনি এমন-একটা অনুপৃচ্ছা, এমন-একটা নাম জানবার আদপেই কোনো কারণ থাকতে পারে। কিন্তু আরো যেটা আশ্চর্য, এই প্রশ্নটা এবং তার কী উত্তর তিনি দিয়েছেন, তা কিন্তু তিনি পরমুহূর্তেই বেমালুম ভুলে গিয়েছেন। তাঁর খেয়ালই হয়নি যে এমন-একটা বিষয় নিয়েও মাথাঘামানো যেতে পারে।

সত্যি, ভারি-অদ্ভুত মানুষ আমাদের এই মার্সেল কামারে!

সম্ভবত বছর-চল্লিশ বয়েস। মাঝারি গড়ন, ঋজুরেখ কাঁধ, বক্ষোদেশ সমতল, সামান্য কয়েকগাছি সোনালি চুল তাঁর চেহারাকে কেমন-একধরনের পলকা পেলবতা দিয়েছিলো। হাত-পা সহজে নাড়েন না, চিরপ্রশান্ত তাঁর স্থৈর্য, আর কথাও বলেন শিশুর মতো সরল লাজুক ভঙ্গিতে, কেমন-একটু ক্ষীণ মৃদুস্বরে, পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন ককখনো মেজাজ খারাপ করেন না, কথায় কখনও রাগের লেশ থাকে না, এমনকী কোনো অস্থিরতারও না। সবসময়েই মাথাটা একটু ঝুঁকে-পড়া, বামকাঁধের দিকে, যেন মাথার ওজনটা তাঁর কাছে বড্ড-বেশি লাগছে, আর মুখমণ্ডলও কেমন বিবর্ণ, নীরস, হালকা-একটু অসুখের ছোঁয়াই লেগে আছে যেন। কিন্তু একটাই সৌন্দর্য ছিলো তাঁর : তাঁর আয়তনীল চোখদুটিতে যেন আকাশছোঁয়া ভাবনার আভাস।

কেউ যদি খুব খুঁটিয়ে দেখতো, তবে ঐ চমৎকার চোখদুটিতে আরো-কিছু আবিষ্কার ক'রে নিতে পারতো। মাঝে-মাঝেই সে-চোখের তারায় ভেসে যেতো আবছা-একটা ঝিলিক, মুহূর্তের জন্যে মনে হ'তো দৃষ্টিটায় বুঝি একটা সবহারা ভাব লুকিয়ে আছে। কেউ যদি হঠাৎ এই ফাঁকা, শূন্য, হারা দৃষ্টিটা দেখে ফেলতো, তাহলে এই সন্দেহ করতে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিধা করতো না যে মার্সেল কামারে এক আস্ত-উম্মাদ—আর সে-যে মিথ্যা-কিছু অনুমান করতো, তাও নয়। দুর্দান্ত প্রতিভার সঙ্গে উন্মত্ততার দূরত্ব কি ন্যূনতম নয়? প্রতিভা কি পাগলামির সীমান্তে বসবাস করে না?

তার দুর্বল, রোগাপটকা চেহারা এবং অলস, পেলব ভঙ্গি সত্ত্বেও মার্সেল কামারের মধ্যে যেন অফুরান প্রাণশক্তি টগবগ ক'রে ফুটছে। দুর্দশা-দুরবস্থা, ভয়ংকর বিপদের সম্ভাবনা, নিষ্ঠুরতম অনটন—কিছুই তাঁকে নড়াতে পারে না। তার কারণ : এদের সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তাঁর ছিলো না। তাঁর স্বচ্ছ-নীল চোখ-দুটো সবসময়ে ফেরানো ভেতরমুখো, চারপাশে কী ঘটছে না-ঘটছে তার কোনো ছায়াই তাতে পড়ে না। তাঁর বসবাস যেন সময়ের পরপারে, এমন-এক আশ্চর্য জগতে যেখানে শুধু খ্যাপা কল্পনাদেরই আনাগোনা, সবসময়েই ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে তাঁর মাথায়। গভীরভাবেই ভাবেন তিনি সবসময়—শুধুই ভাবেন, সারাক্ষণ। মার্সেল কামারে একটা *ভাবুকযন্ত্র* বৈ আর-কিছুই নন—এমন-এক ভাবুকযন্ত্র, যেটা প্রচণ্ড-শক্তিমান, প্রবল-পরাক্রান্ত এবং ভয়ংকর—তাঁর আপাতসরল ভঙ্গি সত্ত্বেও।

এতটাই ভুলোমন যে সাঁৎ-বের্ন্যাকেও তিনি যেন অন্যমনস্কতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারিয়ে দিতে পারতেন। *পার্থিব* জীবন যাকে বলে তার কাছে তিনি যেন এক অনাহূত *বিদেশী*; কতবার যে টাল সামলাতে না-পেরে হোঁচট খেয়ে পড়েছেন রাস্তানদীতে—হয়তো ভাবছিলেন যে সেতু পেরুচ্ছেন বুঝি। তাঁর খাশ খিদমৎগার আস্ত একটা বাঁদরের মতোই দেখতে, সেইজন্যেই সবাই এর নাম দিয়েছিলো *জ্যাকো*, জ্যাকোর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হ'তো না তাঁকে *নিয়ম ক'রে* দু-বেলা খেতে বসাতে। যখনই খিদে পেতো তখনই কিছু-না-কিছু মুখে দিতেন মার্সেল কামারে, ঘুমুতে যেতেন যদি-কখনও ঘুম পেতো —সে ঠা-ঠা দিনদুপুরেও হ'তে পারে, খাঁ-খাঁ নিশুত রাতেও হ'তে পারে।

দশবছর আগে, পরিস্থিতি তাঁকে আচমকা হ্যারি কিলারের সংস্পর্শে এনে দিয়েছিলো। একটা আশ্চর্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন—যখন-খুশি যেখানে-খুশি বৃষ্টি এনে দেবার পদ্ধতি। কেউ যদি শুনতে চাইতো, অমনি তাকে তাঁর সব স্বপ্ন তিনি খুলে বলতেন, তা সে দৈবাৎ-দেখা-হওয়া কোনো অচেনা লোক হ'লেও আপত্তি নেই; আর অন্য কয়েকজনের সঙ্গে-সঙ্গে হ্যারি কিলারও শুনেছিলো এই উদ্ভাবিত পদ্ধতির কথা, যেটা তখনও নিছক তাত্ত্বিক স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু অন্যরা এই পাগলামির কথা শুনে হো-হো ক'রে হেসে উড়িয়ে দিলেও, হ্যারি কিলার এই তত্ত্বটাকে সীরিয়াসভাবেই নিয়েছিলো, এতটাই সীরিয়াসভাবে যে তক্ষুনি সে তার ভাবী পরিকল্পনার একটা ছক ক'ষে ফেলেছিলো।

হ্যারি কিলার যদি হার্মাদ হয়, তবে এমন-হার্মাদ যার দূরপ্রসারী দৃষ্টি আছে—অন্তত সে-ই বুঝতে পেরেছিলো জগৎ যে-প্রতিভাকে চিনতে পারেনি তাকে কী ক'রে কাজে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগানো যায়। দৈব অকস্মাৎ কামারেকে তার হাতে এনে তুলে দিয়েছে, আর সে তাঁর স্বপ্ন সফল ক'রে তোলবার পথ দেখিয়ে তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। তাকে সে নিয়ে গিয়েছে মরুভূমির ধূ-ধূ বিস্তারে, পরে যেখানে ব্ল্যাকল্যাণ্ড গ'ড়ে উঠবে, বলেছে : 'দেখি, আপনার সেই প্রতিশ্রুত বৃষ্টিকে এখানে ফেলুন, দেখি।' আর বৃষ্টি যেন বাধ্য বশম্বদের মতো তক্ষুনি ঝমঝম ক'রে পড়তে শুরু করেছে সেখানে।

কামারে এক চিরন্তন জ্বরের ঘোরের মধ্যেই আছেন তারপর থেকে। যা-যা তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, সব তারপর একের পর এক ফ'লে গিয়েছে। *বাদলযন্ত্রের* পর তাঁর জ্বরাতুর মগজ উদ্ভাবন করেছে আরো-হাজারো অদ্ভুত জিনিশ, যা থেকে হ্যারি কিলার মুনাফা লুঠেছে অন্তহীন, বৈজ্ঞানিক ভুলেও একবারও জানতেও চাননি তাঁর আবিষ্কারগুলো নিয়ে হ্যারি কিলার করেছে কী।

এটা হয়তো কেউ-কেউ বলবে যে তার আবিষ্কারের দুষ্প্রয়োগের জন্যে খামকা এমনকী *পরোক্ষভাবেও* কোনো বৈজ্ঞানিককে দোষী ক'রে লাভ নেই। একদিন যে রিভলবার বানিয়েছিলো সে কিন্তু জানতোই যে এ-রকম একটা অস্ত্র খুনোখুনি শুরু ক'রে দিতে পারে—নিশ্চয়ই এই কথা মনে রেখেই সে তার প্রথম রিভলবারটা বানিয়েছিলো।

হয়তো মার্সেল কামারে সম্বন্ধে, শেষপর্যন্ত, এ-কথা বলা যাবে না। যদি তাঁর মাথায় কখনও এই ভাবনা খেলে যেতো যে, আচ্ছা, এমন-একটা কামান বানানো যাক যার পাল্লাটা আগেকার-সব কামানের চাইতে বেশি হবে, আর গোলাটাও বেশি-ভারি হবে, তবে তিনি তক্ষুনি হৃষ্টচিত্তে সেই কামানটার মাপজোক ঠিক করতে লেগে যেতেন, বার ক'রে ফেলতেন গোলাটা কেমন হবে দেখতে, খোলটার ভেতর কতটা বিস্ফোরক থাকবে... ইত্যাদি, আর তার মধ্যে তিনি বুদ্ধির ব্যায়াম ছাড়া আর-কিছুই দেখতে পেতেন ব'লে মনে হয় না। তিনি হয়তো বোমকেই যেতেন যদি শুনতেন তাঁর এই কামান কেউ বিনাশের কাজে, ধ্বংসের কাজে, লাগিয়েছে।

হ্যারি কিলার বৃষ্টি চেয়েছিলো, মার্সেল কামারে তাকে বৃষ্টি এনে দিয়েছেন। হ্যারি কিলার চাষের সরঞ্জাম চেয়েছিলো, আর মার্সেল কামারে পর-পর উদ্ভাবন করেছেন নতুন লাঙল, রোপণযন্ত্র, আগাছা তাড়ানো যন্ত্র, ফসল কাটা যন্ত্র, মাড়াই যন্ত্র, সব একসঙ্গে, একটা মোটর থেকেই সর্ববিদ্যাবিশারদ এই চাষের যন্ত্র তার শক্তি পাবে। হ্যারি কিলার তার কাছে চেয়েছিলো উড়াল কল—বিমান, আর মার্সেল কামারে তাকে দিয়েছেন হেলিবিমান—যেটা উল্কার বেগে পেরিয়ে যেতে পারে, একবারেই, তিন-তিন হাজার মাইল।

তাঁর পৃষ্ঠপোষক এ-সব যন্ত্র নিয়ে যে কী করে, মার্সেল কামারের মাথায় এ-কথাটা জিগেস করবারও কোনো তাগিদ কখনও হয়নি। তাত্ত্বিক চিন্তায় অভ্যস্ত, তাঁর কাছে শুধু মনে হয়েছে সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায়, কেমন ক'রে সব জট ছাড়িয়ে বানিয়ে-



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোলা যায় জিনিশটাকে—তাদের ব্যাবহারিক প্রয়োগ কী হবে, সে নিয়ে তিনি ককখনো মাথা ঘামাননি। তিনি যে ব্ল্যাকল্যাণ্ডের সৃষ্টি চাক্ষুষ দেখছেন, দেখছেন কী ক'রে শাহারা মরুভূমির মধ্যে গ'ড়ে উঠেছে উর্বর ফলনজমি, এ-তথ্যটা তাঁর মনে কোনো রেখাপাতই করেনি। তিনি আবিষ্কার করেছেন পদ্ধতি, তা-ই এমনটা তো হবেই, এ-তো স্বতঃসিদ্ধ।

বরং মার্সেল কামারে হ্যারি কিলারের কাছে প্রথমেই চেয়েছেন একটা বড়ো কারখানা—যেন তিনি যা চেয়েছেন, তেমনতর কোনো সর্ববিদ্যাবিশারদ কারখানা বানানো ভারি-সহজ কাজ।

আর অমনি হ্যারি কিলার শয়ে-শয়ে আফ্রিকিকে কাজে লাগিয়ে প্রায় আশ্চর্য-ক্ষিপ্রতায় তাঁকে সেই কারখানা গ'ড়ে দিয়েছে। তারপর মার্সেল কামারে চেয়েছেন এটা-সেটা কলকব্জা, চেয়েছেন ডায়নামো, চেয়েছেন স্টীমএনজিন, চেয়েছেন তমুক ধাতু —আর দু-দিন আগে বা পরে, সব তাঁকে ফর্দ মিলিয়ে এনে হাজির ক'রে দিয়েছে হ্যারি কিলার —যেন মায়াবলেই মরুভূমির মাঝখানে এসে হাজির হয়েছে বাষ্পচালিত এনজিন।

মার্সেল কামারে চেয়েছেন দক্ষ কর্মী, কুশলী ও অভিজ্ঞ—আর একের পর এক কর্মীরা এসে হাজির হয়েছে, যতজন চেয়েছেন ততজন। কেমন ক'রে এই আশ্চর্য কাণ্ড সমাধা করেছে হ্যারি কিলার ? মার্সেল কামারে সে নিয়ে আদপেই মাথা ঘামাননি। তিনি চেয়েছেন, তিনি পেয়েছেন : ব্বাস, ল্যাঠা চুকে গেছে। তাঁর কাছে এর চেয়ে সহজ কাজ কিছু আছে ব'লেই মনে হয়নি।

এমনকী, তাঁর সমস্ত স্বপ্নকে কাজে খাটিয়ে তুলতে গেলে কতটা পুঁজি লাগবে, তা নিয়েও তিনি মাথা ঘামাননি, ভুলেও কখনও জিগেস করেননি : 'এত টাকা কোত্থেকে আসছে ?'

ব্ল্যাকল্যাণ্ডে সেদিন সবকিছুই রীতিমাফিক চলেছে। কারখানায় কর্মীরা দম ফেলবার ফুরসৎ পাচ্ছে না। *হল্লোড়বাজ* হর্ষচরিতেরা খেতে-খামারে খবরদারি করছে আফ্রিকি গোলামদের ওপর। নাগরিক সমিতি তার ব্যাবসা নিয়ে ব্যস্ত।

বেলা তখন এগারোটা। হ্যারি কিলার তার নিজের আপিশঘরে একাই ব'সে ছিলো। কী যেন ভাবছে সে গভীরভাবে, আর তার ভ্রূকুটিকুটিল মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে তার ভাবনাগুলো নিশ্চয়ই খুব-সুমধুর নয়।

হঠাৎ ঝনঝন ক'রে টেলিফোন বেজে উঠলো।

'শুনছি!' রীসিভার কানে তুলে নিয়ে বললে হ্যারি কিলার।

'পশ্চিমে, সতেরো ডিগ্রি দক্ষিণে, দশটা হেলিবিমান দেখা গেছে এক্ষুনি,' টেলিফোন জানালে।

'আসছি,' ব'লে রীসিভারটা নামিয়ে রাখলে হ্যারি কিলার।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে পৌঁছে গেলো রাজভবনের বিশাল ছাতে। তার ওপরে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা মিনার উঠে গিয়েছে, প্রায় তিরিশ ফিট উঁচু; পইঠা পেরিয়ে সে গিয়ে উঠলো তারই ওপর। প্ল্যাটফর্মের ওপর যে-হর্ষচরিত দাঁড়িয়েছিলো, সে-ই এইমাত্তর টেলিফোন ক'রে তাকে খবরটা জানিয়ে দিয়েছে।

'ঐ-যে,' সে আঙুল তুলে আকাশের একটা দিক দেখালে।

হ্যারি কিলার তার দুরবিনটাকে সেইদিকেই ঘুরিয়ে নিলে।

'ওরাই তাহ'লে,' একটুক্ষণ দেখে নিয়ে সে বললে। তারপর জুড়ে দিলে : 'কৌশুলিদের ডেকে পাঠাও। আমি নিচে যাচ্ছি।'

হর্ষচরিত বা মেরিফেলো যখন উপদেষ্টা পরিষদের কৌশুলিদের একের পর এক টেলিফোন ক'রে খবর দিচ্ছে, হ্যারি কিলার ততক্ষণে হুড়মুড় ক'রে নেমে এসেছে কারখানা আর রাজভবনের মধ্যকার এস্‌প্ল্যানেডে। সেখানে তার নবরত্নসভার ন-জন কৌশুলি এসে দেখা দিয়েছে একে-একে। সবাই আকাশপানে চোখ তুলে তাকিয়ে সবুর করতে লাগলো।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'লো না। যত কাছে এগিয়ে আসছে, হেলিবিমানগুলোকে ততই বড়ো দেখাচ্ছে। ক-মিনিট বাদেই তারা এক-এক ক'রে আস্তে নেমে পড়লো এস্‌প্ল্যানেডে।

হ্যারি কিলারের চোখদুটো ফুর্তিতে ঝকঝক ক'রে উঠলো। চারটে হেলিবিমান যদি শুধু তাদের চালকদেরই ব'য়ে এনে থাকে, তাহ'লে বাকি ছটার প্রত্যেকটাই দুজন ক'রে যাত্রী ব'য়ে এনেছে : ব্ল্যাকগার্ডদের একজন, আর একজন কয়েদি—আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, চোখমুখ ঢেকে মাথাঢাকা নামানো।

কয়েদি-ছজনের বাঁধন খুলে দেয়া হ'লো। যখন তাঁদের ধাঁধিয়ে-যাওয়া চোখগুলোয় খটখটে দিনের আলো স'য়ে গেলো, তাঁরা বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন চারপাশে। নিজেদের তাঁরা দেখতে পেলেন মস্ত একটা খোলা চকের ওপর, চারপাশেই অনতিক্রম্য দেয়াল। কয়েক পা ওধারেই আছে অদ্ভুত-সব বাহন, যেগুলো তাঁদের এতটা রাস্তা আকাশপথে উড়িয়ে এনেছে। তাঁদের সামনে বিশাল এক রাজভবন—তার ছাতের ওপর উঁচু একটা মিনার, ব্ল্যাকগার্ডের তিরিশজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রাজভবনটাকে পাহারা দিচ্ছে।

তাঁদের পেছনে, শ-খানেক গজ দূরে, আড়াইশো গজ লম্বা এক নিরেট দেয়াল, তাতে না-দেখা যাচ্ছে দরজা, না-বা কোনো জানলা বা ঘুলঘুলি। তার ওপরে উঠে গেছে উঁচু-একটা কারখানার চোঙ, আর তাকেও ছাপিয়ে উঠে গেছে মস্ত-একটা থাম, পলকাই দেখতে, ধাতুর তৈরি—কিন্তু এই খুঁটিটার কোনো মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু এ কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে তাঁদের? এই দুর্গটার কথা আফ্রিকার কোনো মানচিত্রে দেখানো হয়নি কেন?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ব্যাসকূটগুলো যখন হিংটিংছট্ কতগুলো প্রশ্নের মতো তাঁদের মাথার মধ্যে কামড়াচ্ছে, হ্যারি কিলার হাত তুলে একটা ইঙ্গিত করতেই প্রত্যেক বন্দীর কাঁধের ওপর শক্ত হাত এসে চেপে ধরলো। ইচ্ছা-অনিচ্ছা কৌতূহল-বিতৃষ্ণায় মাখামাখি বন্দীরা ঢুকলো রাজভবনে, সামনে যেতেই যেন আপনা থেকেই খুলে গিয়েছে তার দরজা, আর তাঁরা ভেতরে ঢুকতেই আবার যেন নিজে থেকেই বন্ধ হ'য়ে গেছে। মসৃণ, নিখুঁত।

জেন ব্লেজন, সাঁৎ-বের্ঁ্যা, বারজাক, আমেদে ফ্লরেঁস, ডাক্তার শাতোনে আর মঁসিয় পঁসাঁ—সকলেই এখন হ্যারি কিলারের কবলে; ব্ল্যাকল্যাণ্ডের এই স্বৈরাচারের তাঁরা কুক্ষিগত, যে-ব্ল্যাকল্যাণ্ড কোনো অজানা সাম্রাজ্যেরই অজানা রাজধানী!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

## দুই

# দু-পাখা ছড়ানো

[ *আমেদে ফ্লরেঁসের নোটবই থেকে : আবার* ]

*২৫শে মার্চ*। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা হ'তে চলেছে, আমরা এসে পড়েছি... কিন্তু এ-কোন্ জাহান্নামে এসে পড়েছি আমরা ? কেউ যদি আমায় বলতো যে আমরা এখন চাঁদে এসে পৌঁছেছি, তাহ'লে সেটাও আমাকে খুব-একটা অবাক করতো না, যদি একবার আমরা মনে রাখি কী-রকম যানে ক'রে আমরা সফর করেছি। আসল কথা হ'লো কোথায় যে আছি, তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমার।

তথ্য যা-হয় হোক, আমি শুধু মোটামুটি যথাযথভাবে এইভাবেই নিজেকে প্রকাশ করতে পারি : চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি আমাদের কারা যেন বন্দী করেছে, আর অবশেষে আজ সকালেই, এমনিতে শান্তিপূর্ণভাবে রাতটা কাটাবার পরই, আমার মনে হয়েছে নোটবইতে এ-কথাগুলো টুকে রাখার মতো তাকৎ হয়েছে আমার।

আকাশপথে চলবার প্রথম পাঠটা যথেষ্ট অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিতে হয়েছে আমাদের, তবু বলতে পারি সাধারণভাবে আমাদের শরীর-স্বাস্থ্য বেশ ভালোই আছে, আর সাঁৎ-বের্যাঁ যে বিছানায় সেঁটে আছেন তার কারণ ইস্পাতের বেড়ি নয়, বরং তাঁর কটিবাতের কামড়। বেচারা একটা কাঠের খুঁটির মতো আড় ধ'রে আছেন, একটুও নড়াচড়া করতে পারছেন না, আর তাঁকে একটা বাচ্চা ছেলের মতোই ধ'রে-ধ'রে চামচে দিয়ে খাইয়ে দিতে হচ্ছে আমাদের। তাতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছুই নেই। বরং এটাই সবচেয়ে বিস্ময়কর, যে কালকের ঐ সফরের পরেও এখন আমরা বাকিরা দিব্বি চলাফেরা করতে পারছি। কাল সারাদিনেও একে আর একে দুই করার মতো ক্ষমতাও আমার ছিলো না। আজ দিনটা তুলনায় অন্তত বেশ-ভালো, কিন্তু বাড়িতে লিখে জানাবার মতো আহা-মরি কিছু নয়। তাহ'লেও ভাবনাগুলোকে এক জায়গায় জড়ো ক'রে এক দুই তিন চার ক'রে যোগ ক'রে দেখা যাক।

হ্যাঁ, তা, পরশু আমরা কালঘুমই ঘুমিয়েছিলুম। ক্লান্তিতে সারাশরীর ভেঙে পড়েছিলো আমাদের, আর অবসাদে এলিয়ে সবাই আমরা ভোঁশ-ভোঁশ ক'রে ঘুমুচ্ছিলুম, তারপর আচমকা ঊষার আগেই এক উৎকট আওয়াজে আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। সেই একই গুমগুম গর্জন, হাজারটা ভোমরার আওয়াজ, যা আমাকে এর আগে তিন-তিনবার কী-রকম ভড়কে দিয়েছিলো, কিন্তু এবার আওয়াজটা ছিলো আরো-তীব্র—এবং একেবারে যেন কানের পাশেই। চোখ খুলে পরক্ষণেই চোখের পাতা ফের বুজিয়ে ফেলতে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিলো আমাদের, কারণ আমাদের মাথার ওপর থেকে তীব্র আলোর ছটা প'ড়ে আমাদের চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে দিয়েছিলো।

সেই প্রচণ্ড আওয়াজটা থেকে তখনও আমরা ঠিক ধাতস্থ হ'তে পারিনি, তার ওপর ঐ চোখধাঁধানো আলো তো ছিলোই। এমন সময় কথাটি না-ক'য়ে একদল লোক আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমাদের পাকড়ে, নিচে পেড়ে ফেলে, হাত-পা পেছমোড়া ক'রে বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে, মাথার ওপর দিয়ে কী-রকম থলের মতো কিছু ফেলে আমাদের অন্ধ ক'রে দিয়ে এমন কাবু ক'রে ফেলেছিলো যে এখনও প্রায় ভির্মি খাবার দশাই হয় ভাবলে। লিখতে যতটা সময় লেখেছে, তার চেয়েও ঢের অল্প সময়ে পুরো কর্জিটাই হাঁশিল হ'য়ে গেছে। এ নিয়ে দ্বিতীয়-কোনো কথা বলবারই উপায় নেই : এ হচ্ছে কোনো ওস্তাদ লোকের তুলকালাম কীর্তি।

প্রায় একটা মাংসের ডেলার মতোই লাগছিলো নিজেকে। গোড়ালিতে, হাঁটুতে, কব্জিতে, পিঠে কেটে-কেটে বসেছিলো বাঁধন। চমৎকার লাগছিলো!

যখন হতভম্ব ভাবটা কেটে যাবার পর এই চমৎকার অনুভূতিটা প্রথম হ'তে শুরু করেছে, তখনই আমি কার যেন গলা শুনতে পেয়েছি, আর তাকে চিনতে পেরেছি লিউটেনান্ট ল্যকুরের মনোমোহন কণ্ঠস্বর ব'লে : 'কী, সব ক-টাকেই পাকড়েছো তো?'

তারপরেই, কাউকে কিছু সাড়া দেবার সুযোগ না-দিয়েই, একটু থেমে সেই একই গলা আবার রূঢ়সুরে বলেছে : 'প্রথমে যে নড়বে, তারই মাথার খুলি গুলি মেরে উড়িয়ে দেয়া হবে। এসো সব্বাই, চলো, ফেরা যাক!'

দ্বিতীয় কথাটার প্রথম লক্ষ্য যে আমরাই ছিলুম, সেটা বোঝবার জন্যে সর্বোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের অধ্যাপক হ'তে হয় না। চমৎকার মানুষ ইনি, আমাদের বদলি রক্ষিদলের এই প্রাক্তন সর্দারটি! *চলো?* বলা ভারি সহজ। নড়বো যে, চলবো যে, তার উপায় কী। কিন্তু আমি তারপর কান পেতে শুনেছি আমাদের লিউটেনান্টকে কে যেন বলছে : '*হেরুন্টেরস্টাইগেন ক্যেনেন ভির হিয়ের নিখ্ট্! এস্ গিব্ট্ ৎসু ফিয়েলে বাউমে!*'

এই কিচিরমিচির বোঝবার সাধ্য অন্তত আমার ছিলো না; বাজি ধ'রে বলতে পারি এ নিশ্চয়ই আলেমান বুলি; মঁসিয় বারজাক এই কটকটে ভাষাটায় যৎকিঞ্চিৎ সড়গড়, পরে তিনি আমায় জানিয়েছেন পুরো বয়ানটার মানে ছিলো : 'আমরা এখানে নামতে পারবো না যে! বড্ড-বেশি গাছপালা আছে!' হ'তেও পারে-বা। বন্দুকের গুলির মতো বয়ানটার মানে হয়তো তা-ই।

তবে কবুল করি যে তার কোনো মর্মার্থই তখন আমার মরমে পশেনি। কিন্তু যেটা চট ক'রেই ধরতে পেরেছি তা এই : এই টিউটনি কথাটা বলা হয়েছে দূর থেকে—সম্ভবত



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথার ওপর থেকেই।

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই, সেই অবিশ্রাম জগঝম্পের মধ্যে, তৃতীয়-একটা গলা প্রায় গর্‌গর্‌ ক'রেই উঠেছে : 'তোমার বন্দীদের এই গাছপালার চৌহদ্দির বাইরে নিয়ে যেতে হবে—'

হুম ! কথাটা এবার ইংরেজিতে বলা। শেক্সপীয়ারের শ্লোক জানি ব'লে আমি তক্ষুনি বুঝতে পেরেছি আসলে আমাদের এই গাছতলা থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বলা হচ্ছে। তারপরেই লিউটেনান্ট ল্যকুর—সম্ভবত ল্যকুরই—জিগেস করেছে : 'কোন্ দিকে ?'

আলবিয়নের কুলাঙ্গার বলেছে : 'কুরবুসুর দিকে।'

'কদ্দুরে ?'

'*সির্কা ভেনতি চিলোমেত্রি,*' চেঁচিয়ে বলেছে চতুর্থ-কেউ।

আমার যৎসামান্য লাতিন জ্ঞান থেকে ধরতে পেরেছি, এই কথাগুলো ইতালীয় —এবং এর মানে—*আন্দাজ কুড়ি কিলোমিটার*। আমরা কি তবে ভাষাতাত্ত্বিকদের দেশেই এসে পড়েছি নাকি ? না কি এটা বাবিলেরই কোনো কানাগলি ?

সে যা-হয় হোক, কেননা ততক্ষণে লিউটেনান্ট ল্যকুরের মধুর বচন শোনা গেছে : 'ঠিক আছে। তাহ'লে ভোর হ'লেই রওনা হবো।'

আমার দিকে কেউই আর আলাদা ক'রে তখন নেকনজর দেয়নি। যেখানে ছিলুম, সেখানেই প'ড়ে থেকেছি, চিৎপাত, পিঠমোড়া ক'রে বাঁধা। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, নিশ্বাস নিতেই থলেটার মধ্যে হাঁসফাঁস করতে হচ্ছে, মুখের মধ্যে কাপড়ের গোলা !

লিউটেনান্টের কথার পরেই ঐ গুমগুম উৎকট আওয়াজটা আরো-দুনো হ'য়ে পুরো জায়গাটাই রীতিমতো সরগরম হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু পরক্ষণেই আওয়াজটা কমতে শুরু করেছে, তারপর আস্তে-আস্তে ম'রে গেছে। ক-মিনিট বাদেই আওয়াজটা মিলিয়ে গিয়েছে।

কী মানে হয় এই বিকট এবং কিম্ভূত আওয়াজটার ? মুখে কাপড়ের গোলা ঢোকানো ব'লে কারু সঙ্গে যে কোনো কথা বলবো তারও জো ছিলো না, অতএব প্রশ্নটা আমাকে করতে হয়েছে নিজেকেই—এবং, সেইজন্যেই বোধহয়, কোনো উত্তরই আসেনি।

সময় এ-রকম দশাতেও কেটে যায়। সময়ের এ-রকম একটা ভেলকি আছে। ঘণ্টাখানেক পরে দুটো তাগড়াই লোক আমাকে পাঁজাকোলো ক'রে ধ'রে দু-একবার *হেঁইয়া-মারি* গোছের দোল দিয়েই একটা শস্যের বস্তার মতো আমাকে একটা জিনের ওপর চাপিয়ে দেয়, ঘোড়ার গায়ের হাড় কেমন যেন বিঁধতে থাকে আমার গায়ে, তারপরেই ঘোড়াটা জোরকদমে ছুট লাগিয়ে দেয়।

সবচেয়ে তাজ্জব স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবিনি যে আমি একেবারে আফ্রিকার বুকের মাঝখানে মাজেপ্পার ভূমিকায় অভিনয় করবো। ঐ কশাক কাব্যকাহিনীতে অবশ্য তেমন-



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুরাগ আমার কখনোই ছিলো ন। *ঘোড়সোয়ার মাজেপ্পার* ছুট কবিতায় উক্রেনের এই মানুষটি, অর্থাৎ ইভান স্তেপানোভিচ মাজেপ্পা, এক নীলরক্তের অভিজাতকে চটিয়ে দেবার জন্যে ভয়াবহ সাজা পেয়েছিলো, হাত-পা বেঁধে তাকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো এক বুনো-ঘোড়ার ওপর, তারপর চাবকে সেটাকে খেপিয়ে দিয়ে লেলিয়ে দেয়া হয়েছিলো স্তেপির মাঝখানে। মাজেপ্পাকে তখন অবশ্যি কশাকরা বাঁচিয়ে দেয়, আর শেষটায় সে কশাকদের সেনানায়ক হ'য়ে ওঠে। আমি শুধু এটাই ভাবছিলুম, আমি কি একদিন মাজেপ্পার মতোই মুক্তি পাবো? আর শেষটায় বাম্বারাদের সেনানায়ক হ'য়ে উঠবো? এমন সময় এক আধমাতাল গলা, যেন একেবারে আগুন ধরাবার আগেকার পেট্রলে চোবানো, এমনভাবে খেঁকিয়ে উঠেছে যে অন্তরাত্মা অব্দি শিউরে উঠেছে : 'এই ব্যাঙাচির বাচ্চা! হুঁশিয়ার! ফের যদি নড়েছিস তো এই রিভলবার তোর ধ্যাটাম্যো বার ক'রে দেবে!'

বাঃ, চমৎকার! এমন বিনীত ভদ্রভাবে এমন পরামর্শ একদিনেই দু-দুবার পেয়ে গেছি আমি, একবার চোস্ত ফরাশিতে, একবার আঁস্তাকুড়ের ইংরেজিতে!

আমার চারপাশে খটাখট-খটাখট ঘোড়ার খুরের শব্দ, দ্রুত, তেজিয়ান, খ্যাপা। আর মাঝে-মাঝে কানে আসছে গোঁ-গোঁ আওয়াজ, ক্ষীণ, কাপড়চাপা : নিশ্চয়ই আমার সাথীরা, তাদেরও নিশ্চয়ই আমার মতোই দশা। আর আমার দশা তো কহতব্যই নয়! প্রায় যেন দম আটকে আসছে আমার, সব রক্ত যেন মাথায় গিয়ে চ'ড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আস্ত মাথাটাই বুঝি ফেটে পড়বে!

এই খ্যাপা জোরকদম-ছুট চলেছে অন্তত তো আধঘণ্টা হবেই, আর তারপরেই এই ঘোড়সোয়ারবাহিনী আচমকা থেমে গিয়েছে। আমাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে তোলা হ'লো, কিংবা বলতে হয়, তুলে পুরোনো কাপড়ের একটা বস্তার মতো আমাকে ছুঁড়ে ফেলা হ'লো মাটিতে। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেলো, আর তারপর ক্ষীণভাবে কানে এসে পৌঁছুলো—ক্ষীণভাবেই, কেননা আমি তখন তিনচতুর্থাংশ ম'রেই গিয়েছি,—কানে এসে পৌঁছুলো এই কথাগুলো :

'মেয়েটা তো টেঁশেই গিয়েছে!' ইংরেজিতে।

'*নো এল্'এ সোলামেন্তা সভিনিতা।*' (না, কেবল জ্ঞান হারিয়েছে।)

'খোলো, খোলো, বাঁধন খুলে দাও,' হুকুম করেছে কেউ ফরাশিতে, গলা শুনে আমার ধারণা হয়েছে, লিউটেনান্ট ল্যকুর, 'আর ডাক্তারেরও বাঁধন খুলে দাও।'

'ইনি... এই মহিলা... মিস ব্লেজনের কি প্রাণের আশঙ্কা আছে?'

আমাকে তক্ষুনি মুখেগোঁজা কাপড়ের গোল্লা আর মাথাঢাকা থলেটা থেকে অব্যাহতি দেয়া হ'লো। এই জল্লাদগুলো কি ভেবেছে এই ধরনের বিচ্ছিরি সাজপোশাকের মধ্য থেকে ডাক্তার শাতোনেকে একবারেই বার ক'রে ফেলতে পারবে? এই অধমকে যে এভাবে রেহাই দিয়েছে সে-তো এইজন্যেই যে এরা ভেবেছে আমিই বুঝি ডাক্তার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাতোনে ! কেননা পরক্ষণেই ভুল বুঝতে পেরেছে তারা : 'আরে ! এ-তো ডাক্তার নয়। অন্যটাকে খোলো !' সর্দার ব'লে উঠেছে, আর হম্বিতম্বি দেখে আমার আগেই তো সন্দেহ হয়েছিলো লিউটেনান্ট ল্যকুরই এদের সর্দার।

তার দিকে তাকিয়ে দেখেছি আমি আর নিজেকে বিকট অভিসম্পাত দিয়েছি। এই লোকটাকেই আমি কিনা ফিটফাট এক ফরাশি লিউটেনান্ট ব'লে ধ'রে নিয়েছিলুম !... অবশ্য সত্যি-বলতে, গোড়া থেকেই এর ওপর আমার সন্দেহ হয়েছিলো—কেমন যেন *সাজানো* মনে হয়েছিলো একে। কিন্তু সে-তো নিছকই সন্দেহ, আমি তো আর তার মুখোশ খুলে দিতে পারিনি। আর তার মাশুলও দিতে হয়েছে আমাকে—আমার মাথাটা এখন তাঝঝিম-মাঝঝিম করছে। ওহ্, জাহান্নামের পোকা !... একবার যদি একে আমি বাগে পাই !

ঠিক তখনই কে-একজন তার কাছে এসে কথা বলেছে, আর তাইতেই আমি তার আসল নামটা জানতে পেরেছি : কাপ্তেন এডওয়ার্ড রুফাস। কাপ্তেনই বটে ! এ যদি খোদ জেনারেলও হয়, তবু এর সম্বন্ধে আমার ধারণা পালটাবে না।

তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কাপ্তেন রুফাস আমার ওপর থেকে নজর সরিয়ে নিয়েছিলো। সেই ফাঁকে আমি একটু শ্বাসপ্রশ্বাস নেবার চেষ্টা করেছি, *স্বাভাবিকভাবে*। আরেকটু যদি অমন হাঁসফাঁস করতে হ'তো, আমি তবে দম আটকেই ম'রে যেতুম। সেটা নিশ্চয়ই বোঝাই যাচ্ছিলো, গায়ের রং একেবারে নীললোহিত হ'য়ে গেছে, বেগনি, কারণ কাপ্তেন হঠাৎ আমার দিকে একঝলক তাকিয়ে কী-যেন একটা হুকুম করেছে তার একজন সাগরেদকে। তক্ষুনি আমার সারা দেহ খানাতল্লাশ করেছে তার স্যাঙাৎ। তুলে নিয়েছে আমার অস্ত্রশস্ত্র, মেরে দিয়েছে আমার টাকাকড়ি, কিন্তু আমার নোটবইটাকে রেহাই দিয়েছে। এই জানোয়ারগুলো জানে না 'আমেদে ফ্লরেঁস'-এর নাম সই করা লেখার দাম কী ! যাচ্চ'লে ! এ-সব কোন ডাহা-গাড়লদের পাল্লায় এসে পড়েছি আমি !

তবে এই ডাহা-গাড়লগুলো আমার হাত-পায়েরও বাঁধন খুলে দিয়েছে। আর আমি হাত-পা একটু নাড়াতে পেরেছি, রক্তচলাচলের ধরনটাও অনেকটা সাবলীল হ'য়ে এসেছে। আর তারপরেই তাকিয়েছি আশপাশে।

প্রথমেই আমার নজরে পড়েছে দশটা... কী ও-সব ?... দশটা... যন্তর, দশ, হুম! দশটা জিনিশ... বস্তু... ব্যবস্থা... দশটা—ধুত্তোর ! শয়তানই জানে এ-জিনিশগুলো কী —কারণ আমার জীবদ্দশায় আমি এমনতর-কিছু আগে কখনও দেখিনি !

ধ'রে নিন, বেশ বড়োশড়ো এক প্ল্যাটফর্মই যেন, একপ্রান্তে দু-দুটো রণপার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এই *প্ল্যাটফর্ম* থেকে উঠে গিয়েছে খুঁটি, জাফরি-কাটা, পাঁচমিটার উঁচু; ওপরে, তার মাঝামাঝি, একটা চাকায় বসানো দুটো বৈঠার মতো কী যেন, আর, তারও ওপরে, দুটো (হুম, ফের আবার শুরু হয়েছে গণ্ডগোলটা, আমি ঠিক মানানসই-কোনো



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাই খুঁজে পাচ্ছি না যে !)...দুটো...হাত ? দুটো... ডানা, না, না, কথাটা খুঁজে পেয়েছি এতক্ষণে, পুরো জিনিশটাকেই দেখাচ্ছে যেন অতিকায় একটা সারস একঠ্যাঙে ভর ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার দুই পাখা...হ্যাঁ, ঠিক তা-ই... ঝকঝকে ধাতুতে তৈরি দু-দুটো পাখা, পুরো আয়তন হবে ছ-গজের মতো। যতদূর দেখতে পাচ্ছি, দশ-দশটা এমনতর-দেখতে অচেনা বস্তু, সেনাবাহিনীর যুযুৎসু সারের মতো পাশাপাশি সাজানো। অ্যাঁ, কিন্তু কী হ'তে পারে এগুলো?

যখন এই দৃশ্যটা আমার দু-চোখ গোগ্রাসে গিলে শেষ করেছে, তখনই আমি তাকিয়ে খেয়াল করেছি আমাদের আশপাশে রীতিমতো একটা ভিড়ই জ'মে গিয়েছে।

প্রথমেই তো আছেন আমাদের প্রাক্তন-লিউটেনান্ট ল্যকুর, এইমাত্তর যিনি কাপ্তেন রুফাসের পদে উন্নীত হয়েছেন; তাঁর সহচর, সেই গোরা সার্জেন্ট-দুটোও আছে বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো—না, না, গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো, তারা আসলে সার্জেন্ট কি না তা অবশ্য আমি জানি না; আছে তাদের কুড়িজন আফ্রিকি পদাতিক —যাদের বেশির ভাগকেই আমার আগে থেকে চেনা নেই; এছাড়া আছে আরো-দশজন গোরা, যাদের আমি কস্মিনকালেও চোখে দেখিনি—যাদের দেখতে লাগছে অনেকটাই শ্মশানের চিল-শকুনের মতো। ভিড় বটে, অনেক লোক, তবে একে ঠিক প্রিয়জন সান্নিধ্য বলা যাবে না।

এইসব মহদাশয়দের মাঝখানে রয়েছেন আমার সাথীরা। তাঁরা প্রত্যেকেই আছেন এখানে, মিস ব্লেজন মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎপাত প'ড়ে আছেন। খড়ির মতো শাদা হ'য়ে গেছে তাঁর মুখ। মলিক হাপুশ কাঁদছে, চেষ্টা করছে কীভাবে তাঁর সেবা করা যায় তার উপায় ভাবতে। ডাক্তার শাতোনে রুগিনিকে দেখছেন। আর মিস ব্লেজনের পাশেই মাটিতে ব'সে-ব'সে সাঁৎ-বেরাঁ জোরে-জোরে শ্বাস নিয়ে কোনোরকমে ধাতস্থ হবার চেষ্টা করছেন। তাঁর দশাই সবচেয়ে করুণ। তাঁর নিষ্কেশ মাথার খুলি ইটের মতো রাঙা, আর তাঁর বিশাল চোখদুটো যেন এক্ষুনি কোটর থেকে লাফিয়ে বেরুবে। বেচারা সাঁৎ-বেরাঁ !

মঁসিয় বারজাক আর মঁসিয় পঁসাঁর দশা অপেক্ষাকৃত-ভালো। তাঁরা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে আড় ভাঙবার চেষ্টা করছেন। তাহ'লে আমিও কেন দাঁড়িয়ে উঠে একটু ব্যায়াম ক'রে নিয়ে শরীরের আড় ভাঙি না ?

কিন্তু তোঙ্গানেকে আমি আশপাশে কোথাও দেখতে পাইনি। কোথায় গেছে তবে সে ? কোথায় ? হামলাটার সময় সে-বেচারা খুন হ'য়ে গেছে নাকি ? হ'তে পারে, মলিকের ঐ ফুঁপিয়ে কান্নার সেটাও আরেকটা কারণ হ'তে পারে। আমারও মেজাজটা বিচ্ছিরিরকম তেতো হ'য়ে গেলো। তোঙ্গানের মতো ভালোলোক আমি এখানে কি কালো, কি গোরা কারু দলেই দেখিনি।

আমি উঠে প'ড়ে মিস ব্লেজনের দিকে এগিয়ে গেলুম, কেউ আমায় কোনো বাধা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলে না। পা-দুটো বিচ্ছিরি আড় ধ'রে আছে। ঠিকভাবে হাঁটতে অব্দি পারছি না। কাপ্তেন রুফাসই আমার আগে-আগে এগিয়ে গেছে।

'মাদমোয়াজেল মোরনাস কেমন আছেন,' সে জিগেস করেছে ডাক্তার শাতোনেকে।

ও-হ্যাঁ, তা-ই তো, প্রাক্তন-লিউটেনান্ট ল্যকুর তো আমাদের সঙ্গিনীকে তাঁর ধার-করা নামেই শুধু চেনে!

'ভালো,' ডাক্তার বলেছেন। 'ঐ-যে, চোখ খুলছেন—'

'আমরা যেতে পারবো এবার?' জিগেস করেছে তথাকথিত কাপ্তেন।

'একঘণ্টার আগে নয়,' দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেছেন ডাক্তার শাতোনে। 'আর, আমাদের সবাইকেই যদি মেরে ফেলতে না-চান, তো, আমি অনুরোধ করবো ভবিষ্যতে যৎকিঞ্চিৎ কম-বর্বরভাবে আমাদের টানাহেঁচড়া করবেন।'

কাপ্তেন রুফাস কোনো জবাব না-দিয়েই কেটে পড়েছে। আমি গিয়ে দেখি, মিস ব্লেজন সত্যি-সত্যিই মূর্ছা থেকে জেগে উঠছেন। ডাক্তার শাতোনে হাঁটু মুড়ে তাঁর পাশেই বসেছিলেন; তিনি মিস ব্লেজনকে হাত ধ'রে সন্তর্পণে ওঠালেন। তারপরেই মঁসিয় বারজাক আর মঁসিয় পঁসা এগিয়ে এলেন আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে। বাঃ, বেশ, এবার পুরো দলটাই একজায়গায়।

'আমায় মাফ করবেন আপনারা!' হঠাৎ মিস ব্লেজন ব'লে উঠলেন, তাঁর দু-চোখ থেকে অঝোরধারে অশ্রু ঝরছে। 'আমিই আপনাদের এ-রকম ভীষণ সংকটের মধ্যে টেনে এনেছি। আমার জন্যে যদি না-হ'তো, আপনারা তবে এতক্ষণে...'

আমরা হা-হা ক'রে উঠে আপত্তি জানিয়েছি, কিন্তু মিস ব্লেজন কেবলই নিজেকে দোষী সাব্যস্ত ক'রে বারে-বারে আমাদের '*মার্জনা ভিক্ষা*' চেয়েছেন। আমার ঠিক কোনো-কালেই আত্মধিক্কার বা আত্মকরুণা পছন্দ হয় না, আমি প্রসঙ্গটা পালটাবার চেষ্টা করলুম। বললুম, মিস ব্লেজন যেহেতু মিস মোরনাস নামেই পরিচিত এখানে, তাই তাঁর ঐ ছদ্মনামটা বজায় রাখাই বরং ভালো হবে, এই রাস্কেলগুলোর মধ্যে তাঁর দাদার এককালীন সহচরদের কারু-কারু থাকা হয়তো মোটেই অসম্ভব নয়। আর তা যদি হয়, তবে সাধ ক'রে আবার নতুন ক্ষয়ক্ষতি ডেকে আনা কেন? আমার কথাটা তক্ষুনি সকলের মনে ধ'রে গেলো। ঠিক হ'লো, মিস ব্লেজন আবারও আগের মতো মাদমোয়াজেল মোরনাস হ'য়ে উঠবেন।

বস্তুত, ঠিক সময়েই আমরা এই সিদ্ধান্তটায় পৌঁছেছিলুম, কারণ আমাদের কথাবার্তায় বাধা দিয়ে রুক্ষ রূঢ়স্বরে কাপ্তেন রুফাস কী-একটা হুকুম দিতেই আবারও আমাদের ধরপাকড় ক'রে ফের সেই বিচ্ছিরি থলেটা পরিয়ে দিলে মুখে-মাথায়। তারপর আগেরই মতো আমায় চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে-যাওয়া হ'লো।... তবে কি আবারও



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাজেপ্পার মতোই আবার আমার কপালে ঐ ঘোড়দৌড় আছে?

না, আমাকে বরং ছুঁড়ে ফেলা হ'লো—উপুড় ক'রে—কোনো শক্ত-কিছুর ওপর, যেটাকে মোটেই ঘোড়ার পিঠ ব'লে মনে হ'লো না। কয়েক মিনিট বাদেই মনে হ'লো পাখনার মতো কিছু-একটা যেন দুরন্ত বেগে হাওয়ায় ঝাপটাচ্ছে, আর যার ওপর আমি অমন উপুড় হ'য়ে প'ড়ে আছি, সেটা চারদিকে কেমন আস্তে-আস্তে দোল খাচ্ছে। সে শুধু মুহূর্তেরই জন্যে বুঝি, তার পরেই কানে তালা ধ'রে গেলো—সেই বিখ্যাত হাজার ভোমরার আওয়াজ, কিন্তু এবার পাঁচগুণ, দশগুণ, একশোগুণ জোরে, আর তার পরেই প্রচণ্ড-বেগে হাওয়া এসে ঝাপটালে আমায়—আর সেই ঝাপটের দাপট মুহূর্তে-মুহূর্তে যেন বেড়ে গেলো। আমার মনে হ'লো... কেমনভাবে বোঝাবো ঐ অনুভূতিটাকে?... মনে হ'লো আমি যেন ওপরে উঠে যাচ্ছি... উঁহু, যেন কোনো পাহাড়ের ওপরে টুলিকারে ক'রে ছুটেছি... দম প্রায় বন্ধ হ'য়ে আসছে, হৃৎপিণ্ডে কি-রকম একটা প্রবল চাপ... হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ঐরকমই কিছু-একটা যেন সারা বিপন্ন অস্তিত্বটা দিয়েই আমি অনুভব করতে পারছিলুম।

এই অনুভূতিটা ছিলো বোধকরি পাঁচ মিনিটের জন্যে। তারপরেই, একটু-একটু ক'রে, আমার শরীর তাতে অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়ে তার স্বাভাবিক ছন্দটা খুঁজে পেলে—অবশ্য এই অভ্যস্ত হ'য়ে-যাওয়াটাকে যদি স্বাভাবিক বলা যায়। অবশেষে, কবুলই করি, থলের মধ্যে মাথা-মুখ, হাওয়াও নেই আলোও নেই, একটানা ঐ হাজারো ভোমরার ভোঁ-ভোঁ—যেটা এখন নিজস্ব-একটা ছন্দ খুঁজে পেয়েছে, আমি বোধহয় ঢুলেই পড়েছিলুম।

এক আচম্বিত চমক আমাকে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে সেই চটকা থেকে ফিরিয়ে আনলে। আমার একটা হাত নড়তে পারছে! হ্যাঁ, আমার বাঁধন বোধহয় আলগাই ছিলো, এখন একেবারে-ঢিলে হ'য়ে গেছে, আর অচেতনভাবেই আমি একসঙ্গে-বাঁধা হাতদুটোকে আলাদা ক'রে নিতে পেরেছি।

প্রথমটায় আমি ঠাণ্ডাভাবে নিশ্চল প'ড়ে থাকবার চেষ্টা করেছি, কেননা আমি সেখানে একা ছিলুম না—ঐ গর্জনের মধ্যেও কানে আসছিলো পাশেই যেন দুজন লোক কথা বলছে। একজন বলছে ইংরেজি, কিন্তু গলার স্বরটা এমনই কর্কশ যেন কণ্ঠনালীটা কোহলে টৈটম্বুর। অন্যজন ইংরেজিতেই উত্তর দিচ্ছে বটে, কিন্তু কেমন-যেন জগাখিচুড়ি পাকানো তার ব্যাকরণ—সব বৈয়াকরণেরই দুঃস্বপ্ন, সঙ্গে এমন-সমস্ত শব্দ মেশানো, যার মানে আমার জানা নেই। সম্ভবত অজানা শব্দগুলো বাম্বারার, কারণ আফ্রিকায় এই চার-মাসে এমনতর শব্দ আমার অনেকবারই কানে এসেছে। তার মানে এই বক্তাদের একজন ইংরেজ, অন্যজন আফ্রিকি। ক্রমশই আমার যেন সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, কিছুই যেন মাথায় ঢুকতে চাচ্ছে না। অবশ্য তাতে যে খুব-একটা-কিছু এসে যায়, তা নয়। আমার পাহারাদের গায়ের রং যা-ই হোক না কেন—গোরা, বা কালো—থলেটা যেন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটুও না-নড়ে, তারা যেন টের না-পায় যে আমি অন্তত আংশিকভাবে খানিকটা স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছি।

আস্তে, সাবধানে, আমি বাঁধন ধ'রে টানি, গেরোটা খুলে আসে, আমি কব্জিগুলো বার ক'রে আনি, সাবধানে সদ্য-ছাড়ান-পাওয়া হাত দুটোকে টান ক'রে রাখি শরীরের দু-পাশে।

হাত তো ছাড়ানো গেছে, এবার চোখে দেখতে হবে।

আমার সঙ্গে যা আছে, তাতেই আমার চলবে। আমার পকেটে একটা ছুরি আছে... না, না, ছুরি নয় ঠিক, পেনসিল-কাটা ছুরি। সেটা এতই খুদে-মতো যে আমার খানাতল্লাশ করবার সময় তারা সেটা খুঁজে পায়নি। এটা কোনো অস্ত্র না-হ'তে পারে, কিন্তু এটা অন্তত এতটা বড়ো যে এই দমআটকানো থলেটার মধ্যে আমি একটা ঘুলঘুলি তৈরি ক'রে নিতে পারবো। শুধু, কারু কোনো দৃষ্টি আকর্ষণ না-ক'রে ঐ পেনসিল-কাটা ছুরিটা আমায় হস্তগত করতে হবে।

প্রায় পনেরো মিনিট ধ'রে লেগে থেকে শেষটায় ছুরিটা হাতে মিললো। এইভাবে সশস্ত্র হ'য়ে, ডানহাতটা তুলে আনলুম মুখের কাছে, তারপর থলেটায় ছ্যাঁদা ক'রে দিলুম!

হে অন্তরিক্ষবাসী, বাঁচাও!... এ-কী আমার চোখে পড়ছে!... কোনোমতে শুধু বিস্ময়ের চীৎকারটা খপ ক'রে গিলে ফেললুম। আমার চোখ—উপুড় হ'য়ে ছিলুম ব'লেই—মাটির দিকে ফেরানো, আর দেখি নিচের মাটির সঙ্গে বিশাল-এক দূরত্ব, পাঁচশো গজেরও বেশি, নিচের মাটির সঙ্গে আমার এই ব্যবধান। আর অমনি ঝিলিকের মতো সত্যটা মগজের মধ্যে খেলে যায়। একটা আকাশযানে আছি আমি! এই বিমান আমাকে এক্সপ্রেস ট্রেনের চাইতেও দ্রুতবেগে আকাশপথে নিয়ে যাচ্ছে!

চোখটা আমি পরক্ষণেই বুজিয়ে ফেলেছি। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত একটা শিহরন খেলে গেলো। ঐ চমকটার আবেশ এমন ছিলো—এখন কবুল করতে কোনো বাধা নেই—যে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।

যখন আমার বুকের ঢিপঢিপ আবার স্বাভাবিক হ'য়ে এলো, আমি অপেক্ষাকৃত শান্তভাবেই চারপাশে তাকাতে পারলুম। মাথা-ঘুরিয়ে-দেয়া বেগে মাটি ছুটে যাচ্ছে নিচে, পেছন-দিকে। কত-জোরে যাচ্ছি আমরা? ঘণ্টায় একশো মাইল? দুশো মাইল বেগে? আরো-বেশি? উত্তর যা-ই হোক না কেন, নিচে মরুভূমির বালি, বালির সঙ্গে মেশানো ছোটো-ছোটো নুড়ি, আর মাঝে-মাঝেই বেঁটে-বেঁটে তালগাছ। দৃশ্যটা আরো-খারাপও হ'তে পারতো। যত বেঁটেই হোক, এই তালীবনরাজি অন্তত জ্বলজ্বলে-সবুজ, আর ঐ নুড়ির ফাঁকে-ফাঁকে ঘাসও গজিয়েছে। তাহ'লে ব্যাপারটা কী? লোকের বিশ্বাস যা-ই হোক না কেন, মাঝে-মাঝে কি মরুভূমিতেও বৃষ্টি পড়ে?

মাঝে-মাঝেই দেখতে পাচ্ছি, যখন আমাদের যানের নিচে এসে পড়ে, এই বিমানের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতোই আরো আকাশযান। অন্য-কতগুলো বোধহয় আমাদের যানটারও ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে। যান্ত্রিক পাখির ঝাঁকের উড়াল ! আমার দশা যতই সঙিন হোক না কেন, আমি কিন্তু উত্তেজিত না-হ'য়ে পারিনি। চমৎকার দৃশ্য ! আমাদের এই দুশমনরা আসলে যারাই হোক না কেন, এটা মানতেই হবে তারা কেউই সাধারণ মানুষ নয়—তারা ইকারুসের প্রাচীন কিংবদন্তিটাকেও এমন চমৎকারভাবে বাস্তবে তর্জমা ক'রে দিতে পেরেছে।

অবশ্য ঐ বস্তার ফোকরটার মধ্য দিয়ে চোখ বার ক'রে বেশি কিছু দেখবার উপায় আমার ছিলো না। ধাতুর তৈরি প্ল্যাটফর্মের দুটো পাতের মধ্যে দিয়ে দেখছি ব'লে দু-পাশে আমার দৃষ্টি যাচ্ছে না—তবু এত-উঁচুতে আছি ব'লেই অনেকটাই দেখতে পাচ্ছি।

আর, এইখানে নিচের মরুভূমির চেহারায় আশ্চর্য-একটা বদল শুরু হ'য়ে গেছে। একঘণ্টার একটানা উড়ালের পর হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি তালবীথি, চষা প্রান্তর, বাগান। একটা মরূদ্যান নিশ্চয়ই, মরীচিকা নয় মোটেই, কিন্তু খুবই ছোটো-এক মরূদ্যান। যেই তারা চোখে দেখা দেয়, পরক্ষণেই মিলিয়ে যায়। কিন্তু একটাকে পেছনে ফেলে রেখে আসার সঙ্গে-সঙ্গে দিগন্তে উঠে আসে আরেকটা মরূদ্যান, তারপর ঐ-যে তৃতীয়-একটা —আর এই মরূদ্যানের ওপর দিয়ে হা-হা তুফানের বেগে আমরা উড়ে যাচ্ছি।

এই প্রত্যেকটা মরূদ্যানেই একটা ক'রে বাড়ি আছে। আমাদের উড়ালযানের আওয়াজ শুনে বেরিয়ে আসে একজন লোক ভেতর থেকে, একাই, তার সঙ্গে আর-কেউ নেই। এ-সব মরূদ্যানে কি একজন ক'রেই লোক থাকে ?

তারপরেই এক নতুন ধাঁধার জট, এই ধাঁধার উত্তর আমি জানি না। প্রথম মরূদ্যানটা পেরিয়ে যাবার পরই দেখতে পেয়েছি আমাদের আকাশযান যে-পথ লক্ষ্য ক'রে চলেছে, তার তলায় সার বেঁধে নিয়মিত দূরত্বে একটা ক'রে খুঁটি পোঁতা—আর এমনি অনেক —আর এমন মাপজোক-করা ব্যবধান একটার সঙ্গে আরেকটার যে আমার মনে হ'লো তাদের মধ্যে বুঝি তার দিয়ে সংযোগ করা আছে। নাঃ, আমি নিশ্চয়ই জেগে-জেগেই স্বপ্ন দেখছি। ধূ-ধূ মরুভূমির মধ্যে টেলিগ্রাফের—যদি না এগুলো টেলিফোনের হয়—খুঁটি ?

তৃতীয় মরূদ্যানটা পেরিয়ে যাবার পরই, আরো-একটা মরূদ্যান উঠে আসে চোখের সামনে, আরো-গুরুত্বপূর্ণ এক মরূদ্যান। আমি গাছপালা দেখতে পেয়েছি, শুধু তালবীথিই নয়, খেজুরগাছই নয়, আরো নানাধরনের গাছ। যেন কারিতে, বেওবাব, একাসিয়া। দেখতে পাচ্ছি চষা জমি, চমৎকারভাবে কর্ষিত, যেখানে বেশ-কিছু আফ্রিকি কাজ করছে। তারপরেই দেয়াল উঠে এসেছে দিগন্ত থেকে, আর তার দিকেই আমরা ঝড়ের বেগে এগিয়ে গিয়েছি। অজ্ঞাত-এক শহর এটা, নাম-না-জানা কোনো জনপদ, যেখানে আমাদের এই রূপকথার পাখি নামতে শুরু করেছে। ঠিক শহরটার মাথার ওপর এসে পৌঁছেছি আমরা এখন। বেশি-বড়ো হবে না শহরটা, কিন্তু ভারি-আজব, আষাঢ়ে ! স্পষ্ট



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে পাচ্ছি উপবৃত্তাকার এককেন্দ্রিক সব রাস্তা, একেবারে অক্ষরে-অক্ষরে ছক মিলিয়ে তৈরি করা। মাঝের অংশটা প্রায় পরিত্যক্ত, দিনের এই সময়ে সেখানে শুধু কয়েকজন আফ্রিকিই বাইরে রাস্তায় ছিলো, আমাদের আকাশযানের তর্জনগর্জন শুনে ছুটে তারা গিয়ে ঢুকে পড়ছে তাদের কুঁড়েগুলোয়। বাইরের অংশে কিন্তু লোকজনের কোনো কমতি নেই। তারা সবাই গোরা, আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, আর তারা আমাদের লক্ষ্য ক'রে হাত নাড়ছে!

কিন্তু যে-যানটা আমাকে নিয়ে এসেছিলো, সেটা আরো-দ্রুত নামতে শুরু ক'রে দিলে। সরু-একটা নদী পেরিয়ে এলুম আমরা, তারপরেই আচমকা মনে হ'লো একটা ঢেলার মতোই নিচে নেমে যাচ্ছি যেন। প্রায় ঘুরে-ঘুরে নামছি, শঙ্কুল, বিসর্পিল বৃত্তের মতো, আর আমার মাথাটা ঘুরে গেলো। হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে চ'লে এলো মুখের মধ্যে! এ কোথায় দুম ক'রে পড়তে চলেছি?...

না, চাকার গর্জন থেমে গিয়েছে এখন, আমাদের আকাশযান এসে ভুঁয়ে থেমেছে। কয়েক গজ যেন পিছলেই এগিয়ে গেলো সে তারপর, বেগ ক'মে এলো ক্রমে, থেমে গেলো।

একটা হাত সজোরে পাকড়ে ধ'রে আমার মাথার ওপরকার থলেটা টেনে তুলে ফ্যালে। আমি শুধু চট ক'রে হাতে বাঁধনটা লাগাবারই সুযোগ পেয়েছি।

সরিয়ে ফেলা হ'লো থলে, খুলে দেয়া হ'লো বাঁধন। কিন্তু যে-ই খুলে থাক, সে খেলাটা টের পেয়ে গেছে। মাতাল, জড়ানো, গলায় হুমকি দিয়ে উঠেছে: 'কোন উজবুক গেরোটা বেঁধেছিলো?'

আমি, অবশ্য, উত্তর দেবার কোনো চেষ্টাই করিনি। বরং পায়ের বাঁধন খুলে দেবার পর বেশ খুশি হ'য়েই পা নেড়ে আড় ভাঙবার চেষ্টা করেছি।

'উঠে পড়ো!' কার গলা থেকে যে কর্তৃত্বের এই দাপট বেরিয়েছে, তাকে আমি দেখতে পাইনি।

উঠতেই শুধু বলা হয়েছে, আর-কোনো কঠিন কাজ করতে তো বলা হয়নি, অথচ তবু উঠে-পড়াটা ততটা সহজ ছিলো না। এতক্ষণ রক্তচলাচল বন্ধ ছিলো ব'লে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমার হুকুমে যেন কোনো সাড়াই দিতে চাচ্ছিলো না। যা-ই হোক, অনেক-কষ্টে অবশ পায়ে সাড়া এনে আমি উঠে দাঁড়ালুম।

না, মোটেই উৎফুল্ল দেখাচ্ছে না চারপাশের দৃশ্যকে। আমার সামনেই উঁচু-একটা দেয়াল উঠে গিয়েছে, তাতে একটা ছোটো ঘুলঘুলি অব্দি নেই, আর ঠিক তার উলটো ভাগে, সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। আমার বাঁপাশেও তাই। দৃশ্যবৈচিত্র্য একেবারেই নেই দেখছি! কিন্তু, তবু, তৃতীয় দেয়ালটার ওপরে আমি দেখতে পেয়েছি একটা মিনার, আর-একটা খুব-উঁচু চোঙ। কোনো কারখানা নাকি এটা? কিন্তু আর কীই বা ভাববো,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন দেখতে পেলুম সেই মস্ত খুঁটিটা, যেটা মিনারটা থেকে উঠে গিয়েছে, সটান যেন আকাশ ফুঁড়েই!

ডান দিকে দৃশ্যটা একটু অন্যরকম, তবে খুব-একটা মনোহরণ নয়। দুটো মস্ত অট্টালিকা, তাদের সামনে প্রকাণ্ড-একটা দুর্গ, আর দুর্গ যেমন হয়, কামান-বন্দুকের জন্যে ছিদ্রময় দেয়াল, আর বাইরে-বেরিয়ে-আসা ছোটো অলিন্দ, পাহারার জন্যে।

আমার সব বন্দীসাথীরাও পাশে দাঁড়িয়ে আছেন—শুধু বেচারি তোঙ্গানে বাদে। এ কী, মলিকও দেখছি নেই, কিন্তু সকালে যখন থেমেছিলুম, তখন তাকে দেখতে পেয়েছিলুম, সকলের সাথেই। কী হ'লো তাদের, তবে?

আমার মতো থলের গায়ে ঘুলঘুলি তৈরি ক'রে নিতে পারেনি ব'লে আমার সাথীদের নিশ্চয়ই এই খটখটে-আলো চোখে সইয়ে নিতে অস্বস্তি হচ্ছিলো। চোখ পিটপিট ক'রে তাকাবার চেষ্টা করছিলেন তাঁরা, কেবলই চোখ রগড়ে নিচ্ছিলেন। তাঁদের চোখ রগড়ানো শেষ হবার আগে তাগড়াই একেকটা হাত এসে পড়েছে আমাদের কাঁধে। টেনে নিয়ে-যাওয়া হয়েছে আমাদের তারপর, প্রায় হিঁচড়েই, ধাক্কাধাক্কি, আর আমরা হতভম্ব, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, নিরুৎসাহিত...

কী করতে চায় এরা আমাদের নিয়ে? আর, এ-কোন্ জাহান্নামে এসে পড়েছি আমরা?

হায়! একমিনিট বাদেই আমরা সবাই বন্দীশালায়!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

## তিন

# স্বৈরাচারী / একনায়ক

( *আমেদে ফ্লরেঁসের নোটবই থেকে* )

২৬*শে মার্চ*। তাহ'লে এখন এই কয়েদখানায় ! মাজেপ্পার ভূমিকায় অভিনয় করার পর, এখন কিনা সিলভিও পেলিকোর ভূমিকায় অভিনয় করছি, যে সিলভিও পেলিকো ছিলেন বায়রনের বন্ধু, দশ-দশ বছর বন্দীজীবন কাটাবার মর্মন্তুদ কাহিনী যিনি লিখে গেছেন।

যেমন বলেছি, পরশুদিন, দিবা দ্বিপ্রহরের একটু আগেই, আমাদের বন্দী করা হয়েছিলো। আমাকে পাকড়ে ধরেছিলো তিন-তিনজন মুলাটো, যারা কিঞ্চিৎ জানোয়ার-সুলভ ব্যবহারের পরে, আমাকে জোর ক'রে নিয়ে গিয়েছে কতগুলো পইঠা পেরিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে, তারপর একটা অন্ধকার ঢাকাবারান্দা দিয়ে লম্বা-একটা গ্যালারিতে, আর তার মধ্যে ছিলো কয়েকটা ছোটো কুঠুরি। এই আস্ত গ্যালারিটার ওপরই নজর রাখা সহজ, আর দু-প্রান্তে দাঁড়িয়েছিলো শান্ত্রীরা। আমার ঘোরতর সন্দেহ, অন্তত এই গ্যালারি পেরিয়ে আমরা হয়তো কোনোদিনই পালাতে পারবো না।

আমাকে এমন-একটা কুঠুরির মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে যার মধ্যে আলো ঢোকে আমার মাথার প্রায় বারোফিট ওপরে গরাদ-দেয়া একটা জানলা দিয়ে, তারপর দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে তিন-তিনটে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। কেবল আমার নিজস্ব দুর্ভাবনাগুলোর সঙ্গেই এখন আমার সহবাস—এবং দুর্ভাবনাগুলো ঠিক গোলাপসুন্দরী নয়।

একার পক্ষে এই কুঠুরিতেই চ'লে যায়—এতে হাওয়াও ঢোকে। ঘরের মধ্যে আছে একটা টেবিল, তাতে কিছু লেখার সরঞ্জাম, একটা চেয়ার, একটা বিছানা—সেটাকে বেশ পরিচ্ছন্নই লেগেছে, আর-কিছু শাবান ইত্যাদি। ছাদ থেকে ঝুলছে একটা বিজলিবাতির আলো। এই কয়েদখানার তথাকথিত '*খড়ের শয্যা*' বেশ আরামপ্রদই। লেখার ঘর হিশেবে এটাকে হয়তো আমার পছন্দই হ'তো, যদি-অবশ্য আমার স্বাধীনতা থাকতো।

ব'সে প'ড়ে আমি একটা সিগারেট ধরালুম। আমি অপেক্ষা ক'রে আছি—কিন্তু কীসের ? একটা-কিছু ঘ'টে যাক, হেস্তনেস্ত হ'য়ে যাক—এইই আমি চাই। অন্তত যতক্ষণ কিছু না-ঘটে, ততক্ষণ দিব্বি এই চমকপ্রদ ভ্রমণের উপায়টা নিয়েই ভাবা যাবে।

দু-ঘণ্টা পরে আমার এই ধ্যানভঙ্গ হ'লো আমার কুঠুরির দরজা খোলার আওয়াজে। খিল খোলা হ'লো, তালাগুলোয় চাবি ঘোরাবার আওয়াজ হ'লো, এবং দরজা হাট ক'রে খুলে গেলো, এবং আমি দেখতে পেলুম... হাজারটা অনুমান করার সুযোগ দিচ্ছি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনাদের।

আমি দেখতে পেলুম ৎশুমুকিকে, হ্যাঁ, ৎশুমুকিকেই, যে উধাও হ'য়ে গিয়েছিলো, তৃতীয়বার-যেদিন আবার আমি এই রহস্যময় গুমগুম শুনতে পেয়েছিলুম, তৃতীয়বারের মতো, যে হাজারো ভোমরার গুঞ্জনের অর্থ এখন বেশ বুঝতেই পারছি আমি। যেভাবে আমার লেখাগুলোকে তাচ্ছিল্য করেছে, তারপরেও কি না আমার সামনে এসে উদয় হবার তার সাহস হয়!

সে নিজেই নিশ্চয়ই শীতল-এক অভ্যর্থনাই প্রত্যাশা করেছিলো। তাই কুঠরির মধ্যে ঢোকবার আগে একবার সরেজমিন নিরীক্ষণ ক'রে হতচ্ছাড়া আন্দাজ করবার চেষ্টা করছিলো কী-রকম অভ্যর্থনা তার কপালে আছে।

'ও-হো! তুমি শ্রীমান, দু-চোখো খলনায়ক!' ব'লেই আমি ছুটে গিয়েছি তার দিকে, ইচ্ছেটা হতভাগাকে হাতের সুখে দু-ঘা কষিয়ে দিই!

কিন্তু আমি এসে প্রায় ধাক্কাই খেলুম দরজার পাল্লার গায়ে—বেইমানটা আমার ভাবভঙ্গি দেখেই তৎক্ষণাৎ দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। সেটা হয়তো ভালোই হ'লো! তার কানটা মুলে দিলে আমার হাতের সুখ হ'তো বটে, তাতে শেষ অব্দি কী-ই বা লাভ হ'তো আমার? বরং এমনিতেই নিরানন্দ দশাটা হয়তো আরো-জটিল হ'য়ে পড়তো!

সে বোধহয় আন্দাজই করতে পেরেছিলো আমার ইচ্ছার এই ডিগবাজি। কারণ দ্বিতীয়বার দরজাটা খুলে নচ্ছার দিব্বি-মুখটা বাড়িয়ে দিয়েছিলো ঘরের মধ্যে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, এবার সে অনায়াসেই ঘরে ঢুকতে পারে। কেননা ততক্ষণে আমি ফের আমার চেয়ারটায় এসে বসেছি... সেই সঙ্গে চেষ্টা করেছি মাথাটাও ঠাণ্ডা রাখতে।

আমি ফের একই সম্ভাষণ জানাই তাকে, তবে এবার গলার স্বরে কোনো ধমকের ভাব নেই : 'ও-হো! তুমি *শ্রীমান*, দু-চোখো খলনায়ক! কিন্তু হতচ্ছাড়া, তুই এখানে কী করছিস?'

'আমি এখানে চাকরি করি,' দরজার পাল্লা আরো খুলে ধ'রে একটু সংকোচের সুরেই বলে ৎশুমুকি।

ঢাকাবারান্দাটা দিয়ে আরো-দুজন আফ্রিকি খাবারের থালা নিয়ে এগিয়ে আসে। ৎশুমুকি নিজের হাতে সব খাবার সাজিয়ে রাখে আমার টেবিলে। খাবার দেখে আমার জিভে জল এসে যায়, এতক্ষণে বুঝতে পারি যে খিদেয় আমার নাড়িভুঁড়ি চোঁ-চোঁ করছে। সেটা অবশ্য বিস্ময়কর কিছু নয়। কারণ আমি সারাদিন কিছু খাইনি, এবং এখন বেলা দুটো বাজে।

সব দুর্ভাবনাকে ঝেড়ে ফেলে আমি এই খাদ্যের প্রতি সুবিচার করবার চেষ্টা করি, আর ৎশুমুকি বেশ সসম্ভ্রমেই খাবার পরিবেষণ করে আমাকে। আমি তাকে প্রশ্ন জিগেস



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করি আর সে চেপে-ঢেকে রাখে না কিছু—যখন উত্তর দেয়। তার মতে আমি নাকি এক *রাজার* অতিথি—অনিচ্ছাসত্ত্বেও—বড়ো-এক রাজা, হ্যারি কিলার—নামটা অবশ্য তেমন-মনোরম নয়—আর ইনিই নাকি আমাকে এই আশ্চর্য শহরে নিয়ে এসেছেন, যেখানে নাকি 'বিস্তর বড়ো-বড়ো কুঠি আছে,' আর আছে অজস্র '*তুবাব* জিনিশ,' যার মানে ইওরোপের অনেক জিনিশপত্রই মেলে এখানে। সেটা অবশ্য আমার বিশ্বাস করতে কোনোই অসুবিধে হয় না, বিশেষত ঐ উড়ালযানগুলোর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পর। সত্যি-বলতে, ঐ আকাশযানগুলো এখনও আমাকে কী-রকম যেন অভিভূত ক'রে রেখেছে।

আমি আমার জিজ্ঞাসা চালিয়েই যাই। নিশ্চয়ই এই তথাকথিত রাজাবাহাদুরই তাকে—অর্থাৎ ৎশুমুকিকে—মাদমোয়াজেল মোরনাসের পথে এনে হাজির করেছিলো, এবং তখন তিনি তাকে তাঁর গাইড হিশেবে নিযুক্ত করেছিলেন, যেমন ক'রে লোকে নিজের যাবতীয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ম্যাজিশিয়ানের হাতসাফাই-ক'রে চালানো তাশটাই তুলে নেয়। ৎশুমুকি অবশ্য আপত্তি জানায়, বলে যে সে আগে থেকে কোনো পরিকল্পনা না-ক'রেই নাকি চাকরিটা নিয়েছিলো। তার আরো আব্দার এটাই যে সে নাকি ককখনো কথার খেলাপ করেনি, মাদমোয়াজেল মোরনাস আর সাঁৎ-বের্ন্যা যতদিন আফ্রিকায় থাকবেন, ততদিনই সে নাকি তাঁদেরই চাকরিতে বাহাল থাকবে। এ কি আমাকে ঠাট্টা করছে নাকি? আমি তার দিকে তাকাই। না, সে তো বেশ সিরিয়াসভাবেই কথাটা বলছে, কিন্তু সবমিলিয়ে ব্যাপারটা কেমন যেন হাসিরই শোনায়।

সে বলে মোরিলিরেই নাকি তার মাথাটা খেয়েছে—সে-ই বরং এই রাজাসাহেবের অনুচর। মোরিলিরে যে তাকে বিস্তর ফরাশি সোনা দিয়েছিলো তা-ই নয়, কী-রকম কাব্যি ক'রেই নাকি হ্যারি কিলারের প্রতাপ এবং বদান্যতার কাহন শুনিয়েছিলো; না, ৎশুমুকি এখনও হ্যারি কিলারেকে চোখেও দ্যাখেনি। মোরিলিরেই তাকে বলে, তার সঙ্গে কাজ করলে ৎশুমুকির বাকি জীবনটা নাকি স্বচ্ছন্দে হেসে-খেলেই কেটে যাবে—আর এই প্রতিশ্রুতি পেয়েই তার আনুগত্য একটা ডিগবাজি খেয়েছিলো।

আমি যখন তাকে জিগেস করেছি তার পুরোনো বন্ধু তোঙ্গানের কী হয়েছে, তা সে কিছু জানে কি না, ৎশুমুকির বিশ্রী মুখটা যেন আরো-বিশ্রী হ'য়ে উঠেছে, গলার কাছ দিয়ে ছুরি চালাবার ভঙ্গিতে সে হাতটা চালায় একবার আর মুখ দিয়ে আওয়াজ করে, 'কউরিক।'

তাহ'লে ঠিকই ভেবেছি আমি। বেচারা তোঙ্গানে তবে ম'রে ভূত হ'য়ে গেছে।

ৎশুমুকি তার গোপন কথা শুনিয়ে চলে। যেদিন সে উধাও হ'য়ে গিয়েছিলো সেদিন যে-গুমগুম গর্জনটা আমি শুনেছিলুম তা ছিলো আকাশযানেরই আওয়াজ, তাতে ক'রেই আমাদের কাছে এসে নেমেছিলো লিউটেনান্ট ল্যকুর, ওরফে কাপ্তেন এডওয়ার্ড রুফাস। তার অনুচরেরা অবশ্য এসেছিলো ঘোড়ায় ক'রেই, দুই গোরা সার্জেন্টের সঙ্গে, আর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাস্তায় গ্রামের পর গ্রাম লুঠপাট ক'রে তারা নাকি *একটু মজা* করেছে। উড়ালযানের রণপায়ের দাগই মাটিতে অমন চারইঞ্চি গভীর ক'রে খাঁজ কেটে দিতো।

তাতে বেশ সহজেই বোঝা যায় লিউটেনান্ট ল্যকুরকে অমন ফিটফাট আর তার অনুচরদেরই বা অমন ধূলিধূসর দেখিয়েছে কেন। আর এও বোঝা যায় বিস্ফোরক গুলিতে জখম হওয়া ঐ বুড়ো আফ্রিকি গোরা সার্জেন্টকে দেখে অমন আতঙ্কে গুটিয়ে গিয়েছিলো কেন। ঐ একই উড়ালযান ৎশুমুকিকে পরে এখানে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে...

একটা নামও শোনায় সে এ-জায়গাটার, একটু তালগোল পাকিয়েই সে উচ্চারণ করে নামটা। অনেক কষ্টে আমি বুঝতে পারি যে সে *ব্ল্যাকল্যাণ্ড* কথাটা উচ্চারণ করবার চেষ্টা করছে—ইংরেজি বলতে সে অভ্যস্ত নয় ব'লেই সে উচ্চারণটা অমন গুলিয়ে ফেলেছে। হ্যাঁ, তা তো হ'তেই পারে। তাহ'লে এখন আমরা এই ব্ল্যাকল্যাণ্ডেই আছি, ৎশুমুকির মতে যেটা নাকি আশ্চর্য শহর, যেটার কোনো হদিশ সবচেয়ে-ওয়াকিবহাল ভূগোলবিদও জানেন না।

ৎশুমুকির মুখ থেকে সব খবর শুনতে-শুনতে আমি ভাবতে থাকি। ৎশুমুকি যদি টাকা কামাবে ব'লেই আমাদের সঙ্গে নেমকহারামি ক'রে থাকে, তাহ'লে আরো-বেশি টাকার লোভে সে তার নতুন প্রভুদের সঙ্গেই বা নেমকহারামি করবে না কেন। এ-কথা ভেবেই আমি তাকে একটু বাজিয়ে দেখি : এমন-একটা টাকার অঙ্কের প্রলোভন যাতে তার তিন পুরুষ পায়ের ওপর পা তুলে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। হতভাগার কাছে এমন প্রস্তাবটা খুবই স্বাভাবিক শুনিয়েছে, কিন্তু তবু সে ঘন-ঘন মাথা নেড়ে না করেছে, যেন এমন লোভনীয় অঙ্ক হাতে পাবার কোনো সুযোগই তার নেই।

'এখান থেকে যাবার কোনো উপায়ই নেই,' সে আমাকে জানায়। 'এখানে অনেক সেপাইশান্ত্রী আছে, বিস্তর *তুবাব* জিনিশ আছে, আর আছে উঁচু-উঁচু সব দেয়াল।' সে আরো জানায় যে শহরটার চারপাশেই না কি ধূ-ধূ করছে মরুভূমি, আর কিছু না-ই হোক ঐ মরুভূমি পেরুনো আমাদের সাধ্যে নেই। সেটা অবশ্য সত্যি, আকাশ দিয়ে আসার সময় আমি নিজের চোখেই ঐ বিশাল মরুভূমি দেখেছি। তাহ'লে কি এখানেই আমাদের বাকি জীবনটা কাটাতে হবে নাকি?

আমার খাওয়া শেষ হ'তেই ৎশুমুকি সব থালা-বাসন নিয়ে চ'লে যায়, বাকি দিনটা আমি একাই কাটিয়ে দিই।

রাতের বেলায় ৎশুমুকি ফের খাবার নিয়ে আসে। রান্না বেশ চমৎকার এবং খাবারের বেশ তরিবৎ আছে। তারপর যেই আমার ঘড়িতে ন-টা বেজে কয়েক মিনিট, অমনি হঠাৎ মাথার ওপরকার বিজলিবাতি নিভে গেছে, আমি অন্ধকারে হাৎড়ে-হাৎড়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছি।

তোফা কেটেছে রাতটা। তারপর ২৫শে মার্চ সকালবেলায় উঠে আমি আমার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নোটবই নিয়ে পড়েছি, লিখেছি কেমন ক'রে আমাদের পাকড়ে উড়ালযানে ক'রে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। দিনটা শান্তিতেই কেটেছে। ৎশুমুকি ছাড়া আর-কারু সঙ্গেই আমার দেখা হয়নি। সে-ই শুধু নিয়মিত আমার খাবার নিয়ে এসেছে। রাত্তিরে, আগের দিনের অভিজ্ঞতার পর, আমি বাতি নেভার আগেই শুতে চ'লে গেছি—ঠিক আগের রাতের মতোই ন-টা বেজে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আলো নিভে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে, এটাই এখানকার দস্তুর।

আরেকটা রাত কেটেছে আরামেই, তারপর এই-তো আমি, ২৬শে মার্চ সকালে বেশ তরতাজা, তবে—হায়রে!—এখনও কয়েদ হ'য়েই আছি ঘরটায়। অবস্থাটা ক্রমেই আজব ঠেকতে শুরু করেছে : এরা আমাদের নিয়ে কী করতে চায়? জিগেস করতে পারি, এমন-কাউকে কখন দেখতে পাবো?

*সন্ধেবেলায়*। আমার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছে। আমরা *মহামহিম পরমপ্রতাপাদিত্য* হ্যারি কিলারের সকাশে গমন করেছি, এবং সেই সাক্ষাৎকারের পরই আমাদের অবস্থা আদ্যোপান্ত বদলে গিয়েছে। এখনও সে-কথা ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

তখন বেলা তিনটে হবে, হঠাৎ আমার কুঠুরির দরজাটা শব্দ ক'রে খুলে গিয়েছে। এবার আর এই খোলা দরজায় ৎশুমুকি এসে দেখা দেয়নি, বরং এসেছে আমাদেরই আরেক পুরোনো ইয়ার—মোরিলিরে। তার সঙ্গে এসেছে একদঙ্গল আফ্রিকি, বোঝাই যায় সে-ই তাদের সর্দার। এই আফ্রিকিদের মধ্যেই আমি আমার সাথীদের দেখতে পেয়েছি। মিস ব্লেজন-মোরনাসকে শুদ্ধু, কিন্তু সাঁৎ-বের্ন্যাকে নয়—তাঁর তরুণী মাসি জানিয়েছেন, তিনি নাকি এখনও নড়াচড়া করতে পারছেন না। আমি গিয়ে তাঁদের সঙ্গেই যোগ দিই। নিশ্চয়ই আমার জীবনের শেষপ্রহর এসে উপস্থিত হয়েছে, বিনা নোটিসেই—এখন নিশ্চয়ই আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জল্লাদের কাছে।

না, সে-রকম কিছু হয়নি আদপেই। সারি-সারি করিডর পেরিয়ে আমরা অবশেষে গিয়ে পৌঁছেছি একটা মস্ত ঘরে : আমরা ঘরটায় ঢুকে পড়েছি, আমাদের পাহারা বাইরে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে থেকেছে।

ঘরে শুধু একটাই আরামকেদারা, তালপাতায় ছাওয়া, সামনে একটা টেবিলের ওপর একটা গেলাশ, আর আদ্ধেক-খালি বোতল, যার মধ্য থেকে কোহলের গন্ধ বেরুচ্ছে। টেবিলের ওপাশের আরামকেদারাটার ওপর ব'সে আছে একটা লোক। আমরা সবাই একযোগে তার দিকে তাকিয়েছি। হ্যাঁ, লোকটার এলেম আছে বটে।

*মহামহিম পরমপ্রতাপাদিত্য* হ্যারি কিলারের বয়েস হবে আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ বছর—আরো-কিছু বড়োও হ'তে পারে হয়তো। দেখে যদ্দুর বুঝতে পেরেছি, তাতে মনে হয়েছে মানুষটা সে লম্বা, হট্টাকট্টা গড়ন, বিশাল-দুই হাতের থাবা, মাংসপেশীগুলো ফুটে বেরুচ্ছে বাহুতে, দেখেই বোঝা যায় দেহে বুঝি সে হারকিউলিসের শক্তি ধরে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু যেটা প্রথমেই চোখে পড়ে সেটা তার মাথা। শ্মশ্রুগুম্ফহীন মুখ, মাথায় উশকো-খুশকো কাঁচা-পাকা চুল, ঝাঁকড়া, কতকাল যে চিরুনির সঙ্গে এই চুলের মুখদেখাদেখি নেই কে জানে। চওড়া কপাল থেকে এই কেশর—হ্যাঁ চুল নয়, কেশরই—একটু পেছিয়ে এসেছে, তাতে ক্ষুরধার বুদ্ধির ছাপ, কিন্তু, উগ্রভাবে-ফুটে-বেরুনো চোয়াল দেখে মনে হয় যে-কোনো মুহূর্তে সে রুষ্ট হ'য়ে উঠতে পারে। গাল দুটো ব্রনজের মতো, তাতে দুটো-চারটে রক্তরাঙা ফুশকুড়ি বেরিয়েছে। পুরু ওষ্ঠাধর, তাতে নিচের ঠোঁটটা একটু ঝুলেই এসেছে, আর সেই আধখোলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখা গেছে শক্ত দু-পাটি দাঁত, হলদেটে। চোখদুটো গভীরভাবে কোটরে বসানো, তাদের ওপর ঝোপের মতো ভুরু। মানুষটিকে দেখেই মনে হয় নেহাৎ হেজিপেঁজি সাধারণ লোক নয়, বরং দুর্ধর্ষ, প্রচণ্ড, বলীয়ান।

*মহামহিমের* পরনে ছাইরঙের শিকারের পোশাক, যোধপুরী, হাঁটু অব্দি ওঠা বুটজুতো, আঁটো উর্দি—সব নোংরা, কতরকম যে দাগে ভর্তি। টেবিলের ওপর একটা মস্ত পশমের টুপি, তার পাশে প'ড়ে আছে তার ডানহাতটি, সবসময়েই কাঁপছে।

আড়চোখে একবার তাকিয়ে ডাক্তার শাতোনে সেই কাঁপা হাতটার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আমি বুঝতে পেরেছি তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন : এ হাত নেশাখোরের হাত, মোদোমাতালের হাত।

কিছুক্ষণ ধ'রে এই পরাক্রম ব্যক্তিত্ব কেবল চুপচাপ আমাদের দিকে তাকিয়েই থেকেছে। একজনের পর একজনের ওপর সে বুলিয়ে গেছে নজর, যেন আমাদের ভেতরটাকে সে প'ড়ে ফেলতে চেয়েছে। আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে তার নেকনজর কাকে কী করে, তা-ই দেখবার জন্যে অপেক্ষা ক'রে থেকেছি।

'ওরা যে আমাকে বললে সবশুদ্ধ ছ-জন আছেন আপনারা,' অবশেষে সে ফরাশিতেই বলেছে, তবে তাতে জোরালো ইংরেজি ঝোঁক, গলার স্বর রুক্ষ গমগমে। 'আমি তো মাত্র পাঁচজনকেই দেখতে পাচ্ছি। কেন?'

'আমাদের একজন বেশ-অসুস্থ,' ডাক্তার শাতোনে উত্তর দিয়েছেন, 'আপনার লোকজনের হামলাতেই ঘায়েল হ'য়ে গেছে বেচারা!'

আবারও একটুক্ষণের জন্যে স্তব্ধতা নেমে এসেছে ঘরে, তারপরেই আমাদের প্রশ্নকর্তা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দুম ক'রে জিগেস করেছে : 'আপনারা আমার দেশে এসেছেন কেন?'

প্রশ্নটা এমনই অপ্রত্যাশিত যে অবস্থার গাম্ভীর্য সত্ত্বেও আমাদের হাসি পেয়ে গিয়েছে। হুম! তার দেশে এসেছি আমরা! সে তো আমাদের প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেই।

সে কঠোর চোখে তাকিয়ে বলেছে : 'গোয়েন্দাগিরি করতে নিশ্চয়ই!'

'ক্ষমা করবেন...' বলবার চেষ্টা করেছেন মঁসিয় বারজাক।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু অন্যজন তাঁকে বাধা দিয়েছে। প্রচণ্ড জোরে টেবিলে একটা চাপড় মেরে সে ব'লে উঠেছে, বজ্রের মতো সুরে : 'লোকে আমাকে *প্রভু* বলে, *সর্বেসর্বা*!'

মঁসিয় বারজাক তারপর চমৎকার কীর্তি স্থাপন করেছেন। এমন বেকায়দায় প'ড়ে-যাওয়া সত্ত্বেও তিনি তো বক্তৃতাবাজই আসলে। তিনি সটান খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন, বাঁ-হাতটা বুকে চেপে ধ'রে ডান-হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, 'সতেরোশো উননব্বুই-এর পর থেকে ফরাশিদের কোনো প্রভু নেই কোথাও!'

অন্য-কোথাও কেউ এ-রকম কোনো কথা বললে হো-হো হাসির রোল উঠতো। কিন্তু এখানে এই বন্য খ্যাপা মানুষটার সামনে এই কথার তাৎপর্যটা অন্যরকম হ'য়ে উঠেছিলো, নিছক অতিনাটুকেপনা আর থাকেনি।

শুনে, হ্যারি কিলার তার কাঁধ ঝাঁকিয়েছে শুধু, পরম তাচ্ছিল্যে। তারপর আবার সে পর-পর আমাদের ওপর পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার চোখ বুলিয়েছে, যেন হঠাৎ এই-প্রথম আমাদের সে চোখে দেখছে। তারপর মঁসিয় বারজাকের ওপর থমকে থেকেছে তার চোখ। তার ঐ জ্বলন্ত রুষ্টদৃষ্টির সামনে মঁসিয় বারজাক কিন্তু একটুও কুঁকড়ে যাননি। মিদির এই সাংসদ নিছক বক্তৃতাবাজই শুধু নন, মানুষটির বেশ সাহসও আছে। আমাদের এই মিশনের নেতার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

হ্যারি কিলার অনেক কষ্টে দমন করেছে নিজেকে : হররোজ নিশ্চয়ই এমন ক'রে সে আত্মসংবরণ করে না। তারপর যেমন ক্রুদ্ধস্বরে সে আচমকা গ'র্জে উঠেছিলো, তেমনি আচমকা গলার স্বর নামিয়ে এনে শান্তগলায় জিগেস করেছে : 'আপনি ইংরেজি জানেন?'

'হ্যাঁ,' উত্তর দিয়েছেন মঁসিয় বারজাক।

'আর আপনার সহচররা?'

'তাঁরাও জানেন।'

'বেশ,' তারপর একটু জড়ানো নিচুগলায় সে ইংরেজিতেই আবার পুরোনো প্রশ্নটা তুলেছে। 'আপনারা আমার এ-দেশে এসেছেন কেন?'

উত্তরটা তো স্বতঃসিদ্ধই। 'এ-প্রশ্নটা ঘুরিয়ে আপনাকেই আমাদের করবার কথা,' বলেছেন মঁসিয় বারজাক, 'আমরাই উলটে জানতে চাচ্ছি, আপনি আমাদের জোর ক'রে এ-রকমভাবে আটকে রেখেছেন কেন?'

'কেননা আমি আপনাদের বাগে পেয়েছি,' চড়াগলায় প্রায় ধমকেই উঠেছে হ্যারি কিলার, আবার যেন পারা চ'ড়ে গিয়েছে তার মেজাজের, 'আমি যতদিন বেঁচে আছি, আমার সাম্রাজ্যের ধারে-কাছে কারু আসার কোনো অধিকার নেই!'

তার সাম্রাজ্য?... কী বলতে চাচ্ছে এই উন্মাদ?

হ্যারি কিলার প্রায় লাফিয়ে উঠেছে এবার। টেবিলে প্রচণ্ড-জোরে একটা ঘুষি মেরে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঁসিয় বারজাককে লক্ষ্য ক'রেই সে ব'লে উঠেছে : 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি ভালো ক'রেই জানি আপনার দেশের লোকেরা টিমবাকটু অব্দি পৌঁছেছে, আর নাইজারের তীর ধ'রে ক্রমেই আরো-ভেতরে ঢুকে পড়বার চেষ্টা করছে, কিন্তু তারা যদি এখনও থেমে যায়, তবেই তাদের মঙ্গল। যদি না-থামে... আর এখন কিনা তাদের ধৃষ্টতা এতটাই বেড়ে গিয়েছে ডাঙা দিয়েও লোক পাঠিয়েছে গোয়েন্দাগিরি করবার জন্যে !... আমি চুরমার ক'রে দেবো এদের, এই গোয়েন্দাদের—ঠিক যেমন ক'রে এই গেলাশটা আমি চুরমার ক'রে ভাঙছি !'

যেমন কথা, তেমন কাজ ! ব'লেই সে ছুঁড়ে মেরেছে গেলাশটা মেঝেয়—আর সেটা চুরমার হ'য়ে ভেঙে গেছে মেঝেয়।

তারপরেই সে দরজার দিকে ফিরে গর্জন ক'রে উঠেছে : 'আরেকটা গেলাশ !'

প্রচণ্ড-রোষে ক্ষিপ্ত, আক্ষরিকভাবেই খেপে-উন্মাদ, তার মুখের কষ বেয়ে ফেনা বেরিয়ে এসেছে। উঁহু, মোটেই তাকে ভালো দেখাচ্ছে না এখন। তার উগ্র-বেরিয়ে-আসা চোয়ালটার জন্য তাকে এখন একটা বুনোজন্তুর মতোই দেখাচ্ছে।

ব্ল্যাকগার্ডদের একজন তক্ষুনি এসে তার হুকুম তামিল করেছে। তার দিকে দৃক্‌পাত না-ক'রেই এই ভূতে-পাওয়া মানুষটা টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে, দাঁড়িয়ে মঁসিয় বারজাকের দিকে তাকিয়ে চীৎকার ক'রে উঠেছে :

'আর আমি কি আপনাদের অনেকবারই সাবধান ক'রে দিইনি ?... সেই *দুংকোনোর* গল্পটা, আপনাদেরই সুবিধের জন্যে আমি সেটা ছড়িয়েছিলাম—সেটাই ছিলো প্রথম ইঙ্গিত। আমি আপনাদের পথে সেই গণৎকারকে রেখেছিলাম—তার সব ভবিষ্যদ্বাণী যে ফ'লে গিয়েছে সে জন্যে আপনারা নিজেরাই দায়ী। আমিই পাঠিয়েছিলাম আমার *গোলাম* মোরিলিরেকে, যাতে সিকাসোতে আপনাদের থামিয়ে দেবার জন্যে একটা শেষচেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই কোনো কাজ হয়নি। মিথ্যেই আমি আপনাদের রক্ষিদলকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছি, মিথ্যেই আমি আপনাদের অনাহারে মারবার চেষ্টা করেছি...উঁহু, কিছুতেই কোনো ফল হয়নি, গোঁয়ার্তুমি ক'রে আপনারা তবু নাইজারের দিকে এগিয়েছেন... বেশ, নাইজারে এখন তো পৌঁছে গেছেন আপনারা, এমনকী নাইজার আপনারা পেরিয়েও গিয়েছেন। যা জানতে চেয়েছিলেন, সব জেনে ফেলেছেন তো এবার... আর তার সঙ্গে ফাউ পেয়েছেন আরো-অনেককিছু, না-চাইতেই ! তা এবার এ-সব খবর আপনাদের কর্তাদের কাছে জানাবেন কী ক'রে আপনারা ?'

তার খ্যাপা রোষে প্রায় জ্ঞানশূন্য হ'য়েই হ্যারি কিলার পায়চারি করতে শুরু ক'রে দিয়েছে ঘরে। লোকটা যে উন্মাদ, সে-বিষয়ে আমার অন্তত কোনো সন্দেহ নেই। তারপর আবার হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়েছে, সম্ভবত নতুন-কোনো কথা তার মাথায় খেলে গিয়েছে; ঠাণ্ডাগলায় মঁসিয় বারজাককে জিগেস করেছে : 'কিন্তু আপনারা কি আসলে সায়ীর দিকে যেতে চাননি ?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ,' উত্তর দিয়েছেন মঁসিয় বারজাক।

'তাহ'লে হঠাৎ অন্যদিকে গিয়েছিলেন কেন ? কুবোতে গিয়ে কী করবেন ব'লে ভেবেছিলেন ?'

হ্যারি কিলার প্রশ্নটা ক'রেই তার ঐ মর্মভেদী দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়েছে। আমরা একটু আড়ষ্টভাবে গুটিয়ে গিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়েছি। এ-প্রশ্নটা ভারি-বিপজ্জনক, যেহেতু আমরা আগেই ঠিক ক'রে নিয়েছিলুম যে মিস ব্লেজনের সত্যিকার পরিচয় আমরা কাউকে দেবো না। সৌভাগ্যবশত মঁসিয় বারজাক একটা সম্ভাব্য কৈফিয়ৎ খাড়া করতে পেরেছেন। 'আমাদের রক্ষীরা আমাদের ছেড়ে চ'লে যাবার পর আমরা টিমবাকটুর দিকেই যেতে চাচ্ছিলুম।'

'কেন ? সিকাসোতে নয় কেন ? সেটা তো খুব-দূরে ছিলো না ?'

'আমরা শুধু ভেবেছিলুম টিমবাকটু গেলেই আমাদের বেশি সুবিধে হবে।'

'হুম !' হ্যারি কিলারের স্বরে দ্বিধা আর সন্দেহ। 'তাহ'লে আপনারা পুবদিক ধ'রে নাইজারে যেতে চাননি ?'

'না,' মঁসিয় বারজাক তাকে আশ্বস্ত করেছেন।

'সেটা যদি আমি অনুমান করতে পারতাম,' হ্যারি কিলার আমাদের জানিয়েছে, 'তাহ'লে এখন আর এখানে আপনাদের টেনে আনতে হ'তো না !'

কী নির্মম ঠাট্টা ! যেন সে কোনোদিন আমাদের কাছে কথাটা জানতে চেয়েছিলো !

এই পরিহাসবিজল্পনার পর যে-স্তব্ধতাটা নেমে এসেছিলো, তার মধ্যেই আমি আমার কৌতূহল মেটাবার জন্যে কতগুলো প্রশ্ন করবার সাহস সঞ্চয় ক'রে নিয়েছিলুম। আমি মানুষটা আবার একটু যুক্তিটুক্তির পক্ষপাতী—যা-ই আমার যুক্তিসংগত মনে হয় না, তা-ই কেমন যেন অগোছালো লাগে আমার। আর একটা তথ্য আমার ভারি বেখাপ্পা লাগছিলো, কেমন যেন বেমানান। তাই আমি একটু সাহস সঞ্চয় ক'রে জিগেস করেছি :

'মাফ করবেন,' খুব নরমসুরে মোলায়েম ক'রে বলেছি, 'আপনি তো আমাদের খতম ক'রে দিতেই পারতেন—তার বদলে হঠাৎ এমন ক'রে আমাদের ধ'রে এনেছেন কেন এখানে? আপনার কাপ্তেন এডওয়ার্ড রুফাস ও তার সহচরদের তো যথেষ্ট সুযোগ ছিলো—আমরা তো তাদের অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ খুঁজে পাইনি। সেটাই তো আমাদের ধরাধাম থেকে মুছে দেবার পক্ষে ভালো হ'তো!'

হ্যারি কিলার ভুরু কুঁচকে অপরিসীম তাচ্ছিল্যভরে আমার দিকে তাকিয়েছে। কে বটে এই পিগমি, যে তার সঙ্গে কথা বলবার স্পর্ধা রাখে ! তবু সে কৃপা ক'রে আমায় বলেছে : 'ফরাশি কর্তৃপক্ষ যাতে অহেতুক তদন্ত করতে সেনাবাহিনী না-পাঠায়। তারা নিশ্চয়ই বেজায় অস্থির হ'য়ে পড়তো, যদি হঠাৎ তাদের কোনো মিশন অমনভাবে কোনো



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিহ্ন না-রেখেই মুছে যেতো!'

অংশত মেনে নিয়েছি উত্তরটা, কিন্তু পুরোপুরি সন্তুষ্ট হ'তে পারিনি। তাই একটু আপত্তি তুলেছি, সবিনয়ে : 'কিন্তু আমরা যদি হঠাৎ গুম হ'য়েই যাই, তাতেও তো ঐ একই প্রতিক্রিয়া হবে!'

'তা ঠিক,' হ্যারি কিলার এতক্ষণে একটু কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে। 'সেইজন্যেই আমি চেয়েছিলাম আপনারা যাতে সফরের পরিকল্পনাটাই বাতিল ক'রে দেন। শুধু আপনাদের এই অবুঝ গোঁয়ার্তুমিই আপনাদের এভাবে ধ'রে আনতে বাধ্য করেছে আমায়।'

সে যেহেতু একটু সুযোগ দিয়েছে আমায়, আমি সেটা অমনি সজোরে আঁকড়ে ধরেছি। 'তাহ'লে তো চমৎকার একটা বোঝাপড়া ক'রে ফেলা যায়। আপনি নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পেরেছেন যে আমরা বাস্তবিকই নাইজারের দিকে যেতে চাই না—আপনাকে শুধু আবার আমাদের ওখানটায় পৌঁছে দিতে হবে, ঐ কুবোর কাছে, তাহ'লেই কোথাও কেউ কোনো প্রশ্ন তুলবে না...'

'যাতে গিয়ে পরমানন্দে ইওরোপে খবরটা ছড়িয়ে দেয়া যায় এখানে আপনারা কী দেখেছেন যাতে কেউ যার নামও শোনেনি, সেই শহরটার কথা সবাই জেনে যায়?' হ্যারি কিলার হঠাৎ আবার চ'টে গিয়েছে। 'উঁহু, এখন বড্ড-দেরি হ'য়ে গেছে। যেই একবার ব্ল্যাকল্যাণ্ডে ঢুকেছে তারই আর-কোনোদিন এখান থেকে বেরিয়ে-যাওয়া হবে না।'

গলাটাকে অত কষ্ট দিচ্ছে কেন লোকটা? আমি তার এই ঝড়তুফানে ক্রমেই অভ্যস্ত হ'য়ে উঠছি। ফলে তার তর্জনগর্জনকে কোনো পাত্তা না-দিয়েই আবার বলেছি : 'কিন্তু তদন্ত তো একটা হবেই!'

'হবে নিশ্চয়ই,' আবার তার মেজাজের পারা নেমে গিয়েছে, 'কিন্তু আমার অবস্থা আগের চাইতেও আরো-ভালো হ'য়ে যাবে। যদি আমার কথা সবাই জেনে ফ্যালে, যদি আমাকে লড়তে হয়, তবে আপনাদের মৃতদেহগুলোর চাইতেও একটা ভালো জিনিশ থাকবে আমার দখলে।'

'সেটা কী?'

'জামানত। আপনারাই আমার কাছে জামানত হ'য়ে থাকবেন।'

হ্যাঁ, সেটা খুবই জোরালো সুবিধে হবে তার। এ-লোকটা মোটেই বোকা নয়। সে জানে কীসে কী হয়। কিন্তু তাকে প্রশ্ন ক'রে আমিও ঠিকই করছি, বোঝাই তো যাচ্ছে এখন খামকা আমাদের প্রাণে মেরে ফেলবার কোনো মৎলব তার নেই। অন্তত এ-তথ্যটা জানা সবসময়েই মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

হ্যারি কিলার আবার গিয়ে টেবিলের ওপাশে তার আরামকেদারাটায় ব'সে পড়েছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিব্বি শান্ত, সুবোধ, নিজের মেজাজটা এখন পুরোপুরি আয়ত্তে।

'একটা জিনিশ স্পষ্ট হ'য়ে যাক,' এবার নতুন-একটা হিমশীতল স্বরে সে বলেছে, 'আপনারা এখন ব্ল্যাকল্যাণ্ডে আছেন, এবং আপনারা কোনোদিন এখান থেকে আর এক পাও বেরুতে পারবেন না, একজনও না। কী ধরনের জীবন যাপন করতে চান, সেটা পুরোপুরি আপনাদের ওপরই নির্ভর করবে। আমাকে কারু কাছেই কৈফিয়ৎ দেবার কিছু নেই। আমি আপনাদের বন্দী ক'রেও রাখতে পারি, আবার খতম ক'রেও দিতে পারি। যা ইচ্ছে হবে, তা-ই করতে পারি। আবার আমি এখানে যে-রকম ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে পারি, সেই অধিকারও আপনাদের দিয়ে দিতে পারি—অবশ্যই আমার এই সাম্রাজ্যের ভেতরেই এই অবাধ চলাফেরার সুযোগ আপনারা পাবেন।'

আবার ঐ সাম্রাজ্যের কথা!

'সেটা নির্ভর করবে, আপনাদেরই নিজেদের ওপর, আপনারা কী চান,' আবার মঁসিয় বারজাককে লক্ষ্য ক'রে সে বলেছে। 'হয় আপনারা জামানত হিশেবে এখানে থাকবেন, নয়তো...'

সে এমন-একটা ভঙ্গিতে তাকিয়েছে যে আমার মতোই মঁসিয় বারজাকও ভারি অবাক হ'য়ে গেছেন। জামানত ছাড়া আর কী-ই বা তবে হ'তে পারি আমরা?

'অথবা আমার সহযোগী হ'য়ে উঠতে পারেন,' ঠাণ্ডাগলায় বলেছে হ্যারি কিলার।

এই প্রস্তাব যে আমাদের বিস্মিত ক'রে দিয়েছিলো, এটা বললে কমিয়েই বলা হবে। আমরা যেন বজ্রাহতের মতো তাকিয়ে থেকেছি।

সে কিন্তু তেমনি ঠাণ্ডাস্বরে ব'লেই চলেছে : 'এটা ভাববেন না যে ফরাশি সেনাবাহিনীর ভাবগতিক বা অগ্রগতি সম্বন্ধে আমি কোনো খবর রাখি না। তারা যদি আমার অস্তিত্বের কথা এখনও না-জানে, তবে অদূর-ভবিষ্যতে কোনোদিন মোক্ষমভাবেই তার কথা জেনে যাবে। তখন হয় তার সঙ্গে আমায় লড়াই করতে হবে, নয়তো আপোষ-রফা নিয়ে দরাদরি করতে হবে। এটা ভাববেন না যে যুদ্ধ করতে আমি ভয় পাই। নিজেকে রক্ষা করবার সব উপায়ই আমার আছে। কিন্তু যুদ্ধই তো আর একমাত্র সমাধান নয়। নাইজার নদীর বাঁকে উপনিবেশ স্থাপন করতে হ'লে ফরাশি বাহিনীকে এখনও অনেকদিনই ব্যতিব্যস্ত থাকতে হবে। পুবদিকে আরো এগিয়ে মরুভূমির দিকে যদি আসতে চায় আমার সঙ্গে তাদের যুদ্ধ অনিবার্য। কী লাভ এই ধূ-ধূ বালি দখল করবার চেষ্টা ক'রে, যদি তার জন্যে তাদের বেমক্কা বিচ্ছিরিভাবে হার স্বীকার ক'রে নিতে হয়? মরুভূমিটা তাদের কোনো কাজে লাগবে না, কিন্তু আমি তাতে সোনা ফলাতে পারবো। ঠিকমতো আলোচনা করলে আমাদের মধ্যে বরং একটা মৈত্রীই হ'তে পারে।'

লোকটা দেখছি অনেককিছুই ধ'রে নিয়েছে, যেন সে যা ভাবছে তার আর কোনো অন্যথা নেই। তার সর্বাঙ্গ থেকে দম্ভ চুঁইয়ে পড়ছে। এই ঘৃণিত স্বৈরাচারীর সঙ্গে ফরাশি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকার কি কোনো আলোচনাসভায় বসতে রাজি হবে?

'মৈত্রী? আপনার সঙ্গে!' মঁসিয় বারজাক বিস্ময়ধ্বনি ক'রে উঠেছেন। আর ঐ কথাতেই আমাদের সবাইকার মনোভাবই ব্যক্ত হ'য়ে গেছে।

কিন্তু তুফান তোলবার জন্যে ঐ প্রশ্নটাই যথেষ্ট। সত্যি, তার ঠাণ্ডা মেজাজটা বড্ড-বেশিক্ষণই টিকেছে। বড্ড-একঘেয়ে হ'য়ে উঠছে এই শান্ত মেজাজ।

'ভাবছেন যে আমি আদৌ তার যোগ্য নই?' গর্জন ক'রে উঠেছে হ্যারি কিলার। ধ্বক ক'রে জ্ব'লে উঠেছে তার রক্তচক্ষু, আবার সে নিরীহ টেবিলটার ওপর সজোরে ঘুষি কষিয়েছে। 'না কি ভাবছেন যে এখান থেকে পালাতে পারবেন? আমার ক্ষমতা তাহ'লে আপনারা টের পাননি!'

সে উঠে প'ড়ে হুমকি দিয়েছে : 'বেশ। শিগগিরই তা জানতে পাবেন।'

তার ডাকে পাহারারা ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে। তারা পাকড়ে ধরেছে আমাদের, হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে গেছি সবাইকে। অন্তহীন সিঁড়ির ধাপ বেয়ে তারপর আমরা উঠেছি কেবল, তারপরে মস্ত-একটা অলিন্দ দিয়ে টেনে নিয়ে গেছে তারা আমাদের, তারপর আরো পইঠার পর পইঠা—সিঁড়ি। শেষটায় আমরা মিনারটার প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছি, আর পরক্ষণেই হ্যারি কিলারও এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

লোকটা অবিশ্রাম ঢেউয়ের মতো উঠছে নামছে। মাঝামাঝি-কিছুই নেই তার কাছে। একবার তপ্ত রোষে গর্জাচ্ছে তো পরক্ষণেই হিমজমাট হ'য়ে এসেছে স্বর। আপাতত তার শেষ-চোটপাটের কোনো চিহ্নই নেই তার ব্যবহারে।

'এখানে চল্লিশ গজ ওপরে এসে আপনারা দাঁড়িয়েছেন,' যেন কোনো ওস্তাদ গাইড দ্রষ্টব্যস্থান সম্বন্ধে মোলায়েম মন্তব্য করছে। 'তার মানে দিগচক্রবাল প্রায় পনেরো মাইল দূরে এখান থেকে। যদ্দূর অব্দি চোখ যাবে দেখতে পাবেন মরুভূমির বদলে এখানে উর্বর একটা দেশ গজিয়ে উঠেছে। যে-সাম্রাজ্য আমি শাসন করি, তা ছশো বর্গমাইলের চেয়েও বেশি। না, না, ছশো কেন, বারোশোই হবে। আর এ-কাজটা আমরা হাঁশিল করেছি মাত্র দশ বৎসরে।'

হ্যারি কিলার একটু থেমে গিয়ে আমাদের অভিভূতবিস্ময় দেখে পরম সন্তোষ লাভ করেছে। 'যদি কেউ এই বারোশো বর্গ মাইলের মধ্যে পা দেবার চেষ্টা করে, আমি তাহ'লে তক্ষুনি মরুভূমিতে যে-তিনটে পাহারাবিতান বানিয়েছি সেখান থেকে খবর পেয়ে যাবো — টেলিফোনে—'

তাহ'লে সেদিন যে মরূদ্যান আর সারি-সারি খুঁটি দেখেছিলুম, তার অর্থটা এই? কিন্তু আপাতত বরং হ্যারি কিলারকেই শোনা যাক। সে আমাদের একটা আতশকাচে তৈরি মস্ত লণ্ঠন দেখাচ্ছে, অনেকটা কোনো বাতিঘরের লণ্ঠনেরই মতো। প্ল্যাটফর্মের ঠিক মাঝখালে একটা থামের ওপর সেটা বসানো।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাও যদি যথেষ্ট না-হয়, তবু কেউ আমার অনুমতি বিনা এখানে ঢুকতে পারবে না। ব্ল্যাকল্যাণ্ডের দেয়ালের বাইরে পাঁচ ফার্লং দূরে আধমাইল চওড়া একটা সুরক্ষা অঞ্চল আছে—সারারাত জোরালো বাতি থেকে সন্ধানী আলো পড়ে সেখানে। এই বাতিটা কোনো চোখের মতো, সেইজন্যে আমি এই যন্ত্রকে *সাইক্লোস্কোপ* বলি, সেটা সরাসরি নিচে ঐ সুরক্ষা অঞ্চলের দিকে তাকায়, আর প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি ধরা প'ড়ে যায় তার চোখে —আতশকাচের মারফৎ, অনেকগুণ-বড়ো হ'য়ে। আসুন, এই *সাইক্লোস্কোপের* মধ্য দিয়ে তাকান—আমি আপনাদের অনুমতি দিচ্ছি—নিজেরাই তারপর বিচার ক'রে দেখুন।'

আমাদের কৌতূহল এতটাই উশকে উঠেছিলো যে আমরা সবাই এক-এক ক'রে তখন ঐ সাইক্লোস্কোপের পরকলা দিয়ে তাকিয়েছি : সোজাসুজি ঢুকে পড়েছি ঐ অতিকায় লণ্ঠনটার মধ্যে আর বিশাল-একটা পরকলার মধ্য দিয়ে তাকিয়েছি আমরা। ঐ লণ্ঠনের মধ্যে ঢোকবামাত্র বাইরের পৃথিবীটা আমূল বদলে গিয়েছে। যেদিকেই তাকিয়েছি, গোড়ায় একটা সটান-খাড়া দেয়াল ছাড়া আর-কিছুই চোখে পড়েনি—বড়ো-বড়ো শিক লাগানো কতগুলো চৌকো-চৌকো খোপে সেই দেয়ালটা ভাগ করা।

দেয়ালটার ভিৎ ছায়ায় ঢাকা, কিন্তু তার ওপরটা মনে হয়েছে বিশাল-ওপর থেকে আমাদের মতো ক্ষুদ্র মনুষ্যের দিকে তাকিয়ে আছে—আর সেখানটা দুধশাদা আলোয় মাখামাখি। তারপরেই আস্তে-আস্তে টের পেয়েছি তার রং সবজায়গায় একরকম নয় মোটেই, বরং যেন অগুনতি ভিন্ন-ভিন্ন শাদার রেশ, অস্পষ্ট-সব ঝাপসা রেখা। একটু মনোযোগ দিতেই বুঝতে পেরেছি ওগুলো সব হয় গাছপালা, নয়তো মাঠঘাট বা রাস্তা —সড়ক। কোথাও-বা দেখেছি মাঠে লোক খাটছে। সব আতশকাচের মধ্য দিয়ে এতটাই বড়ো হ'য়ে চোখের পটে পড়েছে যে, একটু পরে তাদের শনাক্ত করতে মোটেই অসুবিধে হয়নি।

'ঐ নিগ্রোদের দেখতে পাচ্ছেন?' হ্যারি কিলার জিগেস করেছে আমাদের। 'ধরুন, যদি তারা কখনও পালাবার কথা ভাবে, তবুও বেশি দূরে যেতে পারবে না।' ব'লেই সে তুলে নিয়েছে টেলিফোনের রীসিভার। বলেছে, 'একশো এগারো নম্বর বৃত্ত। পনেরোশো আটাশ ব্যাসার্ধ।' তারপর আরেকটা টেলিফোন তুলে বলেছে : 'চোদ্দ নম্বর বৃত্ত। পনেরোশো দুই ব্যাসার্ধ।' তারপর আমাদের দিকে ঘুরে বলেছে : 'এবারে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখুন।'

গোড়ায় কয়েক মিনিট কিছুই দেখা যায়নি, তারপর ঐ ঝাপসা জায়গাটা আরো-অস্পষ্ট হ'য়ে গেছে ধোঁয়ায়। ধোঁয়া স'রে যেতেই দেখেছি, যেখানে ঐ ঝাপসা রেখাটা একটু আগেও ছিলো সেটা আর নেই।

'যে-লোকটা ওখানে কাজ করছিলো, তার কী হ'লো?' মাদ্‌মোয়াজেল মোর্‌নাসের গলা আবেগে কেঁপে উঠেছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সে মারা গেছে,' ঠাণ্ডাগলায় জানিয়েছে হ্যারি কিলার।

'মারা গেছে !...' আমরা আঁৎকে উঠেছি : 'অকারণে একটা লোককে এমনভাবে মেরে ফেললেন !'

'ও নিয়ে ভাববেন না—ও-তো নেহাৎই এক নিগ্রো।' অত্যন্ত সরলভাবেই বলেছে হ্যারি কিলার। 'তুচ্ছ আবর্জনা বৈ আর-কিছু না। একটা গেলে আরো-অনেক কটা মিলবে। ও-লোকটা একটা *উড়াল টরপেডোর* ঘায়ে উড়ে গেছে। একটা হাউইই আসলে, *রকেট*, পনেরো মাইল তার পাল্লা। আর দেখেছেন তার গতি আর নিখুঁত লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা!'

তার এই ব্যাখ্যা শুনেছি, আর লোকটার নিষ্ঠুরতায় শিউরে উঠেছি। পরক্ষণেই ঐ শাদা দেয়ালের গা বেয়ে আরো-একটা উল্কাপিণ্ডের মতো কিছু ছুটে গিয়েছে—আর দ্বিতীয় ঝাপসা রেখাটাও মুছে গেছে।

'ও-লোকটার কী হ'লো,' মাদমোয়াজেল মোরনাসের গলা দিয়ে যেন স্বরই বেরুতে চাচ্ছিলো না। 'সেও কি ম'রে গেছে ?'

'না। ও-লোকটা বেঁচে আছে। সবুর, এক্ষুনি তাকে দেখতে পাবেন।'

ব'লে সে লণ্ঠনঘর বা *সাইক্লোস্কোপ* থেকে বেরিয়ে গেছে, আর পাহারারাও আমাদের টেনে বের ক'রে দিয়েছে সেখান থেকে। আবার আমরা এসে মিনারের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছি। আর অমনি দেখতে পেয়েছি, উল্কার বেগে একটা বিমান এদিকে ধেয়ে আসছে। তার তলা থেকে কী যেন ঝুলছে শূন্যে।

'এই-যে দেখুন, হেলিবিমান,' এইভাবেই হ্যারি কিলার তার আকাশযানের নামটা ফাঁস করেছে আমাদের কাছে। 'এক মিনিটের মধ্যেই টের পেয়ে যাবেন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ এখানে ঢুকতে অথবা এখান থেকে বেরুতে পারে কি না।'

হেলিবিমানটা, সত্যি, তীব্রগতিতে কাছে এগিয়ে এসেছে। আর আমরা শিউরে উঠে আবিষ্কার করেছি, তার তলায় শূন্যে যা ঝুলছে—সে এক নিগ্রো; তাকে বিমান থেকে যেন একটা চিমটে বেরিয়ে গিয়ে আঁকড়ে ধ'রে রেখেছে।

হেলিবিমানটা আরো-কাছে এসে পড়েছে, একেবারে আমাদের প্ল্যাটফর্মের ওপর। আর, বীভৎস... চিমটে আলগা হ'য়ে গিয়েছে, সাঁড়াশির বাঁধন থেকে নিচে থুবড়ে পড়েছে ঐ নিগ্রো, তার দেহটা একেবারে থেঁৎলে গিয়েছে। ঠিক আমাদের পায়ের কাছে। আমাদের গায়ে ফিনকি দিয়ে ছিটকে এসে পড়েছে তার রক্ত।

ধিক্কারে আমরা চীৎকার ক'রে উঠেছি ! কিন্তু মাদমোয়াজেল মোরনাস শুধু চীৎকার ক'রেই ক্ষান্ত হননি, তাঁর চোখ জ্বলন্ত, মুখটা বিবর্ণ, ঠোঁট রক্তশূন্য—তিনি আচমকা পাহারাকে ঠেলে সরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন হ্যারি কিলারের ওপর।

'খল ! কাপুরুষ !... খুনে।' তার মুখের ওপর চেঁচিয়ে বলেছেন তিনি, আর ছোটো হাত দুটি দিয়ে তার টুঁটি টিপে ধরেছেন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে অনায়াসেই একটা মাছি তাড়াবার ভঙ্গি ক'রে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। আমরা এই মাথাগরম তরুণীর ইন্তেকাল এসেছে ভেবে আঁৎকে উঠেছি। কিন্তু কিছুই করবার উপায় ছিলো না আমাদের : পাহারারা আমাদের ততক্ষণে সজোরে জাপটে ধরেছে।

সৌভাগ্য বলতে হবে, এই স্বৈরাচারী একনায়ক আপাতত অন্তত এই তরুণীকে সাজা দেবার কথা ভাবেনি, শুধু দুজন শান্ত্রী তাঁকে হিড়হিড় ক'রে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেছে। হ্যারি কিলারের মুখটা যদিও নিষ্ঠুর-শ্লেষে বেঁকানো, তার চোখে কেমন-একটা উল্লাসের দৃষ্টি। সে স্থিরভাবে তরুণীর দিকে তাকিয়ে বলেছে : 'হুম ! হুম ! এর দেখছি সাহস আছে—ডরায় না যে !' তারপর পা দিয়ে নিগ্রোটির থ্যাঁৎলানো দেহটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলেছে : 'অত তুচ্ছ ব্যাপারে মাথাগরম করতে নেই, খুকি !'

সে মিনার থেকে নেমে গিয়েছে তারপরে, আমাদেরও পাহারা হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে গেছে পেছন-পেছন। আবার আমরা এসে পড়েছি হ্যারি কিলারের খাশ কামরাটায় —যেটা *চমৎকারভাবে* শুধু-একটা টেবিল আর শুধু-একটা আরামকেদারা দিয়েই সাজানো। হ্যারি কিলার তার মসনদে ব'সে প'ড়ে আমাদের দিকে তাকিয়েছে।

না, ভুল বলেছি... শুধু একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছে মাদ্‌মোয়াজেল মোর্‌নাসের দিকে, আর তার ক্রুর-চোখে যেন হাসি ফুটে উঠেছে। 'এখন আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে একটু ধারণা হয়েছে তো ? আমি শুধু এটাই দেখিয়েছি যে আমার প্রস্তাব অমন তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। এই-শেষবার আবারও প্রস্তাবটা রাখছি। আমি শুনেছি আপনাদের মধ্যে একজন রাজনীতিক, একজন ডাক্তার, একজন সাংবাদিক এবং দুটি আস্ত গর্ধব আছে...'

আস্ত গর্ধব ! মঁসিয় পঁসা আর সাঁৎ-বেব্যা !

'দরকার হ'লে ঐ রাজনৈতিক নেতা ফ্রান্সের সঙ্গে আলোচনা চালাতে পারবেন। আমি ডাক্তারের জন্যে একটা হাসপাতাল তৈরি ক'রে *দেবো*। সাংবাদিক কাজ করতে পারবেন *ব্ল্যাকল্যাণ্ড থাণ্ডারবোল্ট* কাগজটায়, বাকি দুজনকে কীভাবে কাজে লাগানো যায় পরে ভেবে দেখবো। বাকি রইলো এই খুকি। একে আমার ভারি মনে ধরেছে... আমি একে বিয়ে করবো।'

'এর কোনোটাই হবে না,' দৃঢ়স্বরে মঁসিয় বারজাক বলেছেন। 'আমাদের চোখের সামনে ওভাবে নিরীহ লোকদের খুন ক'রে ভেবেছেন আমাদের ভয় দেখাবেন ? উঁহু। গায়ের জোর খাটালে অন্য কথা—কিন্তু আমরা আপনার দাক্ষিণ্য চাই না। আর মাদ্‌মোয়াজেল মোর্‌নাস...'

'ওহ্, আমার ভাবী বৌয়ের নাম বুঝি মোর্‌নাস ?'

'আমি নিজেকে মোর্‌নাসই বলি বা না-ই বলি,' রেগে, আরক্তিম, আমাদের সঙ্গিনী বলেছেন, 'এটা জেনে রেখো তোমাকে একটা বুনোজানোয়ার ছাড়া আর-কিছুই আমি ভাবি না। ভেবেছো, তোমার ঐ ঘৃণিত, ধিক্কৃত প্রস্তাবে...'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যারি কিলার অমনি হো-হো ক'রে হেসে উঠেছে। 'বাঃ, চমৎকার... চমৎকার! তবে তাড়া কিছু নেই। একমাস তুমি ভেবে দেখবার সময় পাবে, খুকি।'

কিন্তু তারপরেই পারা আবার চ'ড়ে গেছে। উঠে প'ড়ে সে পাহারাদের ডেকে বলেছে : 'এদের সব ক-টাকে নিয়ে যা।'

কিন্তু যাবার আগে মঁসিয় বারজাক হ্যারি কিলারকে জিগেস করেছেন : 'আর একমাস পরে আমাদের নিয়ে কী করবেন?'

হাওয়া কিন্তু সত্যি পালটে গেছে। এই একনায়ক তখন আর আমাদের কথা আদপেই ভাবছে না। তার কম্পিত হাত টেবিল থেকে মদের গেলাশটা তুলে নিয়েছে। গেলাশটা মুখে তুলতে গিয়ে একটু থেমে গিয়ে বলেছে : 'সেটা ঠিক ভেবে দেখিনি। হয়তো ফাঁসিতেই লটকাবো!'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চার

## ২৬শে মার্চ থেকে ৮ই এপ্রিল

আমেদে ফ্রঁরেস যেমন লিখেছেন তাঁর নোটবইতে, হ্যারি কিলারের সঙ্গে ওই চমকপ্রদ সাক্ষাৎকারের পর ছ-জন কয়েদি খুবই বিপন্ন ও বিচলিত বোধ করেছেন, ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধও। ঐ দুজন হতভাগ্য আফ্রিকির মৃত্যু এবং তদুপরি দৃশ্যটির ভয়াবহ পরিসমাপ্তি তাঁদের একেবারে কাঁপিয়ে দিয়েছিলো। এ-রকম কোনো লোক জন্মায় কী ক'রে, যারা এমনই নৃশংস যে অকারণেই চারপাশে মৃত্যু ছড়িয়ে দিয়ে এমন জঘন্য আমোদ পায়? শুধু তুচ্ছ-একটা খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে, শুধু তার জঘন্য ক্ষমতাকে দেখাবার জন্যেই সে কিনা খামকা এই দুজন মানুষকে মেরে ফেললো!

তৎসত্ত্বেও তাঁদের জন্যে বেশ পছন্দসই বিস্ময়ই অপেক্ষা করছিলো। হ্যারি তাঁদের একমাস সময় দিয়েছে সব ভেবে দেখবার জন্যে, কিন্তু তাঁদের মনোভাব প্রসন্ন ক'রে তোলবার জন্যে ভেবেছে তাঁদের একটু আরামে রাখলেই তাঁরা খুশি হ'য়ে যাবেন। কারণ যা-ই থাক না কেন, তাঁদের কুঠুরির দরজায় আর তালা পড়েনি, ইচ্ছেমতো গ্যালারিটায় ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে তাঁদের। আর গ্যালারিটা হ'য়ে উঠেছে তাঁদের *কমনরুম*, সকলের মেলবার জায়গা, যেখানে গিয়ে যতবারখুশি পরস্পরের সঙ্গে দেখা করা যায়।

গ্যালারির একপ্রান্ত থেকে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে সরাসরি তার ওপরতলায়। সেখানকার বুরুজের ওপর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে ওঠবারও স্বাধীনতা আছে তাঁদের। উষ্ণ মণ্ডলের এই প্রচণ্ড রোদ্দুরের জন্যে ভরদুপুরে সেখানে গিয়ে পায়চারি করার ইচ্ছে অবশ্য কারুই ছিলো না, কিন্তু সন্ধেবেলায় রোদ্দুর প'ড়ে গেলে সেখানে গিয়ে খোলা হাওয়ায় কাটাতে বেশ-ভালোই লাগে তাঁদের—সন্ধের পর যতক্ষণ-ইচ্ছে থাকা যায় সেখানে, তা নিয়ে কেউ কোনো মন্তব্য করে না।

এমন অবস্থায় দৈনন্দিন জীবনযাপন তেমন জ্বালায় না : স্বাধীনতা নেই, ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত—এরই মধ্যে, তবু, যতদূর-সম্ভব খুশি থেকেছেন তাঁরা। তাঁদের যাঁর-যাঁর কুঠুরি, গ্যালারি, আর এই অলিন্দ প্রায়-একটা *সত্যিকার স্বয়ংসম্পূর্ণ* অ্যাপার্টমেন্টের মতো, শুধু গ্যালারির ওপাশের দরজাটা সবসময়েই বন্ধ থাকে ব'লে বাস্তব খোঁচা লাগায় মনে, কারণ এই বন্ধ দরজার ওপাশেই আছে তাঁদের পাহারা, সশস্ত্র শান্ত্রীর দল। তাদের কথাবার্তার আওয়াজ তাদের অস্ত্রশস্ত্রের ধুমধাড়াক্কা ঝনঝন আওয়াজ বারে-বারেই তাঁদের মনে করিয়ে দেয় এ-দরজা পেরুনো চলবে না।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরকন্নার কাজের দায়িত্বে আছে ৎশুমুকি, আর তার ফুর্তি আর উৎসাহের কোনো কমতি নেই। তবু যখন খাবারদাবার নিয়ে আসে, শুধু তখনই তাকে চোখে দেখা যায়। কিংবা যখন সে তাদের ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে সাফ করে, বিছানার চাদর পালটায়, সবকিছু ঝাড়পোঁছ করে, তখনও। একদিক থেকে ভালোই : তাকে দেখলেই মেজাজটা কেমন বিগড়ে যায়। এই হতভাগাই, অন্তত আংশিকভাবে, তাঁদের এই দশার জন্যে দায়ী।

দিনের বেলায় একে-অন্যের সঙ্গে দেখা ক'রেই কাটে, কিংবা গ্যালারিটায় পায়চারি ক'রে। তারপর সূর্যাস্তের সময় তাঁরা উঠে আসেন অলিন্দে, প্ল্যাটফর্মে, যেখানে ৎশুমুকি মাঝে-মাঝে এমনকী তাঁদের রাতের খাবারও নিয়ে আসে।

চৌকো, প্রায় বর্গক্ষেত্রের মতোই বুরুজটা, যেখানটায় বেশ খানিকটা সময় তাঁরা আড্ডা দিয়ে কাটান। রাজভবনের পশ্চিম কোণটায় এই বুরুজের দুই পাশ চওড়া অলিন্দটাকে প্রায় যেন দখল ক'রেই নিয়েছে। ভেতরে বসানো কতগুলো চত্বর এটাকে ছোটো-ছোটো খোপের মতো নানা টুকরোয় ভাগ ক'রে রেখেছে। এগুলো পেরিয়েই তাঁদের যেতে হয়েছিলো মাঝখানটার ঐ মিনারটায় যাবার জন্যে—সেই যেখানে *সাইক্লোস্কোপ* আছে। এর দুই বাইরের মুখের মধ্যে একটা প্রায় এসপ্ল্যানেডের ওপর উঠেছে—এই এসপ্ল্যানেডের একপাশে রাজভবন, অন্যপাশে কারখানা, আর রাঙানদীর কাছে একটা মস্ত দেয়াল সেটাকে আরেকটা দিকে আটকে দিয়েছে—অন্য মুখটা এই রাঙানদীর দেয়ালটার দিকেই এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে আছে—নদীর ওপরে, উঁচুতে, প্রায় নব্বুই ফিট।

অতএব এখান থেকে পালাবার আশাটা তাঁদের আক্ষরিকভাবেই জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে। তাছাড়া *সাইক্লোস্কোপের* পাহারার নমুনাটা কেমন, সেটা তো হ্যারি কিলার সেদিন তাঁদের নিষ্ঠুরভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। বুরুজ থেকে অলিন্দে গিয়েও তাঁদের কোনো লাভ হ'তো না—যদি কৌশুলি, হর্ষচরিত এবং ব্ল্যাকগার্ডদের চোখে ধুলো দিয়ে সেখানে যাওয়াও যেতো ; অবশ্য সেটাও সম্ভব হ'তো না—কারণ এই তিনদল লোক অনবরত সেখান দিয়ে যাতায়াত করছে। আর এসপ্ল্যানেডের চারপাশেও তো দেয়াল—অনধিগম্য, পরাক্রান্ত, উচ্চশির—সেখান দিয়ে পালাবার চেষ্টা ক'রেও কোনো লাভ নেই। একমাত্র আশা জোগাতে পারে রাঙানদী, কিন্তু বন্দীদের কাছে কোনো ডিঙি নৌকো অব্দি নেই, আর নব্বুই ফিট উঁচু থেকে ঐ নদীতে তাঁরা নামবেনই বা কী ক'রে ?

প্ল্যাটফর্মটার ওপর থেকে তাকিয়ে দেখেছেন তাঁরা রাঙানদীকে। ভাঁটিতে, বা উজানে—দু-দিকেই নদীটা দিয়ে ঘন গাছপালার আড়ালে ঢাকা প'ড়ে গেছে—মাত্র দশ বছর আগেই নাকি রোয়া হয়েছে গাছগুলো, অথচ কেমন ফনফন ক'রে বেড়ে উঠেছে এর মধ্যেই ! শুধু জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত বাগানটা বাদে—রাজভবনের দেয়াল সেটাকে আড়াল ক'রে রেখেছে—গোটা ব্ল্যাকল্যাণ্ডই ছড়িয়ে আছে তাঁদের চোখের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে। এখান থেকে তিনটে অংশকেই দেখা যায়, উঁচু-উঁচু দেয়াল দিয়ে পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা করা; উপবৃত্তাকার সব রাস্তা, একই কেন্দ্রে গিয়ে শেষ হয়েছে; পশ্চিমের সব ঘরবাড়ি, পুবের সব ঘরবাড়ি—এ-দু-জায়গায় গোরাদের সংখ্যা খুবই কম, তাদের বেশি দেখা যায় কেন্দ্রে, পালে-পালে, ভোরবেলায়, বিশাল-এক জনতা—তারপর তারা যে-যার কাজে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

তাঁদের দৃষ্টি পৌঁছে যায় কারখানাতেও, কিন্তু দূর থেকে যতটুকু দেখা যায়, তা থেকে এই দ্বিতীয় শহরটা সম্বন্ধে কোনো আন্দাজই করা যায় না। একটা শহরের মধ্যে আরেকটা শহর—প্রথমটার মধ্যেই দ্বিতীয়টা—কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে যেন এদের কোনো যোগাযোগই নেই।

কী বানায় এই কারখানা, যার ওপরে বিশাল-উঁচুতে গেছে একটা চোঙ, যে-চোঙ থেকে একবারও কোনো ধোঁয়া ওঠে না, তারপর রাজভবনের মতোই একটা মিনার আছে কারখানারও, তারপর প্রায় আরো-একশো গজ উঁচুতে ঐ মিনার থেকেই উঠে গেছে একটা খুঁটি—প্রথমবার এখানে নেমেই এই দুর্বোধ খুঁটিটা চোখে পড়েছিলো আমেদে ফ্লরেঁসের। কী মানে হয় ঐ সব বিশাল-বিশাল অট্টালিকার, রাঙানদীর পাশেই যারা উঠে গেছে, যাদের অনেকগুলো চাপড়া-চাপড়া ঘাস দিয়ে ঢাকা। সবচেয়ে-বড়ো যেটা তার মধ্যে মাছে হাটবাজার আর ফলবাগান—কিন্তু অন্যগুলো কেন আছে? আর ঐ ওপরে ওটার ওপর ধাতুর পাত আটকানো কেন? আর কেনই বা তার নিচে, ঐ চওড়া আর গভীর ট্রেনচ? আর, বাস্তবিকই, ঐ দেয়ালটাই বা কেন—কারণ এর একদিক যায়নি রাঙানদীর দিকে, অন্যদিকটা যায়নি এসপ্ল্যানেডের দিকে—যার পর শুরু হয়েছে উন্মুক্ত জমির বিস্তার? কেউ নিশ্চয়ই এই ছোট্ট শহরটার নিজের প্রতিরোধব্যবস্থাকে জোরালো করতে চেয়েছিলো, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সব যোগাযোগ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিতে চেয়েছিলো। পুরো জিনিশটাই ভারি দুর্বোধ্য, কেমন-যেন প্রহেলিকাই একটা।

ৎশুমুকিকে জিগেস ক'রে ঐ দ্বিতীয় শহরটার কোনো নাম জানা যায়নি—সে তার কোনো নাম নাকি শোনেনি। 'কাজের বাড়ি,' শুধু এই কথাটাই সে বলেছে, কেমন ভয়ে-ভয়ে, যেন এর সঙ্গে কোনো আতঙ্ক আর কুসংস্কার জড়িয়ে আছে। তাছাড়া, হ্যারি কিলারের শেষতম রংরুট হিশেবে, সে কিছুই খুব-একটা বোঝে না, আর কেন যে ঐ আতঙ্ক তার, তাও সে স্পষ্ট ক'রে গুছিয়ে বলতে পারেনি : হয়তো আতঙ্কই এই শহর সম্বন্ধে সকলকে এমন গুটিয়ে রেখেছে। নিশ্চয়ই রাজভবনের মুখোমুখি যে-দেয়ালটা উঠে গেছে, তার আড়ালে অন্য-কোনো শক্তি লুকিয়ে আছে। কিন্তু কী তার প্রকৃতি, এই শক্তির? কোনোদিন কি তাঁরা এই দুর্বোধ্য ধাঁধাটার মীমাংসা করতে পারবেন? আর, তারপর, সেই শক্তিকে লাগিয়ে দিতে পারবেন নিজেদেরই কাজে?

জেন ব্রেজনের স্বাধীনতা সকলের চাইতে বেশি। হ্যারি কিলারের হুকুমে, ৎশুমুকি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে জানিয়েছে যে সে ইচ্ছেমতো যেখানে খুশি যেতে পারবে, কেউ তাকে বাধা দেবে না, আর তার নিরাপত্তারও কোনো ভয় নেই—না রাজভবনে, না-বা এসপ্ল্যানেডে। তাকে শুধু মানা ক'রে দেয়া হয়েছে রাঙানদী পেরিয়ে সে যেন কোথাও না-যায়, আর তা সে যেতোও না কখনও, কারণ কাস্‌ল ব্রিজের ওপর চব্বিশ ঘণ্টাই থাকে মেরিফেলোদের কড়া পাহারা।

বলাই বাহুল্য, জেন অবশ্য কিছুতেই এই বাড়তি স্বাধীনতার সুবিধেটুকু নেয়নি। যা ঘটে ঘটুক, সে তার দুঃসময়ের সাথীদের সঙ্গেই থাকবে সবসময়। সেও তাদেরই মতো, আরো-একজন বন্দিনী, এটা অবশ্য ৎশুমুকিকে প্রচণ্ড অবাক ক'রে দিয়েছে। তার ভূতপূর্ব মালকিনের চোখের সামনে সে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছে কতটা শানদার তার এই সৌভাগ্য।

'আপনি কয়েদখানায় থাকবার উপযুক্ত নন,' ভাঙা-ভাঙা কথায় সে জানিয়েছে জেন ব্লেজনকে। 'আপনি যখন সর্বেসর্বাকে বিয়ে করবেন, দারুণ হবে। তিনি আপনাকে কত *তুবাব* দেবেন।'

কিন্তু জেন ব্লেজন ৎশুমুকির কোনো কথা কানেই নেয়নি।

যখন গ্যালারিতে বা বুরুজে পরস্পরের সঙ্গে আড্ডা দেন না, তখন বন্দীরা যে যাঁর রুচিমতোই সময় কাটান।

বারজাকের একটু আত্মম্ভরিতাই দেখা গিয়েছে : ভাবখানা, কেমন কড়কে দিয়েছি হ্যারি কিলারকে। তাতে সবাই তাঁকে যেভাবে তারিফ করেছেন, তাতে দেমাকে তিনি বেশ ফুলেই উঠেছেন : মনে-মনে ঠিক করেছেন, আরো-প্রশংসা পেতে হবে তাঁকে, তাই ফলাফল যা-হয় হোক, তিনি হ্যারি কিলারের কাছে ককখনো মাথা নোয়াবেন না। সমস্ত অনুভূতিই তাঁর ভেতর থেকে বাগাড়ম্বর ও জমকালো বক্তৃতা হিশেবে বেরিয়ে আসে। আর সেই থেকে তিনি মহড়া দিয়ে চলেছেন, কেমন ক'রে এই স্বৈরাচারীকে প্রথম সুযোগেই তিনি দু-চারটে মনের কথা শুনিয়ে দেবেন। কেবলই পালিশ করেছেন তিনি তাঁর শানদার বুলি, অনবরত পরিমার্জনায় চমৎকার জেল্লা খুলেছে তাদের : আরেকবার আসুক না সে, তার অসাধু প্রস্তাব নিয়ে, তারপর তিনি দেখিয়ে দেবেন কাকে বলে ভাষার কেরামতি।

সাঁৎ-বের্যাঁ সেরে উঠতেই ডাক্তার শাতোনের চাকরি গেছে : দেখাশুনো করবার মতো আর-কোনো রুগিই তাঁর নেই। আর সাঁৎ-বের্যাঁও মহাফাঁপরে পড়েছেন—তাঁর মাছ ধরার নেশার কী হবে, এখানে? দুজনেই তাই তাঁদের বেশির ভাগ সময় কাটান জেন ব্লেজনের সঙ্গে আর তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন। গ্লেনর কাসলের *বন্দী, নিঃসঙ্গ* বাবার কথা মনে পড়লেই জেন ব্লেজন ভারি ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে, যদিও তার মনে হয়



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন সে ফিরে যেতে পারলে তার বাবার ঐ সান্ত্বনাহীন হতাশা অনেকটাই ঘোচাতে পারবে। কেমন ক'রে সে গিয়ে বাবাকে জানাবে যে জর্জ ব্লেজন নির্দোষ ছিলো—সে তার স্বদেশের সঙ্গে বেইমানি করেনি। অকাট্য কোনো প্রমাণ অবশ্য এখনও হাতে পায়নি, তবে যতটুকু প্রমাণ পাওয়া গেছে, পেছন থেকে ছুরি খেয়ে মরার ঐ ঘটনাই প্রমাণ ক'রে দেবে, সম্ভবত সে কোনো দোষ করেনি।

আমেদে ফ্লরেঁস তাঁর সময়ের অনেকটাই কাটান তাঁর নোটবইয়ের লেখাগুলো ঘষামাজা ক'রে। একদিনও বাদ যায় না যেদিন তিনি তাঁর পেশাদার দায়িত্বটা পালন করেন না। যদি কোনোদিন আবার তিনি ইওরোপের মাটিতে পা দিতে পারেন, তাহ'লে ভেতরকার সব খুঁটিনাটি সমেতই বারজাক মিশনের কথা সবাই জেনে যাবে।

আর মঁসিয় পঁসাঁ—তিনি কিছু বলেনও না, করেনও না—শুধু তাঁর ঐ মোটাখাতায় মাঝে-মাঝে কী-সব যেন টুকে রাখেন, সব নাকি পরিসংখ্যান—আর অবসর কাটান অদ্ভুত সব ত্রৈরাশিকের অঙ্ক ক'ষে—একেকটা এমন-সব জটিল ত্রৈরাশিক যে অদীক্ষিতের কাছে তা মনে হ'তে পারতো চৈনিক হেঁয়ালির মতোই দুর্বোধ্য।

কিন্তু একসঙ্গে যখন আড্ডা দেন বন্দীরা, তখন তাঁদের আলোচনার বিষয় ঘুরে ফিরে একটাই বুড়ি ছুঁয়ে যায়। নিজেদের অবস্থা নিয়ে মাথা তো ঘামানই, কিন্তু হ্যারি কিলার সম্বন্ধে তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা থেকে তাঁরা একফোঁটাও নড়তে পারেন না : প্রথম দর্শনেই হ্যারি কিলার তাঁদের ওপর যে-ছাপ ফেলেছিলো, সময় তা মোটেই হ্রাস করতে পারেনি।

'আচ্ছা, লোকটা কে হ'তে পারে?' জিগেস করেছেন মঁসিয় বারজাক।

'ইংরেজ,' জেন ব্লেজন বলেছে, 'ওর উচ্চারণ শুনেই বোঝা যায় ও ইংরেজ।'

'ইংরেজ বটে, না-হয় মেনেই নিলুম,' মঁসিয় বারজাক বলেছেন, 'কিন্তু তাতেই খুব-কিছু জানা হয় না। এটা ঠিক যে, এ কোনো সাধারণ লোক নয়। একটা শহর গড়েছে সে নিজের হাতে, মরুভূমিটাকে রূপান্তরিত ক'রে দিয়েছে উর্বর জমিতে, শতাব্দীর পর শতাব্দী যেখানে কোনো জল ছিলো না সেখানে সে জল এনে দিয়েছে—আর সব কি না মাত্রই দশ বছরের মধ্যে! তাতেই বোঝা যায় কোনো-এক দুর্দান্ত প্রতিভা তার বিশাল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবুদ্ধিকে কাজে খাটাচ্ছে। এটা কি সম্ভব যে এই স্বৈরাচারের এমন আশ্চর্য প্রতিভা আছে?'

'আমার কাছে ব্যাপারটা আরো জটপাকানো মনে হয়,' আমেদে ফ্লরেস বলেছেন, 'আমার মনে হয় হ্যারি কিলার বদ্ধপাগল।'

'বদ্ধপাগল নয়, অর্ধোন্মাদ,' তাঁকে শুধরে দিয়েছেন ডাক্তার শাতোনে, 'তবে সে একজন অর্ধোন্মাদ মোদোমাতাল—আর সেটাই ব্যাপারটাকে ভয়াবহ ক'রে তুলেছে।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এই দুই *সদ্‌গুণ* একসঙ্গে আছে ব'লেই,' আমেদে ফ্লরেঁস বলেছেন, 'ইনি একেবারে ধ্রুপদী জাতের স্বৈরাচারী—প্রবৃত্তির দাস, ভাগ্য যাকে অসীম ক্ষমতা দিয়েছে, কিন্তু যে তার অপচয় করছে বখাটে, ডেঁপো ছোঁড়ার মতো। একটুও বিরোধিতা সহ্য করতে পারে না ব'লেই কোনোকিছু মাঝামাঝি নেই তার কাছে—দপ ক'রে জ্ব'লে ওঠে, দপ ক'রে নিভে যায়, আর মানুষের প্রাণ সম্বন্ধে তার অপরিসীম তাচ্ছিল্য—সে-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা তার নেই!'

'আফ্রিকায় এমনতর জীবের কোনো অভাব নেই,' ডাক্তার শাতোনে একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন, 'আফ্রিকায় যারা আসে, তারা এইজন্যেই আসে যে ইওরোপে তারা বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি, তাছাড়া নিগ্রোদের তো তারা মানুষ ব'লেই মনে করে না। ফলে, তাদের মতে, তাদের সারাক্ষণ নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যেই থাকতে হয় —আর তাতে নিজের দম্ভও বেড়ে যায়, যা-খুশি তা-ই হুকুম করা যায় এদের, আর ইওরোপের লোকেরা দু-হাতে পয়সা কামায়, লাটসাহেবি করে; চরিত্রের দৃঢ়তাও নেই এদের, কোনো আদর্শেরও বালাই নেই—ফলে নিজেদের একেকজন কেউকেটা ভাবতে শুরু ক'রে দেয় এরা। উপনিবেশগুলোর একটা মস্ত ব্যাধিই হ'লো স্বৈরাচার—যেহেতু কৈফিয়ৎ চাইবার কেউ নেই। হ্যারি কিলার শুধু এদেরই মধ্যে একটু বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছে—অন্য গোরাদেরও সে এতটা নিকৃষ্ট ভাবে যে কাউকে কোনো পরোয়াই করে না।'

'আমি কিন্তু আবারও বলছি, লোকটা ডাহাউন্মাদ,' আমেদে ফ্লরেঁস আলোচনায় ইতি টেনে দিয়েছেন, 'আর উন্মাদকে কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস আমাদের কথা সে বেমালুম ভুলেই গিয়েছে—অথচ পাঁচমিনিট পরেই সে যে আমাদের সব্বাইকে খুন ক'রে ফেলবার হুকুম দিতে পারে, এ-সম্ভাবনাটাও আমি উড়িয়ে দিতে পারি না।'

৩রা এপ্রিল অব্দি অবশ্য নতুন-কিছুই ঘটেনি, এবং আমেদে ফ্লরেঁসের আশাবিহীন অনুমানটাও ফ'লে যায়নি। ৩রা এপ্রিল কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের দুটি ঘটনা ঘটেছে। বেলা তিনটে নাগাদ বন্দীরা মলিককে এসে হাজির হ'তে দেখে যেমন অবাক হয়েছেন, তেমনি খুশিও হয়ে উঠেছেন। জেন ব্লেজনকে দেখেই সে ছুটে এসে তার মালকিনের হাত চেপে ধ'রে কৃতজ্ঞতার বশে চুমু খেয়েছে—জেন ব্লেজনও তাকে দেখে খুবই নাড়া খেয়ে গেছে।

জানা গেছে, অন্য বন্দীদের মতো হেলিবিমানে ক'রে আনার বদলে, এই আফ্রিকি বালিকা এসেছে, আরো চোদ্দজন লোক ও রক্ষিদলের সেই দুই গোরা সার্জেন্টের সঙ্গে, মরুভূমি পেরিয়ে, পথে থেমে বিশ্রাম করতে-করতে। তার সঙ্গে বিশেষ ভালো ব্যবহারও করেনি কেউ—কিন্তু দুর্ব্যবহারের ধরনটা নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্নই করেননি। এই প্রশ্নও



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেননি, তোঙ্গানের কোনো খবর সে রাখে কি না। তার দুঃখ থেকে মনে হয়েছে তোঙ্গানের ভাগ্যে কী হয়েছে তা বোধহয় সে কিছুই জানে না।

মলিক আসার দু-ঘণ্টা পরে ঘটেছে দ্বিতীয় ঘটনাটা—সম্পূর্ণ অন্যরকম। তখন আন্দাজ পাঁচটা হবে, ৎশুমুকি ছুটে এসেছে গ্যালারিতে। ভীষণ উত্তেজিতভাবে হাঁফাতে-হাঁফাতে সে বলেছে হ্যারি কিলার তাকে হুকুম করেছে মাদ্‌মোয়াজেল মোরনাসকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে—প্রভু তাকে এখনই হবু-পত্নী ব'লে গণ্য করতে শুরু করেছে।

বন্দীরা সবাই একবাক্যে প্রস্তাবটা উপেক্ষা করেছেন—উপেক্ষাই শুধু নয়, উড়িয়েই দিয়েছেন প্রায়। ৎশুমুকি বহুবার অনুনয় করেছে, কিন্তু কোনো ফল হয়নি, শেষটায় বাধ্য হ'য়ে তাকে ফিরে যেতে হয়েছে। সে চ'লে যাবার পর তাঁরা হ্যারি কিলারের এই অদ্ভুত আমন্ত্রণ নিয়ে উত্তেজিতভাবে নানান আলোচনা করেছেন। এই একটা বিষয়ে আর-কোনো দ্বিমতই নেই—তাঁদের সঙ্গিনীকে কোনো অছিলাতেই তাঁদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে দেয়া চলবে না।

'আপনাদের সবাইকে আমার ধন্যবাদ জানাই,' জেন ব্লেজন তাঁদের বলেছে, 'যেভাবে আমাকে আপনারা চারপাশ থেকে ঘিরে ধ'রে বাঁচিয়েছেন তার জন্যে আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নেই। তবে এটা ভাববেন না যে জানোয়ারটার সঙ্গে একা দেখা হ'লে আমি আত্মরক্ষা করতে পারবো না—সে তো আর অমর অজর অভেদ্য নয়। এরা যদিও আপনাদের খুব-সাবধানে খানাতল্লাশ করেছে, কিন্তু মেয়ে ব'লে আমাকে খানাতল্লাশ করবার কথা ভাবেনি—এবং এই অস্ত্রটা আমার কাছে আছে এখনও।' ব'লে, জেন তাদের দেখিয়েছে সেই খঞ্জরটা, যেটা সে তার দাদার কবরে পেয়েছিলো, এবং এখন যেটা সে তার জামাকাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। আরো বলেছে, 'এটা ঠিক জানবেন, দরকার হ'লে এটা কেমন ক'রে ব্যবহার করতে হয়, তা আমি জানি।'

সবে জেন ফের খঞ্জরটা তার জামাকাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে, অমনি আবার ৎশুমুকি এসে হাজির, ভয়ে সে ঠকঠক ক'রে কাঁপছে। মাদ্‌মোয়াজেল মোরনাসের উত্তর শুনে হ্যারি কিলার নাকি রোষে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছে, এক্ষুনি তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবার জন্যে হুকুম দিয়েছে। সে যদি ফের এই প্রস্তাব উপেক্ষা করে, তাহ'লে নাকি ছ-জন বন্দীকেই এক্ষুনি ফাঁসিতে লটকে দেয়া হবে।

এখন আর দ্বিধার কোনো সময় নেই, তার সঙ্গীদের সে অযথা এই বিপদের মধ্যে এনে ফেলেছে ব'লে তাঁদের সব আপত্তি সত্ত্বেও যেতে রাজি হয়েছে। তাঁরা এমনকী জোর ক'রেই তাকে আটকে রাখবার চেষ্টা করেছেন। অমনি ৎশুমুকি চীৎকার ক'রে কী বলেছে, আর তৎক্ষণাৎ জনা-বারো শান্ত্রী ঘরে ঢুকে তাঁদের পিঠমোড়া ক'রে আটকে রেখেছে—আর সেই ফাঁকে জেন ব্লেজন ৎশুমুকির সঙ্গে চ'লে গিয়েছে।

সে-রাতে সে আটটার আগে ফেরেনি। তিনঘণ্টার এই অদর্শনে সবাই কেমন মুষড়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়েছিলেন, সাঁৎ-বেরাঁ তো কাঁদতেই শুরু ক'রে দিয়েছিলেন—তাঁরই কষ্টটা স্বভাবতই সবচেয়ে-বেশি ছিলো। তাকে ফিরতে দেখেই সবাই একসঙ্গে ব'লে উঠেছেন: 'তো?'

'তো, সব চুকে গেছে আপাতত,' জেন ব্লেজন তখনও থরথর ক'রে কাঁপছিলো।

'আপনাকে ওভাবে হঠাৎ ডেকে পাঠিয়েছিলো কেন?'

'এমনি। তার খেয়াল। আমাকে নাকি একবার চোখের দেখা দেখতে চেয়েছিলো। গিয়ে দেখি সে ততক্ষণে ঢকঢক ক'রে মদ গিলতে শুরু করেছে—সেটাই নাকি তার দস্তুর, ততক্ষণে প্রায় আদ্ধেক মাতাল সে। আমাকে সে বসতে বললে, আর তার নিজস্ব ধরনে আমার তারিফ ক'রে বললে, আমাকে নাকি তার ভারি মনে ধরেছে, আমার মতো বউই সে চেয়েছে চিরকাল। তারপর শুরু ক'রেছে তার ক্ষমতার গুণকীর্তন, আর কত ধনদৌলৎ তার আছে তা নিয়েও জাঁক দেখাতে সে ভোলেনি। তাকে বিয়ে করলে এ-সবই নাকি আমার হবে।

'আমি চুপচাপ তার সব হাম্বড়া বাকতাল্লা শুনে নিয়েছি, তারপর বলেছি সে তো আমাদের একমাস সময় দিয়েছে সব দিক বিবেচনা ক'রে দেখতে, সে-একমাস তো এখনও উৎরোয়নি, সবে তো একটা সপ্তাহই মাত্র কেটেছে। শুনে আশ্চর্য লাগতে পারে বটে, সে কিন্তু তাতে মোটেই চ'টে যায়নি, আমার বরং মনে হয় এই পাগলটার ওপর আমার হয়তো বেশ প্রভাব আছে। সঙ্গে-সঙ্গে সে রাজি হ'য়ে গিয়ে বলেছে, হ্যাঁ, আমাদের মনস্থির ক'রে নেবার জন্যে একমাস সময়ই দেবে, তবে একটা শর্তে: প্রত্যেকটা বিকেল আমায় গিয়ে তার সঙ্গে কাটাতে হবে...

'তাহ'লে তোকে আবার সেখানে যেতে হবে একা-একা?' কেমন ক্ষুব্ধ স্বরে ব'লে উঠেছেন সাঁৎ-বেরাঁ।

'হ্যাঁ, যেতে হবে, আর সেটা খুব-জরুরি,' জেন ব্লেজন উত্তর দিয়েছে, 'তবে আমার মনে হয় না তাতে আমায় খুব-একটা ঝুঁকি নিতে হবে—যদি এই প্রথম বিকেলটা থেকে কিছু বোঝা যায়, সাতটার আগেই সে বেহেড মাতাল হ'য়ে গেছে, আর আমার কাজ হয়েছে স্রেফ তার পাইপটা ধরিয়ে দেয়া আর গেলাশটা ফাঁকা হ'লেই সেটা আবার ভ'রে দেয়া—যতক্ষণ-না জানোয়ারটা নাক ডাকাতে শুরু ক'রে দিয়েছে। আর তখনই আমি আপনাদের কাছে ফিরে এসেছি।'

তারপর থেকে, সত্যিই, রোজই তাকে যেতে হয়েছে হ্যারি কিলার সকাশে, রোজই বেলা তিনটে নাগাদ হ্যারি কিলারের এত্তেলা এসেছে আর তাকে গিয়ে রাত আটটা অব্দি তার সঙ্গে থাকতে হয়েছে। রোজ তার বুলেটিন অনুযায়ী, চুক্তিটা বেশ-শান্তিপূর্ণভাবেই বহাল আছে। রোজই বিকেলগুলো তাকে একইভাবে কাটাতে হয়। গিয়ে প্রথমে দেখতে পায় তার কৌশুলিদের সঙ্গে সে আলোচনাসভায় ব'সে আছে, আর তাদের যে-সব হুকুম-



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুকুম দিয়েছে তাতে তার প্রখর বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় পাওয়া গেছে। তার সে-সব নির্দেশে নতুন-কোনো বৈশিষ্ট্যই থাকে না—সে-সব শুধু শহরের শাসনকাজ সম্বন্ধে—আর খেতে-খামারে যা কাজ হচ্ছে তার একটা খতিয়ান নেয়াও সেই পরামর্শসভার কাজ। বাস্তবিক, ব্ল্যাকল্যাণ্ড সরকারের শাসনকাজের সঙ্গে কোনো রহস্যই জড়ানো থাকতো না, যদি-না মাঝে-মাঝে সে ঝুঁকে প'ড়ে তার কোনো কৌশুলির কানে-কানে ফিশফিশ ক'রে নানারকম নির্দেশ দিতো, হয়তো একান্ত-গোপনীয় কোনো খবর—জেন যার সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেনি।

পরামর্শসভা সবসময় কাঁটায়-কাঁটায় চার ঘণ্টা ধ'রে চলতো। তারপর সবাই একে-একে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতো, ঘরে থাকতো শুধু জেন ব্রেজন আর হ্যারি কিলার। কিন্তু সেও শিগগিরই কিছুক্ষণের জন্যে উধাও হ'য়ে যেতো। হররোজ, প্রতিটি দিন, ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে-চারটের সময় একটা ছোটো দরজা দিয়ে সে যেন কোথায় চ'লে যেতো, এই দরজাটার চাবি সে ককখনো কাছছাড়া করতো না। কোথায় যে যেতো, সে-সম্বন্ধে জেন বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানে না।

প্রথম তিনদিন জেন অপেক্ষা করেছিলো কখন সে ফিরে আসে—আর সে ঐ দরজা দিয়ে উধাও হ'য়ে যাবার কয়েক মুহূর্ত পরেই তার কানে এসে পৌঁছুতো অদ্ভুত-সব শব্দ, যেন কাউকে নির্যাতন করা হচ্ছে কোথাও, আর সে থেকে-থেকে কেবলই যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠছে। এ-রকম অন্তত পনেরো মিনিট ধ'রে চলতো, তারপর, আধঘণ্টাটাক কেটে যাবার পর ঐ ছোটো দরজাটা দিয়ে আবার এসে ঘরে ঢুকে পড়তো হ্যারি কিলার—হৃষ্ট ও প্রফুল্ল। জেন তখন ধরিয়ে দিতো তার পাইপ, ভ'রে দিতো তার গেলাশ, আর সে ঢকঢক ক'রে মদ গিলে ক্রমেই বেহুঁশ হ'য়ে পড়তো।

শুধু প্রথম তিনদিনই জেন ওভাবে তার ফিরে-আসার অপেক্ষা করেছিলো, কিন্তু ক্রমেই দূরের ঐ-সব আর্তনাদ এমন অসহ্য হ'য়ে উঠতো যে তার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করতো—কিছুতেই সে যে নিদারুণ নিপীড়নের কষ্ট লাঘব ক'রে দিতে পারছে না, এই বোধটা তাকে কুরে-কুরে খেতো। ফলে সে এটাই একটা রীতি বানিয়ে নিয়েছিলো যে আধঘণ্টার ঐ অনুপস্থিতির সময়টা ও-ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে রাজভবনে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াবে। দু-একদিনের মধ্যেই, সব কর্মচারী, কৌশুলিরা, কালো দাসদাসীরা, আর কর্তব্যরত মেরিফেলোরা (*হর্ষচরিতেরা*) তাকে চিনে ফেলে তাকে বেশ সমীহই করতে শুরু ক'রে দিয়েছিলো।

প্রত্যেক সন্ধেতেই এমন-একটা সময় আসতো যখন পাঁড়মাতাল হ্যারি কিলারের জীবন নির্ভর করতো জেন ব্রেজনেরই দয়ার ওপর। তার দুর্ভাগা দাদার কাছ থেকে একমাত্র যে-উত্তরাধিকারটা সে পেয়েছে, সেই খঞ্জরের এক আঘাতেই জেন হ্যারি কিলারকে সহজেই খুন ক'রে ফেলতে পারতো। কিন্তু সে তা করেনি। কোনো লোক,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যার আত্মরক্ষা করার কোনো সামর্থ্য নেই, সে যতই দুঃসহ হোক না কেন, তাকে মেরে ফেলার কথা সে ভাবতেই পারে না। আর, তাছাড়া, কী-ই বা লাভ হ'তো তাকে ওভাবে খতম ক'রে? হ্যারি কিলার মারা গেলেও ঐ দস্যুদল তো থেকেই যাবে, যারা গালভরা একটা নাম দিয়েছে নিজেদের—কৌশুলি! তাছাড়া তো আছেই বিকট ঐ ব্ল্যাকগার্ডেরা, আর উৎকট ঐ মেরিফেলোরা—আর আরো যে কত চোর বাঁটপাড় খুনে গুণ্ডা!

তাতে বন্দীদের দশার কোনো উন্নতি তো হ'তোই না, বরং হ্যারি কিলারের মৃত্যুতে আরো অবনতি হ'তো। গোটা শহরের মধ্যে এই হ্যারি কিলারই হয়তো একমাত্র লোক, দুর্লভ-সব মুহূর্তে, যার মধ্যে দেখা যেতো ক্ষুরধার বুদ্ধির ঝিলিক—যে হয়তো সব দিক বিবেচনা ক'রে একদিন দয়ার মাহাত্ম্যও বুঝতে পারতো। জেন ব্লেজনের সঙ্গীরাও এ-বিষয়টায় সম্পূর্ণ একমত : না, অযথা হ্যারি কিলারকে এখন খুন ক'রে কোনো লাভই নেই।

তবে আরো-ভালো একটা ছক হয়তো কষা যেতে পারে। স্বৈরাচারের বিশ্বাস যেহেতু তার ওপর বর্তেছে, তখন খোদ হ্যারি কিলারকেই কি কোথাও ফাঁদে ফেলে বন্দী ক'রে রাখা যেতে পারে। তাহ'লে বাস্তবিক এমন-একজনকে জামানত পেয়ে যাবেন তাঁরা, যাতে এদের সঙ্গে সমানে-সমানে যুঝতে পারবেন।

অবশ্য এ-ছকটাকে কাজে খাটাতে যাবার বিষম মুশকিল আছে কতগুলো। হ্যারি কিলারকে তাঁরা আটক করবেন কী ক'রে, যখন তাঁরা নিজেরাই বন্দী। রাজভবনে সবসময়েই রক্ষী আর পাহারার ভিড়—তাছাড়া তাঁদের ওপরও একদল শান্ত্রী সারাক্ষণ নজর রেখে যাচ্ছে। আর যদি-বা এই মুশকিলটা কোনোরকমে কাটিয়ে ওঠা যায়, তাহ'লেও যে তাঁদের কোনো লাভ হবে তারই বা ঠিক কী। ব্ল্যাকল্যাণ্ডের লোকেরা যদি এই একনায়কের অপসারণে খুশি হ'য়ে উঠে তার হাত থেকে মুক্তির জন্যে তাঁদের সঙ্গে কোনো রফা করতে রাজি না-হয়? আর যদি-বা তা না-হয়, যদি আপোষেই সব মীমাংসা ক'রে নেবার একটা কথা পাকা হয়, তাঁরা কী ক'রে জানবেন যে এই নরাধমগুলো সে-কথা রাখবে? এ-রকম কোনো জটিল সমস্যার সমাধান করা অত-সহজ কাজ নয়।

এ-ছকটা ছাড়াও, জেন ব্লেজন মনে-মনে আরো-একটা পরিকল্পনা ভেঁজে রেখেছিলো—আর সেটা সে একদিন খুলেও বলেছে তার সঙ্গীদের। হ্যারি কিলারের ঐ নিয়মিত অনুপস্থিতি তার কৌতূহল আর দয়া—দুইকেই উশকে দিয়েছে। রোজ সন্ধেয় ও-কার আর্তনাদ ভেসে আসে বন্ধ দরজাটার ও-পাশ থেকে? হ্যারি কিলার যখন বেহেড মাতাল হ'য়ে বেহুঁশ প'ড়ে থাকে, তখন অনেকবারই তার মনে হয়েছে চাবিটা নিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে ওপাশে গিয়ে দ্যাখে, কে আছে। এতদিন অবশ্য সে কিছুতেই সাহস জোটাতে পারেনি, শেষমুহূর্তে ভয় পেয়ে পেছিয়ে এসেছে। সে কোনোক্রমে চেপে রেখেছে কৌতূহলটা।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইভাবে এক-এক ক'রে পাঁচ দিন কেটে গেছে। অবশেষে এসেছে ৮ই এপ্রিল। ...সেদিন রাত নটার একটু বাদে, বন্দীরা সবাই, এমনকী মলিক শুদ্ধু, বুরুজের ওপরকার সেই প্ল্যাটফর্মটার ওপর জেন ব্লেজনকে সেদিনকার খবরের বুলেটিনটা জানবার জন্যে প্রশ্ন করেছেন—এবং জেনও জানিয়েছে, এ-দিনটাও অন্যান্য দিনের মতোই একইভাবে কেটেছে। নিচে প্ল্যাটফর্মের তলায় দাঁড়িয়ে আছে ৎশুমুকি, তার হাতের কাজকর্ম সেরে ফেলছে, তারপর সে রাতের মতো বিদায় নেবে।

শুক্লপক্ষেরই গোড়ার দিক হবে, কিন্তু আকাশে ঝুলে আছে রাশি-রাশি বাদলমেঘ, একটু পরেই বোধহয় ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি পড়বে, রাতটা কী-রকম ঘুটঘুটে আঁধারে যেন দমবন্ধ ক'রে আছে, বৃষ্টি পড়ার আগে যেমন হয়। প্ল্যাটফর্মের ওপর ভ'রে আছে নিবিড় ছায়ায়—তার ওপর রাঙানদীর ওপারের মিটমিটে আলো এসে পৌঁছোয় না।

হঠাৎ কী যেন ওপর থেকে পড়েছে শানের ওপর, ঝুপ ক'রে একটা ভোঁতা ও ভারি আওয়াজ হয়েছে। বন্দীরা এতটাই আঁৎকে উঠেছেন যে আপনা থেকেই তাঁদের সব কথাবার্তা বন্ধ হ'য়ে গেছে। কোত্থেকে এলো শব্দটা? কীই বা পড়লো অমন ক'রে? কিছুই তাঁরা অন্ধকারে ঠাহর করতে পারছিলেন না।

প্রথমে সংবিৎ ফিরে পেয়েছেন আমেদে ফ্লরেঁসই। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন রহস্যময় জিনিশটাকে, যেটা ওভাবে এসে পড়েছে। মস্ত-একটা নুড়ি, একটা মোটাসুতোর গায়ে বাঁধা, যার অন্যপ্রান্তটা রেলিঙের ওপর দিয়ে গিয়ে ওপাশে রাঙানদীতে পড়েছে।

কী মানে হ'তে পারে এই রহস্যময় ঢেলাটার? কোনো ফাঁদ নয়তো? না কি এই ব্ল্যাকল্যাণ্ডেও তাঁদের কোনো অজানা বন্ধু আছে, যে তাঁদের কোনো খবর পাঠাতে চায়? উত্তরটা জানতে হ'লে, শুধু ঐ মোটাসুতোটা ধ'রে টান দিতে হবে—তার অন্যপ্রান্তটায় কোনো খবর আটকানো থাকতেও পারে। আমেদে ফ্লরেঁস তক্ষুনি সুতোটা ধ'রে টান লাগিয়েছেন, কিন্তু ডাক্তার শাতোনেরও সাহায্য চাইতে হয়েছে তাঁকে। দড়ি তো নয়, সুতো, নিচে যে-ভার আছে, তা সুতোটাকে বরং আঙুলের ফাঁক দিয়ে নিচেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে। উঁহু, কোনো চিঠি হ'তেই পারে না, অন্যকিছু।

অবশেষে সুতোটার অন্যপ্রান্তের নাগাল পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে এবার একটা রশি বাঁধা। সুতোটাকেও যেমন ক'রে টেনে তুলেছেন, রশিটাকেও তাঁরা তেমনি ক'রেই টান লাগিয়েছেন। টেনে এনে দেখেছেন রশিটা লম্বায় অন্তত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ গজ তো হবেই; এ-যাবৎ দড়িটা টেনে তুলতে কোনো অসুবিধে হয়নি, এবার যেন একটু উলটো টানই পড়েছে, যেন দড়িটা কোনো-কিছুর সঙ্গে বাঁধা—না কি অন্যদিক থেকেও অন্যকেউ টান দিচ্ছে? একটু হকচকিয়েই গেছেন তাঁরা, কী করবেন গোড়ায় বুঝে উঠতে পারেননি।

'রশিটা বেঁধে রাখুন,' আমেদে ফ্লরেঁস পরামর্শ দিয়েছেন,—'যেইই এই রশিটা এখানে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠিয়ে থাকুক, শিগগিরই বুঝতে পারবো তার মৎলব কী।'

রশিটা বেঁধে নেবার পর যেই টান-টান হ'য়ে গেছে, অমনি আর-কেউ নিশ্চয়ই সেটা বেয়ে উঠেছে, আর বন্দীরা নিচের দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে তাকে দেখবার চেষ্টা করেছেন। পরক্ষণেই দেখতে পেয়েছেন, কে-এক মানুষ তরতর ক'রে দেয়াল বেয়ে উঠে আসছে।

অজানা আগন্তুক তারপরেই রেলিঙ ডিঙিয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে নেমেছে—আর স্তম্ভিত বন্দীদের মাঝখানে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

গলার স্বর সাবধানে নিচু রেখেই, তাঁরা একসঙ্গে অস্ফুট চেঁচিয়ে উঠেছেন : '*তোঙ্গানে!*'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

## পাঁচ

# নতুন বন্দীশালা

তাহ'লে তোঙ্গানে শুধু বেঁচেই নেই, পরে তার কথা থেকে জানা যাবে, কুবোর ঐ আচমকা হানার সময় তার গায়ে একটা আঁচড় অব্দি লাগেনি। হানাদারদের সন্ধানীআলোগুলো তার গায়ে পড়েনি; সে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চটপট গাছপালার আড়ালে মিলিয়ে যেতে পেরেছে; হানাদাররা অন্যদের নিয়ে এতটাই ব্যস্ত ছিলো যে তাকে নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি।

তবে তার মাথায় কিন্তু তার প্রভুদের ছেড়ে যাবার কথা একবারও স্থান পায়নি, তাছাড়া মলিকও তো তাঁদেরই সঙ্গে থেকে গেছে। সে এমনকী মনে-মনে ভেবেছিলো তাঁদের কাছে এসে তাঁদের সাহায্য করবে, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভেবে দেখেছে সে তাঁদের সবচেয়ে কাজে লাগতে পারবে যদি সে তার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখে।

পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবার বদলে, সে কিন্তু আগাগোড়া হানাদারদের অনুসরণ ক'রে এসেছে। মরুভূমি পেরুবার সময় তাকে যে কত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, তা সে কোনোদিনই ভাষায় ব'লে বোঝাতে পারবে না, সে-এক অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা, সে শুধু সারাক্ষণ ফেউয়ের মতো তাদেরই পেছনে লেপটে থেকেছে যারা মলিককে নিয়ে ব্ল্যাকল্যাণ্ড আসছিলো। তারা যেখানে-যেখানে থেমে খাওয়াদাওয়া করেছে পরে সেখানে এসেই তাদের পাতের ফেলে-দেয়া খাবার কুড়িয়ে-বাড়িয়েই নিজেকে কোনোরকমে টিকিয়ে রেখেছে সে। পায়দলে এসেছে বটে, তবু তাদের ঘোড়ার সঙ্গে সে তাল রেখেছে —দিনে অন্তত কুড়িমাইল পথ পেরিয়েছে সে ঐ ধূ-ধু তপ্ত বালির ওপর।

একেবারে ব্ল্যাকল্যাণ্ডের কাছে না-এসে সে কখনও তাদের নাগাল ছাড়েনি। যেই তারা চাষের জমির কাছে এসে পড়েছে, সে থমকে গিয়েছে, অপেক্ষা করেছে কখন রাত নামে—প্রকাশ্য দিবালোকে এই অজানা দেশে পা দেবার ঝুঁকি নেবার সাহস তার হয়নি। তারপর ভোরবেলার দিকে লুকিয়ে পড়েছে গাছপালার আড়ালে ঘন ঝোপের মধ্যে, তারপর সকালে যখন ব্ল্যাকল্যাণ্ডের *কালো গোলামরা* খেতে কাজ করতে এসেছে, সে মিশে গিয়েছে তাদের মধ্যে, সারাদিন তাদেরই সঙ্গে হাতে হাত লাগিয়ে সে কাজ করেছে, তাদেরই সঙ্গে পাহারার ছড়ির ঘা খেয়েছে—আর পাহারারা আর-কিছু পারুক না-পারুক দু-হাতে ছড়ি চালাতে ওস্তাদ, আর তার পর ঐ আফ্রিকিদের সঙ্গেই ফিরে এসেছে শহরের কেন্দ্রীয় অংশে, সন্ধেবেলায়, কেউ তার দিকে একবার দৃক্‌পাতও করেনি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন একটা পরিত্যক্ত ভাঙাচোরা কুঁড়েবাড়ির মধ্যে এই রশির বাণ্ডিলটা কুড়িয়ে পেয়েছে। তারই সাহায্যে সে তথাকথিত বেসরকারি নাগরিকদের পেছন-পেছন আসতে পেরেছে, শেষ অব্দি এসে পৌঁছেছে নদীর পাড়ে, যেখানে পুরো দুটো দিন সে লুকিয়ে থেকেছে একটা পয়ঃপ্রণালীর মুখে, তাকে-তাকে অপেক্ষা ক'রে থেকেছে কখন সুযোগ আসে।

আর তারই মধ্যে সে দেখেছে বন্দীরা সবাই রোজ সন্ধেয় বুরুজের ওপরে এই প্ল্যাটফর্মের ওপরে এসে ওঠেন, কতবার সে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাঁরা একবারও তার দিকে তাকাননি। যে-সুযোগটার সে অপেক্ষা করছিলো, সেটা ৮ই এপ্রিল অর্থাৎ তৃতীয় দিনের আগে আসেনি। সেদিন সন্ধে থেকেই আকাশে ঝুলেছিলো ভারি-ভারি বাদলমেঘ, আর অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিলো, তারই সুযোগ নিয়ে সে বেরিয়ে এসেছে ঐ নর্দমার মুখ থেকে, আর ওপরে এই রশিটা ছুঁড়ে দিয়েছে তার প্রভুদের কাছে, যার সাহায্যে শেষটায় এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে পেরেছে।

এত-সব কথা অবশ্য সে তখন বলেনি, এই বৃত্তান্তটা জানা গেছে অনেক পরে। আপাতত সে শুধু এই কথাই বলেছে যে সে যেভাবে রশিটা ধ'রে ঝুলতে-ঝুলতে এখানে এসে পৌঁছেছে, সেই একই উপায়ে তো তাঁরাও এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারেন। নিচে তাঁরা দেখতে পাবেন একটা নৌকো, অনেক কষ্টে এই ছোট্ট ডিঙিটা সে বাগাতে পেরেছে, তাঁদের শুধু রাঙানদী ধ'রে এই নৌকো বেয়ে কেটে পড়তে হবে।

বলাই বাহুল্য, কোনো আলোচনা না-ক'রেই তক্ষুনি এই ফন্দিটা কাজে খাটানো হয়েছে। চারজনে বৈঠা হাতে নিয়েছেন, তরতর ক'রে খরস্রোতও ব'য়ে যাচ্ছিলো, ঘণ্টায় অন্তত ছ-মাইল পথ তাঁরা চ'লে যেতে পারবেন। তাঁরা যদি এগারোটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে পারেন, তাহ'লে সকাল হবার আগেই একটানা নৌকো বেয়ে অন্তত পঁয়তাল্লিশ মাইল চ'লে যেতে পারবেন। তাতে তাঁরা যে *সাইক্লোস্কোপের* যান্ত্রিক নজরটাই এড়াতে পারবেন তা নয়, তাঁরা তীরের গাছপালাগুলোর ছায়ায়-ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে চাষের জমি ছাড়িয়ে মরুভূমিতে বসানো শেষ পাহারারও নজর এড়িয়ে যেতে পারবেন। পরে হেলিবিমানের নজর এড়াবার জন্যে নদীর কোনো-কোনো খাঁড়িতে লুকিয়ে কাটিয়ে দেবেন, আর রাতে ফের নৌকো বেয়ে চলতে পারবেন—যতক্ষণ-না গিয়ে নাইজারের জলে পড়েন। সায়ীর ঠিক উত্তরেই বিকিনি ব'লে একটা গ্রাম আছে, রাঙানদী নিশ্চয়ই সেখানে গিয়ে নাইজারের সঙ্গে মিশেছে। কেননা রাঙানদী প্রধানত পুরোনো, শুকিয়ে-যাওয়া উদ্যেদ তাফাসেৎ-এর খাত ধ'রেই এগিয়েছে। অর্থাৎ পুরোটাই সবশুদ্ধু ২৮০ মাইল জলপথ পাড়ি দেবার প্রশ্ন, তার মানে দাঁড়াবে চার বা পাঁচরাতের মামলা।

চট ক'রে দু-চার কথায় পরিকল্পনাটা ভেঙে বলবামাত্র তক্ষুনি সেটা কাজে খাটাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু প্রথমে, অবশ্য, ৎশুমুকির হাত থেকে ছাড়ান পেতে হবে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—সে প্রায়ই সন্ধেবেলায় গ্যালারি বা প্ল্যাটফর্মের আশপাশেই ঘুরঘুর করে। তার কখন মর্জি হবে, সে কখন বিদায় নেবে, তার জন্যে সবুর করার সময় নেই। যা করবার এক্ষুনি ক'রে ফেলতে হবে তাঁদের।

জেন ব্লেজন, অকস্মাৎ ধাড়ি মঁসিয় পঁসা আর তোঙ্গানেকে বুরুজটার ওপরে রেখে, অন্য বন্দীরা তখন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসেছেন। সিঁড়ির ওপরের পইঠা থেকে ৎশুমুকিকে নিচের তলায় দেখা গেছে; সে তার ঢিলেঢালা অলস ভঙ্গিতে দিনের কাজ শেষ করছে। তাঁদের দিকে একবারও তাকায়নি সে, কেননা হঠাৎ তাঁদের সন্দেহ করবার কোনো কারণই তার ছিলো না; আর তাই তাঁরা চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে ধরতে পেরেছেন—কিন্তু সে তাঁদের মৎলব ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি।

যেমন ঠিক ক'রে রাখা হয়েছিলো, সাঁৎ-বেব্যাঁ গিয়েই আক্রমণটা প্রথমে শুরু করেছেন; তাঁর পেশীবহুল হাত আচমকা তার গলা জড়িয়ে ধরেছে, অন্য হাতটা থাবার মতো পড়েছে তার মুখে এতই অতর্কিতে যে সে টুঁ শব্দটিও করবার সুযোগ পায়নি। অন্য তিনজনে তারপর চেপে ধরেছেন তাঁর হাত-পা, আষ্টেপৃষ্ঠে পিঠমোড়া ক'রে শক্ত ক'রে বেঁধে দিয়েছেন, মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন যাতে সে কোনো আওয়াজ করবারও সুযোগ না-পায়। তারপর তাকে ঐ কুঠুরিগুলোর একটায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, বাইরে থেকে দরজায় তালা আটকে চাবিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন রাঙানদীর জলে। এতে অন্তত তাঁদের পালাবার খবরটা যতটা সম্ভব বাড়তি কিছুক্ষণ চেপে রাখা যাবে।

এ-কাজটা সেরে প্ল্যাটফর্মে ফিরতে-না-ফিরতেই এতক্ষণ শাসাবার পর সারা আকাশ ফেটে পড়েছে, মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে, প্রায়-একটা খ্যাপা-ঝড়েরই তাণ্ডব, আর তাঁরা ভিজে-জবজবে হ'য়ে গেছেন। এই ঝড়তুফানও তাঁদের উপকারেই আসবে। কুড়ি গজ দূরেও নজর যায় না এখন, সব যেন এই অবিশ্রাম তরল পর্দায় ঢাকা, আর নদীর ওপারে মেরিফেলোদের আস্তানার আলো অত-দূর থেকে কাউকেই এই বৃষ্টির মধ্যে ফুটিয়ে তুলবে না।

তারপর এক-এক ক'রে নির্বিঘ্নেই ঐ রাশি ধ'রে-ধ'রে নিচে নেমে এসেছেন তাঁরা, সব-আগে গিয়ে নেমেছেন আমেদে ফ্লরেঁস আর সব-শেষে তোঙ্গানে, রশির নিচের দিকটা শক্ত ক'রে নৌকোর নোঙরের সঙ্গে বাঁধা, রশিটা টলোমলো করেছে বটে কিন্তু অসুবিধে হয়নি। জেন ব্লেজন শুদ্ধু সরসর ক'রে রশিটা ধ'রে নেমে এসেছে, যেন এ-কাজে সে কতই অভ্যস্ত।

প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে নেমে পড়বার আগে তোঙ্গানে রশিটা রেলিঙ থেকে খুলে নিয়েছিলো, তারপর রেলিঙের অন্যপাশ দিয়ে রশির প্রান্তটা ঝুলিয়ে দিয়েছিলো, দুইহাতে এই দু-পাল্লার দড়ি ধ'রে সে নেমেছে তারপর, নেমেই দড়ির একটা প্রান্ত ধ'রে টান দিতেই দড়িটা খুলে এসেছে—কীভাবে বন্দীরা পালিয়েছে তা বোঝবার কোনো উপায়ই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন নেই।

দশটার একটু বাদে নোঙর তোলা হয়েছে নৌকোর, আর প্রবল স্রোত তাকে ভাঁটির দিকে টেনে নিয়ে গেছে। পলাতকেরা গুঁড়ি মেরে নৌকোর পাটাতনের সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়েই লুকিয়েছিলেন ; যখন স্রোতের টানে নৌকো শহরের বাইরে চ'লে এসেছে, প্রায় ছশো গজ দূরে, তখনই তাঁরা উঠে ব'সে চেপে ধরেছেন দাঁড়, আর নৌকোর গতিও আরো অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছে। এতক্ষণ, বৃষ্টি যদিও একটা আবছায়া পর্দার আড়ালে তাঁদের ঢেকে রেখেছিলো, তবু তারা ভেবেছেন যতটা-সম্ভব গুঁড়ি মেরে থাকা যায় ততই ভালো—কোথায় যে তাঁরা চলেছেন, সেটা আপাতত না-দেখলেও চলবে।

কিছুক্ষণ পরে ঠিক যখন তাঁরা ভেবেছেন তাঁরা শহরের বাইরে চ'লে এসেছেন, তখন আচমকা নৌকো গিয়ে কিসের গায়ে যেন ধাক্কা খেয়ে আটকে গিয়েছে। হাৎড়ে-হাৎড়ে তারপর তাঁরা কারণটা আবিষ্কার ক'রেই হতাশায় ভ'রে গিয়েছেন : ওপর থেকে সারি-সারি লম্বা-লম্বা শিক নেমে এসেছে, ঠিক কোনো জানলার গরাদের মতো—তার ওপর দিকটা নিরেট ধাতুর পাতে মোড়া, আর শিকগুলো সোজা নেমে গিয়েছে নিচে, জলের তলায়। তাঁরা এ-পাশ থেকে ও-পাশ গেছেন—নদীর পুরো চওড়া প্রসারটাই, কিন্তু খামকাই —দুটো প্রান্তই দুই তীরে বাঁধা—এক তীরে বেসরকারি নাগরিকদের বসতি, আর মেরিফেলোদের আস্তানা—অন্য তীরটায় কারখানা ঘিরে গেছে সেই বৃত্তাকার রাস্তা।

আর ততক্ষণে মর্মান্তিক বাস্তবটা মাথায় ঢুকেছে তাঁদের : পালাবার কোনো রাস্তাই নেই তাঁদের সামনে!

হ্যারি কিলার ঠিকই বলেছিলো : তার হুঁশিয়ারি একেবারে নিখুঁতভাবে পলাতকদের সব পথই আটকে দিয়েছে। দিনের বেলায় শিকগুলো ওপরে তুলে দেয়া হয়, রাতের বেলায় শিকগুলো নামিয়ে দিয়ে রাঙানদী দিয়ে যাবার পথ আটকে দেয়া হয়।

এতটাই তাঁরা মুষড়ে পড়েছিলেন যে, কতক্ষণ মোহ্যমান বসেছিলেন তার কোনো হিশেব ছিলো না। এতটাই হাল ছেড়ে দিয়েছেন ঐ তুমুল বর্ষার প্রচণ্ড ঝাপটাও যেন আর গায়ে লাগছিলো না—অথচ বৃষ্টির ছাঁট যেন প্রায় মাংস ফুঁড়ে, হাড়ে-হাড়ে গিয়ে বিঁধছিলো। ফিরে-যাওয়া মানেই নিজের থুতু গেলা, এবার রাজভবনে তাঁদের হাতে-পায়ে বেড়ি পড়বে। না, সেটা কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু এছাড়া করবেনই বা কী তবে? শিক বেয়ে, ওপরে যদি-বা উঠতে পারেন ঐ নিরেট মসৃণ ধাতুর পাত বেয়ে উঠবেন কী ক'রে—ওপরে না-উঠে তো আর তা টপকানো যাবে না! নৌকোটাও টেনে-হিঁচড়ে ওপরে তুলে ও-পাশে নিয়ে যাওয়া যাবে না। আর ডাঙায়? বাম পাশে কারখানার জগৎ, আর ডানতীরে মেরিফেলোদের আস্তানা। সবদিক থেকেই রাস্তা বন্ধ।

'এখানে আশা করি আমাদের ঘুমুতে হবে না,' শেষটায় স্তব্ধতা ভেঙে বলেছেন আমেদে ফ্লরেঁস।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহ'লে এখন আপনি আমাদের কোথায় যেতে বলেন,' মঁসিয় বারজাক এখনও তাঁর হতাশার ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারেননি।

'কোথায়, তাতে কিছুই এসে যায় না—তবে মহামহিম পরমপ্রতাপাদিত্য হ্যারি কিলারের সকাশে ফিরে-যাওয়া চলবে না,' সাংবাদিকটি উত্তর দিয়েছেন। 'আমাদের যখন বাছাই ক'রে নেবার খুব-একটা সুযোগ নেই, তখন আমরা কেন নতুন-কোথাও গিয়ে ঘর ভাড়া করি না—এই যাকে ওরা কারখানা বলে। হয়তো তপ্ত তাওয়া থেকে আগুনে গিয়ে পড়বো—কিন্তু তবু তো তাতে একটা নতুনত্ব থাকবে!'

কিন্তু তাছাড়া আর করারই বা কী আছে? হয়তো, শহরের বাকি সব অংশের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এই অণুবিশ্বটায় কোনো সাহায্য মিলে গেলেও যেতে পারে। আর যা-ই ঘটুক, হ্যারি কিলারের কাছে ফিরে-যাওয়ার চাইতে তো অধম-কিছু হবে না—তবে চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কী?

তাঁরা তারপর এক-এক ক'রে বামতীরেই উঠে পড়েছেন, আর একটু উজানে এগিয়ে তাঁরা এসে পড়েছেন একটা রাস্তার মোড়ে, সেটা প্রায় পঞ্চাশগজ চওড়া, সেটাই চারদিক থেকে কারখানাকে পেঁচিয়ে আছে। বৃষ্টি এমনই মুষলধারে পড়ছে যে রাস্তার এ-পাশ থেকে ও-পাশেও নজর চলে না।

যদিও প্রকৃতির এই তর্জনগর্জন অন্যসব আওয়াজকেই ঢেকে ফেলেছে, তবু যতটা-সম্ভব সন্তর্পণে, চুপিসাড়েই, তাঁরা এগিয়েছেন। আর আদ্ধেকটা রাস্তা পেরিয়েই থমকে থেমে পড়েছেন।

একটু-একটু দেখা যাচ্ছে, এই বৃষ্টির পর্দার মধ্যেও, বড়ো-জোর কুড়িগজ দূরে, কারখানার পশ্চিম আর উত্তর দেয়াল জুড়ে গিয়ে যে-কোণটা তৈরি করেছে—উত্তরের যে-দেয়ালটা শহরের সীমার বাইরের সমান্তরালভাবে এসেছে, আর অন্য দেয়ালটা গেছে উজানে, নদীর পাড় ধ'রে। রাজভবনের সেদিকটার দেয়ালটা যেমন, এই দেয়াল কিন্তু সরাসরি নদীর জলে গিয়ে নেমে পড়েনি, বরং জল থেকে আলাদা হ'য়ে গিয়ে সেখানে একটা চওড়া ঘাট তৈরি ক'রে দিয়েছে।

এবার পলাতকরা ধাঁধায় প'ড়ে গেছেন: কোনদিকে যাবেন? তারা বরং একটুখানিই দেখতে পেয়েছেন কারখানার ঠিক মোড়টাতেই, ভারি-বিপজ্জনক জিনিশ: শান্ত্রীর পাহারার ছোট্ট কুঠুরি—বৃষ্টির মধ্যে দিয়েও যার ধ্রুপদী বহিঃরেখা আবছাভাবে চেনা যাচ্ছে। শান্ত্রীর পাহারাকুঠুরির মর্মার্থ: ওখানে শান্ত্রী আছে। যদি সে বাইরে না-দাঁড়িয়ে থাকে, কারণ তাকে সেখানে দেখা যাচ্ছে না, তাহ'লে নিশ্চয়ই সে বৃষ্টির জন্যে কুঠুরিটার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

কিন্তু তাই ব'লে তাঁরা তো সারারাত সেখানে বৃষ্টির মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। এ-বৃষ্টি যদি হঠাৎ থেমে যায়, আর শান্ত্রী যদি ফের তার কুঠুরি থেকে বেরিয়ে আসে,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহ'লে তাঁরা চট ক'রেই ধরা প'ড়ে যাবেন।

সঙ্গীদের, ইঙ্গিতে, তাঁকে অনুসরণ করতে জানিয়ে আমেদে ফ্লরেঁস রাঙানদী থেকে কয়েক পা স'রে এলেন, তারপর রাস্তাটা পেরিয়ে চ'লে এলেন অন্যপাশে, সবসময়েই কারখানার দেয়ালের গা ঘেঁসে। এবার তাহ'লে তাঁরা শাস্ত্রীর পাহারাকুঠির পেছন দিয়ে যেতে পারবেন, কেননা তার দরজাটা নিশ্চয়ই নদীর দিকেই।

মোড়টায় এসে, তাঁরা থমকে দাঁড়িয়ে পরবর্তী পদক্ষেপটা ভেবে নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়েছেন আবার; তারপর আমেদে ফ্লরেঁস, সাঁৎ-বের্ঁা, আর তোঙ্গানে মোড় ঘুরে গিয়ে পৌঁছেছেন ঘাটে, আর সেখান থেকে হুড়মুড় ক'রে ছুটে গিয়ে ঢুকেছেন শাস্ত্রীকুঠিতে।

মেরিফেলোদের একজন, অর্থাৎ জনৈক হর্ষচরিত, সেখানে ছিলো বটে। অতর্কিত হামলায় এতটাই বোমকে গিয়েছিলো যে সে তার অস্ত্রে হাত দেবারই কোনো সুযোগ পায়নি, আর তার চীৎকারটা ঝড়ের দাপটের মধ্যে চাপা প'ড়ে হারিয়ে গেছে রাতের হাওয়ায়। সাঁৎ-বের্ঁা শুধু তাঁর ঘাড়টা ধ'রে তাকে তুলে ধ'রে আছাড় মেরেছেন মেঝেয়, ঠিক যেমনভাবে তিনি খানিক আগেই আছাড় মেরেছিলেন ৎশুমুকিকে—আর এই গোরাও আগেকার কালাআদমির মতো তেমনি অসাড় লুটিয়ে প'ড়ে থাকলো।

তোঙ্গানে ছুটে গেলো নৌকোয় নিয়ে এলো সেই রশির কুণ্ডলি, আর সেটা দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হ'লো এই তথাকথিত হুল্লোড়বাজ হর্ষচরিতকে। তারপর আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না-ক'রে, পলাতকরা উজান ধ'রে এগুলেন রাজভবনের দিকে, কারখানার দেয়াল ঘেঁসে সার বেঁধে পর-পর তাঁরা চলেছেন।

কারখানার অন্যতম অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিলো এটাই যে বাইরের দিক থেকে খোলবার কোনো দরজাই নেই। এসপ্ল্যানেডের দিকে একটাও দরজা ছিলো না, সেটা তাঁরা বুরুজ থেকেই লক্ষ করেছেন। উলটো দিকটাতেও কিছু দেখা যাচ্ছিলো না—অন্তত বৃষ্টির পর্দার মধ্য দিয়ে তাকিয়ে তা-ই মনে হয়েছে। আর, এখন মনে হচ্ছে উত্তরদিকটায় ঠিক নদীর গায়ে এসে শেষ হয়েছে কারখানা—কিন্তু এখানেও কোনো দেয়াল নেই।

তবে, একটা ঘাট যখন আছে, সেটা নিশ্চয়ই কোনোকিছুর জন্যে ব্যবহার করা হয়। নৌকো ক'রে মালপত্র এলে এই ঘাটে এনেই নিশ্চয়ই মাল খালাশ করা হয়, তা ছাড়া আর-কোন্ রাজকার্যের জন্যে এই ঘাট এত যত্ন ক'রে বানানো হয়েছে? অতএব মালগুলো কারখানার ভেতরে নিয়ে যাবার জন্যে অবশ্যই কোনো ব্যবস্থা আছে এখানে।

এবং তাঁদের যুক্তিতর্কে ভুল ছিলো না। প্রায় দেড়শো গজ এগিয়ে এসে পলাতকেরা একটা মস্ত দরজা দেখতে পেয়েছেন দেয়ালের গায়ে, সেটা পুরু ধাতুর পাত দিয়ে বানানো, গোটাটাই ইস্পাতের, বর্মের মতো দুর্ভেদ্য। বাইরে থেকে তার কড়া, বা ছিটকিনি, বা কোনো খিল নেই। কী ক'রে খুলবেন তাঁরা, তাহ'লে, এই দরজা? কেমন ক'রেই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা এটাকে ভেঙে ফেলবেন? ভেতরের কাউকে ডেকে যে নিজেদের দুরবস্থার কথা জানাবেন, তারও কোনো জো নেই—কেননা অন্যসব শাস্ত্রীরা নিশ্চয়ই পাহারায় মোতায়েন আছে আশপাশেই, ডাকাডাকি শুনলে তারাই প্রথমে ছুটে আসবে।

এই মস্ত দরজাটার পাশেই, আরো কয়েক পা উজিয়েই, আরো-একটা দরজা, অমনি ইস্পাতে তৈরি, আগেরটার চাইতে অনেক-ছোটো, আর প্রকাণ্ড-একটা তালা দিয়ে আটকানো। চাবি নেই, তালাটা যে খুলবেন এমন-কোনো যন্ত্রপাতিও নেই, ফলে ওতেই বা কোন্ ফায়দা হবে?

অনেকক্ষণ ভেবে, পলাতকেরা যখন ঠিক করেছেন দরজাটার গায়ে দুমদুম ক'রে ঘুষি কষাবেন, কিংবা দরকার হ'লে লাথি—এমন সময়ে এসপ্ল্যানেড থেকে উজান ধ'রে একটা ছায়ামূর্তি তাঁদের দিকে এগিয়ে এলো। মুষলধারের বৃষ্টির মধ্যে, আবছায়ার মতো ছায়ামূর্তিটা ক্রমেই তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। যেহেতু ঘাট থেকে বৃত্তাকার রাস্তায় যাবার আর-কোনো উপায়ই নেই, এই নিশাচর নিশ্চয়ই ঘাটের কোনো-একটা দরজার দিকেই এগুচ্ছে।

এখন আর চট ক'রে আশপাশে কোথাও স'রে যাবার উপায় নেই দেখে পলাতকেরা বড়ো দরজাটার ছাঁইচটার তলায় যতটা সম্ভব কুঁকড়িমুকড়ি দিয়ে দেয়াল ঘেঁসেই দাঁড়িয়ে রইলেন। খানিকটা গুঁড়ি মেরে থাকার ভঙ্গি, যাতে প্রথম সুযোগেই আগন্তুকের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়।

আগন্তুকটি কিন্তু দিব্বি নিশ্চিন্তভাবে, কোনো সন্দেহ না-ক'রেই, এগিয়ে আসছে। এতটাই কাছে এসে পড়েছে, হাত বাড়ালেই বুঝি তাকে ছোঁয়া যাবে। তার ভাবেভঙ্গিতে এমন-কোনো লক্ষণই নেই যে সে তাদের দেখতে পেয়েছে। দেখাই যাক্ কী হয়—খামকা কারু ওপর হামলা চালাবার কোনো মানে হয় না, পলাতকেরা ততক্ষণে এমনি একটা সিদ্ধান্ত ক'রে নিয়েছেন।

আগন্তুকের এই বিস্ময়কর দৃক্‌পাতবিহীন চালচলন দেখে, বুকে সাহস সঞ্চয় ক'রে, একজন-একজন ক'রে পলাতকেরা তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন পায়ে-পায়ে। তারপর তাঁরা আগেই যা ভেবেছিলেন তা-ই হ'লো : আগন্তুক এসে ছোটো দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর চাবিটা ঢুকিয়েছেন তালায়, পেছনে তাঁরা পর-পর দাঁড়িয়ে, একটু বোধহয় উপবৃত্তাকারেই, আটজন দর্শক, হুঁশিয়ার, উৎকর্ণ—যাদের অস্তিত্বটাই যেন আগন্তুকের নজরে আসেনি।

দরজা খুলে গেলো। আগন্তুক ভেতরে গিয়ে ঢুকতেই প্রায় তাকে ধাক্কা দিয়েই, পলাতকেরাও ভেতরে গিয়ে ঢুকেছেন। শেষে যে ঢুকেছিলো, সেই ভেতর থেকে টেনে পাল্লাটা বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

কিন্তু গভীর অন্ধকার এই ভেতরে। আর সেই অন্ধকারের মধ্য থেকেই একটা নরম



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বর ভেসে এ'লো, একটু যেন বিস্ময়মাখানো : 'আরে ! এর মানে কী ? কী চান আপনারা ? ...হচ্ছেটা কী ?'

মিটমিটে একটা আলো জ্ব'লে উঠলো তারপরেই, ক্ষীণ হ'লেও এই ঘন অন্ধকারে তাকেই মনে হ'লো চোখ-ধাঁধিয়ে দেয়া। জেন ব্লেজন তাঁর বিজলি মশালটা জালিয়েছে, যেটা কোকোরোতে একবার দারুণ কাজে লেগেছিলো। আর এই টর্চের আলো তক্ষুনি আলোর পাল্লায় পেয়েছে তোঙ্গানেকে, আর তাঁর মুখোমুখি, হালকাদীঘল একজন মানুষ, হালকা-সোনালি চুল, গায়ের জামাকাপড় থেকে অঝোরে জল ঝরছে, আর দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো।

পরস্পরকে ঐ টর্চের আলোয় দেখেই একসঙ্গেই দুজনে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো, যদিও দুজনের বিস্ময়ের স্বর আলাদা :

'সার্জেন্ট তোঙ্গানে !' হালকাপলকা মানুষটি অস্ফুট বিস্ময়ে ব'লে উঠলো।

'মাসা কামারে!' ব'লে উঠলো তোঙ্গানে, তার চোখদুটো ভীত, সন্ত্রস্ত, বিস্ফারিত!

কামারে !... নামটা শুনেই জেন ব্লেজন শিউরে উঠেছে; এ-নামটা তার চেনা, তার দাদার পুরোনো বন্ধুদের একজনের নাম !

আমেদে ফ্লরেঁসের মনে হয়েছে এবার তাঁর গায়ে প'ড়ে কিছু-একটা বলা উচিত। যে-লোকেরা একে-অন্যকে আগে থেকেই চেনে, তাদের পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার দরকার পড়ে না। আমেদে ফ্লরেঁস সামনে এগিয়ে এসে আলোর পাল্লার মধ্যে দাঁড়ালেন।

'মঁসিয় কামারে, আমি আর আমার বন্ধুরা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'এ আর বেশি কথা কী,' শান্তগলাতেই বললেন মঁসিয় কামারে।

তিনি একটা বোতাম টিপতেই ছাত থেকে বিজলি বাতি ঝলমল ক'রে উঠলো। পলাতকেরা অমনি দেখতে পেলেন তাঁরা একটা কোঠায় এসে পড়েছেন, মাথার ওপর ছাত আছে, কিন্তু ঘরে কোনো আশবাবপত্র নেই—অনেকটা কোনো হলওয়ের মতো।

মার্সেল কামারে একটা দরজা খুলে দিতেই সিঁড়ির ধাপ দেখা গেলো। তারপর, একপাশে স'রে দাঁড়িয়ে, ভদ্রতা ক'রে শিষ্টাচারসম্মতভাবে বললেন : 'আপনারা যদি অনুগ্রহ ক'রে ভেতরে আসেন।'

সহজসরল কথা, তাতে কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছয়

# মার্সেল কামারে

এই শিষ্টাচার ও সৌজন্যে মুগ্ধ, তাজ্জব ও অভিভূত, ছজন গোরা ও তাদের সঙ্গেকার দুজন কালো, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলেন—সিঁড়ির পইঠাগুলো বিজলিবাতির আলোয় ঝলমল করছে। প্রায় কুড়িধাপ পেরিয়ে এসে তাঁরা ঢুকলেন দ্বিতীয় একটা হলওয়েতে। মার্সেল কামারে তাঁদের পেছন-পেছন আসছিলেন, এবার তিনি তাঁদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এসে দ্বিতীয়-আরেকটা দরজা খুলে দিয়ে একপাশে একটু স'রে দাঁড়ালেন, যাতে তাঁর অপ্রত্যাশিত অভ্যাগতরা তাঁর আগে যেতে পারেন।

মস্ত-একটি ঘরে এসে ঢুকলেন অভ্যাগতরা—ঘরটা যেন চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা কেমন দেখাতে পারে, তারই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। একটা দেয়ালের একপাশে আছে মস্ত-একটা টেবিল, যেমনতর টেবিলে এনজিনিয়াররা তাঁদের *নীল নকশা* আঁকেন, বাকি-তিনটে দেয়ালভর্তি বইয়ের তাক। এলোমেলো ছড়িয়ে আছে গোটা-বারো চেয়ার, সবগুলোর ওপর বইপত্র আর কাগজ চাপানো। মার্সেল কামারে এমনি-একটা বইকাগজের স্তূপ তুলে নিয়ে মেঝেয় রেখে দিয়ে চেয়ারটায় ব'সে পড়লেন। এই দৃষ্টান্ত দেখে উৎসাহিত হ'য়ে তাঁর অভ্যাগতরাও তাঁর দেখাদেখি চেয়ারগুলো ফাঁকা ক'রে নিয়ে তাতে ব'সে পড়লেন —শুধু মলিক আর তোঙ্গানে সসম্ভ্রমে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলো।

'আপনাদের কোন্ কাজে লাগতে পারি, বলুন,' মার্সেল কামারের কথা বলার ভঙ্গি দেখে মনে হ'লো এমন অপ্রত্যাশিত আগমনের মধ্যে অস্বাভাবিক-কিছুই তিনি দেখতে পাননি।

চেয়ার ফাঁকা ক'রে বসতে যতটা সময় লেগেছে, পলাতকেরা তার মধ্যেই এই আশ্চর্য মানুষটিকে ভালো ক'রে লক্ষ ক'রে নিয়েছেন। যাঁর ঘরে এ-রকম বলা-নেই-কওয়া-নেই এসে চড়াও হয়েছেন, সে কেমনতর মানুষ? দেখে বরং একটু আশ্বস্তই হওয়া গেছে। মানুষটি যে ভারি অদ্ভুত, তাতে কোনো সন্দেহই নেই—এই যাঁকে তোঙ্গানে 'কামারে' নামে সম্বোধন করেছে; যিনি এমনই নিজের ভাবনায় মশগুল হ'য়ে ছিলেন যে কখন যে ঘাটের পাশে এদের গায়ে গা ঘেঁসে এসেছেন তা অব্দি খেয়াল করেননি, যাঁর ভাবগতিক দেখে মনে হয় এইসব তুচ্ছ পার্থিব ব্যাপারে তাঁর কোনো মাথাব্যথাই নেই; এমন অতর্কিতে-চড়াও-হওয়া অনিমন্ত্রিত অতিথিদের যেমন সহজসরল ভঙ্গিতে স্বাগত জানিয়েছেন সেটাও কম-আশ্চর্য নয়।

তবে এ-সব অনুপুঙ্খ যতই অসাধারণ হোক, এর মধ্যে কোনো সাজানো ব্যাপার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা ঘোরপ্যাঁচ আছে ব'লে মনে হয় না। একধরনের *সততা* মাখানো আছে তাঁর মধ্যে, একধরনের আশ্চর্য সারল্য, যাঁর ছোটোখাটো মিরকুট্টে শরীরটা দেখে মনে হয় এখনও পুরোপুরি বেড়ে ওঠেনি, যেন বয়ঃসন্ধির মুখে এসে দাঁড়ানো কোনো কিশোরের শরীর। না, এই চওড়া প্রশস্ত কপাল যাঁর, যাঁর আয়ত চোখদুটির সরলদৃষ্টি এ-রকম, সে কিছুতেই হ্যারি কিলারের নৈতিক সংসারের মানুষ হ'তে পারে না। অথচ সবকিছু দেখেশুনে বোঝা যাচ্ছে এঁরা দুজনেই একই জীবনযাত্রার শরিক।

'মঁসিয় কামারে,' মঁসিয় বারজাক এতক্ষণে আবার তাঁর আত্মবিশ্বাস খানিকটা ফিরে পেয়েছেন, 'আমরা আপনার কাছে নিরাপত্তা চাইতে এসেছি।'

'*নিরাপত্তা?*' কামারে খুব-বিস্মিত ভঙ্গিতেই শব্দটার পুনরাবৃত্তি করেছেন। 'কার কাছ থেকে, বলুন তো?'

'এই শহরের প্রভু—কিংবা সর্বেসর্বার হাত থেকে : হ্যারি কিলারের হাত থেকে।'

'হ্যারি কিলার? *প্রভু? সর্বেসর্বা?*' কামারে কেমন হতভম্বভাবে কথাগুলো আউড়েছেন আবার।

'আপনি জানতেন না যে সে স্বৈরাচারী একনায়ক?' মঁসিয় কামারের ভাবগতিক দেখে মঁসিয় বারজাকও কম অবাক হননি।

'না-তো,—'

'এটা নিশ্চয়ই জানেন যে এখানে একটা শহর আছে?'

'বাঃ, নিশ্চয়ই!'

'শহরটার নাম ব্ল্যাকল্যাণ্ড—নয় কি?'

'ওঃ, তাহ'লে ব্ল্যাকল্যাণ্ড নাম দেয়া হয়েছে?' শব্দটা যেন জিভের ডগায় চেখে নিলেন কামারে। 'নাঃ, খুব-একটা মন্দ নাম দেয়নি তো... না, এ-নামটা আমি জানতুম না, তবে আপনি যখন বললেন, এখন তাহ'লে জানি। তবে ও-সব নাম-টামে আমার কিছুই এসে-যায় না।'

'শহরের নামটা যদি নাও জানেন, এটা নিশ্চয়ই জানতেন, এ-শহরে লোক থাকে—জনসংখ্যা খুব-একটা কমও নয়।'

'বাঃ রে, তা জানবো না কেন,' শান্তসুরেই বললেন কামারে।

'তা, কোনো শহর থাকলে সেটা চালাবার জন্যে সংগঠন লাগে—সরকার, বা শাসকসভা।'

'তা তো নিশ্চয়ই।'

'ব্ল্যাকল্যাণ্ডে এই শাসনের দায়িত্ব পুরোপুরি, সবদিক থেকেই, হ্যারি কিলারের হাতে। আর সে এক নিষ্ঠুর, বদমায়েশ, রক্তলোলুপ স্বৈরাচার বৈ আর-কিছু নয়—মাতাল জানোয়ার একটা সে, সম্ভবত বদ্ধউন্মাদ!'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতক্ষণ মার্সেল কামারে বারজাকের দিকে মুখ তুলেও তাকাননি। এবার তাঁর দিকে যখন মুখ তুলে তাকিয়েছেন, তখন তাঁর চোখে অসহায় একটা বিমূঢ়ভাব ফুটে উঠেছে। কিছুই যেন তিনি বুঝতে পারছেন না। যেন সদ্য তিনি চাঁদ থেকে এসে নেমেছেন পৃথিবীতে—অন্যগ্রহের জীব।

'ওঃ,' কি-রকম বিমূঢ় ভাবে অস্ফুটস্বরে বললেন, 'আপনি এমন ভাষা ব্যবহার করছেন—'

'হ্যাঁ, যে-বাস্তবটা ফোটাতে চাচ্ছি, তার পক্ষে এ-ভাষার সামর্থ্যে মোটেই কুলোয় না, তা জানি, কিন্তু আগে আমাকে আমাদের পরিচয়টা জানাতে দিন—তাহ'লে হয়তো খানিকটা আন্দাজ করতে পারবেন।'

কামারে যদিও ঘাড় হেলিয়ে সৌজন্যের সঙ্গেই তাঁকে অনুমতি দিয়েছেন, তবু তাঁর ভঙ্গিতে এমন-একটা ঔদাসীন্য ছিলো, যেটা আদৌ তেমন উৎসাহব্যঞ্জক নয়। জেন ব্রেজনের ছদ্মনামটাই বলেছেন বারজাক, বাকি সকলের পরিচয় দেবার সময় নামের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরা কী কাজ করেন তাও বলেছেন। 'আর সব-শেষে,' বারজাক বললেন, 'এ হ'লো তোঙ্গানে, তবে একে-তো আপনি আগে থেকেই চেনেন ব'লে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ,' অস্ফুট নরমসুরে বললেন কামারে, আবারও তিনি তাঁর চোখ নামিয়ে নিয়েছেন।

'ফরাশি সরকারের নির্দেশে... আপনি নিজেই নিশ্চয়ই একজন ফরাশি, মঁসিয় কামারে ?'

'হ্যাঁ... হ্যাঁ,' আবারও সেই নিরাসক্ত অস্ফুটস্বরে বলেছেন বৈজ্ঞানিক।

'নির্দেশে, বলেছি... ফরাশি সরকারের নির্দেশে আমি আর আমার সহকর্মীরা একটা মিশনে এসেছিলুম, পথে অবিরাম একের পর এক বাধার মুখে পড়তে হয়েছে আমাদের... নাইজার অব্দি যাবার কথা ছিলো, কিন্তু যেতে পারিনি—কারণ আমাদের সামনে এ-বাধাগুলো উপস্থাপিত করেছিলো, আবারও বলছি, একের পর এক, সে ঐ হ্যারি কিলার।'

'কিন্তু সে তা করতে যাবে কেন ?' অবশেষে কামারে একটা আপত্তি তুলেছেন।

'যাতে আমরা নাইজারে যেতে না-পারি। কারণ হ্যারি কিলার চায় তার এই ডেরাটার কথা যেন কেউ না-জানে। সেইজন্যেই সে আফ্রিকার এদিকটায় আমাদের ঢুকতে দিতে চায়নি। তার ভয় হচ্ছিলো, আমরা হয়তো ব্ল্যাকল্যাণ্ডের কথা জেনে ফেলবো। ইওরোপে কেউই জানে না যে এ-রকম কোনো দেশ আছে !'

'এ আপনি কী বলছেন ?' হঠাৎ যেন কামারের ঔৎসুক্য চুলবুল ক'রে উঠলো। 'কিন্তু জানবে না কেন ? ইওরোপে নিশ্চয়ই জানবে—এখান থেকে কত কর্মীই তো কাজ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ ক'রে ইওরোপে ফিরে গেছেন।'

'অথচ, কেউ ব্ল্যাকল্যাণ্ডের কথা জানে না।'

'আপনি কি তাহ'লে বলতে চাইছেন,' ক্রমেই একটা অদ্ভুত অস্থিরতা ফুটে উঠছিলো কামারের গলায়, 'যে কেউ—আমি বলতে চাইছি, কেউ—আমাদের কথা জানে না?'

'না, কেউ না।'

'আর তারা এখনও ভাবছে যে এই মরুভূমি বসবাসের সম্পূর্ণ-অযোগ্য?'

'হ্যাঁ, মঁসিয়, আমি ঠিক এই কথাটাই বলতে চাচ্ছি।'

কামারে ততক্ষণে দুম ক'রে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন। কি-রকম অস্থিরভাবে ঘরটার মধ্যে পায়চারি করতে-করতে তিনি বললেন: 'অচিন্তনীয়!... এ যে একেবারেই ভাবা যায় না!' তাঁর উত্তেজনা অবশ্য একটু পরেই প্রশমিত হয়েছে, অতি-কষ্টে নিজেকে দমন ক'রে আবার তিনি চেয়ারে গিয়ে ব'সে পড়েছেন। 'বলুন, মঁসিয়, আপনি কী বলতে চাইছিলেন।'

'সে-সব যে কত বাধা হ্যারি কিলার আমাদের সামনে দাঁড় করিয়েছিলো, তার বর্ণনা দিয়ে আপনাকে আমি বিরক্ত করতে চাই না। শুধু এটুকু জানুন যে, হ্যারি কিলার আমাদের রক্ষিদলকে মিথ্যে অছিলায় পাঠিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, যখন দেখেছে ঐ রক্ষিদল বিনাই আমরা তবু নাইজারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, সে রাতের অন্ধকারে তার লোকজন পাঠিয়ে অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ ক'রে বন্দী ক'রে নেয়—তারপর এখানে এনে চোদ্দ দিন ধ'রে আমাদের তার জেলখানায় আটকে রেখেছে আর বারে-বারে ফাঁসির ভয় দেখাচ্ছে!'

মার্সেল কামারের মুখটা ততক্ষণে টকটকেলাল হ'য়ে উঠেছে। 'আপনি যা বলছেন তা অচিন্তনীয়—অবিশ্বাস্য! অ্যাঁ... হ্যারি কিলার এইরকম করেছে!'

'শুধু তা-ই নয়,' বলে মঁসিয় বারজাক বিশদভাবে খুলে বলেছেন কী ভয়ংকর অত্যাচার চালাচ্ছে সে মাদমোয়াজেল মোরনাসের ওপর, আর কী-রকম ঘৃণ্য ও নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, শুধু একটা খেয়ালখুশি মেটাবার জন্যে, দু-দুজন আফ্রিকি চাষীকে। আর শুনতে-শুনতে মার্সেল কামারে যেন যন্ত্রণায় দুমড়ে গেছেন। আপাতত, অন্তত, শুদ্ধ নির্বস্তুক চিন্তার জগৎ থেকে আছাড় খেয়ে পড়েছেন তিনি বাস্তবের রূঢ় জগতে। তাঁর ভেতরকার সত্তা যেন এই কথা শুনে প্রচণ্ড মার খাচ্ছে। যে-তিনি একটা পিঁপড়েকে পর্যন্ত মারবার জন্যে হাত ওঠাতে পারেন না, সেই-তিনিই কি না এত-বছর ধ'রে এমন-একজনের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ ক'রে চলেছেন, এ-সব নৃশংস কাজ যার কাছে রুটিমাখনের মতোই দৈনন্দিন! প্রায় ছটফট ক'রে উঠে অস্ফুটস্বরে কামারে বললেন: 'বীভৎস!... ভয়ানক!'

যে-বিভীষিকার বোধ তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে, তার সঙ্গে মেশানো যে-বিবমিষা, দুটোই নির্ভেজাল ও অকৃত্রিম, তাঁর অন্তরের অন্তঃস্তল থেকেই যেন উৎসারিত হয়েছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের বিবেককে তিনি এখন শামাল দেবেন কী ক'রে? কী ক'রে, এত-সব গর্হিত কাজের বিবরণ শোনবার পর, এই শহরে থাকবেন তিনি এখন?

'এবং মঁসিয়,' বারজাক বলেছেন, 'যে-লোক ঠাণ্ডামাথায় এমন-সব নৃশংস কাজ করতে পারে, আর যা-ই হোক, সে কোনো *অপেশাদার শখের অপরাধী* নয়। হ্যারি কিলারের বিবেকে নিশ্চয়ই আরো-সব অপকর্মের স্মৃতি গাঁথা হ'য়ে আছে। আর আপনি তার কিছুই জানেন না?'

'আপনি... আপনার সাহস হয় আমাকে এমনতর প্রশ্ন করতে?' কামারে তীব্রসুরে প্রতিবাদ ক'রে উঠেছেন, 'হ্যাঁ, সত্যি, এ-সবের বিন্দুবিসর্গও ঘুণাক্ষরেও আমি টের পাইনি কোনোদিন। আপনি ঠিকই বলেছেন, এমন জঘন্য কাজ কেউ একদিন হঠাৎ দুম ক'রে ক'রে বসে না—এ কোনো অপেশাদারের কাজ নয়। এখন আমার ঘোরতর সন্দেহ হচ্ছে আরো-কত জঘন্যতর কাজই না সে করেছে। এই কারখানা থেকে আমি প্রায়-কখনোই বেরুই না, এর সব দায়িত্ব আমার—এ নিয়েই আমি সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকি। নতুন-নতুন পরিকল্পনার ছক তৈরি করতে হয় আমায়। এটা আমি জোর দিয়েই বলছি সম্ভবত সেইজন্যেই এ-সবের কোনোকিছু কোনোদিনই আমার চোখে পড়েনি, কানেও আসেনি, *কোনোদিনই না*।'

'আপনি যদি আমাদের কথা বুঝতে পেরে থাকেন,' বারজাক বললেন, 'তাহ'লে, অন্তত আংশিক হ'লেও, আপনি আমাদের একটা কৌতূহল মেটাতে পারবেন। এখানে এসেই, এই শহরটা দেখবামাত্র, আমরা সবাই তাজ্জব হ'য়ে গেছি। এই শহর আর তার আশপাশের ঐ সোনাফলানো জমি নিশ্চয়ই হ্যারি কিলারের কীর্তি হ'তে পারে না—বিশেষত যখন আমরা সবাই জানি যে মাত্র দশ বছর আগেও এখানে খাঁ-খাঁ করতো মরুভূমির রুক্ষ বালি! এর উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, রূপান্তরটা চমকপ্রদ। আর হ্যারি কিলারের মাথায় যদি কোনোকালে কোনো বুদ্ধিশুদ্ধি থেকেও থাকতো, এতদিনে তা অন্তত অত মদের তলায় চাপা প'ড়ে গেছে। এটা আমাদের মাথায় ঢুকছে না ও-রকম একজন নরাধম পশু কী ক'রে এই আশ্চর্য রূপান্তরটা সম্ভব ক'রে তুলেছে।'

'ও!' হঠাৎ যেন প্রচণ্ড ক্রোধে মার্সেল কামারের সর্বাঙ্গ চিড়বিড় ক'রে জ্ব'লে উঠলো। 'ও!... ও করবে এই কাজ, যে একটা *কেউ-না*, যে একটা *কিছুই-না*!... এ আপনারা কী ভাবছেন!... এ-কাজ দুর্দান্ত, আর এমনতর কাজ যে ঘটাতে পারে, সে নিশ্চয়ই হ্যারি কিলারের চাইতে একেবারেই অন্যরকম হবে!'

'তাহ'লে এর জন্যে দায়ী কে?'

'আমি!' কামারের মুখ অহংকারে জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো। 'এখানে যা-কিছু আপনারা দেখছেন, সব আমার নিজের হাতের কাজ। আমিই এই তৃষাতুর মাটিতে জীবনদায়ী বৃষ্টি ঝরিয়েছি, আমিই মরুভূমিকে রূপান্তরিত করেছি সোনাফলানো মাটিতে। আমিই প্রায়



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শূন্য থেকেই তুড়ি মেরে বার ক'রে এনেছি এই শহরটাকে—ঈশ্বর যেমন ক'রে *কিছুই-না* থেকে সৃষ্টি করেছেন এই বিশ্বকে!'

বারজাক আর তাঁর সঙ্গীরা একটু অস্বস্তিভরে পরস্পরের দিকে চোখ চাওয়াচাউয়ি করলেন। এ-যে দেখছি নিজেরই মহিমার স্তুতি গাইতে শুরু করেছে! তাহ'লে কি একজন পাগলের পাল্লা থেকে বেরিয়ে তাঁরা আরেকজন পাগলের খপ্পরে এসে পড়লেন?

একমুহূর্তের স্তব্ধতা ভেঙে এবার ডাক্তার শাতোনে জিগেস করলেন, 'আপনিই যদি এইসব আশ্চর্য কাজ ক'রে থাকেন, তাহ'লে হ্যারি কিলারের হাতে এইসমস্ত তুলে দিলেন কেন? একবারও জানবার চেষ্টা করলেন না এইসব আবিষ্কার আর উদ্ভাবন নিয়ে সে কী করছে?'

'ঈশ্বর যখন অসীম আকাশে তারা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, তখন কি তিনি এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন পরে এদের কী হবে?'

'ঈশ্বর শুনেছি পাপের সাজা দেন,' ডাক্তার শাতোনে বললেন, 'বাইবেলে তিনি বলেছেন: "*প্রতিহিংসা আমার*।"'

'যদি দরকার হয়, তাহ'লে আমিও তাঁরই মতো কঠোর সাজা দেবো,' অস্থির-একটা আলোয় আবার ঝকমক ক'রে উঠলো মার্সেল কামারের চোখের তারা।

পলাতকেরা মহাফাঁপরে পড়লেন। এঁর ওপরে নির্ভর করা যায় কী ক'রে? ইনি মস্ত প্রতিভা হ'তে পারেন, কিন্তু এঁর তো মানসিক ভারসাম্য ব'লে কিছুই নেই।

'মঁসিয় কামারে,' আমেদে ফ্লরেঁস আবার আলোচনাটাকে নিকট-বাস্তবে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন, 'আমি যদি জিগেস করি আপনার সঙ্গে এই হ্যারি কিলারের পরিচয় হ'লো কী ক'রে, তা কি নিতান্তই অনধিকার চর্চা হবে? আর এই ব্ল্যাকল্যাণ্ডকে গড়বার পরিকল্পনাটাই বা হঠাৎ আপনার মাথায় এসেছিলো কেমন ক'রে?'

'না-না, অনধিকার চর্চা হবে কেন?' মার্সেল কামারের গলার স্বর আবার মৃদু হ'য়ে এলো, 'ভাবনাটা এসেছিলো হ্যারি কিলারের মাথাতেই, তবে সেটাকে বাস্তবে রূপায়ণ করার দায়িত্ব ছিলো আমারই ওপর। আমার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিলো, যখন এক ইংরেজ সমরবাহিনীর কাপ্তেন, জনৈক জর্জ ব্রেজন, সেই অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।'

নামটা বলবামাত্র সবাই জেন ব্রেজনের দিকে ফিরে তাকালেন, কিন্তু তার মুখের একটা পেশীও কাঁপলো না।

'সার্জেন্ট হিশেবে তোঙ্গানেও সেই অভিযানে অংশ নিয়েছিলো। আর সেইজন্যেই এত-বছর বাদেও ওকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছি। আমার কাজ ছিলো এনজিনিয়ারের, আমার কাজ ছিলো পর্বতবিদ্যাচর্চাসংক্রান্ত—সেইসঙ্গে জলবিদ্যা ও বিশেষত খনিবিদ্যাতেও অভিনিবেশ দিতে বলা হয়েছিলো। আশান্তিভূমির আসেরা থেকে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তরদিকে আমরা এগিয়েছি ক্রমাগত, দু-মাস কেটে যাবার পর হঠাৎ একদিন হ্যারি কিলার এসে সেখানে আবির্ভূত হয়। আমাদের নেতা কাপ্তেন জর্জ ব্লেজন তাকে দেখেই উচ্ছ্বসিতভাবে অভ্যর্থনা জানান, সেও তখন আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়—কখনও আর অভিযানের সঙ্গ ছাড়েনি।'

'এটা বলা কি ঠিক হবে না,' জেন জিগেস করলে, 'অবশেষে ধীরে-ধীরে সকলের অলক্ষিতে সে-ই শেষটায় নেতা হ'য়ে উঠেছিলো? এমনই ধীরে-ধীরে, কেউ সেটা খেয়ালও করেনি?'

তরুণীর দিকে ফিরে তাকালেন মার্সেল কামারে। 'সেটা আমি ঠিক বলতে পারবো না,' একটু ইতস্তত করলেন বটে, কিন্তু এ-প্রশ্ন শুনে যে খুব-একটা অবাক হয়েছেন, তা মনে হ'লো না। 'আমি আমার নিজের কাজেই এমন ডুবেছিলুম যে বাইরের খুঁটিনাটির দিকে নজর দেবার কোনো অবসর ছিলো না। জর্জ ব্লেজনের চাইতে বরং অনেক-বেশিবারই হ্যারি কিলারের সঙ্গে আমার দেখা হ'তো। তা, একদিন যখন আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে আমার নিজের গবেষণা সেরে আমি ফিরে এসেছি, দেখি যেখানে শিবিরটা থাকবার কথা ছিলো, সেটা সেখানে নেই। লোকজন কেউ নেই, যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম কিছু নেই,. কিছু-না! একটু যখন বিরক্তই বোধ করছি, ভাবছি কোথায় যাবো, এমন সময় হঠাৎ আমার সঙ্গে হ্যারি কিলারের দেখা হ'য়ে গেছে।

'সে আমায় জানালে কাপ্তেন ব্লেজন নাকি প্রায় গোটা দলবলটা নিয়েই উপকূলের দিকে ফিরে গেছেন, কুড়িজন অনুচর দিয়ে তারই ওপর নাকি ভার দেয়া হয়েছে আমাদের অনুসন্ধানের বাকি কাজটা শেষ করার। আমার কী এসে যায় বলুন—নেতা এ-ই হোক, বা ও-ই হোক। তাছাড়া কাপ্তেন ব্লেজনের নাগালই বা তখন আমি ধরবো কোথায়? তো, আমি কোনো দ্বিধা না-ক'রেই হ্যারি কিলারের সঙ্গে গেছি তখন। সে নাকি গুজব শুনেছিলো যে আমি কতগুলো আশ্চর্য জিনিশ উদ্ভাবন করতে চাইছি। সে তখন আমাকে এখানে নিয়ে এসে বলে সেগুলো তাহ'লে এবার কাজে রূপায়িত করা যাক। আমি রাজি হ'য়ে যাই। হ্যারি কিলারের সঙ্গে আমার সম্পর্কের সেটাই শুরু।'

'মঁসিয় কামারে, হ্যারি কিলার সম্বন্ধে আপনি যতটুকু জেনেছেন, তার সঙ্গে আরো-কতগুলো তথ্য যোগ করতে দিন আমায়।' জেন ব্লেজনের গলার স্বর গম্ভীর। 'যেদিন থেকে সে গিয়ে কাপ্তেন ব্লেজনের দলে যোগ দিয়েছিলো, সেদিন থেকেই বাহিনীটা একটা দস্যুর দল হ'য়ে ওঠে। তারা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, নির্বিচারে হত্যা করেছে নিরীহ মানুষদের, মেয়েদের ওপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে, আর শিশুদের পর্যন্ত কুপিয়ে মেরেছে!'

'অসম্ভব!...' কামারে তীব্র আপত্তি জানালেন। 'গোল্লায় যাক গুজব—আমি নিজে সেখানে ছিলুম। এবং আমি সে-সব কিছুই দেখিনি!'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যেমন এখনও আপনি আপনার চোখের সামনে যা-সব কাণ্ড ঘ'টে যাচ্ছে তার কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না! গত দশবছর হ্যারি কিলারের অপকর্মের কিছুই আপনি খেয়াল করেননি! অথচ, হায়-রে, আমি যে-সব ঘটনার কথা বললুম, তা তো কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না। এ-সবই ঐতিহাসিক তথ্য, এবং সারাজগৎ এ-সবের কথা জানে!'

'আর আমি তার কিছুই জানতে পারিনি!...' মার্সেল কামারে বুঝি বজ্রাহত।

'না-জানতে পারেন,' জেন তখনও তার কথা শেষ করেনি, 'এ-সব নৃশংস অত্যাচারের খবর ইওরোপে গিয়ে পৌঁছেছে। কাপ্তেন ব্লেজনের বিদ্রোহী বাহিনীর বিরুদ্ধে ফৌজ পাঠানো হয়েছে। যেদিন আপনি গিয়ে শিবিরটাকেই দেখতে পাননি, জর্জ ব্লেজন সেখান থেকে দলবল নিয়ে চ'লে যাননি। তিনি তখন মৃত।'

'মৃত?!'

'হ্যাঁ, কিন্তু আগে যে লোকে বলেছিলো ইংরেজ ফৌজের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে তিনি মারা গেছেন, সেটা ঠিক খবর নয়। জর্জ ব্লেজন খুন হয়েছেন আততায়ীর হাতে!'

'*আততায়ীর হাতে খুন হয়েছেন*।...'

'এবং পেছন থেকে *এই খঞ্জর* চালিয়ে তাঁকে খুন করা হয়েছে,' ব'লে, জেন তার জামার ভেতর থেকে খঞ্জরটা বার ক'রে দেখালে। 'এই ভদ্রলোকদের সঙ্গে আমি আমার দাদার কবর খুঁজে বার করতে গিয়েছিলুম; সেখানে, এঁদের সামনে, আমি তার দেহাবশিষ্ট পরীক্ষা ক'রে দেখেছি। তাঁর কাঁধের হাড়ের মধ্য দিয়ে এই খঞ্জর তার দেহে বেঁধানো ছিলো, ফলাটা গিয়ে বিঁধেছিলো হৃৎপিণ্ডে। খুনীর নামটাও খোদাই করা ছিলো হাতলে, কিন্তু সময় নামের হরফগুলোকে ঝাপসা ক'রে দিয়ে গেছে। কিন্তু দুটি হরফ এখনও পড়া যায়, আর আপনি আমাদের এইমাত্র যা বললেন, তা থেকে আমার অন্তত কোনো সন্দেহই নেই যে এই নামটা ছিলো "*হ্যারি কিলার*"।'

এই শোচনীয় কাহিনীটা শুনতে-শুনতে মার্সেল কামারে ক্রমেই অস্থির হ'য়ে উঠছিলেন, উত্তেজিতভাবে নিজের আঙুলগুলো মোচড়াচ্ছিলেন, আর মাঝে-মাঝেই কপাল থেকে ঘাম মুছে নিচ্ছিলেন।

'এ-যে ভয়ংকর! বীভৎস কাণ্ড!...শেষ পর্যন্ত আমিই কিনা এ-রকম করলুম! আমি!...*আমি*!' তাঁর বিস্ফারিত চোখে কেমন-একটা অদ্ভুত আলো ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

'আপনি আমাদের লুকিয়ে থাকতে দেবেন এখানে?' এতক্ষণে বারজাক আসল প্রশ্নটা জিগেস করলেন।

'আমি আপনাদের লুকিয়ে থাকতে দেবো কি না?...' একটু তিক্ততপ্ত স্বরেই মার্সেল কামারে জিগেস করলেন: 'সেটা আবার আমাকে জিগেস করছেন আপনারা? আপনারা কি ভুলেও ভাবতে পারেন যে এমন-একটা জঘন্য অপরাধের সঙ্গে আমি লিপ্ত আছি,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন কি না আমি ভাবছি তাকে কী-রকম কঠোর সাজা দেবো!'

'সাজা দেবার কথা ভাববার আগে বরং আমরা কী ক'রে আত্মরক্ষা করতে পারি, সেটাই প্রথমে ভাবা উচিত,' আমেদে ফ্লরেঁস কাণ্ডজ্ঞানের কথাটা শোনালেন, 'হ্যারি কিলার আবার ধরপাকড় চালাবে নিশ্চয়ই—আমাদের নিশ্চয়ই আবার পাকড়াবার চেষ্টা করবে!'

মার্সেল কামারে মৃদু হাসলেন। 'আপনারা যে এখানে আছেন, এ-কথা সে জানে না। আর যদি জানেও,' তাচ্ছিল্যভরে হাত নেড়ে এমন-একটা ভঙ্গি করলেন যাতে বোঝা গেলো তিনি তার থোড়াই পরোয়া করেন, 'আপাতত আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আপনারা এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ, এটা জেনে রাখবেন।' ব'লে তিনি একটা বোতাম টিপেছেন, আর একটা ঘণ্টা বেজেছে। অমনি দরজা খুলে কালো-একটি পরিচারক এসে হাজির। আর এঁদের সবাইকে দেখেই বিস্ময়ে সে আঁৎকে উঠেছে। কামারে অবশ্য সেদিকে দৃকপাত না-ক'রে এমন সহজ-সুরে তাকে নির্দেশ দিলেন যেন জগৎসংসারে এর চেয়ে নিরীহ সরলসোজা কাজ আর কিছুই নেই। 'জ্যাকো, এই মহিলা আর এই ভদ্রলোকদের তাঁদের শোবার ঘর দেখিয়ে দাও।'

মার্সেল কামারে উঠে ঘর পেরিয়ে গিয়ে একটা দরজা খুললেন। 'শুভরাত্রি,' শিষ্টাচার ও সৌজন্যের এই নিদর্শনের পরেই তিনি অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন, আর সবাই বিস্মিত হ'য়ে তাঁর প্রস্থানপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সবচেয়ে বোমকে গিয়েছে এই কৃষ্ণাঙ্গ পরিচারকটিই, এদের বিছানা জোগাড় ক'রে দেবার সবচেয়ে-কঠিন দায়িত্বটা তো পড়েছে তারই ওপর। বাস্তবিকই, বেচারা জ্যাকো এখন মাঝরাত গড়িয়ে যাবার পর তাঁদের জন্যে বিছানা জোগাড় করতে যাবে কোথায়? কারখানার সব বিছানাই যার-যার ঘরে, এবং সেগুলো ব্যবহার হয়; অপ্রত্যাশিত অতিথিদের শোবার জন্যে কোনো ব্যবস্থাই নেই এখানে। তাকে কি তবে দোরে-দোরে ঘুরে এখন এই বর্ষাবাদলের রাতে গিয়ে কর্মীদের কাঁচাঘুম ভাঙিয়ে তুলতে হবে?

তার বিষম মুশকিলের কথাটা অনুমান ক'রেই মঁসিয় বারজাক তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীদের কোনো বিছানা ছাড়াই চলবে। তাঁরা সবাই বরং এ-ঘরটাতেই থাকবেন, ঘরটা এমনিতে বেশ-বড়ো, প্রশস্ত, শুধু জ্যাকো যদি কতগুলো আরামকেদারা আর চাদর জোগাড় ক'রে দিতে পারে! এতেই তাঁরা মানিয়ে নেবেন; তাছাড়া রাত তো এমনিতেই বোধহয় কাবার হ'তে চলেছে।

অবশেষে একসময় সকালও হ'লো। যে-দরজাটা দিয়ে গতরাতে ঘর ছেড়ে মার্সেল কামারে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক ছটায় সেই দরজা খুলেই তিনি আবার ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর ঘরটাকে যে এঁরা একটা ঢালাও শোবার জায়গায় পরিণত ক'রে নিয়েছেন, সেই ডরমিটরি-মার্কা হাল দেখে তিনি খুব-একটা যে অবাক হয়েছেন তা কারুই মনে হ'লো না।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সুপ্রভাত,' যেমন শান্তসুরে গতরাতে তিনি তাঁদের 'শুভরাত্রি' জানিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি শান্তগলায় তিনি প্রাতঃকালীন সম্ভাষণ জানালেন।

'সুপ্রভাত, মঁসিয় কামারে,' তাঁরাও সমস্বরে প্রত্যভিবাদন জানালেন।

কামারে সোজা কাজের কথায় এলেন। 'কাল রাতে আপনারা আমায় যা-যা বলেছেন, তা নিয়ে আমি অনেকক্ষণ ভেবেছি। এই অবস্থা কিছুতেই আর চলতে দেয়া যেতে পারে না। আমাদের এক্ষুনি এর মোকাবিলা করতে হবে।' ব'লে তিনি একটা বোতাম টিপলেন, অমনি চারপাশ থেকে শোরগোলের ঝমঝম শুরু হ'য়ে গেলো।

'অনুগ্রহ ক'রে আমার সঙ্গে আসুন,' কামারে তাঁদের বললেন।

কয়েকটা করিডর পেরিয়ে যাবার পর, তাঁরা এসে পৌঁছুলেন বিশাল-এক ওয়ার্কশপে, অনেক যন্ত্রপাতির ঘটাং-ঘটাং চলে সেখানে, তবে এখন সেগুলো নিঃশব্দ প'ড়ে আছে। আর সে-সব যন্ত্রের চারপাশে নারী-পুরুষের এক জটলা।

'সবাই এসেছে তো?' জিগেস করলেন কামারে, 'রিগো, একটু নাম ডেকে দ্যাখো তো!'

যখন জানা গেলো যে কারখানার সব কর্মীই এই ওয়ার্কশপে উপস্থিত, তিনি তাঁদের উদ্দেশ ক'রে বলতে শুরু করলেন। প্রথমেই রাতের অতিথিদের সঙ্গে তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন, এঁরা প্রাণ বাঁচাবার জন্যে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। তারপর তিনি স্পষ্ট-প্রাঞ্জল ভাষায় খুলে ব'লে দিলেন রাত্তিরে তিনি কী-কী তথ্য জেনেছেন।

যে-কোনো কারণেই হোক, হঠাৎ জর্জ ব্লেজনের লোকেরা হ্যারি কিলারের নিয়ন্ত্রণে আসার পর চারপাশে কীভাবে নিপীড়ন লাঞ্ছনার ঝড় তুলেছিলো; এইসব খুনজখম রাহাজানি লুঠতরাজের জন্যে হ্যারি কিলারকেই কীভাবে দায়ী করা যায়; বারজাক মিশনের অভিযাত্রীদের ধ'রে এনে কীভাবে বন্দী ক'রে রেখে হুমকি দেয়া হচ্ছে সারাক্ষণ; জেন ব্লেজনের প্রতি কী নিদারুণ নিপীড়ন চালানো হচ্ছে; আর শেষ পর্যন্ত—ঐ হত্যা, নিষ্ঠুর এবং অন্যায়, দুজন নিগ্রোকে কীভাবে ঠাণ্ডামাথায় খুন করেছে হ্যারি কিলার—*সব*, সব তিনি শ্রোতাদের জানালেন। কাল রাতে যা-যা তথ্য তিনি জেনেছেন, তার একটা খুঁটিনাটিও বাদ দেননি।

তা থেকে এটাই স্পষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে যে তাঁরা সবাই *না-জেনে* এক নির্মম দস্যুর হ'য়ে কাজ ক'রে যাচ্ছেন—এবং কারখানার সব কাজই ঐ দস্যু তার স্বৈরাচার কায়েম রাখার জন্যে আরো-সব ভয়ংকর দুষ্ক্রিয়ার কাজে লাগাবার জন্য করাচ্ছে। এ-রকম অবস্থা কিছুতেই চলতে যেতে-দেয়া পারে না, আর যদি কারু মধ্যে বিন্দুমাত্র আত্মসম্মানের বোধ থাকে, তাহ'লে হ্যারি কিলার যাঁদের জোর ক'রে ধ'রে রেখেছিলো, তাঁদের কাউকেই তার হাতে ফিরিয়ে দেয়া চলে না। তাহ'লে এটাই মোদ্দা-ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে যে এই মুহূর্তেই কারখানাকে রাজভবনের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে দিতে হবে—আর একজন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন ক'রে সবাইকেই সমস্ত ক্ষতিপূরণ সমেত নিরাপদ স্থানে ফিরিয়ে দেবার দাবি জানাতে হবে।

পিন-পড়া স্তব্ধতার মধ্যেই কর্মীরা সবাই কামারের বৃত্তান্ত শুনে প্রথমে স্তম্ভিত হ'য়ে গেছেন—এঁরা সবাই সৎকর্মী, এ-রকম একটা বিষম কাণ্ড যে চলেছে এ-সম্বন্ধে কোনো ধারণাই কারু ছিলো না। উত্তেজনা একটু কমলে পরে সকলেই একবাক্যে কামারের সমস্ত সিদ্ধান্তে সায় দিলেন। যে-পরিচালককে কর্মীরা সবাই এমন শ্রদ্ধাসম্মান করে, তাঁর কথায় কোনো আপত্তি তোলবার কথা কেউই স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না।

তিনি যে-সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন, তার কারণ মার্সেল কামারে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে তাঁর শ্রোতাদের কল্পনাকে স্পর্শ ক'রে গেছে : 'কাল রাতে আমি যত অবিশ্বাস্য তথ্য জেনেছি, তার মধ্যে যেটা আমাকে সবচেয়ে তাজ্জব করেছে সেটা এই : ইওরোপে নাকি কেউই এই শহরটার অস্তিত্বের কথাই জানে না হ্যারি কিলার যার নাম দিয়েছে ব্ল্যাকল্যাণ্ড। এটা আমি জানি যে এই শহরটা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ক্যারাভানের বহর যেখান দিয়ে তার চাইতে অনেক দূরে—একেবারে মরুভূমির বুকের মাঝখানে, যেখানে কেউই কোনোদিন ভুলেও পা দেয় না—আর তার একটা মস্ত কারণও ছিলো।

'কিন্তু এটাও আমরা জানি যে আমাদের কর্মী ও সাথীদের কেউ-কেউ এখানে কিছুকাল কাটাবার পর দেশের টানে এতটাই ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছিলেন যে তাঁরা সবাই যে-যাঁর দেশে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। আমি কাল রাতে হিশেব ক'রে দেখেছি এ-রকম প্রাক্তন কর্মী কতজন। কাজ শুরু করার পর থেকে সবশুদ্ধু একশোসাঁইত্রিশজন কর্মী আমাদের এখান থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁদের দু-চারজনও যদি দেশে গিয়ে পৌঁছুতেন, তাহ'লেই ইওরোপের কারু কাছে এই শহরটার কথা অগোচর থাকতো না। কিন্তু ইওরোপে কেউ যেহেতু ব্ল্যাকল্যাণ্ডের নামই শোনেনি, তাতে বোঝা যায় ঐ একশো-সাঁইত্রিশজনের কেউই আজ অব্দি তাঁদের গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছোননি।'

সমবেত কর্মীদের সবাই যেন দম আটকে আছে : এই অকাট্য যুক্তির সামনে তারা সবাই স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে।

'আর তার ফলে এটাও বোঝা যায় তোমাদেরও কেউই আর-কোনোদিন এই দুরাশা করতে পারবে না যে একদিন কাজ শেষ ক'রে স্বদেশে ফিরে যাবে, অন্তত যতদিন সব ক্ষমতা হ্যারি কিলারের হাতে আছে, ততদিন নয়। আমরা যদি একবার তার কবলে গিয়ে পড়ি, তবে তার সেই খপ্পর থেকে বেরুবার কোনো আশাই আর থাকবে না আমাদের। আমাদের নিজেদের স্বার্থে, আর সুবিচারের স্বার্থেও, হ্যারি কিলারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে আমাদের গ'র্জে-ওঠা উচিত।'

'হ্যাঁ... হ্যাঁ... !... আপনি আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন,' চার পাশ থেকেই এই একই সাড়া উঠলো।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্সেল কামারের ওপর তাদের অগাধ আস্থা। প্রথমে, সারা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছে শুনে তারা কেমন মোহ্যমান হ'য়ে পড়েছিলো, কিন্তু এই প্রকৌশলী ও বৈজ্ঞানিকের কথা শুনতে-শুনতেই তারা আবার তাদের সাহস ফিরে পেয়েছে; মার্সেল কামারে যখন সঙ্গে আছেন, তখন আর ভয় কী। এই অগাধ আস্থার নিদর্শন হিশেবেই তাদের সকলের বজ্রমুঠি ওপরে উঠলো।

'কাজ চলুক, প্রতিদিনকার মতোই, যেমন চলছিলো। আমার ওপর তোমরা নির্ভর রেখো,' ব'লে সকলের আশা ও উল্লাসের কোলাহলের মধ্য দিয়ে মার্সেল কামারে ওয়ার্কশপ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ওয়ার্কশপ থেকে বেরিয়ে গিয়ে কয়েক মিনিট তিনি তাঁর ফোরম্যানের সঙ্গে কাটালেন—তাকেই তিনি *রিগো* ব'লে ডেকেছিলেন। পরে, রিগো যখন তার নির্দেশগুলো নিয়ে চ'লে গেলো, কামারে ফিরে এলেন তাঁর নিজের পড়ার ঘরে এবং তাঁর আশ্রিতরাও তাঁর পেছন-পেছন সে-ঘরে এসে ঢুকলেন।

আর ঢোকবামাত্র, ঝনঝন ক'রে টেলিফোন বেজে উঠলো। রীসিভারটা তুলে নিলেন মার্সেল কামারে, আর অন্যরা শুনতে পেলেন তিনি মৃদুস্বরে কেবল 'হুঁ-হুঁ,' 'হ্যাঁ,' 'না,' 'বেশ,' 'যা আপনার ইচ্ছে' এইসব কথাই ব'লে চলেছেন, উত্তরে। শেষে তিনি হো-হো ক'রে হেসে উঠে রীসিভার নামিয়ে রাখলেন।

'হ্যারি কিলার ফোন করেছিলো,' বেশ-নিরাসক্ত গলাতেই বললেন মার্সেল কামারে, 'সে জানে আপনারা এখানে আছেন।'

'এর মধ্যেই?!' অস্ফুটস্বরে বিস্ময় ব্যক্ত করেছেন বারজাক।

'হ্যাঁ, ৎশুমুকি নামে কাকে যেন সে পেয়েছে। একটা নৌকো নদীর মাথায় প'ড়ে থাকতে দেখেছে, আর দেখেছে ৎশুমুকির মতোই আরো-একজন শান্ত্রীকে কারা যেন বেঁধে রেখে গেছে। যেহেতু তার অজ্ঞাতসারে কারু পক্ষেই রাত্তিরে এ-শহর ছেড়ে কোথাও চ'লে যাবার জো নেই, সে তাই ধ'রেই নিয়েছে আপনারা এখানে আছেন। আমি তা অস্বীকার করিনি। তারপর সে বলেছে আপনাদেরকে তার হাতে তুলে দিতে। আমি তাতে রাজি হইনি। সে বড্ড চাপ দেবার চেষ্টা করেছিলো, আমি আবারও তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি। তাতে সে প্রচণ্ড খেপে যায়। শাসিয়ে বলে, সে নিজেই এসে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে আপনাদের। তাতে আমার হাসি পেয়ে গেছে, আমি টেলিফোনের লাইনটা কেটে দিয়েছি।'

অন্যরা, একসঙ্গে, উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে।

'এটা বলবার দরকার নেই, যে আপনি আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন,' সকলের হ'য়েই বারজাক তাঁদের মনের কথা জানালেন। 'কিন্তু আমাদের যে কিছু অস্ত্রশস্ত্র চাই...'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অস্ত্রশস্ত্র ?...' কামারে মৃদুভাবে হেসে উঠলেন। 'অস্ত্রশস্ত্র কিসের জন্যে ?... এখানে কোনো অস্ত্রশস্ত্র আছে ব'লেও আমার মনে হয় না। তবে আপনারা তা ব'লে ঘাবড়ে যাবেন না। আমাদের হাতে অন্য উপায় আছে।'

'রাজভবনের গোলাবন্দুক ঠেকাবার মতো উপায় ?'

'তাও আছে, তাছাড়াও অনেক-কিছু আছে। আমার যদি কখনও ইচ্ছে হয় শহরটা ধ্বংস ক'রে দিই, তাহ'লে আমি তা একনিমেষে ক'রে ফেলতে পারি। তবে আমার মনে হয় না আমাদের ও-রকম চূড়ান্ত-কিছু করতে হবে। রাজভবনের কামান-বন্দুক চুপ ক'রেই থাকবে—এ-ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিন্তই থাকতে পারেন।

'কিলার যে শুধু আমার ক্ষমতা সম্বন্ধেই ওয়াকিবহাল তা নয়, সে এও জানে যে তার গোলাবারুদ এই কারখানার গায়ে আঁচড়টুকুও কাটতে পারবে না, এ-কারখানা *শেল-প্রুফ*। তাছাড়া এটাকে সে খামকা ধ্বংসও করতে চাইবে না, কেননা সে জানে তার সব শক্তির উৎসই হচ্ছে এই কারখানা। সে বরং তার গোয়েন্দা বা সেপাইশান্ত্রী পাঠিয়ে আপনাদের ধ'রে নিয়ে যেতে চাইবে। তবে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, তা সে পারবে না।'

যেন তাঁর এই ঘোষণার জবাবেই নিচে দরজার কাছ থেকে দুম-দুম ধাক্কার শব্দ এলো।

'কী বললুম আপনাদের ?' মৃদু হেসে বললেন বৈজ্ঞানিক। 'ওরা এসে দরজাটার ওপর হামলা চালাচ্ছে। তবে এই আশ্বাস দিতে পারি যে এই নিরেট দরজাটা এতই পুরু যে ওদের শত ধাক্কাধাক্কিতেও কিছু হবে না।'

'কিন্তু যদি একটা কামান এনে ওরা ঠেলা লাগায় দরজায় ?' বৈজ্ঞানিকের প্রশান্ত মুখচ্ছবি দেখেও বারজাক ততটা আশ্বস্ত হ'তে পারেননি।

'তাহ'লেও দরজাটা ভেঙে ফেলা ততটা সহজসাধ্য হবে না। কিন্তু রাজভবনের একটা কামানকে জাহাজঘাটায় এনে হাজির করতেও বেশ সময় লাগবে—আপাতত আমাদের ঐ কটা মানুষের ঠেলাঠেলি নিয়েই কারবার করতে হবে। ঘুষি কষিয়ে, লাথি মেরে ওরা একটা আস্ত শতাব্দী কাটিয়ে দিতে পারে ইচ্ছে করলে, কিন্তু তাতে ওদের কোনোই লাভ হবে না। তবু আপনারা যদি আমার সঙ্গে গিয়ে সরেজমিন তদন্ত ক'রে আসতে চান, তবে, চলুন, যাই, গিয়ে দেখে আসি হামলাটার হাল কেমন, আমার মনে হয় সে-দৃশ্য দেখে আপনাদের ভারি আমোদ হবে।'

আবার তাঁরা ফিরে গেলেন ওয়ার্কশপে, কিন্তু না-থেমে, অন্য-একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন পাশে। যন্ত্রগুলো তখন পুরোদমেই চলছে, কিন্তু কর্মীদের মধ্যে তেমন-একটা উৎসাহের ভাব দেখা যাচ্ছে না। একটা জায়গায় জড়ো হ'য়ে তারা সকালে যা শুনেছে তা-ই নিয়েই ব্যস্তভাবে আলোচনা ক'রে চলেছে, এবং ওয়ার্কশপে সামান্য-একটু



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশৃঙ্খলারই সৃষ্টি হয়েছে, তবে কামারে সেটাকে তেমন পাত্তা দেননি।

ওয়ার্কশপ পেরিয়ে, তাঁরা একটা ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে সরাসরি একটা মিনারের প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ালেন; রাজভবনের মিনারের প্ল্যাটফর্মটার সঙ্গে এটার তফাৎ শুধু এইখানটাতেই যে এখানে প্ল্যাটফর্ম ও মিনারটা রাশি-রাশি খুঁটি দিয়ে ঘেরা—দুর্বোধ্য এই খুঁটিগুলো, কেন এখানে আছে কে জানে—এদের ডগা প্রায় একশো গজ ওপরে উঠে গিয়েছে, শূন্যে। রাজভবনের মতোই, এখানেও খুঁটিগুলোর মাঝখানে একটা *সাইক্লোস্কোপ* বসানো। কামারে সবাইকে তার ভেতরে ঢুকে পড়তে আমন্ত্রণ জানালেন।

'হ্যারি কিলারের জন্যে আমি যে-*সাইক্লোস্কোপটা* বানিয়ে দিয়েছি এটার অবশ্য তার মতো মাইল-মাইল পাল্লা নয়। তবে কারখানার দেয়ালের ওপর বাঁকাভাবে বসানো সারি-সারি আয়নার সৌজন্যে আমরা আমাদের আশপাশে কী ঘটছে, সে-সব খুব-ভালোভাবেই দেখতে পারি। এখান থেকে আশপাশের দেয়ালের বাইরের দিকটায় কী হচ্ছে না-হচ্ছে তা স্পষ্ট দেখতে পাবেন।'

*সাইক্লোস্কোপে*, বাস্তবিকই, এস্‌প্ল্যানেড, নদীর ঘাট, উপবৃত্তাকার রাস্তা—সবকিছু ছবির মতো ফুটে উঠছিলো, প্রতিচ্ছবিগুলো রাজভবনের *সাইক্লোস্কোপের* প্রতিচ্ছবিগুলোর মত অত-বড়ো না-হ'তে পারে কিন্তু তার চেয়ে অনেক-স্পষ্ট। পরকলার মধ্য দিয়ে দেখা গেলো একদল লোক, তাদের কেউ-কেউ আবার মই নিয়ে এসেছে, কারখানার দেয়ালের চারপাশে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে, আর প্রায় জনা-তিরিশ লোক কারখানার দরজাটা ভাঙবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে ক্রমেই হাঁফিয়ে উঠছে।

'হুঁ, যা ভেবেছিলুম,' কামারে বললেন, 'এরা দেখছি একটা পুরোদস্তুর হামলারই তোড়জোড় করছে! এবার তাহ'লে পুরো ব্যাপারটা দারুণ-চিত্তাকর্ষক হ'য়ে উঠবে।'

হামলাটার তোড়জোড় চলছে জোর। এরই মধ্যে কয়েকখানা মই এনে দেয়ালের গায়ে ঠেকানো হয়েছে, আর তার ওপর চড়তে শুরু করেছে বেশ ক-জন হর্ষচরিত। মইয়ের ডগায় পৌঁছে কয়েকজন কোনো সন্দেহ বিনাই দেয়ালের কিনারটা আঁকড়ে ধরেছে।

আর পরমুহূর্তেই পুরো দৃশ্যটাই বদলে গেলো। দেয়ালের ওপরটা ছুঁতে না-ছুঁতেই যন্ত্রণায় ভীষণভাবে কুঁকড়ে গেলো লোকগুলো। দেয়ালের ওপর থেকে ল্যাগব্যাগ ক'রে ঝুলছে একেকজন, যেন তাদের হাতগুলো আঠার মতো আটকে গিয়েছে দেয়ালে, আর তারা উৎকট-একটা নাচ জুড়ে দিয়েছে, যেমন ক'রে পুতুলনাচের আসরে সুতো ধ'রে কেউ ধেই-ধেই ক'রে নাচায় পুতুলদের।

'লোকগুলো ভারি হাবার মতো কাজ করেছে,' কামারে তাঁদের ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালেন। 'দেয়ালের ওপরটা পুরোপুরি এমন-একটা ধাতুর পাত দিয়ে মোড়া, যেটা আমারই এক আবিষ্কার—তামার চাইতেও আরো শতগুণ-জোরালো পরিবাহী। আমি তার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যেই একান্তর এক বিদ্যুতের ঢেউ চালিয়ে দিয়েছি, আর তার ফল কী হয়েছে, সে তো আপনারা নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন।'

তিনি যখন এই ব্যখ্যা দিচ্ছিলেন, মইয়ের নিচের ধাপে যারা ছিলো, তারা ওপরের লোকেদের ঠ্যাং ধ'রে টান দিলে, আর অমনি শুরু হ'লো তাদেরও খিঁচুনি, অঙ্গবিক্ষেপ, হুলুস্থুল নৃত্য—আর নিচে যারা দাঁড়িয়েছিলো তারা একেবারেই হতভম্ব হ'য়ে পড়লো, বেশ ভয়ও পেয়ে গেলো।

'এই খ্যাপাগুলো ছেড়ে দিচ্ছে না কেন দেয়াল, নিচে লাফিয়ে পড়ছে না কেন?' সাঁৎ-বেরাঁকে বেশ কৌতূহলীই দেখালো।

'কারণ, তারা ছাড়তে পারলে তো! আমি যতক্ষণ চাইবো, ততক্ষণ এই হতচ্ছাড়াগুলোকে দেয়ালের সঙ্গে লেপটে গিয়ে এমন বেদম নাচ নাচতে হবে... তবে আরো মজা করতে পারি আমি!' ব'লে, মার্সেল কামারে একটা বোতাম টিপে দিয়েছেন। অমনি মইগুলো নিচে প'ড়ে গেলো টালমাটাল, যেন কোনো অদৃশ্য হাত বিষম জোরে তাদের ঠেলে ফেলে দিয়েছে—আর যে-সব লোক মইটা ধ'রে ছিলো তারা উলটেপালটে ডিগবাজি খেয়ে চিৎপটাং আছড়ে পড়লো নিচে—দেয়ালের গায়ে তখনও আটকে রইলো তারা, যারা গোড়াতেই দেয়াল টপকাবে ব'লে দেয়ালের ওপরদিকে হাত দিয়েছিলো। তারা তখনও প্রাণপণে দেয়াল থেকে হাত ছাড়াবার জন্যে আকুলব্যাকুল চেষ্টা ক'রে চলেছে।

কামারে খুব-নরমসুরে বললেন, 'কারু ক্ষয়ক্ষতির জন্যে আমি কিন্তু দায়ী নই। নিজের চোখেই তো দেখতে পেলেন আপনারা—আমি কি কাউকে একবারও ছোঁবার চেষ্টা করেছি? জানতে চান, কেমন ক'রে ব্যাপারটা হ'লো?

'আসলে ব্যাপারটা খুবই সহজ। আমার মতে, শক্তি—তার প্রকৃতি বা ধাত যা-ই হোক না কেন—শক্তি শুধু কতগুলো দোল বা কম্পনেরই সমষ্টি—ইথারের মধ্যে তারা অন্যরকম শিহরন তৈরি ক'রে দেয়। মোটামুটিভাবে সবাই এখন মেনে নিয়েছে যে আলোকরশ্মি শুধু-একটা বিশেষ মাত্রায় প্রবাহিত হওয়া তরঙ্গদৈর্ঘ্য—আর বিদ্যুতের তরঙ্গদৈর্ঘ্য আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা—শিহরনের বা কম্পনের স্তরেরও একটা মস্ত তারতম্য আছে এই দুয়ের মধ্যে। নিশ্চয়ই এদের দুয়েরই সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে উত্তাপেরও সম্পর্ক আছে। আমি এই বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং বিভিন্ন কম্পনস্রোত তৈরি করতে পারি, আর তাতে যা আশ্চর্য কাণ্ড হয় তার একটু নমুনা তো এইমাত্তর আপনাদের দেখিয়ে দিলুম।'

এই ব্যাখ্যানার সময় সেই কিম্ভূতকিমাকার নাচ কিন্তু সমানে চলেছে—মাটি থেকে অনেকটাই ওপরে।

'নাঃ, এই তুচ্ছ খেলাটা বড্ড-বেশি সময় ধ'রে চলেছে,' ব'লে, মার্সেল কামারে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরেকটা বোতাম টিপে দিলেন।

তক্ষুনি ব্যাঙ-তড়কা-খাওয়া মনুষ্যশরীরগুলো ধুপধাপ ক'রে তিরিশ ফিট নিচে মাটিতে এসে আছড়ে পড়েছে—আর প'ড়েই থেকেছে চিৎপটাং, নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু। একটু ইতস্তত ক'রে তাদের সাথীরা এসে তাদের চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে গেছে।

'প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি,' কামারে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মৃদু স্বরে বললেন, 'প্রথম অঙ্কটা অবশ্য খলনায়ক হ্যারি কিলারের ভালো কাটেনি। এরইমধ্যে ওর তিরিশ-পঁয়ত্রিশজন চেলা অকর্মণ্য হ'য়ে পড়েছে। এবার তাহ'লে ঐ-যে হাবাগুলো দরজাটার ওপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের একটু মজা দেখাবো ?' ব'লেই, একটা টেলিফোন তুলে নিয়ে জিগেস করলেন, 'তুমি তৈরি আছো তো, রিগো?'

'হ্যাঁ,' আর *সাইক্লোস্কোপের* সবখানেই তার উত্তরটা শোনা গেলো।

'তাহ'লে পাঠিয়ে দাও !' কামারে হুকুম দিলেন।

অমনি, অদ্ভুত দেখতে একটা যন্ত্র, *তখুনি* মিনারের তলাটা থেকে বেরিয়ে এসে স'রে গেলো। অদ্ভুত-একটা খাড়া গোলক, লম্বমান, বেলনের মতো দেখতে, যেদিকটা মাটির দিকে আছে, সেটা বিশাল একটা শঙ্কুর মতো দেখতে হ'য়ে গেলো।

অন্যদিকটায় আছে চারটে খুদে চাকা, একটা শোয়ানো, অন্যগুলো খাড়া, তারা বনবন ক'রে, চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে, পাক খাচ্ছে। এই অদ্ভুত যন্ত্র মুহূর্তে ভুউশ ক'রে গিয়ে উঠেছে আকাশে, বাইরের দেয়াল থেকে অনেকটাই স'রে গেছে। বেশ-কয়েক গজ উঁচুতে উঠে গিয়ে সেটা চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়লো যেন, আর কারখানার সীমা অনুসরণ ক'রে ছুটলো।

এই প্রথম যন্ত্রটার পর-পরই বেরিয়ে এসেছে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, এবং আরো অনেকগুলো। কামারের অতিথিরা সবশুদ্ধু কুড়িটা গুনেছেন। তারা পর-পর বেরিয়ে এসেছে মিনারের তলা থেকে, যেন পাখির বাসা থেকে একটার পর একটা পাখি বেরুচ্ছে, আর সকলেই একইভাবে শূন্যে উঠে গিয়েই চিৎ হ'য়ে শুয়েছে হাওয়ায়। আর প্রথম যন্ত্রটাকে অনুসরণ ক'রে গেছে, পেছন-পেছন।

'এরা হ'লো আমার *বোলতা*,' মার্সেল কামারে বোলতা এবং আমার এই দুটো কথারই ওপর বড্ড-বেশি ঝোঁক দিলেন। 'পরে আপনাদের বলবো, এগুলোকে কেমনভাবে চালায়। আপাতত শুধু দেখে যান এরা কেমনভাবে কাজ করে।'

আবারও টেলিফোন তুলে নিয়ে তিনি বলেছেন, 'রিগো, একটা হুঁশিয়ারি দিয়ে দাও !'

তারপর নতুন বন্ধুদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেছেন, 'খামকা এই বেচারাগুলোকে আমি মারতে যাবো কেন, বলুন ? এরা তো আর আমার সঙ্গে কিছু করেনি। একটা শুধু ধমক দিয়ে দেখছি, এই হুঁশিয়ারিতে যদি এদের টনক নড়ে।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হানাদারদের অবস্থা ততক্ষণে বেশ-সঙিন। অত ওপর থেকে আছাড় খেয়ে প'ড়ে কেউ-কেউ নির্ঘাৎ টেঁশেই গেছে, অন্যদেরও জখম এতটা যে তাদের চ্যাংদোলা ক'রে ধ'রে নিয়ে যেতে হয়েছে। তারপর সবাই উপবৃত্তাকার রাস্তাটা ছেড়ে গিয়ে জড়ো হয়েছে এসপ্ল্যানেডে, কারখানা থেকে একটা সসম্ভ্রম-দূরত্ব বজায় রেখেই, আর বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে আছে তার দেয়ালের দিকে।

তবে দরজায় যারা ধাক্কাধাক্কি করছিলো, তারা তাদের কাজ থামায়নি, বরং কতগুলো মোটা-মোটা থাম এনে কুড়িজনে মিলে ধ'রে দুমদাম ক'রে ঠেলছে দরজাটা—তাতে দরজা অবশ্য একচুলও নড়েনি বা টলেনি। কারখানার চৌহদ্দিটায় পাক খেয়ে *বোলতারা* এই দলটার ওপর দিয়ে ভোঁ-ভোঁ ক'রে পর-পর উড়ে গেছে। এই দলটা তাদের দিকে দৃকপাতও করেনি।

হঠাৎ একটা *বোলতার* মধ্য থেকে বিষম-একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ ফেটে পড়েছে, আর প্রায় একশোগজ জমি ঘিরে পর-পর ছুটে গিয়েছে মেশিনগানের গুলি।

বিস্ফোরণের আওয়াজটা শুনে যারা দরজা ঠেলছিলো তারা মুখ তুলে তাকিয়েছে ওপরে। কোত্থেকে যে আওয়াজটা এসেছে, তা তারা তখনও ধরতে পারেনি। এমন সময় আরেকটা *বোলতা* ভোঁ ক'রে উড়ে এসেছে তাদের কাছে, আর অমনি আরেকটা বিস্ফোরণের আওয়াজ, এবং প্রথমটারই মতো আবারও মেশিনগানের গুলির বর্ষণ।

এবার গুলিগোলা কাছেই পড়েছে, কয়েকজনের গায়েও লেগেছে। অন্যরা আর অপেক্ষা করেনি। ঐ মোটা গাছের গুঁড়িটা ফেলে রেখেই আহতদের তুলে নিয়ে ভোঁ-দৌড় দিয়ে প্রাণপণে ছুটে পালিয়েছে সেখান থেকে।

বারজাকরা যেন নিজের চোখকেই আর বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। প্রত্যেকটি *বোলতা*, গুলিগোলা ছুঁড়ে, দিব্বি শান্তশিষ্ট, বাধ্য, পোষা *বোলতার* মতোই ফিরে এসেছে তাদের পাখির বাসায়, মিনারের ঠিক তলাটায়। তারপর আবার ভেতরে গুলিগোলা পুরে সেই চক্রটার মধ্যে ফিরে গিয়েছে যে যার নিজের জায়গায়।

'আমার মনে হয় না এদের নিয়ে আর আমাদের মাথা ঘামাতে হবে,' বলেছেন মার্সেল কামারে, 'এখন বরং চলুন, কারখানাটা একবার ঘুরে দেখবেন...'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত

## ব্ল্যাকল্যাণ্ড কারখানা

তাঁর অতিথিরা আমন্ত্রণটা গ্রহণ করবার জন্যে পা বাড়িয়েই ছিলেন।

'কারখানাটা ঘুরে দেখে আবার আমরা এখানে ফিরে আসবো,' কামারে জানিয়েছেন। 'তবে প্রথমে সাধারণভাবে এর ছকটা একটু খেয়াল করুন। পুরো কারখানাটা নদীর ধারে আড়াইশো গজ চওড়া আর তিনশো ষাট গজ লম্বা একটা আয়তক্ষেত্রের ওপর গ'ড়ে উঠেছে। মোটামুটি কুড়ি একর আয়তন; এই পুরো আয়তক্ষেত্রের তিনপঞ্চমাংশ জুড়ে পশ্চিমভাগটায় গ'ড়ে উঠেছে বাগান।'

'বাগান কেন?' জানতে চেয়েছেন আমোদ ফ্লরেঁস।

'এরা আমাদের আংশিকভাবে খাদ্য জোগায়, বাকিটা আসে বাইরে থেকে। কাজেই শুধু বাকি অংশটাকে জুড়েই—প্রায় একশো গজ চওড়া, প্রবেশপথটা নদীর ঘাটে—গ'ড়ে উঠেছে আসল কারখানাটা। ঠিক তার মাঝখানে, ঐ মিনারটার তলায়, লম্বায় প্রায় আড়াইশো গজ জায়গা নিয়ে গ'ড়ে উঠেছে ওয়ার্কশপগুলো, আর আমার থাকবার আস্তানা। তার দুই প্রান্তে প্রায় ষাট গজ চওড়া একটা রাস্তা গেছে—সোজা নদীর ধারটাকে লক্ষ্য ক'রে, আর রাস্তার দু-পাশে কর্মীদের কোয়ার্টারগুলো। একেকটা সারে সাতটা ক'রে দালান, চারতলা উঁচু—অর্থাৎ সাকুল্যে একশো কুড়িটা কোয়ার্টার।'

'আপনার এখানে কর্মীর সংখ্যা কত?' বারজাকের জিজ্ঞাসা।

'ঠিক একশোজন কাজ ক'রে এখানে, তবে কেউ-কেউ বিয়ে করেছে, আর তাদের কারু-কারু ছেলেমেয়েও আছে। দেখতেই তো পাচ্ছেন ওয়ার্কশপগুলো একতলা সমান উঁচু আর তাদের ছাতের ওপর মাটি বসানো আছে—তাতে ঘাস আছে ফরাশের মতো। মাটির আস্তরটা খুব-পুরু। ফলে, বুঝতেই পারছেন, গুলিগোলা তাদের প্রায় কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। এবার মোটামুটি ছকটা তো জেনে গেলেন, এখন আপনারা যদি চান তো নিচে নেমে গিয়ে খুঁটিনাটিগুলো চাক্ষুষ দেখে-আসা যেতে পারে।'

আমন্ত্রণটা গ্রহণ করবার আগে কামারের শ্রোতারা আবার একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছেন আশপাশে। অবস্থার আর-কোনো বদল হয়নি। *বোলতাগুলো* এখনও চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে সার্কুলার রোডের ওপর, আর হানাদারেরা, ও-রকম নাজেহাল অভিজ্ঞতার পর, আবার সেই গুলিগোলার মধ্যে ঢুকে পড়তে সাহস পাচ্ছে না। আশ্বস্ত হ'য়ে, বারজাক মিশন বৈজ্ঞানিককে অনুসরণ ক'রে প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে এলো।

মার্সেল কামারের নেতৃত্বে তাঁরা প্রথমে ঘুরে দেখেছেন মিনারের তলদেশ,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈজ্ঞানিক যাকে বলেছেন *মৌচাক*, সেখান থেকে, খোপের পর মধ্য থেকে, বেরিয়ে এসেছে বোলতারা; খোপগুলোর মধ্যে স্তূপ ক'রে রাখা আছে অজস্র গোলাবারুদ। তারপর তাঁরা গেছেন নানাধরনের ওয়ার্কশপে—আর সে-সব দেখে ক্রমাগত বিস্মিত হ'তে-হ'তে তারা এসে পৌঁছেছেন বাগানে, রাজভবন থেকে সবচেয়ে-কাছে এ-জায়গাটা।

কারখানার চারপাশের উঁচু দেয়াল রাজভবনকে অবশ্য তাঁদের চোখ থেকে আড়াল ক'রে রেখেছে। কিন্তু দেয়ালটা থেকে পঞ্চাশ গজ স'রে আসতেই হ্যারি কিলারের মিনারটার গম্বুজ চোখে পড়েছে তাঁদের। আর তক্ষুনি ঐ মিনার থেকে ছুটে এসেছে গুলি, তাঁদের মাথার ওপর দিয়ে চ'লে গেছে। অমনি তাঁরা দ্রুতবেগে পেছিয়ে এসেছেন।

'গাড়ল ! আকাট !...' কামারে অস্ফুটস্বরে নিজেকে বলেছেন, তারপর না-থেমেই তিনি শুধু তাঁর হাতটা তুলে ধরেছেন শূন্যে।

আর ইঙ্গিতটার পরক্ষণেই এলো হিংস্র-একটা হিসহিস শব্দ। তাঁর অতিথিরা কেমন আঁৎকে উঠে তাকিয়েছেন, কারখানার দিকে, কামারে কিন্তু রাজভবনের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন। রাজভবনের মাথায় মুকুটের মতো যে-*সাইক্লোস্কোপটা* শোভা পেতো, সেটা আর নেই।

'এটা থেকেই মজা টের পাবে হ্যারি কিলার,' বৈজ্ঞানিক ব'লে উঠেছেন। '*উড়াল-টরপেডো* আমার আছে ! ওর কাছে যতগুলো আছে, আমার কাছে বরং তার চাইতে অনেক-বেশিই আছে—কেননা আমিই তাদের উদ্ভাবন করেছি। আর ঐ *সাইক্লোস্কোপ* —দরকার হ'লে আমি না-হয় ওকে আরেকটা বানিয়ে দেবো। ব্যাস !'

'কিন্তু মঁসিয়,' আমেদে ফ্লরেঁস জিগেস করেছেন, 'আপনি যাকে *উড়াল-টরপেডো* বলেন আপনার কাছে যেহেতু সেগুলো প্রচুর পরিমাণেই আছে, আপনি সেগুলো হ্যারি কিলারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছেন না কেন ?'

মঁসিয় কামারে একটুক্ষণ শুধু বিহ্বলভাবে প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন, তাঁর চোখে একটা বিমূঢ় দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। 'আমি !...' শেষকালে তিনি কী-রকম যান্ত্রিকসুরে ব'লে উঠেছেন, 'আমি কিনা শেষে নিজের সৃষ্টিকেই ধ্বংস ক'রে বসবো !'

কথাটা আর না-বাড়িয়ে আমেদে ফ্লরেঁস শুধু তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করেছেন। বিজ্ঞানের সেরা প্রতিভা হ'তে পারেন, কিন্তু আশ্চর্য মানুষটার একটা মস্ত-বড়ো দুর্বলতা আছে, আর তাঁর সেই *আকিলিসগোড়ালি* হ'লো তাঁর অহমিকা, তাঁর আকাশছোঁয়া দম্ভ।

চুপচাপ তাঁরা হেঁটে গিয়েছেন তারপর, রাজভবন *মজাটা টের* পেয়েছে। বাগান দিয়ে তাঁরা যতক্ষণ হেঁটে গিয়েছেন, রাজভবন থেকে আর-কোনো আক্রমণ আসেনি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ একটা দরজা খুলে দিয়ে মার্সেল কামারে ব'লে উঠেছেন : 'এবারে আমরা সবচেয়ে-দুর্দান্ত জায়গায় এসে পড়েছি। এটা ছিলো শক্তির উৎস, কারখানার সমস্ত শক্তি আসতো এখান থেকে—মোটর, আর স্টীমএনজিন আর বয়লার সব ছিলো এখানে, অন্যকোনো জ্বালানি ছিলো না ব'লে আমরা কাঠের আগুন ব্যবহার করতুম। মস্ত ঝামেলার ব্যাপার ছিলো সেটা, কেননা কাঠ আনতে হ'তো অনেকদূর থেকে, আর বেশ বেশি পরিমাণেই ঐ জ্বালানি ব্যবহার করতে হ'তো আমাদের। ভাগ্যিশ ও-অবস্থায় আর বেশিদিন কাটাতে হয়নি ! যে-মুহূর্তে আমারই সৃষ্টি-করা মুষলধারে বৃষ্টিতে নদীটা তার খাতের মধ্যে ফুলে-ফেঁপে উঠে বইতে শুরু করলো, তখন থেকেই *হাইড্রো-ইলেকট্রিক* স্টেশনটা কাজ করতে শুরু ক'রে দিলো ; আমি ততদিনে অন্তত ছ-মাইল জোড়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র বসিয়ে দিয়েছি। এখন আর আমাদের ঐ সেকেলে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয় না, আর ঐ চোঙগুলো দিয়েই সারাক্ষণ ভলকে-ভলকে ধোঁয়া বেরিয়ে আকাশ কালো ক'রে রাখে না। এই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র থেকে যত বিদ্যুৎ আসে, তাতেই আমাদের দিব্বি চ'লে যায় এখন।'

তাঁরা আরো-একটা ঘরে মার্সেল কামারেকে অনুসরণ ক'রে গেছেন।

'এখানে, আর তারপরের ঘরগুলো—ওগুলোও এ-ঘরটারই মতো ডায়নামো, অলটারনেটর, ট্র্যান্সফর্মার আর কয়েল দিয়ে ভর্তি—এটাই হ'লো বজ্রবিদ্যুতের আস্তর। জলবিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে যত বিজলি আসে এখানেই আমরা দরকারমতো তাকে বিভিন্ন ভোল্টে বদলে নিই।'

'অ্যাঁ ?' আমেদে ফ্লরেঁস স্তম্ভিত হ'য়ে ব'লে উঠেছেন, 'এত-সব যন্ত্রপাতি কলকব্জা —সব আপনারা মরুভূমিতে আনিয়ে নিয়েছেন !'

'মাত্র কয়েকটাই আনিয়েছি। বেশির ভাগই তো আমরা এখানে বানিয়ে নিয়েছি।'

'তবু, কাঁচা মাল দরকার হয়েছে তো আপনাদের। এই মরুভূমির মাঝখানে সে-সব আপনারা পেলেন কোত্থেকে ?'

মার্সেল কামারে হঠাৎ একটু যে ভাবনাতেই প'ড়ে গেছেন। সত্যি-তো, এই মরুভূমির মাঝখানে এত-সব পাওয়াই বা গেলো কোত্থেকে ? এটা তো কোনোদিনই তাঁর মাথায় আসেনি। 'হুম, আপনি ঠিকই বলেছেন, মঁসিয় ফ্লরেঁস। প্রথম যন্ত্রপাতিগুলো এখানে এসেছিলো কী ক'রে, তাছাড়া অন্যগুলো বানাতে যে-কাঁচা মাল লেগেছিলো, তা-ই বা আমরা কোত্থেকে পেয়েছিলুম ? আজ কবুল করি, সে-সব প্রশ্ন নিয়ে আমি কোনোদিনই মাথা ঘামাইনি : আমি শুধু জিনিশগুলো চেয়েছি, ক-দিন বাদেই সে-সব হাতে পেয়ে গেছি। কোত্থেকে, কীভাবে এলো, সে-সব তলিয়ে দেখিনি। এখন যখন আপনি এ-বিষয়টায় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন...'

'আর লোকজনকেও বা কত কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে, মরুভূমির মধ্য দিয়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওগুলোকে ব'য়ে আনতে—যতক্ষণ-না আপনারা হেলিবিমান বানিয়ে নিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, সেও সত্যি,' স্বীকার করেছেন কামারে। তাঁকে কী-রকম বিবর্ণ দেখাচ্ছে।

'আর, টাকা? এ-সব কিনতে নিশ্চয়ই কাঁড়ি-কাঁড়ি নগদ টাকা লেগেছে!'

'টাকা?' কামারে কেমন ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়েছেন।

'হ্যাঁ, টাকা। আপনি নিশ্চয়ই রাজা-বাদশার ধনসম্পত্তি পেয়েছিলেন!'

'*আমি?... রাজা-বাদশার ধনসম্পত্তি?...* উঁহু, এখানে যখন এসেছি, তখন আমার পকেটে পাঁচ সেনটাইমও ছিলো কি না সন্দেহ!'

'তাহ'লে?'

'সবই হ্যারি কিলার...' কেমন যেন থতমত-সুরে শুরু করেছেন কামারে।

'হ্যাঁ, না-হয় হ্যারি কিলারই দিয়েছে, কিন্তু সে ঐ টাকা পেলো কোত্থেকে? সে কি কোনো ধনকুবের ক্রোড়পতি না কি—আপনার এই হ্যারি কিলার?'

কামারে কেমন অসহায়ভাবে হাত উলটে নিজের অজ্ঞতা কবুল করেছেন। এই প্রশ্নটা আচমকা যেন তাঁকে একেবারেই পেড়ে ফেলেছে, আর আবার তাঁর চোখে ফুটে উঠেছে সেই অদ্ভুত শূন্যদৃষ্টি, যেন তিনি কোনো মরলোকের জীবই নন। এ-সব প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর যা হ'তে পারে, তা তাঁকে যেন দুম ক'রে হঠাৎ রূঢ় ক্রূর বাস্তবের মুখোমুখি ক'রে দিয়েছে। এমনতর কোনো হেঁয়ালির জট তাঁকে কোনোদিনও ছাড়াতে হয়নি। তাঁর সামনে এখন এমন-একটা দিগন্ত উন্মোচিত হ'য়ে গেছে, তার সামনে তিনি কেমন যেন বিহ্বল বোধ করেছেন, অসহায়। এমন ব্যাকুল, কাতর, নিঃস্ব, নিঃসহায় দেখাচ্ছিলো তাঁকে যে শেষটায় ডাক্তার শাতোনের মনে সহানুভূতির বান ডেকে গেছে। 'এই ব্যাপারগুলো না-হয় অন্য-সব জটিল প্রশ্নের সঙ্গেই পরে মীমাংসা ক'রে নেয়া যাবে,' ডাক্তার শাতোনে বলেছেন, 'এ নিয়ে এখন সারাদিন মাথা ঘামাবার কোনোই দরকার নেই। বরং কারখানাটাই ভালো ক'রে দেখে নেয়া যাক।'

যেন মাথার মধ্য থেকে উৎকট-একটা চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছেন কামারে। চুপচাপ গিয়ে পরের ঘরটায় ঢুকেছেন। 'এখানে,' এখনও তাঁর গলায় কেমন-একটা দ্বিধাকাতরতা। 'এখানে এই-যে সব কলকব্জা দেখছেন, এগুলো হ'লো *কম্প্রেসার*। আমরা এখানে তরল গ্যাস নিয়ে কারবার করি। আপনারা হয়তো জানেন যে, সব গ্যাসকেই তরল ক'রে নেয়া যায়—অন্তত যতক্ষণ তাকে যথাসম্ভব সংকুচিত ক'রে রাখা যায় আর তাপমাত্রা খুব-নিচু থাকে। কিন্তু যে-মুহূর্তে এই তরলকে নিজের মর্জিমাফিক চলতে দেয়া যায়, সে গরম হ'য়ে ওঠে, আর আগের মতোই ফের গ্যাস হ'য়ে ওঠবার চেষ্টা ক'রে। তখন তারা যদি কোনো চারপাশ-আটকানো পাত্রের মধ্যে থাকে, সেটাকে ফাটিয়ে চুরমার ক'রে দিয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে।

'আমার একটা উদ্ভাবন সে-সমস্তকেই বদলে দিয়েছে। বস্তুত আমি এমন-একটা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদার্থ আবিষ্কার করেছি যেটা সম্পূর্ণ *অ্যান্টিডায়াথার্মিক*—উত্তাপের সংস্পর্শে এলে তার কিছুই হয় না। তার ফলে, কোনো তরল গ্যাস—ধরুন হাওয়া—এই পদার্থের তৈরি কোনো কৌটোয় যদি থাকে, তাহ'লে ককখনো আর তাপমাত্রার বদল হবে না—সবসময়েই তার তাপ একই থাকবে। কাজেই সে তরলই থেকে যায়, বিস্ফোরকের মতো ফেটে পড়বার সম্ভাবনা আর থাকে না। এই উদ্ভাবনটা আমাকে পরে অন্য-কতগুলো উদ্ভাবনের ব্যাপারে দারুণ সাহায্য করেছিলো—এটা থেকেই বাকিগুলো গজিয়েছে। বিশেষ ক'রে ঐ দূরপাল্লার হেলিবিমানগুলো, যাদের কথা আপনারা জানেন।'

'আমরা জানি!' আমেদে ফ্লরেঁস বুঝি আর্তনাদই ক'রে উঠেছেন। 'জানি, মানে হাড়ে-হাড়ে জানি! তাহ'লে ঐ হেলিবিমানগুলো আপনিই বানিয়েছেন!'

'কে বানিয়েছে ব'লে ভেবেছিলেন আপনি?' উলটে প্রশ্ন করেছেন কামারে—আবারও তাঁর তীব্র অহংকারের বোধ ফিরে এসেছে। কিন্তু পরক্ষণেই অবশ্য তাঁর কথায় কোনো মানবিক বোধেরই ছাপ থাকেনি, নিরাসক্তভাবেই বলেছেন, 'আমার হেলিবিমানগুলোর তিন-তিনটে বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। যখন উড়াল দেয় তখন টালমাটাল না-ক'রে যেমনভাবে ভেসে থাকতে পারে হাওয়ায়, উড়াল শুরু করবার ধরনটা, আর তাদের চালকশক্তি সংক্ষেপেই আমি বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করবো।

'ধরুন, একটানা সমানভাবে হাওয়ায় ভেসে থাকবার ক্ষমতা। যখন কোনো পাখি দমকা হাওয়ার পাল্লায় এসে পড়ে, তখন তার ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্যে বা ফিরে পাবার জন্যে জটিল-কোনো হিশেব করতে হয় না তাকে। তার স্নায়বিক ব্যবস্থাপনার মধ্যেই এমন-একটা স্বভাবদোল আছে, যার সাহায্যে অনায়াসেই তারা ভারসাম্য ফিরে পায়। আমার যান্ত্রিক পাখির এই ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতাকে স্বয়ংক্রিয় ক'রে তোলবার জন্যে আমি তাকে কতগুলো স্বভাবদোল দিতে চেয়েছি। দেখেছেন নিশ্চয়ই হেলিবিমানগুলোকে দুটো ক'রে পাখা দেয়া হয়েছে, পনেরো ফিট উঁচু দুটো খুঁটির মাথায় সেগুলো বসানো। যে-প্ল্যাটফর্মটায় মোটর বসানো আছে, পাইলটের বসবার জায়গা আছে আর যাত্রীদের বসবার জায়গা আছে, সেখান থেকেই ঐ খুঁটি উঠেছে। এই ব্যবস্থার ফলে অভিকর্ষের কেন্দ্র অনেকটাই নেমে আসে।

'কিন্তু ঐ খুঁটি কিন্তু মোটেই স্থিরভাবে পুঁতে দেয়া নেই—ঐ পাখার সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক আছে। যদি তাকে হালের সঙ্গে ঠিকমতো জুড়ে দেয়া না-থাকে, সে ইচ্ছেমতো লম্বমানভাবে নিজের কক্ষেই যে-দিকে খুশি আবর্তিত হ'তে পারে, পাক খেতে পারে। কাজেই, হালের গতিবিধি বাদ দিলে, পাখা যদি সামনে বা পাশে গোঁত্তা খায়, তখন খুঁটিটা নিজের ওজনেই বাধ্য হয় তাদের সঙ্গে নতুন-একটা কোনাকুনি সম্পর্ক তৈরি করতে। এভাবে ন'ড়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে ভর এসে যায় পাখার সমান্তরভাবে অথবা উল্লম্বভাবে, আর পাখাগুলোকেও তার সঙ্গে তাল রেখে নিজেদের আন্দোলনকে শুধরে নিতে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। সেটাই তৎক্ষণাৎ, আপনা থেকেই, হেলিবিমানের আকস্মিক দোলাচলকে শুধরে দেয়।'

মাটির দিকে তাকিয়ে এমনভাবে সহজ ভঙ্গিতে মার্সেল কামারে কথাগুলো বলেছেন যে মনে হয়েছে কোনো পণ্ডিত অধ্যাপক যেন ক্লাসে ছাত্র পড়াচ্ছেন। একটুও তো-তো করতে হয়নি তাঁকে, কথা হাৎড়াতে হয়নি থেমে গিয়ে, কথাগুলো যেন অনায়াসেই সহজ ছন্দে তাঁর জিভের ডগায় এসে যাচ্ছে। ঐ একই ভঙ্গিতে তিনি কিন্তু ব'লেই চলেছেন :

'এবার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটার কথায় আসা যাক। মাটি থেকে উড়াল দেবার সময় হেলিবিমানের পাখাগুলো নামানো থাকে, আর খুঁটিটাকে জড়িয়ে থাকে তারা। তখন চাকার অক্ষ, পাখার তুলনায় উল্লম্বভাবে লম্বমান ভঙ্গিতেই পাক খেতে পারে, আর টেনে ওঠায় তখন বিমানকে, আকাশে উঠে যাবার পর চাকাটা উল্লম্বভাব থেকে আবার সটান শয়ান হ'য়ে যায়। এই যন্ত্র তা-ই একটা *হেলিকপ্টার* হ'য়ে ওঠে, আর এই চাকার একমাত্র কাজ হয় তাকে ঝুলিয়ে রাখা। তারপর যখন যথেষ্ট উচ্চতায় উঠে যায়, হেলিবিমানের পাখাগুলো খুলে ছড়িয়ে যায় দু-পাশে আর তখন তার সঙ্গে তাল রেখেই চাকার অক্ষদণ্ড সামনে ঝুঁকে প'ড়ে দিগন্তশায়ী হ'য়ে যায়। আস্তে-আস্তে এই চাকা চলবার শক্তি জোগায়, আর হেলিকপ্টার হ'য়ে ওঠে আকাশযান, এয়ারোপ্লেন।

'আর তাকে যা চালায়, তা হ'লো তরল গ্যাস। জ্বালানির ট্যাঙ্কটা গড়া ঐ *অ্যান্টি-ডায়াথার্মিক* পদার্থতে যার কথা আমি আগেই বলেছি; পর্যায়ক্রমে কতগুলো ভাল্‌ভের মধ্য দিয়ে ব'য়ে যায় তরল বাতাস, একটা নিয়মিত ছন্দে, তারপর এসে পৌঁছোয় একটা নলে, যেটাকে সবসময়েই গরম রাখা হয়। তরল বাতাস অমনি তার গ্যাসের আকার ফিরে পায়, প্রচণ্ড একটা চাপ দেয়, আর মোটরকে বনবন ক'রে চালায়।'

'এই হেলিবিমানের দ্রুততম গতি কী?' জিগেস করেছেন আমেদে ফ্লরেঁস।

'তিনহাজার মাইল অব্দি, নতুন জ্বালানি বিনাই, ঘণ্টায় আড়াইশো মাইল।'

*নিল মিরারি*, বলেছেন হোরাস, কোনোকিছুতেই আশ্চর্য হোয়ো না। কিন্তু কামারের শ্রোতারা তাঁদের মুগ্ধতা চেপে রাখতে পারেননি। মিনারে ফিরে আসতে-আসতে কোনো কথাই তাঁদের কাছে তাঁর প্রতিভার যথার্থ প্রশংসা ব'লে মনে হয়নি। কিন্তু এই অদ্ভুত মানুষটা মাঝে-মাঝে অসহ্য অহংকারে ফেটে পড়েন বটে, এখন কিন্তু তাঁদের এই অকুণ্ঠ প্রশংসায় মোটেই কোনো কর্ণপাত করেননি, যেন তাঁর প্রতিভাকে তারিফ করার যোগ্যতা একমাত্র তাঁর নিজেরই আছে।

'এখন আমরা ক্রমেই এসে পড়ছি কারখানার হৃৎপিণ্ডেরই কাছে,' মিনারটায় পৌঁছে তিনি বলেছেন। 'এই মিনারটায় ছটা তলা ভাগ করা—প্রত্যেক তলাতেই এই একইরকম যন্ত্রপাতি আছে। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে এর চুড়ো থেকে একটা মস্ত উঁচু ধাতুর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁটি আকাশে উঠে গেছে। এই খুঁটিটা হ'লো *তরঙ্গপ্রক্ষেপক*, এই মিনারটায় এমনি পশুর গায়ের রোঁয়ার মতো আরো-অনেকগুলো *তরঙ্গপ্রক্ষেপক* আছে—সেগুলো ছোটো-ছোটো প্রক্ষেপযন্ত্র—আকারটা শুঁড়ের মতো।'

'কী বললেন? *তরঙ্গপ্রক্ষেপক*?' জিগেস করেছেন ডাক্তার শাতোনে।

'আমি, আপাতত, আপনাদের পদার্থবিদ্যা গুলে খাওয়াবার চেষ্টা করছি না,' মৃদু হেসে বলেছেন মার্সেল কামারে। 'তবে ভৌতবিজ্ঞানের কতগুলো সূত্র মনে রাখা খুবই জরুরি। হার্টৎস নামে জনৈক জার্মান পদার্থবিদ কিছুদিন আগে লক্ষ করেছিলেন যে কোনো *কনডেনসারের* দুটো প্রেরণকেন্দ্রের মধ্যেকার সামান্য ফাঁকটা দিয়ে যখন কোনো কুণ্ডলিপাকানো পরিবাহী তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুতের ফুলকি ছোটে—*কনডেনসার* না-ব'লে তাকে *রেসনেটার* বলতে পারেন, *অসিলেটর*ও বলতে পরেন—ঐ ফুলকিযন্ত্রটার দুই বিপরীত মেরুবিন্দুতে একটা ঘূর্ণ্যমান বিদ্যুতের তরঙ্গ ছিটোয়।

'এই-দুইয়ের মধ্যে যে-ফাঁকটা আছে তাকে পেরিয়ে যায় একান্তর এক তরঙ্গপ্রবাহ, কিংবা অন্যভাবে বলতে পারি, দুই মেরুবিন্দু একান্তরভাবে একবার ধন্যাত্মক আর একবার ঋণাত্মক হ'য়ে ওঠে—যতক্ষণ-না বিদ্যুৎ ছিটোবার পর আবার তা তার সমতায় ফিরে আসে। এই ঘূর্ণির গতি, যাকে *ফ্রিকোয়েন্সিও* বলে, দুর্বার হ'য়ে উঠতে পারে, একটা সেকেণ্ডে অর্বুদ বার এই যাওয়া-আসা চলতে পারে ধনাত্মক আর ঋণাত্মকে।

'যে-সব বিন্দু থেকে এ-সব ঘূর্ণিগতির উদ্ভব হয়, গতিটা কিন্তু শুধু তাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পক্ষান্তরে এরা তাদের পরিবেশের মধ্যে গণ্ডগোল পাকিয়ে বসে, হাওয়ায়, কিংবা আরো-যথাযথভাবে বলতে গেলে, সেই অগাধ-তরলে যা আন্তর্নাক্ষত্রিক পরিবেশটা ভ'রে রেখেছে, যাকে আমরা বলি ঈথার। প্রত্যেক কম্পনের তাই একটা প্রতিকম্প ওঠে ঈথারেও—আর এই প্রতিকম্প তাকে ছড়িয়ে দেয় আরো দূর-দূরান্তরে। এই কম্পনগুলোকে তাই সংগতভাবেই বলে হার্ৎসীয় তরঙ্গ। আমি যা বলতে চাইছিলুম, বোঝা গেছে তো?'

'চমৎকার!' বলেছেন বারজাক। তিনি রাজনৈতিক নেতা হিশেবে দুর্দান্ত হ'তে পারেন, কিন্তু বিজ্ঞানের রহস্য সম্বন্ধে তাঁর প্রস্তুতি বিশেষ-কিছুই নেই।

'শুধু আমি ছাড়া,' বৈজ্ঞানিকের বয়ান তখনও ফুরোয়নি, 'এই বিদ্যুৎতরঙ্গগুলো অন্যদের কাছে ছিলো নিছকই গবেষণাগারের বিস্ময়। ওদের দিয়ে, কোনো কিছুকে না-ছুঁয়েই, বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত ধাতুর জিনিশকে বিদ্যুতাহত ক'রে দেয়া হ'তো। এই তরঙ্গগুলোর একটা দোষ—তারা সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে চায়। দিঘিতে কোনো ঢিল ছুঁড়লে যেমনভাবে গোল হ'য়ে ঢেউ ছড়িয়ে যায় চারপাশে। ফল যেটা হয়, যত দূরে চ'লে যায়, ততই তা দুর্বল হ'তে-হ'তে মিলিয়ে যায়। কাজেই একেবারে কাছে যে-ঢেউগুলো থাকে, সেগুলো ছাড়া অন্য ঢেউগুলোর কাছ থেকে বিশেষ-কোনো সাড়া



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাবারই উপায় থাকে না। যদিও লোকে লক্ষ করেছে এই ঢেউগুলোকে আলোয় প্রতিফলিত করা যায়, তবু আমি ছাড়া আর-কেউ তা থেকে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেনি। কিন্তু আমি যে অতিপরিবাহী এক ধাতু আবিষ্কার করেছিলুম তারই সাহায্যে —ঐ যে-ধাতুটা দিয়ে আমি ঐ দেয়ালের ওপরকার দিকটা আগাগোড়া মুড়ে দিয়েছি —আমি এমন-কতগুলো প্রতিফলক অর্থাৎ *রিফ্লেকটার* তৈরি করেছি যার সাহায্যে আমি যেদিকে-খুশি ঐ ঢেউয়ের শক্তিকে সংহত ক'রে আনতে পারি।

'তাদের আদিশক্তিটাকে তাই অন্তরিক্ষে পুরোপুরি পাঠিয়ে দেয়া যায়—যেদিকে খুশি, যেহেতু তাদের যাবতীয় ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়তে গিয়ে অপচয়িত হ'য়ে যায়নি। এ-সব ঘূর্ণিকম্পনের পরম্পরার মধ্যে বিভিন্ন তারতম্য প্রতিষ্ঠার কথা আগেই জানা ছিলো। আমি শুধু তৈরি করেছি গ্রাহকযন্ত্র, *রীসিভার*, যেটা শুধু-এক বিশেষ দ্রুতস্পন্দনেই সাড়া দেয়। যে-দ্রুতস্পন্দনটাকে ধরবে ব'লে ঐ গ্রাহকযন্ত্র তৈরি করা হয়, সে শুধু ঐ দ্রুতস্পন্দন এলেই তাকে নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে। এখন ঐ দ্রুতস্পন্দন অজস্র ধরনের ও সংখ্যার হ'তে পারে। সে-কথা মনে রেখে আমিও অনেক মোটর বানাতে পারবো, যার মধ্যে এমন-দুটো থাকবে না যারা একই সঙ্গে একই দ্রুতস্পন্দনকে ধরতে চাইবে— প্রত্যেকটা মোটর থাকবে আলাদা-আলাদা দ্রুতস্পন্দনে সাড়া দেবার জন্যে তৈরি।

'তাদেরই সাহায্যে আমরা অগুনতি যন্ত্র বানিয়েছি কৃষিকর্মের জন্যে, যারা দূর থেকেই তাদের শক্তি শুষে নিতে পারে, এই মিনারের ওপরে রোঁয়া ফুলিয়ে আছে যে-সব প্রেরকযন্ত্র, প্রক্ষেপক, অর্থাৎ *প্রজেকটার*, তারা যে-দ্রুত কম্পন ছড়িয়ে দেয়, দূর থেকেই তারা সে-সব টেনে নিতে পারে। ঠিক এইভাবেই আমরা *বোলতাগুলোকেও* নিয়ন্ত্রণ করি। প্রত্যেকটার চারটে ক'রে চাকা আছে, প্রত্যেকটারই আছে খুদে-খুদে চারটে মোটর, বিশেষ-বিশেষ দ্রুতস্পন্দনের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে তৈরি—যখন-ইচ্ছে এক বা একাধিক মোটরকেই আমরা যুগপৎ চালিয়ে দিতে পারি। এই ছন্দমেলানো গ্রহণপ্রেরণকে বলে *সিনটোনাইজেশন*। এর সাহায্যে, দরকার হ'লে, এই আস্ত শহরটাকেই আমি উড়িয়ে দিতে পারবো।'

'এখান থেকেই আপনি আস্ত শহরটা উড়িয়ে দিতে পারবেন?!' সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠেছেন বারজাক।

'খুব-সহজেই। হ্যারি কিলার আমাকে বলেছিলো একে অভেদ্য বানিয়ে দিতে—এবং আমি একে অভেদ্যই বানিয়েছি। প্রতিটি রাস্তা, প্রতিটি বাড়ির নিচে, রাজভবনের নিচে, এমনকী এই কারখানারও নিচে আছে প্রচণ্ডশক্তিশালী সব বিস্ফোরক, প্রত্যেকটির সঙ্গে জুড়ে দেয়া আছে একটি ক'রে *ডেটোনেটার*, এমন দ্রুতস্পন্দনের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে *সিনটোনাইজ* করা যার কথা শুধু আমিই জানি। শহরটা উড়িয়ে দিতে হ'লে আমাকে শুধু প্রতিটি বিস্ফোরককে উদ্দেশ ক'রে তার *ডেটোনেটারের* সঙ্গে মেলানো দ্রুতস্পন্দন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছড়িয়ে দিতে হবে।'

আমেদে ফ্লরেঁস জ্বরাতুর হাতে তাঁর নোটবইতে সব টুকে নিচ্ছিলেন ঘস-ঘস ক'রে, একবার চকিতের জন্যে তাঁর মনে হ'লো, ব'লে দেখবেন নাকি, এখুনি হ্যারি কিলারকে উড়িয়ে দিতে ! কিন্তু তাঁর অমনি মনে প'ড়ে গেছে যখন *উড়াল-টরপেডো* ছুঁড়ে রাজভবন উড়িয়ে দিতে অনুরোধ করেছিলেন তখন বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে আদৌ কোনো সাড়া পাননি। ফলে চুপ ক'রে থাকাই তাঁর কাছে সমীচীন মনে হয়েছে।

'আর মিনারের ওপরকার ঐ মস্ত খুঁটিটা ?' জিগেস করেছেন ডাক্তার শাতোনে।

'হ্যাঁ, এটার কথা ব'লেই আমি আপাতত আলোচনাটা শেষ করবো। এটা ভারি-অদ্ভুত যে ঐ তথাকথিত হার্ৎসীয় ঢেউগুলো এমনভাবে কাজ করে যেন তারা মাধ্যাকর্ষণের টানের এক্তিয়ারে পড়ে : যেখান থেকে ঐ ঢেউ বেরিয়ে আসে, তার প্রতি আকৃষ্ট হয় তারা, আস্তে-আস্তে মাটিপৃথিবীর দিকে হেলে পড়ে, তারপর সেখানেই মহাশূন্যে হারিয়ে যায়। ফলে যদি খুব-দূরে তাদের পাঠাতে হয়, তবে উপযুক্ত উচ্চতা থেকেই তাদের পাঠাতে হবে। আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে সেটা আরো-বেশি জরুরি —কারণ আমার লক্ষ্য হচ্ছে তাদের খুব-দূরে পাঠানো নয়, বরং আরো-উঁচুতে পাঠানো —আর সেটা আরো-অনেকবেশি কঠিন কাজ। কিন্তু আমি তা করতে পেরেছি *অসিলেটার* বা স্পন্দনযন্ত্রের সঙ্গে লাগানো একশোগজ উঁচু একটা খুঁটির সাহায্যে, আর তার সঙ্গে ঐ খুঁটির ওপর অবশ্য বসিয়ে দিতে হয়েছে জোরালো-একটা প্রতিফলক।'

'আপনি ওপরদিকে ঢেউ পাঠাতে চান কেন ?' জিগেস করেছেন আমেদে ফ্লরেঁস।

'যাতে বৃষ্টি বানাতে পারে। হ্যারি কিলারের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হয়, তখন এর মূল তত্ত্বটা আমার মাথায় খেলে গিয়েছিলো, আর এই তাত্ত্বিক চিন্তাকে কাজে তর্জমা করতে সে আমায় সাহায্য করেছিলো। ঐ খুঁটি আর প্রতিফলকের সাহায্য আমি মেঘের পানে পাঠিয়ে দিই ঢেউগুলো, আর যে-বৃষ্টির ফোঁটা ঐ মেঘের মধ্যে আছে তাকে বিদ্যুতাহত ক'রে জলকণায় পরিণত ক'রে দিই। যখন মেঘ আর পৃথিবীর মধ্যে সম্ভাব্যতার তারতম্য ঘটে কিংবা আশপাশের মেঘ বিশাল হ'য়ে ওঠে, তখনই ঝড় ফেটে পড়ে, বৃষ্টি নামে। এই রুক্ষ মরুভূমি যেভাবে সোনাফলানো মাটিতে রূপান্তরিত হয়েছে, সেটাই এই প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা প্রমাণ ক'রে দেবার জন্যে যথেষ্ট।'

'কিন্তু মেঘ চাই তো তার জন্যে,' ডাক্তার শাতোনের জিজ্ঞাসা।

'স্বভাবতই—অন্তত, মেঘ না-হয়, ভেজা স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়া চাই, আর্দ্রতা চাই। কিন্তু মেঘ তো একদিন এখান থেকে উড়ে যাবেই। আমাদের সমস্যা হ'লো, অন্য-কোথাও বৃষ্টি হ'লে নেমে না-প'ড়ে সে যাতে এখানেই নামে। এখন যখন জমিটায় চাষ-আবাদ চলেছে, গাছপালাও গজাতে শুরু করেছে, এখন স্বাভাবিকভাবেই বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে, মেঘও আসছে ঘন-ঘন। যেই মেঘ আসে, আমাকে শুধু একটা বোতাম টিপে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতে হয়, তার তখুনি হাজার অশ্বশক্তির বিদ্যুৎতরঙ্গ অগুনতি কম্পনের বোমা ছোঁড়ে ঐ মেঘে।'

'চমৎকার!' শ্রোতারা সমস্বরে তারিফ ক'রে উঠেছেন।

'ঠিক এইমুহূর্তে, যদিও আপনারা কোনোভাবেই সেটা দেখতে পাচ্ছেন না,' নিজের আবিষ্কারের কথা বলতে-বলতে ক্রমেই উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছেন মার্সেল কামারে, 'এই খুঁটির ওপর থেকে অবিশ্রাম বিদ্যুৎতরঙ্গ বেরিয়ে গিয়ে অনন্ত অসীমের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি তাদের জন্যে আরেকটা ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে পারি। আমার মনে হয়, আমি জানি, আমার বিশ্বাস যে ঐ হারানো বিদ্যুৎতরঙ্গগুলোকেও কত-শত ভিন্ন-ভিন্ন কাজে লাগানো যাবে। যেমন, সারা পৃথিবীতে, এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে যোগাযোগ স্থাপন করা যাবে, টেলিগ্রাফ কিংবা টেলিফোন মারফৎ, আর তার জন্যে বিভিন্ন স্টেশনের মধ্যে যোগসূত্র করার জন্যে কোনো তারই লাগবে না।'

'কোনো তার বিনাই!' শ্রোতারা সবিস্ময়ে ব'লে উঠেছেন।

'কোনো তার বিনাই। তার আমাদের দরকার হয় কেন? যতটুকু কাজে লাগে, সে তো নেহাৎই সামান্য। আমাকে শুধু একটা মানানসই রীসিভার বানিয়ে নিতে হবে—আমি সেটা নিয়েই কাজ করছি এখন, প্রায় ধ'রে ফেলেছি সমাধানের সূত্রটা, কিন্তু এখনও তাকে ঠিকমতো বাগে আনতে পারিনি।'

বারজাক বিমূঢ় গলায় বলেছেন, 'আমরা কিন্তু এখনও অন্ধকারেই র'য়ে গেছি!'

'কিন্তু তার চাইতে সহজ আর-কিছুই নেই,' কামারের উত্তেজনা আরো-দপদপ ক'রে উঠেছে। 'এই দেখুন, এটা একটা মর্স-উদ্ভাবিত যন্ত্র, যে-ধরনের যন্ত্র সাধারণ টেলিগ্রাফে ব্যবহার করা হয়, এটাকে আমি পরীক্ষামূলকভাবে এক বিশেষ বিদ্যুৎপ্রবাহের আবর্তে রেখেছি। শুধু এই বোতামগুলো টিপলেই ঢেউ বানায় যে-বিদ্যুতের স্রোত, তার সঙ্গে এই আবর্তের, এই বিশেষ *সার্কিটের*, যোগাযোগ হ'য়ে যাবে। মর্স-এর চাবি যখন তোলা থাকে, হার্ৎসীয় তরঙ্গ ছোটে না; যখন সেটাকে চাপ দিয়ে ডেবে দেয়া হয়, তখনই খুঁটির মাথা থেকে তরঙ্গদল বেরিয়ে পড়ে।

'কিন্তু বেরিয়ে আকাশে চ'লে যায় না, বরং ছুটে যায় কল্পিত ঐ রীসিভারটার দিকে। সেটা সম্ভব হয় প্রতিফলকটাকে রীসিভারের দিকে ঘুরিয়ে দিতে—সেই প্রতিফলকটা প্রবাহকেন্দ্র। কোনদিকে খবর পাঠানো হবে, তা যদি জানা না-থাকে, তবে শুধু প্রতিফলকটাকেই বিচ্ছিন্ন ক'রে দিলেই চলবে—সেটা আমি করতে পারি এই অন্য বোতামটা টিপে। এখন, এই পাঠিয়ে-দেয়া বিদ্যুৎতরঙ্গ পৃথিবীর দিকে-দিগন্তরে—সব-দিকেই—ছড়িয়ে পড়বে আর আমি মর্স-সংহিতার চাবি টিপে নিশ্চিত হ'তে পারবো এটা গিয়ে রীসিভারে পৌঁছুবে—যদি সে-রকম কোনো রীসিভার থাকে—তা সে যেখানেই থাকুক। দুর্ভাগ্যবশত, সে-রকম কোনো রীসিভার কোথাও নেই।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনি টেলিগ্রামের কথা বলেছেন,' জেন ব্রেজন জিগেস করেছে, 'সে-কথাটার মানে কী?'

'সাধারণত লোকে টেলিগ্রাফ বলতে যা-বোঝায় তা-ই। এই বোতামটাকে আমাকে সাধারণভাবে ব্যবহার করতে হবে, আর মর্স-এর বর্ণলিপির সহায়তা নিতে হবে—পৃথিবীর সব টেলিগ্রাফকর্মীই সেই বর্ণলিপি জানে। আচ্ছা, একটা দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা আরো-সহজ হবে। যদি এই কল্পিত রীসিভারটা কোথাও থেকে থাকে, তাহ'লে আপনি কি প্রথম সুযোগেই টেলিগ্রাফ মারফৎ এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করবেন না?'

'সে-সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই ওঠে না!' বলেছে জেন।

'আচ্ছা, ধরুন, অমন-কোনো রীসিভার আছে,' কামারে ঐ মর্সের যন্ত্রের কাছে ব'সে প'ড়ে বলেছেন, 'সেক্ষেত্রে কাকে আপনি টেলিগ্রাফে খবর দিতে চান?'

'এমন-একটা দেশে আছি, যেখানে কাউকেই আমি চিনি না, কাকে আর তাহ'লে টেলিগ্রাফ করবো?' হেসে ফেলেছে জেন। পরক্ষণে লজ্জায় একটু আরক্ত হ'য়ে গিয়ে বলেছে, 'আমি তো এখানে শুধু কাপ্তেন মার্সেনেকেই চিনি।'

'ঠিক আছে। কাপ্তেন মার্সেনেই না-হয় হোক।' মর্স-সংহিতা তখন তার হ্রস্বদীর্ঘ টরে-টক্কা শুরু ক'রে দিয়েছে। 'কোথায় আছেন তিনি?'

একটু ইতস্তত ক'রে জেন বলেছে : 'এখন সম্ভবত টিম্‌বাকটুতেই আছেন।'

'টিম্‌বাকটু,' চাবিতে টরে-টক্কা ক'রে কামারে বলেছেন। 'তা, এই কাপ্তেন মার্সেনেকে আপনি ঠিক কী কথা বলতে চান? নিশ্চয়ই এ-রকম কিছু, যে, "জেন ব্রেজন..."

'মাপ করবেন,' জেন তাঁকে বাধা দিয়েছে। 'কাপ্তেন মার্সেনে আমাকে শুধু জেন মোরনাস হিশেবেই চেনেন।'

'তাতে কিচ্ছু এসে-যায় না, কারণ এ-বার্তা তো আর কোথাও গিয়ে পৌঁছুবে না; আচ্ছা, তবু না-হয় মোরনাসের নামেই আমরা খবর পাঠালুম। তাহ'লে আমি খবর পাঠাচ্ছি : "ব্ল্যাকল্যাণ্ডের বন্দিনী জেন মোরনাসের উদ্ধারে আসুন"...' টরে-টক্কা থামিয়ে কামারে আবার বলেছেন : 'আর এই ব্ল্যাকল্যাণ্ডের কথা যেহেতু বাইরের পৃথিবীর কারুই জানা নেই, আমি তাই তার অবস্থান জানাবো : "অক্ষাংশ ১৫°৫০ উত্তর, দ্রাঘিমাংশ"...' টরে-টক্কা ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছেন কামারে। 'এই যাঃ, হ্যারি কিলার বিদ্যুৎপ্রবাহ কেটে দিয়েছে!'

ধাঁধাটা বুঝতে না-পেরে, তাঁর অতিথিরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন।

ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন কামারে : 'যেমন বলেছি, এই বিদ্যুৎশক্তি আসে প্রায় ছ-মাইল উজানে তৈরি-করা এক জলবিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে। হ্যারি কিলার আমাদের জলবিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছে।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহ'লে যে কলকব্জা সব বন্ধ হ'য়ে যাবে!' বলেছেন ডাক্তার শাতোনে।

'তারা আগেই বন্ধ হ'য়ে গেছে,' উত্তর দিয়েছেন কামারে।

'আর *বোলতাগুলো?*'

'তারা যে মাটিতে আছড়ে পড়েছে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই আর!'

'তাহ'লে হ্যারি কিলার নিজে সেগুলো ব্যবহার করতে পারবে,' আর্তনাদই বুঝি ক'রে উঠেছে জেন ব্লেজন।

'সেটা অতটা নিশ্চিত ক'রে বলা যায় না,' বৈজ্ঞানিক বলেছেন, 'বরং আমার সঙ্গে মিনারে উঠে আসুন, দেখতে পাবেন তাতে তার খুব-একটা লাভ হয়নি।'

চট ক'রে ওপরতলাগুলো পেরিয়ে এসে তাঁরা এসে ঢুকেছেন *সাইক্লোস্কোপের* মধ্যে। আগের মতোই, দেয়ালের বাইরেটা চোখে পড়েছে তাঁদের, এমনকী বাঁধানো ঘাটটা শুদ্ধু। তার তলায় প'ড়ে আছে নিশ্চল কতগুলো *বোলতা*।

এস্‌প্ল্যানেডে দাঁড়িয়ে *হর্ষচরিতেরা* সোল্লাসে চ্যাঁচাচ্ছে। আবার তারা হামলার জন্যে প্রস্তুত হ'তে শুরু করেছে। কেউ-কেউ মাটিতে নেমে মরা *বোলতাগুলোকে* ছুঁয়ে দেখছে, একটু আগেই সেগুলো তাদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া ক'রে দিয়েছিলো।

কিন্তু তারা সেগুলোকে ছোঁবা মাত্র, অস্থির ভয় পেয়ে পেছিয়ে এসেছে। ভয়ে গুটিয়ে গিয়ে ফের তারা পেছিয়ে যেতে শুরু করেছে। কয়েকজন এতই দুর্বল হ'য়ে পড়েছিলো যে পর-পর জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে গেছে মাটিতে।

'ওদের জীবনের জন্যে দুটো সুও দেবো না আমি,' মার্সেল কামারে ঠাণ্ডা গলায় বলেছেন, 'এ-রকম যে হ'তে পারে সেটা আমি আগেই জানতুম, তাই সেই অনুযায়ী সাবধানতা অবলম্বন করেছিলুম আমি। জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের বিদ্যুৎ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন ও বঞ্চিত ক'রে হ্যারি কিলার না-জেনেই, স্বতঃই, *ইপসোফ্যাক্টো*, এমন-একটা জলকপাট খুলে দিয়েছে যা তরল *কার্বন ডায়োক্সাইডের* পাত্রগুলোর মুখ খুলে দিয়েছে এখানে, আর তা আবার তরল অবস্থা থেকে গ্যাসে বদলে গিয়েছে, আর ঐ গ্যাস বাতাসের চেয়ে ভারি ব'লে ওখানেই ঝুলে থেকেছে, আর তার আওতায় যারাই আসবে, তারাই দূষিত গ্যাসে দম আটকে মারা যাবে।'

'বেচারারা!' জেন ব্লেজন ব'লে উঠছে।

'সত্যি ভারি-বেচারা! তাদের সাহায্য করবার কোনো ক্ষমতাই আমার নেই। আমার যন্ত্রপাতি কলকব্জাগুলোর ব্যাপারে আমি আগে থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করেছিলুম। আজ সকাল থেকেই তরল বাতাস—আমাদের ভাঁড়ারে প্রায় অনিঃশেষ পরিমাণে আছে এই তরল বাতাস—আজ সকাল থেকেই তরল বাতাস শক্তি জোগাচ্ছে এখানে, বিদ্যুতের বদলে যন্ত্রপাতি চালাবে এই তরল বাতাসই। আর সেটা এর মধ্যেই ঘ'টে গেছে, এই বিকল্প ব্যবহারের ফলে এর মধ্যেই ঐ শুনুন যন্ত্রপাতিগুলো আবার চলতে শুরু করেছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ দেখুন, *বোলতাগুলো* আবার আকাশে চক্কর দিকে শুরু করেছে।'

*বোলতাগুলোর* চাকারা আবার তাদের হেঁয়ালিভরা ঘুরন শুরু করেছে, যন্ত্রগুলো ফের পাহারায় বেরিয়েছে, রোঁদে, চক্কর দিচ্ছে শূন্যে। আর কাণ্ড দেখে বিমর্ষ ও হতভম্ব *হর্ষচরিতেরা* মৃত সাথীদের ফেলেই রাজভবনের দিকে চম্পট দিতে শুরু করেছে।

মার্সেল কামারে তাঁর অতিথিদের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। তাঁকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছে। যেন বিষম ঘাবড়ে গেছেন, যেন প্রচণ্ড উত্তেজিতই, আর তাঁর চোখে আবার দপ ক'রে জ্ব'লে উঠেছে সেই অস্থির আলো। দেমাকে ফুলে গিয়ে, সরল ভঙ্গিতে, ছেলেমানুষের মতো তিনি ব'লে উঠেছেন : 'এবার তাহ'লে আমরা নাকে তেল দিয়ে শান্তিতে ঘুমুতে পারবো ব'লেই মনে হয়!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

## আট

# উদ্ধারের আহ্বান

অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তেই কাপ্তেন মার্সেনে বারজাক মিশনকে ছেড়ে এসেছিলেন, বিশেষত জেন মোরনাস ব'লে যে-তরুণীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো তাকে ছেড়ে আসতে তাঁরা আরো অনেক-বেশি কষ্ট হচ্ছিলো। তবু বিন্দুমাত্র দ্বিধা না-ক'রেই তিনি সদলবলে চ'লে এসেছিলেন, আর যেমন নির্দেশ ছিলো, সেগু-সিকোরো অব্দি দ্রুতবেগেই পড়িমড়ি ক'রে এসেছিলেন। আদ্যোপান্ত এক সামরিক অফিসার তিনি, কায়মনোবাক্যেই ফরাশি বাহিনীর কাছে সমর্পিতপ্রাণ, তার জন্যে যদি ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিতেও হয়, সে নিয়ে তিনি দু-বার ভাবেন না।

কিন্তু যত দ্রুতই আসবার চেষ্টা ক'রে থাকুন না কেন, ঐ তিনশো মাইল দূরত্ব পেরুতে তাঁর পুরো ন-দিন লেগেছিলো, ২২শে ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে তিনি অবশেষে সদলবলে এসে পৌঁছেছিলেন সেগু-সিকোরোতে। ফলে পরদিন সকালের আগে ছাড়া কর্নেল সের্জন-এর সঙ্গে তিনি দেখা করতে পারেননি। সকালবেলায় সেগু-সিকোরোর শিবিরের অধ্যক্ষ কর্নেল সের্জনকে এসে তিনি কর্নেল সাঁৎ ওবানের নির্দেশটা দেখিয়েছিলেন।

কর্নেল সের্জন ক্রমবর্ধমান বিস্ময়ের সঙ্গে তিন-তিনবার আদ্যোপান্ত পড়েছিলেন নির্দেশটা। পুরো ব্যাপারটাই কিছুতেই তাঁর মাথায় ঢুকছিলো না। 'ভারি আশ্চর্য তো!' বলেছিলেন তিনি সবিস্ময়ে। 'টিম্‌বাকটু পাঠাবার জন্যে সিকাসোতে লোক ডেকে পাঠানো! এ-যে কল্পনাতীত!'

'তাহ'লে, আমরা যে আসবো, এ-খবর আপনি পাননি?'

'মোটেই না!'

'যে-লিউটেনান্ট আমাকে এই নির্দেশটা পৌঁছে দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে টিম্‌বাকটুতে বিক্ষোভ ফেটে পড়েছে—আর তুয়ারেগ আউয়েলিমেদেন প্রচণ্ড উত্তেজিত হ'য়ে আছে!'

'এই-প্রথম এমনতর কথা শুনলুম,' কর্নেল তাঁকে বলেছিলেন, 'বস্তুত, কালকেই, কাপ্তেন পেইরোইয়েস... আপনি হয়তো তাঁর কথা শুনেছেন?'

'দু-বছর আগে আমরা একই রেজিমেন্টে ছিলুম।'

'হুম, কালকেই তিনি এখান দিয়ে গেছেন, এই কাপ্তেন পেইরোইয়েস। টিম্‌বাকটু থেকে ডাকার যাবার রাস্তায় এখানে থেমেছিলেন তিনি। কালকেই তো গেলেন এখান



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে, কিন্তু, কই, এই বিক্ষোভ সম্বন্ধে তো ঘুণাক্ষরেও কিছু বলেননি!'

কাপ্তেন মার্সেনে এ-কথা শুনে অসহায়ভাবে শুধু কাঁধ ঝাঁকিয়েছিলেন।

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, কাপ্তেন,' কর্নেল সের্জন বলেছিলেন, 'এ নিয়ে তর্ক করার কিছু নেই। এ-রকমই যখন নির্দেশ, তখন তা আমাদের পালন করতে হবে বৈ কি। তবে কখন যে আপনি রওনা হ'তে পারবেন, তা শুধু শয়তানই জানে!'

সেই অদৃষ্টপূর্ব-অভিযানের জন্যে তৈরি হ'তে গিয়ে বিষম মুশকিলে পড়তে হয়েছিলো কাপ্তেন মার্সেনেকে। ঘোড়াগুলো রাখবার জন্যে আস্তাবল খুঁজে বার করতেই আটদিনেরও বেশি সময় লেগে গিয়েছিলো, কারণ নির্দেশ ছিলো ঘোড়াগুলো যেন সেগু-সিকোরোতেই রেখে-আসা হয়। তাছাড়া রাস্তার জন্যে যথেষ্ট খাবারদাবারও চাই আর চাই যানবাহন। শেষটায় দোসরা মার্চেই কাপ্তেন মার্সেনে টিমবাকটুর পথে রওনা হ'তে পেরেছিলেন।

শুখার মরশুম ব'লে জায়গায়-জায়গায় জল এত-কম ছিলো যে তাঁকে মাঝপথে বেশ-কয়েকবার থেমে জোয়ারের জলের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছে। ফলে ১৭ই মার্চের আগে বারজাক মিশনের প্রাক্তন রক্ষিদলের অধ্যক্ষ কাবারায় পৌঁছুতে পারেননি। কাবারা টিমবাকটুরই বন্দর, টিমবাকটু থেকে তার দূরত্ব দশমাইল।

যখন কাপ্তেন মার্সেনে স্থানীয় বাহিনীর অধ্যক্ষ কাপ্তেন আলেজ-এর কাছে গিয়ে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালেন, তিনিও সেগু-সিকোরোয় তাঁর সহযোগী যেমন তাজ্জব হ'য়ে গিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন। জোরগলায় বললেন, এ-অঞ্চলে কোথাও কোনো গণ্ডগোলই নেই, তিনি নিজে কস্মিনকালেও কোনো বাড়তি সেনাদল চেয়ে আবেদন পাঠাননি, তিনি বুঝতেই পারছেন না আগে থেকে না-জানিয়ে কর্নেল সাঁৎ-ওবান হঠাৎ কেন বাড়তি একশোজন সৈন্য পাঠিয়েছেন, তাঁর এখানে যাদের কোনো দরকার নেই।বইটি আমারবই.কম এর জন্য নির্মিত।

ব্যাপারটা ভারি-আশ্চর্য ঠেকলো কাপ্তেন মার্সেনের কাছে। এই-প্রথম তিনি সন্দেহে ভ'রে গেলেন : কোনো ওস্তাদ জালিয়াতের পাল্লায় পড়েননি তো? কিন্তু কেন? খামকা কীসের জন্যে ঐ জালিয়াৎ তাঁকে এমন নাকাল ক'রে ঘোড়দৌড় ছোটাচ্ছে? উত্তরটা অবশ্যি স্পষ্ট। মৎলবটাকে যতই দুর্বোধ্য আর জটপাকানো ঠেকুক, এই ফেরেব্বাজির মানে একটাই হয়—তাঁকে সরিয়ে দিয়ে বারজাক মিশনকে উৎখাত ক'রে দেয়া। যুক্তি তাঁকে যখন এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিয়েছে, কাপ্তেন মার্সেনে তখন একেবারে মর্মযন্ত্রণায় ভ'রে গেছেন : কী হাঁদার মতো এই গুরুদায়িত্ব থেকে তিনি স'রে এসেছেন! আর মাদমোয়াজেল মোরনাসেরই বা কী হবে? শয়নে-স্বপনে-জাগরণে, সবসময় যেন মাদমোয়াজেল মোরনাসের কথাই তাঁর মনে-প্রাণে তখন হানা দিচ্ছিলো।

তাঁর সব ভয় যে আদপেই অমূলক নয়, তার আরো-একটা প্রমাণ পাওয়া গেলো,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন না-টিম্‌বাকটুতে না-সেগু-সিকোরোতে কেউ লিউটেনাণ্ট ল্যকুরের কোনো হদিশ দিতে পারলে। শুধু-যে কেউ কোনোদিন ল্যকুরের নামই শোনেনি, তা নয়—কেউ কোনোদিন সুদানি স্বেচ্ছাসেবকদের কথাও শোনেনি—অথচ কর্নেল সাঁৎ-ওবানের চিঠিতে তাদের কথা লেখা ছিলো।

তথাচ, কর্নেল সাঁৎ-ওবানের চিঠি তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁটিয়ে দেখেও মনে হচ্ছিলো না সে-চিঠি জাল; যতক্ষণ-না হাতে-নাতে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ সেটাকে কর্নেলের নির্দেশ ব'লেই মেনে নিতে হবে। তাই কাপ্তেন মার্সেনে আর তাঁর লোকজনের থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিতে হ'লো : আর ঠিক হ'লো প্রথম-সুযোগেই কর্নেল সাঁৎ-ওবানের চিঠি তাঁর কাছেই পাঠিয়ে দেয়া হবে, কেননা একমাত্র তিনিই বলতে পারবেন এ-চিঠি অপ্রামাণিক কি না।

কিন্তু টিম্‌বাকটু থেকে বামাকোর দূরত্ব ছশো মাইলেরও ওপর। চড়াই-উৎরাইয়ে ভরা। কর্নেলের কাছ থেকে সন্দেহভঞ্জনের চিঠি আসতে তাই অনেকটাই সময় লেগে যাবে।

এদিকে কাপ্তেন মার্সেনে যে এখন কী করবেন, তা-ই কেউ জানে না। তাঁর ওপর নির্দিষ্ট কোনো কাজের ভার নেই। তিনি সারাক্ষণই অস্থির হ'য়ে আছেন। সময়কে মনে হচ্ছে অহেতুক-দীর্ঘ—যেন কেউ তাকে টেনে লম্বা ক'রে দিয়েছে। সুখের বিষয় যে মার্চের শেষে, জনৈক কাপ্তেন পেরিনি—সাঁৎ সির্-এ তাঁর পুরোনো সাথী ছিলেন—যাঁর সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা এখনও অটুট ছিলো—সেই কাপ্তেন পেরিনি এসে হাজির হলেন; দুই বন্ধু হঠাৎ পরস্পরকে দেখে খুব-খুশি হলেন, জমাট আড্ডা হ'লো দুজনে, এখন অন্তত সময়টা একটু-দ্রুত কাটতে লাগলো কাপ্তেন মার্সেনের।

বন্ধুর অস্বস্তির কারণ শুনে, পেরিনি তাঁকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করলেন। এই জাল ফরমান এমনই সুকৌশলে তৈরি করা হয়েছে যে যে-কেউ এই ধাপ্পায় ভড়কি খেয়ে যেতো। অত নিখুঁতভাবে কেউ স্বাক্ষর বা সীলমোহর নকল করতে পারে না ব'লেই তাঁর ধারণা। বরং তাঁর মনে হয়েছে, লিউটেনাণ্ট ল্যকুর হয়তো কর্নেলের সিদ্ধান্তের আসল উদ্দেশ্যটা ধরতে পারেননি, তাই ও-রকম ভুলভাবে বর্ণনা করেছেন। আর কর্নেল আলেজ্-এর বিস্ময়টাও বোঝা যায় : যে-অঞ্চলে এখনও পুরোপুরি শান্তি ও শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সেখানে এ-রকম এক-আধটা ফরমানের ভুলবোঝাবুঝি থেকেই অনেকরকম গণ্ডগোলের উদ্ভব হ'তে পারে।

কাপ্তেন পেরিনিকে অন্তত দু-বছর টিম্‌বাকটুতে থাকতে হবে ব'লে তিনি সঙ্গে বিস্তর মালপত্তর নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর পুরোনো বন্ধু সব বাক্সপ্যাঁটরা খুলে সেগুলো গুছিয়ে রাখার ব্যাপারে হাত লাগিয়েছিলেন। মালপত্তরের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলো গবেষণাগারের সরঞ্জাম : প্রায় একটা আস্ত ল্যাবরেটরিই, পেরিনি যদি একদিন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমরবাহিনীর উর্দি গায়ে না-চাপাতেন, তবে এতদিনে তিনি মস্ত-একজন বিজ্ঞানী হ'য়ে উঠতেন। বিজ্ঞানের অনুরক্ত ছাত্র হিশেবে তিনি সর্বাধুনিক গবেষণার খবর রাখেন—বিশেষত বিদ্যুৎতরঙ্গ সম্বন্ধে যে-সব গবেষণা হচ্ছে, তাতে তাঁর কৌতূহল অসীম। তাঁদের যখন বন্ধুতা হয়েছিলো তখন দুই বন্ধুর একজন ছিলেন কাজের লোক, আরেকজন ভাবুক। এই বিপরীত স্বভাবের দরুন দুই বন্ধুর মধ্যে মাঝে-মাঝে কথাকাটাকাটি হ'তো বটে, কিন্তু কখনও কোনো মনোমালিন্য হয়নি। একবন্ধু গ্রন্থকীট, অন্যজন রংবাজ, ডাকাবুকো—পরস্পরকে এই ব'লেই সম্বোধন করতেন তাঁরা—কিন্তু এটাও সবাই জানতো যে মার্সেনের এই সারাক্ষণ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার মানে এই নয় যে তিনি মোটেই পরিশীলিত ও মার্জিত রুচির মানুষ নন, বরং অনেক সাধারণ লোকের চাইতে জ্ঞানবিজ্ঞানের খবর তিনি অনেক বেশিই রাখতেন। আর পেরিনির পাণ্ডিত্য আর বিজ্ঞানানুরাগও তাঁকে দক্ষ ও সাহসী সামরিক অফিসার হ'য়ে ওঠবার ব্যাপারে কোনো বাধার সৃষ্টি করেনি।

বন্ধুর আসার কয়েকদিন পরে, কাপ্তেন মার্সেনে একদিন বন্ধুর আস্তানায় এসে দেখতে পেলেন, সেখানে তাঁর কোয়ার্টারের সামনে উঠোনে কাপ্তেন পেরিনি কী-একটা অদ্ভুত যন্ত্র বসিয়েছেন।

'তুই একেবারে ঠিক সময়ে এসেই হাজির হয়েছিস,' পেরিনি বন্ধুকে দেখেই সোল্লাসে ব'লে উঠলেন। 'তোকে আমি আজ দারুণ কৌতূহলোদ্দীপক একটা জিনিশ দেখাবো।'

'ঐ ওটা?' কাপ্তেন মার্সেনে আঙুল দিয়ে একটা যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাকে দেখালেন: দুটো তড়িৎকোষ, কিছু বৈদ্যুতিক চুম্বক, আর একটা কাচের নল—তার মধ্যে কী-একটা অচেনাধাতু ভরা: আর তাদের ওপর কয়েকগজ লম্বা একটা তামার খুঁটি বসানো।

'হ্যাঁ, ঐ ওটাই,' পেরিনি বললেন। 'তুই যাকে তাচ্ছিল্য ক'রে, "ঐ ওটা" বলছিস সেটাই হ'লো আধুনিক জাদুবিদ্যার চমৎকার-একটা দৃষ্টান্ত। এটা মূলত নেহাৎই একটা টেলিগ্রাফের খবরপাবার কেন্দ্র, রীসিভিং কেন্দ্র, তবে—ভালো ক'রে শুনে রাখ আমার কথা—*বেতারটেলিগ্রাফি*।'

'ওরা অবশ্য ক-বছর ধ'রেই *বেতারটেলিগ্রাফের* কথা বলছিলো,' মার্সেনের তৎক্ষণাৎ কৌতূহল চেতিয়ে উঠলো, 'সমস্যাটার তাহ'লে সমাধান হ'য়ে গেছে?'

'নিশ্চয়ই! হ্যাঁ, ইতিহাসের এ এক আজব খেলা—পৃথিবীতে একই সঙ্গে এমন দুজন বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হয়েছে তাতে গোড়ায় একে কোনো কাকতাল ব'লেই মনে হ'তে পারে। একজন ইতালির লোক, মার্কোনি, হার্ৎসীয় বিদ্যুৎতরঙ্গকে মহাকাশে ছড়িয়ে দেবার একটি উপায় তিনি বার ক'রে ফেলেছেন।... তুই জানিস, ওরে বেআক্কেলে কাজের লোক, ব্যাপারটা কী?'

'হ্যাঁ, জানি। আমি যখন ফ্রান্সে ছিলুম, তখন ওরা মার্কোনির আবিষ্কার নিয়ে কথা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলছিলো। কিন্তু অন্য কার কাথা বলছিলি তুই?'

'উনি একজন ফরাশি, ডক্টর ব্রাঁলি। উনিই আবিষ্কার করেছেন গ্রাহকযন্ত্র, রীসিভার, উদ্ভাবনীবিদ্যার একটি খুদেবিস্ময়।'

'আর এই-যে যন্ত্র—এটা?'

'এটাই সেই রীসিভার। চক্ষের পলকে এর মূল কথাটা তুই বুঝে ফেলতে পারবি, এত-সহজ। মঁসিয় ব্রাঁলি লক্ষ ক'রে দেখেছিলেন যদিও লোহাচুর সাধারণত ভালো পরিবাহী হয় না, তারা কিন্তু হার্ৎসীয় তড়িৎপ্রবাহের বেলায় চমৎকার পরিবাহী হ'য়ে ওঠে—অর্থাৎ বিদ্যুৎ কোনো বাধা না-পেয়ে তাদের মধ্য দিয়ে সাবলীলভাবে চ'লে যেতে পারে। তার কাজই হচ্ছে এলোমেলোছড়ানো তড়িৎকণাকে একজায়গায় জড়ো ক'রে তাদের মধ্যে সাযুজ্য ঘটিয়ে দেয়া। এবার এই ছোট্ট নলটাকে দ্যাখ।'

'হ্যাঁ, দেখছি বটে।'

'এটাই ঐ সাযুজ্য ঘটায়। বলতে পারিস, তড়িৎকণা খুঁজে বার করবার কাজে পোক্ত এক গোয়েন্দা। এই-যে নলটা, এর মধ্যে ঐগুলো হ'লো লোহাচুর—এবার লোহাচুর সমেত এই নলটাকে কোনো তড়িৎকোষের বিদ্যুৎপ্রবাহের *সার্কিটের* মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে, এই নল, ভালো পরিবাহী নয় ব'লে, *সার্কিটটায়* ঝামেলা পাকায়, তার মধ্য দিয়ে কোনো বিদ্যুৎই আর যায় না। কী, বুঝতে পারছিস তো?

'হ্যাঁ, কিন্তু তারপর?'

'যদি তখন কোনো হার্ৎসীয় বিদ্যুৎতরঙ্গ এসে পৌঁছোয়—ঐ তামার শিকটা তাকে পাকড়ায়—ওকে বলে শোষকশুঁড়, অ্যান্টেনা,—আর তৎক্ষণাৎ, এই নলটা তার গায়ে আটকানো ব'লে, এই নলটা দারুণ-একটা পরিবাহী হ'য়ে ওঠে, তখন তড়িৎকোষের *সার্কিট* বন্ধ বটে, তবু হার্ৎসীয় তরঙ্গের বিদ্যুৎ তার মধ্য দিয়ে ছুটে চ'লে যায়। ওরে রক্তবাদল-ঝরানো-সৈনিক, এটা তোর মাথায় ঢুকেছে তো?'

'হ্যাঁ, ওরে বুড়োজবুথবু বিজ্ঞানী। এবার কী?'

'আর এবার অকুস্থলে এই অধম বক্তার প্রবেশ। এই-যে কলটা আমি নিজে বানিয়ে নিয়েছি, মঁসিয় ব্রাঁলির আবিষ্কারের সঙ্গে তাল রেখেই, তাতে ঐ হার্ৎসীয় বিদ্যুৎতরঙ্গ মর্সের রীসিভারটাকে চালু ক'রে দেয়, যার মধ্যে সাধারণ ধরনেই একটা কাগজের ফিতে খুলে যেতে থাকে। কিন্তু সেইসঙ্গে এই ছোট্ট হাতুড়িটা—ঐ যেটাকে তুই দেখছিস—সেটা *ঠুকে-ঠুকে* সাযুজ্য তৈরি ক'রে দেয়; এটার ঘা খেলে, লোহাচুরগুলো একটু ছিটকে যায়, অমনি হ'য়ে ওঠে অপরিবাহী, তড়িৎকোষ থেকে আর বিদ্যুৎ খেলে না তাদের মধ্যে, আর মর্স রীসিভার ও অমনি বর্ণলিপি ছাপা বন্ধ ক'রে দেয়।

'সে শুধু কাগজের ওপর একটা সংকেত ছাপে, তা-ই তো বলবি? হ্যাঁ, তা ছাপে, কিন্তু যদি পর-পর একটার পর একটা সংকেত আসতে থাকে, আর শোষকশুঁড় অর্থাৎ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ্যানটেনা সে-সব শুষে নেয়, তাহ'লে থেমে-থেমে পর-পর ঐ সংকেতগুলো কাগজে সারি-সারি ছাপ মেরে থাকে। যখন এটা থেমে যায়, অর্থাৎ আর হার্ৎসীয় তরঙ্গ আসে না, তখন এও ছাপা বন্ধ ক'রে দিয়ে পরবর্তী তরঙ্গের আগমনের জন্যে হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে থাকে। অর্থাৎ আমরা একটুক্ষণের মধ্যেই টরে-টক্কার হ্রস্বদীর্ঘ পেয়ে যাই পর-পর। কোনো টেলিগ্রাফকর্মীর কাছে সেটা সাধারণ-কোনো লেখার মতোই সহজপাঠ্য তখন।'

'যেমন, তোর মতো কোনো ওস্তাদ টেলিগ্রাফকর্মী?'

'হ্যাঁ, যেমন, ধর, আমার মতো কেউ।'

'তা এই অসাধারণ যন্ত্রটা হঠাৎ এই আফ্রিকায় জঙ্গলের মধ্যে তুই নিয়ে এসেছিস কেন?'

'এটা এবং এরই সহোদর-ভাই, এই *বিদ্যুৎতরঙ্গউৎপাদক*, অর্থাৎ এই *ট্র্যান্সমিটার*, যাকে আমি কালকেই এখানে বসাবো। তুই জানিস কি না জানি না, আমি আজকাল এই *বেতারটেলিগ্রাফি* নিয়ে একেবারে খেপে উঠেছি। শাহারায় আমিই সব-আগে এটাকে বসাতে চাই। সেইজন্যেই আমি এই দুই সেট যন্ত্র নিয়ে এসেছি। এ-সব জিনিশ পৃথিবীর যে-কোনো জায়গাতেই ভারি-দুর্লভ, আর আফ্রিকায় যে এর জুড়ি একটাও নেই, সেটা আমি তোকে বাজি ধ'রেই বলতে পারি। একবার ভেবে দ্যাখ ব্যাপারটা! আমরা যদি এখন সরাসরি বামাকোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতুম... কিংবা ধর যদি সাঁৎ-লুইয়ের সঙ্গেই কথা বলা যেতো!'

'সাঁৎ-লুইয়ের সঙ্গে?... সেটা বড্ড-দূরে হ'য়ে যাবে না?'

'মোটেই না,' আপত্তি করেছেন পেরিনি। 'দূর-দূরান্তরের সঙ্গে যোগাযোগ কবেই ক'রে ফেলেছেন বিজ্ঞানীরা—লং-ডিস্ট্যান্স ব'লে আর কিছুই নেই!'

'অসম্ভব!'

'খুব-সম্ভব, ওরে মাথা-মোটা গর্দভ! আমার তো ধারণা আমি তার চেয়েও ভালো কিছু করবো। সারা নাইজারের তীর ধ'রে আমি কতগুলো পরীক্ষা চালাবো...'

কাপ্তেন পেরিনি তারপরেই হঠাৎ কথা শেষ না-ক'রেই ফ্যালফ্যাল ক'রে হা ক'রে তাকিয়ে থেকেছেন, যাতে বোঝা গেছে কতটা বিস্মিত আর হতভম্ব হ'য়ে গেছেন তিনি। ব্রাঁলি যন্ত্রটা থেকে ক্ষীণ-একটা খটখটে আওয়াজ বেরুচ্ছে, যেটা তাঁর অভ্যস্ত কান চিনতে মোটেই ভুল করেনি।

মার্সেনে অবাক হ'য়ে জিগেস করেছেন, 'তোর আবার হঠাৎ কী হ'লো?'

তাঁর বন্ধু একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁর বিস্ময় যেন কথাগুলো তাঁর মুখ থেকে কেড়ে নিয়েছে। '*চলছে, যন্ত্রটা চলছে*!' আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেছেন তিনি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী? যন্ত্রটা চলছে?' কাপ্তেন মার্সেনে একটু বুঝি-বা ঠাট্টাই করেছেন। 'তুই স্বপ্ন দেখছিস, তোর ভাবী ইনস্টিটিউটের হ'য়ে তুই এর মধ্যেই জেগে-জেগেই খোয়াব দেখতে শুরু ক'রে দিয়েছিস। তোর যন্ত্রটা গোটা আফ্রিকায় একমাত্র যন্ত্র, ফলে তার পক্ষে চলা আদপেই সম্ভব নয়—যতই নাটুকেভাবে তুই কথাটা বলবার চেষ্টা করিস না কেন। আসলে তোর ঐ যন্ত্র বিগড়ে গিয়েছে, কোথাও কোনো গণ্ডগোল হয়েছে—'

কোনো উত্তর না-দিয়েই কাপ্তেন পেরিনি যন্ত্রটার কাছে গিয়ে হাজির হয়েছেন। 'বিগড়ে গিয়েছে!' ভীষণ-উত্তেজিত হ'য়ে তিনি ব'লে উঠেছেন। 'এটা এতটাই বিগড়ে গিয়েছে যে আমি কাগজের ফিতেটায় পড়তে পারছি: "কাপ্...তেন...কাপ্...তেন...মার...*কাপ্তেন মার্সেনে*"!'

'আমার নাম?' তাঁর বন্ধু হেসে উঠেছেন। 'উঁহু, দোস্ত, বিলকুল বৃথা চেষ্টা! আমাকে তুই ওভাবে *ছেলেভোলাতে* পারবি না!'

'তোরই নাম!' এতটাই উত্তেজিত হ'য়ে পেরিনি কথাটা বলেছেন যে শেষটায় তাঁরই উত্তেজনার ছোঁয়াচ লেগেছে কাপ্তেন মার্সেনের মধ্যে।

যন্ত্রটা এখন থেমে গিয়ে, দুই বন্ধুর ফ্যালফ্যাল চোখের সামনে চুপ ক'রেই থেকেছে। একটু পরেই কিন্তু ঐ আশ্চর্য টরে-টক্কার খটখট আবার শুরু হ'য়ে গেছে।

'দ্যাখ-দ্যাখ! আবার শুরু করেছে!' পেরিনি ততক্ষণে কাগজের ফিতেটার ওপর ঝুঁকে পড়েছেন। 'হুম! এখন দেখি তোর ঠিকানা ফুটে উঠেছে: *টিমবাকটু*!'

'টিমবাকটু!' মার্সেনে হুবহু এক কলের পুতুলের মতো কথাটা আবার আউড়েছেন। এবার উত্তেজনায় নিজেই কাঁপতে শুরু ক'রে দিয়েছেন, কী-এক অজানা আশঙ্কায়!

যন্ত্রটা দ্বিতীয়বারের জন্যে আবার থেমে গিয়েছে। তারপর, একটু বিরতি দিয়েই কাগজের ছাপা ফিতে আবার ভাঁজের পর ভাঁজ খুলে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে—কিন্তু তারপরে আবারও একবার থেমে গিয়েছে।

'*জেন ব্রেজন*!' পেরিনি জোরে-জোরে পড়েছেন!

'উঁহু, এমন-কাউকে আমি চিনি না!' মার্সেনে জানিয়েছেন, নিজেই জানেন না কেন কথাটা বলবার সময় তাঁর এমন স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো। 'হয়তো আমাদের সঙ্গে কেউ মজা করবার চেষ্টা করছে!'

'মজা করবার চেষ্টা করছে!' পেরিনি বিষম ভাবনায় প'ড়ে গেছেন। 'কিন্তু তারা কেউ জানবে কী ক'রে যে আমার কাছে *বেতারটেলিগ্রাফের* যন্ত্র আছে?...দ্যাখ-দ্যাখ, আবার টরে-টক্কা শুরু হ'য়ে গেছে।'

ফিতেটার ওপর ঝুঁকে প'ড়ে, বানান ক'রে-ক'রে, যখনই কোনো কথা এসেছে, পড়েছেন পেরিনি: 'জেন...মোর...নাসের...উদ্ধারের...জন্যে...আ...সুন!'

'জেন মোরনাস!' মার্সেনের মনে হয়েছে তাঁর বুঝি দম বন্ধ হ'য়ে যাবে। তাঁর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উর্দির গলার বোতামটা খুলে দিয়েছেন তিনি।

'চুপ!' পেরিনি তখনও পড়ছেন : 'ব্ল্যাক...ল্যাণ্ডে...বন্...দিনী...'

চতুর্থবারের জন্যে টরেটক্কা আবার বন্ধ হ'য়ে গেছে। পেরিনি সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়েছেন। তাঁর বন্ধুর তখন কাহিল দশা! চোখদুটো গোল-গোল, মুখটা রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে। 'তোর আবার কী হ'লো?'

'তোকে পরে বলবো,' মার্সেনের মুখ দিয়ে যেন কোনো আওয়াজই বেরুতে চায়নি। 'কিন্তু ব্ল্যাকল্যাণ্ড?...এই *ব্ল্যাকল্যাণ্ডের* মানে কী হ'তে পারে ব'লে তোর মনে হয়?'

পেরিনির আর উত্তর দেবার কোনো অবসর আসেনি। যন্ত্রটা আবারও টরে-টক্কা শুরু ক'রে দিয়েছে, আর তিনি থেমে-থেমে পড়েছেন : '*অক্ষাংশ...পনেরো...ডিগ্রি...পঞ্চাশ...মিনিট...উত্তর...দ্রা-ঘিমাংশ...*'

যন্ত্রটার ওপর ঝুঁকে প'ড়ে দুই বন্ধু বেশ কিছুক্ষণ উদ্‌গ্রীবভাবে অপেক্ষা করেছেন আবার কখন টরে-টক্কা-টক শুরু হয়, কিন্তু যন্ত্র আর-কোনো কথা বলেনি—এবার সে একেবারেই চুপ ক'রে গেছে—মর্স-গ্রাহকযন্ত্র সম্পূর্ণ মৌন।

কাপ্তেন পেরিনি চিন্তার সুরে আপন মনেই বলেছেন : 'এ-যে দেখছি ভারি-কড়া একপেয়ালা চা! এই বনে-জঙ্গলে আর-কোনো শখের বেতারপাগল আছে নাকি? এমন-কেউ, যে আবার তোকে চেনে!' তারপরেই বন্ধুর দিকে ফিরে তাকিয়ে তিনি আঁৎকে উঠেছেন। 'এ-কী রে, তোর আবার কিছু হ'লো নাকি? তোকে যে অমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে!'

চট ক'রে, সংক্ষিপ্ত দু-চারটে কথায়, কাপ্তেন মার্সেনে তাঁর এমন বিচলিত হ'য়ে -পড়ার কারণ খুলে বলেছেন বন্ধুকে। যদি কাগজের ফিতেয় নিজের নাম দেখে তাঁর শুধুই বিস্ময় হ'য়ে থাকে, পরক্ষণেই তা বদলে গেছে তীব্র আবেগের আলোড়নে, ঠিক যে-মুহূর্তে পেরিনি জেন মোরনাসের নামটা উচ্চারণ করেছেন। হ্যাঁ, জেন মোরনাসকে তিনি চেনেন, তাকে তিনি ভালোবাসেন, আর যদিও এ নিয়ে দুজনের মধ্যে কোনোই কথা হয়নি, তবু তাঁর দৃঢ় ধারণা—না কি আশা?—যে একদিন তাঁর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে।

কর্নেল সাঁৎ-ওবানের ফরমানটার রহস্য তাঁকে কতখানি বিচলিত ক'রে তুলেছে, সেটা তাঁর এক্ষুনি মনে প'ড়ে গেছে। মহাশূন্য থেকে এই-যে রহস্যময় বার্তা অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হাজির, সেটা তাঁর সব আশঙ্কাকেই সত্য ব'লে প্রমাণিত করেছে। জেন মোরনাস এখন ভয়ংকর বিপদের মধ্যে!

'আর আমার কাছেই কি না উদ্ধারের জন্যে আকূতি জানিয়েছে!' তাঁর এই বিচলিত অবস্থাতেও কোথাও-বুঝি একটু উল্লাসও চাপা প'ড়ে ছিলো।

'আরে, এ-তো খুবই সহজ কাজ! মেয়েটিকে সাহায্য করবার জন্যে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়। হয়তো নতুন-কোনো সেণ্ট জর্জ আর ড্র্যাগনের গল্পই—'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সাহায্য করতে যে যাবো, তা ঢাক পিটিয়ে না-বললেও চলে!' কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার সম্ভাবনায় চনমনে বোধ করেছেন মার্সেনে। 'কিন্তু কেমন ক'রে?'

'সেটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে,' পেরিনি তাঁকে বলেছেন। 'কিন্তু গোড়ায় তথ্যগুলো সব সাজিয়ে নিয়ে দেখতে হবে আমরা কদ্দুর কী জানি। কোনো যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারলে আমার ভারি-আশ্বস্ত লাগে—সব অস্বস্তি কেটে যায়।'

'তাহ'লে ঐ সিদ্ধান্তে গিয়ে তুইই পৌঁছুবার চেষ্টা কর!' তেতোসুরে বলেছেন মার্সেনে।

'হ্যাঁ, আমিই পৌঁছুবো...*প্রিমো.* মাদ্‌মোয়াজেল মোরনাস মিশ্চয়ই কোথাও একাকিনী আকুল হ'য়ে ব'সে নেই, কেননা তাঁর কাছে কস্মিনকালেও কোনো বেতারযন্ত্র ছিলো না। আর তাঁর সঙ্গী ছিলো, অন্তত তুই যাঁদের সঙ্গে তাঁকে রেখে এসেছিলি, তাঁদেরও কারু কাছে কোনো বেতারে খবর পাঠাবার যন্ত্র ছিলো না। অতএব তাঁর এখন নতুন-একজন রক্ষাকর্তা আছেন, যাঁর কাছে অমন-একটা যন্ত্র আছে। আর তিনি বিশেষজ্ঞ, ওস্তাদ লোক, এটা আমি বাজি ধ'রে বলতে পারি।'

মার্সেনে ঘাড় হেলিয়ে সায় দেয়ায়, পেরিনি আবার বলেছেন :

'*সেকুন্দো.* মাদ্‌মোয়াজেল মোরনাসের আপাতত, অন্তত সাময়িকভাবে হ'লেও, কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। তিনি তোকে টিম্‌বাকটুতে বেতারে খবর পাঠিয়েছেন। তাঁর ধারণা, তুই এখন টিম্‌বাকটুতেই আছিস, কাজেই এটাও তিনি জানেন যে তুই এখন তাঁর ঠিক দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নেই, কোনো সদুত্তর দিতে তোর একটু সময়ই লেগে যাবে। অথচ তবু যখন বেতারে এই বার্তা পাঠিয়েছেন, তাঁর নিশ্চয়ই ধারণা হয়েছে যে এই আবেদন নেহাৎই বিফলে যাবে না। কাজেই, বিপদ যদি মাথার ওপর ঝুলেও থাকে, তবে এক্ষুনি চট ক'রে কোনো গণ্ডগোল পাকাবে না।'

একটু ঘাবড়ে গিয়েই মার্সেনে জিগেস করেছেন : 'তুই তাহ'লে কী বলতে চাচ্ছিস?'

'যে, আপাতত তুই একটু মাথা ঠাণ্ডা ক'রে থাক—অন্তত এ-ভরসা রাখ যে এ-গল্পটা ককখনো শোচনীয়ভাবে শেষ হবে না...এক্ষুনি গিয়ে কর্নেলকে বল মঁসিয় ল্য দেপুতেকে উদ্ধার করবার জন্যে একফোঁটাও সময় নষ্ট না-ক'রে একটা বাহিনী পাঠিয়ে দিতে অভিযানে—তাতে তুই ফাউ পেয়ে যাবি মাদ্‌মোয়াজেল মোরনাসকেও!'

দুজন কাপ্তেনই তক্ষুনি বেরিয়ে পড়েছেন কর্নেল আলেজ-এর খোঁজে, তারপর তাঁকে বিশদভাবে পুরো বৃত্তান্তটাই খুলে বলেছেন, জানিয়েছেন এইমাত্র অপ্রত্যাশিতভাবে বেতারে কী খবর এসেছে। তাঁরা তাঁকে কাগজের ফিতেয় ছাপা টরে-টক্কা দেখিয়েছেন, আর পেরিনি সে-খবর *সহজ ফরাশিতে তর্জমা ক'রে* শুনিয়েছেন।

'এখানে তো মঁসিয় বারজাক সম্বন্ধে কোনো খবর নেই,' কর্নেল বলেছেন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, তা নেই,' পেরিনি বলেছেন, 'তবে মাদ্‌মোয়াজেল মোর্‌নাস তো তাঁর সঙ্গেই ছিলেন—'

'তিনি যে বারজাক মিশন ত্যাগ ক'রে নিজের পথে চ'লে যাননি, তা-ই বা কে জানে?' কর্নেল আপত্তি তুলেছেন। 'বারজাক মিশন কোন-কোন রাস্তা দিয়ে যাবে, সে-খবর আমি জানি। এটা বলতে পারি যে অত উঁচু অক্ষরেখায় এ-সফর গিয়ে পৌঁছুতেই পারে না। মিশনের যাবার কথা ছিলো উয়াগাদাদুসু দিয়ে, সেটা তো বারো ডিগ্রি অক্ষরেখায়, সায়ীর পরেই, আর সায়ী তেরো ডিগ্রিতে। এই রহস্যময় বার্তা বলছে পনেরো ডিগ্রি পঞ্চাশ মিনিট—ধরা যাক ষোলো ডিগ্রিই।'

এই মন্তব্যটা কিন্তু মার্সেনের স্মৃতিকে উশ্‌কে দিয়েছে।

'আপনি ঠিকই বলেছেন, মাদ্‌মোয়াজেল মোরনাস হয়তো বারজাক মিশনের সঙ্গে না-গিয়ে অন্য পথে গিয়েছেন। আমার মনে পড়ছে, তিনি বলেছিলেন সিকাসোর শো-খানেক মাইল পরে একাই উত্তরমুখো যাবেন, তাঁর ইচ্ছে ছিলো গাওতে গিয়ে নাইজারে পড়বেন।'

'সেটা অবিশ্যি সবকিছুর ছক পালটে দিচ্ছে,' কর্নেল গম্ভীরসুরে বলেছেন। 'মঁসিয় বারজাককে উদ্ধার করবার জন্যে সৈন্য পাঠানো এককথা, কেননা তিনি সংসদের একজন মাননীয় সদস্য, ফরাশি সরকারের পাঠানো কোনো প্রতিনিধি দলের নেতা। কিন্তু মাদ্‌মোয়াজেল মোর্‌নাস তো নিছকই সাধারণ-একজন নাগরিক—বেসরকারি—'

'তবু,' একটু জোর দিয়েই বলেছেন মার্সেনে, 'আমি যে ফরমানটা নিয়ে এখানে এসেছি সেটা যদি জাল হয়, সবকিছু দেখেশুনে এখন তো তা-ই মনে হচ্ছে, তাহ'লে যে-রাস্কেলটা এসে আমার জায়াগা নিয়েছিলে, মঁসিয় বারজাক নিশ্চয়ই তারই কোনো চক্রান্তের বলি হয়েছেন!'

'হ্যাঁ, তা হ'তে পারে, খুবই সম্ভব সেটা,' কর্নেলের খুঁতখুঁতুনি কিন্তু এ-কথাতে কাটেনি, 'কিন্তু গোটা ব্যাপারটার মীমাংসা করবার জন্যে আমাদের তো বামাকো থেকে কোনো-একটা উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।'

'কিন্তু এটাও তো বিষম-জরুরি,' কেমন বিহ্বলভাবে বলেছেন মার্সেনে। 'যখন সাহায্যের জন্যে এমন-ব্যাকুলভাবে আবেদন জানিয়েছেন, তখন এই তরুণীকেও তো আমরা বিপদের মুখে ফেলে রাখতে পারি না।'

'বিপদ ঠিকই, কেননা তিনি বলেছেন তিনি কোথাও বন্দী হ'য়ে আছেন,' কর্নেল শান্তভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, 'কিন্তু এটা বলেননি যে এক্ষুনি না-গেলে তাঁর মৃত্যুর আশঙ্কা আছে।... তাছাড়া উদ্ধার করতে যাওয়া যাবেই বা কোথায়? এ-কোন ব্ল্যাকল্যাণ্ডের কথা তিনি বলছেন?'

'তিনি আমাদের অক্ষরেখা জানিয়েছেন।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ, কিন্তু দ্রাঘিমাংশটা কী ? মাদমোয়াজেল মোরনাসকে সিকাসোর ওদিকটায় রেখে-আসা হয়েছিলো। তিনি নিশ্চয়ই ফের পশ্চিমদিকে ফিরে যাননি। ষোলো ডিগ্রি অক্ষরেখা প্রথমে যায় মাসিনা দিয়ে, তারপর নাইজার পেরিয়ে সোজা গিয়ে উধাও হয় মরুভূমির মধ্যে —যে-মরুভূমির কথা কারুই কিছু জানা নেই। ব্ল্যাকল্যাণ্ড নিশ্চয়ই মাসিনায় নেই, তাহ'লে তার কথা আমরা জানতুম, তাহ'লে তো এই ব্ল্যাকল্যাণ্ডকে খুঁজতে সোজা মরুভূমিতে গিয়ে পৌঁছুতে হয় আমাদের।'

'কিন্তু...'

'না, কাপ্তেন, আমি তো বুঝতে পারছি না ঐ মরুভূমির মধ্যে একদল সৈন্য আমি পাঠাবো কী ক'রে ? সে-তো মাত্র একজন বেসরকারি নাগরিককে উদ্ধার করবার জন্যে একশো-দুশো সৈন্যের জীবন বিপন্ন করা হবে!'

'দুশো লোক লাগবে কেন ?' মার্সেনের মনে হচ্ছিলো তাঁর সব আশা বুঝি উধাও হ'য়ে যাচ্ছে। 'অনেক-কম লোক হ'লেই চলবে।'

'আমার তা মনে হয় না, কাপ্তেন। নাইজারের তীর ধ'রে যে-সব গুজব ছড়াচ্ছে, তার কথা আমরা সবাই জানি। কালোদের মধ্যে রব উঠেছে যে কোনখানে নাকি—কেউ জানে না কোন-চুলোয়—একটা সাম্রাজ্য গ'ড়ে উঠেছে, যার সম্বন্ধে খুব-একটা ভালো ধারণা পোষণ করবার কোনো কারণ নেই। ব্ল্যাকল্যাণ্ড নামটা যেহেতু চেনা নয়, সেইজন্যে এমনও হ'তে পারে যে এটা সেই সাম্রাজ্যের রাজধানী কিংবা কোনো বড়োশহর। যে-অক্ষাংশটা পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয় ও-রকম কোনো সাম্রাজ্য ওখানেই প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে থাকতে পারে—কেননা শুধু ওখানেই থাকলে তার সম্বন্ধে কোনো কথা জানবার উপায় কারু থাকে না। তাছাড়া, *ব্ল্যাকল্যাণ্ড* নামটা তো ইংরেজি—সেটা একটু অদ্ভুত নয় ? ঐ অনুমিত অবস্থান থেকে ইংরেজদের উপনিবেশ সোকোটো খুব-একটা দূরে নয়...সেটা হয়তো আরেকটা ঝামেলা পাকাবে, একেবারে মৌচাকে ঢিল মারার শামিল হবে...আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কথাও ভেবে দেখতে হয়...অর্থাৎ, এত-সবকিছু বিবেচনা ক'রে, আমার মনে হয়, ও-রকম কোথাও কোনো অভিযানে বেরুবার ঝুঁকি অনেক-তাতে অল্প লোক নিয়ে কিছুতেই যাওয়া চলে না।'

'তাহ'লে, কর্নেল, আপনি সাহায্য পাঠাতে রাজি নন ?'

'অত্যন্ত দুঃখ হ'লেও, এ-কথা আমি বলতে বাধ্য যে এই ঝুঁকি আমি কিছুতেই নিতে পারি না।'

কাপ্তেন মার্সেনে তারপরেও একগুঁয়ের মতো লেগে থেকেছেন। বন্ধুকে যেমন বলেছিলেন, তেমনিভাবেই কর্নেলকেও তিনি বলেছেন মাদমোয়াজেল মোরনাসের সঙ্গে তাঁর কী-রকম হার্দ্য সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে। কিন্তু এই হৃদয়ঘটিত স্বীকারোক্তিতেও কোনো কাজ হয়নি। পরে তিনি আরো বলেছেন, তিনি নিজেই তো একশো সৈন্য নিয়ে এসেছেন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—এবং এখানে কেউই তাদের আসার প্রত্যাশা করেনি, ফলে শুধু তাদের নিয়েই তো তিনি চ'লে যেতে পারেন—কিন্তু এত আবেদন-নিবেদনে কোনো ফল হয়নি। কর্নেল আলেজ কিছুতেই তাঁর সংকল্প থেকে নড়েননি।

'আমি দুঃখিত, কাপ্তেন, গভীরভাবেই দুঃখিত। কিন্তু এই প্রস্তাবটা নাকচ ক'রে দেয়া আমার কর্তব্য। আপনি যে-সৈন্যবাহিনী সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তাদের হয়তো এখানে কোনোই দরকার নেই, কিন্তু তবু, তারাও তো মানুষ, আমি তাদের জীবন-মরণ নিয়ে এমন হালকাচালে ছিনিমিনি খেলতে পারি না। তাছাড়া অত তাড়াই বা কীসের? আমরা বরং মাদমোয়াজেল মোরনাসের কাছ থেকে আরেকটা খবর আসার জন্যে সবুর ক'রে দেখি। একবার যখন তিনি টেলিগ্রাফ করতে পেরেছেন, তখন হয়তো আবার তিনি টেলিগ্রাফ করার চেষ্টা করবেন।'

'আর যদি না-করেন,' হতাশায় তলিয়ে যেতে-যেতে বলেছেন কাপ্তেন মার্সেনে। 'তাঁর এই অসমাপ্ত বার্তা থেকে কোন্ সিদ্ধান্তে গিয়ে তবে আমরা পৌঁছুবো?'

কর্নেল শুধু দুঃখিত ভঙ্গি করেছেন, কিছু কিছুতেই তিনি তাঁর মত পালটাতে রাজি হননি।

'তাহ'লে আমি একাই যাবো,' এতক্ষণে দৃঢ়স্বরে ঘোষণা ক'রে উঠেছেন মার্সেনে।

'একা?'

'হ্যাঁ, কর্নেল। আমি ছুটির দরখাস্ত করবো, আপনি সেটা নামঞ্জুর করতে পারবেন না—'

'উঁহু, ঠিক তার উলটোই, আমি এ-ছুটি কিছুতেই মঞ্জুর করতে পারবো না।' কর্নেল শান্ত গলায় বলেছেন : 'আপনি কি ভেবেছেন আপনাকে আমি এমন-একটা অ্যাডভেনচারে ঝাঁপ খেয়ে পড়তে দেবো, যেখান থেকে আপনি হয়তো সশরীরে আর ফিরতেই পারবেন না।'

'সে-ক্ষেত্রে, কর্নেল, আমি আপনাকে অনুরোধ করবো অনুগ্রহ ক'রে আমার ইস্তফাপত্র গ্রহণ করতে।'

'আপনার ইস্তফা?'

'হ্যাঁ, কর্নেল।'

কর্নেল আলেজ গোড়ায় কোনো কথাই খুঁজে পাননি। তাঁর অধীনস্থ এই সাহসী ও বেপরোয়া মানুষটির দিকে তাকিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছেন, মার্সেনে এখন ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। প্রায় অভিভাবকের সুরেই তিনি বলেছেন : 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, কাপ্তেন, যে আপনার ইস্তফাপত্র কতগুলো সরকারি দফতর দিয়ে যাবে—আমার হাতে এই ইস্তফা গ্রহণ করবার কোনো ক্ষমতাই নেই। তাছাড়া, এত-বড়ো একটা সিদ্ধান্ত নেবার আগে একটু পুনর্বিবেচনা ক'রে দেখারও প্রয়োজন আছে। আজ রাতটা বরং এ নিয়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা ভাবি—কাল এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। এ নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা ক'রে দেখা দরকার।'

পোশাকি-একটা সেলাম ঠুকে, দুই বন্ধু তখন কর্নেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। পেরিনি বন্ধুকে বোঝাতে-বোঝাতে সঙ্গে গেছেন, তাঁকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বেচারা মার্সেনের কানে বুঝি তাঁর একটা কথাও পৌঁছোয়নি। নিজের কোয়ার্টারের কাছে এসেই মার্সেনে বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসে সোজা আছড়ে পড়েছেন তাঁর বিছানায়। অভিভূত, হতাশ, বির্মষ মার্সেনে তারপর ফুঁপিয়ে উঠেছেন অঝোর কান্নায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়

# দুর্বিপাক

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রে তড়িৎপ্রবাহ সাময়িকভাবেই বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো, কেননা এই বিরতি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৯ই এপ্রিল স্থগিত হয়েছিলো তড়িৎপ্রবাহ, ফিরে এসেছিলো পরের দিন সকালেই। বাস্তবিক, এই বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ ক'রে দেবার ফলে তার প্রথম বলি হয়েছিলো হ্যারি কিলার নিজেই। গোড়ায় নিজেকে তার দারুণ বুদ্ধিমান ব'লে মনে হয়েছিলো। ভাবখানা : *কেমন জব্দ করেছি* ! কিন্তু কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ক'রে দেবার ফলে, কারখানার কাছ থেকে যে-সব সেবা পেতে সে অভ্যস্ত, কারখানা উলটে সে-সবই বন্ধ ক'রে দিয়েছিলো। চাষের যন্ত্রপাতি আচমকা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হ'য়ে যাওয়ায় আচমকাই থমকে থেমে গিয়েছিলো। যে-পাম্প দিয়ে নদী থেকে জল তুলে জলাগারগুলোয় ভরা হ'তো, তারাও অকেজো হ'য়ে গিয়েছিলো। জলাগার ছিলো দুটো : একটা কারখানায় জল জোগাতো; অন্যটা জল জোগাতো ব্ল্যাকগার্ডদের বস্তিতে —আর সেখান থেকে, সারা শহরে। দু-দিনেই এই দ্বিতীয় জলাগার খালি হ'য়ে গিয়েছিলো, সারা ব্ল্যাকল্যাণ্ডে জলের জন্যে হাহাকার প'ড়ে গিয়েছিলো। আর, তারপর, রাত্তিরে বিজলি বাতি নেই—আর আলো জ্বালাবার যেহেতু অন্যকোনো বিকল্পব্যবস্থাই ছিলো না, সারা শহরটাই তলিয়ে গিয়েছিলো নিকষ অন্ধকারে। আর সেটা হ্যারি কিলারকে একেবারে খেপিয়ে তুলেছিলো, বিশেষত রাজভবন থেকে সে দেখতে পাচ্ছিলো কারখানা শুধু আলোয় ঝলমলই করছে না, চারপাশে সে জোরালো-সব সন্ধানী আলো জ্বেলে রেখেছে, যাতে রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে কেউ এসে হামলা চালাতে না-পারে। শেষটায় সে যখন হাড়ে-হাড়ে টের পেয়ে গেছে বিপক্ষের হাতের তাশ তার চেয়ে জোরালো, রাগে ফোঁস-ফোঁস করতে-করতে সে নিজেই ফের জলবিদ্যুৎউৎপাদনকেন্দ্র চালু করতে বাধ্য হয়েছে—প্রায় নিজের থুতু গেলার মতোই, কেননা আগের দিন সে নিজেই বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ক'রে দেবার হুকুম দিয়েছিলো। সেইসঙ্গে সে একটা ফোনও করেছে মার্সেল কামারেকে। তিনি তখন তাঁর অতিথিদের সঙ্গে নিজের পড়ার ঘরেই বসেছিলেন।

অতিথিরা শুনতে পেলেন, বৈজ্ঞানিক আগের দিনের মতোই হুঁ-হাঁ ক'রে উত্তর দিচ্ছেন। 'হ্যাঁ,' 'না,' 'বেশ'—এর বেশি কিছুই বলছেন না, আর এই খুচরো কথাগুলো থেকে মোটেই বোঝা যাচ্ছিলো না হ্যারি কিলার অন্যপ্রান্তে কী বলছে। আগের মতোই, এবারও, বৈজ্ঞানিক হো-হো ক'রে হেসে উঠে রূঢ়ভাবেই রীসিভার নামিয়ে রেখেছেন।

অতিথিদের তিনি যে-সংক্ষিপ্তসার দিলেন, তার মর্মার্থ এই : হ্যারি কিলার আর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি নাকি সাময়িক এক সন্ধিতে পৌঁছেছেন। ঠিক হয়েছে, জলবিদ্যুৎকেন্দ্র ফের বিদ্যুৎ জোগাবে, বদলে কারখানা ব্ল্যাকল্যাণ্ডের বাকি পরিষেবাগুলো বজায় রাখার ব্যবস্থা করবে। এই সন্ধিচুক্তিতে, অবশ্য, বাকি-অবস্থার কোনো হেরফের হয়নি—ফলে গোটা ব্যাপারটাই কেমন অদ্ভুত আর জটিল হ'য়ে উঠেছে। শান্তির প্রস্তাব শুধু ঐ একটা ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ। বাকি সংঘর্ষটা এখনও চলছে। হ্যারি কিলার বিশেষভাবে হুমকি দিয়ে দাবি করেছে বন্দীদের ফেরৎ পাঠানো হোক, এবং মার্সেল কামারে শুধু ছোট্ট ক'রে ঠাণ্ডাভাবে জানিয়েছেন এ-প্রস্তাবে তিনি আদৌ রাজি নন।

কথাবার্তার শেষে হ্যারি কিলার নাকি তার হেলিবিমানগুলোর জন্যে তাঁর কাছে তরল বাতাস চেয়েছিলো। যখনই কোনো সফর-শেষে হেলিবিমানগুলো ফিরে আসে, তখন তাদের জ্বালানির ট্যাঙ্ক থাকে ফাঁকা, সেগুলো ফের জ্বালানি দিয়ে ভর্তি ক'রে ফেলবার জন্যে কারখানায় এনে রাখা হয়। হ্যারি কিলারের কাছে আর একফোঁটাও তরল আগুন নেই, আর তার ফলে তার চল্লিশটা হেলিবিমান অকেজো হ'য়ে প'ড়ে আছে। এ-ব্যাপারেও মার্সেল কামারে সোজাসুজি তার আরজিটা নাকচ ক'রে দিয়েছেন। প্রথমত, নিজের হাতে যাতে এই শক্তি প্রচুর পরিমাণে মজুদ থাকে সেটা তাঁকে দেখতে হয়েছে। আর দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁর শত্রুর হাতে এত-বড়ো একটা হাতিয়ার তুলে দিতে রাজি হননি। তাতে নাকি হ্যারি কিলার খেপে-বোম, হুমকি দিয়ে বলেছে সে নাকি কারখানাকে অনাহারে শুকিয়ে মারবে। আলোচনার ঠিক এইখানটাতেই বৈজ্ঞানিক হুমকিটাকে হো-হো ক'রে হেসে উড়িয়ে দিয়ে রীসিভার নামিয়ে রেখেছেন।

তাঁর শ্রোতারা অবশ্য হ্যারি কিলারের শাসানিটাকে বেশ গুরুত্বই দিয়েছেন। কামারে যে-প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গ'ড়ে তুলেছেন, তার ফলে কারখানা যদি-বা একটা অভেদ্য দুর্গের মতোই হয়, তবু এটা ঠিক যে আক্রমণ করার মতো অস্ত্রশস্ত্র তেমন-কিছু নেই এই কারখানায়, তাছাড়া যদি-বা কিছু থেকেও থাকে, বৈজ্ঞানিক তা কিছুতেই কাজে লাগাবেন না। এ-রকম অবস্থায়, দু-পক্ষের কেউই যদিও আপাতত বাজিমাৎ করতে পারবে না, কিন্তু ভবিষ্যতে এমন-একটা দিন নিশ্চয়ই আসবে যখন খাবারের অভাবেই কারখানা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে।

বারজাক যখন এ-সম্ভাবনাটার কথা তুলেছেন, কামারে শুধু তাঁর কাঁধ ঝাঁকিয়েছেন, বলেছেন, 'বেশ-কিছুদিনের উপযোগী রসদ আমাদের হাতে আছে।'

'কিন্তু কতদিনের জন্যে?'

কামারে একটু বুঝি এড়িয়েই গেছেন। 'আমি ঠিক জানি না, তবে পনেরো দিন—কিংবা তিনহপ্তার মতো খাবারদাবার নিশ্চয়ই আছে। সেটা অবশ্য আদৌ পাত্তা দেবার মতো ব্যাপার নয়, কারণ আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা নিজেরাই একটা হেলিবিমান বানিয়ে নিতে পারবো—নির্মাণের কাজ শুরু হ'য়ে গেছে। আপাতত আমি শুধু আপনাদের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মহড়াতেই অংশ নিতে বলবো, আমরা অবশ্য রাত্তিরেই প্রথমবার চালিয়ে দেখবো সব ঠিকঠাক আছে কি না, যাতে রাজভবন ব্যাপারটার কোনো আঁচ না-পায়। মহড়াটা হবে পরশুদিন, ১২ই এপ্রিল, ভোররাতে, চারটের সময়।'

এটা একটা শুভসংবাদ বটে। বন্দীরা এর কথাটা আগে ভাবেননি। হেলিবিমান থাকা মানে অবস্থাটা অনেকটা আয়ত্তে চ'লে-আসা। কিন্তু তার মারফৎ কি শেষ-অব্দি সত্যি উদ্ধার আসবে? নিষ্কৃতি পাবেন তাঁরা এখান থেকে?

'কারখানায় একশোজনেরও বেশি লোকজন আছে,' বারজাক মনে করিয়ে দিয়েছেন। 'আপনার হেলিবিমান যত-শক্তিশালীই হোক, তাদের সবাইকে তো আর এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে না।'

'পাইলটকে বাদ দিয়ে আর শুধু দশজনকে নিয়ে যেতে পারবে,' কামারে জানিয়েছেন। 'সেটা নেহাৎ মন্দ নয়।'

'চমৎকার!' বারজাক সায় দিয়েছেন। 'অথচ তবু আপনাদের সবাইকে এই আপদটা থেকে বাঁচাতে পারবে না!'

'উঁহু, মোটেই তা নয়।' কামারে উত্তর দিয়েছেন। 'কাকের ওড়ার পথে, সায়ী থেকে এ নেহাৎ দুশো মাইল দূরে, আর টিম্‌বাকটু থেকে প্রায় সাড়ে-চারশো মাইল—সেটা হয়তো আরো-ভালো। *উড়াল-টরপেডোগুলোর* হাত এড়াবার জন্যে আমরা যেহেতু শুধু রাত্তিরেই পাড়ি জমাতে পারবো। হেলিবিমান আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সায়ীতে তিনবার আর টিম্‌বাকটুতে দু-বার পাড়ি দিতে পারবে। কারখানায় যে-পাঁচশো জন লোক আছে, নারী ও শিশু শুদ্ধু, তাদের সায়ী নিয়ে যেতে লাগবে মোট পাঁচদিন আর টিম্‌বাকটু যেতে আটদিন!'

এই পরিকল্পনাটার আলোচনা অন্তত এই সুফল ফলিয়েছে যে হ্যারি কিলারের হুমকির ফানুশের মধ্য থেকে সব হাওয়া বার ক'রে দিয়েছে, আর মনে হয়েছে এভাবে ব্ল্যাকল্যাণ্ড থেকে উদ্ধার-পাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। অধীরভাবে এখন শুধু সবুর ক'রে থাকতে হবে কখন এই পরিকল্পনাটাকে কাজে খাটানো যায়।

এই চারপাশ-থেকে-ঘেরাও-হওয়া দুর্গটার মধ্যে এই দু-দিনের অপেক্ষাই যেন অনন্তকাল ব'লে মনে হ'লো। তারই মধ্যে যতটা-সম্ভব ভালোভাবেই দিন কাটাবার চেষ্টা করেছেন তাঁরা, বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে বাগানে ঘুরে বেড়িয়ে, তার উঁচু দেয়ালটার জন্যে রাজভবনের হামলার হাত থেকে এই বাগান অনেকটাই সুরক্ষিত। মঁসিয় পঁসাঁ, *বিশেষত*, সকাল থেকে রাত সারাক্ষণই-প্রায় বাগানেই কাটিয়ে দিয়েছেন। সারাক্ষণ উদ্ভিদগুলোর ওপর ঝুঁকে প'ড়ে, একটা পরকলার সাহায্যে তাদের মাপজোক নিয়েছেন তিনি, আর সবকিছু তাঁর খাতায় টুকে নিয়েছেন।

'এ আপনি করছেন কী?' তাঁকে ব্যস্তভাবে এ-সব টুকে রাখতে দেখে একবার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমেদে ফ্লরেঁস আর তাঁর কৌতূহল চাপতে পারেননি।

'এ তো আমার কাজ, মঁসিয় ফ্লরেঁস,' কিঞ্চিৎ কেউকেটার ভঙ্গি ক'রেই বলেছেন মঁসিয় পঁসাঁ।

'পরিসংখ্যান?'

'তা ছাড়া আর কী। আমি শুধু হিশেব ক'রে দেখছি নাইজার নদীর বাঁক কতজনকে লালন করতে পারবে।'

'আহা! সবসময়েই নদীর বাঁক! আমার কাছে অবিশ্যি মনে হচ্ছে যে আমরা ঐ বাঁকেও গিয়ে থাকবো না, এখানেও থাকবো না! তাছাড়া, বাঁক কোথায় তার ঠিক কী —আপনি মাপজোক নিচ্ছেন সেখান থেকে এত-দূরে!'

প্রায় পণ্ডিতি চালে মঁসিয় পঁসাঁ জবাব দিয়েছেন, 'তাই ব'লে আমরা যে তুলনা ক'রে কোনো ধারণা করতে পারবো না, তা বলা যায় কি?'

এমন সময় ডাক্তার শাতোনে এসে হাজির হয়েছেন সেখানে। 'আপনারা এখানে কী করছেন!'

'মঁসিয় পঁসাঁ পরিসংখ্যানবিদ্যার কারিকুরি বোঝাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ব্যাপারটা খুবই সহজ,' বলেছেন মঁসিয় পঁসাঁ। 'ধরুন এই পালং শাক, চার বর্গ ইঞ্চি জায়গা জুড়ে আছে। তারপরেই ওদিকটায় দেখতে পাবেন একটা ফুলকপি —সে জায়গা নিয়েছে ষোলো বর্গ ইঞ্চি। আমি এমনিভাবে এলোমেলো ভঙ্গিতে একশো উদ্ভিদের মাপজোক নিয়েছি। গড়ে তারা কতটুকু ক'রে জায়গা জোড়ে তারও একটা হিশেব করেছি। তেমনি রোজ এরা কতখানি ক'রে বাড়ে, তারও একটা হিশেব নিয়েছি আমি। ধরুন এই লেটুস, কালকের চাইতে এই লেটুস ঠিক আটগ্রামের ৬১.৭ ভাগ বেড়েছে। অর্থাৎ আমি *গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে* নির্ধারণ করেছি দৈনন্দিন বৃদ্ধির হার একদানার প্রায় .৩৩৯ ভাগ, এক বর্গ ইঞ্চির .৯৬৪ ভাগ।'

'অ্যাঁ! এ তো ভারি তাজ্জব কাণ্ড!' চোখের পাতা না-ফেলেই বলেছেন ডাক্তার শাতোনে।

'সত্যি, তাজ্জব হবারই কথা! ওই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানগুলো সবসময়েই ভারি কৌতূহলোদ্দীপক।' আর তা-ই থেকে হিশেব ক'রে নাকি দাঁড়িয়েছে 'পুরো নাইজারের বাঁকে রোজ খাদ্য ফলতে পারে ১২,০১২,০০০টন—আর বৎসরে—'

'আমার সন্দেহ নেই এ-সব হিশেব-টিশেব ভারি-চিত্তাকর্ষক ব্যাপার,' ডাক্তার শাতোনে ফোড়ন কেটেছেন।

'একজন লোকের জীবনধারণের জন্যে যত খাদ্য লাগে, সেটা মাথায় রাখলে নাইজার নদীর বাঁক কত-লোকের জীবন বাঁচাতে পারে, তা সহজেই বার ক'রে নেয়া যায়। আর এই জিনিশটাই পরিসংখ্যানবিজ্ঞান জানিয়ে দিতে পারে। আমি এই চেষ্টাই করছি আমাদের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই কারাবাস যাতে একেবারেই বিফলে না-যায়,' খুবই শান্তসুরে বলেছেন মঁসিয় পঁসাঁ।

'সে-তো আপনারই সৌজন্যে, মঁসিয় পঁসাঁ,' এই ব'লে ডাক্তার শাতোনে আর আমেদে ফ্লরেঁস যুগপৎ, *একযোগে*, সেখান থেকে পালিয়ে বেঁচেছেন।

এইভাবেই একটি-একটি ক'রে ঘণ্টা কেটেছে ১০ই আর তারপরে ১১ই এপ্রিলের।

একটা ছোট্ট ঘটনা, অবশ্য, দ্বিতীয়দিনের একঘেয়েমিটা কিঞ্চিৎ কাটিয়ে দিয়েছিলো। বিকেল পাঁচটা নাগাদ কামারেকে এসে জানানো হ'লো যে যে-পাম্পটা দিয়ে নদী থেকে জল তোলা হয়, সেটা আর কাজ করছে না। কামারেও দেখেশুনে এসে সমস্যাটা স্বীকার করলেন। খ্যাপামি করছে পাম্পটা, যেন সে শূন্যের মধ্যে কাজ করছে, টেনে তোলবার মতো কিছুই পাচ্ছে না। অমনি কামারে নির্দেশ দিলেন তার পিস্টনটা বার ক'রে নিতে, কারণ চাকার চারপাশের কানার বড্ড ক্ষতি হয়েছে, ফলে ঐ সিলিণ্ডারের মাপে-মাপে তা আর বসতে পারছে না। সামান্যই একটা মেরামতির ব্যাপার, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই খুঁতটা সারিয়ে নেয়া যাবে।

পরদিন ভোরের মধ্যেই স্নায়ুখ্যাপানো অপেক্ষা অবশেষে শেষ হ'য়ে গেলো। অনায়াসেই নিশ্চয়ই বোঝা যায় মার্সেল কামারে রাত চারটের সময় *রঁদে-ভু-র* ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও কেউই তখন আর নাসাগর্জন ক'রে ঘুমুচ্ছিলেন না। তিনি তাঁর নিজের কথা রেখেছেন, কাঁটায়-কাঁটায়। বাগান থেকে মহড়ার কাজ শুরু হবে : তাঁরা সবাই বাগানে পৌঁছে দ্যাখেন, যে-প্রকৌশলবিদেরা হেলিবিমানটা বানিয়েছে, তারা এর মধ্যেই সেটাকে বাগানে এনে হাজির করেছে।

মার্সেল কামারে প্ল্যাটফর্মে উঠে মোটরটাকে চালু ক'রে দিলেন। ক-মিনিট কেটে গেলো, দর্শকদের কাছে মনে হচ্ছিলো যেন অনন্তকাল। তাঁরা ভয় পাচ্ছিলেন, যদি কোথাও কোনো ভুলচুক হ'য়ে থাকে। একটু পরেই অবশ্য তাঁদের সব আশঙ্কা দূর হ'য়ে গেলো। হেলিবিমানটা হঠাৎ শূন্যে উঠে গেলো, মেলে দিলো তার দুই পাখা, তারপর কারখানার মধ্যে আকাশে একবার পাক খেয়ে যেখান থেকে রওনা হয়েছিলো, সেখানেই এসে নেমে পড়লো। মার্সেল কামারে এবার দশজন সঙ্গী নিয়ে আকাশে উড়লেন, তিনবার চক্কর খেলেন বাগানের ওপর, পরীক্ষা শেষ। হেলিবিমান তার মহড়ায় সসম্মানে উৎরেছে।

প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে পড়তে-পড়তে তিনি বললেন, 'আজ রাত নটার সময় প্রথম উড়াল।'

আর তাতে সমস্ত দুরবস্থাই যেন একনিমেষে মুছে গেলো : হামলা, কারাবাস, গত পনেরো দিনের রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠা আর তার সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মেশানো একঘেয়েমির বোধ। আর ক-ঘণ্টার মধ্যেই এই নিদারুণ দুঃস্বপ্ন কেটে যাবে। তাঁরা ছাড়া পেয়ে যাবেন। পরস্পরকে অভিনন্দন জানিয়ে শুভেচ্ছাবিনিময় করলেন বন্দীরা, আর মিস্ত্রিরা আবার হেলিবিমানটাকে নিয়ে গেলো তার *হ্যাঙারে*, পরদিন সন্ধেবেলায়, যথাসময়ে সে আসবে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার—টিম্‌বাকটু যাবার জন্যে উড়ানে।

পুরো কারখানা খালি ক'রে সবাইকে নিয়ে যেতে যেহেতু কয়েকটা দিন লেগে যাবে, রোজকার নিয়মিত কাজ তাই ব'লে থামানো চলবে না। বিশেষত পাম্পটা সেদিনই সারিয়ে ফেলা হ'লো। মেরামত করতে গিয়ে দেখা হ'লো ক্ষতি যা হয়েছে তা অতি-নগণ্য। অন্তত সেদিক দিয়ে কোনো গণ্ডগোল কিছু নেই। পাম্পটা কেন খ্যাপার মতো কাজ করছিলো, তার কারণ খুঁজতে হবে অন্য-কোথাও। আপাতত-অবশ্য তাকে আবার জুড়ে বসিয়ে দিলেই কাজ চলবে, আর সে-কাজটা অবিলম্বেই সমাধা করা হ'লো।

সন্ধে সাড়ে-আটটায়, অন্ধকার যখন নিবিড় হ'য়ে গিয়েছে, মার্সেল কামারে অবশেষে প্রস্থানের সংকেত দিলেন। তার অনেক আগেই হ্যারি কিলারের আটজন প্রাক্তন কয়েদি আর দুজন মিস্ত্রির স্ত্রী—প্রথম দফায় তাঁরাই যাবেন—এসে বাগানে অপেক্ষা করছিলেন। সেখান থেকে একজন অভিজ্ঞ পাইলটের নিয়ন্ত্রণে হেলিবিমান তার উড়াল দেবে। মার্সেল কামারের নির্দেশে, জনাবারো কর্মী গেছে হ্যাঙারের দিকে, গিয়ে দরজা খুলেছে...

সেটাই ছিলো সর্বনাশের মুহূর্ত—যে-দুর্বিপাকের কথা কেউ ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি।

ঠিক যে-মুহূর্তে দরজাটা খুলেছে, সেই মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজে সমস্ত-কিছু কেঁপে উঠেছে। পুরো হ্যাঙারটাই তাশের প্রাসাদের মতো হুড়মুড় ক'রে ধ্ব'সে পড়েছে, যেখানে আস্ত-একটা বাড়ি ছিলো সেখানে এখন শুধু রাবিশের স্তূপ।

স্তম্ভিত ভাবটা কেটে যেতেই সবাই ছুটে গিয়েছেন কর্মীদের সাহায্যে। ভাগ্যিশ, তাদের মধ্যে সবচেয়ে যে সামনে ছিলো, বিস্ফোরণে সে-ই একটু জখম হয়েছে, অন্য-কারু গায়ে আঁচড়টুকুও লাগেনি, তারা হ্যাঙারের মধ্যে ঢোকবার আগেই বিস্ফোরণটা হয়েছে ব'লেই বাঁচোয়া।

যদিও কেউ বিশেষ আহত হয়নি বা মারা যায়নি, বিলাপের তবু কারণ ছিলো : প্রচণ্ড-একটা দুর্বিপাক এটা, অপ্রত্যাশিত ব'লেই এত-নিদারুণ, অপূরণীয় একটা ক্ষতি। হেলিবিমানটা শুধু নষ্টই হয়নি, একেবারে ধূলিসাৎ হ'য়ে গেছে। শুধু কতগুলো বাতিল অপ্রয়োজনীয় জঞ্জাল ছাড়া আর-কিছুই নেই সেখানে।

'রিগো,' এমন নিদারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে কামারের ধীরস্থিরশান্ত ভঙ্গিটা কিন্তু অটুট আছে, 'এক্ষুনি আবর্জনা সাফ করবার ব্যবস্থা করো। বিস্ফোরণের কারণটা আমাদের বার করতে হবে।'

যেখানটায় একটু আগেও হেলিবিমানটা ছিলো, সেখানেই সবাই প্রথমে জঞ্জাল সাফ করতে লেগে গেলো। সবাই মিলে হাত লাগিয়েছিলো, কাজটা চললো দ্রুতবেগে। এগারোটা নাগাদ হ্যাঙারের মেঝেটা পুরোপুরি সাফ হ'য়ে গেলো—দেখা গেলো শান-বাঁধানো মেঝের মধ্যে মস্ত-বড়ো একটা গর্ত।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ডায়নামাইট,' ঠাণ্ডা গলায় বললেন কামারে, 'সে নিশ্চয়ই নিজেই পায়ে হেঁটে এখানে আসেনি।'

আবর্জনাস্তূপের মধ্যে রক্তের দাগ দেখে বোঝা গেছে বিস্ফোরণ শেষ-অব্দি তার বলি নিয়েছে। আরো-দ্রুতহাতে জঞ্জাল সাফের কাজ চলতে লাগলো। আর শিগগিরই নিদারুণ আবিষ্কারটা সবাইকে মোহ্যমান ক'রে দিলে। মাঝরাতের একটু-আগে, প্রথমে পাওয়া গেলো একজন কালো আফ্রিকির একটা উড়ে-যাওয়া হাত, তারপর এলো আরেকটা, তারপরে একটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন, প্রায় থেঁৎলে-যাওয়া, শরীর, আর মাথাটা।

আমেদে ফ্লরেঁস পুরো ব্যাপারটাই তাঁর সাংবাদিকের চোখে এতক্ষণ দেখে যাচ্ছিলেন, এবার তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন : 'ৎশুমুকি!'

কামারেকে তিনি ব্যাখ্যা ক'রে বললেন এই ৎশুমুকি কে : একজন নিমকহারাম, যাকে মিস ব্লেজন চাকরি দিয়েছিলেন, কিন্তু যাকে ভুলিয়েভালিয়ে হ্যারি কিলার নিজের দলে টেনে নিয়েছিলো। সেটা, বস্তুত, গোটা ব্যাপারটাই ব্যাখ্যা ক'রে দিলে। ৎশুমুকিই এই বিস্ফোরণের কারণ এবং বলি। এখন শুধু এটাই জানা বাকি এত লোকের চোখে ধুলো দিয়ে সে কী ক'রে কারখানার মধ্যে এসে ঢুকেছিলো। কারণ একজন যদি এসে থাকতে পারে, তবে তার সঙ্গে অন্যরাও যে আসেনি, তারই বা ঠিক কী। এবার শুধু শত্রুপক্ষকে উলটে একটা প্রচণ্ড আঘাত হানার ওয়াস্তা : তাদের প্রাণে আতঙ্ক জাগিয়ে তুলতে না-পারলে তারা যে এ-রকম কত দুর্বিপাক সৃষ্টি করবে, কে জানে!

সেইজন্যেই কামারে নির্দেশ দিলেন ৎশুমুকির ছিন্নভিন্ন দেহটা এসপ্ল্যানেডে ছুঁড়ে ফেলতে—হ্যারি কিলারের স্যাঙাৎরা তাহ'লে চাক্ষুষ দেখতে পাবে তার পরিণামটা কী ভয়ংকর হয়েছে। তারা তাহ'লে এটাও নিশ্চয়ই তাদের মোটা মাথাগুলোয় ঢোকাবে যে কারখানার মধ্যে এসে ঢোকার পরিণাম খুব-একটা আহ্লাদজনক নয়।

এদিকে জঞ্জাল সাফ করার কাজ চললো একটানা। কর্মীরা হাত থেকে হাতে পাচার ক'রে দিচ্ছে আবর্জনা, জঞ্জাল স্তূপ হ'য়ে উঠছে বাগানে, আর হ্যাঙারের বাকি-অংশটাও জঞ্জালের স্তূপ থেকে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে আসছে।

'এই-যে, এখানে দেখি আরেকজন!' হঠাৎ কর্মীদের একজন চেঁচিয়ে উঠলো।

মার্সেল কামারে নিজেই এগিয়ে গেলেন। আবর্জনার মধ্যে কার-একজনের একটা পা দেখা যাচ্ছে। কয়েক মিনিট বাদেই পুরো দেহটাই বেরিয়ে এলো। এবার একজন গোরার মৃতদেহ—ওপর থেকে ছাত ভেঙে প'ড়ে তার কাঁধের হাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে।

ডাক্তার শাতোনে তার ওপর ঝুঁকে পড়লেন। 'এখনও প্রাণ আছে!'

লোকটাকে আবর্জনাস্তূপ থেকে উদ্ধার ক'রে কামারের কাছে নিয়ে-আসা হ'লো, আর ডাক্তার তার শুশ্রূষায় ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। কাল যদি সে কথা বলবার মতো অবস্থায় থাকে, তাহ'লে তাকে জেরা করা হবে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অবশ্য যদি সে কথা বলতে রাজি হয়,' ফোড়ন কাটলেন আমেদে ফ্লরেঁস।

দাঁতে দাঁত চেপে মার্সেল কামারে বললেন, 'আমি দেখবো কী ক'রে কথা না-ব'লে পারে ও!'

জঞ্জাল সাফ করার কাজটা মোটামুটিভাবে শেষই হ'য়ে গেছে এখন। অন্তত ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যে আর-কারু মৃত বা আহত দেহ প'ড়ে নেই, এটা বেশ-নিশ্চিত হওয়া গেছে। মার্সেল কামারে কাজটায় ইতি টেনে দিয়ে কর্মীদের ছুটি দিয়ে দিলেন —বেচারিদের এখন বিশ্রাম দরকার।

আর তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রেই, বৈজ্ঞানিক ও তাঁর অতিথিরা বিপর্যয়ের স্থান ছেড়ে যে যার আশ্রয়ের দিকে চললেন।

কিন্তু ক-পা এগিয়েই হঠাৎ আমেদে ফ্লরেঁস থমকে থেমে গিয়ে মার্সেল কামারেকে জিগেস করলেন : 'এখন যখন হেলিবিমান আর নেই, আপনি *এখন* কী করবেন ব'লে ঠিক করেছেন?'

'আমরা আরেকটা হেলিবিমান বানিয়ে নেবো,' কামারে উত্তর দিলেন।

বারজাক জিগেস করলেন : 'মালমশলা সব আছে তো আপনার?'

'নিশ্চয়ই।'

'কত-দিন লাগবে বানাতে?'

'দু-মাস।'

'হুম!' শুধু এই আওয়াজটাই হ'লো আমেদে ফ্লরেঁসের উত্তর; প্রশ্নটা নিয়ে আর না-ঘাঁটিয়ে তিনি চিন্তিত মুখে স্থানটা পরিত্যাগ করলেন।

*দু-মাস*!... এবং কারখানার মধ্যে কি না আর-মাত্র পনেরোদিনের খাবার আছে!

সাংবাদিকের মাথায় তখন একটাই ভাবনা পাক খাচ্ছে : কী ক'রে এই সংকট থেকে এখন উদ্ধার পাওয়া যায়!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশ

# আমেদে ফ্লরেঁসের রণকৌশল

আগের দিনের সঙ্গে কী-যে উৎকট একটা তফাৎ এই ১৩ই এপ্রিল সকালবেলার! আগের দিন সব ঝক্কিঝামেলা বাধাবিপত্তির অবসান হ'য়ে যাবে ব'লে ভেবেছিলেন সবাই, বন্দীদের মনে একটা উল্লাসের ছোঁয়া লেগেছিলো। অথচ আজ সব আশা উধাও, এবং সকলেই হতাশ এবং বিমর্ষ।

বাকি-রাতটা প্রায় কেউই ঘুমুতে পারেননি। প্রায়-সকলেই নানাদিক থেকে আগাপাশতলা তন্নতন্ন ক'রে খুঁটিয়ে দেখেছেন পুরো বৃত্তান্তটা, অথচ এত-ভেবেও কোনো কূলকিনারা পাননি—এ-সব বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম ক'রে যাবার কোনো উপায়ই দেখতে পাননি সামনে।

এমনকী মার্সেল কামারেও বুঝি কী-যে করবেন, ভেবে উঠতে পারছিলেন না। আরেকটা হেলিবিমান বানিয়ে নেয়া ছাড়া এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার আর-কোনো সম্ভাবনা আছে ব'লেই তাঁর মনে হয়নি। কিন্তু সমস্ত আশাভরসা শুধুমাত্র একটা যন্ত্রের ওপরই নির্ভর ক'রে থাকবে, এবং সেটা বানাতে দু-দু-মাস লেগে যাবে, অথচ খাবারদাবার আছে মাত্র পনেরো দিনের উপযোগী—এ-অবস্থায় আত্মপ্রতারণারও কোনো অবকাশ নেই।

একটু খোঁজখবর নিয়ে আরো-যেটা জানা গেছে সেটাও মর্মান্তিক : আগে যতটা সহজে পালিয়ে যাওয়া যাবে ব'লে ভাবা হয়েছিলো, এখন সেটা আর কিছুতেই সম্ভব ব'লে মনে হচ্ছে না। ভাঁড়ারে কী আছে তার একটা হিশেব নেবার পর, ফলমূল শাকসব্জি যতটা পাওয়া যেতে পারে খতিয়ে দেখার পর, বোঝা গেছে এমনকী পনেরো দিনের খাবারও আর নেই—যা আছে তাতে বড়োজোর ন-দশ দিন চলতে পারে! দু-মাস তো দূরের কথা, এই এপ্রিলমাসটা কেটে যাবার আগেই অনাহারে ধুঁকতে শুরু করবেন তাঁরা!

সেই অনিবার্য বিপর্যয় যতদূর-সম্ভব ঠেকিয়ে-রাখা যায়, সেই উদ্দেশ্যে এখন থেকেই সব খাবার *র‍্যাশন* ক'রে দেয়া হ'লো। পালানো যাক বা না-যাক, এই চারপাশের ঘেরাও যে-দুর্বিপাক ডেকে আনবে, অন্তত তাকে একটু বিলম্বিত করা যাবে এতে।

১৩ই এপ্রিলের গোটা সকালটাই কেটে গেলো ভাঁড়ারের হিশেব নিতে; আর অন্য-একটা দল তড়িঘড়ি লেগে গেলো হেলিবিমানের নির্মাণে—এই হেলিবিমান তৈরি করার পর সে-বিমান যে তাঁদের উদ্ধার করবে, সে-আশা সুদূরপরাহত, তবু মার্সেল কামারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে-ক'রেই হোক যত-তাড়াতাড়ি-সম্ভব হেলিবিমানটা বানিয়ে ফেলতে হবে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে কারখানার লোকজন শুধু বিকেলবেলাতেই আহত বন্দীর দিকে নজর দিতে পারলে।

এই-প্রথম এমন-একটা মধ্যাহ্নভোজ হ'লো, যেখানে খাবার বলতে বিশেষ-কিছুই ছিলো না। এই অতিথিদের আকস্মিক আবির্ভাবে এখন মার্সেল কামারের নিজের জীবনটাই বিপন্ন হ'তে বসেছে : তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ আর তাঁর অতিথিদের ভবিষ্যৎ এখন একই সুতোয় বাঁধা প'ড়ে গেছে। খাবারটেবিলে ডাক্তার শাতোনে জানালেন, কাল রাতের সেই আহত বন্দী এখন অন্তত কথা বলার মতো অবস্থায় আছে। যে-ঘরটায় এই আহত গোরা-লোকটাকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো, মার্সেল কামারে অতিথিদের নিয়ে সে-ঘরে গিয়ে হাজির হলেন।

'কে তুমি ? কী তোমার পরিচয় ?' কামারে তাকে জিগেস করলেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে এ-প্রশ্নটা শুধু-যে নিরীহ এবং অর্থহীন, তা নয়—একান্তই অবান্তর। কিন্তু কামারে মনে-মনে খুব-ভেবেচিন্তে একটা ছক তৈরি ক'রে রেখেছিলেন।

বন্দী কোনো উত্তর দিলে না। কামারে আবারও ঠাণ্ডাগলায় সেই একই প্রশ্ন করলেন —কিন্তু তাতে কোনোই লাভ হ'লো না।

কামারে খুব মোলায়েমভাবে বললেন, 'তোমাকে আমার হুঁশিয়ার ক'রে দেয়া উচিত —আমি তোমাকে দিয়ে কথা বলাবোই।'

এই হুমকিতে গোরা-লোকটার মুখ অবশ্য খুললো, তবে তার খোলা ঠোঁটের ফাঁকে একটা শ্লেষের হাসি ফুটে উঠলো—একটা মস্ত তাচ্ছিল্যের ভাব। তাকে দিয়ে কথা বলাবে ? লোকটার কাছে এটা একেবারে অবিশ্বাস্য-একটা প্রস্তাব ব'লে মনে হয়েছে। আর সত্যি, অন্তত এই গোরা লোকটার চেহারাছিরি দেখে মনে হয়েছে তাঁরা এমন-একজন লোকের মুখোমুখি হয়েছেন যার শুধু-যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আছে তা নয়, সে-আত্মবিশ্বাস অটুট রাখার জন্যে গভীর মনোবলও আছে।

কামারে শুধু তাঁর কাঁধ ঝাঁকালেন। তারপর, কথা বলাবার জন্যে আর-কোনো চাপ না-দিয়ে, তার দুই বুড়োআঙুলে ও পায়ের তলায় চারটে ধাতুর পাত লাগিয়ে দিয়ে অনেক বোতাম লাগানো কী-একটা বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সঙ্গে জুড়ে দিলেন, আর তারপরেই হঠাৎ একটা বোতাম টিপে দিলেন। কোনো কথা না-ব'লেই, নীরবে।

তৎক্ষণাৎ লোকটার সারা শরীর কিম্ভূতকিমাকারভাবে খিঁচিয়ে উঠলো। ভয়াবহ-সব অঙ্গবিক্ষেপ, তার ঘাড়ের শিরাগুলো এমন উৎকটভাবে ফুলে উঠেছে যেন এক্ষুনি ফেটে পড়বে, তার নীল-হ'য়ে-যাওয়া মুখটায় অসহ্য যন্ত্রণার ছাপ।

শুধু-কয়েকটা মুহূর্ত, তারপরেই কামারে বোতাম টিপে বিদ্যুৎপ্রবাহ থামিয়ে দিলেন। তেমনি মোলায়েমসুরে জিগেস করলেন : 'কী ? এখন কথা বলবে ?'

তারপর, লোকটা যখন তবু চুপ ক'রে রইলো, তিনি বললেন, 'বেশ। তবে আবার শুরু করা যাক।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবারও বিদ্যুৎচক্রের আবর্ত লোকটার সারা শরীরে যেন আরো-তীব্র যন্ত্রণা ছিটিয়ে দিলে। খিঁচুনি দিচ্ছে সারা শরীর, মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত। সারা কপালে ঘাম, চোখের তারা-দুটো বুঝি ঠিকরে বেরুবে, আর যেন কামারশালার হাঁপর, এমনিভাবে তার বুকের খাঁচাটা উঠছে-নামছে।

আবারও বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ ক'রে দিয়ে কামারে নিচুগলায় জিগেস করলেন : 'এবার কথা বলবে ?'

'হ্যাঁ... হ্যাঁ !' লোকটা যেন তার সহ্যশক্তির শেষসীমায় গিয়ে পৌঁছেছে।

'চমৎকার !... তাহ'লে বলো, তোমার নাম কী ?'

'ফার্গাস ডেভিড।'

'এ তো কোনো নামই নয়,' কামারে আপত্তি করলেন, 'পদবি কী ?'

'ব্ল্যাকল্যাণ্ডে সবাই আমাকে ঐ নামেই ডাকে। আমার আসল নাম এখানে কেউই জানে না।'

'তাতে কিছুই এসে-যায় না। নাম কী তোমার ?'

'ড্যানিয়েল ফ্রাস্নে !'

'দেশ ?'

'ইংলণ্ড।'

ড্যানিয়েল ফ্রাস্নে—সেটাই তার আসল নাম—ঠিক করেছে কথা যদি বলতেই হয় তবে ছোটোখাটো দু-একটা কথাতেই সারবে। একটা-একটা ক'রে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে সে, সংক্ষেপে।

'এবার আমি গোটা-কতক খবর চাই। যদি গাঁইগুই করো, তো আবার এই মজার খেলাটা শুরু হ'য়ে যাবে। কী, যা জিগেস করবো, ঠিকঠাক জবাব দেবে তো ?'

'হ্যাঁ।'

'প্রথমে বলো, ব্ল্যাকল্যাণ্ডে তুমি কী কাজ করো। এই শহরটায় কোন রাজকার্য সামলাও তুমি ?'

'কৌশুলি।'

'কৌশুলি ?' প্রশ্নের সুরে কথাটা আওড়ালেন কামারে।

ফ্রাস্নে একটু অবাকই হ'লো, বৈজ্ঞানিক এই কথাটা আগে-কখনও শোনেননি ব'লে। সে ব্যাখ্যা ক'রে বললে : 'হ্যারি কিলারের সরকারে যারা মন্ত্রণাসভায় বসতে পায়, তাদের ঐ নামেই ডাকা হয়।'

'তাহ'লে, আমি যদি তোমার কথার মর্ম বুঝে থাকি, তুমি ব্ল্যাকল্যাণ্ডের সরকারের সমস্ত কাজকর্মের শরিক ?'

'হ্যাঁ।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখানে কবে থেকে আছো তুমি?'

'যবে থেকে ব্ল্যাকল্যাণ্ডের পত্তন হয়েছে।'

'তুমি তার আগে থেকেই তবে হ্যারি কিলারকে চিনতে?'

'হ্যাঁ।'

'যখন তোমার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়, তখন তুমি কোথায় ছিলে?'

'ব্লেজনের বাহিনীতে।'

এ-কথাটা শুনেই জেন ব্লেজন কেঁপে উঠলো। ভবিতব্য তার কাছে আরো-একজন সাক্ষী এনে দিয়েছে।

কিন্তু কামারে আবারও প্রশ্ন করেছেন : 'ব্লেজনের বাহিনীতে? তবে তোমাকে আমি চিনতে পারিনি কেন?'

'নিশ্চয়ই অ্যাদ্দিনে আমার চেহারাটা পালটে গিয়েছে।' ফ্রাস্নে প্রায় দার্শনিকের ভঙ্গিতে বললে : 'তবে এটা ঠিক, মঁসিয় কামারে, আমি আপনাদের সঙ্গেই ছিলাম।'

আর ধৈর্য ধ'রে থাকতে না-পেরে, জেন ব্লেজন এবার কথা বললে। 'মাফ করবেন, মঁসিয় কামারে, কিন্তু আপনি কি দয়া ক'রে এর সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে অনুমতি দেবেন আমায়?'

কামারে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালে, জেন ব্লেজন জিগেস করলে : 'তুমি যখন ব্লেজনের বাহিনীতে ছিলে, তখন হ্যারি কিলার যখন হঠাৎ এসে আবির্ভূত হয়েছিলো, সেটা তুমি দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কাপ্তেন ব্লেজন তাকে অমন সমাদর ক'রে অভ্যর্থনা করেছিলেন কেন?'

'সে-সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।'

'এটা বলা কি সংগত হবে যে যেদিন থেকে হ্যারি কিলার বাহিনীতে এসে যোগ দিয়েছিলো, সেদিন থেকে সে-ই বাহিনীর সর্বেসর্বা হ'য়ে উঠেছিলো, তার সত্যিকার দলপতি?'

'হ্যাঁ, ঠিক তা-ই হয়েছিলো,' এতদিন-আগে কোন জঙ্গলে কী-সব ঘটেছে, সে-বিষয়ে এই প্রশ্ন শুনে ফ্রাস্নেকে বেশ-একটু অবাকই দেখালো।

'তাহ'লে হ্যারি কিলারের হুকুমেই ব্লেজনের বাহিনী গ্রামের পর গ্রাম তছনছ ক'রে লুঠতরাজ চালিয়েছিলো? যেজন্যে পরে সরকারের বাহিনী এসে তাকে আক্রমণ করে?'

'হ্যাঁ।' ফ্রাস্নে সায় দিলে।

'এইসব লুঠতরাজ অত্যাচারের সঙ্গে কাপ্তেন ব্লেজনের কোনো যোগ ছিলো না?'

'না।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনারা সবাই শুনলেন তো ?' জেন তার সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললে। তারপর আবার ফ্রাস্‌নেকে শুধোলে : 'কাপ্তেন ব্লেজন কেন সব কর্তৃত্ব হ্যারি কিলারের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন ?'

ফ্রাস্‌নে একটু অধীরভাবেই বললে : 'তা আমি জানবো কী ক'রে ?'

মনে হ'লো, ফ্রাস্‌নে সত্যিকথাই বলছে। অন্তত জেনের মনে হ'লো আর জোরাজুরি ক'রে কোনো লাভ নেই। 'আচ্ছা, তুমি কি এটা জানো কাপ্তেন ব্লেজন কেমন ক'রে মারা গিয়েছিলেন ?'

'ওহ্... লড়াইতে !' ফ্রাস্‌নে এমনভাবে জবাব দিলে যে এ নিয়ে প্রশ্ন করারই কোনো মানে হয় না। 'আরো-অনেকেই ঐ লড়াইতে মারা গিয়েছিলো।'

জেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। কাপ্তেন ব্লেজনের হত্যারহস্যের ওপর থেকে পর্দা সরাতে হ'লে ঠিক এমন উত্তর পেলে চলবে না। এখনও অনেক-কিছু ধোঁয়াটে থেকে গেছে। সে কামারের দিকে ফিরে বললে, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মঁসিয় কামারে। আমার প্রশ্ন শেষ হ'য়ে গেছে।'

কামারে যেখানে তাঁর জেরা বন্ধ করেছিলেন, সেখান থেকেই ফের শুরু করলেন। 'প্রথমে বলো, এই শহর যারা বানিয়েছে সেই আফ্রিকিদের তোমরা পেলে কী ক'রে ?'

ফ্রাস্‌নের চোখটা গোল-গোল হ'য়ে গেলো। এমন হাবার মতো প্রশ্ন আবার কেউ কখনও করে নাকি ? হায়-কপাল, এ-ধরনের আজগুবি প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যেই তাকে এমনভাবে নিপীড়ন করা হ'লো নাকি ?

'কোত্থেকে আবার ? গাঁ থেকে। সেটা জানবার জন্যে কাউকে পণ্ডিত হ'তে হয় না।'

'গাঁ থেকে তো বটেই, কিন্তু কীভাবে পেলে তাদের ?'

ফ্রাস্‌নে তার যে-কাঁধটা ভেঙে যায়নি, সেটাই ঝাঁকালে। 'সেই একই কৌশলে ! যেন আপনি জানেন না ! আমরা তাদের শুধু ঘেটি ধ'রে পাকড়ে নিয়ে এসেছি।'

'আহ্!'... মার্সেল কামারের মাথাটা একটু নিচু হ'য়ে গেলো।

'গোড়ায় তোমাদের অনেক কলকব্জা যন্ত্রপাতি দরকার হয়েছিলো। সে-সব এলো কোত্থেকে ?'

'এটা ঠিক যে, চাঁদ থেকে নয় !' ফ্রাস্‌নে একটু টিটকিরির সুরেই বললে।

'ইওরোপ থেকে এনেছো ?'

'সম্ভবত !'

'এখানে সে-সব এলো কী ক'রে ?'

'এখানে সে-সব নিশ্চয়ই উড়ে এসে জুড়ে বসেনি... শুনুন, মঁসিয় কামারে, এ-সব ভারি-আজগুবি প্রশ্ন, অদ্ভুত ! এখানে এ-সব যন্ত্র কী ক'রে আবার আসবে ? জাহাজে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক'রে, সাগর পেরিয়ে, তা নিশ্চয়ই না-বললেও চলে!'

'জাহাজ থেকে মাল খালাশ করা হয়েছিলো কোথায়?'

'কোতোনুতে।'

'কিন্তু কোতোনু থেকে ব্ল্যাকল্যাণ্ডের দূরত্বও তো কম নয়। এখানে সে-সব আনা হ'লো কী ক'রে?'

'উটের বহরে ক'রে, ঘোড়ায়, নিগ্রোদের পিঠে,' ফ্রাস্‌নে মুখ বেঁকিয়ে বললে, তার ধৈর্য বুঝি এবার ফুরিয়ে যাবে।

'এত-লম্বাপথ পাড়ি দেবার সময় আফ্রিকিদের অনেকে নিশ্চয়ই পথেই মারা গিয়েছিলো?'

'যত ক-টা জন্মেছে, তার চেয়েও ঢের-বেশি নিগ্রো টেঁশে গিয়েছে! ক-জন টেঁশে গেলো, গোনার ব্যাপারে আমার অন্তত আমোদ হয়নি।'

কামারে এবার অন্য প্রসঙ্গে গেলেন। 'এই-সব যন্ত্রপাতি—তাদের জন্যে দাম দিতে হয়েছে নিশ্চয়?'

'এ-যে কোন্ জাহান্নামে এসে পড়লাম!' ফ্রাস্‌নের কাছে প্রশ্নগুলো ক্রমেই আবোলতাবোল আর অর্থহীন ব'লে মনে হচ্ছিলো।

'তাহ'লে ব্ল্যাকল্যাণ্ডে টাকা আছে?'

'ঐ একটা ব্যাপারে আমাদের কোনো টানাটানি নেই।'

'এ-টাকা এলো কোত্থেকে?'

এবার ফ্রাস্‌নে তার সব ধৈর্য হারিয়ে ফেললো। 'আমার সঙ্গে ইঁদুর-বেড়াল খেলা আপনি কখন থামাবেন, মঁসিয় কামারে? এমন-সব অদ্ভুত প্রশ্ন করছেন যার উত্তর আপনিই আমার চাইতে অনেক ভালোই জানেন। এই হেলিবিমানগুলো নিশ্চয়ই আপনি কেবল আহ্লাদ করার জন্যে বানাননি? আপনি খুব ভালো ক'রেই জানেন যে হ্যারি কিলার আর তার সাগরেদরা প্রায়ই ঐ হেলিবিমানে ক'রে বিসাগো দ্বীপপুঞ্জে যায়, তারপর সেখান থেকে স্টীমারে ক'রে তারা ইওরোপে—বেশির ভাগ সময়েই ইংলণ্ডে—যায়, ক-দিন ঘুরে-টুরে আবার ফিরে আসে। অন্তত আপনাকে নিশ্চয়ই ব'লে বোঝাতে হবে না যে ইওরাপে কতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে তাদের লোকে ব্যাঙ্ক বলে, তাছাড়া আছে বংশানুক্রমিকভাবে কঞ্জুষ-সব লোকজন যারা টাকা শুধু জমিয়েই রাখে, আর কত লোক আছে, যাদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে এক-আধবার দেখা ক'রে-আসা ভালো... কোনো আমন্ত্রণ বা অভ্যর্থনা বিনাই। তারপর দেখাসাক্ষাৎ শেষ হ'য়ে গেলে, তারা ফের এখানে ফিরে আসে—ইওরোপে কেউই তাদের চোখে দ্যাখেনি, কেউই তাদের কানে শোনেনি—কেউই জানে না এরা কে বা কারা?'

'এ-রকম দেখাসাক্ষাৎ বুঝি প্রায়ই ঘটে?' লজ্জায় কামারের মুখটা লাল হ'য়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠেছে।

ফ্রাস্‌নে হাত উলটে একটা হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গি করলে। 'বেশ... এতেই যদি আপনার মজা লাগে! যার যা রুচি... হ্যাঁ, ঐ ইওরোপ-সফর বছরে তিন-চার বার তো হয়ই!'

'শেষ-সফরটা কখন হয়েছিলো?'

'শেষটা?' ফ্রাস্‌নে তার স্মৃতি হাৎড়ালে। 'দাঁড়ান, দাঁড়ান!...মনে পড়েছে!... চার মাস, কি সাড়ে-চার মাস আগে।'

'আর এবার তারা কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো?'

'সেটা আমার ভালো জানা নেই। এ-যাত্রায় আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম না। একটা ব্যাঙ্ক, বোধহয়। তবে একটা কথা জানি যে আগে কখনও এত-বড়ো দাঁও আমরা মারিনি।'

একমুহূর্ত চুপ ক'রে রইলেন মার্সেল কামারে। বিবর্ণ দেখাচ্ছে তাঁকে, যেন নিমেষের মধ্যে তাঁর বয়স একলাফে দশ বছর বেড়ে গেছে। 'আরেকটা কথা, ফ্রাস্‌নে। সবশুদ্ধু কত জন আফ্রিকি এই ব্ল্যাকল্যাণ্ডে কাজ করে?'

'তা, চার হাজার হবে। হয়তো আরো-বেশি।'

'আর স্ত্রীলোক?'

'তা প্রায় দেড় হাজার।'

'আর এদের সবাইকেই নিশ্চয়ই ঐ একইভাবে ধ'রে আনা হয়েছে?

'না,' ফ্রাস্‌নে তার শ্লেষটা বুঝতে না-দেবার চেষ্টা করেছে। 'এখন হেলিবিমানে ক'রে তাদের ধ'রে-আনা যায়।'

'হুঁ...' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কামারে। তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে জিগেস করলেন, 'এখানে তুমি ঢুকলে কী ক'রে?'

উত্তর দেবার আগেই এই-প্রথম ফ্রাস্‌নে একটু ইতস্তত করলে। অবশেষে সরাসরি একটা গুরুতর বিষয়ে প্রশ্ন! এতক্ষণ উত্তর দিতে তাকে কোনো বিষয়েই দু-বার ভাবতে হয়নি, এবার সে একটু অপ্রস্তুত বোধ করলে। তবু উত্তর তো তাকে দিতেই হবে। মুখ বিকৃত ক'রে বললে : 'জলাগারের মধ্য দিয়ে!'

'জলাগারের মধ্য দিয়ে?' কামারে অবাক হ'য়ে জিগ্যেস করলেন।

'হ্যাঁ। পরশুদিন নদীর সব জলকপাট আটকে দেয়া হয়েছিলো যাতে আপনারা পাম্প ক'রে জল তুলতে না-পারেন। রাজভবনের জলাগারও শূন্য হ'য়ে গিয়েছিলো। কারখানায় যে-জলাগারটা জলশূন্য হ'য়ে যায়, এস্‌প্ল্যানেডের তলা দিয়ে সেটায় যাবার জন্যে রাজভবন থেকে মাটির তলা দিয়ে একটা মস্ত নল গেছে। ৎশুমুকি আর আমি ঐ নল দিয়ে এখানে আসি।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েক ঘণ্টা আগেই কামারে জেনেছিলেন যে পাম্পটা আবার বসানো হ'য়ে গেছে, আর সেটা বেশ ভালোভাবেই কাজ করছে। খবরটায় তখন তিনি কোনো গুরুত্ব দেননি। এখন তিনি বুঝতে পারলেন, ৎশুমুকির ও-রকম বীভৎস মৃত্যুর পর তার কাজটা হাঁসিল হ'য়ে গেছে দেখে ফের জলকপাটগুলো খুলে ফেলবার নির্দেশ দিয়েছে হ্যারি কিলার, আর তাইতেই এখন পাম্প আবার জল তুলতে পারছে।

'বেশ। ধন্যবাদ।' আর-কোনো প্রশ্ন না-ক'রেই কামারে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। যা তিনি জানতে চেয়েছিলেন, সব এখন জেনে গিয়েছেন।

কাজেই খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চললো তেরো তারিখ, চোদ্দই এপ্রিলেও নতুন-কোনো ঘটনা ঘটলো না। তেমনি কঠোরভাবে ঘিরে আছে চারপাশ থেকে *হর্ষচরিতেরা*। নদীর ঘাটে আর এস্‌প্ল্যানেডে *হর্ষচরিতেরা* সশস্ত্র দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদের দৃষ্টি যেহেতু সার্কুলার রোড অব্দি যায়, কারখানার সবদিকেই যেহেতু এই দুই জায়গা থেকে নজর রাখা যায়, কারু পক্ষেই কারখানা ছেড়ে বেরুবার কোনো উপায় নেই। এ-কথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে অদূর-ভবিষ্যতে এই অবস্থার কোনো বদল হবে—ফলে অচিরেই এমন-একদিন আসবে, অনাহারে ধুঁকতে-ধুঁকতে কারখানাকে বিনা-শর্তে রাজভবনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

এই অনস্বীকার্য অস্বস্তিকর তথ্যটাই আমেদে ফ্লরেঁসকে একটানা ভাবিয়ে চলেছিলো। হেলিবিমান ধ্বংস হ'য়ে যাবার পর থেকেই তিনি এই বেড়াজাল থেকে কী ক'রে বেরুনো যায়, তারই কথা ভেবে আসছিলেন। কিন্তু কোনো উপায় বার করতে না-পেরে নিজের ওপরেই বিষম রাগ হচ্ছিলো তাঁর। অবশেষে, সারাক্ষণ মাথা খাটিয়ে, চোদ্দ তারিখ সন্ধেবেলায় কুটুশ ক'রে এক ভাবনার পোকা তাঁর মগজে কামড়ে দিলে। সবদিক থেকে খুঁটিয়ে দেখে ফন্দিটা তাঁর কাছে বেশ প্রতিশ্রুতিমূলকই মনে হ'লো। পরদিন সকালে তোঙ্গানের সঙ্গে কী নিয়ে যেন অনেকক্ষণ ধ'রে আলোচনা করলেন তিনি; তারপর তাঁর সঙ্গীদের বললেন তাঁর সঙ্গে কামারের কাছে আসতে; কামারেকে নাকি কী-একটা অত্যন্ত জরুরি কথা বাৎলাবার আছে তাঁর।

ফ্রাসনেকে সেই জেরা করার পর থেকে বৈজ্ঞানিককে আর-কখনও চোখেই দ্যাখেননি কেউ। সেই-যে তিনি গিয়ে তাঁর নিজের ডেরায় ঢুকেছেন, সেখান থেকে আর-একবারও বেরোননি। আর সেখানে, একেবারে-একা, তিনি নিজে-নিজেই যুঝেছেন নিজের বিবেকের সঙ্গে, সান্ত্বনাহীন, উপশমহীন, আর যেন মাথাঘোরানো কোনো শিখর থেকে তাকিয়ে আছেন চেতন-অবচেতনের পরপারে।

এতদিনে পুরো সত্যটাই তাঁর হৃদয়ঙ্গম হয়েছে। এতদিনে তিনি তর্কাতীতভাবে জেনেছেন যে ব্ল্যাকল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে খুনজখমরাহাজানি ও দস্যুবৃত্তির ওপর নির্ভর ক'রেই। জেনেছেন যে, ইওরোপ ও আফ্রিকা দুটো মহাদেশই হ্যারি কিলারের ও তার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যাঙাৎদের হিংসাহিংস্রতার লীলাভূমি হ'য়ে উঠেছে—ভিন্ন-দুই ধরনে। শহরে যে সোনার এত ছড়াছড়ি, সে-সম্বন্ধে এখন আর চোখ বুজে থাকার কোনো উপায়ই নেই। আর সেই সোনার দৌলতেই কি না এতদিন অবাধে তিনি নিজের সমস্ত পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে এসেছেন! ব্লেজনের বাহিনীর লুঠতরাজরাহাজানি ও নৃশংস অত্যাচার, কাপ্তেন ব্লেজনের নির্মম ও বিবেকহীন হত্যা, অসহায় আফ্রিকিদের ওপর অবিরাম শোষণ ও নিপীড়ন, গ্রাম থেকে গ্রাম উজাড় ক'রে শ্রমিকদের ধ'রে নিয়ে-আসা, আফ্রিকা ও ইওরোপে দস্যুতা ও খুনজখম, এবং বারজাক মিশনের ওপর এই বর্বর হামলা—সবকিছুর মানে এখন তিনি জানেন।

আর এইসব অগুনতি দুষ্ক্রিয়ার সঙ্গেই তিনি কি না আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছেন! নিজে প্রত্যক্ষভাবে কিছু করেননি বটে, কিন্তু তাঁরই আবিষ্কার কি এইসব দুষ্কর্মের পথ সুগম ক'রে দেয়নি? গত দশ বছর ধ'রে সত্যিকার-এক বিভীষিকার মধ্যে সারাক্ষণ কাটিয়েছেন তিনি, অথচ কিছুই জানবার চেষ্টা করেননি কত ধানে কত চাল। অন্ধ হ'লে কি প্রলয় বন্ধ থাকে? চিরকালই প্রতিভা ও মত্ততার মাঝখানে সংকীর্ণ রজ্জুর ওপর দিয়ে হেঁটেছেন তিনি, অস্থির, নিয়ন্ত্রণবিহীন; আর এখন আচমকা এই বিপুল ঘা পড়েছে তাঁর চৈতন্যের ওপর, বিবেকের ওপর। এখন এই ব্ল্যাকল্যাণ্ডের কথা ভাবলেই তাঁর বমি পাচ্ছে, সারা গাটা রী-রি ক'রে উঠছে, অথচ এই ব্ল্যাকল্যাণ্ড কি না তাঁরই নিজের প্রতিভার সৃষ্টি! এই আশ্চর্যের পিরামিড কি না গ'ড়ে উঠেছে তাঁরই ধ্যানে-অনুধ্যানে, তাঁরই কাজের প্রেরণায়। সেটাকে যারা এভাবে কলুষিত ক'রে দিয়েছে, তারা কি কোনো সাজাই পাবে না? এত অপকর্মের জন্মস্থল, এই ব্ল্যাকল্যাণ্ড কি গোড়া থেকেই অভিশপ্ত নয়?

আমেদে ফ্লরেঁস এবং তাঁর সঙ্গীরা এসে দেখতে পেলেন মার্সেল কামারে এ-সব চিন্তাতেই কাতর ও মোহ্যমান। হাত-পা ছড়িয়ে এলিয়ে আছেন তাঁর আরামকেদারায়, নিশ্চল, অনড়, চোখদুটোর দীপ্তি উধাও, যেন তাঁর সমস্ত জীবনীশক্তিই কেউ নিংড়ে মুচড়ে বার ক'রে দিয়েছে। এই-যে দু-দিন কারু সঙ্গে তাঁর একবারও দেখা হয়নি, এই দু-দিনে তিনি একদানা খাদ্যও গ্রহণ করেছেন কি না সন্দেহ!

এমন লোক আমেদে ফ্লরেঁসের কোন্ কাজে লাগবে? তিনি চান অতীতের সেই উদ্বুদ্ধ উদ্দীপ্ত প্রতিভাকে, সৃষ্টিকর্তাকে! ফ্লরেঁসের নির্দেশে তোঙ্গানে কিছু খাবার নিয়ে আসতে গেলো। কামারে বাধ্য অনুগত ছেলের মতো সব খাবার খেলেন বটে, কিন্তু খেয়ে তাঁর যে কোনো তৃপ্তি হয়েছে এমন কখনও মনে হ'লো না। খাওয়া শেষ হ'লে অবশ্য তাঁর বিবর্ণ মুখটায় যেন একটু রক্ত ফিরে এলো।

'আপনাদের সবাইকেই যে আমি এখানে ডেকে এনেছি,' ফ্লরেঁস ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালেন, 'তার কারণ হ'লো আমি এই বেড়াজাল থেকে বেরুবার একটা উপায় বার ক'রে ফেলেছি। পুরো ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখে আমি এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের নিরাশ হবার কোনোই কারণ নেই—অজস্র লোক আছে আমাদের দলে, আমাদের বন্ধু—যাদের সাহায্য আমরা অনায়াসেই পেতে পারি, কারণ তারা আমাদের নাগালের মধ্যেই আছে।'

'কোন্ বন্ধু ?' বারজাক আর ডাক্তার শাতোনে প্রায়-একসঙ্গেই একই প্রশ্ন ক'রে বসলেন।

'গোলামখানার ঐ আফ্রিকিরা, দাসত্ব ছাড়া যাদের হারাবার আর-কিছু নেই,' ফ্লরেঁস বললেন, 'অন্তত চার হাজার আফ্রিকি আছে এখানে, মেয়েদের কথা না-হয় আমরা ছেড়েই দিলুম—আর একবার ছাড়া পেলে তারা প্রত্যেকেই একেকজনে দুজনের সমান হ'য়ে উঠবে। এই একটা প্রকাণ্ড শক্তি আছে আমাদের চারপাশে, আমার মনে হয় তাদের আদৌ হেলাফেলা করা আমাদের উচিত হবে না।'

'সেটা না-হয় বুঝলুম,' বারজাক সায় দিয়ে বললেন, 'কিন্তু তাদের তো কোনো অস্ত্রশস্ত্রই নেই, আর তারা হয়তো জানেও না যে আমরা এই ব্ল্যাকল্যাণ্ডে আছি।'

'সেইজন্যেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে এক্ষুনি তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে হবে আমাদের,' আমেদে ফ্লরেঁসের গলার স্বরে কোনো দ্বিধা নেই।

'এ-কথা বলা ভারি সহজ,' বারজাক দ্বিধার সুরে বললেন।

'বলাও সহজ, এবং সম্ভবত করাও সহজ,' ফ্লরেঁস বললেন।

'তাই নাকি ? অস্ত্রশস্ত্রের কথা না-হয় বাদই দিচ্ছি, ঐ আফ্রিকিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে কে যাবে, শুনি ?'

'তাদেরই মতো আরেকজন আফ্রিকি : *তোঙ্গানে*।'

'কিন্তু গোলামখানায় সে যাবে কী ক'রে? আপনি ভালোই জানেন, কারখানাকে ওরা চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে। তাকে দেখতে পেলেই একঝাঁক বুলেট তাকে অভ্যর্থনা জানাবে।'

'সেইজন্যেই সে কারখানার দরজা খুলে কারখানা থেকে বেরুবে না। তাছাড়া তাতে আমাদের কোনো কাজও হ'তো না। কারখানার বাইরেই গোরাদের আস্তানা। আর তোঙ্গানেকে গিয়ে পৌঁছুতে হবে কালোদের মধ্যে। ফলে তাকে যা করতে হবে, তা সে আগেই একবার করেছে। রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে তাকে চাষের জায়গায় চ'লে যেতে হবে, সেখানে গিয়ে অন্য আফ্রিকিদের মধ্যে তাকে মিশে যেতে হবে, আর তারপর তাদেরই সঙ্গে তাকে শহরে এসে ঢুকতে হবে।'

'তাহ'লে তো তাকে দেয়ালটা টপকে সার্কুলার রোডটা দিয়ে যেতে হবে ?'

'কিংবা মাটির ওপর দিয়ে না-গিয়ে, তার তলা দিয়ে যেতে হবে,' এতক্ষণে ফ্লরেঁস সরাসরি কামারের দিকে তাকালেন।

কিন্তু চিন্তায় যেন আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে আছেন কামারে, এই-যে আলোচনা হচ্ছে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার কিছুই যেন তাঁর কানে ঢোকেনি।

'মঁসিয় কামারে,' ফ্লরেঁস তাঁকে জিগেস করলেন, 'কারখানার দেয়ালের তলা দিয়ে কি কোনো সুড়ঙ্গ খোঁড়া সম্ভব হবে—যেটা সার্কুলার রোড পেরিয়ে গিয়ে সোজা চাষের জমিতে পৌঁছুবে?'

মাথা না-তুলেই কামারে বললেন : 'সম্ভব।'

'কতদিন লাগবে কাজটায়?'

কামারে একটুক্ষণ চুপ ক'রে কী ভাবলেন। 'সাধারণ অবস্থায় যদি কোনো সুড়ঙ্গ খুঁড়তে হ'তো তাতে তবে অনেকদিন লেগে যেতো। কিন্তু পুরো ঝামেলাটাই এড়ানো যাবে একটা যন্ত্রের সাহায্যে যার কথা আমি এক্ষুনি ভেবে ফেলেছি। বেলেজমিতে এ-যন্ত্রটা চমৎকার কাজ দেবে। যন্ত্রটা তৈরি ক'রে সুড়ঙ্গ খুঁড়তে-খুঁড়তেই যদি এগুতে হয়, তবে পনেরো দিনের মধ্যেই কাজটা সেরে ফেলা যাবে।'

'তাহ'লে এপ্রিলমাস শেষ হবার আগেই কাজটা আপনি ক'রে ফেলতে পারবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

যে-মুহূর্তে কেউ তাঁর কাছে একটা সমস্যা এনে হাজির করেন, অমনি কামারে যেন নতুন ক'রে আবার প্রাণ ফিরে পান, উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠেন। তাঁর মাথা যেই এ-সমস্যাটায় খেলতে শুরু করেছে অমনি তাঁর বয়েস যেন আবার অনেকটাই ক'মে গিয়েছে।

'আরেকটা কথা, মঁসিয় কামারে। সুড়ঙ্গটা বানাতে কি কারখানার সব কর্মীকেই হাত লাগাতে হবে?'

'হ্যাঁ, আমার বেশ-কিছু লোক লাগবে।'

'যারা সুড়ঙ্গ বানাবার কাজে লাগবে না—তারা কি ঐ সময়ের মধ্যে তিন-চার হাজার অস্ত্র বানাতে পারবে?'

'কী ধরনের অস্ত্র? বন্দুক-পিস্তল বানানো যাবে না।'

'বর্শাবল্লম, ছুরিকৃপাণখঞ্জর, কুড়ুল, মুগুর —যা খুশি—কাটতে, বেঁধাতে, গায়ের জোরে কষাতে যা-যা লাগবে, তা-ই।'

'হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে—বানানো যাবে বৈ কি!'

'আর এই অস্ত্রশস্ত্র—সেগুলো কি হ্যারি কিলারের লোকজনের চোখে ধুলো দিয়ে গোলামখানায় পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে?'

'সেটা একটু কঠিন কাজ,' কামারে শান্তগলায় বললেন। একটু থেমে, কী ভেবে, আবার বললেন : 'হ্যাঁ, তাও করা যাবে, যদি রাতটা ঘুটঘুটে অন্ধকার থাকে।'

আমেদে ফ্লরেঁস অমনি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন। 'তাহ'লে এ-যাত্রায় আমরা বেঁচে গেলুম। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, মঁসিয় কামারে, তোঙ্গানে সুড়ঙ্গ দিয়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেরিয়ে যাবে, বাইরে চাষের জমির কাছে অপেক্ষা করবে, কখন কালো শ্রমিকরা এসে হাজির হবে, তারপর তাদের সঙ্গে মিশে যাবে, আর সে-দিন সন্ধেয় সে তাদের সঙ্গে শহরে ফিরে আসবে। রাত্রিবেলায় সে বিদ্রোহের ডাক দেবে। এই দুর্ভাগা লোকগুলো সবাই এত অসুখী এখানে, সাধ ক'রে কি কেউ দাসের জীবন কাটাতে চায়, সে শুধু তাদের বলবে কাঁধের জোয়াল খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে, শৃঙ্খল ছাড়া তাদের হারাবার কিছু নেই, অস্ত্র হাতে পাবামাত্র তারা *সংগঠন করবে বিদ্রোহ*। আপনি যখনই তাদের অস্ত্র জোগাবেন, তারা আর একমুহূর্তও সময় নষ্ট করবে না। আপনাকে কিন্তু এক্ষুনি কাজে লেগে পড়বে হবে, মঁসিয় কামারে!'

'আমি এর মধ্যেই কাজে লেগে গিয়েছি,' কামারের কাছ থেকে শুধু এই উত্তরটাই এলো। বাস্তবিকই, ততক্ষণে তিনি একটা নকশা তৈরি করতে লেগে গিয়েছেন।

আমেদে ফ্লরেঁস সকলের চোখের সামনে বিদ্রোহের যে-ছবি তুলে ধরেছিলেন, তাতে গোটা কারখানা যেন উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। হ্যাঁ, এটাই একমাত্র রাস্তা। এই এত হাজার লোকের সাহায্য না-চাওয়া তাদের পক্ষে বোকামিই হ'তো। কী ক'রে যে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে, *কামারে আশ্বাস দেবার পর*, সে-সম্বন্ধে কারু মনেই কোনো সন্দেহ থাকেনি।

পরের দিন থেকেই হেলিবিমান নির্মাণের কাজ বন্ধ ক'রে দেয়া হ'লো। সব কর্মীই কাজে ব্যস্ত, কেউ অস্ত্র বানাচ্ছে, কেউ-বা কামারের সেই যন্ত্র বানাচ্ছে যেটা মাটির তলা দিয়ে যাবে। বাকিরা সারাক্ষণ বাইরের দেয়ালের পাশে মাটি খুঁড়ছে, দেয়ালের আড়ালে, যাতে রাজভবন থেকে এই বিপুল উদ্দীপনার কিছুই চোখে না-পড়ে। যে-মস্ত কূপটা খোঁড়া শুরু হয়েছিলো, একুশে এপ্রিলের মধ্যেই তা তিরিশ ফিট গভীর হ'য়ে গেছে। কামারের মনে হ'লো সেটাই যথেষ্ট, সেখানে এবার শুরু হ'লো মাটির উপরিতলের সমান্তর একটা রাস্তা বানানো। আর সেটা সহজে করবার জন্যে পনেরো ফিট লম্বা আর চার ফিট চওড়া একটা শঙ্কু তৈরি করেছেন, খোন্তার মতো ; একটা মস্ত চাকার মতো তাতে খাঁজ কাটা। একটা বিদ্যুতে-চলা মোটর এই খোন্তা ও বেলচার সংমিশ্রণকে চালায়, বেলেমাটির মধ্যে গন্ধগোকুলের মতো পথ খুঁড়ে-খুঁড়ে সে এগোয়, প্রায় যেন একটা স্ক্রুর মতো ঐ মাটিতে ডেবে যায়, আর ঐ বেলচা ভেতর থেকে মাটি তুলে আনে। এই মস্ত চাকার মতো দেখতে শঙ্কুল বেলচা/খোন্তার পেছন-পেছন মাটিতে ঢুকেছে মস্ত-একটা সিলিণ্ডার, ঐ একই মাপের, ভেতরটা ফাঁপা, অর্থাৎ সুড়ঙ্গটা খোঁড়া হ'য়ে গেলে তার মধ্যে থাকবে ধাতুর একটা নল, প্রায় দেড়শো ফিট লম্বা।

এত-সব নানাধরনের কাজে কারুই যখন আর দম ফেলবার কোনো সময় নেই, কামারেকে কাজের জায়গায় মাত্র ক্বচিৎ-কখনও দেখা গেছে। যখনই এসেছেন তখনই তাঁকে দেখিয়েছে বিমর্ষ, অন্যমনস্ক, কোনো মুশকিল আসানের সময় ছাড়া তিনি যেন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুতেই কাজের জায়গায় দেখা দিতেই চান না। সমস্যার সমাধান ক'রেই আবার অন্তর্ধান করেন কামারে, নিজের ডেরায় দরজা বন্ধ ক'রে রাখেন, তাঁর খাশ পরিচারক জ্যাকো তাঁর খাবার এনে দেয়, সেখানে একাই ব'সে-ব'সে দু-এক কুটো খাবার দাঁতে কাটেন।

সুড়ঙ্গটা কিন্তু তাঁর ছক-মতোই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ হ'য়ে গেলো।

তিরিশে এপ্রিল ভোরবেলাতেই দেড়শো ফিট লম্বা নলটা পাতা হ'য়ে গেলো মাটির তলায়, আর, তা না-হ'লে বিষম মুশকিলই হ'তো; সাতাশে থেকেই খাবারে টান প'ড়ে গিয়েছিলো, র‍্যাশনে এমনিতেই কম খাবার দেয়া হচ্ছিলো, এবার যা খাবার দেয়া হ'লো, তা নেহাৎই নামেমাত্র।

অনাহারে থাকলে এমনিতেই মেজাজটা খিটখিটে হ'য়ে ওঠে। কারখানাতেও এর কোনো ব্যত্যয় হয়নি। যদিও সবাই ভূতের মতো খাটছে, কেননা এই কাজের ওপরই তাদের জীবনমরণ নির্ভর ক'রে আছে, তবু মুখগুলো শুকিয়ে গেছে সবার, কথায়-কথায় খিটিমিটি বেঁধে যাচ্ছে। যে-পরিচালককে এতদিন তারা প্রায় দেবতার আসনে বসিয়েছিলো তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার ভাব এবার হয়তো একটু যেন কমেছে—সেই অন্ধভক্তি আর নেই। কেননা যাঁকে তারা ভাবতো জাদুগরের মতো সবকিছুতেই ভেলকি দেখাতে পারেন, সেই-তিনি যখন তাদের ক্ষুধার অন্ন জোগাতে পারছেন না, তখন তাঁর প্রতি এদের ভক্তি একটু চ'টে যাবে বৈ-কি!

তাছাড়া একটা কিংবদন্তিও রচিত হচ্ছিলো ধীরে-ধীরে, রাজভবনের সঙ্গে শত্রুতা শুরু হবার আগে কামারে যখন জেন ব্লেজনের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন, সেই কথা থেকেই তার উৎপত্তি। গোড়ায় হ্যারি কিলার যে তাকে পছন্দ করেছে এই ব্যাপারটায় কেউই তেমন গুরুত্ব আরোপ করেনি, বরং ভেবেছে তার স্বৈরাচারী খামখেয়ালিপনারই বুঝি আরেকটা দৃষ্টান্ত। কিন্তু এখন যখন অবস্থা ক্রমেই আয়ত্তের বাইরে চ'লে যাচ্ছে, বিশেষ ক'রে খিদে যখন মাথার মধ্যেটাই ঘুলিয়ে দিচ্ছে, তখন হ্যারি কিলারের খামখেয়ালটাকেই ভীষণ-গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে হ'লো—যদিও হ্যারি কিলার নিজে বোধহয় সে-কথা অ্যাদ্দিনে বেমালুম ভুলে গিয়েছে। ভাবনাটা একবার কর্মীদের মাথায় হানা দেবার পর সেটাকে আর-কিছুতেই তাড়ানো যাচ্ছিলো না। এ যেন প্রায়-প্রতিষ্ঠিত সত্য—তর্কাতীত। তাদের যে এত বাধাবিপত্তির মধ্যে পড়তে হয়েছে, তাদের যে এখন অনাহারে দিন কাটছে, তার কারণ মিস জেন ব্লেজনের ঐ চমকপ্রদ দেহসৌষ্ঠব। যদি সে হ্যারি কিলারকে বিয়ে করতে রাজি হ'য়ে যায়, তাহ'লেই সব ঝামেলা মিটে যাবে। মাত্র একজনের জন্যে এত লোককে ভুগতে হচ্ছে! তার আত্মবিসর্জনেই যদি সব সমস্যার সমাধান হ'য়ে যায়, তবে তাতে আর আপত্তি কেন!

কর্মীদের মধ্যে যে-এরকম একটা ধারণা ক্রমেই শেকড় চাড়িয়ে দিচ্ছে এটা জেনের মোটেই অগোচর থাকেনি। দু-একটা টিপ্পনী যা কানে গেছে, দু-একবার এমন-বিশ্রীভাবে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকে তার দিকে তাকিয়েছে যে জেনের বুঝতে মোটেই বাকি থাকেনি সবাই তার ওপর কেমন অসন্তুষ্ট হ'য়ে আছে। নিজে সে তাদের ধারণাকে কোনোই গুরুত্ব দেয়নি, কিন্তু এতজন লোক যে এককাট্টা হ'য়ে একই জিনিশ ভাবছে, এটা তার ওপর খানিকটা ছাপ ফেলেছে বৈ-কি! কাজেই আস্তে-আস্তে তারও মনে হয়েছে সে যদি হ্যারি কিলারের কাছে ধরা দেয়—সেটা তার পক্ষে আত্মহত্যারই শামিল হবে—তবু তো এতগুলো নিরীহ লোক রক্ষা পাবে! কী ক'রে সে তার দাদার হত্যাকারীর সঙ্গে থাকবে! সে বরং ম'রে যাবে, তাও সই, তবু ককখনো তা হ'তে দেবে না। কিন্তু তবু এতগুলো লোককে বাঁচানো তার কর্তব্য—সে না-হয় এদের বাঁচিয়ে দিয়ে তারপরই আত্মহত্যা করবে!

ক্রমেই এই ব্যাপারটা তার মধ্যে এমন দানা পাকিয়ে গেলো যে একদিন সে তার বন্ধুদের কাছে কথাটা খুলে বললে। নিজের ভীরুতাকে ধিক্কার দিলে সে, বললে যে হ্যারি কিলারের কাছে গিয়ে সে আত্মসমর্পণ করবে, শুধু একটা শর্তে, যে, বাকি সবাই ছাড়া পাবে। শুনে, সাঁৎ-বের্ঁার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো।

আমেদে ফ্লরেঁস তো খেপে-আগুন। 'আপনি আমাদের সকলের অসম্মান করতে চাচ্ছেন। আর তাও আবার অকারণে, যা থেকে কারুই কোনো লাভ হবে না! হ্যারি কিলার নিজের ক্ষমতায় এতটাই আস্থা রাখে যে সে ধ'রেই নিয়েছে একদিন-না-একদিন সে আপনাকে বাগে পাবেই—এবং তার জন্যে তাকে কোনো দামই দিতে হবে না! তাছাড়া, এটাও জেনে রাখুন, হ্যারি কিলার কোনোদিনই তার কোনো প্রতিশ্রুতি রাখবে না! তার কোনো কথায় যে বিশ্বাস করে সে একটা আকাট বোকা।'

বারজাক, ডাক্তার শাতোনে, এমনকী মঁসিয় পঁসাঁও—যিনি সাত চড়েও রা কাড়েন না—সবাই ফ্লরেঁসের কথাতে এমন জোর দিয়ে সায় দিলেন যে জেনকে আপাতত এই শহিদ হবার আজগুবি আশঙ্কা থেকে স'রে আসতে হ'লো। তাছাড়া এবার যখন সুড়ঙ্গটা তৈরি হ'য়ে গেছে, তাতে এমন প্রস্তাব একেবারেই অর্থহীন। আর তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তোঙ্গানে ঐ সুড়ঙ্গপথে পালাবে, আর পরদিনই সে নিশ্চয়ই বিদ্রোহের সংকেত দিয়ে, কারখানার সবাইকে মুক্তি দেবে।

যদি ব্ল্যাকল্যাণ্ডের নগরপরিকল্পনার সময় ছকটা ঠিকঠাক অনুসরণ করা হ'য়ে থাকে, তাহ'লে নদীর উজানের দিকটায় কারখানার দেয়ালের মুখোমুখি দুটো দেয়ালের কোণা দাঁড়িয়ে আছে, একটা শাদাদের আস্তানার দেয়াল, অন্যটা কালোদের বস্তির দেয়াল। ঐ কোণাটা থেকেই, তোঙ্গানে সংকেত করবে—যদি অবস্থা ভালো বোঝে—অস্ত্র পাঠাতে। সেইজন্যেই পয়লা মে সন্ধেবেলায় কারখানার সকলেই ঐ কোণাটার দিকেই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তাকিয়েছিলো। রাঙানদীর কাছে, কর্মীদের কোয়ার্টারের পাশে, কামারে একটা মাচা তৈরি ক'রেছিলেন। সেটার ওপর উঠেই সকলে দলে-দলে এই গোরা-কালো মহল্লার সন্ধিস্থলের দেয়ালটার দিকে অনিমেষ লোচনে তাকিয়েছিলো।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম চেষ্টাগুলো যে মাঠেই মারা যাবে, এটা মোটামুটি আন্দাজ করাই ছিলো। তোঙ্গানের সব উদ্যম যদি সফলও হয়, তবে সে-তো সদ্য এসে পৌঁছুবে কালোদের বস্তিতে। সবকিছু বুঝিয়ে ব'লে বিদ্রোহের ডাক দিতেও তো তার খানিকটা সময় লাগবে।

কিন্তু পরদিনও যখন কোনো সংকেত এলো না, কারখানা তখন একটু অস্বস্তিতে প'ড়ে গেলো। তবে নিজেদের সবাই এই ব'লে বোঝালে যে পূর্ণিমার রাতে এমনিতেই অস্ত্র পাচার করা মুশকিল হ'তো। কিন্তু তেসরা মে কারখানার উদ্বেগ যেন প্রায় অসীমে পৌঁছুলো, কারণ সেদিন সারাদিনই আকাশে মেঘের আনাগোনা ছিলো, মেঘ ছিঁড়ে সন্ধের সময় একবারও চাঁদ বেরুতে পারেনি। তোঙ্গানের এই ব্যর্থতা আরো-উৎকণ্ঠা জাগালে এইজন্যেই যে সেদিনই সবাই শেষকণা খাবার শেষ ক'রে ফেলেছে। দু-দিন, বড়ো-জোর তিনদিন, তারপরেই হয় তারা সফল হবে, নয়তো আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে, আর নয়তো সবাই উপোস ক'রেই মরবে।

কারখানার কাছে মনে হ'লো চৌঠা মের দিনটা যেন আর শেষ হবে না। অধীরভাবে সবাই অপেক্ষা ক'রে আছে কখন সন্ধে নামে, কখন অন্ধকার হয়। কিন্তু সেদিনও কালোদের বস্তি থেকে কোনো সংকেতই এলো না।

পাঁচই মে শুরু হ'লো ধুঁকতে-ধুঁকতে। গত দু-দিন উপোস ক'রে কেটেছে সবার। হৃদয় যদি-বা মানে, জঠর মানে না। ওয়ার্কশপগুলোয় কেউ নেই। কর্মীরা, তাদের স্ত্রী এবং বাচ্চারা, একই সঙ্গে কেমন করুণ কিন্তু খ্যাপাভাবে কারখানার এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কিছু যদি না-হয় তবে সবাই গিয়ে হ্যারি কিলারের পায়ে পড়বে, তাও সই, তবু এভাবে অনাহারে মরার কোনো মানে হয় না। ছোটো-ছোটো দলে ভাগ হ'য়ে তর্কাতর্কি হচ্ছে। কটুকাটব্য, তিক্ত মন্তব্য তো বটেই—কেউ-কেউ আবার বলতে শুরু করেছে নিজে ছাড়ান পেয়ে গিয়ে তোঙ্গানে অন্যদের কথা বেমালুম ভুলেই গিয়েছে। ঐ কালো লোকটা নিশ্চয়ই এত হাবা নয় যে নিজের জীবন বিপন্ন ক'রেও সে সকলের উদ্ধারের চেষ্টা করবে!

এমনি একটা দলের পাশ দিয়ে যাবার সময় জেন ব্লেজন হঠাৎ নিজের নামটা শুনতে পেলে। একটি কর্মী আর তার স্ত্রী ফাটাফাটি ঝগড়া ক'রে চলেছে, আর তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তাদের কয়েকজন সাথী। এতটাই তারা খেপে গিয়েছে যে কে কোথায় আছে তা পর্যন্ত তারা খেয়াল করছে না। জেন থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে শোনবার চেষ্টা করলে তারা কী বলছে।

স্বামীটি চীৎকার ক'রে বললে : 'ওরা যা-খুশি বলে বলুক; কিন্তু এই খুদে রাজকন্যাটির জন্যে আমরা যে সবাই এখন মরতে চলেছি, এটা বড্ড-বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে!'

স্ত্রী বললে : 'তোমার লজ্জা করে না এমনভাবে কথা বলতে?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'লজ্জা !... তুমি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছো, মা-জননী !... আমার বাড়িতে একটা বাচ্চা আছে—আর সে এখন না-খেতে পেয়ে ধুঁকছে, কাঁদতেও পারছে না—'

'তোমার কি মনে হয় আমার কোনো ছেলেমেয়ে নেই ?'

'তোমার ছেলেপুলে না-খেতে পেয়ে মারা গেলে তোমার যদি কোনো আপত্তি না-থাকে, তবে আমি সেখানে নাক গলাবার কে ? সহানুভূতি উথলে উঠলে আমার তো আর প্রাণ বাঁচবে না ! কালও যদি হালটা এ-রকম থাকে, তাহ'লে সোজা আমরা কত্তার কাছে গিয়ে মনের কথা খুলে বললো। ঐ রাজকন্যার জন্যে তো আর আমরা সবাই এমন ক'রে মরতে পারি না !'

'তোমার মতো ডরপোক আমি দুটি দেখিনি !' ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে স্ত্রী বললে। 'আমার ছেলেমেয়ে নিয়ে আমায় যদি কবরেও যেতে হয় তাও সই, তবু অমন বেআক্কেলে কেলেঙ্কারি কাজ আমাকে দিয়ে হবে না ! কী ঘেন্না, ছী-ছি !'

'যার যেমন রুচি,' লোকটা আলোচনা থামিয়ে দিলে। 'কালকেই বোঝা যাবে কার কতটা মুরোদ !'

জেন ব্লেজনের মনে হ'লো সে বুঝি পারলে মাটিতে মিশে যেতো ! এখন ওরা খোলাখুলিভাবে তাকে নিয়ে এ-সব কথা বলতে শুরু করেছে। তাদের মতে, তাদের এই নাজেহাল দশার জন্যে সে একাই দায়ী ! অসহ্য—অসহ্য—এই ভাবনা। কিন্তু ওরা যে সব ভুল ভাবছে, এটা বোঝাবার জন্যে কী করতে পারে সে ?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মিনিটের পর মিনিট, ৫ই মে, শেষটায় যেন বুকে হেঁটেই তার সমাপ্তিতে গিয়ে পৌঁছুলো। সূর্য ডুবে গেলো একসময়। নেমে এলো রাত্রি। আজও আবার, পর-পর তৃতীয় দিন, ঘন-কালো মেঘে চাঁদ ঢাকা প'ড়ে গেছে। অন্ধকার যেন থমথম করছে। তোঙ্গানে কি এই পরিবেশের সুযোগ নেবে আজ ? সেই দীর্ঘপ্রতীক্ষিত সংকেত কি আসবে এই অন্ধকারের মধ্যে ? কারু চোখে কোনো আশা নেই, তবু সবগুলো চোখ সেদিকেই ফেরানো—যেখান থেকে ঐ সংকেত আসার কথা। কারখানার ঘড়ি ঢং-ঢং ক'রে ঘোষণা করলে সাতটা, আটটা, সাড়ে-আটটা। না, মিথ্যেই তাদের এই অধীর প্রতীক্ষা !

কিন্তু সাড়ে-আটটার কয়েক মিনিট বাদেই গোটা জমায়েৎটার মধ্যে হঠাৎ যেন দমকা-একটা শিহরন খেলে গেলো। না, তোঙ্গানে তাদের কথা ভুলে যায়নি। ঐ-যে, কালোদের বস্তির মধ্য থেকে, দেয়ালের ওপর অবশেষে দেখা দিয়েছে সংকেত !

একমুহূর্তও সময় নষ্ট না-ক'রে কাজে লেগে গেলো সবাই। কামারের নির্দেশে তক্ষুনি মাচার কাছে এসে হাজির অদ্ভুত দেখতে একটা জিনিশ,—অ্যাঁ, একটা কামান যে ! সত্যিকার কামান ! তার কোনো চাকা নেই, আর সেটা বানানো হয়েছে কাঠে ! সেই কাঠের তৈরি নলচের মধ্যে বসানো হ'লো অস্ত্রভরা সিন্দুক—তারপর জমাট গ্যাসের চাপে সেটা *নিঃশব্দে* ছুটলো লক্ষ্যের দিকে। সঙ্গে গেলো ইস্পাতের দুই দাঁড়া, সিন্দুকের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গায়ে আটকানো সবকিছু ঠিকঠাক চললে সেটা গিয়ে কালোদের বস্তির দেয়ালে আঁকশির মতো আটকে যাবে। সিন্দুকের ওজন, দাঁড়াগুলোর দৈর্ঘ্য, জমানো গ্যাসের পরিমাণ, লক্ষ্যের দিকে মুখ-করা কামান—সব অঙ্ক ক'ষে নির্ভুল স্থির করেছেন কামারে। এবং এই অদ্ভুত কামান দাগবার দায় কামারে আর-কারু হাতেই ছেড়ে দিতে রাজি নন।

নিঃশব্দে, ক্ষেপণসিন্দুক ছুটলো নদীর ঘাটের ওপর দিয়ে, পেরিয়ে গেলো রাঙা-নদী, *হর্ষচরিতদের* আস্তানা, আর কালোদের বস্তিতে গিয়ে পড়লো। তাহ'লে কি সফল হয়েছেন তাঁরা? আঁকশির মতো ঠিকঠাক দেয়ালটাকে কি আঁকড়েছে দাঁড়াগুলো, আর তাদের মুখে লাগানো আংটা?

কামারে একবার তাকিয়ে দেখলেন তাঁর অদ্ভুত কামানটাকে—হয়তো তাঁর প্রতিভার এটাই শ্রেষ্ঠকীর্তি। হ্যাঁ, এবার আকাশে একটা পথ তৈরি হ'য়ে গেছে, ঐ দাঁড়াদুটোয়, তাছাড়া সিন্দুকটা গিয়ে পড়েছে কালোদের বস্তিতে। দাঁড়াদুটো এমনভাবে টান-টান হ'য়ে আছে যে বোঝাই যায় তারা আঁকড়ে ধ'রে আছে দেয়ালের কানা।

আর সেই আশমানি রাস্তাতেই মুহুর্মুহু পাঠানো হ'তে লাগলো অস্ত্রশস্ত্র। প্রথমেই বিস্ফোরকের একটা প্যাকেট, তারপর চার হাজার ছুরি-কৃপাণ, কুড়ুল-বল্লম। এগারোটার মধ্যেই সব কাজ সারা। সবাই মাচা থেকে স'রে এসে এবার সদরদরজার কাছে এসে দাঁড়ালে। যে যা হাতের কাছে পেয়েছে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। মেয়েরা শুদ্ধু, অপেক্ষাকৃত-বড়ো ছেলেমেয়েরা শুদ্ধু। গাদাগাদি ঠাশাঠাশি দাঁড়িয়ে সবাই। এবার উপযুক্ত মুহূর্তে নিজেরাই গিয়ে আসরে নামবে তারা।

কিন্তু কে-একজন যেন নেই এই দলটায়। নেই, *একটি তরুণী নেই*: জেন ব্লেজন!

সাঁৎ-বের্ঁা, আমেদে ফ্লরেঁস, বারজাক, ডাক্তার শাতোনে মিথ্যেই গলা ফাটিয়ে তার নাম ধ'রে ডাকলেন, আর প্রতিধ্বনি গমগম ক'রে নামটা চারপাশে ছড়িয়ে দিতে লাগলো। মিথ্যেই তাকে খোঁজা হ'লো সারা কারখানায়। তাকে কোথাও পাওয়া গেলো না। সে যেন মন্ত্রবলে, না কি খোলা হাওয়ায় কর্পূরের মতো, উবে গিয়েছে।

এবার কারখানার অনেক কর্মীও খোঁজাখুঁজিতে লেগে গেলো। মিথ্যে চেষ্টা।

*চাক্ষুষ অনুপস্থিতির* প্রমাণটাকেই বাধ্য হ'য়ে মেনে নিতে হ'লো সবাইকে। সে-যে কোথাও নেই, এটাই চাক্ষুষ দেখা যাচ্ছে।

জেন ব্লেজন কোন ফাঁকে কোথায় যেন উধাও হ'য়ে গিয়েছে!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগারো

## দরজার ওপাশে কী আছে

জেন ব্লেজন কিন্তু সবচেয়ে সহজসিধে পথেই চ'লে গিয়েছিলো। কাউকে কিছু না-ব'লে সোজা সে বেরিয়ে গিয়েছিলো দরজা দিয়ে, দরজায় যথারীতি ছিটকিনি ছিলো, খিল ছিলো, এমনকী তালাও লাগানো ছিলো। কিন্তু তাতে কী। *সাইক্লোস্কোপে* তখন যার পাহারায় থাকার কথা সে তাকে কারখানা ছেড়ে চ'লে যেতে দেখেছে কিন্তু তাকে চিনতে পারেনি। তাকে ব'লে দেয়া ছিলো নেহাৎ একান্ত-জরুরি না-হ'লে সে যেন অহেতুক রক্তক্ষয় না-করে, সেইজন্যেই সে মাত্র একজনের বিরুদ্ধে *বোলতা* লেলিয়ে দিতে চায়নি—বিশেষ ক'রে সে যখন কারখানায় ঢুকতে চাচ্ছে না, বরং কারখানা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

পাহারার প্রতিবেদন দেখিয়েছে যে জেন, কারখানা ছেড়ে বেরুবার পর, উজানের দিকে গেছে, নদীর ঘাট ধ'রে। ফলে কোনো বিভ্রমেরই কোনো অবকাশ নেই; সন্দেহ নেই যে অন্যরা যে-পরিকল্পনাটা কাজে খাটাতে পই-পই ক'রে বারণ করেছিলো, সে সেই *অবাঞ্ছিত* পরিকল্পনাটাকেই কাজে খাটিয়েছে। অনেক বিচার-বিবেচনা ক'রে সে স্থির করেছে অবশেষে সে গিয়ে হ্যারি কিলারের কাছেই ধরা দেবে। পরিহাস এটাই যে যখন সে গেছে তখন আর তার এই আত্মবিসর্জনের কোনোই দরকার ছিলো না।

ভাঁটির দিকের নদীর ঘাট শেষ হয়েছে সার্কুলার রোডে গিয়ে, সেটা বন্ধ ছিলো; উজানের দিকে নদীর ঘাট গিয়ে শেষ এস্‌প্ল্যানেডের দেয়ালে; তাই নদীর ঘাটের পুরো রাস্তাটাই ছিলো আসলে একটা কানাগলি। এখানে অবশ্য ধাতুর পাতের বর্মপরানো একটা দরজা ছিলো দেয়ালের গায়ে। এই দরজাটা সাধারণত বন্ধই থাকে, আর তার চাবি থাকে মাত্র দুজনের কাছে—মার্সেল কামারে আর হ্যারি কিলার। শত্রুতা শুরু হবার পর থেকেই এ-দরজাটা খোলাই ছিলো। ফলে *হর্ষচরিতেরা* যদি তাদের হর্ষোল্লাসে তার পথ না-আটকায়, জেন ব্লেজন তবে অনায়াসেই এস্‌প্ল্যানেডে পৌঁছে সোজা রাজভবনে চ'লে যেতে পারবে।

শুধু-একটা মরীয়া হতাশার মুহূর্তেই জেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই কাজে। কারণ সবাই যখন এই ধারণাটাকেই আঁকড়ে ব'সে আছে যে তারই জন্যে সবাই এখন মরতে বসেছে, তাদের সব বিপদআপদের মূলে আছে একমাত্র শুধু সে-ই, তখন সে এতটাই বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলো যে স্বাভাবিকভাবে কিছু ভেবে দেখবার মতো মনের অবস্থাই তার ছিলো না—*এত লোক তাকে এমনভাবে ঘৃণা করে!* কিন্তু, ধরো, তাদের ধারণাই যদি ঠিক হয়? যদি সে-ই সত্যি দায়ী হয়? যদি সত্যি এই মারামরি কাটাকাটির আসল কারণ সে-ই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়? যদি তাকে পেলেই হ্যারি কিলার তুষ্ট হ'য়ে যায়? তা যদি হয়, তবে যত-দেরি করবে, ততই সকলের অমঙ্গল—প্রায় একটা অসংশোধনীয় অপরাধই! নিজেকে তার গালাগাল দিতে ইচ্ছে করছিলো—এতজনকে বাঁচাতে পারবে জেনেও সে কি না এই সিদ্ধান্ত নিতে এত-দেরি ক'রে ফেললো! আর কারখানার সবাই যদি ভুলও ভেবে থাকে—যদিও সবাই মিলে একসঙ্গে এমন-একটা ভুল করবে, তা কি হয়?—তাহ'লে তার আত্মসম্মানের বোধ কি এটাই বলে না যে নিজের জীবন দিয়েও তাদের চোখে-আঙুল-দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তারা ভুল ভেবেছে?

সংকেত দিতে তোঙ্গানের দেরি হওয়ার ফলেই এই দুর্বিপাকের ঘোরের মধ্যে তার মন এ-রকম *প্রাঞ্জল* একটা সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছুবার সময় পেয়েছিলো। কাজেই ৫ই মে সন্ধেবেলায়, হঠাৎ, *হঠাৎই*, তার মাথাটায় কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায় সব, আর তক্ষুনি সে ছুটে বেরিয়ে যায় তার মাথায় যেটা তখন তার একমাত্র কর্তব্য ব'লে চেপে বসেছিলো, তাকেই সম্পাদন করতে।

কিছুই তার খেয়াল ছিলো না তখন। নিজেই সে বুঝতে পারেনি, সে কী করছে। সে শুধু আস্তে আলগোছে দরজাটা খুলেছে আর সকলের অগোচরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তারপর, নিঃশব্দে, পেছনে ফের বন্ধ ক'রে দিয়েছে দরজাটা, আর রাজভবনের দিকে চলতে শুরু করেছে, কারখানার আলোয় চারপাশ ঝলমল করছিলো ব'লে শুধু সে চেষ্টা করেছে দেয়ালের গায়ে মিশে গিয়েই যেন সে আস্তে-আস্তে এগুতে পারে। *সাইক্লোস্কোপের* পাহারার মতো, শহরের বাইরের দেয়ালের কাছে যে-*হর্ষচরিতরা* পাহারায় ছিলো তারাও তাকে বেরুবামাত্রই চোখে দেখেছে। কিন্তু তাদেরও মনে হয়নি মাত্র একজনের ওপর এভাবে গুলি চালানো উচিত—বিশেষত এমনও হ'তে পারে যে এমনভাবে প্রকাশ্যে যে হেঁটে বেড়াচ্ছে সে হয়তো তাদেরই দলের লোক।

কাজেই জেনের পক্ষে এসপ্ল্যানেডে পৌঁছুতে আদৌ কোনোই অসুবিধে হয়নি, সে ঐ খোলা দরজাটা দিয়েই এগিয়ে গেছে। রাঙানদীর তীরের দেয়াল ঘেঁসে, সে দুঃসাহসে ভর ক'রেই সরাসরি চ'লে এসেছে খোলা জায়গাটায়, দৃকপাতও করেনি *হর্ষচরিতদের* ক-টা ছোটোখাটো দলের মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হচ্ছে। আর তার এই বেপরোয়া স্পর্ধা দেখে *হর্ষচরিতরা* এতটাই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে যে সে বেশির ভাগ রাস্তাটাই নিরুপদ্রবে পেরিয়ে আসতে পেরেছে। শুধু যখন রাজভবন থেকে সে মাত্র কুড়ি পা দূরে, তখনই একটা দলের মধ্য থেকে দুজন *হর্ষচরিত* বেরিয়ে এসে তাকে সাবধান ক'রে দিয়ে থামতে বলেছে।

বন্দীরা পালিয়ে যাবার আগে জেন যে স্বাধীনভাবে ইচ্ছে মতো রাজভবনে ঘুরে বেড়াতো, সেটা এই লোকগুলো দেখেছিলো। তাকে চিনতে পেরে তারা অবাক হ'য়ে অস্ফুট-একটা আওয়াজ করেছে শুধু; তার উদ্দেশ্য কী, তারা মোটেই জানে না; তাছাড়া



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্বস্তিও আছে বেদম, কেননা হ্যারি কিলার তাকে কতটা খাতির করেছে সে-তো তারা নিজের চোখেই দেখেছে; কী করবে বুঝতে না-পেরে হতভম্বভাবে তারা তাকে শুধু চ'লেই যেতে দেয়নি, একেবারে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে রাজভবনে, আর নিজের হাতে রাজভবনের দরজা খুলে দিয়েছে যাতে সে ভেতরে ঢুকে যেতে পারে।

যে-মুহূর্তে সে চৌকাঠ পেরিয়েছে, দরজাটা সশব্দে বন্ধ হ'য়ে গেছে তার পেছনে। সে চাক বা না-চাক, এখন থেকে সে হ্যারি কিলারেরই কব্জায়—এমন-কোনো আশাও আর নেই যে কেউ কোনোদিন তাকে উদ্ধার করবার জন্যে এখানে ছুটে আসবে।

রাজভবনে তার এই আকস্মিক আবির্ভাব তেমনি বিস্ময়ের সৃষ্টি করলো, যেমন করেছিলো এসপ্ল্যানেডে। যে-খাশ পরিচারকটি তাকে ভেতরে ঢুকতে দিয়েছে, সে বিষম হকচকিয়ে গিয়ে তাকে নিয়ে গেছে তার সর্বেসর্বা প্রভুর কাছে। তারই পেছন-পেছন জেন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেছে, গেছে গ্যালারির পাশ দিয়ে, অন্ধকার করিডরগুলো দিয়ে, আর সব-শেষে এসে পৌঁছেছে ঝলমলে আলোয় ভরা ঘরটায়, যেটাকে সে এত-ভালো চেনে। এটাই হচ্ছে মসনদকক্ষ, একবার আমেদে ফ্লরেঁস ঠোঁট বেঁকিয়ে যে-নামে এটাকে ডেকেছিলেন, যেখানে একবার ঠেলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিলো বন্দীদের, ব্ল্যাকল্যাণ্ডের সর্বেসর্বার সঙ্গে তাদের একমাত্র-সাক্ষাৎকারের জন্যে, যে-ঘরটায় আশবাব বলতে শুধু আছে একটা টেবিল আর একটা বিশাল আরামকেদারা।

আরামকেদারাটা এখনও তেমনি প'ড়ে আছে এখানে, আর আগের মতোই হ্যারি কিলার তার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে ব'সে আছে, আর সামনের টেবিলটায় রয়েছে সারি-সারি বোতল আর গেলাশ। কিন্তু এখন আশবাব বলতে শুধু ঐ আরামকেদারা আর টেবিলই নেই ঘরটায়। আরো-নটা চেয়ার আনা হয়েছে ঘরে, আর তাদের একটাই শুধু ফাঁকা, অন্য-আটটায় ব'সে আছে ক্রুর দেখতে আটজন লোক, তারাও চেয়ারে হেলান দিয়ে ব'সে মদ খাচ্ছে। হ্যারি কিলার তার *নবরত্নসভার* কৌশুলিদের সঙ্গে ব'সে ফুর্তি করছে।

দরজার কাছে দাঁড়ানো তরুণীটিকে দেখে, এই ন-জন আধমাতাল লোক বিস্ময়ে ঘোঁৎ ক'রে একটা আওয়াজ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে। কারখানা থেকে এমন-একজনের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব ছাড়া আর-কিছুই বোধহয় তাদের এতটা ভ্যাবাচাকা খাইয়ে দিতো না।

সবাই একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো : 'মিস মোর্‌নাস!'

'একাই?...' হ্যারি কিলার জিগেস করলে। দরজার ফাঁক দিয়ে একটা চৌকো অন্ধকার দেখে একটু বুঝি অস্বস্তিই হয়েছে তার।

'একাই।' জেনের গলা কাঁপছে, কিন্তু তবু তাতে দৃঢ়তার সুর। তার হাঁটুর জোড়গুলো তখন যেন খুলে আসতে চাচ্ছে; সে দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েক মুহূর্তের জন্যে এই ন-জন লোক বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে তার দিকে শুধু হা ক'রে তাকিয়ে রইলো। সে-যে এখানে এসেছে, এটাই চমকপ্রদ তথ্য; তার ওপর এমনভাবে? একা? তাদের এই হতভম্ব চাউনির সামনে জেনের মাথাটা আবার কেমন তালগোল পাকিয়ে গেলো, এতক্ষণে সে তার এই হঠকারী দুঃসাহসের তাৎপর্যটা একটু-একটু ক'রে বুঝতে পারছে।

'তুমি ঐ-ওখান থেকে,' ব'লে কারখানাটাকে দেখিয়ে জড়ানো গলায় বললে হ্যারি কিলার, 'আসছো?'

'হ্যাঁ,' প্রায়-শোনা-যায়-না এমন গলায় বললে জেন, ফিশফিশ ক'রে।

'এসেছো কেন এখানে?'

তার গলার সুরে কোনো অমায়িকভাব নেই। জেনের বুঝতে বাকি রইলো না যে কারখানার বুভুক্ষু কর্মীরা তাকেই সব দুর্বিপাকের কারণ ব'লে ভেবে কত-বড়ো ভুল করেছে। আবারও তার গা শিউরে উঠলো, তার এই আত্মত্যাগে পৃথিবীতে কোথাও কারু কোনো উপকারই হবে না!

'আমি ধরা দিতে এসেছি,' নিজেকে এতটাই তুচ্ছ ও অবাঞ্ছিত লাগছিলো যে এছাড়া আর-কিছু বলবার কথা তার মনেই হ'লো না।

'বেশ! বেশ!' ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে হ্যারি কিলার; তারপর, তার ইয়ারবক্সিদের দিকে ফিরে বললে, 'একলা একটু কথা বলতে দাও আমাকে।'

আটজন কৌশুলিই টলতে-টলতে উঠে দাঁড়ালে। মুচকি হেসে একজন জড়ানো গলায় টিপ্পনী কাটলে: 'ঠিক হ্যায়। আকেলাই রেখে যাচ্ছি তোমাকে।'

তারা যেই দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছেছে, হ্যারি কিলার হাত নেড়ে তাদের একটু থামতে বললে। তারপর জেনের দিকে ফিরে বললে: 'ৎশুমুকির কী হয়েছে তা আর জিগেস ক'রে কী হবে? ছিন্নভিন্ন হাত-পা দেখেছি তার! কিন্তু তার সঙ্গে যে অন্য আরেকজন ছিলো, তার কী হয়েছে?'

'ৎশুমুকিকে আমরা খুন করিনি,' জেন উত্তর দিলে। 'হেলিবিমান উড়িয়ে দিতে গিয়ে সে নিজেই বিস্ফোরণে উড়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে যে ছিলো, সেও বেশ জখম হয়েছে। কারখানায় ওরা তার সেবাশুশ্রূষা করছে!'

'আহা!' বললে হ্যারি কিলার, শ্লেষের ভঙ্গিতে। 'হেলিবিমানের কী হয়েছে?'

'চুরমার!'

হ্যারি কিলার খুবই আহ্লাদের ভঙ্গিতে হাত কচলালে—আর বাকি-আটজন কৌশুলি টলোমলো-পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। 'তো, তুমি তাহ'লে এখন ধরা দিতে এসেছো? বটে? তা, এই ধরা দেবার সুমতি হঠাৎ হ'লো কেন?'

'অন্যরা যাতে প্রাণে বাঁচে,' সাহসে ভর ক'রে বললে জেন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অসম্ভব!' খুক ক'রে একটু হেসে উঠলো হ্যারি কিলার। 'তাহ'লে সবাই একেবারে নাজেহাল—সহ্যের একেবারে শেষসীমায়? অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ,' চোখ নামিয়ে প্রায় ফিশফিশ ক'রেই বললে জেন।

বিষম আহ্লাদে গেলাশে মাত্রাছাড়ানো পরিমাণে মদ ঢাললে হ্যারি কিলার—আর সবটাই একঢোঁকে গলায় চালান ক'রে দিলে। প্রশ্নের সুরে বললে, 'তো?'

'কিছুকাল আগে,' লজ্জায়-ধিক্কারে জেনের মুখ টুকটুকে-রাঙা হ'য়ে উঠলো, 'কিছুকাল আগে, তুমি আমায় বিয়ে করতে চেয়েছিলে। বিয়েতে আমি রাজি আছি, তবে একশর্তে—অন্যদের ছেড়ে দিতে হবে।'

'একশর্তে?...' হ্যারি কিলার বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়েই উঠলো : 'খুকি, চারপাশে কী হচ্ছে ব'লে তুমি ভাবছো? কারখানার লোকেরা যখন বেকায়দায় পড়েছে, তখন আজ না-হোক কাল আমি তাদের সব-কটাকে বাগে পাবোই—এবং তোমাকেও পাবো, ফাউ। আজ সন্ধেয় তোমার এভাবে এখানে আসায় কোনো লাভ হয়নি, খুকি—তাতে আমি শুধু হাতে আরেকটা তুরুপের তাশ পেলাম।'

উঠে দাঁড়িয়ে তার দিকে টলতে-টলতে এগুলো সে। 'তোমার বুকের পাটা আছে—না-হ'লে শর্তের কথা বলতে পারো! আমার স্ত্রী হবার জন্যে শর্ত! হুম, তুমি আমার বউ হবে—তবে সেটা হবে আমি যখন ইচ্ছে করবো, তখন। কিন্তু এখন তুমি আমাকে ঠেকাবে কী ক'রে শুনি! সেটা জানবার জন্যে কৌতূহলে আমি ম'রে যাচ্ছি!'

সে যতই জেন ব্লেজনের দিকে এগিয়ে এলো, জেন ব্লেজন ততই কুঁকড়ে গুটিয়ে গেলো। সে প্রায় তাকে ছুঁয়েই ফ্যালে বুঝি। শেষটায়, কোনঠাশা, দেয়ালে-পিঠ-ঠেকানো, জেন ঠিক তার নাকের ডগায় তার মদেভরা নিশ্বাসের ঝাপটা পেলে।

'আমি ম'রে যেতে পারি, ইচ্ছে করলে!'

'মরবে?...' হ্যারি কিলার, টালমাটাল, স্থির হ'য়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে। তার গলার ঠাণ্ডা দৃঢ়তায় সে কেমন ভড়কে গিয়েছে। দ্বিধার ভঙ্গিতে গাল চুলকে সে আবারও বললে : 'মরবে?'

একমুহূর্ত চুপ ক'রে থাকার পরই তার মাথায় বুঝি অন্য-কী-একটা ভাবনা খেলে গেলো। 'ধুস!... আচ্ছা, সে না-হয় কাল দেখা যাবে। বুঝলে, খুকি, শিগগিরই আমরা একটা সমঝোতায় এসে, পড়বো। ততক্ষণ, না-হয় এসো, একটু আমোদ-আহ্লাদ করা যাক।'

তার আরামকেদারায় ফিরে গিয়ে হ্যারি কিলার তার মদের গেলাশটা বাড়িয়ে ধরলে। 'এসো, দুজনে মিলে একটু পান করা যাক।'

জেন হাত না-বাড়ালে কী হবে, হ্যারি কিলার এক গেলাশের পর আরেক গেলাশ, তারপর আরেক গেলাশ, বেধড়ক মদ গিলে চললো। জেন আসবার আগেই তো অর্ধেক



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাতাল হ'য়ে গিয়েছিলো, এখন নেশার ঝোঁকে একটু পরেই তার নাক ডাকতে শুরু করলো।

তাহ'লে এই আরেকটা সুযোগ—তার দাদাকে সম্ভবত এই লোকটাই হত্যা করেছে —এবং এখন এই আততায়ীর জীবন আবারও আরেকবার তারই দয়ার ওপর নির্ভর ক'রে আছে। যে-খঞ্জরটা দিয়ে জর্জ ব্রেজন খুন হ'য়েছে, সেই একই খঞ্জর সে এখন অনায়াসেই তার হৃৎপিণ্ডে ঢুকিয়ে দিতে পারে! কিন্তু তাতে ফায়দাটা কী হবে? যাদের বাঁচাবার জন্যে এত-কষ্ট ক'রে সে এখানে এসেছে, হ্যারি কিলার ম'রে গেলে তাদের জীবন কি আরো-বিপন্ন হ'য়ে পড়বে না? কিছুক্ষণ ঐ ঘুমন্ত সর্বেসর্বার দিকে হা ক'রে তাকিয়ে রইলো জেন—চিন্তায় আচ্ছন্ন। তারপরেই তার পেটটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠলো। খিদে —নিষ্ঠুর, সর্বগ্রাসী, অসহ্য খিদে। আর মুহূর্তের মধ্যে তার বুভুক্ষু অস্তিত্ব যেন তার চারপাশের অবস্থাটাই ভুলে গেলো—ভুলে গেলো সে কোথায় আছে, ভুলে গেলো হ্যারি কিলারের প্রাণ তারই দয়ার ওপর আছে এখন, ভুলে গেলো কারখানার লোকজনের দশা, শুধু খাবার ছাড়া আর-কিছুর কথাই তার মনে রইলো না। খাবার চাই, এক্ষুনি কিছু না-খেতে পেলে সে ম'রেই যাবে!

সন্তর্পণে গিয়ে সে খুললো দরজাটা, যে-দরজা দিয়ে একটু আগেই আটজন কৌশুলি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। আর পাশের একটা ঘরে সে দেখতে পেলে একটা ভোজের অবশিষ্ট, অজস্র খাবার। এরা নিশ্চয়ই পানভোজনে মত্ত ছিলো, পরে মসনদঘরে গিয়ে শুধু মদই গিলেছে!

জেন টেবিলটার দিকে ছুটে গিয়ে হাতের কাছে যা পেলে, তা-ই তুলে নিলে। আর যত সে গোগ্রাসে খেতে লাগলো, ততই যেন প্রাণ ফিরে আসতে লাগলো তার অবসন্ন দেহে, শিরায়-শিরায় ফেনিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো যেন আবার, আর দৈহিক শক্তির সঙ্গে-সঙ্গে আবার তার নৈতিক বল ফিরে এলো।

সতেজ, সে ফিরে গেলো পাশের ঘরে। হ্যারি কিলার তখনও তার আরামকেদারায় চিৎপাত শুয়ে ভোঁস-ভোঁস ক'রে ঘুম লাগাচ্ছে। সে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে তার মুখোমুখি ব'সে অপেক্ষা করতে লাগলো কখন তার ঘুম ভাঙে।

আর এভাবে ব'সে থাকতে-থাকতে স্মৃতিরা ভিড় ক'রে এলো তার মাথায়। তার মনে প'ড়ে গেলো হ্যারি কিলার কীভাবে তাকে বসিয়ে রেখে ঐ বন্ধ দরজাটা খুলে আধঘণ্টার জন্যে অন্তর্হিত হ'য়ে যেতো, আর তখন কতবার কৌতূহল তাকে জ্বালিয়ে মেরেছে, দরজার ওপাশে কী আছে তা জানবার জন্যে। এই দরজার চাবি সবসময় তার সঙ্গে-সঙ্গে থাকে, আর এখন দৈব আবার জেনকে সুযোগ দিয়েছে, তার কৌতূহল চরিতার্থ করবার সুবর্ণসুযোগ! প্রলোভনটা বিপুল। এই সুযোগটা তাকে নিতেই হবে, হয়তো তার জীবনে আর-কখনও এমন সুযোগ আসবে না!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাড়াহুড়ো ক'রেই, ক্ষিপ্রপায়ে, জেন দরজাটার কাছে গিয়ে পৌঁছুলো, যে-দরজা দিয়ে প্রতিদিন হ্যারি কিলার অন্তর্হিত হ'য়ে যেতো, আর চাবিটা ঢোকালো তালার ফোকরে। নিঃশব্দে খুলে গেলো কবাট। আর তার ওপাশেই একটা ল্যাণ্ডিং, সেখান থেকে সিঁড়ির ধাপ নেমে গিয়েছে নিচের তলায়। আস্তে, সন্তর্পণে, পাল্লাটা বন্ধ না-ক'রেই, শুধু খুলে রেখে, জেন পা টিপে-টিপে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলো, নিচে থেকে ঝাপসা আলো এসে পড়েছে সিঁড়িতে।

যে-ঘরটা ছেড়ে সে চ'লে এসেছে সেটা রাজভবনের দোতলায়, অথচ দুটো তলা পেরিয়ে যাবার পরও, সে এসে পৌঁছুলো আরেকটা ল্যাণ্ডিঙে, সেখান থেকে সিঁড়ির ধাপ নিশ্চয়ই মাটির তলার কোনো ঘরে নেমে গিয়েছে। একমুহূর্ত ইতস্তত ক'রে, সে আরো নেমে যাবার জন্যে পা বাড়ালে।

শেষটায় সে এসে পৌঁছুলো একটা লম্বা, আয়ত, কুঠুরিতে, আর চৌকাঠের কাছে এসেই থমকে দাঁড়ালে। একটা সিঁড়ির ধাপে ব'সে একজন ব্ল্যাকগার্ড কুঠুরিটা পাহারা দিচ্ছে। জেনকে আসতে দেখেই সে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালে।

কিন্তু পরক্ষণেই আশ্বস্ত বোধ করলে সে। পাহারার কোনো বিরূপ মৎলব নেই। বরং সে এমনভাবে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে, তার এই রাতের অতিথি যাতে সহজে পাশ দিয়ে যেতে পারে। এই অপ্রত্যাশিত সম্মান দেখে জেন তাকিয়ে দেখলে এই ব্ল্যাকগার্ডটিকে সে আগে তাদের ঘরে পাহারা দিতে দেখেছে। যে-*হর্ষচরিতেরা* সসম্মানে তাকে রাজভবনের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছিলো তাদের মতোই এও জেনকে আগে স্বাধীনভাবে ইচ্ছেমতো সবখানে চলাফেরা করতে দেখেছে—সে হয়তো জানে যে তার প্রভু একে বিয়ে করতে চেয়েছেন। আর দোনোমনা না-ক'রে সে তাকে পাশ কাটিয়ে চ'লে গেলো। কিন্তু ঝামেলা তখনও মেটেনি। লোকটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার পরেই আছে একটা বন্ধদুয়ার।

বাইরে একটা বেজায় আত্মবিশ্বাসের ভাব দেখিয়ে জেন হ্যারি কিলারের চাবিটা তালায় ঢোকালে, অমনি আগের দরজাটার মতোই এটাও নিঃশব্দে খুলে গেলো। জেন নিজেকে দেখতে পেলে বেশ-লম্বা একটা করিডরের মধ্যে : দু-পাশে ডাইনে-বাঁয়ে দশ-বারোটা দরজা, পর-পর।

একটা ছাড়া সবগুলো দরজাই খোলা। যেতে-যেতে খোলা দরজাগুলো দিয়ে তাকালে জেন। ছোট্ট-সব কুঠুরি, হাজতঘর, অন্ধকার, আলো-হাওয়া ঢোকে না—স্যাঁৎসেঁতে, ঘরগুলোয় শুধু একটা ক'রে টেবিল আর নামকাওয়াস্তে একটা ক'রে বিছানা। তা বাদ দিলে ঘরগুলো ফাঁকাই প'ড়ে আছে—দেখে মনে হয় না অনেকদিন এখানে কেউ ছিলো।

এবার শুধু বন্ধ দরজাটাই বাকি। পর-পর তৃতীয়বার জেনের এই সবখোল চাবি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেলকি দেখালে। অন্য-দুটো দরজার মতো, এটাও সহজেই খুলে গেলো।

ঘরের মধ্যেটায় গা-ছমছম-করা অন্ধকার। গোড়ায় সে তাকিয়েও বুঝতে পারলে না এ ঘরের মধ্যে কী আছে। তারপর আস্তে-আস্তে সেই আবছায়া তার চোখে স'য়ে এলো, অন্ধকারের মধ্যেই সে দেখতে পেলে কে যেন কুণ্ডলি পাকিয়ে আছে, বড়ো-বড়ো নিশ্বাসের শব্দ আসছে ঐ কুণ্ডলি থেকে।

যেন কোন অতিপ্রাকৃত শক্তিই তাকে ব'লে দিয়েছে, এখন সে দারুণ গুরুতর-কিছু আবিষ্কার করবে। জেনের বুক ঢিপঢিপ করছে, পা-দুটো কেমন যেন অবশ হ'য়ে আসছে, তার গায়ে যেন কোনো শক্তিই আর নেই; সে শুধু চুপচাপ কোনো ঘোরের মধ্যে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে রইলো—তার চোখ আর কান যেন এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারকে অবিরাম হাৎড়ে যাচ্ছে।

শেষটায় তার মনে প'ড়ে গেলো দরজার বাইরেই সে একটা বিজলিবাতির বোতাম দেখেছে। অন্ধকার থেকে চোখ না-সরিয়েই হাত বাড়িয়ে সে বোতামটা টিপে দিলে।

কী তুলকালাম বিস্ময় অপেক্ষা করছে তার জন্যে? না কি কোনো অকথ্য বিভীষিকাই?

যে-প্রচণ্ড মনোবল তাকে কারখানা থেকে একটু-আগে এই রাজভবনে এনে হাজির করেছে, তাতে হয়তো এমনি আঁৎকে আঁৎকে উঠতোও না যদি এখন এই ঘরে দেখতে পেতো তার দাদা জর্জ ব্লেজনকে, সবাই যাকে জানে দশ বছর আগেই মারা গেছে ব'লে।

কেননা যে-অপ্রত্যাশিত দৃশ্য সে এখন দেখতে পেলে, তার কথা সে স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবেনি।

হঠাৎ-আলোর-ঝলকানিতে কুঠুরির এককোণে যে-লোকটা কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে ছিলো সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো। গায়ে ছেঁড়া-কাঁথাই যেন তার, আর ছেঁড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, দেহটা কঙ্কালসার, চোখদুটো কোটরে, লোকটা দু-চোখে সাতরাজ্যের আতঙ্ক নিয়ে কোনোরকমে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো।

দীর্ঘ নিপীড়নের সব চিহ্ন সত্ত্বেও, তার শুকিয়ে-যাওয়া মুখে ঝোপের মতো দাড়িগোঁফ সত্ত্বেও, মাথার জটপাকানো চুলের রুক্ষ গুচ্ছ সত্ত্বেও—জেন-এর একমুহূর্তও দেরি হয়নি বন্দীকে চিনতে!

*অবিশ্বাস্য! আশ্চর্য!* ব্ল্যাকল্যাণ্ডের এই মাটির তলার হাজতঘরে বন্দীকে চিনতে পেরে জেনের মাথায় যেন সব তালগোল পাকিয়ে গেলো! একে তো ছ-মাস আগে সে ইংলণ্ডে দিব্বি নিশ্চিন্তে কাল কাটাতে দেখে এসেছে। মানুষের এই ধ্বংসাবশেষ, হ্যারি কিলারের নির্যাতনের এই শিকার—এ-যে লুইস রবার্ট ব্লেজন, তার আরেক দাদা!

খাবি খেলো যেন জেন। তার মুখ থেকে একটাও কথা সরছে না। শেষটায় ছুটে গেলো সে তার ছোড়দার কাছে, 'লুইস!' আর ততক্ষণে লুইস— বিমূঢ়, হতভম্ব,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্যাবাচাকা —তার মুখেও বিস্ময়ের স্বর ফুটেছে : 'জেন !... তুই!... তুই *এখানে* !'

পরস্পরের বুকে যেন ঝাঁপিয়েই পড়লো তারা, আর দুজনেই ভেঙে পড়লো কান্নায়, প্রথমে কিছুক্ষণ কারু মুখেই কোনো কথা ফুটলো না।

তারপর অস্ফুট স্বরে লুইস শেষটায় বললে : 'জেন ! তুই ! তুই কেমন ক'রে আমায় উদ্ধার করতে এলি !'

'তোকে পরে বলবো সব,' জেন বললে, 'গোড়ায় তুই তোর কথাই বল। বল, তুই কী ক'রে এখানে এলি !'

'কী বলবো বল ?' হতাশায়, ধরাগলায়, বললে লুইস। 'আমি নিজেই কি ছাই তার কিছু বুঝতে পেরেছি ! পাঁচমাস আগে, ৩০শে নভেম্বর, আমার নিজের আপিশে, পেছন থেকে কেউ আমার ঘাড়ে এমন সজোরে ঘা মেরেছিলো যে আমি জ্ঞান হারিয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ি। জ্ঞান ফিরতে দেখি আষ্টেপৃষ্ঠে সারা গা বাঁধা, মুখে কাপড় গুঁজে দেয়া, একটা সিন্দুকে প'ড়ে আছি। কতভাবেই যে আমায় নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে ওরা—ঠিক একটা পার্সেলের মতো, মালের বোঁচকার মতো। এ কোথায় আছি আমি ? জানি না। চারমাসেরও বেশি হবে, এ-ঘর ছেড়ে মুহূর্তের জন্যেও আমি কোথাও বেরুইনি, আর প্রত্যেকদিন এরা আমায় অকথ্য যন্ত্রণা দিয়েছে—সাঁড়াশি দিয়ে গায়ের চামড়া ছিঁড়েছে, প্রচণ্ড-জোরে চাবকেছে...'

'ওঃ !... লুইস !... লুইস !' জেন তখনও ফোঁপাচ্ছে। 'কিন্তু কে তোকে অমনভাবে মারে ?'

'সেটাই সবচেয়ে *অধম* !' লুইসের গলাটা কেমন ভেঙে গেলো। 'এ-সব নৃশংস কাজ যে কে করে, তা তুই স্বপ্নেও ভাবতে পারবি না। সে হ'লো...'

হঠাৎ লুইস থেমে গেলো, কথা শেষ না-ক'রেই। তার বাড়ানো হাতটা দেখালো, করিডরে কার যেন ছায়া, আর তার চোখমুখে ফুটে উঠলো অবর্ণনীয় আতঙ্কের ছাপ।

জেন পেছন ফিরে তাকিয়েই ভয়ে কেঁপে উঠলো, মুখচোখ বিবর্ণ হ'য়ে উঠেছে তার, নিজের অজান্তেই তার হাত চ'লে গিয়েছে তার জামার ভেতর, চেপে ধরেছে সেই তীক্ষ্ণধার খঞ্জর, যেটা সে কুড়িয়ে পেয়েছিলো কুবোর গোরস্থানে। তার চোখ রক্তরাঙা, তার মুখের কষ বেয়ে ফেনা গড়াচ্ছে, সারা মুখচোখই যেন কোনো বন্যজন্তুর হিংস্র উল্লাসে বিকৃত, কিম্ভূত, ভয়াল, ভয়ংকর, করাল—দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে আছে আর কে ?—হ্যারি কিলার !



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারো

# হ্যারি কিলার

'হ্যারি কিলার!' আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো জেন।

'হ্যারি কিলার?' কী-রকম অদ্ভুত সন্দেহের সুরে বললে লুইস রবার্ট, তার ছোটোবোনটির দিকে সে ভারি-অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছিলো।

'সশরীরে,' গাঁক-গাঁক ক'রে বললে হ্যারি কিলার।

এক-পা এগিয়ে এলো সে সামনে। খোলা দরজাটার চৌকাঠের সামনে এসে সে থমকে দাঁড়ালে, তার ব্যায়ামপুষ্ট শরীরটা পুরো দরজাটাকেই ঢেকে দিয়েছে। রাত্তিরের বেশামাল হুল্লোড়ে এখনও সে টালমাটাল একটু, কবাটের গায়ে সে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

'তো এটাই খুকিকে এখানে টেনে এনেছে?' জড়ানোস্বরে ক্রুদ্ধভাবে সে বললে। 'বেশ, বেশ, মাদমোয়াজেল তবে ভাবী স্বামীর অগোচরেই অন্য লোকের সঙ্গে ভাব পাতিয়েছেন!'

'ভাবী স্বামী!' রবার্ট লুইস আগের চাইতেও অনেক-বেশি হতভম্ব।

'কী ভেবেছিলে? অত-সহজে আমার চোখে ধোঁকা দেয়া যায়?' হ্যারি কিলার ঘরের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে তার বিশাল রোমশ হাতটা জেনের দিকে বাড়িয়ে দিলে।

কিন্তু এতক্ষণে জেন তার পোশাকের মধ্য থেকে খঞ্জরটা বের ক'রে এনেছে। সেটা তুলে ধ'রে সে বললে, 'ব্বাস! দূরে থাকো!'

'বেশ!... বেশ!...' হ্যারি কিলার ব্যঙ্গে ফেটে পড়লো। 'ভ্রমরীর তবে হুলও আছে!'

কিন্তু মুখে যতই টিটকিরি দিক, তার মাথায় তখনও এতটা বুদ্ধি ছিলো যে সে আর না-এগিয়ে থমকে দাঁড়ালে। নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো সে ঘরের মধ্যে, অপলক চোখে সে খঞ্জরটার দিকে তাকিয়ে আছে।

তার দ্বিধার সুযোগ নিয়ে, জেন তার দাদাকে সঙ্গে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেছে ততক্ষণে, আর যে-শত্রুকে সে এত ভয় পায় তার পিছোবার পথ আটকে দিয়েছে। কাঁপাগলায় সে বললে, 'হ্যাঁ, আমার কাছে এক অস্ত্র আছে! আর এ কী যা-তা অস্ত্র, একে আমি একটা কবরে পেয়েছি... কুবোয়!'

'কুবোয়?' লুইস রবার্ট আরো-হতভম্ব। 'ওখানেই তো জর্জ...'

'হ্যাঁ,' জেন এবার দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'ঐ কুবোতেই জর্জ খুন হয়েছিলো —না, কারু গুলিতে নয়, এই অস্ত্রটায়—আর এর গায়ে নাম লেখা আছে একটা—খুনীর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম, কিলার !'

কুবোর সেই শোচনীয় ঘটনাটার কথা বলবামাত্র হ্যারি কিলার এক-পা পেছিয়ে গেছে। বিবর্ণ, ভূতে-পাওয়া, সেই হাজতঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বিস্ফারিত চোখে জেনের দিকে তাকিয়ে আছে, তার চোখে আতঙ্ক।

'কিলার, বললি তুই, না ?' লুইস রবার্ট ব'লে উঠলো। 'কিন্তু তুই ভুল করেছিস জেন। এ-লোকটার নাম কিলার নয়। তার আরো-একটা নাম আছে, কিলার নামটার চেয়েও অধম-একটা নাম, আর সে-নামটা তোর অচেনাও নয় !'

'আরেকটা নাম ?'

'হ্যাঁ... যখন সে আমাদের কাছ থেকে চ'লে যায় তখন তুই এইটুকুনি ছিলি, ছোটো, তাই তাকে তুই চিনতে পারিসনি। কিন্তু অনেকবারই আমাদের মুখে তুই তার নাম শুনেছিস। তোর মা যখন তোর বাবাকে বিয়ে করেছিলেন, তখন তাঁর এক ছেলে ছিলো। সেই ছেলেকেই এখন তুই চোখের সামনে দেখছিস—তোর সৎভাই—উইলিয়াম ফেরনে !'

এই উদ্‌ঘাটন দুজনের ওপর ঠিক দু-রকম প্রভাব ফেললো।

জেন, প্রায় অর্ধমূর্ছিত, তার অবশ হাত প'ড়ে যেতে দিলে, যেন শক্তিহীন। আর উইলিয়াম ফেরনে—এবার তার আসল নামেই তাকে ডাকা উচিত—বুঝি আবার তার তেরিয়া-আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলে। আর সেইসঙ্গে তার নেশাও তখন ছুটে গিয়েছে। সোজা হ'য়ে দাঁড়ালে সে, সটান, আর জেন আর লুইস রবার্টের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ালে—আর তার চোখে ক্রূর, নিষ্ঠুর, একটা ঘৃণার ভাব ফুটে উঠলো।

'ও-হো, তাহ'লে তুমিই সেই জেন ব্লেজন,' কী-রকম এক ভয়ালসুরে সে বললে। তারপর দাঁতকড়মড় ক'রে আবার বললে, 'তুমিই তবে সেই জেন ব্লেজন !'

তারপর হঠাৎ, আচমকা, তার মধ্যে যত অশুভ তাড়না লুকিয়েছিলো, সব যেন একসঙ্গে জেগে উঠলো। সে বললো, এত-দ্রুত বললো কথাগুলোকে যেন সেগুলোকে ঠিকমতো সাজাবারও তার আর তর সইছে না, ছোটো-ছোটো কাটা-কাটা উদ্দাম সব কথা, বুকটা হাঁপরের মতো উঠছে আর নামছে, গলার স্বর ভারি, জড়ানো, চোখদুটো জ্বলন্ত :

'বেশ, ভালোই হ'লো !... হ্যাঁ, হ্যাঁ, দারুণ আহ্লাদ হচ্ছে আমার !... তাহ'লে তুমি শেষ-অব্দি কুবো গিয়েছিলে !... হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানি, আমিই ওকে খুন করেছিলাম... তোমার দাদা জর্জ... সেই চমৎকার যুবক জর্জ... যার জন্যে গোটা ব্লেজনবংশই যেন ধন্য হ'য়ে গিয়েছিলো—এত-ভালো—আর এত তার জন্যে গর্ব !... আমি এমনকী দু-দু-বার তাকে খুন করেছি... প্রথমে খুন করেছি তার আত্মাটাকে... তারপর তার শরীরটা !... আর এখন আমি তোমাদের দুজনকে আমার কবলে পেয়েছি... দুজনকে একসঙ্গে... আমার খপ্পরে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়েছি, আমার পায়ের তলায় !... তোমরা আমারই সম্পত্তি... তোমাদের নিয়ে যা-খুশি তা-ই করতে পারি আমি !...' তার গলা থেকে এমনভাবে ছটফট ক'রে হুড়মুড় ক'রে কথাগুলো বেরুচ্ছে যে ভালো ক'রে বোঝাই দায় ! গলা জড়ানো, উল্লাসে নেশাতুর, বিজয়গর্বে দাম্ভিক, বেপরোয়া। 'যখন কি না ভেবেছি একটাকেই শুধু বাগে পেয়েছি... তখন অন্যজন কি না স্বেচ্ছায় এসে আমার কাছে ধরা দিয়েছে !... এ-তো দারুণ মজা, হো-হো মজা, বীভৎস মজা !...'

এক-পা এগিয়ে এলো সে সামনে। জেন আর লুইস রবার্ট তখন পরস্পরকে আঁকড়ে ধ'রে আছে, নিশ্চল, কেউই নড়ছে না, যেন পাষাণে তৈরি দুই মূর্তি। তাদের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে সে কিন্তু ব'লেই চললো : 'ভেবেছো, তোমরা অনেক জানো? ঢের জানো! সব জেনে ব'সে আছো যেন ! কিন্তু তোমরা কিছুই জানো না... আমি... আমিই তোমাদের এখন সব কথা খুলে বলবো !... আর বলতে কী যে আনন্দ হবে... উল্লাস ! হ্যাঁ-হ্যাঁ, সে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো—ঐ লোকটা... যে তোমাদের বাবা! এখন... এখন তার সব আনন্দ সে রাখবে কোথায় ?... শুধু একটা কথা ভেবেই আমার আনন্দটা একটু কম হচ্ছে... আমি চাই সে জানুক সব... চিরতরে ম'রে যাবার আগে জেনে যাক... জেনে যাক কার হাত একটার পর একটা অমন অমোঘ আঘাত হেনেছে... এই সেই হাত... দ্যাখো তাকিয়ে... এই আমার হাত...'

সে আরো-এক পা এগিয়ে এলো। যেন ভাইবোনকে সে ছুঁতে পারে এখন ইচ্ছে করলে, আর তারা কুঁকড়ে গিয়েছে এখন, উন্মাদের এই প্রলাপের কাছে যারা এখন আতঙ্কে যেন একটা ঘোরের মধ্যে, একটা বিভ্রমের মধ্যে, হুমড়ি খেয়ে প'ড়েছে।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তারা আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিলো। কুকুর-বেড়ালের মতো দূর-দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলো !... কী আমি করতে পারতাম, আমাকে তো শুধু ভিখিরির মতো দু-চারটে পয়সাই ছুঁড়ে দিয়েছিলো... আমি চেয়েছিলাম সোনা, অনেক সোনা, সোনার পাহাড় !... আর আজ আমি সেই সোনা পেয়েছি... সোনা... স্তূপাকার... পাহাড়প্রমাণ... তোমাদের কোনো করুণা বা সাহায্য ছাড়াই !... সব নিজের চেষ্টায় !... আর সেটা পাবার জন্যে কী-ই-ব-না-করেছি আমি !... তোমাদের মতো ম্যাদামারারা যাকে বলে দুষ্কিয়া, অপকর্ম, অপরাধ... হা ! এমন-কোনো অপরাধ নেই যা আমি করিনি !... লুঠপাট করেছি... খুন করেছি... চুরি, জোচ্চুরি, রাহাজানি, খুনজখম... কিচ্ছু বাদ দিইনি ! সব দুষ্কিয়া... সব অপরাধ... সব অপকর্ম ! হাঃ !

'কিন্তু সোনা, শেষকালে আর যথেষ্ট মনে হ'লো না একদিন... আমাকে সারাজীবন যা তাড়িয়ে ফিরেছে, হন্যে ক'রে ফিরেছে, সে তোমাদের প্রতি ঘৃণা !... তোমাদের সবাইকার প্রতি ঘৃণা—গ্লেনরের ঐ দুর্গটার জন্যে ঘৃণা... ঘৃণার স্তূপাকার বারুদ !... আর সেইজন্যেই আমি এসেছি আফ্রিকায়... ফেউয়ের মতো ঘুরেছি জর্জ ব্লেজনের বাহিনীর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেছন-পেছন... আমাকে তার কাছে নিয়ে গেছে ধ'রে, তার চরেরা... আর চমৎকার একটা প্রহসনে অভিনয় করেছি... খেদ... মনস্তাপ... দুঃখ... অনুতাপ... প্রায়শ্চিত্ত... কত-কী ছিলো সেই প্রহসনে... আমি ছিলাম মিথ্যাবাদী, ঠগ, জোচ্চোর, ভণ্ড, প্রবঞ্চক, প্রতারক... কী নই! এটা তো যুদ্ধ ছিলো একটা, না কী? আর যুদ্ধে ও প্রেমে সব চলে!... আর সেই গাড়ল, সেই আকাট-বোকা একেবারে গ'লে গেলো... বিগলিত... দরদ উথলে উঠলো তার... দুই হাত বাড়িয়ে সে আমায় আমন্ত্রণ করলো... একই তাঁবুতে আমরা থেকেছি... একই খাবারটেবিলের শরিক হয়েছি দুজনে... হা! তার ঐ হাবামির পুরো সুযোগটাই নিয়েছি আমি... রোজ তার খাবারে আরো-একটু ক'রে গুঁড়ো... কীসের গুঁড়ো?... কী এসে-যায় তাতে? আফিম... গাঁজা... কিংবা আরো কী-সব... ঐ সবই তো আমার কাজ ছিলো তখন... যাও, গিয়ে জর্জ ব্রেজনকে খুঁজে বার করো... বাচ্চা ছেলে একটা, যেন অসহায় শিশু... ন্যাকা চৈতন...

'নেতা কে?... আমি... আর তারপর, সে-কী জয়... হ্যাঁ, জয়, জয় চেয়েছিলাম... আর আমি জয়ী হলাম... কাগজগুলো ফুর্তিতে ফেটে পড়লো... ঢি-ঢি প'ড়ে গেলো... ছী-ছিক্কার... জর্জ ব্রেজন পাগল হ'য়ে গেছে... জর্জ ব্রেজন লুঠতরাজ চালাচ্ছে... জর্জ ব্রেজন নরাধম... জর্জ ব্রেজন দেশদ্রোহী!... শুধু এই কথা কথা... জর্জ ব্রেজন এই... জর্জ ব্রেজন সেই... কে তখন হেসেছিলো, পরে যখন কাগজগুলো পড়েছিলো হাতে... হ্যাঁ, আমি, আমিই এই আফ্রিকার বুকে দাঁড়িয়ে হা-হা ক'রে হেসে উঠেছিলাম... কিন্তু চলুক খেলা, যতদিন-না সব খতম হয়... একদিন ফৌজ এলো তাড়া ক'রে!... জর্জ ব্রেজন মরলো, সে-তো চমৎকার... ধিক্কৃত, সে-তো আরো-ভালো—আর তাই তার মুখটা চিরতরে বন্ধ ক'রে দেবার জন্যে আমিই তাকে খুন করলাম।...

'আর তারপর এলাম এখানে। এখানে মরুভূমির বুকে নগর বসালাম আমি... খুব কি খারাপ তেমন, যাকে একদিন লাথি মেরে বার ক'রে দেয়া হয়েছিলো, সে-ই কি না নগর বসালে... এখানে, আমিই প্রভু, আমি রাজা, আমি সর্বেসর্বা... আমি হুকুম দিই, তটস্থ হ'য়ে অন্যরা তা তামিল করে!... কিন্তু তবু... তবু শান্তি কোথায়... আমার অতৃপ্তি মেটেনি... তোমাদের বাবার তখনও তো আছে এক ছেলে এক মেয়ে... সে কী ক'রে সইবো? প্রথমে ছেলেটাকে... একদিন আমার টাকার দরকার... আমি তার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছি... আর ফাউ পেয়েছি তাকেও... হা-হা, এক ঘা মারতেই অজ্ঞান... ফুলের ঘায়ে মুচ্ছো যান... মুরগির ছানার মতো, সেই ছেলে... সিন্দুকে বন্ধ কে? সেই ছেলে... তারপর চলো, চলো রেলগাড়িতে, জাহাজে, হেলিবিমানে... চলো... আর তারপর এই এখানে... আমার কুক্ষিগত... আমার রাজ্যে!... আর তাকেও আমি খুন করবো, অন্যটারই মতো... তবে অত-তাড়াতাড়ি নয়,... ধীরে-ধীরে... আস্তে-আস্তে... দিনের পর দিনে!... আর এদিকে, ইংলণ্ডে, ওখানে... ঐ বাবা... আহারে, কী গৌরবের শিরোমনি... আর কত ধনী...



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাপ জানে ছেলে ভেগেছে, সঙ্গে নিয়ে গেছে ব্যাঙ্কের সব টাকা... চমৎকার ভেবেছি সব, গল্পের মতো, কী এসে-যায় যদি ঈশ্বর আমায় জাহান্নামে পাঠায়!

'কিন্তু মেয়েটা... মেয়েটা তো আছে এখনও... আমার বোন... হা হা হা, আমারই বোন! তবে, এবার তার পালা... কী করবো আমি এই মেয়েটাকে নিয়ে?... অনেক ভেবছি আমি... অবিশ্রাম মাথা খুঁড়েছি... কিন্তু, আবার কী চমৎকার প্রহসন... সে নিজেই কি না এসে হাজির এখানে!... এই আমার সুযোগ!... আগে ভেবেছিলাম তাকে ঐ আমার বৌ করবো!... শুধু তাকে নির্যাতন করার জন্যে... আমার বৌ!... উঁহু, মোটেই তা নয়... বৌ করবো আমার অধমতম দাসটার... সবচেয়ে-কুৎসিত দেখতে যে-দাস...

'আর তারপর? কী বাকি থাকবে তারপর?... বুড়ো লর্ড মাতব্বর... অত খেতাব, অত জাঁকজমক, অত টাকা... দুই ছেলের একটা দেশদ্রোহী... অন্যটা ব্যাঙ্কডাকাত... আর তার মেয়ে? অদৃশ্য, উধাও, কেউ জানে না কোথায়... আর সে, নিজে?... একা, নিজের সেকেলে ধ্যানধারণার মধ্যে বন্দী... গ্লেনর বংশের চমৎকার-একটা পরিণাম হবে সেটা!'

খাবি খেতে-খেতে বলা, এই অভিশাপ শেষটায় যেন একটা ক্রুদ্ধ, বন্য, জান্তব গরগর হ'য়ে গেলো!

উইলিয়াম ফেরনে থামলে, হাঁফাচ্ছে, রাগে তার বুঝি দম আটকে যাচ্ছে! কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়েছে চোখ দুটো! তার অন্ধ থাবা বাড়িয়ে সে ধরতে চাইলে তার শিকারদের, তাদের ঘৃণিত মাংস সে নিজের হাতেই ছিঁড়ে ফেলবে এখন। আর সে মানুষ নেই আর। মানুষ নয়। উন্মত্ততার কবলে-পড়া করাল কোনো খুনে, হিংস্র জন্তু, সবকিছু ছিঁড়েখুঁড়ে দিলেই যার শান্তি হয়!

হা ক'রে তার দিকে তাকিয়ে রইলো জেন, আর লুইস রবার্ট। মানুষের বুকে কখনও এত ঘৃণা আঁটে?

'আজকের রাতটার জন্যে,' একটু দম ফিরে পেয়ে আবার সে বললে, 'শুধু আজকের রাতটার জন্যে তোমাদের একসঙ্গে থাকতে দিচ্ছি, তা-ই দেখছি তোমাদের মনে ধরেছে। কিন্তু কাল...'

বিস্ফোরণটা নিশ্চয়ই প্রচণ্ড আর মারাত্মক ছিলো, নইলে মাটির এত নিচে এই পাতালে এসে তার আওয়াজটা পৌঁছুলো কী ক'রে? আর বিস্ফোরণ গিলে খেলো তার বাকি কথাগুলো! আচমকা সে থেমে পড়লো, বিস্মিত, উদ্বিগ্ন, উৎকর্ণ...

বিস্ফোরণটাকে অনুসরণ ক'রে এলো কয়েক মিনিটের স্তব্ধতা, তারপরেই ফেটে পড়লো কোলাহল... চীৎকার, সুদূর গর্জন, খ্যাপা জনতার চ্যাঁচামেচি, আর তারই মাঝে-মাঝে, বাক্যের মধ্যে যতির মতো, আসছে গুলির শব্দ... রাইফেলের আর রিভলবারের...

উইলিয়াম ফেরনে তখন আর জেন বা লুইস রবার্টের কথা ভাবছে না। কান পেতে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনে বোঝবার চেষ্টা করছে এই হুলুস্থুলুর মানে কী।

দরজার কাছে যে-ব্ল্যাকগার্ড পাহারায় ছিলো সে হঠাৎ ছুটে এলো হাজতঘরে। 'প্রভু!' তার গলায় আতঙ্ক, 'শহরে আগুন লেগেছে!'

ফেরনে ক্রুদ্ধ স্বরে কাকে যেন অভিসম্পাত দিলে। তারপর, অপরিসীম তাচ্ছিল্যভরে এক ধাক্কায় দুই ভাইবোনকে সরিয়ে দিয়ে দরজা পেরিয়ে ছুটে মিলিয়ে গেলো করিডরের অন্ধকারে।

এই বাধাটা এসেছে এমনই অতর্কিত, এমনই আচম্বিত, যে ভাইবোনের কেউই তার কোনো মানে বুঝতে পারেনি। এতই হতভম্ব হ'য়ে গেছে তারা যে এটাও তাদের মাথায় ঢোকেনি যে এই বিস্ফোরণ আর কোলাহলই তাদের জল্লাদের কাছ থেকে তাদের আপাতত মুক্তি দিয়েছে। একমুহূর্ত যেন এটাও তাদের মাথায় ঢোকেনি যে এই ছোট্ট ঘরটায় শুধু তারা দুজনেই আছে। এখনও দুজনে দুজনকে আঁটো ক'রে আঁকড়ে আছে, যে-বীভৎস দৃশ্যটা এক্ষুনি শেষ হ'লো এখনও যেন তারই ঘোরের মধ্যে আছে তারা। আর তারই মধ্যে তাদের মনে হানা দিয়েছে এক জবুথবু বৃদ্ধ, কুঁকড়ে গুটিয়ে গিয়েছেন লজ্জায়-ধিক্কারে, অথর্ব, নিঃসাড়, উদাস শূন্য দৃষ্টি চোখে—আর অমনি দুজনে আকুল হ'য়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেরো

## রক্তারক্তির রাত

যে-ভয়াবহ অভিজ্ঞতা একটা অতিকায় দুঃস্বপ্নের মতো তাদের আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলো, তার দরুন নিজেদের অসীম দুঃখবেদনা ছাড়া আর-কিছুই তাদের মনে স্থান পায়নি। জেন আর লুইস রবার্ট ব্রেজন কেমন যেন ঘোরের মধ্যে পরস্পরকে আঁকড়ে ধ'রে দাঁড়িয়েছিলো; কতক্ষণ—তা তারা জানে না। শেষকালে এই বিহ্বল আচ্ছন্নতা ধীরে-ধীরে কেটে গেলো তাদের, গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তারা ক্রমে বহিঃপৃথিবীর বোধ যেন ফিরে পেলো।

তাদের চারপাশে গুমগুম ক'রে যে-বিশৃঙ্খল আওয়াজ গড়িয়ে যাচ্ছিলো, তারই মাঝে-মাঝে হঠাৎ-হঠাৎ এসে হাজির হচ্ছিলো *অস্থির*-এক স্তব্ধতা। বিজলি-বাতির আলো এখনও জ্বলছে করিডরে, কিন্তু এই ঢাকাবারান্দায় এখন যেন গোরস্থানের শান্তি। কেমন যেন মনে হচ্ছে পুরো রাজভবনটাই যেন ম'রে গিয়েছে। বাইরে, *অথচ*, তুলকালাম শোরগোল, গুলিগোলার আওয়াজ, আর এমন-এক উদ্দাম কলরোল যার প্রচণ্ডতা যেন মিনিটে-মিনিটে বেড়ে যাচ্ছে।

এইসব দুর্বোধ্য আওয়াজ তারা একটুক্ষণ উৎকর্ণ হ'য়ে শুনলো, আর তারপরেই জেন হঠাৎ এর আসল মানেটা বুঝতে পারলে। ছোড়দার দিকে ফিরে সে বললে : 'হাঁটতে পারবি তুই?'

'চেষ্টা করতে পারি।'

'তাহ'লে আয়।'

দৃশ্যটা দেখে যে-কারু কষ্ট হ'তো। এক তরুণী, এখনও-আচ্ছন্ন, কাহিল, ধ'রে-ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে এক যুবককে, চার-পাঁচ মাসের লাঞ্ছনা ও নিপীড়নে যার তখন যেন হাঁটবারও শক্তি নেই কোনো। তারা হাজতঘর থেকে বেরিয়ে গেলো, ধীরে-ধীরে পেরিয়ে এলো করিডর, যার শেষমাথায় পাহারা আর নেই।

ধীরে-ধীরে তারা ধাপের পর ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে ওপরে উঠলো, তেতলা অব্দি। উইলিয়াম ফেরনের কাছ থেকে যে-চাবিটা হাতিয়ে নিয়েছিলো, তাই দিয়েই জেন সবচেয়ে ওপরের ল্যাণ্ডিঙের দরজাটা খুললো। তারপর, লুইস যখন কাঁপা-কাঁপা পায়ে তাকে অনুসরণ করলে, সে এসে ঢুকলো সেই ঘরে, কিছুক্ষণ-আগে—কতক্ষণ-আগে? —যে-ঘরে নেশায় আচ্ছন্ন হ'য়ে ছিলো এই পৈশাচিক উন্মাদ, যাকে সে তার সৎ-ভাই ব'লে চিনতেও পারেনি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিচের করিডরের মতোই, এ-ঘরটাও ফাঁকা, পরিত্যক্ত—তবে লোকজন ছাড়া এ-ঘরটায় আর-কিছুই বদল হয়নি। এখনও টেবিলটার ওপাশে আছে ফের্‌নের বিশাল আরামকেদারা, টেবিলে এখনও থরে-থরে সাজানো আছে বোতল আর গেলাশ, আর চাঁদের কলার মতো তাকে ঘিরে ছিলো যে-নটা চেয়ার, সেগুলো তেমনি আছে এখনও, শূন্য।

লুইস রবার্টের পা যেন আর বইতে পারছিলো না, তাকে ধ'রে-ধ'রে নিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসালে জেন : আর এই-প্রথম যেন আচম্বিতে বুঝতে পারলে তাদের অদ্ভুত দশাটা। কেউ নেই কেন কোথাও ? কেন এই গা-শিরশির-করা স্তব্ধতা ? তাদের জল্লাদের কী হ'লো?

হঠাৎ কোন-এক আবেগের তাড়ায় তার দাদাকে চেয়ারে বসিয়ে রেখেই জেন দুঃসাহসে ভর ক'রে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো, তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো চারপাশ। আর খুঁজে দেখতে শুরু করলো সব।

প্রথমে গেলো নিচের তলায়, একতলায়, কোনো কোণাখামচিও খুঁজতে বাকি রাখলো না। বাইরে বেরুবার দরজাটা বন্ধ ; তার পাশ দিয়ে যেতে-যেতে সে তাকিয়ে দেখলো চারপাশে, যদি কাউকে কোথাও দেখা যায় । কেউ নেই কোথাও ; সবগুলি দরজা হাট ক'রে খোলা, যেন হুড়মুড় ক'রে ঘর থেকে বেরুবার সময় দরজাগুলো বন্ধ ক'রে দেবারও তর সয়নি কারু। ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে তার বিস্ময় ; সে অন্য তলাগুলোও খুঁজে দেখলে, কিন্তু কোথাও কেউ নেই, সব শূন্য, পরিত্যক্ত, হা-হা করছে। যতই অবিশ্বাস্য ঠেকুক না কেন, সব দেখে মনে হচ্ছে রাজভবনে এখন যেন তারা ছাড়া আর-কেউই নেই।

সবগুলো তলা খুঁজে দেখবার পর বাকি র'য়ে গেলো শুধু সেই বিশাল মিনার, আর তার চারপাশের অলিন্দ। সিঁড়ির ধাপের কাছে এসে হঠাৎ জেন পইঠায় পা দেবার আগে থমকে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবলে খানিক, তারপর আস্তে-আস্তে ওপরে উঠলো।

না, যা ভেবেছিলো তা নয়, রাজভবন পুরোপুরি পরিত্যক্ত নয়। সিঁড়ির ওপরের পইঠায় পৌঁছুবামাত্র, বাইরে থেকে তার কানে এলো কাদের যেন গলা। খুব-সন্তর্পণে সে সবচেয়ে-ওপরের ধাপটায় পৌঁছে, অন্ধকারে গা মিশিয়ে দিয়ে, অলিন্দের দিকে তাকালে—দূরের কারখানা থেকে আলো এসে পড়েছে অলিন্দে।

রাজভবনের সকল অধিবাসীই এসে জমায়েৎ হয়েছে এই অলিন্দে। শিউরে উঠে, জেন তারই মধ্যে চিনতে পারলে আটজন কৌশুলি পরিবৃত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে উইলিয়াম ফের্‌নে। আরো-একটু ওদিকে দুটো দলে ভাগ হ'য়ে জটলা পাকাচ্ছে একদল ব্ল্যাকগার্ড আর কিছু আফ্রিকি ভৃত্য।

রেলিঙের ওপর দিয়ে ঝুঁকে, তারা দূরে কী যেন দেখাচ্ছে পরস্পরকে, আর কথার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বদলে যেন গলা ফাটিয়ে শুধু চ্যাঁচাচ্ছেই তারা, আর তারই সঙ্গে চলেছে নানারকম অঙ্গভঙ্গি। কী হ'তে পারে বাইরে, যা তাদের এমন ক'রে ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট ক'রে তুলেছে?

হঠাৎ ফেরনে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে হেঁড়েগলায় চেঁচিয়ে কী-একটা হুকুম করলে; তারপর তার আটজন স্যাঙাৎকে নিয়ে এগিয়ে এলো সিঁড়ির দিকে, যার ওপরের ধাপটায় অন্ধকারে গা মিশিয়ে দিয়ে জেন দাঁড়িয়ে আছে। সেখান থেকেই সে দেখতে পেলে প্রত্যেকেরই কোমরবন্ধে দুটো ক'রে রিভলবার গোঁজা, হাতে উদ্যত রাইফেল। আরেকটা সেকেণ্ড, আর তাহ'লেই এরা তাকে দেখে ফেলবে। এই হিংস্র পশুগুলোর হাতে পড়লে কী হবে তার? জেন প্রমাদ গুনলো।

আশপাশে তাকিয়ে, অচেতনভাবেই বোধহয় সে খুঁজলো কোনো অসম্ভব উপায় —পালিয়ে যাবার; আর আচমকা তার চোখ গিয়ে পড়লো সিঁড়ির ওপরের ধাপের কাছেই একটা দরজায়, সেটা আটকে দিলে অলিন্দের পথ বন্ধ ক'রে দেয়া যায়। দেখেই দরজা খুলে সেটা বন্ধ করতে গেলো সে—সশব্দে, কেননা দুম ক'রে একটা আওয়াজ হ'লো কবাটের—জেনের যেন একনিমেষও লাগলো না; জেন নিজেই জানে না সে নিজেই ও-কাজ করেছিলো কি না। যেন কোনো স্বজ্ঞাপ্ররোচিত তীব্র তাড়নাতেই সে মুহূর্তে কাজটা ক'রে ফেলেছে।

বাইরে থেকে খ্যাপাপশুর গর্জন এলো, ভীষণ-সব অভিসম্পাত। শেষ-খিলটা লাগাবার সঙ্গে-সঙ্গেই বাইরে থেকে রাইফেলের কুঁদোর প্রচণ্ড আঘাত পড়ছে দরজার কবাটে, এমন অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের পথ আটকে যাওয়ায় তারা যেন হিতাহিত জ্ঞানও হারিয়ে ফেলেছে।

এইসব বন্য অভিসম্পাত আর রাইফেলের কুঁদোর অবিরাম আঘাতের তুলকালাম শোরগোলের মধ্যে জেন, *আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত,* সেখানে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো—তার চলৎশক্তি যেন মন্ত্রবলে অন্তর্হিত হয়েছে। নড়তে না-পেরে, অনিমেষে তাকিয়ে রইলো দরজাটার দিকেই, আচ্ছন্নের মতো, প্রতি-মুহূর্তেই মনে হচ্ছে এই বুঝি ঐ ভয়াল শত্রুদের রাইফেলের ঘায়ে দরজাটা ভেঙে পড়লো!

কিন্তু দরজা ভাঙলো না আদৌ; এত-ক্ষিপ্ত আঘাত পড়ছে, অথচ তবু কবাটের গায়ে যেন সামান্যতমও প্রভাব পড়ছে না, একটা আঁচড় পর্যন্ত না। আর তা-ই দেখতে-দেখতে জেনের ঘোর কেটে গেলো, নিজের ওপর ফিরে এলো নিয়ন্ত্রণ, সে বুঝতে পারলে কারখানা ও রাজভবনের অন্যান্য দরজার মতোই এটাও বর্মপরানো—সমস্ত অক্রমণ ঠেকাবার কথা ভেবেই তৈরি। এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে ফেরনে শুধু-মাত্র এই ক-জন সাগরেদের সাহায্যে কোনোকালে এ-দরজাটা ভাঙতে পারবে!

আশ্বস্ত হ'য়ে সে ফিরে গেলো তার দাদার কাছে, আর যেতে-যেতে লক্ষ করলো, অলিন্দ থেকে একতলা পর্যন্ত রাজভবনে এ-রকম পাঁচ-পাঁচটা বর্মপরানো দরজা আছে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—একটা ভাঙলেও অন্যটায় এসে তাদের আটকে পড়তে হবে। ফেরনে কোনো আচম্বিত আক্রমণের মোকাবিলা করবার জন্যে রাজভবনকে একটা লোহার তৈরি দুর্গের মতোই সুরক্ষিত ক'রে রেখেছে। এইসব দরজা দিয়ে গোটা রাজভবনটাই কতগুলো ভিন্ন-ভিন্ন মহলে তৈরি—রাজভবন দখল ক'রে নিতে গেলে কাউকে একের পর এক এই দরজাগুলো ভেঙে ভেতরে ঢুকতে হবে। এখন—নিয়তির নির্মম পরিহাসে—তার এতসব হুঁশিয়ারি যেন তারই ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে তার বিরুদ্ধে উঠে-প'ড়ে লেগেছে!

জেন পর-পর পাঁচটা দরজাতেই খিল তুলে দিয়ে একতলায় এসে দাঁড়ালে।

রাজভবনের জানলাগুলো বিশাল-সব গরাদ-দেয়া জানলা দিয়ে সুরক্ষিত—আর ধাতুর পর্দার খড়খড়ি নামিয়ে দিলে সেগুলো প্রায় নিরেট দেয়ালই হ'য়ে যায়। একমুহূর্তও অপেক্ষা না-ক'রে সে এক-এক ক'রে সবগুলো জানলার ওপর ঐ ইস্পাতের পর্দা নামিয়ে দিলে।

এ-সব বিশাল পর্দাগুলো নামাবার মতো এত-শক্তি হঠাৎ সে পেলে কোত্থেকে? জ্বরের ঘোরে আছে যেন, কী করছে না-করছে তাতে তার চেতন মনের যেন কোনো ভূমিকাই নেই; আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি ও স্বজ্ঞা তাড়িত, সে যেন স্বপ্নচালিতের মতোই আচ্ছন্ন হাতে সবকিছু ক'রে যাচ্ছে, কিন্তু সুকৌশলে ও দক্ষহাতে, এবং ক্ষিপ্রবেগে। এখন সে অভেদ্য-এক দুর্গের মাঝখানে—ইস্পাতেরই এক কেল্লার মাঝখানে।

আর ঠিক-তখনই অবসাদে তার সারা শরীর যেন এলিয়ে পড়তে চাইলো। এতক্ষণে সে টের পেলে দেহে ও মনে কতটা বিপর্যস্ত, কতটা অবসন্ন সে। তার পা দুটো যেন আর কিছুতেই তার ভার সইতে পারছে না। ক্লান্ত, হাতদুটো রক্তাপ্লুত, তার যেন তার দাদার কাছে ফিরে যাবারও শক্তিটুকু আর নেই!

'কী হ'লো আবার তোর?' তাকে এমন অবস্থায় দেখে লুইস রবার্ট খুবই উৎকণ্ঠিত হ'য়ে জিগেস করলে।

একটু পরে দম ফিরে পেয়ে জেন সব খুলে বললে—সে কী করছিলো এতক্ষণ। প্রায় বিজয়িনীর ভঙ্গিতে সে বললে: 'এখন আমরাই এই রাজভবনের প্রভু।'

'ঐ সিঁড়ি ছাড়া আর কি কোনো রাস্তা নেই ওদের?' এ-রকম একটা দুর্জয় অবস্থায় যে পড়তে পারে, লুইস রবার্টের তা যেন বিশ্বাসই হ'তে চাচ্ছিলো না।

'উঁহু, আর-কোনো রাস্তাই নেই,' জেন ঘোষণা করলে। 'এটা আমি নিশ্চিত জানি, উইলিয়াম এখন অলিন্দে আটকা প'ড়ে গেছে, নিজের খাঁচায় নিজেই বন্দী। দেখি, ও কেমন ক'রে এখান থেকে পালায়!'

'কিন্তু ওরা সবাই তড়িঘড়ি অলিন্দে উঠে গিয়েছিলো কেন?' লুইস জানতে চাইলো। 'কী এমন হ'তে পারে যে ওদের কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান এমন ক'রে হারিয়ে গেলো?'

কিন্তু এটা এমন-এক প্রশ্ন, যার উত্তর জেন নিজেও জানে না। কারখানাকে রক্ষা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবার জন্যে কী-কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, সে তা চাক্ষুষ দ্যাখেনি। সেটা হয়তো বাইরে তাকিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে। তারা দুজনে মিলে ওপরতলায় উঠে এলো, তাদের মাথার ওপর এখন শুধু মিনার আর তার অলিন্দ। তারপরে এইমাত্র-বন্ধ-করা খড়খড়ি খুলে তারা দুজনে বাইরে তাকালে।

আর তাকিয়েই বুঝতে পারলে, উইলিয়াম ফেরনে আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা কেন এমন ক'রে মাথায় হাত দিয়ে বসেছে! যদিও তাদের পায়ের নিচে এস্‌প্ল্যানেড প'ড়ে আছে অন্ধকার আর নিশ্চুপ, রাঙানদীর ডানতীরে কিন্তু উজ্জ্বল আলোর মধ্যে তুলকালাম কাণ্ড চলেছে। আফ্রিকিদের বস্তিতে সবগুলো কুঁড়েঘর দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে। শহরের ঠিক মাঝখানটা, নিগ্রোদের বস্তি—সব যেন এক বিকট নরককুণ্ড! আগুন জ্বলছে বেসরকারি নাগরিকদের বাড়িঘরেও, আর ভাঁটির দিকে *মেরিফেলো* অর্থাৎ *হর্ষচরিতদের* আস্তানাতেও আগুন ধরতে শুরু করেছে।

*হর্ষচরিতদের* আবাসের যে-দিকটায় এখনও আগুন ধরেনি সেখান থেকে তুমুল-একটা কোলাহল উঠছে : চীৎকার, গালাগাল, অভিশাপ, ক্ষমা চেয়ে অনুনয়, তুলকালাম হট্টগোল—আর তারই মাঝখানে অবিশ্রাম গ'র্জে উঠছে আগ্নেয়াস্ত্র।

'এ নিশ্চয়ই তোঙ্গানের কাণ্ড,' বললে জেন। 'আফ্রিকিরা সবাই বিদ্রোহ করেছে!'

'আফ্রিকিরা... তোঙ্গানে...?' লুইস শুধু বোকার মতো কথাগুলো আওড়ালে, কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না।

জেন তারপর তাকে বুঝিয়ে বললে পুরো ব্ল্যাকল্যাণ্ডের বৃত্তান্তটাই—অন্তত সে নিজে তার যতদূর জানে। সংক্ষেপে সে বিবৃত করলে কেমন ক'রে সে নিজে এই শহরে এসে পৌঁছেছিলো, আর তার আগে কোন-কোন ঘটনা ক্রমশ তাদের সফর অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিলো। সে আরো খুলে বললে কেন সে একাই সকলের অগোচরে কারখানা থেকে বেরিয়ে এসেছে—কেমন ক'রেই বা সে প্রমাণ করেছে তাদের দাদা জর্জের নির্দোষিতা —আর কবে সে এটা প্রমাণ করবার জন্যেই বারজাক মিশনের সঙ্গে আফ্রিকায় সফরে বেরিয়েছিলো।

সে আঙুল তুলে দেখালে কারখানাটাকে—এস্‌প্ল্যানেডের ওপাশে, সন্ধানী আলোয় ঝলমল ক'রে উঠছে। বললে তার সফরসঙ্গীদের কথা, আফ্রিকি অনুচর তোঙ্গানে ছাড়া যারা সবাই এখনও কারখানার ভেতরেই আশ্রয় নিয়ে আছে। আর তোঙ্গানে—সে-ই ব্ল্যাকল্যাণ্ডের সমস্ত বিক্ষুব্ধ আফ্রিকিকে চেতিয়ে তোলবার চেষ্টা করছে, আর বিদ্রোহ যে এরই মধ্যে অনেকটাই সফল হয়েছে, তা তো এখন নিজের চোখেই তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। হায়-রে, তার সবুর করার ধৈর্য ছিলো না, যে-সন্ধেয় এই বিদ্রোহের আগুন জ্বললো —আক্ষরিকভাবেই আগুন —সেই সন্ধেতেই সে কিনা কারখানার সবাইকে উদ্ধার করবার দুরাশা নিয়ে একা এসেছিলো রাজভবনে—সকলের চোখে ধুলো দিয়ে। কিন্তু



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছিলো ব'লেই তো সে আবিষ্কার করতে পেরেছে তার বেচারি ছোড়দাকে। আর সেই-ফাঁকে নিশ্চয়ই সংকেত দিয়েছে তোঙ্গানে, অস্ত্র পাঠানো হয়েছে তাদের কাছে আগেকার ব্যবস্থামতো, আর, দুর্বার, ফেটে পড়েছে বিদ্রোহ। উইলিয়াম ফেরনে আর তার স্যাঙাৎরা সবে যখন উলটে পালটা-আক্রমণ চালাবার ব্যবস্থা করেছে, ঠিক তখনই সে গিয়ে তাদের মুখের ওপর সশব্দে বন্ধ ক'রে দিয়েছে দরজা।

'আর আমরা? আমরা তবে এখন কী করবো?' জিগেস করলে লুইস।

'সবুর, অত অধীর হোসনে,' জেন উত্তর দিলে। 'আফ্রিকিরা কেউ আমাদের জানে না—আর এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে আমাদের তারা আলাদা ক'রে চিনতেও পারবে না। তাছাড়া, আমরা দুজনে আর কী সাহায্যই বা দেবো ওদের? আমাদের কাছে তো কোনো অস্ত্রই নেই!'

লুইসকে একটু ঠাণ্ডা ক'রে জেন আরেকবার পুরো রাজভবনটা চক্কর দিয়ে দেখতে বেরিয়ে পড়লো। উইলিয়াম ফেরনেদের আটকে দিয়ে সে একদিক থেকে বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছে বটে, কিন্তু তাতে কি কোনো ফল হবে? উইলিয়াম ফেরনেদের সঙ্গে বেশ-কিছু অস্ত্রশস্ত্র আছে, বাকি-সবই মজুদ করা আছে অলিন্দে, মিনারের কাছে। অনেক-খুঁজে সে শুধু পেলে একটামাত্র রাইফেল, দুটো রিভলভার, আর দু-মুঠো কার্তুজ।

যখন সে তার অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় ক'রে ফিরে এলো, পরিস্থিতি তখন অনেকটাই পালটে গিয়েছে। আফ্রিকিরা দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে, আক্রমণ করেছে এস্‌প্ল্যানেড—এখন তারা এস্‌প্ল্যানেডে, হয়তো হাজারে-হাজারে। মুহূর্তের মধ্যে খ্যাপা ঝড়ের মতো গিয়ে তারা পড়েছে ব্ল্যাকগার্ডদের ব্যারাকে, আর নির্বিচারে হত্যা করেছে তাদের এতদিন যারা তাদের ওপর হিংস্রপশুর মতো অত্যাচার চালিয়েছিলো। ধ্বংস করেছে চল্লিশটা হেলিবিমানের জন্যে যে-মস্ত *হ্যাঙারটা* তৈরি করা হয়েছিলো—আর তা থেকে দাউ-দাউ আগুন আকাশে মেলে দিয়েছে লেলিহান শিখা। এতদিনকার অত্যাচার, অপমান, লাঞ্ছনার শোধ নিচ্ছে তারা সব ধ্বংস ক'রে দিয়ে, হন্যে, খ্যাপা, উত্তেজিত—আর লক্ষণ দেখে বোঝা যাচ্ছে আস্ত ব্ল্যাকল্যাণ্ডটাকে গুঁড়িয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে না-দিয়ে তারা কিছুতেই থাকবে না—ব্ল্যাকল্যাণ্ডের সকল অত্যাচারীকেই শেকড়শুদ্ধু উপড়ে ফেলে, সম্পূর্ণ নির্মূল ক'রে দিয়েই, শুধু থামবে।

আর এই দৃশ্য দেখে উইলিয়াম ফেরনের খ্যাপা মুখের কষ বেয়ে এখন বুঝি ফেনা গড়াচ্ছে। শোনা যাচ্ছে তার রোষ আর চীৎকার, বন্যজন্তুর গর্জনের মতো—কিন্তু কী-সে বলছে, তার একটা কথাও যদি বোঝা যায়! অলিন্দ থেকে অবিশ্রাম গুলিবর্ষণ চলেছে নিচের এস্‌প্ল্যানেড লক্ষ ক'রে—আর সেই হাজার-হাজার আফ্রিকিদের ভিড়ের মধ্যে কিছু-কিছু বলিও খুঁজে পেয়েছে।

কিন্তু তাতে কি আর অন্যরা এখন থামে? ব্ল্যাকগার্ডের ডেরাগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেলিবিমানের *হ্যাঙারে* আগুন ধরিয়ে দিয়ে সেই অগ্নিকাণ্ডের অতিকায় মশালের আলোয় তারা এখন এসে আক্রমণ করেছে রাজভবনকেই—হাতের কাছে যা পাচ্ছে তা-ই দিয়েই ঘা মারছে দরজায়—এখনও অবশ্য দরজা ভাঙতে পারেনি তারা।

যখন তারা দরজার ওপর প্রবল বন্যার মতোই আছড়ে পড়েছে, তখন রাঙানদীর তীর থেকে গুলির শব্দ ভেসে এলো। শেষটায় কোনোরকমে শৃঙ্খলা আনতে পেরেছে *মেরিফেলোরা*, পেরিয়ে এসেছে সেতু; আর এস্‌প্ল্যানেডের ওপার থেকে এলোমেলো গুলি চালাচ্ছে ভিড়কে লক্ষ ক'রে—আর সেই এলোপাথাড়ি গুলিতে কত শত লোক যে আছড়ে পড়ছে মাটিতে!

আফ্রিকিরা ক্রুদ্ধ গর্জন ক'রে নিজেদের আছড়ে ফেললো এই নবাগত শত্রুদের ওপর। কয়েক মিনিট এক দুর্ধর্ষ লড়াই চললো, কোনো নিয়মকানুন না-মানা, অন্ধ, ক্ষিপ্ত, অকথ্য হানাহানি। তাদের হাতে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র নেই ব'লে আফ্রিকিরা ঝাঁপিয়ে পড়লো শত্রুর ওপর, হাতাহাতি লড়াই, বল্লমের ফোঁড়, কুঠারের কোপ, ছুরি, কৃপাণ, খঞ্জর—আর-কিছুই যখন নেই, তখন দাঁত! *হর্ষচরিতদের* উত্তর এলো সঙিনের ফলায়, বুকের ওপর ঠেকানো রিভলভারের গুলিতে।

এই লড়াইয়ের ফলাফল আর-বেশিক্ষণ কোনো সন্দেহের মাঝখানে থাকবে না। সংখ্যার ওপর জয়ী হবে অস্ত্রের বাহাদুরি। একটু পরেই একটা ইতস্ততভাব জেগে উঠলো আফ্রিকিদের মধ্যে। তারা পেছিয়ে এলো একটু, ছুটলো নদীর পাড় ধ'রে, আর এস্‌প্ল্যানেড ফের দখলে চ'লে এলো *হর্ষচরিতদের*। আর তারাও ছুটলো আফ্রিকিদের পেছন-পেছন, তাদের নিজেদের আস্তানা রক্ষা করতে তাদের আবাসে তখনও গিয়ে আগুন পৌঁছোয়নি।

ঠিক যখন তারা সেতুটা পেরুচ্ছে, একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ফেটে পড়লো। রাজভবনের জানলা থেকে, জেন আর লুইস দেখতে পেলে বিস্ফোরণটা ঘটেছে বেশ-কিছুটা দূরে, বেসরকারি নাগরিকদের আবাসের দূর-কোণায়। চারপাশে আগুন যে অতিকায় মশালের মতো জ্ব'লে উঠেছে, তারই আলোয় তারা দেখতে পেলে বাইরের দেয়ালের একটা লম্বা অংশ এই বিস্ফোরণে উড়ে গিয়েছে।

বিস্ফোরণের উৎস যা-ই হোক না কেন, এর যেটা স্পষ্ট সুফল হ'লো, তা এই: খোলা মাঠে গিয়ে পড়বার জন্যে আফ্রিকিদের সামনে একটা মস্ত রাস্তা খুলে গিয়েছে। আর উড়ে-যাওয়া সেই দেয়ালের ফাঁক দিয়েই আফ্রিকিরা শত্রুর হাত এড়িয়ে গিয়ে পড়লো চাষের জমিতে, আর তার আশপাশের গাছপালার মাঝখানে।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই পশ্চাদ্ধাবনকারীরা রাঙানদী পেরিয়ে ফের ফিরে এলো এস্‌প্ল্যানেডে। এখন যে আঘাত হানবার জন্যে কোনো শত্রুই নেই তাদের সামনে, শুধু তা-ই নয়, তারা নিজেরা এখন আতঙ্কে চোখ ছানাবড়া ক'রে তাকিয়ে আছে পর-পর ঘ'টে-যেতে-থাকা বিস্ফোরণগুলোর দিকে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী হ'তে পারে কারণ—এইসব বিস্ফোরণের ? কেউ জানে না। এটা অবশ্য চট ক'রেই বোঝা গেছে যে বিস্ফোরণগুলো এলোপাথাড়ি ঘটছে না, বরং কেউ যেন অনেক ভেবেচিন্তে, ছক ক'ষে, সেই অনুযায়ীই এই বিস্ফোরণগুলো ঘটাচ্ছে পর-পর। প্রথমটা ঘটেছে শহরের শেষমাথায়, সীমান্ত-দেয়ালে, বেসরকারি নাগরিকদের যে-আবাস রাজভবন থেকে সবচেয়ে-দূরে। পাঁচমিনিট পরেই তার ডানদিকে আর বামদিকে প্রায় একযোগে ঘটেছে দুটি বিস্ফোরণ। তারপর, আবার, পাঁচমিনিট পরে আরো-দুটো বিস্ফোরণ, নদীর আরো-কাছে, তবে এখনও বেসরকারি নাগরিকদেরই আবাসস্থলে। আর তারপরেই *যে-হর্ষচরিতেরা* ধাওয়া ক'রে গিয়েছিলো আফ্রিকিদের, তারা ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে ছুটে ফিরে এসেছে এসপ্ল্যানেডেই আশ্রয় নিতে।

আর তারপর থেকে সেই দুর্বোধ্য বিস্ফোরণগুলো ফেটেই পড়ছে নিয়মিত, সাময়িক একটু বিরতির পর-পর। তারপর প্রতি আধঘণ্টা অন্তর শোনা গেছে আরো-একটা বিস্ফোরণ, আর বেসরকারি নাগরিকদের আবাসের আরো-একটা অংশ উড়ে গিয়েছে। এসপ্ল্যানেডে প্রায়-জড়াজড়ি ক'রে দাঁড়িয়ে ব্ল্যাকল্যাণ্ডের স্তম্ভিত গোরারা প্রায় একটা জাগর দুঃস্বপ্নের মতোই দেখেছে তাদের সাধের ব্ল্যাকল্যাণ্ড প্রায় শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে, কোনো প্রচণ্ড ও দুর্ধর্ষ শক্তি ছক ক'ষে একটু-একটু ক'রে উড়িয়ে দিচ্ছে ব্ল্যাকল্যাণ্ডকে।

নিজেদের চাইতে অস্ত্রবলে যারা দুর্বল, তাদের খুন করবার সময় এই দস্যুদের প্রাণে কোনো মায়াদয়া ছিলো, বরং ছিলো না, দুর্জয় সাহস, দুর্মর আত্মবিশ্বাস : এখন তারা কোনো উচ্চতর শক্তির সামনে ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপছে। রাজভবনের দেয়ালের গায়ে এসে ঠেকেছে তারা পিছোতে-পিছোতে, মিথ্যেই চেষ্টা করছে রাজভবনের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে, তারা গর্জন ক'রে অভিসম্পাত দিচ্ছে উইলিয়াম ফেরনেকে, অকথ্য-সব গালাগাল কেননা তাকে তারা দেখতে পাচ্ছে অলিন্দের ওপর, অথচ বুঝতে পারছে না তাদের এই সর্বেসর্বা প্রভু তাদের হঠাৎ এমনভাবে পরিত্যাগ করেছে কেন। আর উইলিয়াম ফেরনে অনবরত ওপর থেকে অঙ্গভঙ্গি ক'রে ইঙ্গিতে কী যেন বোঝাতে চাচ্ছে, অথচ যার মাথামুণ্ডু কিছুই তারা বুঝতে পারছে না, আর তার সমস্ত চীৎকারই চাপা প'ড়ে যাচ্ছে সব শব্দ-ছাপানো এক তুলকালাম কোলাহলে।

আর এইভাবেই শেষ হ'লো রাত, রক্তারক্তির রাত। দিন ফুটে উঠে উদ্‌ঘাটন ক'রে দিলে এক ভয়াবহ দৃশ্য। এসপ্ল্যানেডে এলোমেলো গড়াগড়ি যাচ্ছে অগুনতি মৃতদেহ; অন্তত কয়েকশো, গোরায়-কালোয় মাখামাখি। গোরারা যদি ভেবে থাকে যে কালোদের তারা হঠিয়ে দিতে পেরেছে, তবে তার জন্যে ধনেপ্রাণে তাদের মূল্য দিতে হয়েছে সুপ্রচুর। কাল অব্দি *মেরিফেলো* আর বেসরকারি নাগরিকদের আবাসে ছিলো আটশোরও বেশি লোক, এখন তাদের অর্ধেকও বেঁচে আছে কি না সন্দেহ। অন্যরা মারা গেছে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্রোহের প্রথম ধাক্কাতেই, আতঙ্কে আর বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া; আর এসপ্ল্যানেড থেকে যখন বিদ্রোহীদের হঠিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে, তখন মারা গেছে অজস্র জন।

আফ্রিকিরা—ওপরতলা থেকে জেন আর লুইস দেখতে পেলে—ছড়িয়ে পড়েছে ব্ল্যাকল্যাণ্ডের বাইরের বিশাল-উন্মুক্ত বিস্তারে। অনেকে চ'লে যেতে শুরু করেছে। কেউ যাচ্ছে পশ্চিমে, সোজা নাইজারের দিকে—আর তাদের সামনে ছড়িয়ে আছে ধূ-ধূ বালি। এই মরুভূমি পেরিয়ে ক-জন তবে পৌঁছুতে পারবে নাইজারে—যখন তাদের সঙ্গে কোনো জল নেই, খাদ্য নেই, অস্ত্র নেই? অন্যরা বেছে নিয়েছে অপেক্ষাকৃত-নিরাপদ ঘুরপথ —তারা চলেছে রাঙানদীর তীর ধ'রে, আর ক্রমেই উধাও হ'য়ে যাচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিমে।

কিন্তু বেশির ভাগই এখনও মনস্থির ক'রে উঠতে পারেনি, ব্ল্যাকল্যাণ্ড থেকে চ'লে যাবে কি না। তারা ছোটো-ছোটো দলে ভাগ হ'য়ে ছড়িয়ে আছে খেতে-খামারে চাষের জমিতে—ফ্যালফ্যাল ক'রে হতভম্ব তাকিয়ে আছে শহরটার দিকে, দেখছে কুণ্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে ব্ল্যাকল্যাণ্ডের ওপর, আর পরের পর বিস্ফোরণ শহরটাকে রূপান্তরিত ক'রে ফেলছে বিশাল-এক ধ্বংসস্তূপে।

আর ঠিক তখনই প্রচণ্ড-এক বিস্ফোরণ ফেটে পড়লো সরাসরি রাজভবনেরই অলিন্দে। তারপর আঘাতের পর আঘাত, বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ, যার শেষটা হ'লো প্রচণ্ড।

জানলার একটু-তোলা খড়খড়ি দিয়ে এতক্ষণ স্তম্ভিতের মতো সব লক্ষ ক'রে যাচ্ছিলো জেন আর লুইস; কিন্তু নাটকের এই শেষতম দৃশ্য দেখে আঁৎকে উঠে লুইস চেপে ধরলে তার বোনের হাত।

'ও হ'লো উইলিয়াম,' এই নতুন বিস্ফোরণগুলোর মানে জেন বুঝতে পেরেছে, 'উইলিয়াম এখন কামান দেগে অলিন্দের দরজা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে!' খুবই শান্ত-গলায় কথাগুলো বললে জেন; সে শান্তভাবে নিরীক্ষণ ক'রে যাচ্ছে পরিস্থিতি, ঠাণ্ডা-মাথায় বোঝবার চেষ্টা করছে তার তাৎপর্য।

'তার মানে,' লুইস আতঙ্কিত, 'তার মানে ওরা তবে এক্ষুনি নেমে আসবে?' তার বোন যে-রিভলবার দুটো জোগাড় ক'রে এনেছিলো, তার একটা আঁকড়ে ধ'রে সে বললে, 'বরং নিজের হাতে মরবো, তবু ওদের হাতে ধরা দেবার চাইতে তা অনেক ভালো।'

জেন হাত নেড়ে মানা করলে তাকে। 'এখনও তো ওরা এখানে আসতে পারেনি। এ-রকম পাঁচ-পাঁচটা দরজা আছে—আর শেষ-তিনটে দরজা এমন যে কোনো কামান দেগেও সেগুলো উড়িয়ে দেয়া যাবে ব'লে মনে হয় না।'

যেন তার কথাগুলোর তলায় লাইন দেগে দিয়েই কামানগুলো থেমে গেলো। অলিন্দে উঠলো ভারি-একটা গড়গড় আওয়াজ, সেইসঙ্গে খ্যাপা চীৎকার : উইলিয়াম



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেরনে আর তার স্যাঙাৎরা কামানটা ঠেলে আনতে চাচ্ছে দ্বিতীয় দরজাটার দিকে, আর অলিন্দ থেকে ওভাবে চাকা গড়গড়িয়ে কামান নামানো খুব-একটা সহজ কাজ নয়।

তাছাড়া, শিগগিরই, সে-কাজটায় আপাতত ইতি টানতে হ'লো তাদের। নতুন-আরেকটা ঘটনা ঘ'টে গেছে, যেটা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যেমন তা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে জেন আর লুইসের।

নিয়মিত বিস্ফোরণগুলো এখন তার পূর্ববর্তী বিস্ফোরণগুলোর চাইতেও আরো-অনেক-বেশি বিধ্বংসী রূপ নিয়েছে। যে-প্রচণ্ড ধ্বংসশক্তি বোতলের মধ্যকার জিনের মতো বেরিয়ে এসেছিলো, সেটা এখন বামতীর ধ'রে এগুচ্ছে, এরই মধ্যে আকাশে উড়ে গেছে কারখানার বাগানের পাশের দেয়াল, আকাশে উড়ে যাচ্ছে মাটি-পাথরের এক বৃষ্টি, নিচে না-নেমে মাধ্যাকর্ষণ এড়িয়ে তারা যেন উঠে যেতে চাচ্ছে ওপরের আকাশে। ধোঁয়া স'রে যেতেই দেখা গেলো, আগে যেখানটায় বাগান ছিলো এখন সেখানে মস্ত-একটা গর্ত, এমনকী খোদ কারখানাটারও একটা ছোটো অংশ সেই-সাথে উড়ে গিয়েছে।

আকাশে তখনও বিস্ফোরণের পরেকার ধুলোবালি ঝুলে ছিলো, এমন সময় হাট-ক'রে-খোলা কারখানার দরজা দিয়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে এলো একটা ভিড়, নদীর ঘাটের দিকে। তক্ষুনি তাদের চিনতে পারলে জেন। তারা তারই বন্দীজীবনের সঙ্গীরা, সঙ্গে আছে কামারের কর্মীরাও, আর তাদের মাঝখানে আছে নারী আর শিশুরা। এই হতভাগারা তাদের আশ্রয় ছেড়ে এসপ্ল্যানেডের দিকে এগুচ্ছে কেন? সেখানে তো *হর্ষচরিতরা* আছে, তারা তো এখনও ক্ষিপ্তভাবে আছড়াচ্ছে রাজভবনের দরজায়! নতুন প্রতিপক্ষকে অবশ্য তখনও এই *হর্ষচরিতরা* দেখতে পায়নি, এসপ্ল্যানেডের দেয়াল আড়াল ক'রে রেখেছে তাদের। কিন্তু উইলিয়াম ফেরনে তাদের দেখতে পেয়েছে অলিন্দ থেকে আর আঙুল তুলে দেখাচ্ছে। কিন্তু *হর্ষচরিতরা* কেউই তার এই মুদ্রার কোনো মানেই বুঝতে পারেনি। নদীর ঘাটের কাছে এসপ্ল্যানেডের দেয়ালে যে-দরজাটা ছিলো, সেটা খুলে কারখানা থেকে ভিড়টা এসপ্ল্যানেডে এসে পৌঁছুলো। আর *হর্ষচরিতরা*, এতক্ষণে, যে-ই তাদের দেখতে পেলে রুদ্ধআক্রোশে গর্জন ক'রে উঠলো। দরজা ভাঙার কাজ মুলতুবি রেখে হাতের কাছে যে যা অস্ত্র পেলে তাই নিয়েই ছুটে এলো নবাগতদের দিকে।

এখন লড়াইটা ঠিক আগেকার মতো একতরফা হ'লো না। কারখানার লোকেরাও যে যা অস্ত্র পেয়েছে হাতে ক'রেই এসেছিলো : কামারশালার হাতুড়ি, সাঁড়াশি, লোহার ডাণ্ডা, লাঠি-শোঁটা... তারাও ধেয়ে এলো। ভয়াল সেই লড়াই, আকাশবাতাস অস্ত্রের ঝনঝন আর চীৎকার-কোলাহলে বধির। রক্তের বন্যা ব'য়ে গেলো এসপ্ল্যানেডে—আর আগেই, রাতের যুদ্ধের পরিণামে, যত মৃতদেহ পড়েছিলো সেখানে, তার ওপর থুবড়ে পড়লো আরো-কত মৃত ও আহত।

দু-হাতে চোখ ঢেকে জেন চেষ্টা করলে সে-দৃশ্য তাকে যাতে আর দেখতে না-



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়, এই-যারা এই হাতাহাতি লড়াইতে মেতেছে তাদের মধ্যে কতজন আছে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ! সে ভয়ে-আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো সাঁৎ-বেরাঁর কথা ভেবে, আমেদে ফ্লরেঁসের কথা ভেবে, ডাক্তার শাতোনের কথা ভেবে—আর মিশনের নেতা বারজাকের জন্যেও —তবে সাঁৎ-বেরাঁর জন্যেই তার ভয়টা সবচাইতে বেশি !

কিন্তু তার চেয়েও প্রচণ্ড আরো-একটা গর্জন কানে এলো তক্ষুনি।

সংখ্যায় বেশি *হর্ষচরিতরা*, অস্ত্রবলেও বেশি-বলীয়ান তারাই। কারখানার লোকজনদের মাঝখানে ফুঁড়ে গিয়েছে তারা, মাখনের মধ্যে তপ্তছুরির মতো। একদল পিছোচ্ছে নদীর ঘাটের দিকে, পদে-পদে বিপদের সঙ্গে যুঝতে-যুঝতে, অন্যদলটাকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে রাজভবনের দিকে। ঠিক শিকারের সময় খেদা যেমন করে। আর রাজভবনের দিকে যাদের ঠেলে নিয়ে-আসা হচ্ছে তাদের অন্তত রেহাই পাবার কোনো আশা নেই। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে, মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে তাদের শত্রুর সামনে; অলিন্দের ওপর থেকে সপারিষদ উইলিয়াম ফেরনে অনায়াসেই গুড়ি ছুঁড়তে পারবে এই হতভাগ্যদের ওপর। যাদের এমনকী যোঝবার কোনো শক্তিই নেই...

হঠাৎ তারাই উল্লাসে জয়ধ্বনি ক'রে উঠলো।

যে-দরজাটায় এসে তারা পিঠ ঠেকিয়েছিলো, সেটা আচমকা খুলে গিয়েছে তাদের পেছনে, আর চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে জেন ব্লেজন। শত্রুরা ধাওয়া ক'রে আসছে... কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তারা আশ্রয় নিয়েছে রাজভবনের মাঝখানে—আর জেন আর লুইসের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি ঠেকিয়ে রাখছে *হর্ষচরিতদের*, তাদের নাগাল ধরতে দিচ্ছে না।

হঠাৎ এই অতর্কিত বাধায় বিমূঢ় হ'য়ে *হর্ষচরিতেরা* একমুহূর্ত ইতস্তত করেছিলো। রাজভবনের এমনতর ব্যবহারের কোনো মানেই তারা বুঝতে পারছিলো না। যতক্ষণে এই হতভম্ব দশা কেটেছে তাদের, তারা ফের সবেগে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেছে, ততক্ষণে বড্ড-দেরি হ'য়ে গেছে।

তাদের মুখের ওপর দড়াম ক'রে আবার বন্ধ হ'য়ে গেছে অভেদ্য-বর্ম পরানো সেই দরজা। সম্ভবত মাথা কুটে ম'রে গেলেও এই দরজা ভেঙে ফেলবার সাধ্য তাদের কারুই নেই।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোদ্দ

# ব্ল্যাকল্যাণ্ডের অবসান

দরজাটা যখন ভেতর থেকে ভালো ক'রে এঁটে বন্ধ ক'রে দেয়া হ'লো, তখন প্রথম কাজটা দাঁড়ালো আহতদের সেবাশুশ্রূষা—বেশ-কিছু লোকই জখম হ'য়ে পড়েছিলো। আমেদে ফ্লরেঁস আর মঁসিয় বারজাকও অল্প চোট-জখম পেয়েছিলেন। জেন ব্লেজন নিজে, স্বয়ং, তাদের সেবাশুশ্রূষার ভার নিলে। আত্মরক্ষার জন্যে কেউ যদি কখনও এসে তার ভয়ংকর শত্রুর বাড়িতে আশ্রয় নেয়, আমেদে ফ্লরেঁস শুধু তার পরিহাসের দিকটাই দেখতে পেয়েছিলেন তা নয়—ভাববার চেষ্টা করছিলেন এ-রকম দৃষ্টান্ত গল্পে বা বাস্তবে আর আছে কি না।

ফার্স্ট-এইড দেবার পর জেনের কাঁধে আরেকটা দায়িত্ব বর্তালো। তাকে এই বেচারি লোকগুলোকে খাওয়াতে হবে—গত ক-দিনে এঁরা কেউ দানাটিও দাঁতে কাটেননি। কিন্তু সেটা কি সে করতে পারবে? এতগুলো লোককে খাওয়াতে পারার মতো যথেষ্ট খাবার কি আছে রাজভবনের ভাঁড়ারে?

প্রত্যেকটি তলা তন্নতন্ন ক'রে খোঁজার পর যতটুকু খাবার পাওয়া গেলো, তাতে শুধু সকলের সামান্য নাশতাই হয়। ফলে এদিক দিয়েও পরিস্থিতি এখনও গুরুতর—তার যেটা অনিবার্য ফল হ'তে পারে, সেটাকেই বোধকরি মাত্র কয়েক ঘণ্টার মতো ঠেকানো গেছে।

এ-সব নানা খুচরো কাজ শেষ হ'তে-হ'তে সকাল এগারোটা। এদিকে, সারাক্ষণ, বিস্ফোরণের আওয়াজ আসছে বাইরে থেকে, আর এসপ্ল্যানেড থেকে ভেসে আসছে *হর্ষচরিতদের* কোলাহল—তারা মাঝে-মাঝেই এসে একবার ক'রে দরজাটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আর সেইসঙ্গে অলিন্দ থেকে উইলিয়াম ফেরনে আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের গাঁক-গাঁক চীৎকার তো আছেই। এঁদের কানে এই সব কলরব-কোলাহল ক্রমেই স'য়ে যাচ্ছে —শেষটায় কেউ আর এ-সবে কান পাতছিলেন না। তাঁদের এই আশ্রয় যে অভেদ্য—এই বিশ্বাস প্রায়-বদ্ধমূল হ'য়ে উঠেছে তাঁদের—শত্রুদের ক্ষিপ্ত গর্জনকে তেমন-একটা আর পাত্তা দিচ্ছিলেন না তাঁরা।

একটু ফুরসৎ পাবার পরেই, জেন প্রথমেই আমেদে ফ্লরেঁসকে জিগেস করলে: হঠাৎ তাঁরা কেন কারখানার সুরক্ষিত আশ্রয় ছেড়ে প্রাণ হাতে ক'রে এসপ্ল্যানেডে চ'লে এসেছিলেন। জেন কারখানা ছেড়ে চ'লে-আসার পর সেখানে কী-কী ঘটেছে, সাংবাদিক তা বেশ গুছিয়েই বললেন জেনকে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাখ্যা ক'রে বললেন, কেমন ক'রে সাড়ে-আটটার একটু পরেই, তোঙ্গানে যখন দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত সংকেতটা দিয়েছিলো, মার্সেল কামারে তার আগেই, ব্ল্যাকল্যাণ্ডের অন্য বাসিন্দাদের অজ্ঞাতসারে, শহরের মাঝখানে প্রচুর গোলাবারুদ আর ডায়নামাইট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। প্রাথমিক প্রস্তুতিটা শেষ হয়েছিলো রাত এগারোটা নাগাদ, আর কারখানা ততক্ষণে এই লড়াইতে নিজের কী ভূমিকা হবে, তাও স্থির ক'রে নিয়েছে।

আমেদে ফ্লরেঁস বিশদভাবে বললেন সাঁৎ-বের্ঁার মাথাকোটা হতাশার কথা : বেচারা যদি এই লড়াইতে প্রাণে বেঁচেও যায়, উদ্বেগে-আশঙ্কায় সে নিশ্চয়ই আধমরা হ'য়ে গিয়েছে।

অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়ে দেবার আধঘণ্টা পরে শোনা গিয়েছিলো এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ। তোঙ্গানে নিজের হাতে কালোদের বস্তির একটা দরজা উড়িয়ে দিয়েছে। সেই বিস্ফোরণে কালোদের বস্তিতে আগুনও ধ'রে গিয়েছিলো; আর তাঁরা বাইরে থেকে ঠিক তার পরেকার তুলকালাম হট্টগোল শুনে আন্দাজ করেছিলেন কালোরা তাদের সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেসরকারি নাগরিকদের আস্তানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

বাকিটা জেন জানে। সে জানে যে নিগ্রোরা, এসপ্ল্যানেডে রে-রে ক'রে তেড়ে এসেছিলো বটে, কিন্তু *মেরিফেলোদের* পালটা আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যায়। এমন চট ক'রে পুরো ব্যাপারটা ঘ'টে যায় যে কারুপক্ষেই তাদের সাহায্যে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কারখানা থেকে জেনের বন্ধুরা একবার বেরিয়েছিলেন বটে, কিন্তু লড়াই তখন এমনই প্রচণ্ড হ'য়ে উঠেছিলো যে তাদের প্রায় তক্ষুনি পিছু হ'ঠে যেতে হয়—আর পরে যখন দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় তাঁরা এসপ্ল্যানেডে এসে পৌঁছুলেন, কালোদের ততক্ষণে গোরারা এসপ্ল্যানেড থেকে তাড়িয়ে দিতে পেরেছে।

কারখানার ফিরে যেতে বাধ্য হ'য়ে কারখানার সবাইকে সারাটা রাত তীব্র-উদ্বেগের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। কালোদের এই বিদ্রোহী উত্থান এ-রকম বিপর্যস্ত হ'য়ে গেলো দেখে তাঁরা এটা ভাবতে শুরু ক'রে দিয়েছিলেন এভাবে হ্যারি কিলারকে ঘায়েল করা যাবে কি না। জেনের মতো তাঁরাও উৎকর্ণ শুনেছেন পর-পর সব বিস্ফোরণের শব্দ —এখন যা পুরো শহরটাকেই ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চাচ্ছে। কিন্তু এই বিস্ফোরণ কারা ঘটাচ্ছে, কারণ কী—তা তাঁরা কিছুই জানেন না। অবশেষে তাঁরা এটাই শুধু আন্দাজ করেছেন এ নিশ্চয়ই খোদ মার্সেল কামারের কীর্তি—এতক্ষণে তিনি বোধহয় সব কাণ্ডা-কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে সম্পূর্ণ উন্মাদ হ'য়ে গেছেন।

যত-চমকপ্রদ উদ্ভাবননিপুণ প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকই হোন না কেন, কামারে প্রায় চিরকালই প্রতিভার পরপারে পাগলামির সীমান্তে একটা পা বাড়িয়েই ছিলেন—আগেই যা দেখেছে সবাই, কোথায় যেন প্রখর বুদ্ধির সঙ্গে একটা ভারসাম্যহীনতা মিশে আছে। গত মাসে পর-পর যে-সব ঘটনা ঘটেছে, পর-পর, এত ধরনের সব ঘটনা, যে, শেষ-



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যন্ত তা তাঁকে যেন ঠেলে দিয়েছে পাগলামির ওপারে।

প্রথম ধাক্কাটা খেয়েছেন, যখন হ্যারি কিলারের বন্দীরা তাঁকে হ্যারি কিলারের কুকীর্তির কথা বর্ণনা ক'রে কারখানায় আশ্রয় চেয়েছেন। দ্বিতীয়, এবং আরো-ভয়ংকর, আঘাতটা এসেছে ড্যানিয়েল ফ্রাস্নের কাছ থেকে। এবার যখন দুষ্পাচ্য সত্যটার মুখোমুখি হয়েছেন, কামারে প্রতিদিনই একটু-একটু ক'রে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছেন। শুনতে-শুনতে জেনের মনে প'ড়ে গেলো, কতদিন তিনি নিজের ঘরটায় দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে একাই সারাটা সময় কাটিয়ে দিতেন—আর যদি-বা কখনও ওয়ার্কশপে আসতেন তাঁকে কেমন বিষণ্ন ও উদভ্রান্ত দেখাতো।

তোঙ্গানের উদ্দেশে অস্ত্রশস্ত্রগুলো পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করাই সম্ভবত তাঁর শেষ প্রাঞ্জল কীর্তি। প্রথম বিস্ফোরণটা যখন *উঠেছিলো* আর কালোদের বস্তিটা দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠেছিলো, তারপর যখন বেসরকারি নাগরিকদের আবাসও, তখন তাঁর আশপাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই আচমকা লক্ষ করেছেন কী-রকম পাণ্ডুর হ'য়ে গেছেন তিনি, আর হাতটা তুলে নিয়েছিলেন এমনভাবে যেন তাঁর দমবন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। আর সেইসঙ্গে জড়ানোগলায় বিড়বিড় ক'রে বকছিলেন : 'আমার সব কাজের ইতি হ'য়ে গেলো।... ভণ্ডুল হ'য়ে গেলো সব কাজ... সব কাজ পণ্ড হ'য়ে গেলো!'... প্রায় পনেরো মিনিট ধ'রে বিড়বিড় ক'রে শুধু এই কথা কটিই আউড়েছিলেন মার্সেল কামারে, যাঁরা তাঁকে তখন দেখেছেন তাঁরা হয়তো কোনোদিনই ভুলতে পারবেন না কেমন অস্থির আর উদভ্রান্ত লাগছিলো তাঁকে তখন। তারপর, আচমকা, সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে, সটান, ঋজু, বুকে কিল মেরে তিনি ব'লে উঠেছিলেন : 'ঈশ্বর ব্ল্যাকল্যাণ্ডকে দণ্ডিত করেছেন! ব্ল্যাকল্যাণ্ড অনুদ্ধারণীয়!'... আর যে-ভঙ্গিতে তিনি কথাটা বলেছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিলো ঈশ্বর বলতে তিনি শুধু নিজেকেই বুঝিয়েছেন। আর, কেউ তাঁকে বাধা দেবার আগেই, ছুটে গিয়েছেন তিনি, বারে-বারে চীৎকার ক'রে বলেছেন : 'ব্ল্যাকল্যাণ্ড অনুদ্ধারণীয়! ব্ল্যাকল্যাণ্ড অনুদ্ধারণীয়!'

আর, গিয়ে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন মিনারে, সিঁড়ি দিয়ে ছুটে উঠতে-উঠতে পেছনের সব দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন পর-পর। কারখানারও প্রতিরোধব্যবস্থা হুবহু রাজভবনের মতোই; ফলে এখানে উইলিয়াম ফেরনে দরজা বন্ধ ক'রে দেবার পর যেমন নিচে নামতে পারেনি আর, তাঁর বন্ধুদের পক্ষে তেমনি কামারের কাছে গিয়েও পৌঁছুনো সম্ভব হয়নি। আর কামারে যতই ওপরে উঠে গেছেন, ততই আকাশবাণীর মতো শুনিয়েছে তাঁর স্বর : 'ব্ল্যাকল্যাণ্ড অনুদ্ধার্য! *ব্ল্যাকল্যাণ্ড অনুদ্ধার্য*!'

প্রথম বিস্ফোরণটা শোনা গেছে ঠিক তার পরক্ষণেই।

রিগোর নেতৃত্বে আরো-কয়েকজন কর্মী ছুটে গিয়েছে কারখানায়, চেষ্টা করেছে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ ক'রে দিয়ে মিনারকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেবে। তাঁদের গুরুর এমন দশা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে তারা দিশেহারা হ'য়ে পড়েছিলো। কিন্তু মিনার ছিলো স্বয়ংসম্পূর্ণ, তার নিজের একটা ভাঁড়ার ছিলো, যেখানে *জেনারেটার* তরল বাতাসকে রূপান্তরিত ক'রে দেয় বিদ্যুতে–আর তাই বিস্ফোরণ বন্ধ হয়নি। কিন্তু যখন *বোলতাগুলো* যেভাবে পাক খেয়ে কারখানার সুরক্ষায় ঘুরছিলো, তারা একের পর এক ভির্মি খেয়ে পড়তে লাগলো নিচে, তখন রিগোরা বাধ্য হয়েছে ফের কামারের বিদ্যুৎব্যবস্থা চালু ক'রে দিতে। পাগল হ'তে পারেন কামারে, কিন্তু নিশ্চয়ই জানেন তিনি কী করতে চাচ্ছেন—কেননা বিদ্যুৎপ্রবাহ চালু ক'রে দেবামাত্র আবার *বোলতাগুলোকে* সুরক্ষাচক্রের মতো কারখানাকে ঘিরে পাক খাইয়েছেন তিনি।

বিষম উদ্বেগের মধ্যে রাতটা কেটে যাবার পর, মার্সেল কামারে এসে দেখা দিয়েছেন মিনারের প্ল্যাটফর্মটায়। সেই-উঁচু থেকে, আকাশবাণীর মতো, তিনি লম্বা-এক সন্দর্ভ ঝেড়েছেন, যার মধ্যে মাঝে-মাঝে একটা-দুটো কথাই শুধু বোঝা গেছে। যেমন, *ঐশ্বরিক রোষ, স্বর্গের আগুন, সম্পূর্ণ বিনাশ* এই কথাগুলো যতই *বাইবেলের প্রকাশিত বাক্যের* মতো শোনাক, সেগুলো এটাই বুঝিয়ে দিয়েছে যে তাঁর এই উন্মত্ততা সহজে কাটবার মতো নয়। এই *সন্দর্ভের* শেষে তিনি চেঁচিয়ে বলেছেন : 'পালাও !... সবাই পালিয়ে যাও !... কেউ এখানে আর থেকো না !' আর এমনভাবে গলা ফাটিয়ে কথাগুলো বলেছেন যে কারখানার সব কোণা থেকেই তা শোনা গেছে। তারপর সেই-যে ফের তিনি মিনারে গিয়ে ঢুকেছেন, সেখান থেকে আর বেরোননি।

আর তারপরেই বামতীর থেকে উঠেছে বিস্ফোরণের আওয়াজ। এই বিস্ফোরণটার উৎপত্তি সরাসরি কারখানারই দেয়ালে—আর তা-ই দেখে সবাই ভয়ে একেবারে-নীল হ'য়ে গেছে। কারখানায় থাকলেও মরণ, বাইরে বেরুলেও মরণ—এই দুই-মরণের মধ্যে কোনটা ভালো বোঝা দায়। তবু তাঁরা ঠিক করেছেন, কারখানা থেকেই বেরিয়ে গিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে হবে !

কিন্তু কপাল তো সঙ্গেই যায়, এসপ্ল্যানেডে এসেই তাঁরা মুখোমুখি পড়েছেন *হর্ষচরিতদের*—আগে তাদের দেখা যায়নি, তাহ'লে প্রস্তুত হওয়া যেতো, কিন্তু তারা লুকিয়েছিলো দেয়ালের আড়ালে। বিস্তর ক্ষয়ক্ষতির পর, পলাতকেরা দুটি ভাগে ভাগ হ'য়ে গেছেন। কেউ-কেউ, এই যেমন, সরাসরি খোদ হ্যারি কিলারের আস্তানাতে এসেই আশ্রয় পেয়েছেন, অন্যরা পালিয়ে গেছে নদীর ঘাটে, যাবার সময় *ব্যারিকেড* হিশেবে এসপ্ল্যানেড আর নদীর ঘাটের মধ্যকার দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে গেছে।

এ-দলটাকে রাজভবন থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আবার আক্রমণ করার কোনো তোড়জোড়ই করছে না তারা—কেননা তার অর্থহীনতা তারা জানে; এদিকে কারখানায় গিয়েও আশ্রয় নেবার সাহস পাচ্ছে না আর : তারা এখন পুরোপুরি নির্ভর ক'রে আছে এক উন্মাদের খামখেয়ালের ওপর—অনাহারে জীর্ণশীর্ণ, স্নায়ুগুলো সব যেন ছিন্নভিন্ন,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে খোলা জায়গাতেই, অরক্ষিত। কেউ-কেউ থুবড়ে পড়েছে মাটিতে, যারা দাঁড়িয়ে আছে অবসাদে তারাও যায়-যায়। নদীর অন্যতীর থেকে, রাজভবনের ওপর থেকে, গুলি ক'রে তাদের উড়িয়ে দেয়া যায়—কিংবা সার্কুলার রোড দিয়ে ঘুরে এসে তাদের ওপর চড়াও হওয়া যায়।

জেন অন্তত এটুকু স্বস্তি পেলে যে তাদের মধ্যে আছেন সাঁৎ-বের্ঁ্যা, আর ডাক্তার শাতোনে। অর্থাৎ, এ-যাবৎ, অন্তত, তার কোনো বন্ধুই মারা যাননি—বিশেষ ক'রে তার ঐ আধখ্যাপা আত্মীয়টি, যাকে সে এত ভালোবাসে, তিনি এখনও বেঁচে আছেন।

কিন্তু আশ্বস্ত হ'লে কী হবে, পরক্ষণেই রাজভবনের ওপর থেকে দুমদুম ক'রে ভীষণ ধাক্কাধাক্কি শুরু হ'য়ে গিয়েছে দরজায়। নিশ্চয়ই এইসব ধুপধাপ শব্দের উৎপত্তি রাজভবনের অলিন্দতেই। তারা পারলে বুঝি ছিঁড়েই ফ্যালে সবকিছু! এখনও দরজা অটুট আছে, ঠেকিয়ে রেখেছে ঐ অন্ধকারের জীবদের, কিন্তু কতক্ষণ! যদি উইলিয়াম ফেরনে আর তার সঙ্গীরাও অনাহারে খানিকটা কাহিল না-হ'য়ে পড়তো, তাহ'লে এতক্ষণে তারা হয়তো সফল হ'তে পারতো। সন্ধে ছটার একটু পরেই তেতলার দরজা শেষটায় ভেঙে ফেললো তারা, আর অমনি সকলকে তড়িঘড়ি চ'লে আসতে হ'লো দোতলায়। দোতলার দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে তারা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো কখন এ-দরজাটাও ভেঙে পড়ে।

এইফাঁকে অবশ্য বারজাক আর আমেদে ফ্লরেঁসকে জেন নিজের অ্যাডভেনচারের সব কথাই খুলে বলেছে—কারখানা থেকে বেরিয়ে আসার পর তাকে কী-রকম অবস্থাবিপাকে পড়তে হয়েছে। এবার সে বিশদ ক'রে খুলে বললে তার বংশবৃত্তান্ত, বললে কেমন ক'রে লুইসকে কী দুঃসহ স্পর্ধায় চুরি ক'রে এনে এখানে বন্দী ক'রে রেখেছিলো হ্যারি কিলার—আর সব-শেষে বললে কী মর্মান্তিক ও শোচনীয় আবিষ্কার সে করেছে তারপর—হ্যারি কিলার আসলে তারই সৎ-ভাই, উইলিয়াম ফেরনে। যদি ভাগ্য প্রতিবন্ধকতা করে, যদি সে আর কখনও ইংলণ্ড না-পৌঁছোয়, তবে আমেদে ফ্লরেঁস আর মঁসিয় বারজাকই জগৎকে সত্যিকথাটা জানিয়ে দিতে পারবেন —জর্জ বা লুইস, দুজনেই, এমন-দুষ্কর্মের জন্যে অভিযুক্ত হয়েছে যে-দুষ্কর্ম তারা করেনি।

সাতটা নাগাদ দোতলার ছাদটাও নড়বোড়ে হ'য়ে গেলো। দরজা ভাঙতে না-পেরে, হ্যারি কিলার (ওরফে উইলিয়াম ফেরনে) ঠিক করেছে ছাদ ধসিয়ে দিয়েই নিচে নামবে। একটুক্ষণ জিরিয়ে গায়ে তাকৎ এনে ফের ফেরনে আর তার সঙ্গীরা দোতলার ছাদ ভাঙবার কাজে লেগে গিয়েছে। শরণার্থীদের এবার আরো-নিচে চ'লে যেতে হ'লো।

তেতলার ছাদ ভাঙবার কাজটা কিন্তু মোটেই সহজ ছিলো না—আগেরটার মতোই অবিশ্রাম আঘাত চাই। ধকল মোটেই কম নয়। তবু রাত দুটো পর্যন্ত তাদের বুকের ঢিপঢিপ শব্দের সঙ্গে তাল রেখেই চললো দমাদ্দম ধুপধাপ আঘাত। তারপরেই ক্লান্ত



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ'য়ে সাময়িকভাবে নিশ্চয়ই ছাদ ভাঙবার চেষ্টাটায় বিরতি দিলে তারা।

দমাদ্দম শব্দটা ফের শুরু হ'লো, এবার সরাসরি দোতলার ছাদেই, ভোর চারটের সময়। মাথার ওপর ছাদ ভেঙে-পড়া পর্যন্ত সবুর না-ক'রে, শরণার্থীরা চ'লে গেলো একতলায়—দরজা লাগিয়ে দিয়েই, তবে এখন তো আর তারা দরজা ভাঙবার ব্যর্থ চেষ্টাটা আর করছে না।

এই হচ্ছে তাদের শেষদুর্গ। মাথার ওপরকার বাকি ছাদগুলো ভেঙে ফেলে যখন বন্দুকের নল তাগ ক'রে ধরবে ফেরনেরা, তখন তাদের হয় ঐ মাটির তলার জেলখানায় চ'লে যেতে হবে, আর নয়তো রাজভবনের দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে হবে খোলামেলায়। তারপর তাদের সামনে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

উইলিয়াম ফেরনেরা যখন বাকি-দুটো ছাদ ভাঙবার জন্যে মরীয়া চেষ্টা ক'রে চলেছে, তখন নির্মেঘ আকাশে উঠে এলো সূর্য। আর সকালবেলার ফটফটে আলোয় দেখে এই-প্রথম খানিকটা আন্দাজ পাওয়া গেলো ধ্বংসের পরিমাণ কী বিপুল, কী সর্বক্ষয়ী : যা-ই ঘটুক না কেন, ব্ল্যাকল্যাণ্ডের সর্বেসর্বা এর-পর তার রাজত্ব পাতবে শুধু-এক ধ্বংসস্তূপেরই ওপর।

শহরটা পুরোপুরি-ধ্বংস হ'য়ে গেছে। শুধু দুটো বাড়ি আস্ত আছে, *হর্ষচরিতদের* বসতিতে, ঠিক রাজভবনের মুখোমুখি। সূর্য ওঠবার কয়েক মিনিট পরেই তাদেরও পালা এলো : তারাও ধ'সে পড়লো পর-পর আর রাঙানদীর ডানতীরের ধ্বংসলীলা সম্পূর্ণ হ'য়ে গেলো।

বিস্ফোরণ কিন্তু মোটেই থামেনি, বরং এক বিস্ফোরণ থেকে আরেক বিস্ফোরণের ব্যবধান অনেকটাই ক'মে এসেছে। মার্সেল কামারে এবার বামতীর নিয়ে পড়েছেন -—এবার কারখানার আস্তে-আস্তে ধ'সে-পড়ার পালা। অথচ এখনও সুদক্ষ, রণনিপুণ, সেনাধ্যক্ষের মতোই মার্সেল কামারে তাঁর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন : তাঁর *উন্মত্ততার মধ্যেও* কোথাও কোনো *পদ্ধতিগত ব্যবস্থা* আছে। তিনি এক-এক ক'রে উড়িয়ে দিচ্ছেন কর্মীদের বাড়িঘর, ওয়ার্কশপ, গুদোমঘর, একটু-একটু ক'রে, এক-এক ক'রে, আর যেন বিলম্বিত করতে চাচ্ছেন ধ্বংসের প্রক্রিয়া, যেন আস্তে-আস্তে নিংড়ে নিতে চাচ্ছেন এ-থেকে যতটা সন্তোষ পাওয়া যায়, তার সমস্তটাই, অথচ কখনও কারখানার প্রাণকেন্দ্রকে স্পর্শও করছেন না, যে-কলকব্জা থেকে তড়িৎপ্রবাহ বেরুচ্ছে অনর্গল, তারা যেন তাঁর ছক-কষা পরিকল্পনা অনুযায়ীই অব্যাহতি পেয়ে যাচ্ছে বারে-বারে।

সারারাত ধ'রে রাজভবনের দরজার ওপর হামলা চালিয়ে হয়রান হ'য়ে *হর্ষচরিতেরা* সবাই নাজেহাল দাঁড়িয়েছিলো। বামতীরে প্রথম বিস্ফোরণটা ঘটতেই, এসপ্ল্যানেডে তাদের মধ্যে এক তুমুল কোলাহল উঠলো, তারা আবার নতুন উদ্যম নিয়ে মরীয়ার মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো রাজভবনের দরজায়।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা সত্যিই দুর্বোধ্য-একটা প্রহেলিকার মতো। এত-জেদি কেন তারা, এমন একগুঁয়ে? এখন যখন ব্ল্যাকল্যাণ্ড ব'লেই কিছু আর নেই, কী তারা তবে পাবে এই রাজভবন থেকে? এই মরা শহরটা ছেড়ে চ'লে গেলেই তারা ভালো করবে না কি? এই ভুতুড়ে শহর ছেড়ে নাইজারের তীরে চ'লে-যাওয়াই তো তাদের পক্ষে শ্রেয় হ'তো।

বাইরে *হর্ষচরিতদের* উত্তেজিত কথাবার্তার মধ্যে তাদের এই অদ্ভুত আচরণের একটা হদিশ পাওয়া গেলো। তাদের নেতাকে উদ্ধার করবার কোনো বাসনাই আর নেই তাদের; তাদের ধারণা তাদের নেতাই এমন ক'রে তাদের পথে বসিয়েছে; এখান থেকে পালাতে পারলেই এখন তারা বাঁচে। প্রথমে, অবশ্য, সব ধনরত্ন লুঠ ক'রে নিয়ে যেতে চায় তারা —কারণ তাদের ধারণা সব ধনরত্ন হ্যারি কিলার রাজভবনের তহবিলেই জমা ক'রে রেখেছে। যখন সব ধনরত্ন নিজেদের মধ্যে তারা ভাগবাঁটোয়ারা ক'রে নেবে, তখন আর একমুহূর্তও অপেক্ষা করবে না—তল্পিতল্পা গুটিয়ে এখান থেকে সোজা পিঠটান দেবে —অন্য-কোনো আকাশের তলায় গিয়ে ফাঁদবে তাদের খুনজখমরাহাজানির ব্যাবসা।

শরণার্থীরা, পারলে, খুশি হ'য়েই রাজভবনের কোষাগার উন্মুক্ত ক'রে দিতো তাদের কাছে। কিন্তু ব্ল্যাকল্যাণ্ডের *প্রাক্তন* সর্বেসর্বা (প্রাক্তনই তো, কারণ ব্ল্যাকল্যাণ্ডই নেই আর) কোথায় যে তার লুঠতরাজের মাল লুকিয়ে রেখেছে কেউই তা জানে না। অথচ এই কোষাগার উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে এই শত্রুদের হাত থেকে যদি নিষ্কৃতি পাওয়া যেতো, তবে তা-ই করতো শরণার্থীরা।

কারখানার দিক থেকে অনবরত বিস্ফোরণের আওয়াজ আসা ছাড়া পরিস্থিতি একই রকম রইলো সকাল নটা অব্দি। উইলিয়াম ফেরনে তখনও চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে ছাদ ভাঙতে, *হর্ষচরিতেরা* তখনও নাস্তানাবুদ হ'য়ে যাচ্ছে দরজা ভাঙতে গিয়ে।

কিন্তু শেষমুহূর্তে হয়তো *হর্ষচরিতেরাও* তাদের রণকৌশল পালটালে। দরজাটা ভাঙবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে নিজেদের খামকা অবসন্ন ক'রে ফেলার চাইতে তারা দরজাটার পাশের ইটবালিপাথর নিয়ে পড়লো। একঘন্টা ধ'রে অবিশ্রাম শোনা গেলো পাথর ভেঙে ফেলবার শব্দ। তারপর বিকট-একটা বিস্ফোরণ দেয়ালের নিচের দিককার পাথর গুঁড়িয়ে দিলে। তারা শেষটায় বুদ্ধি ক'রে একটা গর্ত করতে পেরেছে দেয়ালে । ভাঙতে পারেনি পাথর, কিন্তু তাতে একটা ফুটো ক'রে তাতে গুলিবারুদ রেখে পলতেয় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে তারা।

দরজাটা আছে যদিও, তবু বড্ডই নড়বোড়ে হ'য়ে পড়েছে সেটা। দ্বিতীয়-আরেকটা বিস্ফোরণেই পাশের দেয়াল উড়ে গিয়ে দরজাটা ধ'সে পড়বে। দেয়ালের সেই গর্তের মধ্য দিয়ে এর মধ্যেই দেখা দিতে শুরু ক'রেছে রাইফেলের নল।

শরণার্থীদের হলঘরটা ছেড়ে চ'লে যেতে হ'লো রাজভবনের একেবারে শেষপ্রান্তে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর *মেরিফেলোরা* তখন দ্বিতীয়-একটা বিস্ফোরণের তোড়জোড় ক'রে দেয়ালের ওপর দিকে একটা ফুটো করতে লেগে গিয়েছে, যেখানে তারা রাখবে তাদের গোলাবারুদ, *বাড়িতে-বানানো ডায়নামাইট*।

ঠিক সেইমুহূর্তে আরেকটা উৎকট শব্দ জানান দিলে যে তৃতীয় ছাদটাও ভেঙে পড়েছে। কয়েক মিনিট বাদেই দোতলার ছাদের ওপর ধুপধাপ পায়ের শব্দ শুনতে পেলে শরণার্থীরা।

পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোরালো হ'য়ে উঠছে, কিছুতেই আর আয়ত্তের মধ্যে থাকছে না। বাইরে তিন-চারশো *হর্ষচরিত*, হয়তো আধঘণ্টা বাদেই হুড়মুড় ক'রে বেনোজলের মতো এসে ঢুকবে রাজভবনে। ওপরে, একদল নাছোড় ও গোঁয়ার দস্যু, হয়তো প্রায় একই সময়ে বন্দুক বাগিয়ে মুহুর্মুহু গুলি ছুঁড়তে শুরু ক'রে দেবে। এই ভবিতব্যের সঙ্গে মোকাবিলা করবার মতো মোটেই কোনো অবস্থা নেই কারু। শরণার্থীদের হালছাড়া হতাশাকে স্তোক দিয়ে কাটাবার চেষ্টা করেছিলেন আমেদে ফ্লরেঁস আর মঁসিয় বারজাক, জেন আর লুইস ব্রেজন—কিন্তু বৃথা চেষ্টা। শরণার্থীরা হাল ছেড়ে দিয়ে গড়িয়ে আছে মেঝেয়, অপেক্ষা ক'রে আছে কখন শেষ-মর্মান্তিক আঘাতটা আসবে!

কিন্তু পুরো অবস্থাটাই আচমকা, অপ্রত্যাশিত, বদ্‌লে গেলো। উইলিয়াম ফের্‌নেরা আর *হর্ষচরিতেরা*—দু-দলই একই সঙ্গে তাদের হাতের কাজ থামিয়ে দিলে। একটা বিস্ফোরণ—আশপাশে পর-পর যে ধরনের বিস্ফোরণ হচ্ছে, মোটেই তার মতো নয় —হঠাৎ সব শব্দকে ছাপিয়ে গ'র্জে উঠেছে—আর রাজভবনের চারপাশ থেকে তার প্রতিধ্বনি গুমগুম ক'রে ছড়িয়ে যাচ্ছে বিলম্বিত। বিস্ফোরণ, না কি কামানের আওয়াজ ? আবার পর-পর অনেকগুলো সেই একই রকমের আওয়াজ, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই, এসপ্ল্যানেড আর ওপাশের খোলাজমির মাঝখানকার দক্ষিণপুবের দেয়ালের বেশির ভাগই ধ'সে পড়লো।

অকথ্য-সব খিস্তি বেরিয়ে এলো *হর্ষচরিতদের* মুখ থেকে, অকহতব্য-সব গালাগাল ! মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছে তারা ঐ উড়ে-যাওয়া দেয়ালটার দিকে, আর অমনি যা চোখে পড়েছে দেখে তা বুঝি আদপেই তাদের পছন্দ হয়নি, কেননা তারা সব পাগলের মতো হাত-পা নেড়ে কী যেন চেঁচিয়ে বলছে—তর্ক জুড়ে দিয়েছে একে-আরের সঙ্গে। উইলিয়াম ফের্‌নে ছাদ ভাঙবার কাজ স্থগিত রেখে ফের ছুটে উঠে যাচ্ছে মিনারে, আর *হর্ষচরিতেরা* বিশৃঙ্খলভাবে দৌড় লাগিয়েছে নদীর অন্যতীরটার দিকে। কী-এক অবর্ণনীয় আতঙ্কে তারা যেন হুটোপাটি লাগিয়ে দিয়েছে, ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি—পালাবার চেষ্টায় মরীয়া, আর এমন সময় আরেকটা কামানের গোলা—হ্যাঁ, গোলাই যেন—এসে পড়লো ঠিক তাদের মাঝখানে, অন্তত পঞ্চাশজন ম'রে গেলো মুহূর্তে, আর উড়ে গেলো দুটো সেতুই —কাস্‌ল ব্রিজ আর গার্ডেন ব্রিজ। স্থলপথে ডানদতীরে যাবার কোনো উপায়ই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর নেই —কিন্তু তাতে কী ? যারা প্রাণে বেঁচেছে, তারা সবাই ঝুপঝাপ ক'রে লাফিয়ে পড়েছে নদীর জলে।

মুহূর্তের মধ্যে এসপ্ল্যানেড ফাঁকা হ'য়ে গেলো। আর বিস্ফোরণের শব্দের ফাঁকে-ফাঁকে কী-রকম একটা থমথমে স্তব্ধতা নেমে আসছে চারপাশে। হতভম্ব শরণার্থীরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কী হচ্ছে, এমন সময় রাজভবনের একটা কোণাই উড়ে গেলো। মার্সেল কামারে তাহ'লে পুরো জায়গাটাকেই একটা গোরস্থান বানিয়ে দেবেন ব'লে ঠিক করেছেন। না, এবার তাদেরও পালাতে হবে।

শরণার্থীরা সবাই ছুটে বেরিয়ে এলো এসপ্ল্যানেডে : *হর্ষচরিতেরা* হঠাৎ কী দেখে এমন ভয় পেয়ে পালালো, তা জানবার জন্যে তাদের কৌতূহলের শেষ নেই। তারাও যেদিকটায় দেয়ালটা উড়ে গিয়েছে সেদিকেই ছুটলো। তারা তখনও তার কাছে পৌঁছোয়নি, ঠিক এমন সময় বেজে উঠলো তূরী-ভেরী-শিঙার শব্দ।

ভেরীর আওয়াজে এ-কোন উদ্ধার এলো, তা যেন কানে শুনেও বিশ্বাস হ'তে চাচ্ছিলো না কারু। তারা সবাই থমকে দাঁড়ালে, দোনোমনা, দ্বিধাব্যাকুল, ঠিক যেমন নদীর ঘাটেও কারখানার অন্যান্য কর্মীরা হতভম্ব হ'য়ে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে আছে। তারাও তারপর ছুটে এলো ভাঙা দেয়ালটার দিকে।

এইভাবেই—হতভম্ব, আর্ত, ব্যাকুল—সবাইকে পেয়েছিলেন কাপ্তেন মার্সেনে। কারণ শেষমুহূর্তে কামানের গর্জন আর এই তূরীভেরীর আওয়াজ কাপ্তেন মার্সেনের দলবলের আগমনই ঘোষণা করেছিলো। সবাই তারা আছে এসপ্ল্যানেডে, চারপাশে ফরাশি বাহিনী —আর শরণার্থীরা সবাই বিবর্ণ, পাণ্ডুর, হা-ক্লান্ত, দুর্বল, কম্পমান—খিদেয় প্রায়-জ্ঞানহারা।

ফরাশি বাহিনীকে দেখে প্রথমটায় শরণার্থীরা ছুটে যেতে চেয়েছিলো তাদের দিকে, কিন্তু হাঁটুতে কোনো জোর ছিলো না আর, তারা শুধু তাদের বাহুগুলো আকুলভাবে বাড়িয়ে দিতে পেরেছিলো তাদের উদ্ধারকর্তাদের দিকে—কয়েকজন মূর্ছিত হ'য়ে প'ড়েই গিয়েছিলো মাটিতে।

এসপ্ল্যানেডে দলবল নিয়ে এসে শুধু এই করুণ দৃশ্যটাই দেখেছিলেন কাপ্তেন মার্সেনে। নদীর ওপাশে বিশাল জায়গা জুড়ে একটা ধ্বংসস্তূপ, যা থেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশে। ডানদিকে বামদিকে—দুটো বিশাল ভবন, এখন অর্ধেক-ভাঙা— আর সামনে প'ড়ে আছে রাশি-রাশি মৃতদেহ। আর তারপরেই ধুঁকছে এক-দল লোক—গোঙাচ্ছে, কাঁদছে, থরথর ক'রে কাঁপছে। এদের দিকেই এগুলেন কাপ্তেন মার্সেনে—এদের মধ্যে কি তিনি পাবেন তাকে, যাকে খুঁজতে তিনি বেরিয়েছেন, সেই-কবে ?

পরক্ষণেই সব দুশ্চিন্তা কেটে গেলো। কাপ্তেন মার্সেনেকে দেখেই জেন ব্লেজন,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ কোন্ অজ্ঞাত ভাঁড়ার থেকে শেষ শক্তিটুকু নিংড়ে বার ক'রে নিয়ে, অবসন্ন পা টেনে-টেনে টলতে-টলতে কাপ্তেন মার্সেনের দিকে এগিয়ে গেলো। জেনকে দেখে যেন প্রথমে চিনতেই পারছিলেন না কাপ্তেন মার্সেনে—এই পাণ্ডুবর্ণ, কোটরগত চোখ, চোখের মণিতে জ্বরাতুর-দীপ্তি মেয়েটি—একেই কি তিন মাস আগে ছেড়ে এসেছিলেন ঝলমলে, দীপ্ত, স্বাস্থ্যে উচ্ছল। এগিয়ে এসে তাকে তিনি ধ'রে না-ফেললে জেন মূর্ছিত হ'য়ে প'ড়ে যেতো এসপ্ল্যানেডে।

যখন তিনি তার জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করছেন, তখন এসপ্ল্যানেডের দু-দিকে দুটো বিশাল বিস্ফোরণ একসঙ্গেই উড়িয়ে দিলে কারখানা আর রাজভবনকে। আর সেই ধ্বংসের মাঝখানে আকাশ হাৎড়ে দাঁড়িয়ে রইলো শুধু দুটো মস্ত মিনার।

রাজভবনের ওপরের মিনারটায় দাঁড়িয়ে আছে উইলিয়াম ফেরনে, আর তার নওরতনের আটজন, ন-জন কালো ক্রীতদাস, পাঁচজন ব্ল্যাকগার্ড—সবশুদ্ধু তেইশজন, তারা রেলিঙ ধ'রে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে যেন সাহায্যের জন্যে অনুনয় করছে। আর অন্য মিনারটায় দাঁড়িয়ে আছে একজনই—তিনবার সে প্ল্যাটফর্মটার চারপাশ ঘুরে এলো, হাত-পা নেড়ে উত্তেজিতস্বরে কী যেন প্রলাপ বকছে সে, এতদূর থেকে তার চীৎকার থেকে দুটো কথাই শোনা গেলো : 'অভিশপ্ত... অভিশপ্ত ব্ল্যাকল্যাণ্ড !'

নিশ্চয়ই সে-কথা কানে গিয়েছিলো উইলিয়াম ফেরনের, সে পা দাপালে তার, আর পাশে কার হাত থেকে একটা রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালালে কারখানার দিকে—প্রায় চারশো গজ দূরে ! নিশ্চয়ই তাগ করেনি সে, শুধু গায়ের জ্বালা মেটাতেই গুলিটা সে করেছিলো, কিন্তু বুলেট গিয়ে পৌঁছুলো লক্ষ্যে, মার্সেল কামারে বুক চেপে ধ'রে একবার যেন বেশামাল পাক খেয়ে গেলেন প্ল্যাটফর্মের ওপর।

আর তৎক্ষণাৎ একসঙ্গে দুটো বিস্ফোরণ—আগেরগুলোর চাইতে আরো-ভয়ংকর—কাঁপিয়ে দিলো আকাশবাতাসমাটি—আর দুটো মিনারই একসঙ্গে ধ'সে পড়লো। একটা নিজের সঙ্গে কবরে নিয়ে গেলো উইলিয়াম ফেরনেকে, আর অন্যটা কবরে নিয়ে গেলো মার্সেল কামারেকে।

আর সেই ভয়ংকর শব্দের পর সারা জায়গাটায় নেমে এলো যেন শ্মশানের স্তব্ধতা। আর এই বিভীষিকার মধ্যে যারা বেঁচেছিলো তারা ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো, উৎকর্ণ—কিছুই নেই আর চোখের সামনে, ধ্বংস ছাড়া; আর কানে আসছে না কোনো শব্দ না, কোনো শব্দই আর নেই যেন কোথাও।

সব শেষ হ'য়ে গেলো।

যে-লোক ব্ল্যাকল্যাণ্ড তৈরি করেছিলো একদিন, সে-ই তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস ক'রে দিয়েছে। মার্সেল কামারের আশ্চর্য, *কিন্তু দুর্ভাগা,* কীর্তির আর-কিছুই টিকে নেই।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পনেরো

# উপসংহার

এইভাবেই শেষ হ'য়ে গেলো মার্সেল কামারে, আর উইলিয়াম ফেরনে ওরফে হ্যারি কিলারের। আর সেই একই সাথে ধ্বংস হ'য়ে গেলো ব্ল্যাকল্যাণ্ড, সারা জগতের অজ্ঞাতসারে যে-শহর একদিন গ'ড়ে উঠেছিলো ধূ-ধু মরুভূমির মাঝখানে। আর তারই সাথে-সাথে ধ্বংস হ'য়ে গেলো যত আশ্চর্য উদ্ভাবন, ব্ল্যাকল্যাণ্ডকে যা অবিশ্বাস্য পরাক্রম দিয়েছিলো। শহর আর তার ভেতরের জিনিশ বলতে এখন যা আছে তা শুধু এক বিরাট ধ্বংসস্তূপ, মরুভূমির বালির লোল জিভ যা একদিন চেটে খাবে। সঞ্জীবনী যে-বৃষ্টি বর্ষেছিলো মার্সেল কামারের কল্যাণে, আর তা বর্ষাবে না। শুকিয়ে যাবে রাঙানদীর খাত, হ'য়ে উঠবে বন্য ঊষর অনুর্বর এক *মরা আবাদ* যার মধ্যে আর্দ্রতা থাকবে না একফোঁটাও, শুকিয়ে যাবে খেতখামার, আর মরুভূমি আবার ফিরে পাবে যা তার ছিলো একদিন, যা তার কাছ থেকে একদিন ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো মানুষেরই অপরিসীম সৃষ্টিপ্রতিভা। স্রষ্টারই অঙ্গুলিহেলনে ব্ল্যাকল্যাণ্ড এখন মরা, পরিত্যক্ত—এমন-কিছুই নেই, যা ভাবীকালকে এই আশ্চর্য প্রতিভার বৃত্তান্ত বলতে পারে।

কাপ্তেন মার্সেনে অত্যন্ত-তৎপর চেষ্টা করেছিলেন, যাতে এই মশানে তাঁকে বেশিক্ষণ না-থাকতে হয়। কিন্তু ফিরতে-ফিরতে তাঁর একমাস লেগে গেলো। তাঁকে কবর দিতে হ'লো মৃতদের—সংখ্যায় তারা কয়েকশো হবে, সেবাশুশ্রূষার চেষ্টা করতে হ'লো আহতদের, অতটা পথ যাবার জন্যে তাদের তো সারিয়ে তুলতে হবে, খানিকটা অন্তত ফিরিয়ে আনতে হবে স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য। ব্ল্যাকল্যাণ্ডের পুরোনো বাসিন্দাদের মধ্যে কতজনই যে আর তাদের স্বদেশের মাটিতে ফিরে যেতে পারবে না। কর্মীদের মধ্যে মারা গেছে অন্তত কুড়িজন, তাছাড়া তিনজন স্ত্রীলোক, আর দুজন শিশু—তাদের হত্যা করেছে *হর্ষচরিতদের* বন্দুক, খুব-একটা হর্ষোৎপাদক নয় তাদের কুকীর্তি।

অথচ—কী আশ্চর্য—ভাগ্য বাঁচিয়ে দিয়েছে বারজাক মিশনের সবাইকেই। আমেদে ফ্লরেঁস একটু আহত হয়েছিলেন, কিন্তু তাছাড়া আর-কারু গায়েই আঁচড়টুকুও লাগেনি। তোঙ্গানে আর মলিকও কোনো চোটজখম পায়নি—পরস্পরকে সশরীরে কাছে পেয়ে তাদের সে-কী উল্লাস।

এত-সব বিপদআপদ সহ্য ক'রেও যারা টিকে ছিলো, তারা যখন স্বাস্থ্যোদ্ধারের প্রতীক্ষায় দিন গুনছে, কাপ্তেন মার্সেনেকে তখন ব্ল্যাকল্যাণ্ডের বাকি দুষ্কৃতকারীদের পাকড়াতে হ'লো। গোরাদের মধ্যে যারা গ্রেফতার এড়াতে চেয়েছিলো তাদের বিচার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ'লো বন্দুকের গুলিতে। অন্যদের হাতে-পায়ে পরানো হ'লো বেড়ি—ফ্রান্সের আইনকানুন তাদের সম্বন্ধে বিধান দেবে, যখন তারা দেশে ফিরে যাবে। আর যাদের গোলাম বানিয়ে রেখেছিলো ব্ল্যাকল্যাণ্ডের গোরারা, সেই কালোদের জড়ো ক'রে আশ্বাস দেয়া হ'লো। নাইজারের তীরে ফিরে গিয়ে পরে তারা যে যার গাঁয়ে ফিরে যাবে।

দশই জুনের আগে বাহিনীর পক্ষে রওনা হওয়াই সম্ভব হয়নি। এমনিতেই সঙ্গে রসদ ছিলো পর্যাপ্ত, তাছাড়া *মেরিফেলোরা* আশপাশের যে-সব গ্রাম ছারখার ক'রে দিয়েছিলো, সেইসব পরিত্যক্ত গ্রামগুলোতেও দানাপানি মিললো। কোনো-কোনো গুরুতর আহতকে স্ট্রেচারে ক'রে নিয়ে যেতে হ'লো—কবে যে তারা হাঁটতে পারবে, সেই প্রত্যাশায় আর অপেক্ষা ক'রে থাকা যায় না। বর্ষা আসছে, আর সুদানে এই বর্ষাই শীতকাল—যদিও কাগজেকলমে পাঁজিপুথিতে তার সংযোগ গ্রীষ্মের সঙ্গেই। ফলে যাত্রা শুরু হ'লো বটে, কিন্তু বাহিনীর গতি হ'লো মন্থর। ছ-সপ্তাহ পরে কাপ্তেন মার্সেনের নেতৃত্বে সবাই এসে পৌঁছুলো টিমবাকটুতে। তারও দু-মাস পরে বারজাক মিশনের সঙ্গে যাঁরা বেরিয়েছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগই ফিরে গেলেন ফ্রান্সে, কেউ-কেউ ইংলণ্ডে।

মঁসিয় পঁসাঁ তাঁর দফতরে ফিরে গিয়ে *মিথ্যা, অর্ধমিথ্যা ও পরিসংখ্যানের* হাজারো মজায় মনোনিবেশ করলেন। ডাক্তার শাতোনে ফিরে গেলেন তাঁর পেশায়—তাঁর পুরোনো রুগিদের কাছে। মঁসিয় ল্য দেপুতে বারজাক সংসদে নিজের ঘরে পুনরধিষ্ঠিত হলেন, তবে কালোদের ভোট দেবার অধিকারের প্রশ্নটা আপাতত মুলতুবি রাখা হ'লো, কিন্তু মঁসিয় বারজাকের নামডাক এতটাই বেড়ে গেলো কেউ-কেউ ভাবলে তিনিই বুঝি উপনিবেশ দফতরের ভাবীমন্ত্রী হবেন।

মলিক আর তোঙ্গানে চ'লে এসেছে ইংলণ্ডে—আর ইংলণ্ডে এসে বিয়ে করেছে।

সাঁৎ-বের‍্যাঁ... কিন্তু সাঁৎ-বের‍্যাঁর বৃত্তান্ত তো কিছুই নেই। তিনি মাছ ধ'রে বেড়ান, শিকারে যান, যাদের গোঁফ আছে ভুল ক'রে তাদের সম্বোধন করেন *মাদাম*, যাদের গোঁফ নেই তাদের বলেন *মঁসিয়*, আর ঐ ব্লেজনদের কাসলের কাছেই নিজের ভিলাটায় আছেন।

টিমবাকটু পৌঁছেই কাপ্তেন মার্সেনে ছুটির দরখাস্ত করেছিলেন—এবার অবশ্য কোনো উচ্চবাচ্য ছাড়াই সেটা মঞ্জুর হয়েছে। আর ছুটি নিয়ে সাঁৎ-বের‍্যাঁ, লুইস আর জেন ব্লেজনের সঙ্গে তিনি এসে হাজির হয়েছেন ইংলণ্ডে।

ব্ল্যাকল্যাণ্ডের ধ্বংসস্তূপে যে-একমাস কাটিয়েছিলেন তার মধ্যে একাধিকবারই তিনি খুলে বলেছেন—তাঁর বাগ্‌দত্তা ও অন্যান্যদের—দৈবের আশ্চর্য কেরামতিতে কেমন ক'রে হঠাৎ ঈথারের মধ্যে দিয়ে তাঁর কাছে এসে পৌঁছেছিলো মার্সেল কামারের পাঠানো সেই বেতারবার্তা। আর তারপর সে কী তাঁর মর্মযাতনা—যখন কর্নেল আলেজ্ এমনকী তাঁর ছুটিও মঞ্জুর করতে চাননি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে পরের দিনই—ভাগ্যিশ—উত্তর এসে পৌঁছেছিলো কর্নেল সাঁৎ-ওবানের কাছ থেকে, তাতে তিনি স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়েছিলেন তথাকথিত লিউটেনান্ট ল্যকুরের আনা ঐ ফরমানটিই যে শুধু জাল তা নয়—লিউটেনান্ট ল্যকুরকেই তিনি চেনেন না; তিনি চান যে মঁসিয় বারজাকদের বিপদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে এক্ষুনি একটা বাহিনী পাঠিয়ে দেয়া হোক। তৎক্ষণাৎ বাহিনী বেরিয়ে পড়লো সুপ্রস্তুত, নাইজার ধ'রে গাও; আর তারপর পথের অনেক বিপদ-আপদ পেরিয়ে মার্সেনে অবশেষে এসে পৌঁছেছেন ব্ল্যাকল্যাণ্ডে।

ইংলণ্ডে পৌঁছেই দ্রুততম যানবাহনে ক'রে জেন ফিরে এলো গ্লেনর কাসলে—সঙ্গে তার দাদা, কাপ্তেন মার্সেনে আর সাঁৎ-বের্ঁা। তাদের আসবার খবর নিয়ে আগেই এসেছিলো টেলিগ্রাম। প্রায় একবছর আগে গ্লেনর কাসল ছেড়ে বেরিয়েছিলো জেন। এখন সে ফিরে এসেছে বিজয়িনী, ব্রেজন বংশের গায়ে যতটুকু কালি লেগেছিলো, তারই চেষ্টায় সে-সব মুছে গেছে এখন, হৃত-সম্মানে আবার পুনরধিষ্ঠিত হয়েছেন লর্ড অভ গ্লেনর।

জেন এসে কেমন অবস্থায় দেখেছিলো তার বাবাকে ? বৃদ্ধ—তাঁর বয়েস চুরানব্বুই বছর—তিনি কি কন্যার অদর্শন সহ্য করতে পেরেছেন ? সহ্য করতে পেরেছেন তাঁর ছোটোছেলে সেনট্রাল ব্যাঙ্কের ডাকাতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে বংশের সুনামে নতুন যা কালি ঢেলে দিয়েছে ? খবরকাগজগুলো অবশ্য যতটা বিষ ঢালা সম্ভব সব বিষ ঢেলে দিয়ে এখন ফের হৃতসম্মান ফেরাবার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হ'য়ে আছে। আমেদে ফ্লরেঁস ইওরোপে ফিরে এসেই সব জানিয়েছেন পর-পর নিবন্ধ লিখে, আর অমনি সব শেয়ালের এক রা-য়ের মতো সব কাগজই জর্জ আর লুইস ব্রেজনের গুণগানে মুখর হ'য়ে উঠেছিলো। কিন্তু লর্ড অভ গ্লেনর কি খবরকাগজ পড়েন ? না কি সব সুখবর তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছেছে আশাবিহীন-দেরিতে ? সেনট্রাল ব্যাঙ্কের ডাকাতির পর বাবার অবস্থা কী-রকম হয়েছিলো সেটা তো লোকের মনে আছে!

অবশেষে জেন এসে পৌঁছুলো অসহায় বৃদ্ধের কাছে। অসহায়, কিন্তু চোখে তখনও বুদ্ধির দীপ্তি ঝকমক করছে, বোঝা যায় এখনও তিনি ধরতে পারেন চারপাশে কখন কী ঘটছে, কে কী বলছে। জেনের সঙ্গে ঘরে ঢুকেছিলো লুইসও, সাথে সাঁৎ-বের্ঁা, আর কাপ্তেন মার্সেনে। জেন সব কথা সংক্ষেপে খুলে বললে, বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে কাপ্তেন মার্সেনের, দেখালে সেই কাগজ কুবোর কবরখানায় সাক্ষীদের দস্তখৎ সমেত কী বেকসুরনামা সে লিখিয়ে নিয়েছিলো। আরো-একটা কথা সে বলেছিলো বাবাকে, যেটা সম্বন্ধে খবরকাগজ নীরব ছিলো—সেটা উইলিয়াম ফেরনের কথা, তার ঘৃণা তার দ্বেষ তার বিজাতীয় ক্রোধের কথা—বললে সে কীভাবে ব্রেজন পরিবারের মানসম্মান সব ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চেয়েছিলো। আর সবকিছু খাপে-খাপে মিলে গেলো।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লর্ড অভ গ্লেনরের মনে আর-কোনো সন্দেহই রইলো না। যদিও তাঁর এক ছেলে মারা গেছে, সেটা শোচনীয়, তবু দুই ছেলেরই মানইজ্জৎ আবার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে প্রকাশ্যেই।

বৃদ্ধ, নির্নিমেষে কন্যার দিকে তাকিয়ে, সব কথা অধীরভাবে উৎকর্ণ হ'য়ে শুনছিলেন। জেনের বৃত্তান্ত যখন শেষ হ'লো, তাঁর মুখে একঝলক রক্ত উঠে এলো, কেঁপে উঠলো তাঁর ঠোঁট দুটো, আর থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো তাঁর সারা শরীর। তাঁর শরীরের কাঠামোটার মধ্যে তাঁর প্রাণমন যেন কীসের সঙ্গে যুঝছে।

সবাই সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে দেখলো বৃদ্ধ কীভাবে নিজের সঙ্গে যুঝছেন। কিন্তু রক্তমাংসের চেয়েও প্রবলতর কারু ইচ্ছাশক্তি। এই প্রথমবার, অত মাস পর, লর্ড অভ গ্লেনর ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলেন, কথা বলতে পারলেন, তাঁর রূপান্তরিত মুখচ্ছবি জেনের দিকে ফেরানো। হাত বাড়িয়ে তিনি খুঁজলেন তাঁর সাহসিনী মেয়েকে, যে তাঁর জন্যে এত-কিছু ক'রে এসেছে, আর বিজয়িনীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর ঠোঁট দুটি থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো।

আর, তারপরেই, মনে হ'লো বাঁচবার সকল কারণই যেন তাঁর হারিয়ে গেছে; গভীর-একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ তাঁর চোখ বুজলেন। সে-ই তাঁর শেষনিশ্বাস, নিশ্চিন্ত, কিন্তু শেষ। যেন এতদিন তিনি শুধু এইমুহূর্তটারই অপেক্ষা ক'রে ছিলেন।

মিথ্যেই তারা চেষ্টা করলে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে জীবিতদের মাঝখানে। কিন্তু গ্লেনরের লর্ড ব্রেজন পৌঁছেছেন শান্তিধামে, যেন অনেকদিন পরে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি মারা গেছেন বটে, কিন্তু শান্তি পেয়ে মরেছেন।

**এই বৃত্তান্তর এখানেই শেষ হওয়া উচিত।**

সব কুশীলবেরই খবর আমরা জেনে গেছি। শুধু একজনের বাদে।

অর্থাৎ আমি...

হুঁ, এই দ্যাখো, আবারও আগে থেকে সব ফাঁস ক'রে দিচ্ছি আমি,... তো, না-হয় এইই বলা যাক যে আমেদে ফ্লরেঁস ফের *ল্যাক্রপানসিয়ঁ ফাঁসেস্ট-র* হ'য়ে কাজ শুরু করেছেন, কিস্তিতে-কিস্তিতে এই কাগজেই বেরিয়েছে তাঁর রোমাঞ্চকর অ্যাডভেনচারের বৃত্তান্ত, তাঁর সম্পাদকেরা যার দাম ধ'রে দিয়েছেন লাইনপ্রতি তিরিশ সঁতিম। সেই মজুরিতে তাঁর পোষায় কী ক'রে, তিনি তো আর বড়োলোক নন, ফলে তিনি একঢিলে দুই-পাখি মারতে চেয়েছেন—এই একই বিষয়ে ফেঁদে বসেছেন দুর্বার ও আশ্চর্য এক অভিযানের উপন্যাস।

উপন্যাস? জিগেস করতে চাচ্ছেন... কোন উপন্যাস?

কিন্তু সে তো এটাই, প্রিয় পাঠকপাঠিকাগণ, সে-তো এই উপন্যাসটাই— আপনারা এখন যার প্রথম থেকে এ-পর্যন্ত প'ড়ে এসেছেন।

মস্ত মনস্তাত্ত্বিক এই আমেদে ফ্লরেঁস, তাঁর মনে হয়েছে তিনি যদি সব সত্যিকথাই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখেন তাহ'লেই তা উপন্যাসের চেয়েও মনোরম হবে, লোকে পড়তে-পড়তে হাই তুলবে না—তিনি তো আর ঘুমের ওষুধ বিক্রি করতে বসেননি, অনিদ্রারোগের কোনো মহৌষধ —যেমন হয় বেশির ভাগ আজগুবি কল্পবিজ্ঞান কাহিনীই। কিন্তু তাকে শুধু সাজিয়ে দিয়েছেন তিনি নিজের মতো ক'রে—অর্থাৎ এ-বইতে যা আছে সবই ঘটেছে, তবে তার বিন্যাসটা আমেদে ফ্লরেঁসের স্বকপোলকল্পিত।

তা ভালো হোক মন্দ হোক, উপভোগ্যই হোক বা একঘেয়েই হোক, এইই তবে শেষ। অতএব খসানো যাক ছদ্মবেশ, সর্বসমক্ষে কবুল করা যাক এই উপন্যাসের লেখক আপনাদের সেবক এই-অধমই, যাঁর নাম আমেদে ফ্লরেঁস, *ল্যক্রপান্সিয়ঁ ফ্রাঁসেঈর* সাংবাদিক, যিনি অবশেষে সব উপন্যাসের সেরা-কথাটাই লিখে দিচ্ছেন, রাজা-কথা, সেরা-কথা :

স মা প্ত

mmhs013



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~